ভারতশিল্পী নন্দলাল
ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল

ভারতশিল্পী নন্দলাল

দ্বিতীয় খণ্ড

—যেমনটি বলেছেন—

(১৯৪২-১৯৬৬)

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ

BHARATSILPI NANDALAL

BY DR. PANCHANAN MANDAL

রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ প্রকাশন

দোলযাত্রা চৈত্র ১৩৯০ মার্চ ১৯৮৪

মূল্য এক শত টাকা
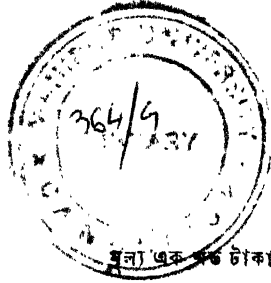
মুদ্রক ও প্রকাশক

রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদের পক্ষে শ্রীশিবপ্রসাদ শর্মা

শ্রীদুর্গা প্রেস বোলপুর বীরভূম ৭৩১ ২০৪

প্রাপ্তিস্থান

রাঢ়-গবেষণা পর্ষদ পল্লীশ্রী গ্রন্থাগার

রতনপল্লী শান্তিনিকেতন বীরভূম ৭৩১ ২৩৫

পরিবেশক

দে বুক স্টোর

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

ফোন : ৩৪-৫০৩৫

উৎসর্গ

॥ 'সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা' রবীন্দ্রনাথের
স্মৃতির উদ্দেশে
'পঞ্চাশ বছরের কিশোর-গুণী'
নন্দলাল বসুর
মধ্যপর্ব জীবনগাথা নিবেদিত হইল ॥

॥ নিবেদন ॥

রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ ভারতশিল্পী নন্দলাল গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করলেন। এ-গ্রন্থ ১৯৮২সালে প্রকাশিত প্রথম খণ্ড গ্রন্থের পরবর্তী পর্যায়। আকারে প্রকারে সমানই। তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

এর মধ্যে ১৯৮৩সালের অগস্ট মাসে বিশ্বভারতী 'ভারতশিল্পী নন্দলাল জীবন ও চিত্রপঞ্জী' পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। এই বইখানি এই মূল তিন খণ্ড গ্রন্থের সূত্র অনুসরণে লিখিত। পুস্তিকাখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭২। এরই একটু বস্তুগত কলেবর বৃদ্ধি করে ১২০ পৃষ্ঠা করার জন্যে প্রস্তাব এসেছে ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট্ থেকে। ইংরেজী অথবা হিন্দী ভাষায় তাঁরা এই বই-খানির অনুবাদ করাবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও নন্দলালের জীবনী কিয়দংশ প্রকাশ করছেন।

নয়াদিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারি অব্ মডার্ন আর্ট ভারতশিল্পী নন্দলালের ৬৭৪৪খানি শিল্পকর্ম সংগ্রহ করেছেন। ১৯৮৩সালে ২৩৪খানি চিত্রসম্বলিত সুন্দর একখানি এ্যালবাম প্রকাশ করেছেন। ১৯৮৪সালে ১৪৪খানি ছবির দেশে বিদেশে ভ্রাম্যমান বিশাল একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে জনগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

ভারতবর্ষে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে, চীনে, জাপানে, এমনকি সমগ্র এশিয়াখণ্ডে নন্দলালের অসংখ্য চিত্রাবলি এখনও প্রকীর্ণভাবে অধিগত রয়েছে। পাশ্চাত্যদেশে অনেক প্রতিষ্ঠানে ও বহু মনীষীর উত্তরাধিকারিগণের নিকটেও নন্দলালের বহু ছবি রক্ষিত আছে। লর্ড কারমাইকেলের আমলে ভালো কিছু ছবি ভূমধ্যসাগরে 'বরুণদেব' গ্রাস করেছেন।

'দেশ' বিনোদন ১৩৮৯ নন্দলাল জন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যা নন্দলালের বহু স্কেচকর্মের নিদর্শন প্রকাশ করেছেন ও চিত্রাবলির যথাসাধ্য সংখ্যায়ন করেছেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এ-সবের সংগ্রহ ও সঙ্কলন করা আকাশের তারা গণনার মতো দুরূহ ও পরবর্তিকালে দীর্ঘদিনের সন্ধান, সংগ্রহমূলে নিখুঁত গবেষণাসাপেক্ষ ব্যাপার।

নন্দলাল জন্মশতবর্ষে ভারতশিল্পী নন্দলাল প্রথম খণ্ড গ্রন্থের গ্রাহকবর্গকে

ধন্যবাদ জানাই। উদার হস্তে তাঁরা এগিয়ে না-এলে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভবপর হতো না। কেন্দ্রীয় সরকারের আচার্য নন্দলাল বোস সেন্টিনারি সেলিব্রেশন্‌স সেন্ট্রাল কমিটির বইকেনার আগ্রহ ছিল সর্বাধিক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বই অধিগ্রহণের উদ্যোগের প্রসঙ্গও স্মরণে রাখতে হয়। বিশ্বভারতীকে ১৫হাজার টাকা মূল্যের ১৫০কপি বই দান দিয়ে, ওঁদের বিক্রয়লব্ধ অর্থের ফাণ্ড থেকে, নন্দলাল শতবর্ষ স্মারক বক্তৃতামালা প্রবর্তন করার অনুরোধ করেছিলুম। কিন্তু বিশ্বভারতী আমার সে প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। তাঁরা বই না-নিয়ে, নগদে পনেরো হাজার টাকা চেয়েছিলেন। নন্দলাল-শিষ্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, মদীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালানি ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায়, সতীর্থ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শঙ্খ চৌধুরীর এবং ডাক্তার অমরেশ দে, শ্রীমতী ইরাবতী দে, ডক্টর শ্রীমতী সুমিত্রা কুণ্ডু ও ডাক্তার মহাপ্রসাদ কুণ্ডুর বদান্যতা এবং উৎসাহ অব্যাহত রয়েছে। লাইব্রেরীতে বই বিতরণে শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু দে-এর কৃতিত্ব অনেকখানি। প্রথম খণ্ডের পরিবেশক শ্রীকিশোরীরঞ্জন দাস ও শ্রীমান্ কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় অনেক কাজ করেছেন।

প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে স্মরণ করি যিনি এই গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশের পথ সুগম করে রেখেছিলেন। বোলপুরের শ্রীদুর্গা প্রেসের মালিক ও এই গ্রন্থাবলির প্রকাশক শ্রীশিবপ্রসাদ শর্মার কর্মকুশলতা সাধুবাদের যোগ্য। কলকাতার রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট এই খণ্ডের জন্যে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত চিত্রাবলির ব্লক প্রস্তুত ও মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। 'চিত্রপরিচিতি'র আলোকচিত্রটি ১৯৬৫সালে তুলেছিলেন বোলপুরের গাঙ্গুলী স্টুডিয়ো। চিত্রবিন্যাসে উপদেশ দিয়েছেন মদীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায় মহাশয়। কলকাতার দে বুক স্টোর এই গ্রন্থ পরিবেশনের ভার গ্রহণ করেছেন।

শিবচতুর্দশী
শান্তিনিকেতন
১৬ ফাল্গুন, ১৩৯০

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল
ফেব্রুয়ারি ২৯, ১৯৮৪

প্রথম খণ্ডের নিবেদন

ভারতশিল্পী আচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের সমগ্র জীবন-গাথা পর পর তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হবে। তার মধ্যে প্রথম খণ্ড ৬৬৪পৃষ্ঠা পর্যন্ত বর্তমানে নন্দলালের জন্মশতবর্ষে প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ।

প্রণাম জানাই গুরু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে যিনি জোর করে শুরু না করালে এ বই লেখা কোনো দিন শেষ হতো না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি, তিনি আচার্য নন্দলালের ইঙ্গিতে তাঁর 'সবিতা' মাসিক পত্রিকায় এই মহাগ্রন্থের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ১৩৭১ সাল থেকে ১৩৭৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সেই ধারাবাহিক প্রকাশ অনুসরণ করে এই তিন খণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশের বর্তমান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, আচার্য শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত অশোকনাথ সেন, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র কুণ্ডু, প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী প্রয়াত দাশরথি তা, শ্রীগিরীনদেব মণ্ডল প্রমুখ অনেকে আগ্রহবশতঃ এই গ্রন্থের অধ্যায়বিশেষ তাঁদের পত্র-পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশ করেছিলেন। আকাশবাণীর কলকাতা-কেন্দ্র থেকেও এই গ্রন্থের কিছু অধ্যায় প্রচারিত হয়েছিল। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর শ্রীচন্দ্র সেনের সূত্রে অধ্যাপক ডক্টর শিশিরকুমার ঘোষ বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি (১৯৭১) নন্দলাল-সংখ্যায় এর ইংরেজী অনুবাদ সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করেছিলেন। প্রয়াত ব্যারিস্টার তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্তী মহাশয় বৃহত্তর পাঠক-গোষ্ঠীর অনুরোধে এই মূল গ্রন্থের অনেকখানির ইংরেজী অনুবাদ করে রেখেছেন। এই গ্রন্থখানিকে ভিত্তি করে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয় অধুনা একটি গবেষণা-কর্ম করিয়েছেন। বিশ্বভারতী সম্প্রতি এই গ্রন্থ অবলম্বন করে ভারতশিল্পী নন্দলালের জীবন ও চিত্রপঞ্জী প্রকাশ করছেন। বর্তমানে শান্তিনিকেতন-রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ এই বিশাল গ্রন্থখানি সমগ্রভাবে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

বিশ্বভারতীর গবেষণা-প্রকাশন-সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক ডক্টর শ্রীপশুপতি শাশমল এই গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিষয়ে সমূহ পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। বীরভূম-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীকিশোরী-রঞ্জন দাশ ও কান্দীবান্ধব-পত্রিকার সংকলক শ্রীকল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ পরিবেশনায় সহায়তা করছেন। শ্রীবিশ্বরূপ বসু, শ্রীনৃত্যগোপাল বাগ্নিক, শ্রীঅরুণাচল পেরুমাল, শ্রীগৌরহরি সাহা, শ্রীবুদ্ধদেব আচার্য, ডক্টর শ্রীমতী সুমিত্রা কুণ্ডু, ডাক্তার শ্রীমহাপ্রসাদ কুণ্ডু, শ্রীমতী ইরাবতী দে, ডাক্তার শ্রীঅমরেশ দে, শ্রীমানসকুমার মণ্ডল, শ্রীমতী শুভ্রা মণ্ডল, শ্রীমতী সরমা মণ্ডল, শ্রীমতী রঞ্জাবতী দে, ডাক্তার শ্রীসর্ববন্ধু দে, শ্রীমতী শ্রীপর্ণা কুণ্ডু ও শ্রীকিঙ্করকুমার কুণ্ডুকে সহযোগিতার জন্যে সাধুবাদ জানাই। শ্রীমতী সরমা মণ্ডলের একটি এক্সপেরিমেণ্টের দায় (পৃ ৬:৪) বোধকরি এখনও বাকি রয়ে গেছে। ছবির প্রিণ্ট্‌স সংগ্রহকল্পে সহায়তার জন্যে ডক্টর শ্রীঅমলেন্দু মিত্রকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

শান্তিনিকেতন-বোলপুরের শ্রীদুর্গা প্রেস ও প্রকাশনীর শ্রীশিবপ্রসাদ শর্মা এবং শ্রীসাগর ভাণ্ডারী, শ্রীসত্যগোপাল মণ্ডল, শ্রীনন্দদুলাল শর্মা প্রমুখ নিপুণ সহকর্মিগণ আগ্রহভরে এগিয়ে না এলে পর্ষদের পক্ষে এই গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভবপর হতো না। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো রইলো। কলকাতার কালিকা টাইপ ফাউণ্ড্রী মুদ্রণ-টাইপ সরবরাহের জন্যে এবং ডি-লাক্স প্রিণ্টার্স ছবির ব্লক নির্মাণ ও মুদ্রণের ফলে ধন্যবাদার্হ।

রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ
পল্লীশ্রী রতনপল্লী
শান্তিনিকেতন

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল
২২ অক্টোবর ১৯৮২

॥ ভূমিকা ॥

১৯৪২ সালের কথা। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল বর্ধমান থেকে দুপুরে আসতেন শান্তিনিকেতনে। আসতেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। বিকেলে চলে যেতেন কাজ সেরে। আসতেন রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ছবির জন্যে। অনেকবার এসেছেন। তখন এক দফা ছবি করে দিই।

১৯৪৬ সালে শ্রীমান পঞ্চানন এলেন বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে রিসার্চ ফেলো হয়ে। ও পদটি ওঁর জন্যেই এখানে প্রবর্তন করা হলো। বাঙ্গালা পুঁথি-বিভাগের কাজে পরম উৎসাহে লেগে গেলেন উনি। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র পঞ্চানন কর্মী হয়ে এখানে ফিরে এলেন। ঠানদির মুখে শুনেছিলুম যখন পঞ্চানন এখানকার ছাত্র, গুরুদেব নিজে ওঁকে সার্টিফিকেট দিয়ে, এখানে ফিরে এসে গবেষণার কাজ করতে বলেছিলেন।

১৯৪৭ সালে সুহৃদ্বর সুনীতিবাবু এখানে আসেন পুঁথির কাজ দেখে রিপোর্ট দিতে। কলাভবনেও বেড়াতে এলেন সুনীতিবাবু। তখনই তিনি নির্দেশ দিলেন আমাকে অনুরোধ জানিয়ে, ওঁকে লিখতে শান্তিনিকেতন-কলাভবনের কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে। সেই থেকেই ওঁর এই কাজের সূচনা। আমি কাজের প্রথম একটা খসড়া করে ওঁকে দিলুম। সুনীতিবাবু তার ওপর কিছু যোগ করলেন। পরে, শ্রীমান পঞ্চানন সেই সব অধ্যায় বিভাগের সঙ্গে আমার জীবনচিত্র ও কর্মধারা জুড়ে বর্তমান গ্রন্থের পরিকল্পনা করেছেন।

আমার শিশুকাল থেকে যাবতীয় স্মৃতিকথার শ্রুতিলিখন চালিয়েছেন পঞ্চানন। আমার অবচেতন মনের ভুলে-যাওয়া, দূরে চলে-যাওয়া স্বপনের মতো কত কথা যে টেনে আনলেন শ্রীমান তার ইয়ত্তা নাই। আমার স্মৃতির পটে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট দু-রকম ছবিই আঁকা আছে—সে অনেক। নিরেস ছবিগুলো এই শ্রুতিলিখনে আর যোগ করলুম না। দিয়ে লাভও নাই। তাতে সমাজের কোনও কল্যাণ হবে না। আমার জীবনের উজ্জ্বল দিকের কথাই বলেছি, যাতে আমার উপকার হয়েছে, উন্নতি হয়েছে। নানা ঘাত-

পরিতাপের অভিজ্ঞতার কথাও বলেছি, তা থেকে আমার শিক্ষা হয়েছে। আমার সে শিক্ষা অপরেরও কাজে লাগতে পারে। জীবনে ভালো কাজ যা করিনি তার দ্বারা আমার জীবনের পরিচয় পাওয়া যাবে না। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, জীবনে আনন্দের মাপকাঠিতেই জীবনকে বুঝে নেওয়া ঠিক, দুঃখের মাপকাঠিতে নয়। অন্ধকার দিয়ে আলোর পরিমাপ করা যায় না।

শিল্প বিষয়ে আমার অনুরাগ কিভাবে ছেলেবেলায় আট বছর বয়েস থেকেই বিকাশ লাভ করতে শুরু করেছে সেই কথা বলেছি। তখন থেকেই ঠিক করে নিয়েছি আমি শিল্পী হব। সেই যে আমার শিল্পরুচি, অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে এসে সে নিজের বিকাশ ঘটালো।

বাঙ্গালার বাইরে মুঙ্গের-খড়্গপুরে আমার জন্ম। পনেরো বছর বয়েস পর্যন্ত ওখানেই কাটে। ঐখানকার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে আমার প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ প্রথম স্থাপিত হয়। সেই অকৃত্রিম প্রণয় বন্ধন আমার সারা জীবনের পাথেয় হয়ে চালিয়ে নিয়ে এসেছে আমাকে। কলকাতায় অবনীবাবুর ছাত্র হয়ে শিল্পকর্ম শিক্ষা করেছি। শিল্পকল্পনা ও সৃষ্টির সন্ধান আমি পেয়েছি আমার গুরু অবনবাবুর কাছ থেকে। কিন্তু শহুরে ইঁট কাঠের সে পাষাণ পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে আবার চাক্ষুষ মিলন হলো শান্তিনিকেতনে এসে। এবং প্রকৃতির সঙ্গে মিলনের মর্মকথার সে নূতন দীক্ষা দিলেন আমাকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। অবনী বাবু শিল্পরচনার অনেক উদ্ভাবনার কৌশল ও টেকনিক গভীর শিল্পদর্শন শিখিয়েছেন আমাকে। কিন্তু প্রকৃতিকে এমন নিজের করে প্রত্যক্ষভাবে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন গুরুদেব। তাঁর লেখা গানে, তাঁর লেখা নাটকে রূপ পেয়েছে প্রকৃতি। তার রং ধরেছে আমার জীবনে। সে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে আমার ইহজন্ম আর পরজন্মের জন্যে। তা ছাড়া, শান্তিনিকেতনে এসে বিভিন্ন শিল্পিগোষ্ঠী, দেশ বিদেশ থেকে আগত শিল্পী ও মনীষীদের সাহচর্য পেয়ে আমার শিল্পিজীবন সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। গুরুদেব আমার কাজে উৎসাহ দিয়েছেন, প্রেরণা দিয়েছেন, আর আমার কাজের উপযুক্ত মূল্য দিয়েছেন তাঁর অনুপম শিল্পবৈদগ্ধ্যের নিকষে কষে।

তিনি আমার কর্তৃপক্ষ ছিলেন, কিন্তু কর্তৃত্ব করেননি কখনও। কেবল পেয়েছি তাঁর অফুরন্ত সহানুভূতি। আর তিনি নিজে একজন বড়ো চিত্র-শিল্পী হওয়াতে আমার প্রকৃত ছিলেন শিল্পী-বন্ধু। আমার পরম সৌভাগ্য এমন লোকোত্তর চরিত্রের সাহচর্য পেয়েছিলুম।

শান্তিনিকেতনে এসে এখানকার বড়ো ছোট, উচ্চ নীচ সকলের সঙ্গেই আমার হৃদ্যতা হয়েছে। আশপাশের গ্রামের লোকেদের সঙ্গে, বিশেষ করে সাঁওতালদেব সঙ্গে যেন আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। তাদেরই লোক বলে জানে আমাকে সাঁওতালেরা। মানুষকে আপন করার শিক্ষাও অবনীবাবুর আর গুরুদেবের। আমার সঙ্গে ছাত্রদের যে সম্বন্ধ ছিল তাতেও তারা আমাকে তাদের নিজেদের লোক বলেই জানতো। শুধু ছেলে নয়, মেয়েরাও আমাকে তাদেব আত্মীয়ের মতো মনে করতো। "মাস্টার মশায়" নাম নিয়ে ভয় খাইয়েছি, কেউ কেউ এই অভিযোগ করে থাকেন। সেটা মোটেই ঠিক নয়। ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, বিপদের সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মনের কথা অকপটে বলতো আমাকে বাপের মতো, অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো মনে করে। ছাত্রদের স্নেহ কি করে করতে হয় সে শিক্ষাও অবনীবাবুর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। কলাভবনেও সে-শিক্ষা প্রবর্তন করেছি। ছাত্র ও শিক্ষকেরা এখানে এখনও সে-ধারা বজায় রেখেছেন। আর ছাত্র শিক্ষক নির্বিশেষে গুণী ব্যক্তিকে কিভাবে মান দিতে হয়, সে শিক্ষাও দিয়েছেন গুরুদেব।

গুরুদেব, অবনীবাবু আর আমার মধ্যে আমাদের একটা পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভাব ছিল। আমি যেমন ওঁদের আদর্শ পুরুষ বলে জানতুম, ওঁরাও আমাকে পেয়ে তেমনি খুবই খুশি হয়েছেন, আর গৌরববোধ করতেন আমার জন্যে! এখানে আসাতে আমার সাংস্কৃতিক উন্নতি যেমন হলো, তার সঙ্গে গুরুদেব আর অবনীবাবু আর্থিক সাহায্যও সমানভাবে করে এসেছেন। যখন আমার যা অভাব পড়েছে, যা দরকার হয়েছে, সব দিয়েছেন অবনীবাবু আর গুরুদেব।

একটি ছোট্ট ঘটনা বলি। একবার অবনীবাবু একটা দিশি পাকুড়গাছকে জাপানী প্রথায় "বামন বৃক্ষ" করবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পারেননি।

কারণ তার ধর্মই হলো প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা। তার পাতা ছোট করতে পারেননি কিছুতেই। শেষে তিনি হতাশ হয়ে সেটাকে আর চেষ্টা করেননি বামন করতে। যখন আমি এলুম এখানে, তিনি বললেন, তুমি এটাকে নিয়ে যাও, শান্তিনিকেতনের মাঠের মধ্যিখানে ছেড়ে দাও। আমি সেটাকে নিয়ে এসে এখানে কলাভবনের কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে দিলুম। আর সেটা অতি শীঘ্র বেড়ে উঠলো।

রামকৃষ্ণ-মিশনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রায় ছেলেবেলা থেকেই। মিশন আমার প্রভূত উপকার করেছেন। আমার ঐহিক ও পারত্রিক জীবন মিশনের মহারাজদের উদার অনুকম্পায় পরিচালিত হয়ে চলেছে। আপদে বিপদে অদ্ভুত সে আনুকূল্যে নিরুদ্বেগ করেছে আমার মনকে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য, শ্রীমান পঞ্চানন মণ্ডল দীর্ঘ দিন ধরে আমার সাহচর্যে থেকে ধৈর্য আগ্রহ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে আমার কথা শুনেছেন, আমার ছবি দেখেছেন, আর আমার সম্পর্কে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বহু কাগজপত্র পরীক্ষা করেছেন। আমার জীবন আর আমার ছবি অভিন্ন। মহাকালের দরবারে আমার ছবির যদি কোনোও মূল্য থাকে, তাহলে আমার জীবনেরও মূল্য আছে। তার হিসেব-নিকেশেরও প্রয়োজন আছে। শ্রীমান পঞ্চাননের এই গ্রন্থে আমার জীবনের সেই প্রামাণ্য হিসেব-নিকেশ অনেক-কিছু পাওয়া যাবে। বিশ্ববিচারকের কাছে আমার শিল্পকৃতি যদি স্থায়িত্বের আসন পায়, তার রচনার ইতিহাসও সমভাবেই বিদগ্ধ-সমাজের সমাদর লাভ করবে বলেই আমার ধারণা।

শান্তিনিকেতন — নন্দলাল বসু

৮ | ৩ | ১৯৫৬

॥ বিষয়সূচী ॥

॥ চিত্রসূচী ॥

(শিল্পীর নামহীন চিত্রাবলি নন্দলাল-অঙ্কিত)

॥ চিত্রবিন্যাস ॥

(শিল্পীর নামহীন চিত্রাবলি নন্দলাল-অঙ্কিত)

আশীর্বাদ

যে মায়াবিনী আলিম্পনা সবুজে নীলে লালে
কখনো আঁকে কখনো মোছে অসীম দেশে কালে,
মলিন মেঘে সন্ধ্যাকাশে
রঙীন উপহাসি যে হাসে
রং-জাগানো সোনার কাঠি সেই ছোঁয়ালো ভালে ॥
বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইসারা করে কত,
তুমিও তারে ইসারা দাও আপন মনোমত।
বিশ্বির সাথে কেমন ছলে
নীরবে তব আলাপ চলে,
সৃষ্টি বুঝি এমনিতরো ইসারা অবিরত ॥
ছবির 'পরে পেয়েছো তুমি রবির বরাভয়,
ধূপছায়ার চপলমায়া করেছো তুমি জয়।
তব আঁকন-পটের 'পরে
জানিগো চিরদিনের তরে
নটরাজের জটার রেখা জড়িত হয়ে রয় ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতশিল্পী নন্দলাল

দ্বিতীয় খণ্ড

-- যেমনটি বলেছেন --

(১৯৫২—১৯৬৬)

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

চিত্রপরিচিতি ঃ

শ্রীবিশ্বরূপ বসু ঃঃ আচার্য নন্দলাল বসু ঃঃ শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

॥ 'শান্তিনিকেতন'-সংবাদ, ১৯২১ ॥

নন্দলাল প্রমুখ শিল্পিত্রয় বাগগুহা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে, তাঁদের আঁকা বাগগুহার বিবিধ চিত্রের প্রতিলিপির প্রদর্শনী করে সকলকে প্রীত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন না ; আমেরিকা য়ুরোপে ঘুরছেন। বিশেষ করে, বিশ্বভারতীর জন্যে টাকা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিচ্ছেন। এই সময়ে শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ে টাকার টানাটানি খুব। রবীন্দ্র-জীবনীকার বলেন, অর্থাভাবের জটিল পরিস্থিতি থেকে সে-সময়ে আশ্রমকে রক্ষা করেছিলেন এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব। তিনি না-থাকলে তখন এখানকার শিক্ষক ও ছাত্রদের নিত্যকার খাবার যোগাড় পর্যন্ত হতো কিনা সন্দেহ।

পাশ্চাত্য-ভ্রমণ শেষ করে ১৯২১ সালের ১৬ই জুলাই কবি বোম্বাই-বর্ধমান হয়ে বোলপুরে এলেন। কবির সংবর্ধনা হলো বিশ্বভারতীর নতুন বাড়িতে। এই বাড়িটি তৈরি হয়েছিল গুজরাটী বন্ধুদের টাকায় —শ্রীসুরেন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুসারে। দু-বছর আগে, বিশ্বভারতীর বাড়ি তৈরির জন্যে চেষ্টা হয় ; নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সহযোগে মহাসমারোহে আশ্রমের দক্ষিণ দিকের মাঠে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনও করা হয়েছিল। কিন্তু দূরত্বের কারণে সেখানে বাড়ি তৈরি না করে 'দেহলী'র কাছাকাছি ছাত্রাবাস তৈরি হলো। বাড়িটির নাম হলো —'শিশু-বিভাগ'। সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুর (১৯২৬) পরে শিশু-বিভাগের এই বাড়িটির নাম হয় —'সন্তোষালয়'। এই নতুন ঘরে কবিকে স্বাগত করা হলো। অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ রূপসজ্জা করেছিলেন রূপকার নন্দলাল, অসিতকুমার হালদার আর সুরেন্দ্রনাথ কর।

১৩২৮ সালের (১৯২১) ১৭ই-১৮ই ভাদ্র জোড়াসাঁকোর বাড়ির প্রাঙ্গণে বর্ষামঙ্গলের যে-উৎসব অনুষ্ঠিত হলো, বাঙ্গালার চারুকলার ইতিহাসে সে-একটি বিশেষ ঘটনা। এই দিনে যে কেবলমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের জলসার সূত্রপাত হলো, তা নয়, —ঋতু-উৎসবও যে

জীবনের অন্যতম আনন্দ-অনুষ্ঠান, সেদিন বাঙ্গালী শিক্ষিতসমাজ তা বুঝতে পারলো।—এই অনুষ্ঠানের সরল রূপসজ্জা করে দিয়েছিলেন স্বয়ং নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীরা। বাদাম গাছের নিচে চৌকি পেতে গ্যালারী সাজিয়ে, তার ওপর নীল আস্তরণ বিছিয়ে সেই মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছিল। যাই হোক্, এই অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধ-সমালোচনা হয়েছিল খুব। অসহযোগ-আন্দোলনের সময়ে এই রকম অনুষ্ঠান নিছক বিলাসিতা মাত্র, সে-কথা কবিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন অনেকে। তাঁদের বক্তব্য হলো—দেশে যখন আগুন লেগেছে, তখন বর্ষামঙ্গলের গান করা একান্ত অকর্তব্য। আর যে-মেয়েরা সেদিন গানের সভায় সেজে এসেছিল, তারা এই অগ্নিকাণ্ডে আহুতি দিয়েছে। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাদান করা, কলাবিদ্যার চর্চা করা, বা নিপুণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নৃত্যগীত অভিনয় করাকে কোনোদিন দেশের অকাজ বলে মনে করেননি। এর পরে, ১৯-এ ভাদ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কবির সংবর্ধনা হয়। তার দু-দিন পরে গান্ধীজীর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়। এর আগে কবি ১৫ই ভাদ্র অসিতকুমারের 'বাগগুহা ও রামগড'-গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন।

সেই ভূমিকায় কলাক্ষেত্রে তাঁর বিরূপ সমালোচনার যেন উত্তর দিয়েই কবি বিশেষ করে বলেছিলেন, খবরের কাগজে দেশের রাষ্ট্রপতির ধ্বজা আস্ফালনের চেয়ে, একটুকরো কাগজে একটুখানি ছোট ছবি যথার্থভাবে আঁকতে পারার মূল্য অনেক বেশি।—শুধু তাই নয়, সেই হলো দেশের শাশ্বত সম্পত্তি। রাষ্ট্রীয় ঐশ্বর্যের একটি ক্ষুদ-কুঁড়োও মহাকালের সম্মার্জনীর তাডনায় টিকে থাকবে না। কিন্তু, অজন্তাগুহার ভিত্তিচিত্র ভারতের মর্মবাণী যুগে যুগে প্রচার করে চলবে।

৮ই সেপ্টেম্বর (১৯২১) কবি শান্তিনিকেতনে এলেন। তখনও পূজার ছুটীকে এক মাস বাকি। কবি ক্লাসে পড়াতে আরম্ভ করে দিলেন। তা ছাড়া, উত্তরায়ণের পর্ণকুটীর 'কোনার্কে' বসে সন্ধ্যের সময়ে আশ্রমবাসীদের নিয়ে কখনো সাহিত্য, কখনো বা Creative unity-র প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করেন। কবি শান্তিনিকেতনে এই সময়ে ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৮-এ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাস করেন। এই

পর্বে 'বিশ্বভারতী' জনগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। এবং বিশ্বভারতীর প্রথম বিদেশী অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি শান্তিনিকেতনে আসেন।

পূজার ছুটী এসে গেল। বিদ্যালয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ এই সময়ে কবির কোনো নাটক বরাবর অভিনয় করে থাকেন। এবারে হলো —'ঋণশোধ'। কবির শারদোৎসবের সংস্করণবিশেষ হলো এই —'ঋণশোধ'। কবি নিজে নিয়েছিলেন কবিশেখরের ভূমিকা। ১৩২৮ সালের আশ্বিন-মাসে পূজার ছুটির আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় 'নাট্যঘরে' অভিনয় হয়েছিল। সে-ঘর এখন নাই। এই অভিনয়ে রূপসজ্জায় শান্তিনিকেতনের শিল্পিত্রয়ই ছিলেন কবির সহায়। ১৯২১ সালের পূজার ছুটীর সময়ে নন্দলাল তাঁর ছোট্ট একটি দল নিয়ে নালন্দা, রাজগীর, পাটনা, গয়া, বুদ্ধগয়া ভ্রমণে বের হলেন।

॥ শিক্ষা-ভ্রমণের সূত্রপাত, ১৯২১ ॥

অধ্যাপক আর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কলাবিভাগের পরিচালক নন্দলাল প্রায় প্রতি বছর শিক্ষা-ভ্রমণে বের হতেন। —'এক এক ক্ষেপে দশ বারো দিন করে থাকতুম। থাকতুম তাঁবু গেড়ে। কারো বাড়িতে থাকা পছন্দ করতুম না —নেহাৎ দায়ে না পড়লে। বরাবরই গেছি আমরা জঙ্গলে আর ইণ্টিরীয়রে। শহরে যাইনি কখনো। আমার ধারণা, আধুনিক শহরে শেখবার কিছু নাই। যেতে যদি হয়ই, তবে পুরাতন শহরে প্রত্নসম্পদ দেখে শিক্ষালাভ করতে যাওয়া উচিত।

'ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বিহারেই গেছি আমি বেশি-বার। নালন্দা, রাজগৃহ, পাটনা, গয়া, বুদ্ধগয়া —এই রকম সব প্রত্নকীর্তিবহুল তীর্থস্থানে দলবল নিয়ে শিক্ষাভ্রমণে গেছি প্রথম। ১৯২১ সালের পূজার ছুটীতে প্রথম ব্যাচে সঙ্গে ছাত্র গিয়েছিলেন মাত্র পাঁচ-ছ' জন —কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ ওরফে 'কেষ্ট', অর্ধেন্দু ব্যানার্জী, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মাসোজী, হরিহরণ। আর ছিলেন কালিদাস চ্যাটার্জী —শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর ভাই, আর আমাদের সুরেন্দ্রনাথ। রাজগৃহে গেছি আমি বারো তেরো বার —১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। গরম জলে স্নান করে মজা পেতুম খুব —বিশেষ করে শীতের

সময়ে। খাবার দাবার তরিতরকারিও খুব মিলতো ওখানে। বাইরে টুরে গেলে মাছ মাংস খেতুম না আমরা, নানা দেশের নানা রুচির ছাত্রছাত্রী সঙ্গে যায় ব'লে। যেখানে যখনই গেছি, এক-কাছে থাকতুম সবাই মিলে। তাঁবুতে নিজেদের কাজ নিজেরাই সারতুম। তাতে শিক্ষক-ছাত্র কোনো ভেদ থাকতো না। সবাই যে যেমন পারে স্কেচ্ করবে। নিজের ইচ্ছামতো যে যার আপন আপন খাতায় স্কেচ্ করতেন। শিক্ষক দেখিয়ে দেবেন কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে, তবে। সে-সময়ে আনন্দের সঙ্গে থেকে এক সঙ্গে কাজ হতো বলে খুব পাকা শিক্ষা হতো সে-সবের। দর্শনীয় স্থান সব একসঙ্গে গিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতুম। স্কেচ্ আমি যা করতুম, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে আমি তা প্রেজেন্ট করতুম। —লটারি করে। ছেলে-মেয়েরাও কখনো কখনো দিতো আমাকে উপহার —তাদের করা স্কেচ্। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আমি ছবি ডিম্যাণ্ড্ করতুম। —সে তাদের উৎসাহ দেবার জন্যে। পাহাড় আঁকবার, জঙ্গল আঁকবার, মানুষ আঁকবার, প্রেরণা দিতুম।

'এই সময় থেকে অবসর (১৯৫১) নেবার আগে পর্যন্ত বহুস্থানে আমি দলবল নিয়ে শিক্ষাভ্রমণে গিয়েছিলুম। পাঁচ-ছয় থেকে এক শ'র কাছাকাছি ছাত্রছাত্রী শেষ পর্যন্ত গিয়েছিল আমার সঙ্গে শিক্ষাভ্রমণে। তবে দল ভারী হলে আমাদের অসুবিধে হতো অনেক। দল ছড়িয়ে পড়তো। সামলাতে বেগ পেতে হতো। ছাত্রীরাও থাকতো সঙ্গে; খুব আনন্দেই কাটতো। কলাভবনে বাইরের শিক্ষক বা ছাত্রছাত্রীদের আমরা সাধারণতঃ দলে নিতুম না। বাইরের লোকেদের মধ্যে শেষবারে গেছলেন অধ্যাপক তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ। একবার ছিলেন এলম্‌হার্স্ট আর রথীন্দ্রনাথ। এলম্‌হার্স্ট আমাদের সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ করতেন। রথীবাবুরা আবার শিকারে বের হতেন। কিন্তু, আমার সেটা ভালো লাগতো না। ওখানে যাদের আমরা দেখতে গেছি, আঁকতে গেছি, তাদের আবার মারবো কি করে! এলম্‌হার্স্ট কাঠ কাটতে লেগে গেলেন আমাদের সঙ্গে সেবারে।

॥ নালন্দা, রাজগীর, পাটনা, গয়া, বুদ্ধগয়া ভ্রমণ, ১৯২১ ॥

শান্তিনিকেতন থেকে নন্দলাল, সুরেন্দ্রনাথ, কালিদাস চ্যাটার্জী আর ছাত্রদল নিয়ে ১৯২১ সালে পূজার বন্ধে বৌদ্ধতীর্থ পরিক্রমায় বের হলেন। লুপ লাইনে বোলপুর থেকে গেলেন বক্তিয়ারপুর। বক্তিয়ারপুর থেকে নালন্দা। নালন্দায় খননকার্য তখন চলছিল। ম্যুজিয়াম তখন তৈরি হয়েছে। সেখানে মিত্রমহাশয় ছিলেন কিউরেটার। ম্যুজিয়াম দেখা হলো। ছোট ছোট মূর্তি অনেক —ব্রোঞ্জের তৈরি। গহনা-টহনাও অনেক রাখা ছিল। ছোটো ছোটো মূর্তিগুলি তিব্বতী ছবির ধরনের। অনেক ভালো ভালো মূর্তি ছিল —হাত পা ভাঙা, গহনা-পরা। গহনার গড়ন —কানবালা-টানবালা অনেকটা বাঙালা দেশের মতন ; দুর্গা ঠাকুরের সাবেক প্রতিমায় যেমন ব্যবহার হতো সেই রকম। জল-ঘড়ির ব্যবস্থা ছিল ওখানে।

নালন্দা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। থাকতেন ওখানে একটা দোকানের সামনে একজন সাধুর মঠে। খাওয়া-দাওয়া ওখানেই হতো। দু-তিন দিন ছিলেন ওঁরা নালন্দায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যা যা দেখা হলো, পরে বিশদভাবে সে-সব বলা হচ্ছে।—

নালন্দা থেকে হেঁটে গেলেন ওঁরা সাত মাইল দূরে রাজগীরে। রাজগীরে তখনও খননকার্য শেষ হয়নি। —'কুয়ার মতন করে করে নাবাচ্ছিল।' একতলা দোতলা বাড়ি পর্যন্ত দেখা গেল। দুর্গের মতন বাড়িগুলো। পুরাতন ইঁট —বড়ো বড়ো। থামে পঙ্কের কাজ। —চুন, শাঁকের গুঁড়ো, আর দই মিশিয়ে ছেঁকে নিয়ে করা হতো পঙ্কের কাজ।

রাজগীরে গিয়ে উঠেছিলেন ধর্মশালায়। ধর্মশালাটি ছিল সাবেক কালের একটি প'ড়ো বাড়িতে। তখন কেউ থাকতো-টাকতো না ওখানে। লোক একজন ঠিক করা হলো। সে কলসীতে করে জল নিয়ে নিয়ে ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো। ঘুরতে ঘুরতে কখন কার-যে তেষ্টা পায়, কে জানে। সকালে উঠে পালা করে ওঁরা রান্না করতেন। ওখানে

মাছ মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। ভাত-টাত খেয়ে বের হতেন ওঁরা ঘুরতে, সকাল সাড়ে আটটা-নটার মধ্যে। সকালে তিন-চার দিন হট্ স্প্রিং-এ গিয়ে স্নান করেছিলেন। ফেরার পথে আনতেন বাজার করে। সেকালের দোকান। আটার লুচি —ভৈষা ঘিয়ে-ভাজা, খেয়ে নিতেন দোকানে। 'নেনুয়া'র তরকারি আর পেঁড়া জাতীয় মিষ্টি খাবার। 'নেনুয়া' হলো আমাদের দেশের পুরুল। ঐ তরকারি আর লুচি-মিষ্টি খেয়ে আসতেন সন্ধ্যেবেলা জল-খাবারের মতন। কোনো দিন আবার রাত্রে আসতেন স্নান সেরে। তিন-চার দিন ছিলেন ওখানে।

রাজগীর থেকে যাওয়া হলো পাটনায়। তখন পাটলীপুত্রের খননকার্য নতুন করে আরম্ভ হয়েছে। ম্যুজিয়ামে প্রত্নবস্তু সংরক্ষণের কাজও সেই সবে শুরু হলো। পাটনায় মানুকের ছবি-সংগ্রহ আবার দেখলেন তাঁর চিত্রশালায় গিয়ে। গোর্খাদের 'নেপাল কুটির', শিখদের 'হর-মন্দির' —এ-সবও দেখলেন। পাটলীপুত্রের কথা আমরা পরে বলছি বিশদভাবে।

পাটনা থেকে ওঁরা গয়া গেলেন ট্রেনে। উঠলেন গিয়ে একটি দোতলা ধর্মশালায়। নিচেই দোকান ছিল। লুচি, পুরি, তরকারি, দই খেতেন সেই দোকানে। গয়াতে বিষ্ণুপদের মন্দির দেখলেন। ফল্গু নদীর উল্টো দিকে ছোটো ছোটো মন্দির আছে অনেক। সে-সব মন্দিরের স্থাপত্য-শিল্পের স্কেচ্ করেছিলেন তখন। নালন্দা-রাজগীরেরও স্কেচ্ আছে বহু। গয়ায় প্রেতশিলা, ব্রহ্মযোনি —এ-সব দেখলেন। গয়ায় পিতৃকৃত্য করলেন নন্দলাল। গয়ার কথা পরে আমরা বিস্তৃত বলবো।

গয়াতে দু-একদিন থেকে, ওখান থেকে গেলেন বুদ্ধগয়া দেখতে। সকালবেলায় টঙ্গায় চেপে সাত মাইল দূরে বুদ্ধগয়ায় যাওয়া হলো। বুদ্ধগয়ায় গিয়ে সারাদিন ঘুরে ঘুরে স্কেচ্ করতেন। বোধিবৃক্ষ, রেলিং – এদের সব স্কেচ্ করা হলো। বটবৃক্ষের ছায়ায় শোওয়া বসা হতো আরাম করে। জাপানী-মঠে কাটিয়ে এলেন একবেলা। তখন জাপানী-মঠ ১৯০২ সালে ওকাকুরার প্রথম প্রচেষ্টার ফলে, ১৯২১ সালে সবে তৈরি হয়েছে। মঠের ছিল ছোট্টবাড়ি, এখন হয়েছে অনেক বড়ো। তিন-চার বার যাওয়া হয়েছে বুদ্ধগয়ায় দলবল নিয়ে শিক্ষা-ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। প্রথম দিকে ছোট্ট পার্টি যেতো পাঁচ-ছ-জনের। তারপরে দল বাড়তে লাগলো।

॥ নালন্দা, ১৯২১-৪৮ ॥

নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের গৌরবে বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ রূপকার নন্দলালের অন্তরাত্মা আনন্দে ডগমগ। এ-প্রীতি তাঁর ভারতশিল্প-প্রীতির সহজাত। তিনি ভাবতেন, তিনি যেন আগের জন্মে নালন্দার কোনও রূপ-শিল্পী হয়ে বর্তমান ছিলেন। নন্দলাল যতবার নালন্দা রাজগীর গেছেন, সব মিলিয়ে তাঁর 'প্রত্যক্ষবোধের দ্বারা উজ্জ্বল' অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছি, —অধ্যাপক অমূল্যচন্দ্র সেন মহাশয়ের রচনার অনুসরণ করে। কারণ শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক থাকার সময়ে অমূল্যবাবু এই বিষয়ে যখন লিখতেন, তখন নানা অলোচনা তিনি করতেন নন্দলালের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে। এখানে সেই সব আলোচনার সার-সঙ্কলন করে দেওয়া গেল। —

বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র থেকে জানা যায়, নালন্দা খুবই সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। রাজগৃহ আনাগোনার পথে বুদ্ধ এখানকার একজন বস্ত্রব্যবসায়ী, 'প্রাবারিক'-এর আমবাগানে বিশ্রাম করতেন। নালন্দা-অঞ্চলে মহাবীরেরও শিষ্য ছিল অনেক। তিনিও নালন্দায় আসতেন প্রায়ই। গয়ার পথে নালন্দা-রাজগীর থেকে পাঁচ-ছ' ক্রোশ দূরে 'অপাপপুরী' —এখনকার জৈনতীর্থ পাবাপুরীতে তাঁর নির্বাণস্থান। একবার বোধ হয় বুদ্ধ ও মহাবীর দু-জনেই এখানে একসঙ্গে আসেন। নালন্দা নামটীর উৎপত্তি সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেন। কেউ বলেন, এখানকার একটা পুকুরে একটা 'নাগ' থাকতো, তার নাম ছিল 'নালন্দা'। কেউ বলেন, বোধিসত্ত্ব আগের একজন্মে এখানকার একজন খুব দানশীল রাজা ছিলেন। তিনি প্রার্থীকে কখনও 'দেবো না' বা 'ন অলং দা' বলতেন না; সেই থেকেই নাকি 'নালন্দা'। কেউ বলেন, পদ্মবন ছিল অনেক, সেইজন্যে নাল বা নালক থেকে 'নালন্দা' হয়েছে। আমাদের মনে হয়, এই নামটি প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসীদের দেওয়া নাম —নাল বা নালম্-দা বা দহ অর্থাৎ 'পদ্মদহ'। যাই-হোক, নামটি সার্থক বটে। এখানে কতো রকমের কতো পদ্ম-যে ফুটেছিল! তাঁদের জ্ঞানের যশঃসৌরভে জগৎ-সংসার আমোদিত।

সারিপুত্রের জন্ম আর মৃত্যুস্থান এই নালন্দা। অশোক সারিপুত্রের চৈত্য পূজা করে স্তূপ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সারিপুত্রের ধাতুস্তূপ দেখেছিলেন ফা-হিয়েন। এখনকার 'সারিচক'-গাঁ এই নামের স্মৃতি বহন করছে। ফা-হিয়েনের সময়ে নালন্দার বিহার ছোট ছিল খুব। পঞ্চম শতাব্দের মাঝামাঝি রাজা প্রথম কুমারগুপ্তের সময় থেকে মহাবিহার আরম্ভ হয়। পরবর্তী গুপ্তবংশের বৌদ্ধ রাজারা এর বৃদ্ধিসাধন করেন সপ্তম শতাব্দে হিউয়েনৎ-সাঙ্‌ দু-বারে প্রায় তিন বছর নালন্দায় বাস করেন। এই শতাব্দের শেষে, ইৎ-সিং দশ বছর এখানে পড়াশুনা করেছিলেন। নালন্দার পণ্ডিতেরা হিউয়েনৎ-সাঙ্‌কে রাজার মতো অভ্যর্থনা করেছিলেন। এই সময়ে এই মহাবিহারে অধ্যয়ন করতো প্রায় তিন-চার হাজার ছাত্র। রাজাদের দান-টান থেকে ছাত্রদের আহারাদির ব্যবস্থা হতো। এখানকার পণ্ডিত আর ছাত্রেরা বিখ্যাত ছিলেন বিদ্যা আর সদাচারের জন্যে। এঁদের জীবন পরিচালিত হতো কঠিন নিয়মে। জল-ঘড়ি থেকে নির্ণয়-করা সময়, শঙ্খধ্বনির সঙ্কেতে নালন্দার সব কাজ নিয়ন্ত্রিত হতো। এখানে ছাত্র ভরতি হতে গেলে, দ্বারপণ্ডিতের কাছে কঠিন পরীক্ষা দিতে হতো। শতকরা তিরিশজনের বেশি ছাত্র ভরতি হতে পারতো না। প্রায় একশোটি 'মণ্ডলী' বা ক্লাসে ছাত্রদের অধ্যয়ন চলতো সারাদিন ধরে। বৌদ্ধশাস্ত্র ছাড়া, বেদ, সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ, ন্যায়, আয়ুর্বেদ, রসায়ন, ধাতুবিদ্যাদি সমস্ত বিষয়ের চর্চা হতো এখানে।

হিউয়েনৎ-সাঙ্‌-এর সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাঙ্গালার এক রাজপুত্র —ভিক্ষু শীলভদ্র নালন্দার মহাস্থবির বা প্রধান আচার্য ছিলেন। হিউয়েনৎ-সাঙ্‌ শীলভদ্রের কাছে বৌদ্ধশাস্ত্র পড়েছিলেন। ওখানে এখন একটি গ্রাম রয়েছে, নাম তার 'সিলাও'। এ-নাম শীলভদ্রের বা শীলাদিত্য হর্ষবর্ধনের নাম থেকে আসতে পারে। হিউয়েনৎ-সাঙ্‌ নালন্দা থেকে উপাধি পেয়েছিলেন 'মোক্ষাচার্য'। তিনি স্বদেশে ফেরবার পরেও, নালন্দার পণ্ডিতেরা দেবপূজার সময়ে তাঁকে স্মরণ করতেন, চিঠি লিখতেন, উপহার পাঠাতেন।

হিউয়েনৎ-সাঙ্‌ নালন্দায় একটি ছ-তলার সমান উঁচু বাড়িতে আশী ফুট উঁচু তামার একটি বুদ্ধমূর্তি দেখেছিলেন। এই মূর্তি মৌর্য রাজা

পূর্ণ-বর্মণ স্থাপন করেন ছ-শতাব্দে। হিউয়েনৎ-সাঙ্ যখন নালন্দায় ছিলেন, সেই সময়ে সম্রাট হর্ষবর্ধন এখানে একটি পিতলের পাত-মোড়া বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। মহাবিহারের খরচ চালাবার জন্যে হর্ষবর্ধন এক-শো খানি গ্রাম নিষ্কর করে দেন। এই এক-শো গাঁয়ের দু-শো ঘর গেরস্ত প্রতিদিন চাল, ঘি আর দুধ যোগাতেন মহাবিহারে। রাজা হর্ষ নিজেকে নালন্দা-পণ্ডিতদের 'দাস' বলেছেন। কান্যকুব্জে হর্ষ যে ধর্ম-মহাসম্মেলন ডেকেছিলেন, তাতে উপস্থিত ছিলেন নালন্দার এক হাজার ভিক্ষু।

অষ্টম শতাব্দে কনৌজের রাজা যশোধর্মদেবের মন্ত্রীর ছেলে মালাদ নালন্দা মহাবিহারে বহু সম্পত্তি দান করেছিলেন। তাঁর শিলালিপি থেকে সে-যুগের নালন্দা-মহাবিহারের চরম শ্রী-সমৃদ্ধির বর্ণনা ফুটে উঠেছে ছবির মতন। হিউয়েনৎ-সাঙ এর জীবনচরিতেও নালন্দায় বহু বিচিত্র কারুকার্য-মণ্ডিত, বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত গগনস্পর্শী প্রাসাদশ্রেণীর উল্লেখ আছে।

গৌড়ের বৌদ্ধ পালরাজারা ছিলেন বিশেষ বিদ্যোৎসাহী। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল অষ্টম শতাব্দের শেষের দিকে মগধ অধিকার করে নালন্দা থেকে পণ্ডিতদের নিয়ে গিয়ে ওদন্তপুরী মহাবিহার স্থাপন করেছিলেন। ওদন্তপুরী হলো এখনকারের বিহার শরীফ। এই সময়ে তিব্বতের সঙ্গে নালন্দার যোগ হয়। নালন্দা থেকে একাধিক পণ্ডিত তিব্বতে যান। তাঁদের মধ্যে শান্ত রক্ষিত আর পদ্মসম্ভব উল্লেখযোগ্য। পদ্মসম্ভব তিব্বতে গিয়ে লামা-ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন।

নবম শতাব্দে রাজা ধর্মপাল উত্তরভারত জয় করে পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থাপন করে বিক্রমশীলা' মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এ হলো এখনকারের কহলগাঁও বা কোলং স্টেশন থেকে ছ-মাইল দূরে —সাহেবগঞ্জ আর ভাগলপুর স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায়। নালন্দার পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে বিক্রমশিলায় গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। পালরাজারা রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে 'সোমপুর', চব্বিশ-পরগণা জেলার 'জগদ্দলে' মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নালন্দায় তাঁরা বহু অর্থ-সম্পত্তি দিয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ উদ্দণ্ডপুরে রাজধানীও স্থাপন

করেছিলেন।

নালন্দার একটি শিলালিপিতে আছে বিপুলশ্রী মিত্র নামে একজন ভিক্ষু সোমপুর-বিহারে 'তারা'-দেবীর মন্দির স্থাপন করেছিলেন। একটি বিহারের তিনি সংস্কার করিয়েছিলেন; আর নালন্দায় ইন্দ্রপুরী বৈজয়ন্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একটি বিহার তৈরি করেছিলেন। সুমাত্রার রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে নবম শতাব্দে রাজা দেবপাল এই বিহারে-রাখা পুঁথি নকল করবার জন্যে, আর ভিক্ষুদের খরচ চালাবার জন্যে পাঁচখানি গ্রাম নিষ্কর করে দেন। আর একটি শিলালিপিতে আছে, দশম শতাব্দের শেষভাগে নালন্দা অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে যাবার পরে, আবার তৈরি করান রাজা মহীপাল।

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দে নালন্দায় 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পুঁথির নকল করা হয়। এই নকল নেপালে, লণ্ডনে, অক্সফোর্ডে আছে। সেই যুগের মাগধী ভাষা আর লিপি থেকে বাঙ্গালা ভাষা আর লিপির উদ্ভব হয়। মাগধী লিপি থেকে তিব্বতী লিপিও হয়েছিল। নালন্দা থেকে চীনে, নালন্দা-বিক্রমশীলা-উদ্দণ্ডপুর থেকে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম আর বৌদ্ধশাস্ত্র প্রচারিত হয়।

চীন থেকে নালন্দায় ভক্ত পণ্ডিত পর্যটকদের আনাগোনার একটি বহুপুরাতন চীনে ছবির স্কেচ্ করে রেখেছেন নন্দলাল (দ্র. স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ২।২৫।৩৪)। মূল ছবিটি তাঁর মনে হয়, মহেঞ্জোদারোর সমকালীন। কোন রাজা বা পর্যটক সে সময়ে ভারতবর্ষে যাচ্ছেন কিংবা ভারতবর্ষ থেকে আসছেন। পথে তিনি নানা বিভীষিকা দেখতে দেখতে আসছেন। বিছে, বহুমাথাওয়ালা সাপ, ভূত, প্রেতাত্মা সব দেখতে দেখতে আসছেন। চীনে পাহাড়ের পরিবেশ।

ভারতের অনেক গ্রন্থের অনুবাদ চীনা তিব্বতীতে হয়েছিল। তিব্বতী সূত্র থেকে জানা যায়, নালন্দায় রত্নসাগর', 'রত্নোদধি' আর রত্নরঞ্জক' নামে তিনটি প্রাসাদে লাইব্রেরী ছিল। এবং মহাবিহারের যে-অংশে এই প্রাসাদ তিনটি ছিল, সে পল্লীর নাম ছিল —'ধর্মগঞ্জ' বা 'জ্ঞানবিপণি'।

১১৯৭-১২০৩ খৃস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী নালন্দা, বিক্রমশীলা,
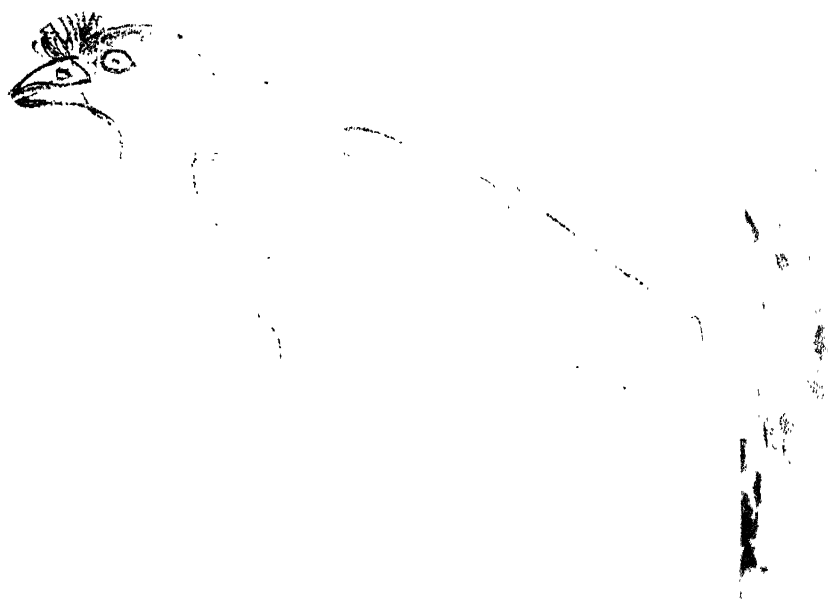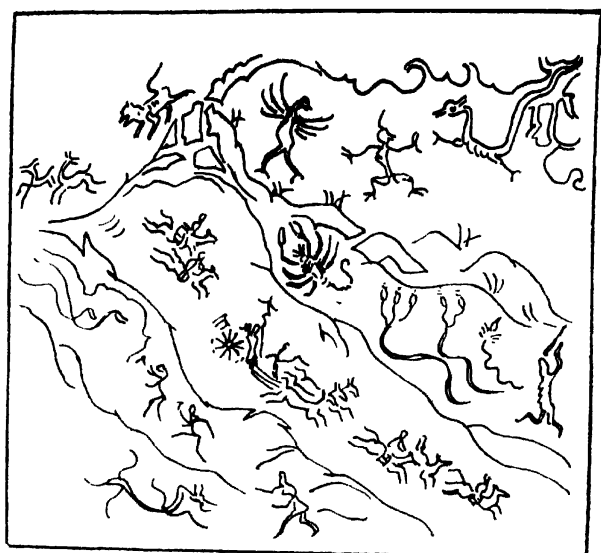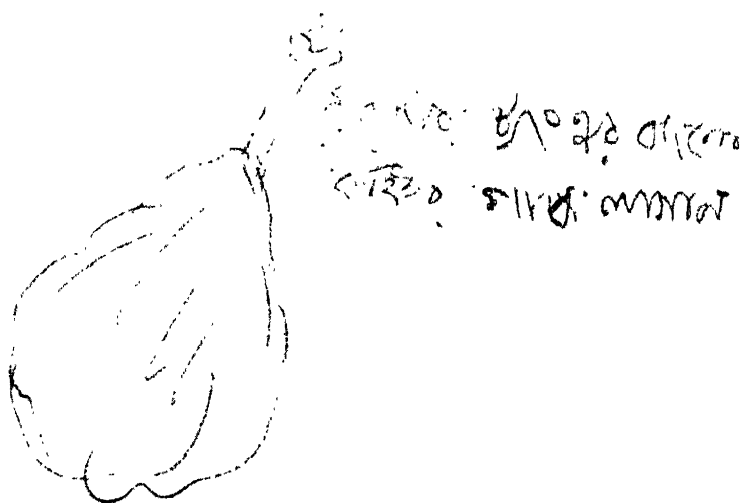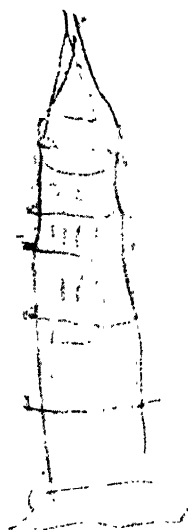
উদ্দণ্ডপুর —এ-সব ধ্বংস করেন। পুঁথিতে আগুন লাগিয়ে দেন। ভিক্ষুদের হত্যা করেন। বখতিয়ার ভেবেছিলেন, উঁচু-দেওয়াল-ঘেরা মহাবিহারগুলো আসলে হলো দুর্গ, আর ভিক্ষুদের ভেবেছিলেন সেনাবাহিনী। এখানকার সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র, মূর্তি আর অন্য দ্রব্য তাঁর সৈন্যেরা লুট করে নেয়। পরে, পুঁথিতে কি লেখা আছে বখতিয়ারের জানবার ইচ্ছা হলে, পুঁথি পড়তে পারে এমন একজন লোকও সেখানে পাওয়া যায়নি। ভিক্ষুরা সবাই নিহত হয়েছিলেন; আর অন্য সব শিক্ষিত ভদ্রলোক পালিয়ে গিয়েছিলেন দেশ ছেড়ে। মুসলমানদের আক্রমণের পরে মুদিতভদ্র নামে একজন ভিক্ষু ভাঙ্গা-বিহার আবার সংস্কার করান; নির্মাণও করান। এর কিছুদিন পরে, মগধরাজের মন্ত্রী কক্কুটসিদ্ধ এখানে একটি চৈত্য-স্থাপন করেছিলেন। সেই উৎসব উপলক্ষে ধর্ম-উপদেশ দেবার সময়ে দু জন পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ এখানে এসে ভীষণ চটে যান। ফলে, ক'জন অল্পবয়সী ভিক্ষু এঁদের মাথায় ময়লা জল ঢেলে দিয়েছিলেন। এই অপমানের শোধ নেবার জন্যে ব্রাহ্মণ দু-জন সূর্যপূজা আর যজ্ঞ করে যজ্ঞকুণ্ডের জ্বলন্ত কয়লা ফেলে, মহাবিহারে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এখনও বিহারে কতকগুলি দরজা আর সিঁড়িতে পোড়া-পোড়া দাগ রয়েছে।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে ধ্বংসশেষগুলিতে নম্বর দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত যা আবিষ্কার হয়েছে, সে প্রাচীন মহাবিহারের সামান্য অংশমাত্র। আবিষ্কৃত বাড়িগুলির মধ্যে পশ্চিমদিকের সব হলো চৈত্য, পূব আর দক্ষিণদিকে হলো বিহার আর মন্দির; আর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণেরটি ছিল স্তূপ।

প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে স্তর পাওয়া গিয়েছে একাধিক। কালক্রমে বা অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হয়ে গেলে, বিনষ্ট ঘরের অবশিষ্ট ইঁট পাথর, ভিত্তি আর দেওয়ালের বাশ সরিয়ে না-ফেলে, সে সব ভরাট আর সমান করে, তারই ওপর নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছিল। যুগে যুগে এই রকম বিনাশাবশেষের ওপর নব-নির্মাণে স্তরগুলির সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিনষ্ট গৃহের পরিকল্পনা যেমনটি ছিল, নব-নির্মাণেও সেই প্ল্যানই অনুসরণ করা হতো। বিহারগুলির প্রত্যেক স্তরে দুই বা তারও বেশি তলের (storey) চিহ্ন পাওয়া গেছে।

প্রথমে, দক্ষিণের ১-এ আর ১-বি বিহার থেকে আরম্ভ করে, পূবদিকের

বিহারমন্দিরগুলি দেখে, পরে, পশ্চিমের চৈত্যগুলি, আর সব শেষে দক্ষিণ-পশ্চিমের স্তূপটী দেখা দরকার।

বিহারগুলিতে দরজার কাছে চোর-কুঠুরিতে দান-পাওয়া মূল্যবান দ্রব্য সব রাখা হতো। ভেতরে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের শেষপ্রান্তে খুব উঁচু প্রতিমা-বেদী; আর চারপাশে ভিক্ষুদের বাসকক্ষের সারি। কোনো কোনো কক্ষে আলো-বাতাস প্রবেশের জন্যে স্কাইলাইট্, দরজার চৌকাটের বদলে খিলান জলনিকাশের জন্যে ড্রেন, কূপ সবই ছিল। শান্তিনিকেতনে আপন আবাস নির্মাণের সময়ে (১৯৩৩) আচার্য নন্দলাল দরজা-জানালার রূপকল্পনায় নালন্দার এই চৌকাঠবিহীন খিলান-পদ্ধতিটি অনুসরণ করে কাজে লাগিয়েছেন।

এক নম্বর বিহারে ন'-টি স্তরের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এর প্রাঙ্গণের প্রতিমা-বেদীর সামনে থামওয়ালা যে-চাতালটি রয়েছে, তার ওপর বসে অধ্যাপক উঠনে-বসা ছাত্রদের অধ্যাপনা করতেন।

দু'-নম্বর পাথরের মন্দিরটিতে রাজসাহী পাহাড়পুরের মন্দিরের মতন অনেক মানুষ, পশুপক্ষী, দেবদেবী প্রভৃতির মূর্তি খোদাই করা আছে। সম্ভবতঃ এগুলি ষষ্ঠ আর সপ্তম শতাব্দে খোদাই করা; অন্য মন্দির থেকে এনে, এখানে লাগানোও হতে পারে। কারণ, বর্তমান মন্দিরটি তৈরি সপ্তম শতাব্দের পরে।

পাঁচ নম্বর বিহারটি একটি প্রাচীন বিহারের ধ্বংসাবশেষ, রয়েছে চার নম্বর বিহারের পিছনে বা পূবদিকে।

ছ'-নম্বর বিহারের ওপরতলার উঠনে অনেক উনোন রয়েছে। তাতে রান্না হতো; বা, ছাত্রদের কোনো রাসায়নিক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো।

এগারো নম্বর বিহারের পরে, পশ্চিমদিকের চৈত্যগুলিতে যেতে হবে।

চোদ্দ নম্বর চৈত্যের প্রতিমার নিচের দিকে চিত্রাঙ্কনের চিহ্ন রয়েছে। উত্তর-ভারতে দেওয়াল-চিত্রের (Fresco) যে সামান্য ক'টি নিদর্শন পাওয়া গেছে —এ হলো তার অন্যতম।

তেরো নম্বর চৈত্যের উত্তরদিকে যে উনোনগুলি রয়েছে সেগুলি ধাতু গলাবার জন্যে ব্যবহার হতো; ধাতুমূর্তি-নির্মাণ নালন্দায় একটি বিশেষ

শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। বারো নম্বর চৈত্যের পরে, তিন নম্বর স্তূপে যেতে হবে।

তিন নম্বর স্তূপটিতে সাতটি স্তর পাওয়া গেছে। এটি প্রথমে ছোটো আকারে স্থাপিত হয় চতুর্থ শতাব্দের দিকে; তারপরে প্রত্যেকবারে পুনর্নির্মাণ যখন করা হয়েছে, প্রতিবারেই কিছু কিছু করে বাড়ানো হয়েছে, এর পঞ্চম স্তরটি ষষ্ঠ শতাব্দের। এই স্তরটি সবচেয়ে ভালো অবস্থায় আছে। উত্তর দিকের সিঁড়ি তিনটি পর পর পঞ্চম, ষষ্ঠ আর সপ্তম স্তরের। এই স্তূপটির প্রতি এতো যত্ন, আর এতবার তৈরি করা হয়েছে দেখে মনে হয়, এটি ছিল হয় বুদ্ধের, কিংবা সারিপুত্রের ধাতুস্তূপ।

মহাবিহারের চারদিকের গাছতলা, ধানক্ষেত, পুকুরঘাট ইত্যাদি স্থানে ছোট-বড়ো অনেক মূর্তি পড়ে রয়েছে। কাছাকাছি বড়গাঁও গ্রামে একটি আধুনিক সূর্য-মন্দিরে কিছু মূর্তি রাখা আছে। বড়গাঁও থেকে উত্তরে বেগমপুর গ্রাম পর্যন্ত মাঝে মাঝে অনেক বড়ো বড়ো ঢিপি দেখা যায়। সেগুলি প্রাচীন ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। ঐ স্থানটি ছিল প্রাচীন নালন্দার উত্তর প্রান্ত। সে-যুগের নালন্দা কতো বিস্তীর্ণ ছিল, এ থেকে বোঝা যাবে। মহাবিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমে দু-মাইল দূরের জগদীশপুর গ্রামে একটি প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি আছে।

নালন্দা খনন করবার সময়ে প্রত্নবস্তু যা পাওয়া গেছে, সেগুলি কাছেই মূ্যজিয়মে রাখা আছে। প্রত্যেক প্রত্নবস্তুতে বর্ণনা আর কাল-পরিচয় লেখা আছে। নালন্দার শিল্পীরা পাথরের চেয়ে ধাতুমূর্তি-নির্মাণেই যত্নবান ছিলেন বেশি। বড়ো মূর্তি নালন্দাতে অনেক রয়েছে। তবু মনে হয়, ছোট মূর্তিতেই তাঁদের আগ্রহ ছিল বেশি। বিভিন্ন মুদ্রায় বুদ্ধ, বোধিসত্ত্বগণ, তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেব-দেবী আর হিন্দু-দেবদেবীর মূর্তিগুলির বেশিরভাগই তৈরি পালযুগে। বৌদ্ধধর্মে গুপ্তযুগের চেয়ে পালযুগে অনেক নতুন দেব-দেবীর উদ্ভব, আর আসন-মুদ্রাদির প্রকার বৃদ্ধি পেয়েছিল। পালযুগে নালন্দায়-তৈরি দেবদেবীর মূর্তি নেপালে, তিব্বতে, আর পূর্বসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। গুপ্তযুগের শিল্পের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভিতরের ভাব ফুটিয়ে তোলা। কিন্তু, পালযুগের শিল্পে প্রাধান্য পেয়েছিল বাহ্য সৌকুমার্য, সৌষ্ঠব, আর কারুকার্য। রাজা, কর্মচারী, সাধারণ ব্যক্তি আর

মহাবিহার-কর্তৃপক্ষের অনেক সীলমোহর মুাজিয়মে আছে। নালন্দার স্তূপ ইত্যাদি থেকে অনেক ইঁট পাওয়া গেছে। তাতে বৌদ্ধ-মন্ত্র খোদাই-করা রয়েছে। বুদ্ধভক্তগণ পুণ্যলাভের আর ইষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এইরকম সব ইঁট রক্ষা করতেন স্তূপে। মালাদ আর বিপুলশ্রী মিত্রের শিলালিপি দুটিও মুাজিয়মে রাখা আছে।

॥ রাজগীর-পরিক্রমা, ১৯২১-৪৮ ॥

রাজগীরে গিয়ে নন্দলালের জন্মান্তর সৌহার্দ্যের কথা মনে পড়ে। বারে বারে যান সেখানে। 'এক যবনিকা থেকে অন্য যবনিকায় চলেচে যে সমস্ত উঁকি-মারার দল, মনে হচ্ছে তারা জন্ম থেকে জন্মান্তরের যাত্রী —নব নব যবনিকার ভিতর দিয়ে একটু কিছু দেখতে পায়, অনেকখানি দেখতে পায় না।'

'নতুন' নগরের লোকালয়ে। রেল-স্টেশন থেকে রাজগৃহ-পরিক্রমা শুরু করলেন। নতুন রাজগৃহ, নতুন নগর বা New Fort-এর মাঝখানে এখনকার রেল-স্টেশন। 'নতুন' রাজগৃহের দুটি ভাগ। —(১) বড়ো বড়ো পাথরে-তৈরি দেওয়াল-ঘেরা এলাকায় ছিল বিম্বিসারের রাজপ্রসাদ-ট্রাসাদ। —এ হলো স্টেশনের দক্ষিণ-পশ্চিমে। (২) মাটীর দেওয়াল-ঘেরা সাধারণ লোকের বাস-এলাকা। স্টেশনের দক্ষিণে, পূবে আর উত্তরে কিছুদূর গেলেই এই মাটির দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। স্টেশন থেকে রেল-লাইন ধরে উত্তরদিকে কিছুদূর এগলেই দ্বিতীয় যে-পথটি পূব-পশ্চিমে দেখা যায়, সেই পথ ধরে পশ্চিমে একটু গেলেই, পৌঁছনো যাবে বাজারের মাঝখানে। এই রাস্তাটি পূবদিকে গিয়েছে সাত মাইল দূরে 'গিরিয়াক' পর্যন্ত। গিরিয়াকে অনেক বাড়ি-ঘরের ধ্বংসাবশেষ আছে। 'নতুন' রাজগৃহের মাটীর দেওয়াল ঘেরা এলাকায়, আর আধুনিক বাজারের চার-পাশের পাড়াগুলিতে প্রাচীন বাড়ি-ঘরের ভিত্তি রয়েছে অনেক। পূরণচাঁদ নাহারের বাড়ির বাগানে রাজগৃহের বিভিন্নস্থানে-পাওয়া পাথরের অনেক মূর্তি রাখা আছে।

'নতুন' নগরের প্রাসাদ-অংশ। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে দক্ষিণ-পশ্চিমে

নতুন রাজগৃহের পাথর-বাঁধানো রাজপ্রাসাদ-এলাকার দেওয়াল দেখা যায়। এই দেওয়ালের পশ্চিমদিক মাটির, বাকি তিন দিক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর —বিনা চুন-সুরকিতে থাকে-থাকে সাজিয়ে তৈরি। এই রকম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চুন-সুরকি-বিহীন গাঁথুনিকে বলা হয় —Cyclopean অর্থাৎ দৈত্য-দানবের কীর্তি। এই দেওয়ালের চারদিকে চারটি দরজা ছিল। তার চিহ্ন আছে এখনও। উত্তর-দেওয়ালের বাইরে একটা মাটির দুর্গ রয়েছে ভাঙ্গা অবস্থায়। দক্ষিণ দেওয়ালের ওপরে আর পাশে ইঁটের গাঁথুনির চিহ্ন আছে অনেক। এই এলাকার ভেতরের বাড়ি-ঘর নিশ্চিহ্ন হয়েছে; কিন্তু খননের ফলে, বাড়ি-ঘরের স্তর পাওয়া গেছে তিন-চারটি। পৃথিবীর সব প্রাচীন স্থানে যেখানে একদা ঘন লোকবসতি, বা প্রসিদ্ধ মঠ-মন্দির ছিল, সেখানে মাটি খুঁড়ে দেখা গেছে, যুগের পর যুগ ধরে লোক-বসতির আর বাড়ি-ঘর বারে বারে তৈরি করার বিভিন্ন স্তর একটির নিচে আর একটি রয়ে গেছে। রাজগৃহ নালন্দায় সামান্য যা খোঁড়া হয়েছে, তাতে পাল-যুগ (খৃ. ৮—১২ শতাব্দ), কোথাও গুপ্তযুগের (খৃ. ৫—৭ শতাব্দ) স্তর পর্যন্ত মাত্র পৌঁছনো গেছে। গুপ্তযুগের স্তরের পাঁচ সাত হাত নিচে মৌর্যযুগের (খৃ. পূ. ৪—২ শতাব্দ) স্তর, তারও নিচে আছে বুদ্ধযুগের স্তর। বুদ্ধযুগের স্তরের অনেক নিচে, পর পর আছে প্রাগার্য, প্রাগৈতিহাসিক, —আর হয়তো আরও কোনো অজানা যুগের স্তর।

শীতবন, অশোক-স্তূপ ও সর্পসৌণ্ডিক প্রাগ্‌ভার। নতুন নগরের পশ্চিমদিকে একটি খাল —আগে ছিল নদী —এখন নাম তার বৈতরণী। বৈতরণীর তীরে প্রাচীন শ্মশানের চিহ্ন। বুদ্ধের সময়ের 'শীতবন'-শ্মশান ছিল বোধহয় এই অঞ্চলেই। এখান থেকে দক্ষিণের অনেকখানি স্থান ছিল —শীতবন। বৈতরণীর পশ্চিম-পাড়ের উঁচু ঢিপিটি অশোকের তৈরি ধাতুস্তূপের অবশেষ। এর সামান্য পশ্চিমে একটি প্রকাণ্ড বিহারের চিহ্ন। হিউয়েনৎ-সাঙ্‌ যে-অশোকস্তম্ভ দেখেছিলেন, সে ছিল কাছাকাছি। এখান থেকে নালন্দা পর্যন্ত উন্মুক্ত ভূভাগ থেকে বৈভার-গিরির উত্তর-গা দেখতে ঠিক যেন সর্পফণা-শ্রেণী। —একেই বোধহয় বৌদ্ধেরা 'সপ্পসোণ্ডিয় পব্‌ভার'

বা সাপের ফণার মতো গিরিপার্শ্ব বলতেন। আর মনে হয়, এই পর্যন্তই ছিল শীতবনের সীমা।

প্রাচীন রাজপথের দুই পাশে —বর্মী-মন্দির, জাপানী-মন্দির, গোরক্ষিণী-ধর্মশালা, Inspection Bungalow, Rest-House। 'নতুন'-নগরের পাথরের দেওয়ালের দক্ষিণ সীমার ঠিক পূবে একটি টিপির ওপর এখন বর্মী-মন্দির। সেখানে আগে ছিল --নতুন'-নগরের মাটির দেওয়ালের একটি প্রান্ত। এখনকার রাস্তা যেখান থেকে দেওয়াল ছেড়ে দক্ষিণে চলে গেছে, সেখানে ছিল একটি দরজা। এখনকার রাস্তার কিছু বাঁয়ে, পূবদিকে নিচু জায়গায় বিম্বিসারের যুগের রাজপথের চিহ্ন দেখা যায় স্পস্ট। মাটির দেওয়ালের মাঝখানের এলাকাতেও এই রাজপথের চিহ্ন আছে অনেক স্থানে। মাটির দেওয়ালে যে-টিপির ওপর এখন বর্মী-মন্দির, সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে জাপানী-মন্দিরের গেটের সামনে দিয়ে, প্রাচীন রাজপথ গিরিপ্রাকারের উত্তর-দ্বার পর্যন্ত গিয়েছিল। এই রাজপথের দু পাশে উঁচু জায়গা আর টিপিগুলি হলো প্রাচীন বাড়ি-ঘরের স্তূপ, চৈত্য, বিহারাদির অবশেষ। পূবদিকে বিপুলগিরির প্রায় নিচে পর্যন্ত এই অঞ্চল ছিল বাড়ি-ঘরে আচ্ছন্ন। জাপানী-মন্দিরের উত্তর-পূবে পাথরে বাঁধানো প্রকাণ্ড পুকুর ছিল একটি। এখনকার মখদুম-কুণ্ডের জল এসে পড়তো ঐ পুকুরে। তার নালা রয়েছে এখনো। বর্তমান রাস্তা থেকে Inspection Bungalow যাবার মোড়ে, গো-রক্ষিণী-সভার ধর্মশালা যেখানে, সেখানেও ছিল প্রাচীন বিহারাদি।

বুদ্ধের ধাতুস্তূপ—বেণুবন আর কলন্দক-নিবাপ। জাপানী মন্দিরের প্রায় সামনে, বর্তমান রাস্তার পূবদিকে, উঁচু ও বড়ো পাথরে-বাঁধানো একটি ভিত্তি আছে। এটি মনে হয়, অজাতশত্রুর তৈরি বুদ্ধ-ধাতুর স্তূপ। এর পশ্চিম দক্ষিণের প্রায় সমস্ত এলাকাটিই ছিল বেণুবন। এই স্থানের ভেতর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে-লম্বা একটি খাল আছে। সেটি কাটা হয়েছে প্রায় আশী বছর আগে। এই খালের গায়ে কোথাও কোথাও পুরানো ভিত্তির বড়ো বড়ো পাথর দেখা যায়। খালের পশ্চিম দিকে গভীর বড়ো পুকুর একটি —এইটি বোধ হয়, কলন্দক-নিবাপ। বাঁশবনে ঘেরা ছিল বলে রাজা বিম্বিসারের এই বাগানবাড়ির

নাম হয়েছিল বেণুবন। 'নিবাপ' কথাটার মানে হলো, পশুপাখির বিচরণের বা জলপানের স্থান। আর 'কলন্দক' মানে হলো, কাঠ-বেরালি বা শালিকপাখি।

ফা-হিয়েন বলেছেন, বেণুবন ছিল প্রাচীন রাজপথের পশ্চিম দিকে, আর পূর্বদিকে ছিল এর প্রবেশ-পথ। দক্ষিণে বেণুবনের সীমা এখনকার দোকানঘরগুলো পর্যন্ত। উত্তরে এর সীমা এখনকার Rest-house আর Inspection Bungalow-র কম্পাউণ্ড পর্যন্ত। বেণুবন ছিল পাঁচীরে ঘেরা। আর পাঁচীরের গায়ে ছিল গো-পুর, অট্টালিকাদি। গো-পুর হলো—নহবতখানার মতন Gate-house। এই দেওয়ালের চিহ্ন আর চারকোণে চারটি ঢিপ এখনো বোঝা যায়। এই বাগানবাড়ির সবচেয়ে বড়ো বাড়িটি বিহারে পরিণত হয়েছিল। সম্ভবতঃ এটি ছিল পুকুরের দক্ষিণ দিকে। সমস্ত বেণুবন জুড়ে পরবর্তী যুগে আরও অনেক বিহার-স্তূপাদি তৈরি হয়েছিল। সেইজন্যেই বৌদ্ধদের চোখে এ হলো পরম পুণ্যক্ষেত্র। এখনও এর সর্বত্র বাড়ি-ঘর, দেওয়াল ইত্যাদি ধ্বংসাবশেষের পোতা দেখা যায়। সারিপুত্র আর মৌদ্‌গল্যায়নের মৃত্যুর পরে, বেণুবনে তাঁদের ধাতুস্তূপ নির্মিত হয়েছিল। বেণুবনের কলন্দক-নিবাপ পুকুরটি দেখতে খুব পুরানো নয়। একধিকবার হয়তো পঙ্কোদ্ধার হয়ে থাকবে এই পুকুর থেকে।

জাপানী-মন্দিরের সামনে বুদ্ধের ধাতুস্তূপের ভিতটি প্রাচীন হতে পারে। অশোকের যুগের আগে, যে-সব স্তূপ তৈরি হতো সেগুলো আকারে হতো খুব ছোট। সাঁচি, সারনাথ ইত্যাদি স্থানের মতো প্রকাণ্ড স্তূপ প্রথম নির্মাণ করেন অশোক। সারিপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন এমন-কি বুদ্ধেরও প্রথম ধাতুস্তূপ মনে হয়, বেণুবনের মধ্যে ছিল ছোট ছোট ঢিপির মতন। সেকালে ধাতু' বা পূতাস্থি আবার চুরি হয়ে যেত। রাজগৃহ থেকে 'ধাতু' যাতে চুরি না হয়, সেজন্যে স্থবির মহাকাশ্যপ অজাতশত্রুকে বলেছিলেন—পাথরের সুদৃঢ় স্তূপ তৈরি করিয়ে তার নিচে মাটীর তলায় ধাতু রাখবার জন্যে। এই স্তূপ কালক্রমে নষ্ট হলে পবিত্রজ্ঞানে এরই ওপর বৌদ্ধরাজারা যুগে যুগে বারে বারে স্তূপ চৈত্যাদি নির্মাণ করিয়েছিলেন। হিউয়েনৎ-সাঙ্‌ বলেছিলেন,—রাজগীরে

এই বুদ্ধস্তূপের কাছে আনন্দের ধাতুস্তূপ ছিল। জাপানী-দেওয়ালের মধ্যিখানের বড়ো স্তূপভিত্তিটি দেখে মনে হয় এই সেই স্তূপ। বর্তমান রাস্তার দু-পাশে, বুদ্ধ-ধাতুস্তূপের ওপর, বেণুবনের অন্য টিপি বা স্তূপগুলির ওপর, জাপানী-মন্দিরের চারদিকে, 'জরাসন্ধকী বৈঠকে'র ওপরে এখন কবর দেখা যাবে অনেক। এ-সব হলো, মুসলমানযুগের কর্ম। এরা শুধু ভেঙে-চুরেই ক্ষান্ত হয়নি, যেখানে উঁচু বা ভালো বাঁধানো ঠাঁই পেয়েছে, সেইখানেই বানিয়েছে কবরখানা। অনেক কবর, দরগা আবার তৈরি করা হয়েছিল প্রাচীন স্তূপাদির ইঁট-পাথর দিয়ে। ব্যবসায়ী, কনট্রাক্টর, সাধারণ-লোকেও প্রাচীন বাড়ি-ঘরের ইঁট-পাথর ভেঙে রাস্তা বা বাড়ি তৈরি করিয়েছে। বেণুবন-এলাকায় অনেক ভাঙা-মাটির ঘরের দেওয়াল রয়েছে। সে গুলো মেলার সময়ের দোকান-পাটের অবশেষ। প্রতি চার বছর অন্তর মলমাসে রাজগীরে একমাস ধরে বড়ো মেলা বসে। সোন-পুরের হরিহরছত্রের মেলার পরে, রাজগীরের এই মেলাই বিহারের প্রধান মেলা। রাজগীরের সবত্র হালফিলের সিমেন্ট-বাঁধানো কূপ রয়েছে। সেগুলো থেকে এই মেলায় জলসরবরাহ হয়। কিন্তু, ইঁটের প্রাচীন কুয়োও রয়েছে স্থানে স্থানে।

বিপুলগিরির তলদেশে—মখ্দূমকুণ্ড ও সূর্যকুণ্ড বা শৃঙ্গী-ঋষি-কুণ্ড। জাপানী-মন্দিরের অগ্নিকোণে মখ্দূমকুণ্ড আর মসজিদ-টসজিদ। মখ্দূম শা ছিলেন বিহারের একজন বিখ্যাত পীর। তিনি এখানকার গুহায় বাস করতেন। এই কুণ্ডের জল প্রায় ঠাণ্ডা। মখ্দূম যে-গুহায় থাকতেন, সম্ভব সেই গুহাতে কিংবা কাছের বিপুলগিরির গায়ে অন্য গুহাগুলির কোনো-একটিতে বুদ্ধ প্রথমবার রাজগৃহে এসে বাস করেছিলেন। বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী দেবদত্ত পরে থাকতেন এই গুহাতে। মখদূম-গুহা থেকে পাহাড়ের গায়ের সিঁড়ি দিয়ে একটু ওপরে উঠলে এক জায়গাতে পাথরের ওপর লাল দাগ দেখা যাবে। নানা গল্প আছে এই লাল দাগ সম্পর্কে। সে গল্প আমাদের ধর্মপূজায় মুণ্ডা-গাজনে হাকন্দ-সেবন-অনুষ্ঠানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর মাথা কেটে ফেলার সঙ্গে হুবহু মেলে।

সূর্যকুণ্ডের পাশের মন্দিরগুলি আধুনিক। এগুলি প্রাচীন বাড়িঘর বা মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষের ওপর তৈরি। বিপুলগিরির পাদদেশে, বৈভারগিরির

গায়ে, সাতধারার চার পাশে, পুরাকালে বহু মন্দির-টন্দির ছিল। প্রাচীন ভিতের বড়ো বড়ো পাথর, আর ইঁটের গাঁথনি হরজাই চোখে পড়ে। বিপুলগিরিতে ওঠবার রাস্তা—সে জৈনেরা এখন তৈরি করিয়েছেন। তার আরম্ভ সূর্যকুণ্ডের একটু অগ্নিকোণ থেকে। বিপুলগিরি জৈনদের কাছে অতি পবিত্র। কারণ, মহাবীর এখানে বাস আর ধর্মপ্রচার করেছিলেন। রাজগীরের পাহাড়ের ওপর যে সাদা সাদা মন্দির সব দেখা যায়, সেগুলি আধুনিক জৈনদের। পাহাড়ে ওঠবার বাঁধানো রাস্তাগুলিও ওঁরা এখন করিয়েছেন। সূর্যকুণ্ডের ঈশেন-কোণে বড়ো পাথরে গাঁথা যে চৌকো উঁচু চত্বরের একটি গা-মাত্র রয়েছে, সেটি ছিল 'জরাসন্ধকী বৈঠকে'র মতো প্রহরীদের পর্যবেক্ষণ-মঞ্চ। মখ্‌দুম-গুহা দেবদত্তের গুহা।

বিপুলগিরি। বিপুলগিরি হাজার ফুটের বেশি উঁচু। ওপরে ওঠবার সময়ে অনেক ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। শিখরে আধুনিক জৈন-মন্দিরগুলি প্রাচীন গিরি-প্রাকারের ভিত্তির ওপর তৈরি হয়েছে। মন্দিরগুলির পূর্বদিকে একটি স্তূপ, -সম্ভবতঃ গিরিপ্রাকারের অংশ। এর ঈশান-কোণে মহাবীরের প্রথম ধর্মপ্রচার-স্থান। বিপুলগিরির শিখর থেকে রত্নগিরিতে গিয়ে, সেখান থেকে উল্টোদিকে নামলে, দক্ষিণে জীবকাম্রবনের কাছাকাছি পৌঁছনো যাবে। জৈনেরা এই পথে পাঁচ-পাহাড় পরিক্রমা করে থাকেন।

গিরিপ্রাকার। রাজগীরে সমস্ত পাহাড়ের ওপর থেকে পর্বতমালার শিখরের গিরিপ্রাকারের (Outer Fortification), আর প্রাচীন নগরের নগর-প্রাচীরের (Inner Fortification) আদল স্পস্ট বোঝা যায়। পাহাড়ে ওঠবার সময়ে অনেক স্থানে প্রাকারের ভিত দেখা যায়; তার ওপর দিয়ে চলাও যায়। এ-সম্পর্কে ভালো ধারণা হয়, পুরাতন নগরের দক্ষিণ-সীমায় বাণ-গঙ্গার কাছে গেলে; এখানে প্রাকারের নিচের দিকটা প্রায় আস্ত আছে। এই গিরি-প্রাকার ছিল অতি আশ্চর্য বস্তু। মোহেনা-জো-দরো, হরপ্পা আবিষ্কৃত হবার আগে রাজগৃহের এই গিরিপ্রাকার ছিল ভারতীয় স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এর নির্মাণকাল হলো অজাতশত্রুর রাজত্বকালের আগে। বিম্বিসারের সময়ে অথবা তাঁর আগেও হতে পারে। চুন-সুরকি ছাড়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর, ওপর ওপর সাজিয়ে এই 'Cyclopean' দেওয়াল তৈরি করা হয়েছিল। এই

প্রাকারের বড়ো বড়ো পাথরের ভিতের ওপর প্রথমে ছিল ছোটো পাথরের গাঁথুনি, তার ওপর গাঁথুনি পোড়া বা কাঁচা ইঁটের, তার ওপর কাঠের। দেওয়াল চওড়া ছিল সতেরো-আঠারো ফুট আর সমস্ত পাহাড়ের ওপর দিয়ে এর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় তিরিশ মাইল। অর্ধবৃত্তাকার বা চারকোণা গাঁথুনি মাঝে মাঝে জুড়ে শক্ত করা হয়েছে প্রাচীরটিকে। উত্তরে বিপুল-বৈভারের মধ্যে পূবে শৈল-গিরি-উদয়গিরির মধ্যে, দক্ষিণে উদয়গিরি-সোণাগিরির মধ্যে, আর পশ্চিমে সোণাগিরি বৈভারের মধ্যে ছিল প্রবেশ-দ্বার। এই দ্বারে থাকতো প্রহরী আর সৈন্য, পাহাড়ের ওপরে প্রাচীরের কাছাকাছি নানাস্থানে ছিল সৈন্যদের ঘাঁটি বা 'ব্যারাকের' মতন।

তপোদ তপোদারাম। বৈভারে ওঠবার আগে বেণুবনে নৈঋত কোণে বৈভারের উত্তর গা। বেণুবনের নৈঋতে নিচে জলস্রোত —প্রাচীন তপোদ আর বর্তমানের সরস্বতী নদী। বেণুবনের সীমার নিচে এই জলস্রোতে বড়ো বড়ো পাথরের একটি বাঁধ ছিল। বাঁধের ওপর দিয়ে ছিল ওপারে তপোদারামে যাবার পথ। তপোদারামে আস্তানা আছে সাধু সন্ন্যাসীদের। এই বাঁধ দিয়ে জল বেঁধে, নদীর ওপরের কিছুদূর অংশ হয়েছিল 'তপোদা সরোবর'। কোনো কোনো স্থানে নদীতীর বাঁধানো ছিল কংক্রীট করে। অন্যত্র ছিল ছোট ছোট পাথর সুরকি চুন আর তার সঙ্গে এমন কিছু অজানা মসলা, যার মিশ্রণের ফলে এসব এমন শক্ত হতো —যেন সবটা মিলে একখণ্ড পাথর।

পিপ্ পলি গুহা। বৈভার-পাহাড়ের নিচেও বহু মন্দির। এখনকার মন্দির মসজিদ, সিঁড়ি ইত্যাদির নিচে প্রাচীন ইট পাথরের চিহ্ন। তপোদারাম আর গঙ্গা-যমুনার ধারা পেরিয়ে পশ্চিমে একটি বড়ো পুরানো পুকুর। এই পুকুরের পূর্ব সীমানায় বৈভারের গায়ে একটু ওপরে পূর্ব-মুখে যে গুহা তার নাম পিপ্ পলি গুহা। সামনে একটি অশ্বত্থ গাছ —তাই গুহার এই নাম। এই গুহায় বাস করতেন বুদ্ধ। সারিপুত্র প্রমুখ শিষ্যরাও বাস করতেন এখানে। ভিক্ষু মহাকাশ্যপ এখানে বাস করার সময়ে একবার তাঁর অসুখ করে। তখন বুদ্ধ তাঁকে দেখতে এসে সান্ত্বনা আর উপদেশ দিয়েছিলেন —এই গুহায় বসে।

সপ্তপর্ণী স্তূপ। বৈভারের উত্তর-মাঠ থেকে ওপরে তাকালে

সপ্তপর্ণী গুহা দেখা যায়। ওপরের ঐ গুহাগুলি সম্ভবতঃ আসল সপ্তপর্ণী পরে নিচের স্তূপগুলিও সপ্তপর্ণীর সঙ্গে গুলিয়ে গিয়েছিল। এই গুহার কাছে ছাতিমগাছ আছে মনে হয় তাই এই নাম হয়েছিল। অজাতশত্রু প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির সময়ে সপ্তপর্ণী গুহার সামনে একটি মণ্ডপ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন এখানকার উঁচু গাথুনি সেই মণ্ডপের ধ্বংসাবশেষ হতে পারে। সপ্তপর্ণী মনে হয় স্তূপের নাম নয় গুহার নাম।

জরাসন্ধের বৈঠক বৈভারের কুণ্ড ও ধারা। গঙ্গ যমুনা ধারার দক্ষিণের পথ দিয়ে জরাসন্ধকা বৈঠকে উঠতে হয়। নিচে ব্রহ্মকুণ্ড সাতধারা ও শতধারা। সাতধারার দক্ষিণে, নিচু জায়গায় একটি পাথর-বাঁধানো পুরানো বাঁধা পুকুর। বৈভারের জলধারাগুলি গরম খুব। জগদীশবাবু বলেছিলেন রাজগীরের গরম ঝরণাগুলির জলে রেডিয়াম আছে বাত টাত হজম ভালো হয় এ জল খেলে। রাজগীরের ঝরণগুলো পুরোর জলেরও ওজন্য গুণ রয়েছে

বৈভারগিরির ওপরে সপ্তপর্ণী গুহা। জরাসন্ধক বৈঠকের পাশ দিয়ে বৈভারে ওঠার পথ। কষ্টসাধ্য ওপরে ওঠা। এখানে কোনো স্থানে বুদ্ধ কেবার ধর্মশিক্ষা দিয়েছিলেন। তার একটি স্মারক স্তূপ ছিল এখানে। এখানে গিরিপ্রাকারের ভিত্তি জৈন মন্দির আর একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে ভাঙ্গ অবস্থায়। সপ্তপর্ণী গুহায় বুদ্ধ বাস করতেন কখনো কখনো। গাছে সপ্তপর্ণী বা ছাতিম গাছ আছে বলে গুহার ঐ নাম। বাঁশবনও ছিল পাহাড়ের নিচে। বৈভারে সর্বোচ্চ শিখরের উচ্চতা হলো ..৪৭ ফুট। বৈভারের ওপর থেকে উত্তরদিকের সমতল ভূমিতে আলবাঁধা খণ্ড খণ্ড নানা রঙের শস্যক্ষেত্র আছে। তার শোভা বুদ্ধ একবার দেখতে বলেছিলেন আনন্দকে। বুদ্ধ ছিলেন বড়ই সৌন্দর্যপ্রিয় সুন্দর কিছু দেখলেই তার প্রশংসা করতেন তিনি আর দেখাতেন অপরকে।

গিরিপ্রাকারের উত্তর দ্বার, নগর-প্রাচীরের উত্তর আর উত্তর পশ্চিম দ্বার। গিরিপ্রাকারের উত্তরদ্বারের পশ্চিমদিকে নদীতীরে একটি শ্মশান। প্রাকারদ্বারের পরেই খাল। খালের পরেই নগরপ্রাচীরের উত্তর পশ্চিম দ্বার। খালের ওপর পাকা পুলের চিহ্ন —বড়ো বড়ো কংক্রীট খণ্ড। দুই দ্বারের পূবে পশ্চিমে নগরপ্রাকারের চিহ্ন আর অবশেষ। নগরপ্রাচীরের উত্তর পশ্চিম কোণের

ওপরে মন্দিরটি আধুনিক। পাণ্ডারা একে বলে 'জরা-রাক্ষসীর মন্দির'। প্রাচীরের গায়ে কাটা দাগ আছে একটা। ওখানে পাওয়া গেছে পোঁতা বড়ো বড়ো মাটীর কলসী , তাতে রাখা মৃতের অস্থি। প্রাচীরের গায়ে এখনো অবশেষ রয়েছে কলসীর আর অস্থির। এ হলো অতি প্রাচীনকালের মৃত-সংকার প্রথার সাক্ষাৎ-পরিচয়। —সে-যুগে মৃতদেহ দাহ করবার পরে নাভিপদ্মের অস্থিগুলি মৃৎপাত্রে ভরে পুঁতে রাখা হতো মাটীতে।

বলরাম মন্দির। জরারাক্ষসীর মন্দিরের কাছে সরস্বতীর পশ্চিম তীর ধরে দক্ষিণে গেলে একটি পাথরে গাঁথা ভিত আছে। এটি আদিতে বোধ হয় স্তূপ ছিল। পরে এর ওপরে হয়েছিল হিন্দু মন্দির। মন্দিরে বলরামের মূর্তি পাওয়ায় এই নাম।

সোণভাণ্ডার। আরো দক্ষিণে সোণভাণ্ডার। পাণ্ডারা বলেন, রাজা বিম্বিসারের স্বর্ণ ভাণ্ডার। এর ভেতরে দেওয়ালের ওপর অজানা অক্ষরে লেখা নির্দেশ আছে গুপ্তধন পাবার রাস্তার। এই লিপির রহস্য ভেদ করতে পারলেই নাকি গুপ্তধন মিলবে। আসলে এখানে ছিল সাধুদের আবাস। ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা লিপি থেকে জানা যায়, একজন জৈন সাধু তপস্বীদের বাসের জন্যে চতুর্থ খৃস্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। এর ভেতরের মূর্তিগুলি জৈন তীর্থঙ্করদের। আগে ছিল দোতলা। এখন ওপরের তলা ভেঙে পড়েছে।

রংভূম বা মল্লভূমি—জেঠিয়ান। সোণভাণ্ডার থেকে দেড় মাইল দক্ষিণে কিংবদন্তীর মল্লভূমি —এখানে ভীম জরাসন্ধকে মল্লযুদ্ধে বধ করেছিলেন। মল্লভূমির মাটি প্রাকৃতিক কারণে নরম আর সাদা। পাণ্ডারা বলেন জরাসন্ধ দুধ আর ঘি ঢেলে ঢেলে মল্লভূমির মাটী নরম আর মিহি করেছিলেন। বিহারের কুস্তিগীরেরা এই মাটি গায়ে মেখে, আর নিয়ে গিয়ে প্রায় একটা ডোবা করে দিয়েছে। মল্লভূমি থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে ছ মাইল দূরে জেঠিয়ান গ্রাম—বৌদ্ধশাস্ত্রের যষ্টিবন।

সোণাগিরি। মল্লভূমি থেকে সোণভাণ্ডারের দিকে ফেরবার সময়ে, ওখান থেকে মনিয়ার মঠের রাস্তার দিকে, সরস্বতী পার হয়ে, একটু পূবে, দক্ষিণের পথ ধরে সোণাগিরিতে উঠতে হয়। প্রাচীন নগরের এই দক্ষিণ অংশই ছিল প্রাচীনতম অংশ—গিরিব্রজ বা কুশাগ্রপুর।

ঘনসন্নিবিষ্ট বহু বাড়িঘর আর রাস্তার চিহ্ন —এখন ঢোকা যায় না এমন জঙ্গল।

মনিয়ার মঠ। —এ হলো মনসার মঠ। গিরিপ্রাকারের উত্তর ফটক দিয়ে এখনকার পাকা রাস্তা ধরে সোজা মনিয়ার মঠে আসতে হয়। দু-পাশে বাড়ি-ঘরের ভিত, প্রাচীন রাজপথের রেখা, ছোট দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, বড়োলোকের প্রাচীর-ঘেরা বাড়ির চিহ্ন। মনিয়ার মঠের ঠিক সামনে ইঁট-বাঁধানো একটা প্রাচীন কুয়ো। মনিয়ার মঠ খুঁড়ে পাওয়া গেছে পাঁচটি স্তর। ওপরের স্তরে জৈন বৌদ্ধ শৈব —এই সব মন্দির ছিল। আর নিচের স্তরে প্রথম দ্বিতীয় শতাব্দে তৈরি অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে। সেগুলি দেখে মনে হয়, সে-যুগে এখানে ছিল নাগ-নাগিনী পূজার ক্ষেত্র। মহাভারতে আছে, মণিনাগ ছিলেন রাজগৃহের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, আর যক্ষ-যক্ষিণী-পূজার ঝোঁক ছিল খুব রাজগৃহে। মনিয়ার মঠই মনে হয়, বৌদ্ধশাস্ত্রের 'মণিমালক চৈত্য', আর জৈনশাস্ত্রের 'মুনিভদ্র যক্ষালয়'। নাগ-নাগিনী আর যক্ষ-যক্ষিণীর পূজা আর্যেতর ভারতধর্মের অঙ্গ। বিশেষ করে, এ-সব হলো অস্ট্রিক কোল নাগবংশীদের সংস্কৃতি-সংহৃতি। নাগ-যক্ষাদি নানা অপদেবতার প্রাধান্যের জন্যে রাজগৃহের খ্যাতি ছিল খুব। আর এ-সব অপদেবতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে বৌদ্ধভিক্ষুরা রাজগৃহে এলে একটি 'পরিত্রাণ মন্ত্র' জপ করে রাখতেন।

মনিয়ার মঠ খোঁড়বার সময়ে চারপাশে বড়ো গর্তের মধ্যে পশু-টশুর হাড় পাওয়া গিয়েছে অনেক। সুতরাং পশুবলি-প্রথা এখানে বলবৎ ছিল। জরাসন্ধের শিবলিঙ্গ-পূজা আর নরবলির স্থানও ছিল সম্ভবতঃ এখানে। এই মঠটি ছিল প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগের অতি প্রাচীন দেবস্থান। এর দক্ষিণে প্রাচীন নগর গিরিব্রজ, আর গিরিব্রজের এই ছিল প্রধান দেবালয়। আরও নিচের মাটী খুঁড়লে আরও প্রাচীনযুগের পূজা-পদ্ধতি, প্রাগায় মগধের ধর্ম, —এ-সব বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। চারদিকের প্রাচীরের ওপর দিয়ে বেড়ালে বোঝা যাবে, কালে কালে এই মঠ কতো বড়ো হয়েছিল।

পাকা রাস্তা ধরে মনিয়ার মঠে পৌঁছে, আবার পাকা রাস্তা ছেড়ে, মনিয়ার মঠের পুব-দেওয়াল ঘেঁষে, যে-পথ দক্ষিণমুখে গেছে, সেই পথ সেকালে ছিল প্রশস্ত রাজপথ। পথের দুধারে বড়ো বড়ো বাড়ির ধ্বংসাবশেষের মতো ঢিপি পড়ে রয়েছে। পশ্চিমে সমগ্র গিরিব্রজ এখন কাঁটা আর জঙ্গল। জঙ্গলে ঢুকলেই প্রাচীন বাড়ি ঘর রাস্তা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

কারাগৃহ। প্রাচীন রাজপথ দিয়ে নগরপ্রাকারে পৌঁছবার কিছু আগে, বাঁদিকে একটা বড়ো ধ্বংসাবশেষ আছে। এটি ছিল —বন্দীশালা। ভিতে লোহার আংটা-আঁটা; সম্ভবতঃ, বন্দীদের আটকিয়ে রাখার জন্যে। অজাতশত্রু বিম্বিসারকে হয়তো এখানেই রেখেছিলেন বন্দী করে। কারণ, বর্ণনায় রয়েছে, —বিম্বিসার বন্দীশালা থেকে গৃধ্রকুট-শিখরে দেখতে পেতেন বুদ্ধকে। এখান থেকে গৃধ্রকুট দেখা যায় সত্যিই।

প্রাসাদ-নগর। —নগরপ্রাকারে পৌঁছলে যে-দ্বারটি দেখা যায়, নাম তার দক্ষিণ-পশ্চিমদ্বার। হিউয়েনৎ-সাঙ্ বলেছেন, এটা উত্তর-পশ্চিম দ্বার। এর দক্ষিণের অংশ ছিল রাজপ্রাসাদ-সমন্বিত প্রাসাদ-নগর। নগরপ্রাকারের কিছু পরে, ডান দিকে একটু দূরে একটা প্রাচীন কুয়ো আছে। এটার সবটাই পাথর-কেটে খোঁড়া। প্রাচীন রাজপথ এই অঞ্চলে ধনুকের মতন বেঁকে আধুনিক পাকা রাস্তার সঙ্গে মিলেছে। এর নির্মাণ-কৌশল প্রশংসা করবার মতন।

রাজপ্রাসাদ, —শেল (Shell) লিপি। প্রাচীন আর আধুনিক রাস্তার সংযোগস্থলের পশ্চিম দিকে জঙ্গল আর ধ্বংসাবশেষ। এখানেই ছিল বিম্বিসারের রাজপ্রাসাদ। একটু এগিয়ে বাঁ-দিকে একস্থানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ভূমিতলে পাথরের ওপর লেখা রয়েছে —অদ্ভুত অক্ষরে। এখানে পাথরের ওপর দিয়ে সেকালে গাড়ী-চলার চাকার গভীর দাগ। এর থেকে মনে হয়, এটা রাস্তা। যাতে লিপিগুলি নষ্ট না হয়, সেজন্যে এখন এখানে দেওয়াল-ঘিরে রাখা আছে। এই অজ্ঞাতপরিচয় অক্ষরকে পণ্ডিতেরা বলেন, —Shell বা ঝিনুক-লিপি। এ-সব এখনো পড়া হয়নি। এই অক্ষরের লিপি রাজগৃহে আরো অনেক জায়গায় আছে। সাতধারার একটি গরম জলের প্রণালী মেরামতের সময়ে, মাটির তলাতেও

একটি পাথরের ওপরে এই লিপি দেখা গেছে। এই লিপি পড়তে পারলে রাজগৃহের আর প্রাচীন ভারতের অনেক তথ্য জানা যাবে। শৈল-লিপির কাছ দিয়ে উদয়গিরিতে ওঠবার পথ। আর একটু দক্ষিণে, রাস্তার বাঁ-দিকে দু-টী ছোট স্তূপের অবশেষ।

বাণগঙ্গা—গিরিপ্রাকারের দক্ষিণ-দ্বার। বাণগঙ্গার মুখের কাছে সোণাগিরির আর উদয়গিরির গিরিপথে গিরিপ্রাকারের দক্ষিণদ্বার। সোণা-গিরিতে উঠে প্রাকারের আয়তন দেখবার মতন। প্রাকারের বাইরে দক্ষিণেও কিছু ধ্বংস রয়েছে। রাস্তা এখান থেকে গিয়েছে গয়ার দিকে। বাণগঙ্গা বা খালের জলে স্নান করা যায়; কিন্তু এ জল না-খাওয়াই উচিত।

নগরপ্রাচীরের দক্ষিণদ্বারের কাছে স্মারক-স্তূপ ছিল কতকগুলি। সেখানে বুদ্ধশিষ্য অশ্বজিতের সঙ্গে সারিপুত্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। অজাতশত্রু মাতাল হাতী লাগিয়ে বুদ্ধকে বধ করার চেষ্টা করেন এখানে। এখান থেকে পূবদিকের গভীর খালে ধাক্কা দিয়ে ফেলে বুদ্ধকে মারবার চেষ্টা করেছিলেন শ্রীগুপ্ত। এই দ্বারের অল্প ঈশানে গৃধ্রকূটে যাবার রাস্তা।

নগরপ্রাচীরের পূর্বদ্বার—জীবকাম্রবন। গৃধ্রকূটের রাস্তা ধরে চললে কাছেই প্রাকারের পূর্বদ্বার। পূর্বদ্বারের পরেই খালের ওপর পুল। এই খাল ছিল নগরপরিখা—তলদেশ বাঁধানো পাথর দিয়ে। পরিখার ওপর দিয়ে পুল ছিল প্রাচীন যুগেও। প্রাচীন পুলে কড়িকাঠ বসাবার খাঁজ-কাটা রয়েছে এখনও। উদয়গিরি থেকে গিরিপ্রাকারের যে-শাখা নেমে রত্নগিরিতে উঠেছে, একটু পরেই তা দেখা যায়। এখানে ছিল রাজবৈদ্য জীবকের আম্রকানন। এই আমবাগান বুদ্ধদেবকে দান করেছিলেন রাজবৈদ্য জীবক। বাঁ-দিকের জঙ্গলে অনেক ধ্বংসাবশেষ। জীবকাম্রবনে পরে যে-সব বিহারাদি তৈরি হয়েছিল, এগুলি সম্ভব সে-সবের।

গৃধ্রকূট। এখান থেকে মাইলখানেক দূরে, গৃধ্রকূটের পাদদেশে পৌঁছে, পাহাড়ের গায়ের রাস্তা দিয়ে প্রায় এক মাইল উঠলে শিখরে পৌঁছনো যায়। পাহাড়ের এই রাস্তা তৈরি করিয়েছিলেন নৃপতি বিম্বিসার। পথে ছ-টী ছোটো স্তূপের ভিত্তি দেখা যাবে। পাহাড়টির চূড়ো দেখতে

শকুনের মতন, অথবা এই শিখরের ওপরে শকুন বসতো বলে এই শিখরের এই নাম —'গৃধ্রকুট'। 'শিখরের নিচের দিকের গুহাগুলি আনন্দ, সারিপুত্র প্রমুখ প্রধান শিষ্যদের গুহা। আর ওপরে যে গুহার ছাদের পাথর ভেঙে পড়েছে, সেইটিই প্রসিদ্ধ —বুদ্ধের বাস গুহা বলে। বুদ্ধের বহুকালের বাসস্থান রাজগীরের বেণুবন-বিহার আজ নিশ্চিহ্ন। তাঁর স্মৃতিবিজড়িত অন্য স্থানগুলিও চেনা যায় না। সেইজন্যে গৃধ্রকুটের এই গুহা বৌদ্ধ-জগতের মহাতীর্থ। বুদ্ধ এখানে যে-সব ধর্মশিক্ষা দিয়েছিলেন, সে-সব শোনবার সৌভাগ্য হয়নি বলে, ভক্ত ফা-হিয়েন এখানে এসে চোখের জল ফেলেছিলেন। গৃধ্রকুটের শিখরের পুবদিকে বুদ্ধ পায়চারি করে বেড়াবার সময়ে দেবদত্ত ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে ফেলে, তাঁকে মারবার চেষ্টা করেছিলেন। যে-সমতল স্থানে বসে বুদ্ধ লোককে ধর্মশিক্ষা দিতেন, সে-স্থানটি পাথরে-বাঁধানো প্রাঙ্গণের মতো। গৃধ্রকুটের পুবদিকের পাহাড়ের গায়ে বড়ো বড়ো অনেক পাথরের গাঁথুনির ভিত্তি আছে। উত্তরে ছঠাগিরির সর্বোচ্চ (১১৬৭ ফুট) স্থানে একটি স্তূপ ছিল —অশোকের তৈরি। স্তূপে যাবার পথ দুর্গম। সমগ্র গৃধ্রকুট-শিখরের ওপর যুগে যুগে বহু পাথর আর ইঁটের চৈত্য, বিহার, স্তূপাদি নির্মিত হয়েছিল। শিখর থেকে অগ্নিকোণে দূরে 'পঞ্চনা' নদী। এ হলো প্রাচীনকালের নদী —'সর্পিণী'। চার-পাঁচ মাইল পুবে, উদয়গিরি আর শৈলগিরির মধ্যপথে গিরিপ্রাকারের পূর্বদ্বার। গিরিয়াক থেকে রাজগৃহে আসার এই পথ। গৃধ্রকুট-শিখরের দক্ষিণ-পাদদেশে ছিল 'মদ্দকুচ্ছি-মৃগোদ্যান'। কাছের পুকুরটি মাগধী দেবীর সুমাগধ-পুষ্করিণী। এরই কাছে ছিল মোর-নিবাপ বা ময়ূর চরবার স্থান। গৃধ্রকুটের শিখরে দাঁড়িয়ে নিচে তাকালেই এ-সব বোঝা যাবে। প্রাচীনকালে মদ্দকুচ্ছি থেকে গৃধ্রকুট-শিখরে ওঠবার যে পথ ছিল, এখনও চিহ্ন রয়েছে তার। ফেরবার পথে কারাগৃহের পরে, আর একটি বড়ো ধ্বংসাবশেষ। গিরি-প্রাকারের উত্তর-দ্বারে আসার পথে আর-একটি ধ্বংসাবশেষ; —লোকে বলে, এই ছিল বিম্বিসারের গোশালা।

আমরা নালন্দা আর রাজগীর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য অমূল্যচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'রাজগৃহ ও নালন্দা' (১৯৫১) গ্রন্থ (ইন্দ্র দুগার কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত)

থেকে সঙ্কলন করে দিলুম। কারণ, অমূল্যবাবু শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক থাকার সময়ে যখন তাঁর এই বই প্রথম লেখেন, সেই সময়ে নন্দলাল অধ্যাপক সেনের নির্দিষ্ট স্থানগুলি আলোচনা করে, রাজগীরের plan অঙ্কিত করেন 'শান্তিনিকেতন-তাঁবু' সমেত। এই আলোচনার ফলে, প্রাচীন রাজগৃহ সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি আরো স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। অধ্যাপক সেনের গবেষণার ফলে, নন্দলালের দৃষ্টি রাজগীরের সুপ্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের গভীরে প্রবেশ করে। নন্দলাল তাঁর প্রথম পর্যায়ের ২৮ সংখ্যক স্কেচ্-বইয়ে রাজগীর সম্বন্ধে বহু স্কেচ্ করে রেখেছেন। রাজগীরের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থান আর প্রাচীন রাস্তাঘাটের স্কেচ্ করেছেন। 'রাজগৃহের রেস্ট্-হাউসে, 'রাজগৃহের পাহাড়ী-কাঠুরে', 'রাজগৃহে গৃধ্রকূটের পথে', 'জরাদেবীর মন্দির,' 'গৃধ্রকূট', 'মখদুম কুণ্ড' ইত্যাদি নন্দলালের রঙিন ও কালি-তুলির ছবি ছাড়া, অসংখ্য অমুদ্রিত স্কেচ্ রয়েছে —রাজগীরের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানের আর মূর্তির। ১৯৩০ ও ৩১ সালে রাজগীরে গিয়ে নন্দলাল ছবি করেছেন (১) লাল গেরিতে আঁকা ক'টি মূর্তি। —একটি মেয়ে আলপনা দিচ্ছে। (২) দুটি মেয়ে কলসী-কাঁখে জল তুলতে যাচ্ছে। একটি মেয়ে গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছে। —(কড়চা সংখ্যা ৩৭ দ্রষ্টব্য)। রবীন্দ্রনাথের একাধিক কাব্য-কবিতা-নাটকের প্রেক্ষাপট হলো প্রাচীন রাজগৃহের পুরাতন কথা ও কাহিনী। তেমনি ভারতের প্রত্নকীর্তি দেখে ঐতিহ্যমগ্ন আচার্য নন্দলালের অসংখ্য চিত্রকর্মের প্রেরণার উৎস আর প্রেক্ষাপট হলো পুরাতন রাজগৃহের পুণ্যময় প্রত্নভূমি। আমরা প্রসঙ্গতঃ সে-সব আলোচনা করবো। যাই হোক্, নালন্দা-রাজগীরের মহাগৌরবময় অতীত ভারত-পরম্পরা ভারতশিল্পী নন্দলালকে তাঁর কর্মজীবনে বারে বারে এখানে টেনে এনেছিল! শুধু তাই নয়, তিনি রাজগীরে এসে অনুভব করতেন তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের অবিচ্ছিন্ন ভালোবাসা।

॥ পাটনা-ভ্রমণ, ১৯২১ ॥

নালন্দা-রাজগীর থেকে দলবল নিয়ে নন্দলাল এলেন পাটনায়। একালের পাটনার শিল্প-সংগ্রহ আর সেকালের পাটলীপুত্রের প্রত্নকীর্তি দেখে ভারতশিল্প-জাহ্নবীনীরে স্নান করবার উদ্দেশ্যে। স্বদেশের পুরাতত্ত্বের সন্ধানে তাঁর মন সদা-উৎসুক।

গ্রীকদের 'পালিবোথরা' আর হিন্দুদের 'পাটলীপুত্র' একই স্থানের নাম। গঙ্গাতীরের প্রাচীন 'পাটলী'-গাঁয়ের নাম থেকে এসেছে এই নাম। এখনকার মজঃফরপুর জেলায় সেকালের বৃজ্জিদের রাজধানী ছিল বৈশালী। সে হলো বর্ধমান মহাবীরের জন্মস্থান, এখনকার বসার। বৈশালীর লিচ্ছবীদের দমন করবার জন্যে মগধের শৈশুনাগ-বংশের রাজা অজাতশত্রু (খৃ. পূ. ৫৫৪) এখানে একটি দুর্গ তৈরি করান। প্রবাদ, বুদ্ধ এই স্থানটি দেখে এর ভাবী সমৃদ্ধি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অজাতশত্রুর তৃতীয় পুরুষে এই স্থান রম্যনগরী হয়ে ওঠে। মৌর্যদের সময়ে 'পাটলী' সারা ভারতবর্ষের রাজধানী হয়েছিল। তখন এর নাম ছিল 'কুসুমপুর' বা 'পুষ্পপুর'।

মেগাস্থিনিস ভারত-ভ্রমণে এসে (খৃ. পূ. ৩০২) পাটলীপুত্রে এসেছিলেন। তখন এখানে ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজপ্রাসাদ। পাটলীপুত্রের সংস্থান ছিল গঙ্গা আর সোণ নদের সঙ্গমস্থলে। 'সোণ নদ' হলো বৈদিকযুগের নদ —'হিরণ্যবাহু'। এখন ঐ অংশে পাটনা-নগরী, বাঁকিপুর আর দু-চারটি আশ-পাশের গ্রাম। নদীর গতি বদলে যাওয়ায় গঙ্গা আর সোণের সঙ্গমস্থল এখন পাটনার বারো মাইল পশ্চিমে দানাপুরে ছাউনির কাছে। এখনও নদীর শুকনো খাতে সেকালের বাঁধ আর বন্দরের জেটি দেখা যায়। প্রাচীন পাটলীপুত্র দীর্ঘে ছিল ন-মাইল, আর আড়ে ছিল দেড় মাইলের বেশি। মেগাস্থিনিস এখানে এসে দেখেছিলেন, পাটলী-দুর্গের চার দিকে একটি কাঠের গুঁড়ির বেড়া দৃঢ়ভাবে পোঁতা আর তার মধ্যে মধ্যে তীর ছোঁড়বার জন্যে ছোট ছোট ছিদ্র। দুর্গের চূড়ো ৫৭০টি, আর তোরণ ৬৪টি ; দুর্গের বাইরে গভীর আর চওড়া একটি দুর্গ পরিখা। তার যোগ ছিল সোণের সঙ্গে। ফলে,

জল থাকতো এতে বারো মাস। শহরের আবর্জনা ঐ পথে ফেলা হতো নদীগর্ভে।

মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ ছিল এখনকার কুমড়াহার (কুমড়া+আহার) গাঁয়ের কাছে। এই প্রাসাদ প্রধানতঃ তৈরি করা হয়েছিল ইঁট-পাথরের ভিতের ওপর কাঠের রলা দিয়ে ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ে যে-সব আশ্চর্য ধরনের রাজপ্রসাদ রয়েছে তার মতো করে। এর সোনা মোড়া থামগুলি সোনার দ্রাক্ষালতা আর রূপোর পাখি দিয়ে সাজানো। নগরের উদ্যানও সাজানো ছিল অতি সুন্দরভাবে। এগুলি ভরতি ছিল মাছের পুকুরে। পুকুর-পাড়ে সাজানো-গোছানো গাছ আর গুল্ম দিয়ে। সমস্তই প্রাসাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে। মাটি খুঁড়ে মৌর্য স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন যা পাওয়া গেছে তাতে অনেকে মনে করেন, এই সব হর্ম্যের নকশা করা হয়েছিল নাগবংশী, দ্রাবিড় আর আর্য-স্থাপত্যের সংমিশ্রণে। সেকালে পারস্যের সঙ্গে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের যোগাযোগের নানা কাহিনীও বৌদ্ধসংঘ থেকে প্রচারিত হয়ে অজন্তায়, বাগে চিত্রকর্মের একটি প্রধান উপজীব্য হয়েছিল। হয়তো এ সম্ভবপর হয়েছিল অন্য ঐতিহাসিক কারণে।

মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ জাঁকজমকে সমকালের পারস্যের রাজধানী একবাটানার প্রাসাদকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। রাজদরবারে ছিল জমকালো আড়ম্বর। স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করা হতো যার আয়তন ছিল ছয় বর্গ-ফুট। রাজা যখন জনসাধারণের সামনে আসতেন, তিনি আসতেন সোনার পালকিতে চড়ে, অথবা হাতীর পিঠে হাওদার ওপর বসে,— সে হাতীর সজ্জা অতুলনীয়। রাজা পরতেন মসলিনের পোষাক—তাতে কাজ করা বেগুনীর আর সোনার। চীন-সমেত সমগ্র এশিয়ার বিলাস-উপকরণ তখন তাঁর সামনে। রাজপ্রাসাদের শতস্তম্ভযুক্ত বিস্তীর্ণ কক্ষে পাহারা দিত প্রধানতঃ রণরঙ্গিনী সশস্ত্র নারীবাহিনী। সকালে উঠে তাদের অভ্যর্থনা-লাভ সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে মনে করা হতো। রাজার বিশাল অন্তঃপুরে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল দৃঢ়তর। সীলমোহর-ছাড়া কোনো-কিছুর প্রবেশ সেখানে ছিল নিষিদ্ধ। —মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের বিলাস-ব্যসনের এই সব ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ এবং পরে দাক্ষিণাত্যের চালুক্য রাজাদের অনুরূপ রাজকীয় কেতা, সেকালে ধনী গৃহস্থের মধ্যেও

সংক্রামিত হয়েছিল। নন্দলাল বলেন,—অজন্তার, বাগের, শ্রীগিরির দেওয়াল-চিত্রে এই সব বাস্তব ঘটনার চিত্ররূপ আঁকা রয়েছে।

অশোক (খৃ. পূ. ২৭২-২৩২) সর্বপ্রথম এই নগরে স্থায়িভাবে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করে তার চারদিক পাঁচীর দিয়ে ঘিরে ফেলেন। তাঁরই সময়ে এখানে কারুকার্যখচিত পাথরে-তৈরি বহু হর্ম্যের পত্তন হয়। পঞ্চম শতাব্দের গোড়ায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ফা-হিয়েন এদেশে এসে (খৃ. ৩৯৯-৪১৪), পাটলীপুত্রে অশোকের রাজপ্রাসাদ দেখেছিলেন। তখনও অশোকের প্রাসাদ, তার মধ্যেকার হল-ঘরগুলি, নগর-সীমার পাঁচীর, আর তোরণ সব আগের মতোই অটুট আর সুন্দর ছিল। তাঁর সবচেয়ে ভালো লেগেছিল শহরের মধ্যিখানে আশোকের তৈরি প্রাসাদ আর হল-ঘর। বৃহদায়তন পাথরে-তৈরি আলঙ্কারিক খোদাই-করা কাজের গভীর ব্যঞ্জনাময় ভাস্কর্য-সজ্জা দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, এ-সব সৃষ্টি মানুষের নয়, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার নির্মাণ। অশোকের সেই মহিমান্বিত প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ এখনকার পাটনা-শহরের দক্ষিণে 'কুমড়াহার' গ্রামে রয়েছে।

অশোকের ছোট ভাই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। অশোক তাঁর জন্যে শহরের মাঝ-খানে একটি স্তূপ নির্মাণ করে দেন। এই স্তূপের কাছে দু-টি প্রকাণ্ড মঠ ছিল। তার একটিতে মহাযানী আর একটিতে হীনযানী ভিক্ষুরা বাস করতেন। এই মঠ দু-টি ছিল বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র। দেশ-বিদেশ থেকে বহু ছাত্র এখানে আসতেন বিদ্যাশিক্ষার জন্যে। তখন এদেশে শোভাযাত্রা বের হতো অনেক। পাঁচ-তলার সমান উঁচু, চার-চাকার রথের মধ্যে বুদ্ধদেবের মূর্তি স্থাপন করে মিছিল বের হতো। তাঁর সময়ে এদেশে দীন দুঃখী পঙ্গু রোগীদের জন্যে আতুরাশ্রম আর হাসপাতাল ছিল। নগরের দক্ষিণ-সীমায় একটি ছিল প্রকাণ্ড মঠ। তার মধ্যে ১৮" ইঞ্চি লম্বা আর ৬" ইঞ্চি চওড়া বুদ্ধের পদচিহ্ন ছিল। গয়ার বিষ্ণু-পদ বুদ্ধের এই রকম পদচিহ্ন বলে নন্দলাল মনে করতেন। ঐ মঠের কাছে দেড়-শো হাত উঁচু একটি প্রস্তরস্তম্ভ ছিল। তার গায়ে খোদাই ছিল অশোকের বাণী। পঞ্চম শতাব্দে ফা-হিয়েন অশোকের যে-রাজপ্রাসাদ দেখেছিলেন, সপ্তম শতাব্দে হিউয়েনৎ-সাঙ্ তার চিহ্ন খুঁজে পাননি! কিছু ছিল প্রাসাদের উত্তর-অংশ গঙ্গার দিকে মুখ-ফেরানো

হাজার-প্রকোষ্ঠের নিদর্শন। দুষ্টের শাসনাগার তৈরি করিয়েছিলেন অশোক, নাম ছিল তার—'নরক'। এই নরকের দক্ষিণে অশোকের তৈরি স্তূপ ছিল একটি—সে বুদ্ধের ধাতুস্তূপ হতে পারে। পুরনো প্রাসাদের নৈঋ'ত কোণে অশোকের গুরু উপগুপ্তের পর্বতগুহা ছিল। তার নৈঋ'তে এক সারিতে পাঁচটি স্তূপ—হয়তো এখনকার 'পাঁচ পাহাড়ী'। অশোকের 'কুক্কুট-আরাম' মঠ দেখেছিলেন হিউয়েনৎ-সাঙ্। তখন এদেশে মঠ, হিন্দু-মন্দির আর বৌদ্ধস্তূপ ছিল অগনতি।

পাটনায় খননের কাজ শুরু হয়েছিল গত শতাব্দের শেষ দশকে। সেকালের রাজধানী 'পাটলীপুত্র' পাওয়া গেল একালের 'কুমড়া-আহার' গাঁয়ের আধমাইল উত্তরে। এর পশ্চিমে বাঁকিপুরে আর পুবে পাটনা পর্যন্ত আট মাইল। উত্তরে গঙ্গা. আর বাকি তিন দিক গভীর পরিখা দিয়ে বেড়া। পরিখার দক্ষিণভাগ প্রাচীন সোণ-নদের একটি প্রশস্ত শাখা—সদা-সর্বদা জলপূর্ণ। এই উঁচু স্থানের নৈঋ'তকোণের সবচেয়ে উঁচু ডাঙ্গায় ছিল সেকালের গ্রাম—'পাটলী'। অশোকের প্রাসাদ প্রসারিত ছিল ছোট-পাহাড়া থেকে 'কুমড়াহার'-গাঁ পর্যন্ত। কুমড়াহারে অশোকের একটি স্তম্ভ পাওয়া গেছে বিরাট। স্তম্ভটি দেখে অনেকে মনে করেন, অশোকের প্রাসাদ কুমড়াহার গাঁয়ের কুড়ি ফুট মাটির তলায় চলে গেছে। এর পুবে একটি গাঁ, নাম 'মহারাজখণ্ড'; আর তার পাশেই একটি কুয়ো—নাম 'আগম কুয়া'। ঐ কূপটি 'অশোক নরকে'র সীমায় হতে পারে। ছোট-পাহাড়ী হলো, কুমড়াহারের অগ্নিকোণে এক মাইল দূরে। এখানে ছিল সন্ন্যাসী উপগুপ্তের আশ্রম। ছোট-পাহাড়ীর এক মাইল পুবে কাঠের তৈরি প্রকাণ্ড বেড়ার অংশ আর দুর্গচূড়ার কিছু পাথর-খণ্ড পাওয়া গিয়েছে। ছোট-পাহাড়ীর একটু দক্ষিণে বড়-পাহাড়ী বা 'পাঁচ পাহাড়ী'। এই পাঁচ-পাহাড়ীই হয়তো অশোকের পঞ্চস্তূপ। কুমড়াহারের বায়ুকোণে দেড় মাইল দূরে 'ভিক্না পাহাড়ী'—বিশ ফুট উঁচু আর সিকি মাইল জোড়া এই পাহাড়টি. তৈরি করে দিয়েছিলেন অশোক তাঁর ভাই মহেন্দ্রের জন্যে। এখানে রয়েছেন 'ভিক্নু কুনওয়ার' বা ভিক্ষুকুমার নামে একটি মূর্তি—ছ-ফুটের বেশি উঁচু—এখনো পুজো

পাচ্ছেন মহেন্দ্রের নামে। এর কাছেই নগরের এক অংশের নাম—'মহেন্দ্রু'।

অশোকের মৃত্যুর পরে পাটলীপুত্রের অবস্থা হীন হয়। বৈশালীর লিচ্ছবীরা এ-স্থান দখল করে নেন। চতুর্থ শতাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবীকুলের রাজকন্যাকে বিয়ে করে সামান্য সামন্ত রাজা থেকে মহারাজচক্রবর্তী হলেন। তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত। সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গীতজ্ঞান সুপ্রচারিত। তিনি সঙ্গীতশিল্পের অধ্যাপকদের বিশেষ সমাদর করতেন। সঙ্গীতের সঙ্গে বিশেষভাবে যোগযুক্ত তিনটি শিল্প স্থাপত্য, ভাস্কর্য আর চিত্রবিদ্যা এই সময়ে গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল। এ সব ধ্বংস হয় পরে মুসলমানদের দ্বারা। এরা হিন্দুকীর্তি বেধড়ক ধ্বংস করেছিলেন কয়েক শতাব্দ ধরে। এমন-কি, গুপ্তযুগের স্থাপত্য রীতি প্রায় ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে প্রায় মুছে গিয়েছিল। ঐ সময়কার ছোট বড়ো স্থাপত্য কম যা এখনও টিকে আছে সে হলো মুসলমান বন্যাপ্রবাহের বাইরে—প্রধানত মধ্য ভারতে আর মধ্যপ্রদেশে। মুসলমান-পূর্ব যুগের পাহাড়-খোদাই করা গুহা মন্দিরের সঙ্গে এ-সবের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

চতুর্থ শতাব্দে সমুদ্রগুপ্ত রাজ্য বৃদ্ধি করে অযোধ্যা বা কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থাপন করায় পাটলীপুত্রের গৌরব আবার কমে যায়। তখন এখানে সামরিক বিভাগের কেন্দ্র ছিল। পরে, বঙ্গ ও বিহারের অধিস্বামী পালরাজারা এখানে একবার 'জয়স্কন্ধাবার' বা রাজশিবির স্থাপন করেন। এদের সময়কার শিল্পকলার কথা অন্যত্র নালন্দা রাজগীর প্রসঙ্গে কিছু বলেছি।

গঙ্গাতীরে রয়েছে শেরশাহের (১৫৪০ খ্রী) 'পাথর কা মসজিদ' একটা দেখবার জিনিস। এক সময়ে পাটনার নাম রাখা হয়েছিল 'আজিমাবাদ'। এ নাম এখানে এখনও চলে মুসলমান সমাজে। আজিমাবাদের এক এক অংশ এক এক শ্রেণীর লোকের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট হয়। আমীর ওমরাহদের জন্যে কায়বান সুকো মুনশীদের জন্যে দেওয়ান মহল্লা মোগলদের জন্যে মোগলপুর আর আফগান লোদীদের জন্যে লোদী কাটরা। এই নগরের ঘরবাড়ি ছাওয়া হতো টালি বা খাপরায়। ইটের ঘরের প্রচলন পরে হয়। সতেরো শতাব্দের শেষের দিকে ঘর বাড়িতে মাটির দেওয়াল আর বাঁশ

ও খড়ের চাল। শোরার কারবার ছিল এখানে। ছাপরার গাঁয়ে শোরা শোধন হতো। তিব্বতীরা আসতো এখানে কস্তুরী বিক্রি করতে। তিব্বতী আর পাটনাবাসীদের মধ্যে কারবার চলতো প্রবাল, স্ফটিক আর কচ্ছপের হাড়ের চুড়ির। মিহি সুতার কাপড়, সূক্ষ্ম রেশমী শাড়ী আর শোরা ছিল প্রধান পণ্য। তখন এখানে বোতল আর একরকম মহাসুগন্ধী মাটীর বাটী তৈরি হতো। ঐ বাটী কাঁচের চেয়ে মসৃণ আর কাগজের চেয়েও হালকা। ঐ সময়ের বাড়ি-ঘরেও মাটীর দেওয়াল আর খড়ের ছাউনি। বাণিজ্য-দ্রব্য —শোরা, আফিম, গালা আর চেলি।

পাটনায় আর বাঁকিপুরে ঐ সময়ে (১৯২১) দেখবার জিনিস অনেক। পাটনার প্রাচীন পাঁচীর ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু, মাটী-মেশানো ইঁটের চারটি স্তূপ সেকালের দুর্গ-সীমার চারটি কোণ বলে বোঝা যায়। ঐ চারকোণে চার পীরের আস্তানা —মনসুর, মরুফ, মহ্‌দী আর জফর। ওঁদের নামেই এখানকার চারটি গঞ্জের নাম। প্রাচীন নগরের পুবে আর পশ্চিমে তোরণ দু-টি বাঁকা আর সুন্দর কালোপাথরে তৈরি। পাটনা-চকের শোভা সুন্দর। সৈফ খাঁর মসজিদের কাছেই একটি পুকুর —'মঙ্গল তলাও'। চকের পশ্চিমে 'ঝাউগঞ্জ' —অযোধ্যার নবাব আসফ-উদ্দৌলার মন্ত্রী ঝাউলালের হর্ম্য। শিকারপুর মহল্লায় শের-শার মসজিদ সবচেয়ে পুরানো। পাটনা-সিটি-স্টেশনের কাছে বেগমপুরে বিহারের শাসনকর্তা হায়বৎ জঙ্গের কবর। খুব সুন্দর সমাধি-মন্দির। হিন্দু-মন্দিরের মধ্যে বড়ো-পাটন-দেবী আর ছোট-পাটন-দেবীর মন্দির দু-টি দেখবার মতন। বড়ো-পাটন-দেবীর মন্দিরটি 'মহারাজগঞ্জে'। প্রবাদ, দেবী উঠেছেন স্বয়ং মাটির ভেতর থেকে। শিখ-সম্প্রদায়ের 'হরমন্দির' আর একটি দেখবার জিনিস। এ হলো রণজিৎ সিংহের কীর্তি। মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মাঝখানে নেপালের জঙ্গ বাহাদুরের দেওয়া শাল-কাঠের তৈরি একটি বিশাল পতাকাদণ্ড রয়েছে। মন্দিরের ভেতরে রাখা আছে —গ্রন্থসাহেব। গুরু গোবিন্দ সিংহ তীরের ফলা দিয়ে এই গ্রন্থের ওপরে নিজে নাম লিখে, তিনি এটি এই মন্দিরে দান করেছিলেন। এই মন্দিরটি ভারতের শিখ-সম্প্রদায়ের একটি প্রধান তীর্থ।

পাদ্রী হাবেলীতে রোমান ক্যাথেলিক চার্চ —গোরস্থানের উল্টোদিকে।

এই চার্চে একটা ঘণ্টা আছে প্রকাণ্ড। ল্যাটিন লিপি থেকে জানা যায়, ১৭৮২ খৃস্টাব্দে নেপালের বাহাদুর শা এটি দান করেছিলেন। অহিফেন-কুঠির কিছু দূরে গুলন্দাজ-পোস্তা। বাঁকিপুরে দেখা হলো, —গোলা বা গোলাঘর। এর নির্মাণ-কৌশল অতি আশ্চর্য। দেখতে মধুচক্রের মতন। উঁচু ৯৬′ ফুট। দু-টি গোল সিঁড়ি এর বা'র দিক থেকে চুড়ো পর্যন্ত উঠে গেছে। এখন পাথর দিয়ে সিঁড়ি দু-টির মুখ বন্ধ। এই গোলাঘরে একদিকে দাঁড়িয়ে কথা বললে, অনেকক্ষণ তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এর মাথায় উঠে উত্তরে গঙ্গা অন্যদিকে বস্তি আর চারদিকে ক্ষেত্রের শোভা অপূর্ব। ব্যানৃফার্লী-নক্সের স্মৃতি-মন্দির আর একটা দেখবার জিনিস —১৭৬৩ খৃস্টাব্দে তৈরি। বাঁকিপুর-স্টেশনের কিছু দক্ষিণে সরকারী কৃষি-বিভাগের কারখানা দেখবার মতন —তৈরি ১৯০৬ সালে। তখন ওখানকার কর্তা ছিলেন শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়, আর উদ্যোগী সভ্য ছিলেন পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ। এখানে বাঙ্গালীদের ইস্কুল-টিস্কুল অনেক, কলেজও তখন হয়েছে।

সেই সময়ে পুরাতত্ত্ব-বিভাগ থেকে লোকজন রাজগৃহ, গয়া ইত্যাদি ঐতিহাসিক স্থানের কাছাকাছি গুহা আর অন্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান সব ঘুরে ঘুরে নানা ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করছিলেন। পূর্ণেন্দুবাবুর উদ্যোগে এখানে একটি কৃষিশিল্প-প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রদর্শনী আগে হতো সোণপুর-মেলার সময়ে, তখন বাঁকিপুরে উঠে এসেছে। —তখন এখানে প্রবাসী-সংঘ-টংঘ বাঙ্গালীদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী পাটনা আর বাঁকিপুরের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ১৮২০ সালে খাঁ-বাহাদুর খোদা-বক্স এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই বাড়িটি প্রকাণ্ড দোতলা অট্টালিকা। দু-টি সিঁড়ি নানা রঙের পাথরে আর শ্বেতপাথরে মোড়া। এর অলিন্দ আর কোনো কোনো প্রকোষ্ঠ কলাই আর মীনা করা টালিতে তৈরি। সুপ্রশস্ত পাঠাগার, এদেশের পুঁথি-সংগ্রহের অন্যতম স্থান। চীন, মধ্য এশিয়া, পারস্য আর ভারতের চিত্রকলার মূল্যবান বহু আদর্শ এখানে রাখা ছিল। তার অধিকাংশই আনা হয়েছিল মোগল সম্রাটদের লাইব্রেরী থেকে। আর্মেনিয়ান ব্যারিস্টার মি. পি. মানুক নিজে যে-সমস্ত ভারতীয় চিত্র, ভাস্কর্য-মূর্তি আর প্রতিমূর্তির

ক্ষুদ্র আদর্শ সংগ্রহ করেছেন তা ভারতে অতুলনীয়। তার কোনো কোনো চিত্রে বর্ণপাত আর ভাবব্যঞ্জনায় রাজপুত আর ভারতীয় মোগল-চিত্রকলার উৎকর্ষের চূড়ান্ত নিদর্শন রয়েছে। মানুক তখন নন্দলালের একাধিক ছবি কিনেছিলেন, সে-কথা আমরা আগে বলেছি। তখন বাঙ্গালীদের মধ্যে ওখানে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন গুরুপ্রসাদ সেন। ইমাম ভাইরাও তখন পাটনার গৌরব। স্থানীয় ব্যারিস্টার সচ্চিদানন্দ সিংহ ছিলেন প্রসিদ্ধ। আর সবচেয়ে গৌরবের কথা, লর্ড সিংহ তখন বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণর হয়ে পাটনার তক্তে বসে আছেন। শান্তিনিকেতনের পাশের গাঁ —রায়পুরে তাঁর বাড়ি।

প্রিয়নাথ সিংহের সঙ্গে ১৯০৭ সালে নন্দলাল যখন পাটনায় যান তখন উঠেছিলেন ওঁরা প্রিয়নাথবাবুর বন্ধু আর রামকৃষ্ণ-মিশনের শিষ্য জালানের বাড়িতে। এবারে দলবল নিয়ে পাটনায় একটি ধর্মশালায় দু-তিন দিন থেকে, যা যা দেখবার মোটামুটি দেখে, ওঁরা রওনা হলেন গয়ার দিকে।

॥ গয়া-ভ্রমণ, ১৯২১ ॥

পাটনা থেকে গয়া যাওয়া হলো; থাকা হলো দু-তিন দিন। গয়া-মাহাত্ম্যে নন্দলাল বিশ্বাসী। পিণ্ডদানাদি শাস্ত্রীয় আচরণ ওখানে গিয়ে যা সব করার দরকার, সে সবই করলেন তিনি।

গয়ার পাণ্ডারা 'ধামী' ব্রাহ্মণ। গয়ার 'ধামী-টোলা'য় এঁদের বাস। এঁরা অশাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ। হিন্দু না বৌদ্ধ তা নিয়েও মতভেদ বিস্তর। যাই হোক্ গয়ার এঁরা তীর্থগুরু। নন্দলাল ঐ সময়ে যখন গয়া গেলেন তখন সহায় পাঁড়ে, দীননাথ পাঁড়ে, জেহল পাঁড়ে, জগমোহন পাঁড়ে, কিশুন পাঁড়ে —এঁরা ছিলেন খুব প্রসিদ্ধ আর ধনী 'ধামী'। বায়ুপুরাণে ধামী হলেন 'ধানুষ্ক'। এঁরা যাত্রীদের নিয়ে সেকালে প্রেতশীলায় যখন পিণ্ডদান করাতে যেতেন, সঙ্গে নিতেন তীর-ধনুক —দস্যু-ডাকাত তাড়াবার জন্যে। এর জন্যে তখন এঁরা বাঙ্গালী যাত্রীদের কাছ থেকে পাঁচ সিকে বা এক টাকা পাঁচ আনা বৃত্তি আদায় করতেন। এর অর্ধেক

আবার তাঁর কর দিতেন গয়ালী বৌদ্ধসাধী পঞ্চাননকে। ইনি ছিলেন পাটনা-জাত। ধামীদের আদি নিবাস হলো দুমকা আর মালদহ জেলার মধ্যিখানে 'ধামীনকোহ'-পর্বতের তরাইভূমিতে। সেইজন্যে গয়ায় এরা ধামী' নামে পরিচিত। প্রেতশীলার পাণ্ডা গয়ার ধামীদের মধ্যে ভাগ করা আছে। গয়ায় ৺পিতামহেশ্বর শিবের কাছে ৺শীতলা দেবী আছেন। তাঁর পাণ্ডাও ধামীদের মধ্যে ভাগ করা আছে।

গয়া-শ্রাদ্ধের শেষে গয়ালীগণ সুফল' দান করে থাকেন। সেই রকম পঞ্চতীর্থের শ্রাদ্ধকর্মের শেষে ধামীরাও রামশীলা-পর্বতের পাদদেশের অশ্বত্থবৃক্ষমূলে সুফল' দিয়ে থাকেন। এই পঞ্চতীর্থে বাঙ্গালীদের কাছ থেকে এক টাকা পাঁচ আনা পশ্চিমাদের কাছ থেকে এক টাকা পাঁচ পয়সা ভেটী আদায় নেওয়া হয়। এর কিছু অংশ গয়ালীদের। এর নাম ব্রহ্মোত্তর।

শীতলা-মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বাঁ দিকে একটি শিলালিপি আঁটা আছে। এই শিলালিপি হচ্ছে মগধের রাজা যক্ষপালের। যক্ষপাল শীতলাদেবীর এই পুকুর কাটিয়ে দিয়েছিলেন। এই লিপি দ্বাদশ শতাব্দের দেবনাগরী অক্ষরে লেখা।

প্রপিতামহেশ্বর। এই শিব-মন্দির শক্ত পাথরে তৈরি। স্থাপনা বৌদ্ধযুগের। ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়ে প্রপিতামহেশ্বর সম্ভব হিন্দু হয়েছেন। এই মন্দিরে ২-একটি প্রস্তর ফলক আছে

মঙ্গলাগৌরী। দেবীভাগবতে মঙ্গলা-পীঠের উল্লেখ আছে। দেবীর আদ্যাস্তোত্রে গয়ার দেবী গায়ত্রীরূপে বিরাজমান এখানে ভৈরব হলেন গদাধর। তাঁর মন্দির বিষ্ণুপদের পাশেই। বিষ্ণুপদের মন্দির পাথরে তৈরি খুব সুন্দর। চূড়ায় স্বর্ণকলস আর পতাকা। প্রেতশীলা' এখান থেকে তিন ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে। আর বুদ্ধগয়া সাড়ে তিন ক্রোশ দক্ষিণে। যেতে হতো গাড়ি একা, টঙ্গা বা পালকি করে। গয়ায় বহু দেবদেবীর নতুন আর পুরানো মন্দির রয়েছে। এখানে ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ার বিবরণ আছে গরুড়পুরাণে আর বায়ুপুরাণে।

সপ্তম শতাব্দে হিউয়েনৎ-সাঙ গয়াভ্রমণ করে লিখেছিলেন — যে বোধিদ্রুম তলে বুদ্ধদেব নির্বাণলাভ করেন মহারাজ শশাঙ্ক সেটি নাকি উপড়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধগয়ার পিপ্পল-বৃক্ষটি যমরাজের পোঁতা বলে হিন্দুদের বিশ্বাস। বৌদ্ধেরা

নাকি ছাপরা, হাজারীবাগ ইত্যাদি জেলায় ছিল, 'ধানুক'রা হলো এঁদেরই বংশধর। —এঁরা বলেন, —এ-গাছ স্বয়ং বুদ্ধের পোঁতা। যাই হোক্, গয়ায় পাদ-পূজা, সুফল-গ্রহণ, পিণ্ডদান-ক্রিয়া বৌদ্ধ কিংবা প্রাগার্য আদিম ব্যাপার, সে আলোচনায় আমাদের দরকার নাই।

ভস্মকূট-পর্বতের শিখরে ৺মঙ্গলাদেবী আছেন। এই পর্বতে ভীমগড়া, পুণ্ডরীকাক্ষ, মার্কণ্ডেয় শিব, জনার্দন, গো-প্রচার, আম্রসেচন, তারকব্রহ্ম তীর্থ। মঙ্গলাগৌরীর পশ্চিমে ক্ষীরসাগর তীর্থ ; আর এর কাছেই 'স্বর্গদ্বার'।

ব্রহ্মযোনি-পর্বতের ওপর মন্দিরটি অনেক দূর থেকে দেখা যায়। এ হলো অহল্যাবাঈ-এর কীর্তি। পাহাড়টি উঁচু ৪৭৫ ফিটের মতন। পাহাড়ের নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত সিঁড়ি রয়েছে। চুড়োয় মন্দিরের ভেতরে ব্রহ্মার প্রাচীন মূর্তি। কিন্তু এঁর মুখ চারটি নয়, পাঁচটি। ইনি নিশ্চয়ই শিব। এখন পুজো হচ্ছে পঞ্চমুখী দেবী বলে। মূর্তির সামনে একটি ঘোড়া। কেউ কেউ বলেন, এ হলো তৃতীয় জৈন তীর্থঙ্কর অশ্ববাহন শম্ভুনাথের মূর্তি। সিঁড়ির ৪৪০-টি ধাপ। সিঁড়ির আকার সাপের মতন। মন্দিরটি বাজ পড়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। সম্প্রতি সংস্কার হয়েছে। পশ্চিমে পুলিশ লাইনের দিক থেকেও এই পাহাড়ে ওঠবার পথ রয়েছে। পাহাড়ের নিচে প্রস্তর-ফলক-গাঁথা গায়ত্রী-মন্দির। পাহাড়ের শিখরের কিছু নিচে 'ব্রহ্মযোনি'। হিন্দুদের বিশ্বাস, এর মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে বের হয়ে এলে, আর জন্ম-মৃত্যু হয় না। গুর্ণিয়া পাহাড় থেকে এসে, বুদ্ধগয়ায় তপস্যা করবার আগে, বুদ্ধ এখানে থেকে কিছুকাল তপস্যা করেছিলেন। হিন্দুর এই পঞ্চক্রোশী প্রেতপুরীতে তপস্যা করেই বুদ্ধ মৃত্যুকে চিনতে পেরেছিলেন। ব্রহ্মযোনির কাছে আদি-সাবিত্রী দেবী। তার নিচে কাকশীলা, উদ্বন্ত-কুণ্ড আর সাবিত্রী-কুণ্ড। সাবিত্রী-কুণ্ডের পাশে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। পর্বত-শিরে যে শক্তিমূর্তি রয়েছে তার নিচে একটি শ্লোক লেখা। তা থেকে বোঝা যায়, ১১৩৩ খৃস্টাব্দে এর প্রতিষ্ঠা।

ব্রহ্মযোনি পাহাড় হলো মাড়নপুর গাঁয়ে। এই গাঁয়ের তখন জমিদার ছিলেন কলকাতার শ্যামবাজারের প্রমথনাথ মিত্র। ব্রহ্মযোনির কিছু দূরে ভস্মকূট পাহাড়ে জনার্দনদেবের মূর্তি। তাঁকে দিতে হয় দই-

মাথা পিণ্ডি। গয়াক্ষেত্র পঞ্চক্রোশী। ব্রহ্মযোনি-পাহাড়ের ওপর বুদ্ধ বহুদিন বাস করে, প্রিয়শিষ্য আনন্দকে বৌদ্ধ ধর্ম-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই পর্বত হলো গয়ার দক্ষিণ সীমা। এর নিচে ক'টি ব্রহ্মযোনি-পাহাড়ের শিখরে একটি কুণ্ড। তার নিচে আসল ব্রহ্মযোনি; অর্থাৎ পাহাড়ের নিচের দিকে প্রস্তরখণ্ড থেকে দরজার মতন একটি গুহা। এই গুহার দ্বার দিয়ে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বের হয়ে আসতে পারলে মুক্তি অবধার্য। মন্দিরের নিচে 'রাধাশ্যামী' প্রমুখ কতকগুলি সিদ্ধপুরুষের আসন আর গুহা। ভৈরব-মন্দিরের কিছু ওপরে হনুমানজীর মঠ। এই পাহাড়ের কাছেই পূবদিকে ৺অক্ষয় বট। এখানে গয়ালীরা যাত্রীদের সুফল-দান করে থাকেন। এখানে কতকগুলি পুরাতন মন্দির আর প্রস্তর-লিপি রয়েছে।

স্মার্ত রঘুনন্দনকে নিয়ে গয়ার 'পঞ্চক্রোশী' সম্পর্কে একটি গল্প আছে। 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব'-গ্রন্থ রচনা করে স্মার্ত রঘুনন্দন এক সময়ে গয়ায় এসেছিলেন শ্রাদ্ধ করবার জন্যে। স্থানীয় গয়ালীরা অর্থপ্রাপ্তির আশায় তাঁকে বিষ্ণু-মন্দিরের ভেতরে পিণ্ডদান করতে দেননি। তাতে স্মার্ত বললেন,—আমি গরীব ব্রাহ্মণ, তোমাদের যোগ্য অর্থ কোথায় পাব। কিন্তু গয়ালীরা তাঁকে কোনো মতে বিষ্ণুমন্দিরে যেতে দিলেন না। তাতে তিনি শাস্ত্র দেখিয়ে বললেন, পঞ্চক্রোশী গয়ার মধ্যে কেবল আমি নয়, বঙ্গবাসীমাত্রেরই পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তখন গয়ালীরা দেখলেন, পূর্বরাজ্য নষ্ট হয়ে যায়। এতে তাঁদেরই আয়ের সমূহ ক্ষতি। কারণ, গয়ায় এসে বাঙালীরাই অর্থ দেয় সবচেয়ে বেশি। তখন তাঁরা বহু অনুনয়-বিনয় করে তাঁকে ক্ষান্ত করে, মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে, পিণ্ডদান করিয়েছিলেন। গয়ার বিষ্ণুপদে নন্দলাল পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করেছিলেন। তিনি ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে, গয়ার পরপারে রামশীলা-পাহাড়ে পিণ্ড দিয়েছিলেন। পাহাড়টি প্রায় ৫০০ ফুট উঁচু। প্রাচীন মন্দির, আর স্তূপের ভগ্নাবশেষ। নন্দলাল বালির পিণ্ড দিয়েছিলেন ফল্গুনদীতে। গয়ার বিষ্ণুপদ, মন্দির আর পিণ্ডদান ইত্যাদির নানা ঘটনা সম্পর্কে আমরা পূর্বে উত্তরভারত-ভ্রমণ প্রসঙ্গে কিছু বলেছি।

গয়ায় পিণ্ডদান করতে হলে, নিজের ভূমিতে বসে পিতৃকার্য করতে

হয়। না-করলে, যিনি সেই ভূমির মালিক, ফললাভ হয় তাঁরই পিতৃপুরুষের। সেইজন্যে গয়ালীরা যাত্রীদের কাছ থেকে তাঁদের সাময়িক জমিদারির বৃত্তি আদায় করে থাকেন।

ভৈরবস্থানের কাছাকাছি কতকগুলি তীর্থ আছে —গোদাবরী, গৃধ্রেশ্বর, ঋণমোচন, পাপমোচন, বশিষ্ঠ-কুণ্ড, কাশী-খণ্ড, মহা-কাশী, আকাশ-গঙ্গা পাতাল-গঙ্গা —এই সব।

গয়ার কাছে 'বরাবর'-পর্বতের গুহাগুলি অশোক আর তাঁর নাতি সম্পাই আজীবিক-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের জন্যে দান করেছিলেন। মৌর্য-যুগের ভাস্কর্য আর চিত্রকলার জীবন্ত নিদর্শন হলো এগুলি। পাহাড় খোদাই করে গুহা তৈরি করা হয়েছিল। গুহার গায়ে নানাবিধ চিত্র খোদাই করা ছিল। গুহাগাত্রের উজ্জ্বল মসৃণতা আজও মলিন হয়নি। স্থাপত্যকর্মের এগুলি মূল্যবান নিদর্শন। এর শিল্পকলা ভারতের গৌরবের বস্তু। এই আজীবিক-গুহাগুলি অজন্তা, বাগ ইত্যাদি পরবর্তী সঙ্ঘারামগুলির পূর্বাভাস। কারুনৈপুণ্য বিস্ময়ের বস্তু। নন্দলাল এ-সব দেখার জন্যে ১৯৩৬ সালে সেখানেও গিয়েছিলেন। সে-কথা যথাসময়ে বলা হবে। এবারে গয়া থেকে এঁরা গেলেন বুদ্ধগয়া।

॥ বুদ্ধগয়া-ভ্রমণ, ১৯২১ ॥

'ধামী'-ব্রাহ্মণদের দেশে, নিরঞ্জনা নদীর তীরে, প্রেতপুরীতে, চৈত্য-তরুর তলায় বসে সিদ্ধার্থ বোধিলাভ করে গোপকন্যার পরমান্ন খেয়েছিলেন —ভারতধর্মের বিবর্তনে সে-এক আশ্চর্য ঐতিহ্যপরম্পরার সংমিশ্রণ। ন-তলা মহাবোধি গন্ধকুঠী নির্মাণ করে দিয়েছিলেন --সেই স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যে মহারাজ অশোক। শুঙ্গ-যুগে এক সামন্ত রাজা ইন্দ্রাগ্নিমিত্র এই বোধিবৃক্ষ আর বজ্রাসনের ওপরে অশোকের মন্দিরের চারদিকে একটি পাষাণ-বেষ্টনী রচনা করে দেন। এখনকার মন্দিরের চারদিকে যে পাষাণ-বেষ্টনী সে তৈরি হয়েছিল খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতাব্দে, ব্রহ্মমিত্র আর তাঁর পত্নী নাগদেবার আদেশে। বেষ্টনীর বহু স্তম্ভ ও সূচী বুদ্ধগয়ার মহন্তগণ

নিজেদের ঘরে লাগিয়েছিলেন। ১৯০৭ সালে সেগুলি যথাস্থানে রাখা হয়েছে।

বুদ্ধগয়ার মন্দির-সংস্কারের সময়ে, মন্দিরের পেছনে বোধিবৃক্ষমূলে বজ্রাসনের নিচে হুবিষ্কের স্বর্ণমুদ্রার ছাঁচ পাওয়া গিয়েছিল। হুবিষ্কের সময়েই বজ্রাসন স্থাপিত হয়। কারণ ঐ আসনের নিচে হুবিষ্কের একটি স্বর্ণমুদ্রাও রাখা ছিল। পরে মুদ্রাটি চুরি হওয়ায় তার ছাঁচটি রাখা হয়। বোধিবৃক্ষের তলায় বজ্রাসনের যে আচ্ছাদন রয়েছে, তার স্থানে স্থানে কুষাণ-অক্ষরে খোদাই লিপি রয়েছে। দেখে মনে হয়, মহাবোধি-বিহার কুষাণযুগে নতুন করে করা হয়েছিল। প্রবাদ আছে, প্রথমে কনিষ্ক পাটলিপুত্র আক্রমণ করে মহাস্থবির বুদ্ধঘোষকে গান্ধারে নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৩২০ বঙ্গাব্দে পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ নতুন করে খনন করবার সময়ে একটি মৃন্ময় মুদ্রা (Terracotta plaque) পাওয়া গিয়েছিল। এই মুদ্রায় মহাবোধি বিহারের ছবি আর কতকগুলি খরোষ্ঠী অক্ষর আছে। এ-সব হলো খৃষ্টপূর্ব দু-শতাব্দ আগের কথা।

বুদ্ধগয়ায় মন্দিরের প্রাঙ্গণ আর একতলা পর্যন্ত বহুকাল ধরে বালির নিচে পোঁতা ছিল। ১৮৮০ সাল থেকে বারো বছর ধরে মহাবোধি-মন্দিরের খনন আর সংস্কার চলে। সেই সময়ে লাল-পাথরে তৈরি একটি বোধিসত্ত্ব-মূর্তির আবিষ্কার হয়। এই মূর্তিটি মগধে শকদের সময়কার। সম্ভব, মথুরায় তৈরি করিয়ে মহাবোধিতে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পঞ্চম শতাব্দে ফা-হিয়েন এদেশে এসে বুদ্ধগয়া দর্শন করেছিলেন।

সপ্তম শতাব্দে হিউয়েনৎ-সাঙ্ লিখে গেছেন, কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ কেটে ফেলে নষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু, সে নাকি অশোকের বংশধর মগধরাজ পূর্ণবর্মার যত্নে আবার বেঁচে উঠেছিল। তুঙ্গধর্মাবলোক নামে এক রাজার একখানি শিলালিপি বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত হয়েছিল। ইনি ছিলেন রাজ্যপালদেবের শ্বশুর। দ্বিতীয় গোপালদেবের সময়ে শক্রসেন নামে এক ব্যক্তি বুদ্ধগয়ায় একটি বুদ্ধ-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মূর্তিটির পাদপীঠমাত্র পাওয়া গিয়েছে। মহাবোধি-মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি আধুনিক মন্দিরে (১৯২১ খৃস্টাব্দে) ক'টি বুদ্ধমূর্তি পুজো পাচ্ছেন পঞ্চপাণ্ডবের নামে। এদের মধ্যে একটি বুদ্ধমূর্তি

মহীপাল-দেবের সময়ে প্রতিষ্ঠিত। গন্ধকুটী দু-টির সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই বুদ্ধমূর্তিটি। লক্ষ্মণসেন-দেবের সময়ে বুদ্ধগয়ায় দু-টি শিলালিপি পাওয়া গেছে। এ দু-টীতে তাঁর রাজ্যাভিষেক কালের উল্লেখ আছে। লিপিতে লক্ষ্মণাব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বুদ্ধগয়ায় কান্যকুব্জের রাজা ব্রাহ্মণ বিজয়চন্দ্রদেবের পুত্র জয়চন্দ্র-দেবের নামযুক্ত একখানি শিলালিপিও পাওয়া গেছে। এই লিপি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দের শেষের দিকে। যাই হোক্, এর মানে হলো, বুদ্ধগয়া হিন্দুবৌদ্ধনির্বিশেষে একটী ভারততীর্থরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত, বোধ হয় সেই বুদ্ধের বোধিলাভের সময় থেকে, কিংবা তাঁর অনেক আগে থেকেই। ১১৭০ খৃস্টাব্দে বুদ্ধগয়া সেনবংশের রাজাদের অধিকারে ছিল। ঐ বছরে রাজা অশোকমল্লদেব মহাবোধি-মন্দিরে একখানি শিলালিপি স্থাপন করেছিলেন। এতে ব্যবহার করা হয়েছে লক্ষ্মণাব্দ। এতে প্রমাণ হয়, বুদ্ধগয়া কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্রের অধিকারভুক্ত ছিল ঠিকই; কিন্তু ১১৯৩ খৃস্টাব্দে আবার দখলে আসে সেন-রাজাদের। এর পরের ইতিহাস কিন্তু বড়ো করুণ। সমগ্র মগধদেশ এই সময় থেকেই মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজির আক্রমণে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল।---

পূর্বভারতের এই সব বৌদ্ধ আর হিন্দু কীর্তি দর্শন করে চিত্তঘট ভরিয়ে নিয়ে ভারতশিল্পী নন্দলাল সদলে ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে ১৯২১ সালের পুজোর ছুটী ফুরোবার আগেই। শান্তিনিকেতনে ওঁরা ফিরে আসবার পরে হলো 'বিশ্বভারতী'-প্রতিষ্ঠা।

॥ লগ্নিকা ॥

নালন্দা-তীর্থের মাটি এনে আচার্য নন্দলাল শান্তিনিকেতনের মাঠে ছড়িয়ে দিলেন। ঠিক এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল অনেক বছর আগে। ইটালীর একজন পাদ্রী জেরুজালেম থেকে কিছু মাটি এনে পিসা নগরের গির্জের উঠনে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিছুকাল পরে দেখা গেল, গির্জের সেই উঠনে একটি নতুন গাছে নতুন নতুন ফুল ফুটেছে। সেই ফুল বর্ণে, গড়নে আর গন্ধে অভিনব। সে-রকম ফুল ইটালীতে তার আগে কখনও দেখা যায়নি। সে-রকম ফুল জেরুজালেম-তীর্থেও

ছিল না কোন দিন। —এই ঘটনার উল্লেখ করে ওয়াল্টার পিটার-সাহেব য়ুরোপীয় রেনেসাঁর রীতি আর প্রকৃতি সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে যা বলেছেন সে হলো যে-কোনো জাতির ভাব-জীবনের যে-কোনো নব-উন্মেষের একটি নিয়মের দিক্‌নির্ণয়। দেশের মাটিতে ভিন্‌দেশের মাটি এসে মিশলে সেই মেশোল মাটিতে সত্যিই সঞ্চারিত হয়ে থাকে একটি নতুন মায়া। সে-মাটি প্রসূতি হয়ে থাকে নতুন ফুলের।

য়ুরোপীয় রেনেসাঁর অন্তরের আরও একটি সত্য মনীষী-ঐতিহাসিকের চোখে ধরা পড়েছিল। অতীত ভাব-জগতের বিচিত্র রূপ এসে বর্তমানের ভাব-জীবনের ধ্যানে চিত্রিত হলে, সে-ও উন্মেষিত করে থাকে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা আর শক্তি। গ্রীক্‌ ক্ল্যাসিক্‌সের সঙ্গে নতুন অন্তরঙ্গতার ঘটনা য়ুরোপীয় সাহিত্য-ভাবনার আর শিল্পকলার নতুন অভ্যুদয়ের সূচনা করেছিল। দেখা গেছে যে, পুরাতন ভাব-জগতের মাটিও নতুন এক কল্প-জগতের মাটির মতন কাজ করতে পারে। —সে পিসার গির্জের উঠনের নতুন ফুলের মতন নতুন সৃষ্টি করে থাকে।

এই নীতি বা নিয়মটি সাহিত্যের আর শিল্পের জগতে আরও বড়ো একটি সত্য। অতীতের যে-সাহিত্য বহু কবির, বহু মনীষার ও বহু আচার্যের প্রতিভার সৃষ্টি, অতীতের যে-শিল্পকলা বহু অভিজ্ঞ রূপদক্ষের অবদান - সে-বস্তু কখনও পুরাতন হয় না। তার মধ্যে নিহিত থাকে বিচিত্র প্রেরণাময় একটি সজীবতা। পুরাতন বাঙ্গালী কবি রামপ্রসাদের ভাষায় একে বলা যায় 'মনোময় মাণিক্য', জয়রুদ্দির ভাষায় 'মনের মানিক'। বর্তমানের ভাবনা আর কল্পনার পক্ষে সেই মাণিক্যের স্পর্শ একান্ত প্রয়োজন। সাহিত্য আর শিল্পকলার রূপ ও প্রকৃতি ঠিক নদী-প্রবাহের মতন —সরোবরের জলের মতো নয়। সে হলো বহু গুণী-শিল্পী আর ভাবুকের, বহু কবি, আচার্য ও মনীষীর প্রতিভার সম্মিলিত পুণ্য-সলিলের ধারা। সমগ্রতার মধ্যে এর রূপ সত্য ও সার্থক। ঐতিহ্যের ধারা খণ্ডিত করা যায় না কখনও। প্রত্যেক জাতির সাহিত্যের আর শিল্পকলার ইতিহাসের শিক্ষা হলো—ভ্রান্ত নব্যতার অর্বাচীন ঔদ্ধত্য পৌরাণিক ঐরাবতের মতন সাহিত্য ও শিল্প-ঐতিহ্যের গঙ্গাপ্রবাহকে বাধা দিতে গিয়ে নিজেই ভেসে গিয়েছে শোচনীয়ভাবে। ভারতীয় সঙ্গীতের

গুণিগণ প্রবেশার্থী শিষ্যের শিক্ষারম্ভের প্রাক্‌কালে শিষ্যকে নিজে একটি গান গেয়ে শুনিয়ে থাকেন। এবং শিষ্যকে গুরুর সেই গীতধারার অনুবর্তন করতে হয়। —'গুরুমত যব নাদ গাওয়ে তব পাওয়ে সরস্বতীকা প্রসাদ'। অর্থাৎ সরস্বতীর প্রসন্নতা লাভ করতে হলে শিক্ষার্থীকে 'গুরুমত' রীতি অনুযায়ী সাধনা করতে হবে। শিল্পী-জগতে প্রবেশলাভের পূর্বেও ছিল এই নিয়ম। একখানি 'গুরুমত' ছবি এঁকে তাঁকে দেখিয়ে নিয়ে, গুরুর বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গুরুর মুখ দিয়ে বলিয়ে নিতে হবে —'হাথ পুখতা হৈ'। স্বদেশের পুরাতন ঐতিহ্যও এক-হিসাবে ঐতিহাসিক 'গুরুমত' – সার্থক প্রেরণার প্রবাহ। —(আ.রা. প., ৮-৮-১৯৮৬ থেকে অংশতঃ নির্বাচিত)। আচার্য নন্দলাল নালন্দার স্বপ্ন নিয়ে ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে! ওঁরা ফিরে আসার পরে 'বিশ্বভারতী'র নতুন বছরের কাজ শুরু হলো ১৯২১ সালের পৌষ মাস থেকে।

॥ শান্তিনিকেতন-সংবাদ, ১৯২১ ২২ ॥

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে লিখলেন, —"বোলপুরের নিকটবর্তী শান্তিনিকেতন পল্লীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বভারতী' নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বৎসরের কার্য আগামী পৌষ মাস হইতে আরম্ভ হইবে। তাহার বিজ্ঞাপন প্রবাসী-বিজ্ঞাপনীর মধ্যে দৃষ্ট হইবে। যাহাতে নূতন বৎসর হইতে কতকগুলি ছাত্রী আশ্রমে পড়াশুনা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থাও হইতেছে। বিশ্বভারতীতে এখন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা আছে :—

'ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে —সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী, মরাঠী, মৈথিলী, সিংহলী, ফরাসী জার্মান ও গ্রীক্। দর্শন বিভাগে —অভিধর্ম ও বৌদ্ধদর্শন। কলা-বিভাগে —ভারতীয় চিত্রকলা। সঙ্গীত-বিভাগে —গান ও বাদ্য। শ্রীযুক্ত সদ্ধর্মবাগীশ ধর্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত সী. এফ্. এণ্ড্রুজ, শ্রীযুক্ত

এইচ. মরিস্, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য প্রভৃতি অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

ইহা ছাড়া সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সিলভঁা লেভি বিশ্বভারতীতে আগমন করিয়াছেন। ইনি ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ে অধ্যাপনা করিবেন, ও ছাত্রগণকে গবেষণার কার্য বিশেষরূপে শিক্ষা দিবেন।

অধ্যাপক লেভির প্রারম্ভিক বক্তৃতা আগামী ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ২০শে নভেম্বর, রবিবার অপরাহ্নে হইবে। তৎপরেও তাঁহার ব্যাখ্যান প্রতি রবিবার অপরাহ্নে হইবে। এরূপ বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে কলিকাতার ও নিকটবর্তী অন্যান্য স্থানের সর্বোচ্চশ্রেণীর ছাত্র ও অপর জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ উপদেশ শুনিয়া আসিতে পারিবেন, এবং সোমবারে পুনর্বার স্ব স্ব স্থানে আসিয়া নিজ নিজ কার্য করিতে পারিবেন। এই সকল বিদ্যার্থী বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ মহাশয়কে আগে হইতে খবর দিতে পারিলে ভাল হয়।'

১৯২১ সালের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন-আশ্রমের ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। এই উৎসবে বিশ্বভারতীর উত্তর-বিভাগের চিত্রশিল্পী আর পূর্ব-বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের আঁকা চিত্রাবলী মেলায় চিত্র-প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর ফলে, অনেক উদীয়মান অজ্ঞাত নবীন চিত্রশিল্পীর পরিচয় লাভ করা গিয়েছিল। তখন চিত্র-বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা তেরো চোদ্দ জনের বেশি ছিল না।

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে রামানন্দবাবু ১৩২৮ সালের মাঘ মাসের প্রবাসীতে লিখলেন, —'বিশ্বভারতীর কার্য আগে হইতেই চলিতেছিল। গত ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সভাপতিত্বে উহার নিয়মাবলী সভাস্থ সকলের সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ঐ সভায় আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য সিল্ভঁ্যা লেভি, ডাক্তার নীলরতন সরকার, প্রিন্সিপ্যাল সুশীলকুমার রুদ্র, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই বিশ্বভারতীর সভ্য হইতে পারেন।

ইহাতে ছাত্র-ছাত্রী উভয়েরই অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ছাত্রীদের বাস ও অধ্যয়ন সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য। বিশ্বভারতীতে প্রাচীন ও আধুনিক সর্ববিধ বিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারিবে। অবশ্য, সকল বিদ্যা শিখাইবার বন্দোবস্ত এখন হয় নাই, কিম্বা অদূর ভবিষ্যতেও না হইতে পারে। কিন্তু কোন প্রকার বিদ্যাকেই বাদ দেওয়া হয় নাই। কোন বিদ্যা শিখাইবার সামর্থ্য যখনই হইবে এবং উহা শিখিতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীও জুটিবে, তখনই উহা শিখাইতে আরম্ভ করা হইবে।'

১৯২২ সালের প্রথম দিকে চিত্র-বিভাগে আরো কিছু মূল্যবান চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছিল। ৭ই মাঘ সরোজনী নাইডুর কন্যা শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু এবং সরোজিনী দেবীর ভগ্নী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। মৃণালিনী দেবী ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাণীর সংগৃহীত প্রায় এক শত প্রাচীন মোগল, কাংড়া ও রাজপুত চিত্র সঙ্গে এনেছিলেন। তার মধ্যে আকবরের আমলের ইন্দো-পার্সীয়ান মিশ্রণ চিত্রও ছিল দু-একটি। ছবিগুলি প্রাচীন হলেও পূর্বকালের ওস্তাদ শিল্পীদের নকল চিত্রই এর মধ্যে ছিল বেশির ভাগ। দু-খানি মোগল বাদশাহের আকৃতি-চিত্র আর দু তিনখানি কাংড়া বা কাশ্মীরী আর একটি রাজপুত চিত্র নিপুণ-শিল্পীর কলমে আঁকা ছিল বলে মনে হয়। মোগল আমলের প্রাচীন চিত্রগুলি ছাত্রদের বিশেষভাবে দেখবার ও জানবার সুবিধের জন্যে কলাভবনের চিত্রশালায় সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। আশ্রমের সকলেই এই প্রদর্শনীতে যোগদান করেছিলেন। প্রদর্শনী সাজানো হয়েছিল —'সন্তোষালয়ে' তখনকার কলাভবনে।

১৯২২ সালের ফাল্গুন মাসের আশ্রম-সংবাদে দেখা যাচ্ছে, —এই সময়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমে যে সমাজ-কর্ম পরিচালিত হতো তারও একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নন্দলাল। সমাজকর্মের এই প্রচেষ্টা শান্তিনিকেতনের আশপাশে, এমন-কি দূর গ্রামেও প্রসারিত হয়েছিল। আশ্রম থেকে ২২ মাইল দূরে হলো জয়দেব-কেন্দুলি। সেখানে প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তির সময়ে চার পাঁচ দিন ধরে মেলা হয়ে থাকে। নানা স্থান থেকে বাউল, সন্ন্যাসী, দরবেশ প্রভৃতি এই মেলায় এসে সমবেত হন। মেলাতে তখন ২৫।৩০ হাজার লোক জমতো। শান্তিনিকেতন-

আশ্রম থেকে ক'জন অধ্যাপক আর ছাত্র কেন্দুলি গিয়ে চার দিন ধরে মেলার মধ্যে তাঁবুতে বাস করেছিলেন। যাতে অজয় নদীর ওপরের দিকের জল দূষিত না হয়, তার জন্যে শান্তিনিকেতনের দল বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন। ছ-টি বড়ো পুকুরে ওষুধ দিয়ে জল শুদ্ধ করা হয়েছিল। খাবারের দোকানের জলেও ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। দোকানে জলখাবার খেয়ে লোকেরা যে-সব শালপাতা বা ঠোঙ্গা রাস্তায় ও দোকানের আশে-পাশে ফেলে দেয় সেগুলো পচে উঠে স্বাস্থ্যহানিকর হয়ে ওঠে। —সেই সব পচা পাতার ঠোঙ্গা বিশ্বভারতীর কলা-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় তাঁর ছাত্রদের নিয়ে ঝুড়ি করে সরিয়ে ফেলতেন।

মেলাতে জল-বিতরণের চেষ্টা সফল হয়নি। রোজ সন্ধ্যায় ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে ছায়াচিত্র দেখিয়ে কালীমোহন ঘোষ, সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিনায়ক মাসোজী প্রভৃতি বুঝিয়ে দিতেন, লোকে খুব উৎসাহের সঙ্গে শুনতো। এ ছাড়া স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা চিত্র মেলায় স্থানে স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই কর্মে বিশেষ নেতৃত্ব ছিল নন্দলালের।

১৯২২ সালের সংবাদে দেখা যাচ্ছে, —কলাবিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করছেন। কলকাতায় ওরিয়েন্টল আর্ট সোসাইটি জার্মানীর চিত্র-প্রদর্শনীতে ছবি পাঠাবেন। শান্তিনিকেতন থেকে কলা-বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রদের প্রায় ২৩খানি ছবি এই উপলক্ষে সোসাইটিতে পাঠানো হয়েছে।

গরমের বন্ধের পরে, সম্প্রতি কলা-বিভাগ থেকে খোদাইয়ের কাজ (Engraving) কাপড় রং করার কাজ (Dyeing), বই বাঁধানোর কাজ (Book-binding), সূচীকর্ম বা সুজনী (Needle-work), দেওয়ালে ছবি আঁকা (Fresco) ইত্যাদি কাজের শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের দেবার আয়োজন করা হচ্ছে।

১৯২০ সালের শ্রাবণের পূর্ণিমা-রজনীতে শিশুবিভাগের নতুন ঘরে —'সন্তোষালয়ে' 'বর্ষামঙ্গল'-উৎসব হয়েছিল। সভাগৃহটি আশ্রমের মহিলারা বিচিত্র আলপনায় মনোরম করে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর কলা-বিভাগের অধিনেতা নন্দলাল, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর, অসিতকুমার

হালদার তাঁদের ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে সভাগৃহটি পুষ্পপত্রে সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, ভীমরাও শাস্ত্রী আর গানের দলের ছাত্র-ছাত্রীরা বর্ষার অনেকগুলি নতুন গান করেন। গুরুদেব স্বয়ং একলা যখন 'আজ আকাশের মনের কথা ঝর-ঝর বাজে' গানটি গাইছিলেন, তখন বাইরে শ্রাবণের ধারাও রাত্রির অন্ধকারে ঝরঝর ধারে ঝরছিল। গানের মধ্যে মধ্যে গুরুদেব 'ঝুলন', 'বর্ষামঙ্গল' এবং 'নিরুপমা' তাঁর এই তিনটি বর্ষার কবিতা আবৃত্তি করেন। বীণার ঝঙ্কার মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে মৃদু সঙ্গীতের মধ্যে মিশিয়ে যাচ্ছিল। মানুষে প্রকৃতিতে মিলে সেদিন যে সন্ধ্যাটির সৃষ্টি হয়েছিল, তা দুর্লভ সামগ্রী —জীবনে এমনতর সন্ধ্যা খুব বেশি আসে না।

গত ২৪ এ শ্রাবণ সায়াহ্নে ঐ স্থানেই বিশ্বভারতীর অধ্যাপক আচার্য শ্রীযুক্ত সিলভাঁ লেভি ও তাঁর সহধর্মিণীর বিদায়-সংবর্ধনা-উপলক্ষে একটি সভার অধিবেশন হয়। সভাগৃহটি এদিনেও বিশেষভাবে সাজানো হয়েছিল। স্বস্তি মন্ত্রপাঠ করে তাঁদিকে মালা চন্দন, বস্ত্র ও উত্তরীয় দান করবার পরে গুরুদেব তাঁদিকে সম্ভাষণ করে যে অভিভাষণটি উপহার দেন – সেটি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় সযত্নে চিত্রিত করে দিয়েছিলেন।

॥ বিদেশী মনীষীদের সঙ্গে যোগাযোগ ॥

সিলভাঁ লেভি সম্পর্কে নন্দলাল বলেন,—

'লেভি সাহেব হাগুালজির মস্ত বড়ো পণ্ডিত ছিলেন। শান্তিনিকেতনে স্বামী-স্ত্রীতে এলেন যখন তখন তিনি খুব বৃদ্ধ। মাথার সমস্ত চুলই বকের পালকের মতো সাদা। খুব মিশুক ছিলেন তিনি। এখানে মিশতেন লোকের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে। সন্তোষ মজুমদারের বাড়িতে গিয়ে তাঁর ছেলেদের নিয়ে আদর করতেন খুব। নিজেও ছিলেন হাসি খুশি স্বভাবের। শান্তিনিকেতনে কিছুদিন থাকার পরে কোট-প্যাণ্ট ছেড়ে লেভি সাহেব আমাদের পোষাক পাজামা-পাঞ্জাবী ধরেছিলেন। ধুতি-চাদরও পরতেন মাঝে মাঝে।

'লেভি সাহেবের বক্তৃতা আরম্ভ হলো আম্রকুঞ্জে। মাটিতে দাঁড়িয়ে আমগাছের ঠেস-দেওয়া বোর্ডে লিখে লিখে তিনি তাঁর বক্তব্য বোঝাতেন। সেকালের শিক্ষকদের প্রায় প্রত্যেকেই তাঁর ক্লাসে আসতে লাগলেন। তা'ছাড়া, ইণ্ডোলজির বিষয় যাঁদের যাঁদের ভালো লাগতো বার থেকে তাঁরাও সবাই আসতেন তাঁর ক্লাসে। আর আসতেন তাঁর ক্লাসে স্বয়ং গুরুদেব। অধ্যাপক লেভির ক্লাস নেওয়া শেষ হলে গুরুদেব সংক্ষেপ করে তাঁর বক্তৃতা সবাইকে বুঝিয়ে দিতেন। ক্লাস চলতো প্রত্যহ। সেই সময়ে লেভি সাহেব বিশ্বভারতীতে চীনে ও তিব্বতী ভাষার চর্চাকেন্দ্র স্থাপন (১৯২১) করেছিলেন।

ঐ সময়ে আমি একটি ছবি আঁকি। নাম তার 'পার্থ-সারথি' এ আমার আগের পার্থ-সারথি থেকে আলাদা। পার্থ বসে আছেন, সামনে কৃষ্ণ। ছবিটি এঁকেছিলুম স্টোক্স (Stokes) সাহেবের জন্যে (১৯২২)। স্টোকস সাহেব বিবাহ করেছিলেন পাঞ্জাবী মেয়ে। স্টোক্স-দম্পতির ইচ্ছাতে তাঁদের জন্যেই ঐ ছবিটি করা হয়েছিল। তখন লেভি সাহেব দেখলেন আমার সেই ছবি। তাঁর পছন্দ হলো না তত। বললেন —বড়ো ডেলিকেট্ হয়েছে।

'কেন্দুলির মেলাতে গিয়েছিলেন লেভি সাহেব আর তাঁর স্ত্রী। গরুর গাড়িতে করে যাওয়া হচ্ছে। তিনি দু পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাচ্ছেন —মাঠের পর মাঠ। সহসা উল্লসিত হয়ে উঠলেন তিনি। ব্যাপার কি? তিনি বললেন দেখুন দেখুন, শান্তিনিকেতনের আইডীয়্যাল ছড়িয়ে পড়েছে সব জায়গায়! এই গ্রাম-দেশেও দেখুন সবাই উপাসনা করছে একসঙ্গে বসে। তখন তিনি ভালোভাবে সেই দৃশ্য দেখবার জন্যে পকেট থেকে ফিল্ড গ্লাস (field glass) বের করছেন। কিন্তু, তখন কী লজ্জা সে আমাদের। আসলে তখন সন্ধ্যের গোড়ায় গাঁয়ের মেয়েরা এসে দলবেঁধে বসেছে মাঠে করতে।

'বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ খুব বিরক্ত হয়েছিলেন বিদেশী পাণ্ডিত এদেশে এনে সংস্কৃত আর ভারততত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ানোর জন্যে। ছোট ভাই রবিকে ডেকে বকুনিও দিয়েছিলেন। কিন্তু গুরুদেব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইণ্ডোলজির শিক্ষণ-পদ্ধতি লেভি সাহেবকে দিয়েই প্রথম

আরম্ভ করলেন এদেশে। আমাদের বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায়ের মতন লোকও নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন তাঁর ক্লাসে। মাদাম লেভি ফরাসী ভাষা শেখাতে লাগলেন।

'লেভি সাহেবরা থাকতেন সুরপুরীতে। আশ্রমের উত্তর দিকে নূতন কুঠির পিছনে এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে কিনে নেন দিনুবাবু। আমরা সুরপুরীতে পরে ফ্রেস্কো করেছিলুম অনেক। সে পরে বলা হবে।

॥ অধ্যাপক উইন্‌টারনিজ্‌ ॥

'আমাদের আশ্রমে এলেন ইনি। সংস্কৃত-ভাষায় মহাপণ্ডিত। খ্যাতি সুধী-জগতে সর্বত্র। আমাদের গুরুদেবেরও মহাভক্ত তিনি। বেঁটে খাটো মানুষটি, খুব গম্ভীর প্রকৃতির। গুরুদেবের আশ্রমের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন তিনি। এখানকার সকলকেই তিনি শ্রদ্ধা করেন —চাকর থেকে শিক্ষক পর্যন্ত। যাকে দেখেন নমস্কার করেন তাকেই।

'উইন্‌টারনিজ সাহেবকে দেখলেই মনে হতো —ঋষিতুল্য লোক। সর্বদাই নিমগ্ন যেন কিসের ধ্যানে। লেভি সাহেবের মতো ইনিও বাঙ্গালা ভাষাটা বেশ রপ্ত করে নিয়েছিলেন। গুরুদেবের কবিতা পড়বেন বলে ইনি অতি অল্প-সময়ের মধ্যে —এই এক মাস কি দেড় মাসের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা শিখেছিলেন।

'উইন্‌টারনিজ সাহেব ছিলেন বড়ো নিরিবিলি লোক। কারও সাতে-পাঁচে থাকতেন না। লেভি সাহেবের মতন ইনিও ক্লাস নিতেন আম্রকুঞ্জে। গুরুদেব নিয়মিত আসতেন তাঁর ক্লাসে। শাস্ত্রীমশায়ও উপস্থিত থাকতেন। ওঁদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনা হতো অনেক।

'খুব ধীর আর শান্ত স্বভাবের লোক ছিলেন তিনি। সব সময়েই নিচু মাথা; আর সেই মাথায় প্রকাণ্ড একটা টাক। রাস্তায় হাঁটছেন, নমস্কার-প্রতিনমস্কারের পালা চলছে তো চলছেই, —তাদের সকলকে চিনতেনও না হয়তো; কিন্তু দরকার নেই চেনার; আশ্রমবাসী হলেই তাঁর কাছে সে শ্রদ্ধেয়।

॥ লেসনী ॥

'লেসনী ছিলেন উইন্‌টারনিজের ছাত্র, চেক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক। ইনি এলেন প্রাগ থেকে। লম্বা চওড়া চেহারা, মাথায় প্রকাণ্ড একটি টাক। ইনিও বাংলা শিখে নিলেন অল্পদিনে। শিখে নিয়ে গুরুদেবের কবিতা নাটক অনুবাদ করতে লাগলেন। অনুবাদ করলেন চেক ভাষায়। উনি এখান থেকে যাবার পরে গুরুদেব প্রাগে গেলেন (১৯২৬)। প্রাগে জারমান আর চেক ভাষায় অভিনীত 'ডাকঘর' নাটক দেখে এলেন। ইনি আমাদের গুরুদেবকে শ্রদ্ধা করতেন মহাপুরুষের মতন। আশ্রমের সঙ্গে তিনি যোগ রেখেছিলেন বরাবর। মারা গেলেন এই সেদিন মাত্র। আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল অল্প-স্বল্প।

॥ স্টেলা ক্রামরিশ ॥

১৯২১ সালে কবি যখন মধ্য-য়ুরোপে ভ্রমণ করছিলেন সেই সময়ে স্টেলা ক্রামরিশ নামে একজন তরুণী 'আর্ট-শাস্ত্রী'র সঙ্গে কবির দেখা হয়। তাঁর মননশীলতা, 'নৃত্যশীলতা' আর 'আর্টসমঝোতা' কবিকে মুগ্ধ করে বিশেষভাবে। তিনি তাঁকে বিশ্বভারতীতে আসবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে আসেন। তিনি এলেন শান্তিনিকেতনে ১৯২২ সালের শেষের দিকে। ডক্টর স্টেলা ক্রামরিশ ছিলেন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প-কলার থিওরিতে ডক্টরেট্-করা। তিনি এদেশে এসে দেখতেন সব-কিছু জার্মান শিল্প-অধ্যাপকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। ক্রমশঃ তিনি শিল্প-জগতে ভারতশিল্পের একজন প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচকরূপে প্রসিদ্ধ হন। তিনি ভারতবর্ষে প্রথম এসে বাঙ্গালা দেশে সাহিত্য ও শিল্পের জীবন্তভাবে চর্চা চলেছে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ভারতশিল্পের নবজাগরণের বিপুল উদ্যম তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু, পরে তিনি নব্য-ভারতশিল্পীদের কাজ দেখবার বা বোঝবার কোনো চেষ্টা করেননি।

পরে তিনি শান্তিনিকেতন-আশ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। প্রত্নতাত্ত্বিক হিসাবে শিল্পকলার বিচারে মন দিয়ে তিনি এই বিষয়ে গবেষণামূলক বহু গ্রন্থ লিখেছেন। আশ্রমে এসে ডক্টর স্টেলা গথিক-আর্টের ওপর একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি পরে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সুপারিশে স্যার আশুতোষের কৃপায় কলকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প-বিভাগের অধ্যাপক হন। তাঁর প্রসঙ্গ পরে সবিস্তর বলা হবে।

॥ আঁদ্রে কার্পেলেস ॥

এর মধ্যে বিখ্যাত শিল্পী আঁদ্রে কার্পেলেস বিশ্বভারতীতে কলা বিভাগের কারুশিল্পের কাজে কিছুকাল যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯২২ সালের ৭ই নবেম্বর কলম্বো পৌঁছিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে একত্রে আশ্রমে এলেন। তাঁর ভগ্নী সুজাঁ কার্পেলেস-ও ফ্রেঞ্চ-কাম্বোডিয়া থেকে আঙ্করভট-বিশেষজ্ঞ হয়ে আসেন শান্তিনিকেতনে। আঁদ্রে ছিলেন ভারতশিল্পের বিশেষ ভক্ত। অবনীবাবুর 'বাংলার ব্রতকথা' বইখানিতে আলপনার ছবি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন। শান্তিনিকেতনে তিনি কলাভবনে ছাত্রছাত্রীদের চিত্রিত করে বই বাঁধানোর রীতি শিখিয়েছিলেন। ফ্লাই শাটল্ তাঁতের কাজও কিছু করেছিলেন তিনি এখানে। কলাভবনের ছাত্র ভি. আর. চিত্রা শিখলেন শিল্পসম্মত বই-বাঁধাই-এর কাজ। আর শিখেছিল আমাদের 'সোকলা' সাঁওতাল। তার কথা পরে বলা হবে।

রবীন্দ্রজীবনীকার বলেন, —শান্তিনিকেতন-কলাভবনের অন্তর্গত 'বিচিত্রা' নামে কারুসংঘ কার্পেলেসের চেষ্টাতেই স্থাপিত হয়। এই বিষয়ে আঁদ্রে কার্পেলেস 'Vichitra'-নাম দিয়ে ১৩২৯ সালের চৈত্র সংখ্যায় শান্তিনিকেতন-পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্যারিসে আঁদ্রের বাড়িতে থাকার সময়ে শ্রীমতী প্রতিমাদেবী য়ুরোপীয় পটারীর কাজও শিক্ষা করেন। পরে দেশে ফিরে তিনি পটারীর কাজ করেছিলেন কুটীর-শিল্প হিসাবে। শ্রীনিকেতনের শিল্পসদনে যে 'পটারী'-বিভাগ খোলা হলো তার প্রবর্তক হলেন শ্রীমতী প্রতিমা দেবী।

॥ বোগদানফ (Bogdanav)

'ইনি ছিলেন বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত। শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এসেছিলেন ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের তাড়নায় পালিয়ে। তিনি বোধ হয় গবেষণা করতেন তন্ত্রশাস্ত্র নিয়ে। তাঁর ঘরে মড়ার মাথার খুলি, কঙ্কাল আর নানাপ্রকার তান্ত্রিক প্রতীকের চার্ট টাঙানো থাকতো। তাঁর ঘরে ঢুকলে ভ্রম হতো যাদুঘর বলে। তিনি ছিলেন একাহারী। চা আর ডিম ছিল তাঁর প্রধান খাদ্য।

'জাতে ছিলেন তিনি হোয়াইট্ রাশিয়ান। কঠোর জারপন্থী। পারস্যে জারের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। আমরা তাঁর নামের উচ্চারণ করতুম 'বকদানব' বলে। রুশ-বিপ্লবের আগেই স্বদেশ থেকে তিনি চলে আসেন। হোয়াইট্ রাশিয়ান বলে কম্যুনিস্ট রাশিয়াতে তাঁর স্থান হলো না। ঐ জাতের সবাইকে তাড়ালে, ওঁকেও তাড়ালে। তিনি পারস্যের পথ দিয়ে ভারতে আসেন। সঙ্গে কিছু আনতে দেয়নি। কিন্তু তিনি বুদ্ধি করে কিছু সোনা সরিয়েছিলেন। সে বুদ্ধিটা এমন কিছু নয়; তাঁর সামনের পাটির দাঁতগুলোকে বাঁধিয়ে এনেছিলেন সোনা দিয়ে। শান্তিনিকেতনে থাকতেন তিনি পুরাতন গেস্ট্-হাউসের ওপর-তলায়। ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন ফার্সী ভাষা আর ইসলামি ইতিহাসে। ধর্মে ছিলেন রোমান্ ক্যাথলিক। পুজো করতেন মেরী মাতার; ধূপ-ধুনো পুড়িয়ে চলতো তাঁর নিত্যপূজা। প্রণাম করতেন মাথা ঠুকে ঠুকে। সেই ঠোকাঠুকির ফলে, তাঁর কপালে গেছলো কড়া প'ড়ে।

'বিশ্বভারতীতে তিনি ফার্সী পড়াতেন। পারসিয়ান পড়বার সময়ে তিনি সাহায্য করতেন বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায়কে। ফার্সীর বড়ো পণ্ডিত ছিলেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি পারসিয়ান পড়াতেন। একবার বড়ো গেস্ট্-হাউসের পুবদিকের নর্দমায় পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ছিলেন। গেস্ট্-হাউসের ওপরতলার খোপরে তখন প্যাঁচা থাকতো। সেই প্যাঁচাকে তিনি নমস্কার করতেন শ্রদ্ধাভরে। সেই জন্যে তাঁকে আমরা ঠাট্টা করতুম। তিনি বলতেন, —না, প্যাঁচা হচ্ছে লার্নিং-এর দেবতা।

ডিম খেতেন তিনি প্রচুর —রোজ অন্ততঃ দশ-বারোটা করে মুরগীর ডিম খেতেন। খেয়ে খেয়ে কিড্‌নির অসুখ হলো তাঁর। শেষে কলকাতায় গেলেন অসুখ সারাতে। কষ্ট পেয়েছিলেন খুব। আশ্রমের উৎসব-অনুষ্ঠানে অনেক সময় তিনি হাফেজ, সাদী প্রমুখ ফার্সী কবিদের বয়েৎ আওড়াতেন। তখনও শান্তিনিকেতনে মৌলনা জিয়াউদ্দীন বোধ হয় আসেননি। বোগদানফ গান্ধীমতের বিরোধী ছিলেন। কবির ভুল বোঝাবুঝির জন্যে তিনি আশ্রমের কাজ ছেড়ে দিয়ে কাবুল-বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন।

। মহর্ষি ও তাঁর শান্তিনিকেতন-আশ্রমের সেতু দ্বিপেন্দ্রনাথের মৃত্যু।

১৯২২ সালের ১৭ই-১৮ই সেপ্টেম্বর কলকাতার অ্যালফ্রেড্‌ থিয়েটারে আর মাদান থিয়েটারে 'শারদোৎসবের' অভিনয় হলো। তাতে রবীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন সন্ন্যাসী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরদা, জগদানন্দবাবু লক্ষেশ্বর, আসত হালদার রাজা, ভূমিকায় রাজা সেজেছিলেন গগনবাবু আর মন্ত্রী সমরবাবু। অভিনয়ের দ্বিতীয় দিনে সকালে বোলপুর থেকে টেলিগ্রাম এলো, সেই দিন শান্তিনিকেতনে দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়েছে (আশ্বিন ১, ১৩২৯)। বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে দিনুবাবু বোলপুরে চলে এলেন। অশীতিপর পিতামহ দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একা। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই সময়ে একদিনের জন্যেও পুত্রশোকাতুর বড়দাদার সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। তিনি কলকাতায় নাটক সেরে পশ্চিমভারতে সফরে চলে গেলেন। এতে শান্তিনিকেতনে সবাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

কবির এই নির্মম রূপ নন্দলালের ভালো লাগেনি। যাই হোক্‌, দ্বিপুবাবুর মৃত্যুসংবাদ ১৩২৯ সালের কার্তিকমাসের প্রবাসীতে রামানন্দবাবু লিখলেন এইভাবে, —'ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। তিনি বিশ্বভারতীর অর্থ-সচিব ছিলেন। তৎপূর্বে বহু বৎসর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। সামাজিকতা ও আতিথেয়তার জন্য তাঁহাকে তাঁহার বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গ ভালবাসিতেন। তিনি যদিও বহুবৎসরব্যাপী অনভ্যাসবশতঃ চলাফিরা সামান্যই করিতেন, তথাপি

তাঁহার আরামকুরসীতে বসিয়াই শান্তিনিকেতন পল্লীর সকলের খবর লইতেন এবং সংবাদ পাইবামাত্র যাহার যাহা আবশ্যক তাহার বন্দোবস্ত করিতেন। আমরা যতদিন ঐ পল্লীতে ছিলাম, তাহার মধ্যে কখনও কোন অসুবিধা হইলে যদি তাঁহাকে না জানাইতাম, তাহা হইলে তিনি দুঃখিত হইতেন। লোককে খাওয়াইতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত যে মেলা হয়, তাহা সর্বসাধারণের প্রিয় করিবার জন্য ও তাহার কার্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্বাহ করিবার জন্য তিনি বিশেষ যত্ন করিতেন। পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের গৌরব তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিতেন।'

শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে 'শোক-সংবাদ' প্রকাশিত হলো এইভাবে :

'গত ১লা আশ্বিন ১৩২৯ শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হৃদরোগে হঠাৎ মারা গিয়াছেন। আশ্রমের সুখ-দুঃখের সহিত তাঁহার জীবন বহুকাল ধরিয়া জড়িত ছিল। আশ্রমবাসী অধ্যাপক ও গৃহস্থদের সম্বন্ধে ত কথাই নাই, বাহিরের লোকেরও বিপদ-আপদে উৎসবে প্রাণপণে সাহায্য করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর দূর-দূরান্তর হইতে গ্রামের লোকেরা তাঁহার সংবাদ লইতে আসিয়াছে। এখানকার সাধারণ লোকেদের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। অতিথি অভ্যাগতদের সম্মান এবং আদরযত্ন করিবার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের সকলের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

১২৬৯ সালের ১৫ই কার্ত্তিক কলিকাতায় ৬ নং দ্বারকনাথ ঠাকুরের গলিতে ৺দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। তিনি পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা বাড়ির অন্যান্য বালকদের সহিত গৃহশিক্ষকের নিকট হয়। তারপর তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে প্রবেশ করেন।

শিক্ষার শেষে পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব তাঁহাকে জমিদারির তত্ত্বাবধানের ভার দেন। কার্যপরিচালনার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ ছিল। এই

কারণে মহর্ষিদেব তাঁহাকে খুব ভালোবাসিতেন, শান্তিনিকেতন-আশ্রম স্থাপনের পরে তিনি তাঁহাকে আশ্রম-পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের ভার দেন। আশ্রমের মন্দির ও ছাতিমতলার বেদী ইত্যাদি তাঁহারই তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়।

চল্লিশ বৎসর বয়স হইতে তিনি আশ্রমে বাস করিতে আরম্ভ করেন। মহর্ষিদেব তাঁহাকে শান্তিনিকেতনের অন্যতম ট্রাস্টি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বহুকাল যাবৎ তিনি আশ্রমের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। বিশ্বভারতী স্থাপিত হইলে তিনি উহার অর্থসচিব নির্বাচিত হন।'

দ্বিপেন্দ্রনাথ ছিলেন বোলপুর আর শান্তিনিকেতনের মধ্যে সেতুস্বরূপ। বোলপুরের আর আশ-পাশের গাঁয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি অনেকেই ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বান্ধব। তাছাড়া গ্রামের সকল শ্রেণীর লোক তাঁকে সম্ভ্রম করতো, উপকারও পেত নানাভাবে। বোলপুরে কালিকাপুর-পটির বারোয়ারিতলার গৃহে 'হরিসভার' অধিবেশন হতো। সেই 'হরিসভায়' যেতেন তিনি। দেবরাজ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের খিড়কি পুকুরের পাড়ে বৈঠকখানা ছিল তাঁর প্রিয় আস্তানা। এখন কেবল শূন্য ভিটা তাঁর স্মৃতি বহন করছে। তবে দিলদরিয়া দ্বিপুবাবুর গুণের কথা স্মরণ করে তাঁর বোলপুর মজলিসের সুবৃদ্ধ তামাকবরদার নরসিংরাম ভকতের চোখে আজও জল ঝরে অঝোরে।

দ্বিপেন্দ্রনাথ ছিলেন সতেরো বৎসর যাবৎ তাঁর পিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন-আশ্রমের সেতুস্বরূপ। শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় বাসের শেষ ইচ্ছা মহর্ষি তাঁরই কাছে প্রকাশ করেছিলেন। এই বিষয়ে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছিলেন (সন ১৩১২, পৌষ মাস), —'১৯০৩ সালের ১৯-এ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রে মহর্ষির কম্পজ্বর হলো। শরীর অবসন্ন —অচেতন. পার্শ্ব-পরিবর্তনের শক্তি নাই। তিন দিন পরে চৈতন্যলাভ হলো। এর দুই দিন পরে বৈকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র ও আমি নিকটে আছি। বলিলেন, আহা! এই সময়ে যদি আমি শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলার বেদীতে শয়ন করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম তবে আমার বড়ই আনন্দ হইত। শান্তি! তুমি

কি আমাকে শান্তিনিকেতনে লইয়া যাইতে পার? বলিলাম, মহাশয়ের শরীরে বল হইলে লইয়া যাইতে পারিব। দ্বিপেন্দ্রবাবুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, দ্বিপু, তুমি সেখান হইতে ছাতিমগাছের একটা চারা আনিয়া আমার এখানে টবে রাখিয়া দিও। যদি শান্তিনিকেতনে না যাওয়া হয় তবে সেই চারা দেখিয়া মনে করিতে পারিব যে সেই শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় আছি।'

॥ শান্তিনিকেতন-সমাজে বিভিন্ন মনীষীর সাহচর্যে আচার্য নন্দলাল ॥

॥ জগদানন্দ রায় ॥

'আমি যখন শান্তিনিকেতনে আসি তখন এখানে আশ্রমের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন জগদানন্দবাবু। তখনকার সর্বাধ্যক্ষ এখনকার (১৯৪৮) 'সচিব' আর কি। মন্দিরের কাজ, বিদ্যালয়ের কাজ —সব বিভাগের কাজ দেখা-শুনা করে সব চালাতেন তিনি। দীর্ঘ নাক, প্রশস্ত ললাট, পাতলা চাপা ঠোঁট, উজ্জ্বল চোখ, শ্যামবর্ণ আর তেজস্বী চেহারা ছিল তাঁর। অঙ্কশাস্ত্র আর বিজ্ঞান —এই দু-টো জটিল বিষয় নিয়েই ছিল তাঁর গবেষণা আর অধ্যাপনা। তাঁর লেখা বিজ্ঞানের বই কলকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্কুল-কলেজের পাঠ্য ছিল তখন। বন্ধুমহলে তিনি একজন সুরসিক ব্যক্তি; কিন্তু ছাত্রদের পক্ষে নির্মম, কঠোর, নিয়ম-নিয়ন্ত্রক শিক্ষক। আশ্রমের শৃঙ্খলা-রক্ষায় তাঁর ছিল সদাজাগ্রত দৃষ্টি। অঙ্কভীত ছাত্রদেরও তিনি সহজেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দিতে পারতেন। আশ্রমের সমস্ত গুরুতর বিষয়ে গুরুদেব তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন দিলদরিয়া-মেজাজের বন্ধুবৎসল হৃদয়বান ব্যক্তি।

'গুরুপল্লীতে আমি থাকতুম তাঁর পাশের বাড়িতে। দেখা-সাক্ষাৎ হতো প্রায়ই। তামাক খেতেন খুব। তামাক খেতেন গড়গড়ায়। অম্বুরী তামাক। তার শব্দ আর সুগন্ধ ভেসে আসতো আমার বাড়িতে। সকালে বিকেলে প্রায় প্রত্যহ যেতুম তাঁর কাছে। আমে ছিল তাঁর বিশেষ প্রীতি। কোন্ বছরে কি জাতের আম খেয়েছেন তার হিসেব ছিল তাঁর মনে। সেই সূত্রে বয়স তাঁর কতর কোঠায় পৌঁছলো, সে হিসেবও

খতিয়ে নিতেন। তাঁর আম লুঠ করে তাঁকেই নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিলুম একবার। সে পরে বলবো। বসে বসে নানা কথা হতো। মাছ, পাখি সম্পর্কে তিনি তখন বই লিখছেন গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কেও লিখছেন।

'জগদানন্দবাবুর প্রকাণ্ড বড়ো একটা টেলিস্কোপ ছিল। জগদীশচন্দ্র আর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর উদ্যোগে, ত্রিপুরারাজের টাকায় পাওয়া গিয়েছিল সেটি। তার লেন্স টা খারাপ হয়ে গেল একবার সারাতে দিয়ে। সেই টেলিস্কোপ নিয়ে তিনি ছাত্রদের গ্রহ নক্ষত্র সম্পর্কে দেখাতেন আর বোঝাতেন। চাঁদের খানিক অংশ আমি দেখেছিলুম জগদানন্দ বাবুর সেই টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে। চাঁদটি দেখতে যেমন মোলায়েম আসলে মোটেই নয় ঐ রকম। এবড়ো খেবড়ো ভীষণ। এ ছাড়া আমাকে তিনি নানা গ্রহ উপগ্রহ সব দেখাতেন আর বোঝাতেন, ছাত্রদের মতো। উঁচু ক্লাসে ছেলেদের ফিজিক্স পড়াতেন। যাই হোক আমাদের গুরুদেব তাঁর বিশ্বভারতীতে নিচুক্লাসে তখন তৈরি করেছিলেন সবই। এখন (১৯৬৮) সেইগুলিই সব ক্রমশঃ বড়ো হচ্ছে। গুরুদেবের সমস্ত প্রচেষ্টার ওপরেই জগদানন্দ বাবুর ছিল সজাগ দৃষ্টি।

শিক্ষাসত্র' স্থাপনের গোড়ায় ছিলেন জগদানন্দবাবু। শিক্ষাসত্রের সঙ্গে আমাকেও যোগ রাখতে হয়েছিল। সে কথা আলাদা করে বলবো।

জগদানন্দ বাবু বিশেষভাবে ক্লাস নিতেন ম্যাথমেটিকস-এর। 'মালতী বিতানে' তাঁর ক্লাস নেবার জায়গা ছিল বাঁধা। তিনি গাছ গাছড়া নিয়েও কালচার করেছেন অনেক। একবার একটা ঘটনা হলো। একদিন গুরুপল্লীতে আমার বাড়ির সামনে দেখি-না, এক ঝাঁক শালিক পাখি। এক একটা পাখি আসছে, আর একটা বিশেষ গাছের পাতা খাচ্ছে, আর উড়ে যাচ্ছে। দেখে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হলো। কৌতূহলবশে গাছটা উপড়ে ফেললুম আমি। দেখাতে নিয়ে গেলুম জগদানন্দবাবুর কাছে। গাছটা দেখামাত্র তিনি বললেন অনন্তমূল মশাই ওটা অনন্তমূল। বড়ো ওষুধ খেলে শরীরের উপকার হয়। ঠিক জানে ঐ পাখিরা ওদের ইনস্টিঙ্কট দিয়ে।

লাইব্রেরীর রীডিং-রুমে আমরা যখন ফ্রেস্কো করি প্রায়ই বসতেন এসে জগদানন্দবাবু। খুব এনজয় করতেন তিনি আমাদের কাজ। খুব

রসিক লোক ছিলেন তিনি। কৌতূহলীও ছিলেন খুব। জগদানন্দবাবু এই সময়ে মাছ, পাখির ওপর বই লিখছিলেন। আর আমি তখন নানা-রকমের মাছ আর নানারকমের পাখির ওপর ছবি এঁকে দিয়েছিলুম রং দিয়ে। সে সময়ে আমাদের যোগাযোগটা খুব চমৎকার জমেছিল। ১৯৩৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

১৩৩০ সালের ফাল্গুন মাসের শান্তিনিকেতন-সংবাদে দেখা যাচ্ছে, —'আশ্রমের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের পাখি এবং বাংলার পাখী নামক দুইখানি পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে। বিখ্যাত শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় বই দুইখানির জন্য কয়েকখানি ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন।' —বাংলার পাখী —নন্দলালের দৃষ্টিতে যা আমরা পাচ্ছি সে তাঁর অতি আশ্চর্য সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ফল।

[জগদানন্দবাবুর 'পাখী' বইখানি উৎসর্গ করা হয়েছে 'পরম সাহিত্যানুরাগী বর্ধমানাধিপতি সুকবি মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত সার বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুরের শ্রীকরকমলে।' 'বাংলার পাখি' রয়েছে নবদ্বীপাধিপতি মাননীয় মহারাজ শ্রীমান ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের নামে। আর জগদানন্দ বাবুর টেলিস্কোপটি আমি দেখেছি বর্ধমান-চকদীঘির রাজা মণিলাল সিংহরায় মহাশয়ের বাড়ির ছাতে।]

'তিনি অঙ্কের লোক হলেও বেহালা বাজাতে পারতেন খুব ভালো রকম। গানের সঙ্গেও সঙ্গত করতে পারতেন। ভালোই বাজাতেন।

তিনি সব্জীর বাগান করতেন মহা উৎসাহে। সকালে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখতেন তাঁর নিজের হাতে বসানো নানা গাছ-পালার প্রাত্যহিক বৃদ্ধি। জগদানন্দ বাবুর বাগানের শাকসব্জী উদ্বৃত্ত হলে ব্যবহার করা হতো আশ্রমের রান্নাঘরে। একবার একটা খুব মজার ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর ক্ষেতে তরমুজ-লতায় একটা বড়ো তরমুজ ফলেছিল। দিন দিন বেড়ে উঠছে সেটা। পর পর প্রকাণ্ড হচ্ছে। তাঁর ইচ্ছে, তরমুজটা যখন সবচেয়ে বড়ো হবে, তখন সেটা গুরুদেবকে উপহার দিয়ে খুশি করবেন। তরমুজটার বৃদ্ধি শেষ হলো; লাল রং ধন হয়েছে। পরের দিন সকালে গুরুদেবের সকাশে নিয়ে যাবেন সেটি। ঘুম থেকে উঠে সকালে তাড়াতাড়ি বাগানে গিয়ে সেই উপহার-দ্রব্যটি তুলতে গিয়ে দেখেন, কোন্ দুষ্টু ছেলে

কাঠঠোকরা
কাঠঠোকরা
বসন্ত বউরি
কাঠঠোকরা
নীলকণ্ঠ
মাছরাঙা
বাঁশপাতি
ভরত পাখী
তাল চোঁচ
টুনটুনি
বাবুই
পায়রা
হরিয়াল
ঘুঘু
ময়ূর
কোঁচবক
গাই বগলা
ঝুঁটি বক
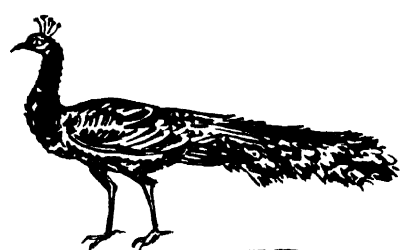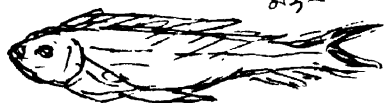
যেন সেই নধর তরমুজটিকে হাঁসিয়ে দিয়ে গেছে! সে-দৃশ্য দেখে জগদানন্দ বাবুর হাউ হাউ করে সে কী কান্না।

॥ নেপালচন্দ্র রায় ॥

'নেপালবাবু ছিলেন সেকালের 'মাস্টার মশাই'। বয়সে সবার চেয়ে বড়ো। গতিবিধি সর্বত্র। সরল সরস হাসি লেগেই আছে মুখে। তিনি ছিলেন গল্পের রাজা। সেকালের পিতামহেরা চণ্ডীমণ্ডপে মজ হয়ে বসে যেমন করে নাতি নাতনীদের কাছে গল্পের আসর জমাতেন ঠিক্ সেইরকম ভাব। লক্ষ্ণৌ-এর ওয়াজেদ আলি শাহ, আশফ-উদ্দৌলাহ্ —এঁদের কথা শুনতুম তাঁর মুখে।

'খুবই উৎসাহী লোক ছিলেন তিনি। যুবকের মতো উৎসাহ দেখেছি তাঁর বৃদ্ধ বয়সেও। নতুন কোন কাজ আরম্ভ করার কথা হলেই তিনি থাকতেন সবার আগে। মহাত্মাজী এখানে এসে একবার 'স্বরাজ'-কর্ম শুরু করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী যেমনটি করতেন সেই রকম আরম্ভ করে দিলেন এখানে। ঐ সময়ে গান্ধীজী তাঁর দু-ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে।

আমাদের শান্তিনিকেতন-আশ্রমে তখন ছিল খাটা-পায়খানার ব্যবস্থা। মহাত্মাজী বললেন,—'ওঃ তোড়্ দেও বিলকুল'। আর অমনি আমাদের উৎসাহী নেপালবাবু সঙ্গে সঙ্গে লেগে পড়লেন শাবল নিয়ে দুমদাম করে পায়খানা ভাঙতে। তখন পায়খানার ভেতরে যে লোক বসে রয়েছে সে খেয়ালই হয়নি তাঁর —উৎসাহের চোটে। এ-ছাড়া আরও সব ঘোরতর 'স্বরাজ'-কর্ম শুরু হয়ে গেল আশ্রমে। —আশ্রমে ছাত্রদের অসনে-বসনে, চলায়-ফেরায় বিপর্যয় ঘটে গেল। সব চেয়ে জোর স্বরাজ কর্ম শুরু হলো রান্নাঘরে। তবে যেখানেই হোক্, নেপালবাবুর উৎসাহ সব-তাতেই। এইভাবে কেটে গেল প্রায় পাঁচ-ছ মাস। গুরুদেব তখন এখানে ছিলেন না। আশ্রমের অবস্থা অচল হয়ে এলো। গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে আশ্রম থেকে তখন গার্জেনরা ছেলে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে, ও-সব এক্স্‌পেরিমেণ্ট্ আশ্রম থেকে তুলে দিতে হলো। অচল অবস্থায় আর কতদিন চলবে। ফলে, আবার পুনর্মূষিক হওয়া গেল। জগদানন্দবাবু

বরাবরই বিরুদ্ধে ছিলেন এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার। কিন্তু নেপালবাবু ঠিক্ তাঁর উল্টো। নেপালবাবু নতুন-কিছু হলেই সঙ্গে সঙ্গে ধরতেন সেটা —আগুপিছু না-ভেবে। আর জগদানন্দবাবু ছিলেন পুরাতন চাল-চলনের পক্ষপাতী।

'নেপালবাবু প্রত্যহ খুব ভোরে উঠে গোয়ালপাড়ার দিকে বেড়াতে যেতেন। খোয়াই থেকে কেয়াফুল পেড়ে এনে ফেরবার পথে বাড়িতে বাড়িতে একটি একটি করে দিয়ে যেতেন। আর সেই সঙ্গে প্রত্যেকের ঘরে কে কেমন আছে, প্রত্যেকের খোঁজ-খবর নিয়ে যেতেন। নেপালবাবুর নামে যে-রাস্তাটি —'নেপাল রোড্' —এখন উত্তরায়ণ থেকে সোজা গুরুপল্লীর দিকে গেছে, সেটি তিনি নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন ছাত্রদের নিয়ে। ক্লাসে তিনি পড়াতেন ভূগোল আর ইতিহাস।

'ট্রেন ফেল-করার ওস্তাদ ছিলেন তিনি। এই পনেরো মিনিট, এই দশ মিনিট, এই পাঁচ মিনিট করে থামতে থামতে, স্টেশনে পৌঁছে দেখা যেত, ট্রেন তখন সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। একবার আমি তাঁর সঙ্গে ট্রাভেল করেছিলুম। টিকিট কেনা হয়েছে থার্ড ক্লাসের। কিন্তু উঠেছি আমরা সব ইণ্টার ক্লাসে। কারণ, থার্ড ক্লাসে গদি নাই। ধরলো বর্ধমানে। নেপালবাবু কৈফিয়ৎ দিলেন, থার্ড ক্লাসে গদি দেওয়া হবে না কেন। কিন্তু চেকাররা তাঁর সে কৈফিয়ৎ মানলে না। এদিকে নেপালবাবুও কিছুতেই অতিরিক্ত ভাড়া দেবেন না। কিন্তু সরকারী ট্রেনে ওঠা হয়েছে। সরকারের চাপরাস-পরা চেকাররা আদায় করে নিলে অতিরিক্ত ভাড়া। এদিকে নেপালবাবু ছাড়বার পাত্র নন। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে এই নিয়ে লেখালেখি করলেন তিনি ছ'মাস ধরে। অবশেষে রেল-কর্তৃপক্ষ উত্তর দিলেন, যা নিয়ম ওরা তাই করেছে। এ বিষয়ে তাঁদের বলবার কিছু নাই। শেষে দেখা গেল, এই লেখালেখির ব্যাপারে পোস্টাল টিকিট-খরচা যা হলো, সে-পয়সায় স্বচ্ছন্দে সেকেণ্ড ক্লাসে যাওয়া-আসা হয়ে যেত। আবার, দীর্ঘ পথ সর্ট্‌কাট করতে গিয়ে নেপালবাবু অনেক সময়ে বনে-বাদাড়ে, খোয়াই-এ পথ হারিয়ে হাঙ্গামা বাধিয়েছেন —এ দৃশ্য দেখা যেত প্রায়ই।

'বেজায় ভুলো মন ছিল তাঁর। একবার হাওড়া-স্টেশনে বসে আছেন। ট্রেন ইন্ করতে তখনও দেরি। নেপালবাবু খবরের কাগজে মন দিলেন,

মগ্ন হয়ে গেলেন। ট্রেন এলো। খবরের কাগজের বিশেষ খবর ভাবতে ভাবতে নেপালবাবু ট্রেনে উঠে পড়লেন। ছোট ছেলেটি সঙ্গে আসছিল। শান্তিনিকেতন আসবে বলে। সে কিন্তু স্টেশনে বসেই রইল। ট্রেন ছেড়ে দিলে। নেপালবাবু চলে এলেন। ছেলে হাওড়া স্টেশনে বসে —এক-শো মাইল দূরে।

'শিশুর মতন সরল ছিলেন তিনি আর পাড়ার ছিলেন উৎসাহী ঠাকুর্দা। ভোরবেলা উঠে নিত্যি নিত্যি বাড়ি বাড়ি গিয়ে জাগিয়ে আসতেন সকলকে —প্রভাতী গেয়ে।

'তিনি ওকালতি পাশ করেছিলেন। আমাদের বিশ্বভারতীর সংসদে থাকতেন অপোজিশন্ পার্টিতে। কনস্টিটিউশন নিয়ে তর্ক করতে পারতেন খুব। শান্তিনিকেতনে কলেজ বা শিক্ষাভবন শুরু হলো ১৯২৬ সাল থেকে। প্রথম অধ্যক্ষ হলেন রামানন্দবাবু। তাঁর পরেই অধ্যক্ষ হলেন নেপালবাবু। গুরুদেব তাঁকে ভালোবাসতেন খুব, আর শ্রদ্ধাও করতেন।

'গুরুদেব রাশিয়া থেকে ফিরে এলেন। এসে, রাশিয়ার কমিউনিস্টদের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে শান্তিনিকেতনে দু তিনটি অধিবেশনে বক্তৃতা করলেন। ফলে, নেপালবাবুর উৎসাহ সহজেই সেই পথে প্রধাবিত হলো। তিনি ছিলেন উগ্র ধরনের লিবারেল, কাজেই আর কোনো ভাবাভাবি নাই; রাশিয়ান কমিউনিস্টদের মতন শান্তিনিকেতন-আশ্রমে সব কাজ এখনই আরম্ভ করা হোক্ —প্রস্তাব করলেন নেপালবাবু; —শান্তিনিকেতনে প্রত্যেকটি গেরস্তের রান্নাঘর করতে হবে একস্থানে। রান্না হয়ে গেলে বাড়ি বাড়ি খাবার দিয়ে আসা হবে গাড়ি করে। ধোপা-নাপিতের ব্যবস্থাও হবে এক জায়গা থেকে। বিয়ে-থার ব্যবস্থাও হবে আশ্রম থেকেই। শিক্ষা-টিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে এক ঠাঁই থেকে।

'রাঁচি রিখিয়া, দেওঘর-বদ্যিনাথ দয়ানন্দের আশ্রম, অরবিন্দ-আশ্রম, প্রবর্তক-সংঘ —সর্বত্র এই রকম সব সমবায়-ব্যবস্থা। টাকাকড়ি লাগে না ব্যক্তিগতভাবে। স্লিপ্ লিখে দিলেই মাদার-টাদার বা কর্তৃপক্ষ সব ব্যবস্থা করে থাকেন। নেপালবাবুকে আমরা বললুম, —আপনি মশায়, গিয়ে সব ঘুরে ঘুরে দেখে আসুন, বুঝে আসুন। —প্রথম মীটিং-এ এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হলো। আরও প্রস্তাব করা হলো যে, আমাদের প্রত্যেকের সম্পত্তিও

সব একজায়গায় থাকবে। বেশ, ঠিক্ আছে; কথা হলো, —যে যা আপনার সম্পত্তির বিবরণ লিখে দেবেন। আমার জমি-জমা আর টাকা-কড়ির নিখুঁত পরিমাণ সমস্ত আমি সংঘকে দান করলুম, —এই বলে লিখে দেওয়া হবে। তার ফলে আমরা মেন্‌টেন্যান্স্ আর সাপোর্ট পাব সংঘ থেকেই।

'এর মধ্যে একবার নেপালবাবু প্রস্তাব করলেন, ডেয়ারী রান্ করতে হবে। আশ্রমে দুধ পাবার জন্যে ডেয়ারী না-চালালে চলবে না। তখন বোধ হয়, তাঁর প্রথম নাতিটির জন্ম হয়েছে। আমরা ওঁকে পরিহাস করতুম, নাতির দুধ খাবার জন্যেই মশায়ের যেন এতো উৎসাহ। ও-সব হবে-টবে না। আগে লিখে দিন, ডকুমেণ্ট করে, যার যা ধন-সম্পত্তি আছে সব আশ্রমকে দান করে দিলুম, এই বলে। আমরা চেপে ধরার পরে, প্রথম মীটিংএর সেই সব রাজী-থাকার দলের অনেকেই দ্বিতীয় মীটিং-এ এলেন না। তৃতীয় মীটিং এ দেখা গেল, এখনই-রাজী-থাকার দল গরহাজির। আর চতুর্থ মীটিং-এ সভার সতরঞ্চি একেবারে ফাঁকা। অতঃপর যে যা আপনার চুপচাপ, ব্যস্। আর মীটিংই হলো না। অগ্রণী নেপালবাবুর উৎসাহ তখন অন্য পথ ধরেছে।

'রথীবাবুকে পড়িয়েছিলেন নেপালবাবু। শান্তিনিকেতন তিনি যখন ছেড়ে গেলেন, তবুও টানে টানে আসতেন মাঝে মাঝে। আমি তাঁকে বললুম, —এখানে জায়গা নিয়ে ঘরবাড়ি করুন। তাঁর জায়গাও ছিল অনেকটা। তিনি বলতেন, —'দেশের বাড়ি ক'র আগে'। আমি মজা করে বলতুম, —দেশে বুঝি বড়ো বাড়ি ফেঁদেছেন, কিন্তু, দেশে আপনি থাকতে পারবেন না, টাকা পুঁতে রাখবেন সেখানে। রিটায়ার করে দেশে যাবেন এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। তবে এখান থেকে তিনি অন্য কোথাও চলে যাওয়ামাত্র, এখানে ফিরে আসবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন, —মন উচাটন হতো এখানে আসতে। আশ্রমের পরিবেশে মন তাঁর বসে গিয়েছিল। অনেক পরে, কলকাতায় অসুস্থ হয়ে ওখানেই মারা গেলেন ১৯৪৪ সালের ২১-এ জানুয়ারী। নেপালবাবুর এক ভাই ভালো কবিরাজ। তিনি জীবিত আছেন এখনও (১৯৫৫)। আমাকে চিকিৎসা

করেছিলেন তিনি। এখনও ওষুধ দেন মাঝে মাঝে। নেপালবাবুর মা মারা গেলেন গত বছরে (১৯৫৪)।

'নেপালবাবুর অনেক কথা আজ আমার মনে পড়ে। সোসাইটি থেকে কাজ ছেড়ে যখন এখানে আমি আসি, এসে উঠলুম খড়ে-ছাওয়া 'নতুন বাড়ি'তে। এখানে থাকতে লাগলুম, কাজও চলতে লাগল। আমার মাইনের কথা কিছুই বলিনি গুরুদেবকে। কোনো রকমে সংসার চালাচ্ছি ছবি বেচে বেচে। একদিন গুরুদেব নেপালবাবুকে আমার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, —নন্দলাল মাইনে নেয় না, কাজ করছে। তখন তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে আমার মাসিক বেতন ঠিক করে দিলেন ষাট টাকা করে। সোসাইটিতে আমার বেতন ছিল দু-শো টাকা। যাই হোক্, মাথা পেতে নিলুম গুরুদেবের আদেশ। ষাট থেকে তিন-শো, তিন-শো থেকে পাঁচ-শো পর্যন্ত বিশ্বভারতীতে বেতন হয়েছিল আমার।

'মহাত্মাজী যারবেদা-জেলে অনশন করলেন। আমরণ উপবাস। শান্তিনিকেতনে বসে আমরা তখন প্রমাদ গুণলুম। মহা বিপদ্। উনিশ কুড়ি দিন হয়ে গেল। সমস্ত দেশে উদ্বেগের ছায়া। আমি, তেজুবাবু আর নেপালবাবু গুরুদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে বললুম, —আপনি যান একবার। বললুম সকালে গিয়ে। গুরুদেব বললেন, —'আমি বুড়ো মানুষ, শরীর বয় না, কি করে যাই।' তখন রথীবাবু ছিলেন না এখানে। সহসা দুপুরের দিকে খবর পাঠালেন গুরুদেব —'আমি যাবই।' তিনি তখন মন স্থির করে ফেলেছেন যারবেদা যাবেন বলে। সঙ্গে গেলেন আমাদের সুরেন। মহাত্মাজীর অনশনের সংবাদে নেপালবাবুর যা মনের অবস্থা হলো সে ভোলবার নয়।

।। ক্ষিতিমোহন সেন ।।

'ক্ষিতিমোহনবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা সোসাইটিতে আর্টস্কুলের একটা এগ্‌জিবিশনে। হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্-এর নিচে-তলার একটা ঘরে

এগ্‌জিবিশন চলছে। অবনীবাবুর, ক্ষিতীন মজুমদারের, আমার ছবি সব দেখানো হচ্ছে। আমার ছবির মধ্যে ছিল পার্থসারথি (১৯১১), শিবের বিষপান (১৯১৩) এই সব প্রথম দফার ছবি। ক্ষিতিবাবুর শরীর তখন বেশ সুস্থ আর সবল। বয়স চল্লিশের নিচে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরি চুল। এখনকার মতো (১৯৪৭) এতো মোটাও হননি তখন। সুঠাম চেহারা। ধপধপে রং। আমার সঙ্গে তিনি পরিচয় করলেন,—'আমি শান্তিনিকেতনে থাকি' —এই কথা বলে। তখন আমি শান্তিনিকেতনে মোটেই আসিনি। সে ১৯১৪ সালের আগের কথা। অবনীবাবুর ঘরে তখন আমি কাজ করি, আর সোসাইটিতে মাঝে মাঝে আনাগোনা করি। প্রথম আলাপের সময়ে ক্ষিতিবাবু আমাকে শান্তিনিকেতনের কাহিনী শোনালেন অনেক। আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন শান্তিনিকেতনে আসার জন্যে। —এ হলো ১৯১৩ সালের কথা।

'শান্তিনিকেতনে ১৯১৪ সালে আমি প্রথম এসে দেখলুম, ক্ষিতিবাবুকে শ্রদ্ধা করে সকলেই। তার পরে এসে দেখলুম, তিনি গুরুদেবের নিকটে যাতায়াত করেন ঘনঘন। গুরুদেব যা বলেন, তিনি টুকে রাখেন সব। আর একটা মজার কথা, গুরুদেব নতুন যা লিখতেন, ক্ষিতিবাবু বেদ, পুরাণ থেকে সে-সবেরই প্যার‍্যালেল্ প্যাসেজ্ বের করে দিতেন। ফলে, গুরুদেব এতে অনেক সময় খুব ক্ষুণ্ণ হতেন। অদ্ভুত পাণ্ডিত্য আর স্মরণশক্তি ছিল ক্ষিতিবাবুর। গুরুদেব যা বলতেন ক্ষিতিবাবুর সমস্ত স্মরণে থাকতো ওয়ার্ড্ বাই ওয়ার্ড্। শুধু গুরুদেব নয়, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এসে আর যে যা বলতেন, সে-সবও তাঁর মনে থাকতো।

'লেখাপড়া করার সময়ে কাশীতে তিনি ছিলেন বহুদিন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায়কে তিনিই বোধ হয় শান্তিনিকেতনে এনেছিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যা হলেই আমরা পাঁচ-ছ'জন বেড়াতে যেতুম ক্ষিতিবাবুর সঙ্গে। তখন তাঁর ভক্ত ছিল অনেক।—গাড়ু-গামছা-বওয়া ভক্ত। আমি, অক্ষয়বাবু, তেজুবাবু, দিনুবাবু তখন রোজই যেতুম তাঁর সঙ্গে বেড়াতে। পথ চলতে চলতে তত্ত্বকথা বলতেন অনেক। কিছুদিন পরে আমি আর নিয়মিত যেতে পারতুম না।

'ইস্কুলে ছেলেদের তিনি পড়াতেন বাঙ্গালা আর সংস্কৃত। একদিন ক্লাসের

একটি পাকা ছেলে পড়া পারে না, কথাও শোনে না। ক্ষিতিবাবু দু-চারটে চড়-চাপড় লাগিয়ে দিলেন তাকে। তখন ছেলেটি তাঁকে পালটা জবাবে বললে,—জানেন, এটা গুরুদেবের আশ্রম, এখানে মারধর নিষেধ। তার কথা শুনে তখন ক্ষিতিবাবু করলেন কী, তার কান দুটো পাকড়ে হাঁটু দিয়ে তাকে শূন্যে তুলে ধরে ঘা-কতক কষিয়ে দিলেন। দিতে দিতে বললেন,—এখন তো তুমি আশ্রম ছাড়া —এই মজার গল্পটা সত্যি কিনা জানিনা, তবে পরিহাসরসিক ক্ষিতিবাবুর নামের সঙ্গে জুড়ে আছে।

'শান্তিনিকেতন-আশ্রমে প্রত্যেক উৎসব-অনুষ্ঠানে মন্ত্রপাঠ করতেন, আর ভাষণ দিতেন বারবার। গুরুদেব যখন আশ্রমে আচার্যের বেদীতে বসে উৎসব-অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতেন, সে-সব ভাষণ লিখে নিতেন ক্ষিতিবাবু। সন্তোষ মজুমদারও ঐ রকম ভাষণ টুকতেন। শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনও তখন অনেক নোটস নিয়ে শান্তিনিকেতন পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু, গুরুদেবের ভাষণের সবচেয়ে বেশি নোট্‌স্‌ ছিল ক্ষিতিবাবুর কাছে। গুরুদেব ক্লাসে যখন কবিতা-টবিতা পড়াতেন বা ব্যাখ্যা করতেন ক্ষিতিবাবু তার নোট্‌ রাখতেন। গুরুদেব আশ্রমে বলতেন নানা স্থানে বসে। 'উটজ'তে বসে বলতেন তিনি। উটজ' হলো ঘণ্টাতলার পাশে একটি পুরাতন বটগাছের আশ্রয়ে একটি মণ্ডপ। কাঠের আট খুঁটি, খড়ের চাল, মাটির বেদী —সে ছিল আমাদের সুরেনের করা। আরও বেদী ছিল ঘোড়ার খুরের আকারে। কারমাইকেল-বেদীতে বসে বলতেন গুরুদেব। সেই সময়ে ইস্কুলের ছেলেরা আর বাইরের লোকেরাও সব শুনতে বসতো। লেডি সাহেবও আসতেন মাঝে মাঝে সেই ক্লাসে। নানা রকম কবিতা পড়তেন গুরুদেব; আর ব্যাখ্যা করতেন তিনি নিজেই। সেই সব ব্যাখ্যার নোট্‌ ছিল ক্ষিতিবাবুর খাতায়। গুরুদেব যখন তাঁর 'বলাকা' পড়াতেন, তার থেকেও প্রচুর নোট্‌ সংগ্রহ করেছিলেন ক্ষিতিবাবু। পরে বলাকার এই নোটস্‌গুলি নিয়ে ক্ষিতিবাবু বই করেছিলেন —'বলাকা কাব্য-পরিক্রমা' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯)।

'আমি যখন শান্তিনিকেতনে আসি ১৯১৪ সালে তখনই দেখি, ক্ষিতিবাবু পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে বৈদিক 'স্থণ্ডিল' বা হোম-মণ্ডল থেকে আশ্রমে আলপনা আঁকার প্রচলন করেছিলেন। মণিগুপ্তকে দিয়ে পঞ্চগুঁড়ির আলপনা

দেওয়াতেন। তার অনেক ব্যাখ্যাও তখন বলতেন তিনি। পরে, আমি এসে তাঁরই অনুসরণ করে আশ্রমে আলপনা দিতে লাগলুম। সেই সময়ে এখানে আমার সহায়িকা ছিলেন সুকুমারী দেবী। তাঁর কথা পরে বলা হবে।

'গুরুদেবের তিরোভাবের পরে, আশ্রমে ক্ষিতিবাবু বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে আচার্যের বেদীতে বসে মন্ত্রপাঠ আর ভাষণ দান করে আসছেন। মন্দির নিতেন তিনি প্রতি বুধবারে নিয়মিত। মন্দিরে ভাষণ দিতেন তিনি নিজেই, মধ্যযুগের ভারতীয় সাধু-সন্তদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। কখনও-বা গুরুদেবের লেখা মন্দিরের ছাপা ভাষণ থেকে পাঠ করে শোনাতেন। ক্ষিতিবাবু যেভাবেই বলতেন তাঁর কথকতার ভঙ্গি ছিল মনোহর।

'শান্তিনিকেতনের বাইরে শ্রাদ্ধ-বিবাহাদি ক্রিয়াকর্মে তাঁর পৌরোহিত্যের ডাক আসতো অনেক। তিনি যেতেন সে-সব ক্রিয়াকর্মে। কলকাতায় বৃক্ষরোপণ-টোপন উৎসব-কর্মের অনুষ্ঠানও তিনি শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অনুকরণেই সম্পন্ন করে আসতেন। শান্তিনিকেতনের উৎসব-টুৎসব তিনি পরিচালনা করতেন আচার্যের বেদীতে বসেই।

'ক্ষিতিমোহনবাবু বয়সে ছিলেন আমার চেয়ে দু-বছরের বড়ো। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের একবয়সী। 'বিধু' বলেই তিনি ডাকতেন তাঁকে।

ক্ষিতিবাবু এক সময়ে আশ্রমের ছিলেন সর্বাধ্যক্ষ। কিন্তু, হিসাব-পত্রের হাঙ্গামে অনেক সময়ে তিনি কূল হারাতেন। সে হাঙ্গামা স্বয়ং গুরুদেব পর্যন্ত পৌঁছতো।

'বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের পরে ক্ষিতিবাবু বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। গবেষণামূলক অনেক বই আছে তাঁর। সে-সব লেখা অতি সরস ভাষায়। তাঁর বিশেষ কাজ হলো মধ্যযুগের ভারতীয় সন্ত-সাহিত্যের ওপর। কবীর, দাদূ, রজ্জব প্রমুখ সাধু-মহাত্মাদের বাণী সব-সময়েই কথায় কথায় তিনি বলতেন। বাঙ্গালার বাউল গানের ওপর তাঁর অনেক কাজ আছে। তিনি উত্তরভারতের বহুস্থানে মঠ-মন্দির হাঁটকে বেড়িয়েছেন গান আর পুঁথি-সংগ্রহের জন্যে। গুরুদেবের সঙ্গে আমরা যেবার (১৯২৪) চীনে

যাই ক্ষিতিবাবু আমাদের দলে ছিলেন। সে-প্রসঙ্গ পরে বলা হবে। তাঁর সঙ্গে আমরা আরও কোথাও কোথাও গিয়েছিলুম।

'শেষ বয়সে ক্ষিতিমোহনবাবু বিশ্বভারতীর উপাচার্য হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে আমার নিজ বসত-বাড়ির তিনি ছিলেন নিকট-প্রতিবেশী, এবং বলা বাহুল্য, অতি মহৎ প্রতিবেশী। তিনি নিজে যখন চলতে পারতেন না তখনও অপরের কাঁধে ভর করে ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। আমার একটি জন্মদিনে তাঁর শেষ শ্রদ্ধা-নিবেদন করতে আসা, আমার মনে গভীর দাগ কেটে রেখে দিয়েছে। তাঁর বিচিত্র জীবন কাহিনী বিশ্বভারতীর তরফ থেকে লেখা হলো না বলে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ ছিল তাঁর মনে। সম্প্রতি (১৯৬০) তাঁর দেহান্ত হয়েছে।

॥ বিশ্বভারতীর কথা, ১৯২২-২৩ ॥

১৯২২ সালের ৭ই পৌষের মেলায় চিত্রকলার দিক থেকে প্রদর্শনীর দ্রষ্টব্য জিনিসের আয়োজন ছিল। কলাভবনের ছাত্র আর অধ্যাপকগণের আঁকা ছোট ছোট বহু কার্ড দেখানো হয়েছিল। আশ্রমের মেয়েদের হাতের তৈরি পুতুল খেলনা ইত্যাদিও প্রদর্শিত হয়।

১৯২২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৩২৮, ২৩এ মাঘ) তারিখটিও বিশ্বভারতীর পক্ষে একটি অবিস্মরণীয় দিবস। শুধু বিশ্বভারতীর নয়, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই দিনটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত। এইদিনে পল্লী-উন্নয়ন-বিভাগের কেন্দ্র স্থাপিত হলো সুরুল কুঠিতে—শ্রীনিকেতন। ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন লেনার্ড এলমহার্স্ট। ভারতের নানা স্থান ঘুরে কৃষি আর গ্রাম-সমস্যা সম্পর্কে খানিক ওয়াকিবহাল হয়ে এসেছেন তিনি। মহাত্মাজির অসহযোগপন্থী ক'জন ছাত্র, সন্তোষ মিত্র আর 'আলু' ওরফে সচ্চিদানন্দ রায়কে নিয়ে এলমহার্স্ট সাহেব গ্রামোদ্যোগের কাজে লেগে পড়লেন। শ্রীনিকেতন-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কবি লিখলেন —'মাটির গান': ফিরে চল মাটির টানে, যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে। —(শান্তিনিকেতন পত্রিকা,

বৈশাখ ১৩২৯)। আচার্য নন্দলাল শ্রীনিকেতনের এই মর্মবাণী ওখানকার দেওয়াল চিত্রে রূপায়িত করেছেন —সে প্রসঙ্গ পরে বলা হবে। ওখানকার বৃক্ষাবাসের কথাও যথাসময়ে বলা হবে।

বিশ্বভারতীর কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক পটভূমি ধীরে ধীরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তারিত হয়ে চলেছে। এতদিন আশ্রমে ছিল আশ্রম-সম্মিলনী। সে হলো বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মীদের সভা। এবার হলো বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর পত্তন। বিশ্বভারতীতে নতুন নতুন ছাত্র, অধ্যাপক আসছেন। তাঁরা বহুদিন থেকে পরস্পর প্রীতিভাবে আদান প্রদান আর যোগ-রক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রের অভাব অনুভব করছেন। সম্প্রতি (২রা চৈত্র ১৩২৮) সে অভাব দূর হয়েছে। 'বিশ্বভারতী-সম্মিলনী' নামে একটি সভা গঠিত হয়েছে।

১৯২১ সালের ২৩এ ডিসেম্বর বিশ্বভারতীকে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বসাধারণের হাতে উৎসর্গ করা হলেও তখন সে আইনসিদ্ধ হয়নি। ১৯২২ সালের ১৬ই মে বিশ্বভারতী রেজিস্টার্ড সোসাইটি হয়েছিল। জুলাই মাসে বিশ্বভারতীর আদর্শ আর কর্মধারা প্রচারের জন্যে কলকাতায় একটি সমিতি গঠিত হলো। ৭ই অগাস্ট বা ২২-এ শ্রাবণ (১৩২৯) পূর্ণিমা তিথিতে আশ্রমে বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠান হলো, আমরা তার বিবরণ আগে দিয়েছি। বর্ষামঙ্গলের পরে ৯ই অগাস্ট লেভি সাহেবের বিদায়-সভা হলো। এই সব কাজ সেরে বৈকালে গুরুদেব আর লেভি-দম্পতি কলকাতায় গেলেন। কলকাতায় বর্ষামঙ্গলের আয়োজন হলো, তার পরে হলো 'শারদোৎসব' অভিনয়। এরও উল্লেখ আগে করা হয়েছে। ১০ই অগাস্ট বিশ্বভারতীর Constitution সভা। এর আগে ১৬ই মে কলিকাতায় বিশ্বভারতী সোসাইটি ১৮৬০ সালের ২১ নম্বর এ্যাক্ট অনুসারে রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল। এবারে সোসাইটির সংবিধান-ধারাগুলি সভায় গৃহীত হলো। ১৯২৩ সালের ২৬এ জুলাই কবি আর দুটি দলিল রেজিস্ট্রি করে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তাঁর লেখা সমস্ত বাঙ্গালা বইয়ের স্বত্ব বিশ্বভারতীকে দান করলেন। আর বিশ্বভারতীর নবগঠিত একটি ট্রাস্টি-সভার ওপর বিশ্বভারতীর স্থাবর, অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির ভার অর্পিত হলো। পরে বিশ্বভারতীর ট্রাস্টিদের

সঙ্গে মহর্ষির ট্রাস্টিদের কিছু গোলযোগ ঘটে। সে-আলোচনা আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে।

বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় বর্ষে পৌষ-উৎসবের দিনকয়েক পরে অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন দেখতে এলেন। তার বিবরণ আমরা পরে বিশদভাবে দিচ্ছি। এই সময়ে দেশ-বিদেশের নানা অধ্যাপক-অধ্যাপিকা কবির আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীতে এসে যোগ দেন। এই সময়ে স্টেলা ক্রামরিশ, স্লোমিও ফ্লাউম, বেনোয়া, বোগদানফ, মার্ক কলিনস্, রে, স্ট্যানলি জোনস্ আসেন। এঁরা ছাড়া এখানে আগে থেকে ছিলেন এ্যাণ্ডুজ পিয়ার্সন আর এলমহার্স্ট। এই সময়ে প্যাট্রিক গেডিস শান্তিনিকেতনে এলেন। কবির বিশ্বভারতীতে দ্বিতীয় প্রাণ-পুরুষ শিল্পী নন্দলালের সঙ্গে এঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই যোগাযোগ হয়েছিল।

শ্রীনিকেতনে ছিলেন এলমহার্স্ট। তাঁর পল্লী-সংস্কারের কাজে সাহায্য করতে লাগলেন মিস গ্রেটবেন গ্রীন্। ইনি আমেরিকান মহিলা। প্যাট্রিক গেডিসের ছেলে আর্থার গেডিসও থাকেন সেখানে। তিনি আবার ফরাসী ভাষায় একটি বই লিখে ফেললেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীনিকেতনে গ্রাম-উন্নয়ন-কর্মের বহু তথ্য একত্র করে। সেই বই হলো —Pays du Tagore।

১৯২৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে কলকাতায় 'বসন্ত'-গীতিনাট্যের অভিনয় সেরে কবি উত্তর-পশ্চিম-ভারত সফরে বের হলেন। সেবারে কবি কাঠিয়াবাড়ের পোরবন্দর গিয়েছিলেন। পোরবন্দরের মহারাজা বা রাণাসাহেব কবির খুব সমাদর করেন। পোরবন্দরের প্রাচীন নাম হলো সুদামাপুরী। সুদামাপুরীতে গুরুদেবকে লোকসঙ্গীত শোনাবার আর লোকনৃত্য দেখাবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সে-সব দেখে কবির ইচ্ছা হলো এই লোকনৃত্য শান্তিনিকেতনের মেয়েরা দেখে আর শেখে। সেইজন্যে তিনি একটি গুজরাটী চাষী পরিবারকে তাঁর সঙ্গে আনলেন। ১৯২৩ সালের ১০ই এপ্রিল কবি এঁদের নিয়ে বোলপুর পৌঁছলেন। শান্তিনিকেতনে ফেরবার দিনকয়েক পরেই আম্রকুঞ্জে গুজরাটী মেয়েটির নাচের আসর বসল। সে নর্তকীবেশে দু-হাতে দু-জোড়া মন্দিরা নিয়ে নাচতে লাগল। তার সাবলীল নৃত্য দেখে সবাই মুগ্ধ। কবি গান লিখলেন —'দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে'। আর নন্দলাল

আঁকলেন তাঁর সুবিখ্যাত ছবি —'কাঠিওয়াড়ি নৃত্য'।

শান্তিনিকেতনে ১৩২৯ সালের বর্ষশেষ আর ১৩৩০ সালের নববর্ষ-উৎসব উদ্‌যাপিত হলো। নববর্ষের উপাসনার পরে সকালেই 'রতন কুঠি'র ভিত্তি স্থাপিত হলো ১৯২৩ সালের ১৪ই এপ্রিল। বোম্বাই-নিবাসী পার্সী দানপতি স্যার রতন টাটা বিশ্বভারতীতে বিদেশী অধ্যাপকদের বসবাসের জন্যে পঁচিশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। সেইজন্যে তাঁরই নামে এই বাড়ির নাম রাখা হলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পার্সী অধ্যাপক ডক্টর তারাপুরওয়ালা এই বাড়ির ভিত্তি স্থাপন করেন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের বিবৃতি মতে, এই 'রতন কুঠি'-বাড়ির প্ল্যান তৈরি করেন স্বয়ং আচার্য নন্দলাল।

শান্তিনিকেতনে এই সময় (১৯২৩) বিচিত্র কর্মসাধনা চলেছে। নারী-বিভাগ খোলা হয়েছে। পরিচালিকা হলেন স্নেহলতা সেন। শ্রীসদনের বড়ো বাড়ি তখনও তৈরি হয়নি। দেহলীর কাছে পিয়ার্সনের বাড়ি 'দ্বারিকে' আর দ্বারিকের কাছে মীরাদেবীর জন্যে তৈরি 'নেবুকুঞ্জ'-বাড়িতে আর 'নতুন বাড়ি'তে মেয়েরা থাকে। এই সময়ে আশ্রম-বালিকাদের সংঘবদ্ধভাবে সেবা আর সমস্ত কাজে ব্রতী করবার উদ্দেশ্যে শ্রীমতী সেন আর মিস্ গ্রীন্ আন্তর্জাতিক 'গার্ল-গাইড'-প্রতিষ্ঠানের আদর্শে মেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্যে কলকাতা থেকে শ্রীমতী মূলে (Moule)-কে শান্তিনিকেতনে ডেকে আনলেন। এই বিষয়ে কবির উৎসাহ খুব। তিনি গার্ল-গাইডের নাম দিলেন —'গৃহদীপ'। পরে বদলে করলেন —'সহায়িকা'। একটি গানও লিখলেন তিনি —'অগ্নিশিখা, এসো এসো।' কিন্তু রাজনৈতিক কারণে কবির এই 'সহায়িকা'-প্রতিষ্ঠান টেকেনি।

১৯২১-২২ সালে বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীরা কলকাতায় 'বর্ষামঙ্গল' উৎসব করে কিছু টাকা তুলেছিল। এবারে কবি ভাবলেন, 'বিসর্জন' নাটক অভিনয় করে কিছু টাকা তুলবেন। তবে এ-কথা ঠিক, সঙ্গীতের জলসা বা নাটক-অভিনয় যাই করা হোক্-না-কেন, তার একমাত্র উদ্দেশ্য টিকিট বিক্রী করে বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থ-সংগ্রহ করা নয়; কবির মধ্যে যে শিল্পী-সত্তা রয়েছে সে নিজের প্রকাশ চায়। রিহার্স্যাল্ দিয়ে আনন্দ, অভিনয় করতে ও করাতে আনন্দ, সর্বসাধারণের সামনে 'সুন্দরে'র পরিবেশন

করে তাঁর আনন্দ। বিশেষতঃ, আচার্য নন্দলাল আর তাঁর সহযোগী শিল্পিগোষ্ঠীর সহায়তায় কবির এই প্রকাশ-বাসনা দিনে দিনে নতুন নতুন ভাবে রূপময়তা লাভ করে চলেছে।

১৯২৩ সালের অগাস্ট মাসের শেষের দিকে কলকাতায় এম্পায়ার থিয়েটারে 'বিসর্জন'-নাটকের অভিনয় হলো। কবি জয়সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। তখন কবির বয়েস বাষট্টি। কিন্তু, লোকে বৃদ্ধ কবিকে রঙ্গমঞ্চে দেখলে যৌবনের প্রতীক হিসেবে। বাঙ্গালাদেশের সেকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অমৃতলাল বসু কবির অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। 'বিসর্জন'-অভিনয়ের পরে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরের গোড়ায়। শান্তিনিকেতনে পূজার ছুটির জন্যে বিদ্যালয় বন্ধ হলো ১৯২৩ সালের ১২ই অক্টোবর। কবি আশ্রমেই রইলেন। বিজয়া-দশমীর দিনে তিনি নতুন নাটক পড়ে শোনালেন —'যক্ষপুরী'। এর মধ্যে ২৫-এ সেপ্টেম্বর ইটালীতে পিয়াসন সাহেব ট্রেন-দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন।

১৯২৩ সালের পূজার ছুটির বেশির ভাগ শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে কবি নভেম্বরের গোড়ার দিকে গুজরাট-ভ্রমণে গেলেন। কবির সঙ্গে গেলেন এণ্ড্রুজ সাহেব, ক্ষিতিমোহনবাবু আর গৌরগোপাল ঘোষ। কবি প্রায় দেড় মাস পরে পৌষ-উৎসবের আগে আশ্রমে ফিরলেন। এবার কাঠিয়াবাড়-সফরের ফলে রাজাদের কাছ থেকে যে অর্থ-সংগ্রহ হলো তাই দিয়ে পরে শান্তিনিকেতনে 'কলাভবন' বাড়ির প্রতিষ্ঠা হলো। কলাভবন অট্টালিকার প্ল্যান তৈরি করলেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর। প্রতিষ্ঠা-উৎসব অনুষ্ঠানের বিবরণ পরে দিচ্ছি। কলাভবনের অট্টালিকা তৈরি হবার আগে কলাভবন প্রথমে বসতো 'দ্বারিকে', তার পরে 'সন্তোষালয়ে', তার পরে লাইব্রেরীর দোতলায় —সে-কথা আমরা পূর্বে বিশদভাবে বলেছি।

॥ সমকালের শিল্পচিন্তা ১৯২১-২৪ ॥

আচার্য নন্দলালের শিল্পচিন্তা 'ছবির পরখ' নাম দিয়ে শান্তিনিকেতন-পত্রিকায় (১৩২৯, পৌষ) প্রকাশিত হলো। —

॥ ছবির পরখ ॥

'চিত্রকরের আঁকা একটি বস্তুর ছবি ও ফটোগ্রাফে তোলা সেই বস্তুর ছবিতে তফাৎ অনেকটা। চিত্রকরের আঁকা ছবিতে, বস্তুটির রূপ ছাড়া, চিত্রকরের সেই বস্তুটি দর্শনে আনন্দের যে উপলব্ধি হয়েছিল বিশেষ করে তারই রূপ দেখি। ফটোতে সেই বস্তুর জড়রূপ দেখি, কিন্তু আনন্দের মূর্তি দেখি না। বলতে পারা যায়, যখন স্বভাবের জড়রূপ দেখে আনন্দ হয়, তখন তারই হুবহু নকলেও (ফটো) আনন্দের উদ্রেক হতে পারে, কিন্তু নাও হতে পারে —কারণ কোনো একটি বস্তু দেখে কোনো ব্যক্তির রসের উদ্রেক হলো না, আর একজন কবির মন মেতে উঠল। কিন্তু চিত্রকরের চিত্রে একটি বিশিষ্ট রসের উদ্রেকের প্রয়াস থাকবেই।

তাহলে ছবি হলো রসের ঘনরূপ বা আনন্দের ঘনরূপ। ভগবানের সৃষ্টিতে দুটি জগৎ আছে, একটি বাহিরের বস্তুজগৎ, অন্যটি মনোজগৎ। বাহিরের জগৎ চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ নিয়ে, আর মনোজগৎ আমাদের রসাদি নিয়ে।

এই মনোজগতের আনন্দকে প্রকাশ করতে গিয়ে ৬৪ কলার উৎপত্তি মানুষ করেছে। কেহ গান গেয়ে, কেহ নেচে, কেহ এঁকে, কেহ গড়ে, নানাভাবে সেই আনন্দের রূপকে সকলের সামনে ধরবে তারই জন্যে ব্যাকুল হচ্ছে।

এই ব্যাকুলতাকে অন্যের নিকট প্রকাশ করার প্রয়োজন কি? আনন্দ প্রকাশ চায়। আলো জ্বললেই প্রকাশ হবে, ফুলের সৌরভ থাকলেই ছড়িয়ে পড়বে, অন্যের প্রয়োজন থাক্ বা না থাক্।

এখন কথা উঠবে চিত্রকরের ছবিতে বস্তুবিশেষের রূপও রয়েছে আর চিত্রকরের আনন্দের অভিব্যক্তিও রয়েছে, এ কি রকম করে হবে?

এই কথা বোঝাতে গেলে Technique বা অঙ্কনরীতি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। চিত্রব্যবসায়ী ছাড়া অন্যের পক্ষে বোঝা শক্ত হলেও, যথাসাধ্য বোঝাতে চেষ্টা করব।

চিত্রের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। চিত্র বিশ্লেষণ করলে, এই

কয়েকটা জিনিস পাওয়া যায়। প্রথম চিত্রকরের মন, দ্বিতীয় যে বস্তু নিয়ে চিত্রের অঙ্কন হচ্ছে, তৃতীয় আঁকবার সাজ-সরঞ্জাম। মনের কথা বলার আগে চোখকে দেখা যাক। মন চক্ষুযন্ত্রের সাহায্যে যাবতীয় পদার্থ দেখে; কেবলমাত্র চক্ষু কোনো জিনিস দেখে না এ-কথা সকলের জানা আছে। চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে মন কত রকমে দেখে। যখন অন্যমনস্ক থাকি, তখন সামনে জিনিস থাকা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই না; কখনও তার অংশমাত্র দেখি। আবার কোনো সময়ে জিনিসকে তার চাইতেও বেশি করে দেখি।

যেমন প্রকাণ্ড ঝুরিওয়ালা এক বটগাছ দেখলাম, দেখেই মনে হলো যেন জটাধারী সন্ন্যাসী। এখানে বটগাছের সঙ্গে সন্ন্যাসীর রূপের কতক অংশ জুড়ে দেওয়া হলো। কখনো আবার এক বস্তুকে অন্য বস্তু মনে করছি; যেমন সর্পে রজ্জুভ্রম —এ-কথা তো সকলেই জানে। অনেকে প্রাচ্য চিত্রকলা-পদ্ধতিতে real perspective পান না। কিন্তু real perspective জিনিসটি জ্যামিতিশাস্ত্রের ভিতরেই আছে। আমার আগের কথা অনুসারে চিত্রকরের perspective mental perspective ছাড়া আর কিছু নয়।

এবার বস্তুর কথা আসলো। কোন বস্তু যখন দেখি, এই কয়টি লক্ষণ দ্বারা পরিচয় পাই।

১ম রেখা (outline drawing), ২য় ঘনত্ব বা ব্লক, তৃতীয় রং। চিত্রে দেখতে পাওয়া যায়, চিত্রকরের মনোমত দু-একটী লক্ষণ নিয়ে ছবি আঁকা হয়েছে।

সকলের শেষে যে সরঞ্জাম নিয়ে ছবি আঁকা হয়, তার বিভিন্নতা অনুসারে অঙ্কনরীতিও বিভিন্ন হয়ে যায়; আর এই রকম বিভিন্ন হওয়াও বাঞ্ছনীয়। কারণ যে সকল বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করা হয়, চিত্রকরের মনের ছবি আঁকবার সময়ে চিত্রকরকে প্রকাশ [তা] করতে বাধা দেয়। সেই বাধাই চিত্রকরকে অভিনব পদ্ধতি সৃষ্টি করতে চালিত করে। বারান্তরে এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করতে বাসনা রইল।'—

আচার্য নন্দলালের এই রচনা প্রকাশ হবার প্রায় দু-বছর আগে ভারতশিল্প-সম্পর্কে স্টেলা ক্রামরিশের আর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের

ভারতশিল্পচিন্তা 'প্রবাসী'তে আর 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে 'ভারতীয় শিল্পপ্রতিভা' আর 'ভারত-চিত্রচর্চা' —এই নামে। স্টেলা ক্রামরিশের ইংরেজী প্রবন্ধটির অনুবাদ করেছিলেন শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। ভারতশিল্প-আলোচনার ধ্রুবপদ বাঁধবার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এই উভয় মনীষীর বক্তব্যের সংক্ষেপসার বিবৃত করছি।—

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ১৯১২ সালের দিকে ভারতশিল্পের চিন্তা করে Dawn-পত্রিকায় যে রচনা প্রকাশ করেছিলেন, আমরা পূর্বে সংক্ষেপে তার মর্মকথা প্রকাশ করেছি। ভারতীয় মূর্তি-নির্মাণ, ভারতশিল্পাদর্শ ও 'ষড়ঙ্গ' সম্পর্কে অক্ষয়বাবু ১৯১২ সালে যা ভেবেছিলেন, সেই ভাবনা আরও বিশদভাবে তিনি ভেবেছিলেন ১৯২২ সালে। তাঁর এই সময়কার 'ভারত-চিত্রচর্চা' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে এই,— বহুযুগের অবসাদগ্রস্ত আধুনিক বাঙ্গালী শিল্প-সাধকের অনভ্যস্ত হস্ত চিত্রচর্চায় ব্যস্ত হয়েছে বলে, রেখা আর লেখা সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। ···তাঁর মতে, এঁদের এই 'ব্যর্থ চেষ্টাই সাফল্যের পূর্বসূচনা।'

কিছুদিন আগেও বাঙ্গালীর শিক্ষা-সাফল্যের পরিচয় দেবার সময়ে বাঙ্গালী কবি চৌষট্টি কলার উল্লেখ করতেন। সে প্রথা লোপ পেয়েছে। এখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় একটি কলারও বিকাশলাভের সুযোগ নাই।···

ভারতচিত্রের মূলপ্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয়ে না-উঠলে, ভারতবর্ষে বসে চিত্রচর্চা করলে ভারত-চিত্র হবে না; ভারতবর্ষের বিষয় অবলম্বন করে চিত্রচর্চা করলেও ভারত-চিত্র হবে না; ভারতচিত্রের প্রকৃতিগত অনন্যসাধারণ বিশিষ্ট লক্ষণগুলিই হলো তার প্রকৃত মানদণ্ড।···

শাস্ত্রবচন উদ্ধার করে অক্ষয়বাবু দেখালেন, পর্বতমালার মধ্যে সুমেরু, অণ্ডজাত জীবের মধ্যে গরুড়, নরগণের মধ্যে রাজা যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি 'কলানামিহ চিত্রকল্পঃ' অর্থাৎ কলাসমূহের মধ্যে চিত্রকলা শ্রেষ্ঠ। —এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতে চিত্রকলা অতি উচ্চ সমাদর লাভ করেছিল। অক্ষয়বাবুর মতে যা ছিল তা নাই! যা আছে যেমন অজন্তা-গুহার চিত্রাবলী, তাতে যা আছে তা কিন্তু চিত্র নয় —চিত্রাভাস। সে হলো প্রাচীন ভারতচিত্রের অসম্যক্ নিদর্শন, চিত্র সাহিত্যদর্পণের 'দোষ-পরিচ্ছেদের অনায়াসলভ্য উদাহরণ। তাঁর ভাষায়, —'তাহা কেবল

বিলাসবাসনমুক্ত যোগযুক্ত অনাসক্ত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের নিভৃতনিবাসের ভিত্তি-বিলেপন ; —বিচক্ষণ চিত্র-সমালোচকগণের নিকট ভক্তিভারাবনত নমস্কার-লাভের যোগ্য হইলেও, ভারত-চিত্রোচিত প্রশংসা লাভের অনুপযুক্ত। তাহা একশ্রেণীর 'পুস্ত-কর্ম', —তাহার মূল প্রয়োজন অলঙ্করণ। ...তাহাতে যাহা-কিছু চিত্র-গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অযত্ন-সম্ভূত —আকস্মিক, —অলৌকিক। এক সময়ে সকল গৃহেই এইরূপ ভিত্তি-চিত্রের ব্যবস্থা ছিল ; কিরূপ গৃহে কোন্ শ্রেণীর চিত্র অঙ্কিত হইবে, তাহাও সুনির্দিষ্ট ছিল। এই সকল ভিত্তি-চিত্রে কেহ চিত্র-সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা দর্শনের আশা করিত না ; ভিত্তি-গাত্র সেরূপ প্রতিভা-প্রকাশের উপযুক্ত স্থান বলিয়াও পরিচিত ছিল না।

'স্থানং প্রমাণং ভূলম্ভো মধুরত্বং বিভক্ততা।
সাদৃশ্যং ক্ষয়বৃদ্ধী চ গুণাষ্টকমিদং স্মৃতম্।
স্থানহীনং গতরসং শূন্যদৃষ্টিমলীমসং।
চেতনারহিতং বা স্যাৎ তদশস্তং প্রকীর্তিতম্॥'

স্থান-প্রমাণ-ভূলম্ভ-মধুরত্ব-বিভক্ততা-সাদৃশ্য-ক্ষয়-বৃদ্ধি, —এই আটটি পারিভাষিক সংজ্ঞায় চিত্রের আটটি গুণ উল্লিখিত। স্থান-দোষ, রস-দোষ, চিত্র-দোষ ; এই সকল দোষদুষ্ট চিত্র অপ্রশস্ত বলিয়া নিন্দিত। এই সকল চিত্র-গুণের এবং চিত্র-দোষের যথাযথ পর্যবেক্ষণে যাহাদের চক্ষু অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট অজন্তাগুহার চিত্রাবলী ভারত-চিত্রের অনিন্দ্যসুন্দর নিদর্শন বলিয়া মর্যাদা লাভ করিতে অসমর্থ। যাহাদের তুলিকাসম্পাতে এই সকল ভিত্তি-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তাঁহারা পুরাতন ভারতবর্ষে 'চিত্রবিৎ' বলিয়া কথিত হইতে পারিতেন না। তাঁহারা নমস্য ; কিন্তু চিত্রে নহে, চরিত্রে। তাঁহাদের ভিত্তিচিত্রও প্রশংসার্হ ; কিন্তু কলা-লালিত্যে নহে, বিষয় মাহাত্ম্যে।

চিত্রবিৎ কে, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য সেকালের শাস্ত্রকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন, —সমীরণ-সঞ্চরণে জলে তরঙ্গ উত্থিত হয় ; অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া শিখাবিকাশ করিয়া থাকে ; ধূম গগনমণ্ডলে আরোহণ করে ; পতাকা আকাশে অঙ্গবিস্তার করে। যিনি এই সকল গতিভঙ্গী যথাযথভাবে চিত্রিত করিতে পারেন, তিনি যথার্থ চিত্রবিৎ। সুপ্ত হইলে, মনুষ্যের প্রাণস্পন্দনের চেতনা লুপ্ত হয় না ; মৃত হইলেই সে চেতনা

লুপ্ত হইয়া যায়; —দেহের সকল অংশ সমান নহে; কোনও অংশ উন্নত, কোনও অংশ অবনত। যিনি এই সকলের পার্থক্য ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চিত্রবিৎ।' যথা,—

তরঙ্গাগ্নিশিখাধূমং বৈজয়ন্ত্যম্বরাদিকং
বায়ুগত্যা লিখেৎ যস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স তু চিত্রবিৎ॥
সুপ্তঞ্চ চেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্যবর্জিতং।
নিম্নোন্নত-বিভাগঞ্চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ॥'

ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—কেবল আকারাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত হইলেই কেহ চিত্রবিৎ বলিয়া মর্যাদালাভ করিতে পারিতেন না।

অ-জীবের গতিভঙ্গি চিত্রিত করাও অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু সজীবের স্থিতিভঙ্গি চিত্রিত করাই কঠিন। তাহাতে চেতনা-ব্যঞ্জক শিল্প-কৌশল আবশ্যক। সেই চেতনায় মৃতের সঙ্গে জীবিতের পার্থক্য প্রকটিত হয়। তাহাকে আবার এমনভাবে চিত্রিত করা আবশ্যক যে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারা যায়,—যেন স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে। সেইরূপ চিত্রই চিত্র—তাহাই শুভলক্ষণসংযুক্ত। যথা,—

'সশ্বাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভলক্ষণম্।'

বিষয়-ভেদে, পদ্ধতি-ভেদে, প্রয়োজন-ভেদে, ভারত-চিত্রে অনেকগুলি বিভাগ প্রচলিত হইয়াছিল। তথাপি পুরাতন সাহিত্যে চিত্রের মুখ্য প্রতিশব্দ—'আলেখ্য', এবং আলেখ্যের প্রধান বিষয় নায়ক-নায়িকা। বাৎস্যায়ন তাহাকেই মুখ্যভাবে সূচিত করিয়া গিয়াছেন। টীকাকার যশোধর, তাহাকে বিশদ করিবার জন্য, একটি কারিকা উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাব-লাবণ্য-যোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকা-ভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥'

··ভারত-চিত্র 'ষড়ঙ্গক', সুতরাং যে-চিত্রে ছয়টি অঙ্গই বর্তমান নাই, তাহা অঙ্গহীন,—চিত্রাভাস।···

প্রথম অঙ্গ —রূপভেদ।

····রূপের' ভেদ-সাধন। সুতরাং 'রূপ' কি তাহা জানা আবশ্যক। তাহা একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা। প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক একটি 'রূপের'

আধার। চিত্রে একটি রূপ হইতে আর-একটি রূপকে পৃথক করিয়া দেখিবার নাম 'রূপ-ভেদ'। তাহা চিত্রগুণ-কীর্তনে 'বিভক্ততা' বলিয়া উল্লিখিত। ইহা সাধারণভাবে 'রেখাবিন্যাস' বলিয়া কথিত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে 'রূপভেদের' পদ্ধতি সূচিত হইলেও 'রূপের' অর্থ সুব্যক্ত হয় না। যাহার প্রভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোনরূপ ভূষণ-ভূষিত না হইয়াও বিভূষিতবৎ প্রতিভাত হয়, তাহারই নাম 'রূপ'। যথা, —

'অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ভূষণাদিনা।
যেন ভূষিতবদ্ভাতি তৎ রূপমিতি কথ্যতে ॥'

'রূপ' রূপ নহে; —অ-রূপ। তাহা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ব্যক্ত হয়। যাহা প্রকৃতপক্ষে অনুভূতিগম্য এবং অতীন্দ্রিয়, তাহা এইরূপে দৃষ্টিগম্য হইয়া থাকে। তজ্জন্য ভারত-চিত্রে 'রেখা' রেখা নহে; তাহা 'রূপ-রেখা'। তাহার বিশুদ্ধি রক্ষার উপর চিত্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে। চিত্রের ভিন্ন-ভিন্ন অভিব্যক্তি ভিন্ন-ভিন্ন রুচিসম্পন্ন দর্শকের চিত্তবিনোদন করে। আচার্যগণ 'রেখা'র প্রশংসা করিয়া থাকেন; —বিচক্ষণগণ (আলো ও ছায়া-প্রদর্শক) 'বর্তনা'র প্রশংসা করেন; —রমণীগণ ভূষণ-বিন্যাসের অনুরাগিনী, ইতর জন 'বর্ণাঢ্যতার' পক্ষপাতী; —যথা,

'রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্যা বর্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যমিতরে জনাঃ।'

'রূপ-ভেদ' প্রথম কার্য। তাহার পদ্ধতি শিল্পশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। একটি 'অনুলোম' এবং আর-একটি 'প্রতিলোম' পদ্ধতি। মস্তক হইতে রেখাবিন্যাসের নাম 'অনুলোম পদ্ধতি'; পদযুগল হইতে রেখা-বিন্যাসের নাম 'প্রতিলোম-পদ্ধতি'। দেবমূর্তির চিত্রাঙ্কনে 'অনুলোম-পদ্ধতিই' অবলম্বনীয়। শরীরের সকল অঙ্গকেই রূপ-ভেদে প্রদর্শিত করিতে হয় না, কারণ সকল অঙ্গ রূপের আধার নহে। যে-সকল অঙ্গ রূপের আধার, তাহা পৃথকভাবে প্রদর্শিত না হইলে, 'চিত্র-দোষ' সংঘটিত হয়। 'অবিভক্ততা' সেই সুপরিচিত 'চিত্র-দোষ'। এই কারণে ভারত-চিত্রে কোন কোন অঙ্গ ইঙ্গিতমাত্রে ব্যক্ত, কিন্তু কোন কোন অঙ্গ সুনির্দিষ্ট রেখা-বিন্যাসে সুবিভক্ত। ভারত-চিত্রের এই 'রূপভেদ'-রীতির যথাযোগ্য বিচারের অভাবে, কোন কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থে ভারত-চিত্র 'রেখাত্মক' বলিয়া উল্লিখিত। ভারত-চিত্র

'রেখাত্মক' নহে, —'রূপাত্মক'।

দ্বিতীয় অঙ্গ—প্রমাণ।

তালহীন সঙ্গীতের ন্যায় মানহীন চিত্র রসবোধের অন্তরায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে একটি পরিমাণ-পার্থক্য বর্তমান। দৈর্ঘ্য বিস্তার, বেধ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিতি সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, গতি বিধানের সহায়তা সাধন করে। …ইহা প্রকৃতপক্ষে রেখা-বিন্যাসকে সুসংযত করিয়া চিত্র-সৌন্দর্য বিকশিত করে। ইহা অনাবশ্যক শাসন-শৃঙ্খল নহে। ইহাকে অবহেলা করিবার উপায় নাই। কেবল এক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম—তাহা হাস্যরসের অবতারণায় অভিব্যক্ত। কিন্তু সেখানেও সাধারণ পরিমাণের ব্যতিক্রম ঘটিলেও, রসানুগত পরিমাণ অনতিক্রমণীয়। 'প্রমাণ' সীমাকে সুনির্দিষ্ট করিয়া, চিত্রকে সুসঙ্গত করে। ইহাতে শিল্পের স্বেচ্ছাচার সংযমিত হয়, —তাহার প্রতিভা প্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না।

তৃতীয় অঙ্গ—ভাব।

……ভাব অশরীরী চিত্ত-বৃত্তি, —যাহা বিভাব জনিত শরীরেন্দ্রিয়বর্গের বিকার-বিধায়ক চিত্তবৃত্তি। যথা,—

'শরীরেন্দ্রিয়বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়কাঃ।
ভাবা বিভাবজনিতাশ্চিত্তবৃত্তয় ঈরিতাঃ।'

পৃথক পৃথক ভাবের প্রভাবে শরীরেন্দ্রিয়বর্গের পৃথক পৃথক বিকার সাধিত হয়। ……মানব-চিত্ত-বৃত্তি রসানুগত; তদনুসারে 'ভাব' নিয়মিত হইয়া থাকে। চক্ষুর আকার-পার্থক্যে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

'চাপাকারং ভবেন্নেত্রং মৎস্যোদরমথাপি বা।
নেত্রমুৎপলপত্রাভং পদ্মপত্রনিভং তথা।
শশাকৃতির্মহারাজ পঞ্চমং পরিকীর্তিতম্।'

চক্ষুর আকার পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত; — চাপাকার, মৎস্যোদর, উৎপল-পত্রাভ, পদ্মপত্রনিভ এবং শশাকৃতি। চাপাকারের অর্থ — ধনুরাকৃতি।…

চক্ষু একটি সুপরিচিত শরীরেন্দ্রিয়; ভাবের প্রভাবে তাহার বিকার সাধিত হইয়া থাকে; এবং তদনুসারে তাহার আকার পরিবর্তিত হয়। এই কারণে, সকল অবস্থায় সকল নরনারীর চক্ষুর আকার একরূপ হইতে

পারে না। চিত্র-সূত্রোক্ত পাঁচ প্রকারের চক্ষু পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন আকার সূচিত করে, এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রভাবে সেই সকল আকার-পার্থক্য সংঘটিত হইয়া থাকে। যথা,—

'চাপাকারং ভবেন্নেত্রং যোগভূমি নিরীক্ষণাৎ।
মৎস্যোদরাকৃতিং কার্যং নারীণাং কামিনাং তথা॥
নেত্রমুৎপলপত্রাভং নির্বিকারস্য শস্যতে।
ত্রস্তস্য রুদতশ্চৈব পদ্মপত্রনিভং ভবেৎ।
ক্রুদ্ধস্য বেদনার্তস্য নেত্রং শশাকৃতির্ভবেৎ॥'

যোগ-ভূমি নিরীক্ষণের অভ্যাসে নেত্র ধনুরাকৃতি লাভ করে, —কামিজনের এবং কামিনীগণের নেত্র (লালসাপূর্ণ বলিয়া) মৎস্যোদরাকৃতি; —নির্বিকারচিত্তের নেত্র উৎপল-দল-সদৃশ; —যে ত্রস্ত বা রুদ্যমান, তাহার নেত্র পদ্মদলের ন্যায়; ক্রুদ্ধের এবং বেদনাগ্রস্তের নেত্র শশকাকৃতি। শরীরেন্দ্রিয়বর্গের এইরূপ বিকার-বিধায়ক চিত্তবৃত্তির নাম 'ভাব', তাহা চিত্রের পক্ষে অপরিহার্য; তাহার অভাব চিত্র-দোষ।

চতুর্থ অঙ্গ—লাবণ্য।

······ইহা এক শ্রেণীর ঔজ্জ্বল্য-সাধন। 'লাবণ্য' শব্দের ব্যবহারে তাহা সুস্পষ্ট সূচিত হইয়াছে। মুক্তা হইতে যেমন একটি তরঙ্গায়মান দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে সেইরূপ তরঙ্গায়মান দ্যুতি নিষ্কাষণের নাম 'লাবণ্য'-যোজন। 'লাবণ্য' একটি পারিভাষিক শব্দ। যথা—

'মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে॥'

সকল নর-নারীর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতেই অল্পাধিক মাত্রায় একটি তরঙ্গায়িত দ্যুতি ফুটিয়া উঠিতেছে বলিয়া প্রতিভাত হয়। ইহাই জীবিতকে মৃত হইতে পৃথক্ করিয়া দেখায়। ইহাকে চিত্রে প্রকাশিত করিবার শিল্প-কৌশলের নাম 'লাবণ্য-যোজন'। ইহাতে তরলতা আছে। তাহা 'ছায়ার' অর্থাৎ 'কান্তির' তরলতা। টীকাকারগণ তাহাকে 'তরঙ্গায়মান' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। 'লাবণ্য' অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের

উপর দিয়া ঢেউ খেলাইয়া চলিয়া যায়। সুতরাং তাহা কেবল ঔজ্জ্বল্য নহে,—চলোর্মিবৎ চলনোন্মুখ। তাহাতেই চিত্র নির্জীব হইয়াও সজীববৎ প্রতিভাত হয়। স্থিতিভঙ্গির মধ্যে এইরূপ লাবণ্য-গতিভঙ্গি সঞ্চারিত না হইলে, চিত্র 'দৌর্বল্য-দোষে'র জন্য নিন্দিত হইয়া থাকে। 'অবিভক্তত্বা' অর্থাৎ 'রূপ-ভেদের' অভাব একটি চিত্র-দোষ; যে রেখাবিন্যাস 'রূপভেদ' সাধিত করে, তাহা যদি স্থূলতার অবতারণা করে, তবে তাহাও একটি চিত্র-দোষ। তাহার নাম —'স্থূলরেখাত্ব'। সেইরূপ বর্ণসাঙ্কর্যও একটি চিত্র দোষ। যথা,—

'দৌর্বল্যং স্থূলরেখত্বমবিভক্তত্বমেব চ।
বর্ণানাং সঙ্করশ্চাত্র চিত্র-দোষাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

পঞ্চম অঙ্গ-সাদৃশ্য।

'দৃশ্যের' সহিত তুল্যতার নাম 'সাদৃশ্য'। 'দৃশ্য' কি,—তাহা বিবৃত না হইলে, 'সাদৃশ্য' কি,—তাহা বুঝিতে পারা যায় না। প্রত্যেক বস্তুতে দুইটি বিষয় বর্তমান,—'বস্তুসত্তা' এবং 'বস্তুদৃশ্য'। গো একটি চতুষ্পদ জীব। কিন্তু সকল প্রকার অবস্থানে তাহার পদচতুষ্টয় সমানভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই নাম 'দৃশ্য'; এবং তাহার সহিত তুল্যতা সাধনের নাম —'সাদৃশ্য'। পাশ্চাত্য শিল্প-সমালোচক রাস্কিনও এই কথা বুঝাইবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন,—যে বস্তুতে যাহা আছে বলিয়া জান, তাহা অঙ্কিত করিও না; যাহা দেখিতে পাও তাহাই অঙ্কিত কর। 'দৃশ্য' দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—বাহ্য এবং আন্তর। 'দৃশ্য' বাহ্যজগতেই বর্তমান থাকুক, অথবা অন্তর্জগতে কল্পিত হউক, যাহা 'দৃশ্য' তাহারই সহিত সাদৃশ্য আবশ্যক। পাশ্চাত্য শিল্পে ভাবাত্মক এবং আকারাত্মক নামে যে দুইটি প্রভেদ কল্পিত হইয়া আসিতেছে, ভারত-শিল্পে তাহা অপরিজ্ঞাত। 'আকার' ভারতশিল্পের 'অ-বিষয়', 'দৃশ্যই' তাহার শিল্পের 'বিষয়'। দৃশ্য, দৃশ্য তাহা আকার হইতে পৃথক। আকারের অন্তরালে রূপ, ভাব, লাবণ্য ও দৃশ্য বর্তমান আছে; তাহাই ভারত-চিত্রের 'বিষয়'; এবং তজ্জন্য ভারত-চিত্র আকারের অনুকরণ নহে;—অনুভূতির অভিব্যক্তি। 'সাদৃশ্য' শব্দে ইহাই সূচিত হইয়াছে। 'সাদৃশ্য' তুল্যতা নহে, তাহা তুল্যতার হেতু।

ষষ্ঠ অঙ্গ —বর্ণিকা-ভঙ্গ।

··যেখানে যে বর্ণের সমাবেশ আবশ্যক, সেখানে সেই বর্ণের বিন্যাসের নাম 'বর্ণিকা-ভঙ্গ। ইহার ব্যতিক্রমে বর্ণের সঙ্করতা ঘটিয়া থাকে; তাহা একটি সুপরিচিত চিত্র-দোষ। ভারতীয় চিত্র-সাহিত্যে চিত্র-বস্তু ও চিত্রাঙ্কনের বস্তু —দুই শ্রেণীর রচনা দুই নামে পরিচিত হইয়াছিল, — 'চিত্র-সূত্র' এবং 'চিত্রকল্প'। 'চিত্র-সূত্রে' চিত্রের মূল প্রকৃতি, এবং 'চিত্র-কল্পে' চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।···

স্থান, কাল, চেষ্টা, একই মনুষ্যের 'দৃশ্যকে' বিবিধ-ভাবে প্রদর্শিত করে; সুতরাং চিত্র সম্পূর্ণরূপে আকারাত্মক হইতে পারে না। তাহা বাহ্য-বস্তুর আকার অবলম্বনে অভিব্যক্ত হইলেও, আকারানুকৃতি নহে, দৃশ্য-সৃষ্টি। তাহার সহিত অস্থিসংস্থান-বিদ্যার সম্পর্ক বড় অধিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অস্থি অদৃশ্য; তাহার অস্তিত্ব কোন কোন স্থলে ঈষৎ প্রতিভাত হইলেও, দূরবর্তী দর্শনস্থান হইতে অদৃশ্য। সুতরাং তাহা চিত্রে প্রদর্শিত হইতে পারে না। কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থি-শিরা মাংসপেশী ইত্যাদির স্বাভাবিক সংস্থানের জন্য যে-সকল নতোন্নত 'দৃশ্য' স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এবং দূরবর্তী দর্শন স্থান হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা চিত্রে প্রদর্শিত হইত। শিরাগুলি প্রদর্শন করা অনুচিত বলিয়া যে নিষেধ-বাক্য প্রচলিত আছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় — ভারত-চিত্র কি জন্য অস্থিসংস্থান-বিদ্যার উদাহরণরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সম্মত হয় নাই।· '—(ভারতবর্ষ, আশ্বিন,১৩২৯)।

কিন্তু যথার্থ সৃষ্টি বাঁধা-রাস্তায় চলে না। সৃষ্টি-কার্যে জীবনী-শক্তির অস্থিরত্ব আচার্য নন্দলালের প্রকৃতিসিদ্ধ। তাঁর এই শিল্পি-প্রকৃতির ক্রম-পরিণতি যথাক্রমে প্রকাশ পাবে।

॥ বিশ্বভারতীর সূত্রপাতে আচার্য নন্দলালের রূপ-চিন্তা ॥

শান্তিনিকেতনে সাজসজ্জার একটি সহজ আর অনাড়ম্বর ভাব আছে। এখানকার উৎসবে, অভিনয়ে আর নানা অনুষ্ঠানের বহিরঙ্গেও সেই সহজ পরিচয়টি সুপরিস্ফুট। এই সাজসজ্জার মধ্যে আছে একটি সুন্দর অথচ

সংযত রুচির প্রকাশ। এখানে নাই অনাবশ্যক জাঁকজমকের প্রয়াস। শান্তিনিকেতনের নিবিড় প্রাকৃতিক পরিবেশে এই সহজ সৌন্দর্য-বিকাশের মূলে রয়েছে স্বয়ং কবিগুরুর চিন্তাধারা আর শিল্পাচার্য নন্দলালের রূপকারিতা। আচার্য নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের ভাবনা বা বাসনাকে প্রকাশ করেছেন আপন মহৎ সৃষ্টির সামর্থ্যের দ্বারা। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-সমবায়ে শিল্পকলার আবশ্যিকতাকে কবি অনুভব করেছিলেন গভীরভাবে। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের সে অনুভূতি বাস্তবক্ষেত্রে যথাযথ রূপলাভ করতে সমর্থ হতো না আচার্য নন্দলালের মতো রূপদক্ষ শিল্পীকে না-পেলে। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথের মতো এক যুগন্ধর প্রতিভার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে না-এলে শিল্পী নন্দলালের প্রতিভার বিকাশ কোন্ পথে প্রধাবিত হতো, সে অনুমান করা খুব শক্ত নয়। নবাবঙ্গের শিল্পী নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে এনে তাঁর 'ভারত-ভারতী চিত্ত' 'রঞ্জিত-করা' তুলিকাস্পর্শে বিশ্বভারতীর ভাণ্ডারে 'নূতন বিত্ত' যোগাবার ভার অর্পণ করবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলেন বিশ্বকবি। তিনি বুঝেছিলেন, ভারতশিল্পের গঙ্গাপ্রবাহকে একমাত্র নন্দলালেরই 'শিবজটাসম' তুলিকা 'রেখাবন্ধনে বন্দী' করতে সমর্থ। —বিশ্বের পটে স্বদেশের নাম 'অক্ষয় বর্ণে' লেখবার যোগ্য অধিকারী একমাত্র তিনিই। নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে আনার মনোগত অভিপ্রায়ে রবীন্দ্রনাথ এই সংবর্ধন-ভূমিকা রচনা করেছিলেন ১৯১৬ সালে। এ প্রসঙ্গ আলোচনা আমরা পূর্বে বিশদভাবে করেছি। উপরন্তু, শিল্পী নন্দলাল আর কবি রবীন্দ্রনাথ পরস্পরকে কী গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তার বিবরণ ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পাবে।

নানা পদ্ধতিতে ছবি আঁকায় আচার্য নন্দলাল ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কিন্তু যৌবন-মধ্যাহ্নে শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে আলঙ্কারিক শিল্পসৃষ্টিতে। এবং এই দিক থেকে তিনি বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর এই আলঙ্কারিক প্রতিভার অসাধারণ প্রকাশ আমরা দেখতে পাই শান্তিনিকেতনে নানা নাট্যাভিনয়ে উৎসব-অনুষ্ঠানে আর অভিনন্দনের প্রত্যেকটি রূপসজ্জার বিন্যাসে। শান্তিনিকেতনে সৌন্দর্য-সাধনার যে সূত্রপাত হয় তার প্রেক্ষাপটে ছিল এখানকার প্রাকৃতিক আবেষ্টন। এখানকার গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত, বসন্তাদি ঋতুপর্যায়, প্রাত্যহিক সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, নির্জন নিশীথ রাত্রি, পূর্ণিমা রজনী —সব-কিছু বিশেষ ছাপ রেখে

যায় প্রত্যেকের মনের মণিকোঠায়। এই পরিবেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আনন্দ-পরিবেশনের যে আয়োজন করলেন, সে এই প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে নয়, এর সঙ্গে সম্পূর্ণ এক হয়ে গিয়ে। এবং এই আনন্দ-পরিবেশনের সঙ্গে রূপসজ্জার যে আয়োজন করা হলো তাতে যদি সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে সে সৌন্দর্য-সৃষ্টি সার্থক হতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ কবিপ্রতিভা আর নন্দলালের অসাধারণ শিল্প-প্রতিভার মণিকাঞ্চনযোগে শান্তিনিকেতনে সে প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠেছিল।

শান্তিনিকেতনের বাইরে সাজ-সজ্জায় সাধারণতঃ জাঁকজমকের যে সমাবেশ দেখা যায়, তার মধ্যে বাইরের সহজ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোনো স্থান নাই। শহরের রূপসজ্জা খানিকটা যেন শহুরে জীবনেরই যোগ্য হয়ে থাকে। কিন্তু শান্তিনিকেতনের কোনো অনুষ্ঠানে বহিঃপ্রকৃতি অঙ্গাঙ্গী হয়ে উঠে। সেইজন্যে শান্তিনিকেতনের বর্ষামঙ্গল, বসন্তোৎসবাদি যেভাবে জমে উঠে প্রাণস্পর্শ করে থাকে, বাইরের উৎসব-অনুষ্ঠানে সাধারণতঃ সে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ শহরে যা দেখা যায়, সে যেন উৎসবের কঙ্কাল। শান্তিনিকেতনের রূপসজ্জার আদর্শের এই হলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এবং এর প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা আচার্য নন্দলাল আর তাঁর সহযোগী শিল্পিগোষ্ঠী।

১৯২১ সালে বিশ্বভারতী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে, রবীন্দ্রনাথ শুরু করলেন নতুন ধরণের একটি গানের আসর বর্ষা-ঋতুকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে। তিনি এর নাম দিলেন, পুঁথি-ঘেঁষা নাম —'বর্ষামঙ্গল'। —কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বর্ষামঙ্গলের আয়োজন হলো সর্বপ্রথম। —সে কথা আগে বলা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা মতে, বিরাট মঞ্চের তিন দিকে দর্শকদের বসবার স্থান। আর মঞ্চের পশ্চাৎপটে ছিল শ্রেফ একটি নীল পর্দা। গায়ে তার আঁটা ছিল কাগজের তৈরি এক সারি হংস বলাকা। পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে তারা যেন মানস-যাত্রী। মঞ্চ সাজানো হয়েছিল বর্ষায়-ফোটা নানা ফুলে। গানের দলের ছেলে মেয়েদের গলায় ছিল সুগন্ধি টাটকা ফুলের মালা। অতি সরল আর একান্ত অলঙ্কারবিরল করে তোলা হয়েছিল মঞ্চটিকে। —এর পরে শান্তিনিকেতনের প্রায় সব উৎসব-অনুষ্ঠানই অনুষ্ঠিত হতে লাগলো এই রকম অলঙ্কারবিরল আর ব্যঞ্জনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে।

শান্তিনিকেতনে শরৎ বা বসন্ত ঋতুর উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্যে মনোনীত হতে লাগলো মুক্ত অঙ্গন, আর আম্রকুঞ্জে হলে, কুঞ্জটিকে সাজিয়ে নেওয়া হতো একটুখানি বৈচিত্র্য দিয়ে। ১৯২২ সালে শান্তিনিকেতনে আর কলকাতায় পরপর অভিনীত হলো 'শারদোৎসব' —ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। এতে দেখা গেল, রঙ্গমঞ্চসজ্জার আর একটি নতুন রূপ। এ রূপের বৈশিষ্ট্য হলো একমাত্র রঙিন কাপড়ের বর্ণচ্ছটা।

নটরাজ-আঁকা, বহুবার ব্যবহার-করা পুরাতন ড্রপসীন, আর গাছ-পালা, ফুলফল দিয়ে শান্তিনিকেতনে প্রথম যুগে স্বাভাবিক দৃশ্য রচনা করে যে অভিনয় হতো, সে-ধারাও পরিত্যক্ত হলো এখন থেকে। মঞ্চসজ্জা গতি নিলে রঙের খেলার সহজ সরল অলঙ্করণের দিকে। এর পর থেকে যত রকমের নাটক বরাবর শান্তিনিকেতনে, কলকাতায় বা বাইরে অভিনীত হয়েছে তার মঞ্চসজ্জা রচনা করা হয়েছিল এই একই আদর্শ অনুসরণ করে। জোড়াসাঁকোর বাড়ির যুগ, শান্তিনিকেতনে প্রথম কুড়ি বছরের যুগ পার হয়ে মঞ্চসজ্জার এইবার তৃতীয় যুগ শুরু হলো। —এই তৃতীয় যুগের প্রবর্তক হলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথদের সঙ্গে নন্দলাল রঙ্গমঞ্চসজ্জায় কাজ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের আদর্শের মধ্যে তিনি আপনাকে আবদ্ধ রাখেননি। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একবার রঙ্গমঞ্চসজ্জা মনোমত না হওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নন্দলাল বলেন, —'সেবারে মনটা বড়ো দমে গেল। স্টেজের পিছন দিকে অন্ধকারের মধ্যে চুপটি করে বসে ভাবছি। গুরুদেব আমার খোঁজ করতে করতে কখন যে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন, টের পাইনি। আমি পিছনে ফিরে চমকে উঠে দাঁড়াতে, তিনি মৃদুস্বরে বললেন, —'নন্দলাল ভাবছো? —ভাবো।'

শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে নন্দলাল তাঁদের উভয়ের অভিমত মঞ্চ সাজাতে লাগলেন। চেষ্টা করতে লাগলেন রঙ্গমঞ্চকে কতখানি সহজ সরল অথচ বিশেষ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করা যেতে পারে তারই। আচার্য নন্দলালের এই কাজে প্রাধান্য পেলে রঙের ছন্দোময় বিন্যাস। এই বিন্যাস মনে আনে একটি স্নিগ্ধতা আর গভীর প্রশান্তি। এই বিন্যাস মন ভোলায় না দুর্বল রসমুগ্ধতায়; মনে জাগায় বিরাটের ব্যঞ্জনা। রঙ্গমঞ্চের এই

পরিবেশে নট-নটী যখন অভিনয় করে, রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জা তখন নিজেকে জাহির করে না আলাদা করে। এ হলো ঠিক্ যেন ভারতীয় ছবির ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড্। আছে, কি না আছে, ছবি দেখবার সময়ে তা বোঝবার জো-টি নাই। শিল্পাচার্য নন্দলালের প্রবর্তিত এই রঙ্গের বিন্যাসে রয়েছে দিশি ছবির আদর্শ। পুরাতন ভারতীয় চিত্রে যে-কটি রং প্রধান, এই মঞ্চসজ্জায় তিনি বিশেষভাবে ব্যবহার করলেন সেই রংগুলিকেই। রঙ্গের বিন্যাসেও প্রাধান্য দিলেন সেই ধারাকে। রংগুলিকে এভাবে সাজানোর আরও একটি গূঢ় কারণ ছিল। নীল রঙ্গের পর্দার প্রেক্ষাপটে জেগে উঠলো সুদূরের ইঙ্গিত। সেই ইঙ্গিতটিকে আরও মধুর করে প্রকাশের বাসনা থেকেই স্থান পেলে অন্য রংগুলি। নীলের বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়ে তিনি মঞ্চের সামনে লাগালেন হলদে আর লাল। আর এই আদর্শে মঞ্চ পরিকল্পনা উপযুক্ত হয়ে উঠলো, সামাজিক বা ঐতিহাসিক যে কোনো বিষয় নিয়ে লেখা নাটক-পরিবেশনের পরিবেশরূপে।

১৯২৩ সালে অভিনীত হলো 'বিসর্জন'। এতে অভিনয় করলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মঞ্চসজ্জা করা হলো নন্দলাল-প্রবর্তিত এই আদর্শকে ভিত্তি করে। এই সময়ে বোধ হয় কারোরই আর মনে জাগেনি প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের রিয়্যালিস্টিক্ দৃশ্যসজ্জা আমদানির কথা। —(এই অংশটি আচার্য নন্দলালের নির্দেশমতে 'রূপকার নন্দলাল' গ্রন্থ থেকে পরিবর্তিত আকারে গৃহীত।)

॥ শান্তিনিকেতন-সংবাদ, ১৯২৩-২৪ ॥

তখন বেশির ভাগ সাধারণ বক্তৃতার আয়োজন করা হতো আশ্রমের কলাভবনে। হেতু হলো মনোরম দৃশ্যসজ্জা। ১৯২৩ সালের ৪ঠা মাঘ (১৩২৯) সন্ধ্যায় পিয়ার্সন সাহেব কলাভবনে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিষয় হলো —উত্তরবঙ্গে বন্যাপীড়িত লোকেদের অবস্থা বর্ণনা। তিনি স্বচক্ষে ঐ-স্থানের প্রজাদের অবস্থা দেখে এসেছিলেন। বর্তমানে তাদের এই তিনটি প্রধান অভাব (১) হালের গরু (২) নতুন বৎসরের জন্যে বীজ-ধান (৩) আহার্য। পিয়ার্সনের মতে, এই অভাব-তিনটি দূর না হওয়া

পর্যন্ত তাদের অবস্থার আর উন্নতি হবে না। বর্তমানে যেখানে যে-ধান মহার্ঘ মূল্যে বিক্রী হচ্ছে তার অধিকাংশই তুঁষ, আর যে-চাল তারা খাচ্ছে তা সবই ক্ষুদ, সে-ও আবার অখাদ্য। সভার পরে পিয়ার্সন সাহেব সকলকে সেই ধান আর তুঁষ নমুনাস্বরূপ দেখিয়েছিলেন।

কিছুদিন আগে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশ্রম পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। পঁয়ত্রিশ বছর পরে তিনি এই দ্বিতীয়বার আশ্রমে এলেন। প্রথমবার বালক বয়সে এসেছিলেন ১৮৮৮ সালে শান্তিনিকেতন-আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়ে। এবারে তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে আমবাগানের বেদীটির ওপর আর সামনের দিকে বিশ্বভারতীর শিল্পী ছাত্রীরা বিচিত্র বর্ণের আলপনায় সাজিয়েছিলেন। আলপনার মাঝখানটিতে একটি মঙ্গলঘটে নতুন আমের মঞ্জরী সাজানো ছিল। আশ্রমবাসী সকলেই সেখানে সমবেত হয়ে আচার্যের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। যথাসময়ে তিনি এসে উপস্থিত হলে সংস্কৃতে একটি শান্তিময় মন্ত্র পাঠ করা হলো। মন্ত্রপাঠের পরে গানের দলের ছেলেরা একটি গান গাইলেন। পূজনীয় গুরুদেব এর পরে তাঁকে সম্বোধন করে, কি উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছেন, এবং ছেলেবেলা থেকে কেমন করে তিনি ইস্কুলের পণ্ডিতের হাত এড়িয়ে বাণী-নিকুঞ্জে মালাকরের পদ পেয়েছিলেন সে বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। তার পর তিনি অবনীন্দ্রনাথকে তাঁর অভাবে বিশ্বভারতীতে আচার্যের আসন অধিকার করতে বলেন। আচার্য অবনীন্দ্রনাথ এর উত্তরে বললেন, —তিনি এই চল্লিশ বৎসর ধরে শিল্পকলার সাধনা করে আসছেন। এর মধ্যে অনেক সময়ই শিক্ষা দিতে কেটেছে। তিনি যৌবনে সেই বাইশ বছরের সময় যে আর্টের দেখা পেয়েছিলেন তাকে আবার খুঁজে পাবার জন্যে পাঁচ বছর নিবিষ্টভাবে কাজ থেকে অবসর নিয়ে তারই সাধনায় নিযুক্ত হবেন —এই সঙ্কল্প করেছেন।

এর পর অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, অসিতবাবু ও সুরেনবাবু প্রভৃতিকে তাঁর গুরুদক্ষিণা দিতে বলেন। তিনি বলেন, —আমাদের দেশের শিশুরা ছোটবেলায় এমন কোনো খেলনা পায় না, যার সাহায্যে তাদের শিশুচিত্ত অনায়াসে কল্পরাজ্যে বিচরণ করতে পারে। এই সমস্ত কচি শিশুর হাতে সুন্দর সুন্দর খেলনা দিতে পারলে তবেই

তাঁদের গুরুদক্ষিণা দেওয়া সার্থক হবে। এই রকমে শিশুকাল থেকেই নানা রকম খেলনার সাহায্যে শিশুদের চিত্তে শিল্পের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়ে দিতে হবে। বড়ো হয়ে আমরা যে শিল্পসাধনা করি, শিশুকাল থেকেই তার সঙ্গে যদি আমাদের পরিচয় না ঘটে তা-হলে আমাদের সে-সাধনা কিছুতেই সম্পূর্ণ হবে না।

অবনীন্দ্রনাথ আরও বলেন, —প্রত্যেক শিল্পীকেই স্বাধীনভাবে নিজের আদর্শ চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে যেন তারা তাদের অধ্যাপকের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে। কেননা অন্যের ছবি আঁকতে গেলে প্রথমতঃ, কিছুতেই তারা সে আদর্শকে সম্পূর্ণ লাভ করতে পারবেনা। দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের নিজেদেরও যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাও তারা হারিয়ে ফেলবে। তিনি বলেন যে, —তিনি নিজে কারও কাছ থেকে শিক্ষা পাননি —তিনি যে আর্ট সৃষ্টি করেছেন তা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের। তেমনি প্রত্যেক শিল্পীই তার আর্টে এমন জিনিস প্রকাশ করুক, যেটি কেবল তারই জিনিস, অন্যের কাছ থেকে ধার করা নয়। —এর পর সেদিনকার মতো সভা ভঙ্গ করা হয়।

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ কলাভবনে শিল্পীদের নিয়ে আর্টের বিষয় আলোচনা করেছিলেন, আশ্রমের শিশুদের চমৎকার একটি গল্প বলেছিলেন। এবং একদিন রান্নাঘরে গিয়ে আহার্য সম্বন্ধে ছেলেদের সঙ্গে অনেক কৌতুকালাপ করেছিলেন। তিনি যখনই শিশুবিভাগে যেতেন অমনি শিশুর দল তাঁকে ঘিরে গল্প বলবার জন্যে ব্যস্ত করত। আর তিনিও হাসতে হাসতে গল্প শুরু করতেন।

বিশ্বভারতীর অন্য কাজ-কর্মের মধ্যে ১৩২৯ সালের (১৯২৩) মাঘ মাস থেকে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাচ্ছি সেগুলি হলো, এই সময়ে গুরুদেব মন্দিরে নিয়মিত উপদেশ দিয়েছেন। আশ্রমের বিভিন্ন স্থানে তাঁর 'বলাকা' কাব্যের ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেছেন। নূতন গান রচনা করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করেছেন উইন্‌টারনিজ সাহেব। এর মধ্যে আশ্রমে নূতন অধ্যাপক নিয়োগের নির্বাচন হয়ে গেল।

১৯২৩ সালের ফাল্গুন মাসে যথাপূর্ব মন্দিরে উপদেশ ও 'বলাকা'

আলোচনা চলছে। এর মধ্যে মহর্ষিদেবের স্মৃতিসভায় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বক্তৃতা করেছেন। ৬ই জানুয়ারী উইনটারনিট্সের বক্তৃতা হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে। এই বক্তৃতা চলেছিল ধারাবাহিকভাবে।

ফাল্গুন মাসে (১৯২৩) আশ্রমের অধ্যাপক মহাশয়েরা মিস্ ফ্লাউমের গৃহে দু দিন সমবেত হয়েছিলেন। শ্লোমিও ফ্লাউম হলেন ইহুদী মহিলা। শিশুশিক্ষায় তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। আশ্রমবিদ্যালয়ের শিশুবিভাগের কাজে তিনি সহায়তা করতেন। এই সময়ে তিনি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে অধ্যাপক মহাশয়দের সঙ্গে শিক্ষাবিষয়ে নানারূপ আলোচনা করেন। এর পর অধ্যাপকেরা শ্রীযুক্ত পিয়ার্স'নকে নিয়ে কলাভবনে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধেও একদিন আলোচনা করেছিলেন। ২রা ফাল্গুন বৈকালে কলাভবনে আচার্য উইনটারনিটস্ 'Impression on India' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেছিলেন। তা ছাড়া, তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে বক্তৃতা চলছিল।

১৯২৩ সালের গরমের বন্ধে (১৩৩০) নন্দলাল মুঙ্গের-খড়্গপুর ঘুরে এলেন। পূজার বন্ধে গেলেন বক্রেশ্বর। আর ৭ই পৌষের পরে ২৯-১২-১৯১৩ তারিখে গেলেন বর্ধমানের গড়জঙ্গলে লাউসেন-ইছাইগড় দেখতে। বহু স্কেচ্ও করলেন। আমরা পরে এই ভ্রমণ বিবরণ সবিস্তর বলবো।

॥ শান্তিনিকেতন-কলাভবনে 'কারুসংঘ' বা 'বিচিত্রা' পত্তন, ১৯২৩ ॥

১৩২৯ সালের চৈত্র (১৯২৩) সংখ্যার (পৃ. ৩১-৩২) শান্তিনিকেতন-পত্রিকায় আঁদ্রে কার্পেলেসের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির নাম হলো —Vichitra। কলাভবনে কারুসংঘের উদ্যোগপর্বের ইতিহাসস্বরূপে প্রবন্ধটির মূল্য অসাধারণ লেখিকা যা বলেছেন, তা এখানে উদ্ধৃত হলো। আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই বিষয়ে পরে বলব।

A few months ago a new Department was added to Kala Bhawan, a new opening was given to creative qualities of the artists and students of our Ashram : it is the school of Applied Arts and Crafts which Sree Abanindranath

Tagore (who is taking a keen interest in our effort) has told us to call 'VICHITRA'.

What are the aims of our Vichitra ? They are numerous and very different but all have in the same ideal : to make in Santiniketan a real centre of revival for Arts and Crafts, to make our Ashram the cradle of a new decorative Art based on Indian traditions, but suited to the new ideals of modern life.

We have a high ideal in front of us and great ambitions, and we realise that it is not in a few months possible yet to make anything worthy of our ideal. We have only made an attempt and are still in the period of 'beginning'. Yet we have had a few encouragements which have come as a proof that we are not trying to start something useless, but that we are answering true needs.

We began by exhibiting in the Mela, a few months ago, a few of the small objects made in our new-vichitra ; they are sold and several professors of the Ashram encouraged our timid efforts by bringing us spontaneously some of their books to be bound.

We are given a small room in the Guest House, a 'Prodarshani' where we exhibit specimens of our work, and a few works from our Vichitra were shown for the first time to the Calcutta public, and some interest was roused amongst Visitors resulting in several encouraging orders.

All this shows that we must begin to organise our work on a larger scale and with the help of all the friends of Santiniketan.

What are the practical aims of our Vichitra ? —To

applied arts, might come to us from time to time from different parts of India.

—Widows and girls wanting to learn a trade or craft that would not interfere with their domestic duties should also study at Viçhitra.

Our work go s on in a pleasant place, with all the walls gaily decorated with different 'Alpanas'. The nucleus of a museum of decoration and popular Art serves as a source of inspiration, and any object serving that purpose will be most gratefully accepted by us for the museum.

It must be well understood by all those who are willing to help us that we are not trying to create luxurious objects which would not be in harmony with the spirit of the Ashram and its surroundings—We want to create simple objects made out of simple materials, but of perfect and refind worksmanship and finish.

Every object made in our Vichitra will have the stamp of 'Santiniketan' not only because it will have been made on the spot, but because it will have the true spirit of Santiniketan—a modern ideal based on the Indian tradition.

A short list of the objects we are making might interest the readers of this notice :

—All sorts of new and artistic book-binding, from the simplest ones in jute to bose with special designs meant for amateurs.

—Embroidery :—Ladies, children's, and household requisits, bags, cushions etc:

—Furniture—book-stands, screens, looking glasses, pots, boxes.

—Terra Cotta Tiles, frescoes for the decoration of the house etc.

Artists would be willing to go to distant places to design and to decorate artistic interiors, and to make designs for jewelry etc. etc. Andree Karpeles

১৩২৯ সালের চৈত্র মাসে (১৯২৩) আঁদ্রে কার্পেলেসের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। আমরা এ থেকে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ভবিষ্যৎ কারুসংঘের পত্তন হচ্ছে দেখতে পেলুম।

এই সময়ে শান্তিনিকেতন থেকে চিত্রশিল্পী অসিতকুমার হালদার য়ুরোপ যাত্রা করলেন। তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালি ভ্রমণ করবেন, স্থির হলো। পিয়ার্সন সাহেবও এই সময়ে বিলাত যাত্রা করলেন। শান্তিনিকেতন-কলাভবন থেকে অধ্যাপনা ছেড়ে অসিতকুমারের এই যাত্রা শেষ যাত্রা হল। তিনি বিলেত থেকে ফিরে এসে রাঁচীতে তাঁদের সাম-লং-এর বাড়িতে গিয়ে তাঁর পিতার কাছে দেখলেন, বিশ্বভারতী তাঁকে কলাভবনের কাজ থেকে ছাড়পত্র পাঠিয়েছেন।

॥ শান্তিনিকেতন-সংবাদের অনুবৃত্তি ॥

১৩৩০ সালের বৈশাখ (১৯২৩) মাসে যথারীতি মন্দির চলছে। বলাকা ব্যাখ্যান হচ্ছে, গুরুদেব শেলীর ওপর বলছেন। উইন্‌টারনিট্‌স্ তাঁর বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। লক্ষ্মীর ব্রতকথা, গান —এই সব প্রকাশিত হয়েছে।

৩রা বৈশাখ ১৬-এ এপ্রিল থেকে ১৭ই আষাঢ় বা ২৪-এ জুন পর্যন্ত আশ্রম বন্ধ ছিল। আশ্রমবাসী প্রায় সকলেই গরমের এই ছুটিতে বাড়ি গেলেন। আশ্রমের কয়েকজন অধ্যাপক আর কলাভবনের শিল্পী-ছাত্রেরা এই ছুটিতে 'বদরিকাশ্রম'-ভ্রমণের সংকল্প করেছেন। তাঁরা এর মধ্যে রওনা হয়ে গিয়েছেন। শিল্পীরা সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলিও এঁকে আনবেন মনস্থ করেছেন।

এর পর জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে কলাভবন সম্পর্কে কোনো উল্লেখযোগ্য সংবাদ নাই। শ্রাবণ মাসে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন সংবাদের

পরে, সর্বশেষে কলাভবনের উল্লেখ করা হয়েছে। সঙ্গীত-বিভাগের অধ্যক্ষ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আচার্য রবীন্দ্রনাথের গান শিখান। আর মরাঠী ভীমরাও শাস্ত্রী হিন্দী পণ্ডিত গান ও বীণা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। চিত্র-বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। অসিতকুমার বিলাত রওনা হয়ে গিয়েছেন।

ভাদ্রমাসের সংবাদ, নববর্ষে মন্দিরের উপদেশ, বলাকা ব্যাখ্যান, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা ছাড়া, সুকুমার রায়ের মৃত্যুতে শোকের ছায়া। আশ্বিন মাসে চলতি সংবাদ ছাড়া, এই পর্বে বিশ্বভারতীর আদর্শ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে শোক-সংবাদ হলো : বিলাত থেকে ৩০-এ সেপ্টেম্বর সকালে শ্রীযুক্ত এ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের কাছে তারযোগে খবর আসে যে আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পিয়াসন সাহেব ইটালীতে ২৪-এ সেপ্টেম্বর (১৯২৩) আকস্মিক দৈব দুর্ঘটনায় ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। সেই সময়ে তাঁর ভাই আর বোন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। নিচে লেখা কথা কটি cable-এ লেখা ছিল :—

Pearson died, 24th September, result accident, Italy, his brother and sister with him. —এর অতিরিক্ত আর কোনো খবর তখনও আশ্রমে এসে পৌঁছয়নি। পিয়ার্স'নের এই আকস্মিক মৃত্যুতে আশ্রমবাসী সকলেই মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি আগামী নবেম্বর (১৯২৩) মাসে আবার আশ্রমবাসীদের মধ্যে ফিরে আসবেন কথা ছিল। তাঁর চিঠিপত্রেও তিনি যে অবিলম্বে আশ্রমে ফিরে আসছেন তাও জানিয়েছেন।

এই সময়ের আশ্রম-সংবাদ হলো : বিশ্বভারতীর উত্তর ও পূর্ব বিভাগে ছাত্রীরা বিনোদন-পর্বে ঋতুমঙ্গল অভিনয় করেন। দু-জন করে ছাত্রী এক-একটি ঋতুর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের বেশভূষাতেও প্রত্যেকটি ঋতুর পরিচয় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছিল। এইভাবে তাঁরা পূজনীয় গুরুদেবের ছয়টি ঋতুর উপযোগী ছয়টি গান গেয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় আর তাঁর ছাত্রেরা সভাগৃহ সাজাবার ভার নিয়েছিলেন। সেদিনে আবীরের আলপনাটি খুব চমৎকার হয়েছিল।

১৩৩০ সালের কার্তিক মাসে (১৯২৩) খবর হলো : দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম-

প্রদর্শনী' নামে 'পদাবলী' বেঁধে প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, বলাকা, শিশুর ইচ্ছাশক্তি, বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আশ্রম-সংবাদ হলো: শ্রদ্ধাস্পদ পিয়ার্সন সাহেবের স্মৃতিরক্ষার জন্যে কি করা হবে সে-বিষয়ে নির্ধারণ করবার জন্যে কলাভবনে (শিশুবিভাগে সন্তোষালয়ে) —একটি সভা হয়েছে। সভায় এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব বলেন, হাঁসপাতালের উন্নতিসাধন করা মিঃ পিয়ার্সনের অত্যন্ত প্রিয় চিন্তা ছিল। তিনি 'শান্তিনিকেতন' নামে ইংরেজীতে যে বই লিখেছেন তার লভ্যাংশ এই হাঁসপাতালের সাহায্যকল্পে দান করেছেন। এ ছাড়া, তিনি বিদেশ থেকে মাঝে মাঝে হাঁসপাতাল-ফাণ্ডে সাময়িক দানও পাঠিয়েছেন। তাঁর সেই টাকায় হাঁসপাতালের নানা রকম সংস্কার করা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, হাসপাতালের উন্নতি করা তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। সেইজন্যে এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব সকলকে জানালেন যে, মিঃ পিয়ার্সনের নামে এখানে একটি চিকিৎসালয় খোলা হবে। এর এক অংশে গরীব গ্রামবাসীদিকে বিনা পয়সায় ঔষধ দান ও চিকিৎসা করা হবে। পূজনীয় গুরুদেবও এ বিষয়ে সম্মতি দিয়েছেন। নতুন হাসপাতালের জন্যে ত্রিপুরার পরলোকগত মহারাজা যে দান অঙ্গীকার করেছিলেন তার কিছু পাওয়া গেছে। বাকি টাকার জন্যে এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব পুজোর ছুটিতে ত্রিপুরায় গমন করবেন।

অগ্রহায়ণ মাসে মন্দিরে উপদেশ, বলাকা ব্যাখ্যান, আলোচনা, আয়ুর্বেদ সাহিত্য আলোচনাদি চলেছে। এই মাসের গুরুত্বপূর্ণ আশ্রম-সংবাদ হলো: আশ্রমের লাইব্রেরী-গৃহের উপরতলার নির্মাণকার্য প্রায় শেষ হয়ে এলো। আগামী ৭ই পৌষের (১৩৩০ / ১৯২৩) সময়ে ঐ গৃহ কলাভবনের শিল্পীরা অধিকার করবেন।

লাইব্রেরী-গৃহের দোতলা নির্মিত হয়েছিল শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের পরিকল্পনা অনুসারে। দোতলার বারাণ্ডার থামগুলিতে তিনি দিয়েছেন আশ্রমের তালগাছের আদল। এর বারাণ্ডার দেওয়ালে দেওয়াল-চিত্র আঁকা হলো পরে —১৯১৭ সালে। তার বিবরণ যথাসময়ে দেওয়া হবে। এই দোতলার পশ্চিমদিকের ঘরটি দখল করলেন বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়; আর বাকি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা সমগ্র হল-ঘরটি প্রায় ছয়

বছরের জন্যে দখল করলেন আচার্য নন্দলাল ও তাঁর কলাভবন (ডিসেম্বর ১৯২৩)। ১৩৩০ সালের মাঘ মাসের (জানুয়ারী, ১৯২৪) খবর হলো, এবার কলাভবনে ভারতীয় চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল। প্রাক্তন ছাত্রদের সভার পরে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় অভ্যাগতদের Picture Post card আর সমস্ত ছবি দেখিয়েছিলেন। তাঁরা চিত্রকরদের আর মহিলা-শিল্পীদের হাতের লাক্ষানুরঞ্জিত সৌখিন দ্রব্যাদির খুব প্রশংসা করেন।

শ্রীপঞ্চমীর দিন সন্ধ্যাকালে মহাসমারোহে গানের সুরে বসন্তের উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে। শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবু, সুরেন্দ্র বাবু আর কলাভবনের শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রী সমস্ত দিন পরিশ্রম করে কলাভবনটিকে উৎসব তিথির অনুকূল করে তুলেছিলেন। একদিকে বৈতালিকদের বসবার স্থানটি বিচিত্র বর্ণের আচ্ছাদনে রচিত হয়েছিল। আর সেইখানটি দু-টি সুদৃশ্য বীণাযন্ত্রে খচিত ছিল।

১৩৩০ সালের ফাল্গুন সংখ্যার শান্তিনিকেতন-পত্রিকায় সংবাদ বের হয়েছে: 'বিখ্যাত শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় জগদানন্দবাবুর 'পাখী' ও 'বাংলার পাখী' বই দু-খানির জন্যে কয়েকখানি ছবি এঁকে দিয়েছেন। এই বিষয়ে জগদানন্দবাবু লিখেছেন: 'সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় এবং বিশ্বভারতীর কলাবিভাগের ছাত্র শ্রীমান বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব-বর্মা এই পুস্তকের কয়েকখানি ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন।' —(পাখী, ১৩৩১)। 'বাংলার পাখী' (১৩৩১) গ্রন্থে গ্রন্থকার লিখেছেন: 'পুস্তকখানির প্রচ্ছদ-পট এবং শিরস্ত্রাণের অধিকাংশ চিত্রই স্বনামধন্য চিত্রকলাবিদ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের অঙ্কিত। রঙিন ছবিখানি বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীমান মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত অঙ্কন করিয়াছেন।' —এই সকল উক্তির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করতে পারি, আচার্য নন্দলাল কতখানি শ্রদ্ধার আসন পেতে বসেছেন প্রতিবেশী আশ্রমবাসীদের হৃদয়ে। জগদানন্দবাবুর প্রসঙ্গে আমরা পূর্বে এ-সব কথার উল্লেখ করেছি।

এর পরে বের হয়েছে চীন-যাত্রার খবর (বৈশাখ, ১৩৩১।১৯২৪)। পূজনীয় গুরুদেবের চীন-যাত্রা উপলক্ষে তাঁর আশ্রমত্যাগের পূর্বদিনে সায়াহ্নে একটি সভার অধিবেশন হয়। পুস্তকালয়ের সম্মুখে চন্দ্রালোকতলে সকলে সমবেত হলে সংস্কৃত মাঙ্গলিক পাঠ করে সভার কাজ আরম্ভ

হয়। সভার পূজনীয় গুরুদেব তাঁর চীন যাত্রার উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। সেই সভায় পূজনীয় আচার্যদেবের সহযাত্রী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় ও শ্রীযুক্ত এলমহার্স্টকেও এতদুপলক্ষে অভিনন্দিত করা হয়। —আষাঢ় মাসে ১৩৩১ এঁরা ফিরে আসেন। —কয়েকদিন পূর্বে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় দীর্ঘ ভ্রমণের পরে আশ্রমে ফিরে এসেছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনার জন্যে শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রীমহাশয় ও নেপালবাবু স্টেশনে গিয়েছিলেন।

॥ কলাভবন-বাড়ি বা 'নন্দন'-প্রতিষ্ঠার পর্ব, ১৯২৩-২৯ ॥

আমরা পূর্বে বলেছি, ১৯২৩ সালের নবেম্বর মাসের গোড়ার দিকে কবি গুজরাট ভ্রমণে গেলেন। ফিরে এলেন পৌষ-উৎসবের আগে। এবার কাঠিয়াবাড়-সফরের ফলে, রাজাদের কাছ থেকে যে অর্থ-সংগ্রহ হলো তাই দিয়ে শান্তিনিকেতনে 'কলাভবনের' অট্টালিকা তৈরি হতে লাগলো। এই বাড়ির প্ল্যান প্রস্তুত করলেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ তাঁর 'নতুন'দার সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে। প্রথমে স্থির হলো, এ-বাড়ি হবে দোতলা। পরে স্থির হলো, আপাততঃ একতলা হোক, পরে দোতলা করা হবে। কলাভবনের মূল বাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট স্টুডিও-ঘর সব তৈরি শেষ হতে প্রায় ছয় বৎসর লাগলো। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কলাভবনের ম্যুজিয়মের দ্বারোদ্ঘাটন হলো। এই উপলক্ষে গুরুদেব কবিতা লিখলেন; বাড়িটির নাম দিলেন —'নন্দন':

> হে সুন্দর, খোলো তব নন্দনের দ্বার,
> মর্ত্যের নয়নে আনো মূর্তি অমরার।
> অরূপ করুক লীলা রূপের লেখায়
> দেখাও চিত্তের নৃত্য রেখায় রেখায়।।

'কলাভবন'-বাড়িতে প্রদর্শনী সাজাবার জন্যে ১৯৩৮ সালে একটি প্রশস্ত কক্ষ সংযোজন করিয়ে তার নাম রাখা হলো —'হ্যাভেল হল্'। এ সব প্রসঙ্গে যথাসময়ে বিশদভাবে বলা হবে।

এই বিষয়ে নন্দলাল বলেন, —'কলাভবনের জন্যে গুরুদেব টাকা

যোগাড় করলেন। তিনি প্রায় এক লাখ টাকা পেয়েছিলেন। 'দ্বারিক' থেকে তার পশ্চিমে 'সন্তোষালয়ে', সন্তোষালয় থেকে তার পশ্চিমে লাইব্রেরীর ওপরতলায়। —আবার তার পশ্চিমে এই নতুন বাড়ি —'নন্দন'। দেখ, পুব থেকে পরপর আমাদের কলাভবনের গতি হচ্ছে পশ্চিমে'। তখন ওঁরা কলাভবন-বাড়ি তৈরি করতে চেয়েছিলেন আরও দূরে —পশ্চিমে। কিন্তু আমরা আশ্রম-ছাড়া হতে চাই না। তাই আপাততঃ 'নন্দন'-ঘরেই স্থিতি হয়েছে। সেই এক লাখ টাকার সুদ থেকে আমাদের বেতন-টেতন সব চলতে লাগলো। কলাভবন বাড়ির plan তৈরি করলেন আমাদের সুরেন। কলাভবনের 'নন্দন'-নাম দিয়েছিলেন গুরুদেব কবিতা লিখে। Aesthetic অর্থে সুরেন দাশগুপ্তের বাঙ্গালা অনুবাদ —'বীক্ষাশাস্ত্র' নামটা ঠিক্ নয়। সব Connotation নাই ওতে। 'নন্দন' কথাটা সব দিক্ থেকেই ভালো। সঙ্গীতভবনের নাম দিয়েছিলেন গুরুদেব —গন্ধর্বভবন'।'

১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসের (কার্তিক, ১৩৩৫) সংবাদ হচ্ছে:

The Kala Bhavana building for which a sum of Rs. 30 000/ was sanctioned in December, 1927 is progressing very favourably and should be available for use next term. This will provide adequate accommodation for the fast growing Art Museum. The first floor of the present Library building will then become available for the Library and the Vidya-Bhavana.

॥ বিশ্বভারতীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষী-সঙ্গমে, ১৯১৪-৩৪ ॥

॥ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ॥

শান্তিনিকেতনে বোলপুর-ব্রহ্মচর্যাশ্রম ক্রমে দু-ভাগে ভাগ হলো ১৯১৯ সালে বিশ্বভারতীর উদ্যোগপর্বে। যজুর্বেদ থেকে 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' বাণী নির্বাচন করে শাস্ত্রী মহাশয় বিশ্বকবিকে তাঁর বিশ্বভারতীর মূল পরিকল্পনা সঠিক খাতে পরিচালিত করতে সহায় হয়েছিলেন। আচার্য নন্দলালের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি ছিল বিশেষ সম্ভ্রমের আর কিঞ্চিৎ দূরের।

কবি শাস্ত্রী মহাশয়কে পালি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করেন; পুত্র রথীন্দ্রনাথকে তাঁর কাছে অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' পড়তে বলেন আর অনুবাদ করান (১৯১৯)। শান্তিনিকেতনে মহাস্থবির ধর্মাধারের ক্লাসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমাত্র শাস্ত্রী মহাশয়ই ছিলেন নিষ্ঠাবান ছাত্র (১৯১৯)। ১৯২১ সালে সৌকত আলি শান্তিনিকেতনে এলেন। সেই সময়ে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁকে নিজে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আশ্রমের সাধারণ ভোজনাগারে খাবার জায়গায় বসিয়েছিলেন বিশ্বমৈত্রীর আহ্বানে।

১৯১৯ সালের আগে শাস্ত্রী-মশায় একবার শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন মালদহের নিজের গাঁয়ে। তিনি দেশে টোল চতুষ্পাঠী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার সাধন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি। তখন কবি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, তাঁর ইচ্ছা পূরণ হবে শান্তিনিকেতনেই। ফলে, তিনি ফিরে এলেন।

১৯২২ সালে অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কলা-বিভাগের কাজ দেখে ফিরে যাবার পরে, সেকালের বাঙ্গালার লাট লর্ড লীটন শান্তিনিকেতন দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে তখনও অসহযোগ আন্দোলনের ঘোর কাটেনি। বিধুশেখর প্রমুখ ক'জন অধ্যাপক লাটকে আমন্ত্রণ জানানোর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা লাটসাহেবের অভ্যর্থনা-সভা বয়কট করবেন।

১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হয়েছিল। ১৯২৩ সালে বিশ্বভারতীর জন্যে নতুন ট্রাস্ট গঠিত হলো। শান্তিনিকেতন-ট্রাস্টের যাবতীয় আয়-ব্যয় বিশ্বভারতীর পরিষদ, সংসদ, কর্মসমিতির হাতে এলো। নতুন ও পুরাতন ট্রাস্টিদের মধ্যে মতান্তর ও মনান্তর, রবীন্দ্র-জীবনীকারের মতে, বিধুশেখর ভট্টাচার্যের আশ্রম-ত্যাগের অন্যতম কারণ, অবশ্য কবি তখন জীবিত।

১৯২৪ সালের ১৮ই মার্চ (৫ই চৈত্র ১৩৩০) সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন-অধিবাসীদের তরফ থেকে কবিকে চীন-যাত্রা উপলক্ষে বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হয়। সেই সভায় বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় স্বরচিত দু-টি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করলেন—একটি কবির উদ্দেশে আর একটি চীনবাসীদের সম্বোধন করে। ১৩৩১ সালের বৈশাখ-সংখ্যার সংবাদে দেখা যায়,—'পূজনীয় গুরুদেবের চীন-যাত্রা

উপলক্ষে তাঁহার আশ্রমত্যাগের পূর্বদিনে সায়াহ্নে একটি সভার অধিবেশন হয়। পুস্তকালয়ের সম্মুখে চন্দ্রালোকতলে সকলে সমবেত হইলে সংস্কৃত মাঙ্গলিক পাঠ করিয়া সভার কার্য আরম্ভ হয়। সভায় পূজনীয় গুরুদেব তাঁহার চীনযাত্রার উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। সেই সভায় পূজনীয় আচার্যদেবের সহযাত্রী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় ও শ্রীযুক্ত এলমহার্স্ট'কেও এতদুপলক্ষে অভিনন্দিত করা হয়।' —এর পরে ১৩৩১ সালের আষাঢ় মাসের (১৯২৪, জুলাই) সংবাদে দেখা যাচ্ছে: 'কয়েকদিন পূর্বে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় দীর্ঘ ভ্রমণের পর আশ্রমে ফিরিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় ও নেপালবাবু স্টেশনে গিয়াছিলেন।' —বলা বাহুল্য, এই সংবাদে আশ্রমে আচার্য নন্দলালের বিশিষ্ট শ্রদ্ধার আসনটি অতি স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয়।

'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থে ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছিলেন, —'সুবিখ্যাত আদর্শ-চরিত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী চীনা ভাষা নিয়ে আলোচনা করছেন (১৯২৪)।'

১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেস অধিবেশনে চরকা-কাটা ও খদ্দর পরিধান হইল কন্‌গ্রেসের নবনীতি'। রবীন্দ্রনাথ বিদেশ ঘুরে পাঁচ মাস পরে ফিরে এসে দেখলেন, শান্তিনিকেতনেই ৯০খানা চরকা-তক্‌লি চলছে। স্বয়ং বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীনন্দলাল বসু প্রমুখ অনেকেই চরকা কাটছেন। রবীন্দ্রনাথ সব দেখলেন, শুনলেন; কোনো মতামত প্রকাশ করলেন না।

১৯২৫ সালে পঁচিশে বৈশাখ (১৩৩২) কবির জন্মোৎসব হলো বেশ জাঁকিয়ে। সেইদিন উত্তরায়ণের উত্তরদিকে পথের ধারে 'পঞ্চবটী'-প্রতিষ্ঠা এই জন্মোৎসবের বিশেষ অঙ্গ। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় এই উৎসব উপলক্ষে একটি শ্লোক রচনা করে দিলেন—

পান্থানাং চ পশূণাং চ পক্ষিণাং চ হিতেচ্ছয়া
এষা পঞ্চবটী যত্নান্ রবীন্দ্রেণেহ রোপিতা॥

—এই বৃক্ষরোপণ উপলক্ষে সেদিন কবির সদ্য-রচিত গান গাওয়া হলো: 'মরু বিজয়ের কেতন উড়াও'। সন্ধ্যার সময়ে উত্তরায়ণে নাটক অভিনয় হলো —'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'। এ সবেরই সজ্জা মণ্ডন করলেন নন্দলাল।

১৯২৮ সালের ১৫ই জুলাই শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ-উৎসব। এর উদ্দেশ্য হলো গ্রাম ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভদ্র জনতার সংযোগ স্থাপন। পণ্ডিত বিধুশেখর এই হলকর্ষণ-উৎসবে প্রাচীন সংস্কৃত থেকে কৃষি-প্রশস্তি পাঠ করলেন আর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং হলচালনা করলেন। আচার্য নন্দলালের পরিচালনায় সভামণ্ডপ নতুনভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছিল। গ্রামের বিবিধ সামগ্রী, নানা শস্য ইত্যাদি দিয়ে যে আলপনা আঁকা হলো সেই ধারা এখনও চলছে। এই দিনটিকে চিরস্মরণীয় করবার উদ্দেশ্যে আচার্য নন্দলাল শ্রীনিকেতনের একটি প্রাচীরগাত্রে হলকর্ষণ উৎসবের ফ্রেস্কো রচনা করে দিলেন। উন্মুক্ত স্থানে প্রাচীরগাত্রে বৃহৎ পটভূমিতে এই রকম চিত্রাঙ্কন শিল্পের ইতিহাসে অভিনব ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে আলোচনা উপলক্ষে বলেছিলেন, —'ভারতে বৃহৎ পটভূমে চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজন। এতদিনে নন্দলাল তাহা সফল করিলেন।' গুরুদেব রবীন্দ্রনাথই এ যুগে সর্বপ্রথম অনুভব করেন যে শিল্পের ক্ষেত্রে কারুকলার সঙ্গে চারুকলার সমন্বয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে। গুরুদেবের এই চিন্তার বাস্তব রূপ হলো শ্রীনিকেতনের শিল্পসদন আর এর রূপায়নে শিল্পাচার্য নন্দলালের অবদান অপরিসীম। সমগ্র ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের ও নন্দলালের এই যুগ্ম সাধনা পরবর্তিকালে সমগ্র দেশ সাদরে গ্রহণ করেছে। শ্রীনিকেতনে শিল্পকর্মের আগে শান্তিনিকেতন-গ্রন্থাগারে ফ্রেস্কো আঁকা হয়েছিল (১৯২৭)। সে আলোচনা আমরা যথাসময়ে করবো। পণ্ডিত বিধুশেখর বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। এ-সব ছবি তখন তাঁর বিশেষ অভিমত হয়েছিল। তিনি এর জন্যে নন্দলালকে সাদর সংবর্ধনা ও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

বিশ্বভারতীর উত্তরবিভাগ বা বিদ্যাভবনের খরচ চলতো বরোদার রাজা সাওজীরাও গায়কবাড়ের বার্ষিক দানে। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পেয়ে ঐ দান বন্ধ হয়ে যায়। এতে কবি অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করলেন। তখন অধ্যক্ষ বিধুশেখর আশ্রম ত্যাগ করার মনস্থ করলেন। সেই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের অধ্যাপকের পদ খালি হয়। সেখানকার কর্তৃপক্ষ শাস্ত্রী মহাশয়কে ডাকলেন। তিনি চলে গেলেন আশ্রম ত্যাগ করে। রবীন্দ্র-জীবনীকারের মতে, এ ছাড়া, 'আসলে, আদর্শের বিরোধই এই বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ।' শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ত্রিশ বছরের যোগ

ছিঁড়ে যেতে তাঁর ব্যথা লেগেছিল ঠিকই ; কিন্তু কবিরও কিছু কম লাগেনি। কারণ তিনি শাস্ত্রী মহাশয়কে দিয়েই তাঁর 'বিদ্যাসমবায়'-এর সূত্রপাত করেছিলেন। ১৯৩৪ সালে পূজার বন্ধের পরে ১৯-এ নবেম্বর শাস্ত্রী মহাশয় আশ্রম ছেড়ে কলকাতায় গেলেন। পরে, বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দিয়ে সাদর সম্মান জানিয়েছিলেন।

নন্দলাল বলেন, —'শাস্ত্রীমশায়ের বিদায়-সংবর্ধনা হলো। আমি তখনও তাঁকে request করলুম,—'আপনি যাবেন না।' তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বুঝলুম, তাঁর যাওয়ার কারণ হলো official authority-র সঙ্গে বিরোধ। সামান্য কাগজ কালি কলম চেয়েও পান না। উনি বললেন,—'এখানে সুবিধে হচ্ছে না। তবে আবার আসবো।' আসতেন মাঝে মাঝে। Art সম্পর্কে তাঁর তেমন কোনো interest ছিল না। অবনীবাবু এখানে আচার্য হয়ে আসার পরে তিনি এসেছিলেন। আমাদের সঙ্গে শাস্ত্রীমশায়ের বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না। তবে, আমাদের পরস্পরের শ্রদ্ধার সূত্রটি কখনো ছেঁড়েনি।

॥ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ॥

১৯২১ সালে (১৩২৮) ৮ই পৌষ প্রাতে শান্তিনিকেতন-আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতীর উদ্বোধন সভা হলো। সভাপতি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ১৯২২ সালে আচার্য শীল মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। সেইসময়ে রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রনাথের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন সেপ্টেম্বর মাসে। ১৯২৪ সালে কনগ্রেসের চরকা ও খদ্দর-নীতির বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথও। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এজন্যে এঁদের তিরস্কার করেছিলেন। ১৯২৮ সালেও কবি মহীশূরে উপাচার্য শীলের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। তিনি ওখানে একাই থাকতেন। সেইজন্যে কবিকে পেয়ে তিনি আরও খুশি হলেন।

'শান্তিনিকেতনে এসেছেন তিনি বহুবার। খুব মোটাসোটা লোক ছিলেন। লম্বা দাড়ি ছিল। নিজেও লম্বা ছিলেন কম নয়। কেউ দেখা করতে গেলে, খুবই নম্রভাব দেখাতেন —যেন তার দাস।

Influence করতেই যেন এই ভূমিষ্ঠ হওয়া। পরনের কাপড় খুলে যেত সব সময়ে। চলতেন পাছা ঘষে ঘষে।

'গুরুদেব তাঁকে একবার বললেন, কলাভবনে লেকচার দিতে। ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন প্রায় এক ঘণ্টা ধরে। বললেন, অবশ্য শিল্পকলার প্রসঙ্গেই। তবে সমস্ত ইতিহাসটি খুঁটিয়ে বললেন বিরাট ব্যাপার করে। কোন্ art-এর গতি কোন্ দিকে হলো, কোন্ art কোন্ দিকে গেল, সব বললেন বিস্তৃতভাবে। বলতে বলতে এমন জায়গায় এসে পৌঁছলেন —যেখানে Cosmic সৃষ্টিপত্তন শুরু হয়েছে। তাঁর ঐ অবস্থায় গুরুদেব আমাকে কানে কানে বললেন, —'তোমাদের হয়ে গেল নন্দলাল, আর বুঝবে না!' —আসল ব্যাপারটা কি জানো? মনে রস থাকলে তবে তো assimilation হবে। সেই ধারাটিই তাঁর শুকিয়ে গিয়েছিল। দর্শন-চিন্তা করে করে দার্শনিকপ্রবরের ধী-শক্তিটিই টনটনে হয়ে উঠেছিল।—এঁর বক্তৃতার পরে, আমাদের আশাকে বললুম, উজ্জ্বলনীলমণি' বোঝাতে। সে বোঝালে না।

॥ মহাস্থবির রাজগুরু ধর্মাধার, ধর্মপাল ও মঞ্জুশ্রী ॥

১৯১৯ সালে যখন এলেন তিনি এখানে, সঙ্গে নিয়ে এলেন একটা সঙ্ঘ। পুরো সঙ্ঘ নিয়ে এলেন। আশ্রমে এসে রইলেন বাগান-বাড়িতে। এই বাড়িটি পরে হলো —'সংস্কার ভবন'। এর পরে তিনি বাড়ি বদল করে এসে রইলেন 'আদি কুটিরে'র একটি ঘরে। ধর্মাধার ছিলেন ওখানে, আর ছিলেন ধর্মপাল। ধর্মাধারের সঙ্গে বেশি কথা আমার তেমন কিছু হয়নি। নিয়মিত যেতুম তাঁর কাছে। পরস্পরের শ্রদ্ধাও ছিল। ধর্মাধার ছেলেদের ভালোবাসতেন খুব। শিশুবিভাগের ছেলেরা সব সময়ে তাঁর কাছে ভিড় করে থাকতো। তিনি কিন্তু খেলাধূলা, নাট্যাভিনয় দেখতে খুব ভালোবাসতেন। যদিও ওঁদের শাস্ত্রমতে ও-সব নিষিদ্ধ বস্তু। তিনি বলতেন, —আনন্দের ব্যাপার তো, যাবনা কেন।

'ধর্মপাল ছিলেন ধর্মাধারের শিষ্য। ধর্মপালও থাকতেন 'আদি কুটিরে'র

একটা ঘরে। কলাভবনে আসতেন তিনি প্রায়ই। অনেক আলাপ-আলোচনা হতো তাঁর সঙ্গে। তিনি ছিলেন ধর্মাধারের ছাত্র। আত্মার সম্পর্কে, প্রবৃত্তির বিচিত্র গতির বিষয়ে অনেক কথা হতো। একটা নতুন কথা আমি শিখলুম তাঁর কাছে। আমি তাঁকে একবার জিগ্যেস করলুম, —আপনারা 'আত্মা' 'আত্মা' করেন, আমি কিন্তু ও-সব কিছু বুঝি-টুঝি না। তখন তিনি একটা অতি সহজ উপায়ে আমাকে তাঁদের 'অনাত্ম' মতবাদ বুঝিয়ে দিলেন। —বললেন, —আপনি যদি এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা লিখে, একটা লাইন টেনে সবটা কেটে দেন, তাহলে ডিটেল্‌স কিছুই থাকেনা। কিন্তু যা থাকে, তা বলা যায় না, —সে হলো 'শূন্য'। অথচ সেই শূন্যের ভেতরেই আছে সবই। তার ভেতর থেকে বাদ পড়ে না কিছুই। সবই থাকে শূন্যের মধ্যে। আর যা থাকে তারই নাম হলো —'অনাত্ম'। 'অনাত্ম' অর্থাৎ Consolidated something।

'ধর্মপালও নৃত্য, অভিনয় —এ সব দেখতেন! আমি তাঁকে জিগ্যেস করলুম, তাঁর নৃত্য দেখার হেতু কি। তিনি বললেন, —হ্যাঁ, আমি এ-সব দেখি। ছেলে-বেলায় আমিও নৃত্য করতুম।

'ধর্মপাল রতনকুঠীতে গিয়ে একটি ঘরে বসে অনাত্ম-সাধন করতেন। কারও সঙ্গে তখন দেখা করতেন না। চিত্ত বিক্ষেপ হয় যাতে, তা তিনি করতেন না।

'ধর্মপাল শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে সিংহলে গিয়ে আনন্দ-কলেজের অধ্যাপক হয়েছিলেন। ধর্মাধারের পরে তিনি গেলেন এখান থেকে।

'১৯৩৪ সালে গুরুদেবের সহযাত্রী হয়ে আমি সিংহলে গিয়েছিলুম। ওখানে গিয়ে আমি ধর্মাধারের আশ্রম দেখতে গেলুম। নিয়ে গেলেন আমাকে ধর্মাধারের নাতি মঞ্জুশ্রী। ধর্মাধার তখন জীবিত ছিলেন কি না, সে-কথা আজ (১৯৫৫) আমার মনে পড়ছে না।

'মঞ্জুশ্রী হলেন মহাস্থবির রাজগুরু ধর্মাধারের নাতি। তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন সংস্কৃত পড়তে। কলাভবনেও ভরতি হয়েছিলেন। আমার ছাত্র ছিলেন। শিখলেন কিছুদিন ধরে। খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। কলাভবনের কিন্তু কোর্স পুরো করেননি। কবিরাজি-শাস্ত্র আর আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র তিনি পড়েছিলেন রীতিমতো। হাত-দেখতে পারতেন অদ্ভুত রকমের। যাকে যা বলেছিলেন, সব ফলেছিল। তাঁর হাত-দেখার পদ্ধতিও ছিল বিচিত্র।

তাঁকে এই প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই তিনি তক্ষুনি ঘড়ি দেখতেন। ঘড়ি দেখে ঠিক করতেন তার গ্রহ-নক্ষত্র রাশি-টাশি। আর এইভাবে সময় নির্ণয় করে বলে দিতেন সব।

'এক সময়ে ইলেমবাজার-বনকাটিতে আমরা চারজনে গিয়েছিলুম ১৯৩৩ সালে —আমি, বিশু বিনোদ আর মঞ্জুশ্রী। বনকাটিতে পিতলের একটি রথ ছিল। সেই রথ থেকে রাবিং আর কাস্ট্ আনতে গিয়েছিলুম। মঞ্জুশ্রী রান্না-বান্নাও জানতেন খুব ভালোরকম। সিংহলী রান্না রাঁধতেন। বনকাটিতে তিনি আর আমি মিলে রান্না করতুম।

'ওখান থেকে ফিরে আসার পরে আমি ছাড়া ওদের তিন জনকে ম্যালেরিয়ায় ধরলো। ম্যালিগন্যাণ্ট টাইপের ম্যালেরিয়া। ওখানে আমার কথা মানতো না ওরা। যেখানে সেখানে জল খেতো আর কোনো ওষুধ খেতো না। মশাও খুব খেতো ওদের। আমার মতো হাবিজুবি করে সারা গায়ে সরষের তেলও মাখতো না।...শেষে সারলো এখানে অতি কষ্টে।

'পিয়ার্সন হাঁসপাতালে যখন ফ্রেসকো করি তখন টিম্‌ওয়ার্ক করেছিলুম। মঞ্জুশ্রী অনেক সাহায্য করেছিলেন। তিনি একসময়ে দার্জিলিং-এ ছিলেন। সেখানে থাকার সময়ে তিনি চীনে শিল্পীর কাছে চীনে ছবি আঁকতে শিখেছিলেন। মনে তাঁর বাসনা ছিল, সিংহলে যত ফ্রেস্‌কো আছে সে-সব নকল করবার। নকল তিনি করেও ছিলেন অনেক। আমাকে কিছু কিছু নকল পাঠিয়েও দিয়েছিলেন। মূল ছবি থেকে তিনি ট্রেস্ করেছিলেন, রং দিয়েছিলেন। কিছু ট্রেসিং আর রঙের চার্ট তিনি দিলেন আমাকে।

'কিছুদিন বাদে তাঁর ইচ্ছে হলো, বিলেতে যাবেন। গায়ের রংটা তাঁর কিন্তু কাঠ-কয়লার মতন কালো। বিলেতে যাবেন কি করে! গেলেও, সেখানে স্বস্তিতে কাজ করতে পারবেন কিছু কি। শেষ-মেশ তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন ঐ সব ফ্রেস্‌কোর কপি ওখানে এগ্‌জিবিট্ করবার জন্যে। তবে, বিলেতে ছবি যেমন-তেমন, হাত দেখেই সবাইকে জয় করে নিলেন। বিলেতে তখন ওরা ভালোবাসতো ঐ সব সামুদ্রিক বিচার। ...বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি সাধুর বেশ ছেড়ে কোট্-প্যাণ্ট পরতে লাগলেন। বাঙ্গালা তিনি জানতেন ভালোই। আমার 'শিল্পকথা' বইখানাকে সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন। যাই হোক,

সাধুর বেশ তো তিনি ছাড়লেন। তাতে মনে তাঁর একটা আতঙ্কও ছিল। নিজের সম্বন্ধে তিনি আমাকে বলতেন, —'আমি নিশ্চয়ই জানি, আমার বীভৎস মৃত্যু হবে।'

'১৯৩৪ সালে আমরা যখন সিংহলে যাই, ওঁদের বাড়িতে সে সময়ে কাঠের মুখোশের অদ্ভুত সংগ্রহ ছিল। সে হবে প্রায় দু'সিন্দুক বোঝাই। সে সংগ্রহের মধ্যে ছিল অতি ভালো সব পুরাতন সিংহলী মুখোশ আর ছিল আফ্রিকান্ মুখোশ। আফ্রিকান আদিবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা। আমি পরামর্শ দিলুম, —বিলেতে নিয়ে গিয়ে এ-সব exhibit করুন। তবে, সে আর হলো না। লড়াইয়ের সময়ে সে সব সিন্দুক খুলে দেখা গেল কি, প্রকাণ্ড দুটো উইয়ের ঢিবি। পৃথিবী থেকে একটা বড়ো সম্পদ চলে গেল। আমার কাছে আছে মাত্র কতকগুলোর ফটো। রাখা আছে আমাদের কলাভবনে। ডেভিল্ ডান্স্-টান্স্-এর ফটো-টটো সবই আছে।

'আমার হাত দেখে মঞ্জুশ্রী আমার সম্পর্কে যা যা বলেছিলেন, তার সবই ফলে যাচ্ছে অক্ষরে অক্ষরে। মঞ্জুশ্রী আমাদের গুরুদেবের হাতও দেখেছিলেন। গুরুদেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, —'বলুন তো মঞ্জুশ্রী, জীবনে আমি আর পুত্রশোক পাব কিনা।' তিনি হাত দেখে নিঃসংশয়ে বলেছিলেন, —'না'।

॥ বেনোয়া, ১৯২১ ॥

'সুইস-ফরাসী অধ্যাপক বেনোয়া (F. Benoit) এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে ১৯২১ সালে। ১৯২২ সালে তিনি চলে গেলেন সিমলা পাহাড়ে কোটগড়ে মিঃ স্টোকস্-এর কাছে। তিনি ফ্রেঞ্চ্ শেখাতেন —শান্তিনিকেতনে। পণ্ডিত তেমন বড়ো ছিলেন না। আশ্রমে এসেছিলেন অনুরক্ত হয়ে। ছিলেন বছর দুই হবে। দাড়ি ছিল মুখে। কথা বলতেন সবার সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষাতে। আশ্রমের পূর্ববিভাগে অর্থাৎ ইস্কুলেও ফ্রেঞ্চ ক্লাস নিতেন তিনি। খুব মেলামেশা করতেন বাঙ্গালীদের সঙ্গে। তাঁর অভিমত ছিল, বাঙ্গালী মেয়ে নাকি দেখতে খুব ভালো। শেষে তিনি বিয়েই করে ফেললেন একটি বাঙ্গালী মেয়েকে। কিন্তু বাঙ্গালী বিয়ে-করা অবশ্য সোজা,

হয়নি তাঁর পক্ষে। সহজে কোনো বাঙ্গালী মেয়ে চায়নি তাঁকে বিয়ে করতে। অবশেষে খৃস্টান বাঙ্গালী মেয়ে জুটেছিল একটি তাঁর ললাটে।

'বেনোয়া সাহেব এসে বসতেন আমাদের চা-চক্রের আড্ডায়। খুব সুরসিক লোক ছিলেন তিনি। নানা রকম কথাবার্তা হতো। একবার তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার একটা খুব হাস্যকর ঘটনা আমাদের বললেন। —তিনি বাইরে কোথাও যেতে-আসতে হলে, ট্রেনে থার্ডক্লাসেই যাতায়াত করতেন। আর এখানে আসার পর থেকে ধুতি-চাদর পরতেন বরাবর। আর সাহেব হয়েও বাঙ্গালা কথা কইতে পারতেন —প্রায় বাঙ্গালীদের মতনই। সেই জন্যে ট্রেনে বহু কৌতূহলী চোখের সম্মুখীন হতে হতো তাঁকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে লোকে তাঁকে বিরক্ত করতো। —তিনি কি করে বাঙ্গালা শিখলেন, ধুতি-চাদর পরেন কেন, থাকেন কোথায়, কি করেন ইত্যাদি ইত্যাদি এই রকম এক-ঘেয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে করে তাঁকে অতিষ্ঠ করতো ট্রেন-কামরার লোকে। আর নতুন স্টেশনে নতুন যাত্রী উঠলেই, আবার একপ্রস্থ অনুবৃত্তি চলতো সেই সব প্রশ্নের। —এই দেখে সাহেব অবশেষে একটা ফন্দী আঁটলেন। —একবার কোথা থেকে যেন আসছেন, প্রথম স্টেশনেই ট্রেনের থার্ডক্লাসের কামরা লোকে যখন ভরতি হয়ে গেছে, বেনোয়া সাহেব হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে সবিস্তর আত্মপরিচয় দিয়ে দিলেন প্রথম মহড়াতেই। তারপরে, পরের স্টেশনে নতুন যাত্রী উঠে সাহেবকে প্রশ্ন করামাত্র তিনি আঙ্গুল বাড়িয়ে পাশের লোকটিকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, —'ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন।'

॥ কাজিনস্ (James Cousins) ॥

'১৯২১ সালে মাদ্রাজ থেকে ইনি সস্ত্রীক এসে উঠলেন কবির পর্ণকুটির কোনার্কের পাশের কুটিরে। ইনি ছিলেন গুরুদেবের বড়ো ভক্ত একজন। তিনি এ্যানি বেসান্টেরও ভক্ত ছিলেন। থাকতেন আদেয়ারে থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে। মদনাপল্লী ইন্স্টিটুটের তিনি প্রিন্সিপাল ছিলেন। এ্যানি বেসান্ট দু-টি ছেলেকে খাড়া করে তুলেছিলেন অবতার বলে। —'কৃষ্ণ', গোপাল' —এই সব নাম দিয়েছিলেন।

'প্রথমে কাজিনস্ সাহেব এ্যানি বেসান্টের ভক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু পরে দল আলাদা হয়ে গেল। কাজিনস্ হলেন আমাদের গুরুদেবের ভক্ত। এখানে তিনি এসেছিলেন বার দুই তিন। এখানে তিনি আমাদের কাছে কবিতা পড়তেন বিলিতি পোজে। Indian Antiquity-র ওপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অগাধ। Indian Art-এর ওপরেও অনেক লেখা লিখেছেন তিনি। তিনি প্রত্যেকবারেই শান্তিনিকেতনে এসেছেন সস্ত্রীক। পরতেন তিনি এদেশী কায়দায় পা-জামা আর পাঞ্জাবী। এখনও (১৯৫৫) তিনি জীবিত আছেন। ব্যাঙ্গালোরে আর্ট'সোসাইটির কর্তা হয়ে আছেন। আর্ট'গ্যালারিরও কর্তা তিনি।

'আমার ছবি পাঁচ-ছ খানা আছে কাজিনস্ সাহেবের কাছে। হরিণের পাল যাচ্ছে —এই রকম একখানা ছবি তাঁর কাছে আছে বলে মনে হচ্ছে। আর ছিল একখানা ছবি —সমুদ্রতীরে চৈতন্যদেব হোলি খেলছেন। আরও বোধহয় দু-তিনটে আছে। Indian Artist-দের ছবির গ্যালারি করেছেন কাজিনস্ সাহেব। মদনাপল্লী-ব্যাঙ্গালোরে আছেন এখন। ১৯২৬ সালে তিনি বোধহয় শেষ আশ্রমে এসে সস্ত্রীক ছিলেন এক মাসের মতো। জাতিতে তিনি ছিলেন আইরিশ।

৮ কলিন্স (Dr. Mark Collins). ১৯২২ ॥

'ইনি ছিলেন অসাধারণ ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত। শান্তিনিকেতনে এসে ইনি ছিলেন নতুন বাড়ির গেস্ট্‌হাউসে। তখন রিসার্চ করতেন মোহেন-জো-দড়ো নিয়ে। আমি যেতুম তাঁর কাছে সাক্ষাৎ করতে। খুব ভালো লোক ছিলেন তিনি। পথে চলতেন আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে। খোয়াইএ একবার তিনি পড়ে গেলেন। চলছিলেন কালবৈশাখী দেখতে দেখতে। সহসা হোঁচট খেয়ে পথে পড়ে গেলেন। কলেজ-বোর্ডিং-এর চার ধারে কাঁটাতার-দেওয়া বেড়া ছিল তখন। সেখানে একবার পড়ে গিয়ে জামা ছিঁড়লেন। বেড়ার ধারে গিয়েছিলেন ঘাসের নীল ফুল দেখতে। তাঁর লেখা কবিতা আছে সেই নীল ফুলের ওপর। নীল ফুলকে কলিনস্ সাহেব বলেছেন, --'নীলফুল, আকাশের দিকে

চেয়ে চেয়ে তোমার গায়ের রংটি নীল হয়ে গেছে। বুকে তোমার ছাপ পড়েছে নীল আকাশের।'—

'মোহেন-জো-দড়োর সীল্ নিয়ে কলিনস্ সাহেব আলোচনা করতেন আমার সঙ্গে। সীলের ছবি-টবিগুলোর রূপের ব্যাখ্যা চাইতেন। এখন যেমন (১৯৫৫) আমাদের স্বামী শঙ্করানন্দ করে থাকেন। তবে, এখন যতটা বুঝেছি, তা তো তখন বোঝা যায়নি।

'স্যর জন মার্শাল সাহেব মোহেন-জো-দড়োর অক্ষর কিছু পড়েছিলেন। —সে ঠিক নয়, বলতেন কলিনস্। একেবারেই ভুল। ও অক্ষর ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ফার্সীর মতন পড়া চলে না; বাঁ দিক থেকে ডান দিকে পড়তে হবে আমাদের ভারতীয় পদ্ধতিমতে।—আরম্ভে বড়ো, শেষে ছোট—এই সব বিশেষত্ব মোহেন-জো-দড়োর অক্ষরের। যাই হোক্, এখন আবার বোঝা যাচ্ছে অনেক জিনিস, যা তখন কলিনস্ সাহেব বুঝতে পারেননি। এখন অনেক নতুন হদিস পাওয়া যাচ্ছে।

'ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল তাঁর। এদেশে বৃটিশ সরকার যা করছেন সবই ঠিক বলে ধারণা ছিল তাঁর। ওঁদের সব কর্মই সরল মনে বিশ্বাস করতেন তিনি। ভিন্ন কিছু বিশ্বাস করতে চাইতেন না পারতপক্ষে। মেদিনীপুরে একবার ফ্ল্যাগিং হলো। তাই নিয়ে বিশেষ কেস্ হয়েছিল। স্বদেশী বুলেটিন সে-সময়ে বের হতো অনেক। বিশ্বভারতীর তখনকার গ্রন্থাগারিক সে-সব বুলেটিন গ্রন্থাগারে রাখতে সাহস পাননি। নিয়মিত আসতো এখানে স্বদেশী বহু বুলেটিন। আমি সেই সময়ে কার্টুনও আঁকলুম অনেক। আমার আঁকা একটা কার্টুনে ছিল, —একটা লোককে ক্রুশে ঝুলিয়ে চাবুক মারা হচ্ছে।—কলিনস্ সাহেবকে বলতুম আমি, —তোমরা এতো শিভল্‌রাস্ জাত, অথচ তোমাদের মধ্যে এতো দুর্নীতি কেন। যখন আমি বলতুম, তখন তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠতো।

'কিছুদিন বাদে তিনি চলে গেলেন এখান থেকে। এখান থেকে গিয়ে মাদ্রাজে ছিলেন। মারা গেলেন মাদ্রাজেই। তাঁর কাগজপত্র কোথায় যে গেল, কেউ জানে না।

॥ ফাব্রি, ১৯২২ ॥

'ইনি ছিলেন হাঙ্গেরীয়ান পণ্ডিত। শান্তিনিকেতনে এসে লেকচার দিতেন তিনি Archaeology-র ওপর। তাঁর বদ্ধ ধারণা ছিল, বাইরের লোক এসে ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। শিল্পসম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল, ভারতীয় শিল্পকলা এসেছে গ্রীক-শিল্প থেকে; অথবা ভারতীয় আর্ট হচ্ছে forged art। ধর্মে তিনি ছিলেন খৃস্টিয়ান; এদেশে এসে তিনি হলেন মুসলমান। সব আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ভারতশিল্পের গোড়া খুঁজতে চেষ্টা করতেন বাইরে থেকে। অর্থাৎ আমরা আদিযুগে যেন বর্বর ছিলুম।

'ক্লাসে আসতেন তিনি জুতো পরে। একদিন আমি তাঁকে বললুম, —আপনি জুতো খুলে ক্লাসে আসুন। তিনি উত্তর দিলেন, —এটা আমার অভ্যাস। জুতো খুলে এলে বক্তৃতা দিতে পারব না। আমার একজন ছাত্র আমাকে একদিন বললে, —আজ আপনি ক্লাসে আসবেন না। সেদিন তাঁর ক্লাসে কিছু একটা করার মতলব। ফাব্রি ক্লাসে আসার পরে সে তাঁকে বললে, —আপনি জুতো খুলে আসুন। তিনি তার কথায় কান দিলেন না। জুতো-পায়ে লেকচার দিতে শুরু করলেন। এদিকে শ্রোতারা পিছু ফিরে ফিরে পালালো একে একে সবাই জানালা টপ্‌কে টপ্‌কে।

'ফাব্রি সাহেব ভালো বেহালা বাজাতে পারতেন। ছেলে-মেয়েদের তিনি বেহালা শেখাতেন। আর বেহালা শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে বেধড়ক গাল দিতেন মহাত্মাজীকে। —'Naked Fakir' —এই সব বলতেন॥ আর বলতেন, —গান্ধী ভুল পথ দেখাচ্ছেন দেশকে। —ফাব্রির এই মন্তব্যে ছেলেরা প্রতিবাদ করলে একবার ক্লাসে। পরে, ফাব্রি শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গেলেন।

'সে সময়ে নতুন বাড়ি 'রতন কুঠি'তে থাকতেন, আর মোহেন-জো-দড়ো নিয়ে কাজ করতেন মার্ক কলিনস্। আমি তাঁকে একদিন বললুম ফাব্রির কথা। —ভারতীয় শিল্পকলা, সভ্যতা কিছু নয়, —ফাব্রির

এই সব উক্তি। শোনামাত্র কলিনস্ সাহেব বলে উঠলেন, —ভারী অন্যায় করেছেন, এ্যাপলজি চান ফাব্রি. আর তাঁর কথা উইথড্র করে নিন। --কলিনস্ নিজে গিয়ে ফাব্রিকে বললেন, এ্যাপলজি চাইতে। ফলে, ফাব্রি এ্যাপলজি চাইলেন।

'আমরা তখন শান্তিনিকেতনে চরকার ক্লাস করতুম। ফাব্রি সাহেব মাঝে মাঝে এসে বসতেন সেই চরকার ক্লাসে। চরকায় তাঁর কোনো শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি ছিল না। একদিন তাঁকে আমি চরকা কাটতে বললুম। তিনি উত্তর দিলেন, —ঐ পানিশ্মেন্টের বদলে, বরং আপনারা যতক্ষণ চরকা কাটবেন, আমি ততক্ষণ ভায়োলিন বাজাবো।

যাই হোক্, ফাবরি সাহেব শান্তিনিকেতনে আমাদের হাতে তাঁর সেই অপমান এখনও (১৯৩৫) ভুলতে পারেননি! শান্তিনিকেতনের কথা উঠলেই তিনি একে পিষে মারতে চেষ্টা করেন। দিল্লীতে তিনি মুাজিয়মের কিউরেটেব হয়েছিলেন। মুাজিয়মের চাকরিতে যখন তাঁকে নেবার কথা চলছে, দিল্লী থেকে মুাজিয়ম-কর্তৃপক্ষ আমাকে লিখে পাঠালেন, ফাবরির সম্পর্কে আইডিয়া দেবার জন্যে। আমি জানালুম, —ফাব্রি সাহেব লোক ভালো, তবে, আমাদের আইডিয়ার সঙ্গে তাঁর আইডিয়া মেলে না। ফাব্রি সাহেব বলতে চান, ইণ্ডিয়ান আর্ট উৎপন্ন হয়েছে সারাসেনিক আর্ট থেকে। শুধু বলা নয়, তিনি এইটেই সাব্যস্ত করতে চান। কিন্তু তাঁর এই আইডিয়ার সঙ্গে ইণ্ডিয়ান আর্টের নিরপেক্ষ সমালোচকদের আইডিয়ার বিরোধ রয়েছে। --আমার এই মন্তব্যের পরেও ফাবরি সাহেবকে দিল্লীতে মুাজিয়মের কিউরেটরের পদে বহাল করলেন বৃটিশ সরকার। —আর সেই থেকেই শান্তিনিকেতন বা ইণ্ডিয়ান আর্টের প্রসঙ্গ উঠলেই এগুলোকে উচ্ছেদ করবার বাসনা তাঁর মনে উগ্র হয়ে ওঠে। যেন জাতক্রোধ রয়েছে। ফাবরি সাহেব বলেন, —I can forgive but cannot forget। আমি বলি, এতো কেন বাপু, শান্তিনিকেতনের নাম, ইণ্ডিয়ান আর্টের নাম, আমার নাম না-করলেই পারো।

॥ প্যাট্রিক গেডিস (Patrick Geddes), ১৯২২ ॥

১৯২১ সালে প্যারিসে প্যাট্রিক গেডিসের সঙ্গে আমাদের গুরুদেবের সাক্ষাৎ হয়েছিল। গেডিস ছিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক-কিছু আধুনিকতার প্রবর্তন করেছিলেন তিনি। গুরুদেব গেডিসের মননশীলতায় মুগ্ধ হন, আর গেডিস কবির আদর্শবাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্যাট্রিক গেডিস সম্পর্কে বলেনঃ He has the precision of the scientist and the vision of the prophet ; and at the same time, the power of the artist to make his ideas visible through the language of symbols. His love of man has given him insight to see the truth of man, and his imagination to realise in the world the infinite mystery of life and not merely its mechanical aspect. — (1927)। —গেডিস্ সাহেব শীঘ্রই ভারতবর্ষে যাবেন শুনে কবি তাঁকে শান্তিনিকেতন দেখবার জন্যে অনুরোধ জানান। গেডিস কবির অনুরোধ রেখে শান্তিনিকেতন দেখতে আসেন, কবি তখনো বিদেশে। ১৯২২ সালের শেষের দিকে তিনি এখানে আসেন। গেডিস্ শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন আর আশপাশের গ্রামগুলি ঘুরে কি-ভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি আর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়, সে সম্পর্কে বিশদ পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন।

প্যাট্রিক গেডিস সম্পর্কে নন্দলাল বলেন, 'শান্তিনিকেতনে এসে প্যাট্রিক গেডিস্ ঘুরে ঘুরে আশ্রম দেখে বেড়াতে লাগলেন। মস্তো স্কলার ছিলেন তিনি। আর ছিলেন planner। বিশেষ করে Town-plan-এ দক্ষ ছিলেন তিনি। কলকাতার রাস্তা, বাড়ি, পুকুর —এ-সব কি-ভাবে বিন্যাস করা যায় তারই plan করবার জন্যে এদেশে এনেছিলেন তাঁকে সেকালের বৃটিশ সরকার। তিনি পুরাতনকে সাফ্ বদল করে নতুন কিছু করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। পুরাতনকে সময়োপযোগী করে নতুন যুগে কাজে লাগানোই ছিল তাঁর পরিকল্পনার মুখ্য বৈশিষ্ট্য। রাস্তার আঁকাচোরা সোজা করবার জন্যে এদিকে ওদিকে জীর্ণ-বাড়ি কিছু ভেঙে ফেলার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।

কিন্তু, রাস্তাটাকে বেমালুম ঘুরিয়ে দেওয়া তাঁর অভিমত ছিল না। এককালে বৃটিশ সরকার কলকাতার সব পুকুর বুজিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। সরকার ভাবছিলেন পুকুর বুজিয়ে টিউব-ওয়েল করবেন। গেডিস্ বললেন, —পুকুর বোজানো উচিত নয়। এবং পুকুরগুলোকে ঝেড়ে কাটিয়ে যাতে তার জল খাওয়া যায়, সেই ব্যবস্থা করা হোক্। বিশেষতঃ, পুকুর হচ্ছে বাঙ্গালা দেশের সম্পদ। তা-ছাড়া, লড়াই বাধলে টিউবওয়েল নষ্ট হতে পারে, কিন্তু পুকুর নষ্ট হবে না। পুকুর বোজালে জল আর একবারেই পাবে না। —এই রকম সব plan করবার জন্যে গেডিস্ এলেন এ-দেশে।

'কলকাতায় এসে ছিলেন তিনি ডক্টর জে. সি. বোসের বাড়িতে। লেডী বোস গেডিস্কে যত্ন করতেন মায়ের মতন। সে-সময়ে গেছলুম আমি ওঁদের বাড়ি গেডিস্কে দেখতে। আর একটা কাজও ছিল। সে-সময়ে আমি ডক্টর বোসের জন্যে সিল্কের ওপর একটি ছবি করেছিলুম —'অসি ও বাঁশি', সেটা তাঁর বৈঠকখানায় খাটিয়ে দেওয়া হলো। ছবিখানা দেখে গেডিস্ বললেন, —ভালো হয়েছে। তবে আর একটা জিনিস করো! যে-লোকটা চলে যাচ্ছে, তার পায়ের চিহ্ন তার পিছনে এঁকে দাও। আমি বললুম, —কি দিয়ে করবো; রং-টং তো আনা হয়নি। শুনে তিনি তক্ষুনি বললেন, —খড়ি দিয়ে করে দাও। তাতে কি হয়েছে। খড়ি অনেক দিন থাকবে! —আমি লোকটার পদচিহ্ন এঁকে দিলুম চক্-খড়ি দিয়েই।

'ডক্টর বোসের বাড়িতে যে ঘরটিতে থাকতেন গেডিস্ তারই এক ধারে রীডিংরুম বানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। নানা বইয়ের রেফারেন্সের জন্যে লাইব্রেরী সাজিয়ে নিয়েছিলেন তিনি অদ্ভুত ধরনে। কতকগুলো প্যাক্-বাক্স যোগাড় করে ঘরের ভেতরে একটি দেওয়ালের গা-ঘেঁষে রেখেছেন। আর তার ভেতরে যত রাজ্যের রেফারেন্সের বই। আর সে-সব বইয়ের পাতা সদাসর্বদাই খোলা রয়েছে। দরকার হওয়ামাত্র উঠে গিয়ে দেখে এসে নোট্ করছেন। সেই প্যাকবাক্সগুলোর মাঝে মাঝে আবার রাস্তা রেখেছেন চলা ফেরার জন্যে। সেই রকম এক অদ্ভুত লাইব্রেরী আমি দেখেছিলুম প্যাট্রিক গেডিসের সাজানো।

'কলকাতায় কিসের যেন একটা মীটিং ছিল একদিন। আমি গেছি

ডক্টর বোসের ঘরে। তখন গেডিস বের হচ্ছেন বক্তৃতা দিতে। মাথার চুল কাটা হয়নি অনেক দিন থেকে। ঐ সময়ে আরশি দেখে নিজের মাথার চুল নিজেই ছেঁটেছেন। এবড়ো-খেবড়ো হয়েছে মাথাময়। দেখে, আপত্তি করলেন লেডি বোস। উত্তরে গেডিস্ বললেন, —ও থাক্। ওতে আর কি হবে। লেডি বোস তাঁর বারণ না শুনে নিজে কাঁচি নিয়ে গেডিসের মাথার চুল খানিক সোজা করে কেটে দিলেন। আর একবার গিয়ে দেখি, ফাউন্‌টেন্‌পেনের কালি পড়ে বুকপকেটে লেগে রয়েছে। লেডি বোস দেখে আপত্তি জানালেন। সাহেব বললেন, —ও থাক না। নিচে গাড়ি দাঁড়িয়ে। তখন কাচবারও সময় নাই। তাড়াতাড়ি লেডি বোস করলেন কি, চক্‌খড়ি দিয়ে খানিক ঘষে দিলেন। ফলে, কালির দাগের ওপর আরও খানিক সাদা পোঁচ পড়ে গেল।

'ডক্টর বোসের ঘরে আর এক দিন। আমাকে চা খেতে ডাকলেন। সব্বাই একসঙ্গে বসেই আমাদের খাওয়া হচ্ছে। কিন্তু, আমাকে কি যেন দেখাবেন বলে গেডিসের ভয়ানক ব্যস্ততা। আমাকে বললেন, —swallow করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। দরকারী কাজ আছে। —এই বলছেন, আর খাবার গিলছেন তিনি নিজেও। —আর না, ওঠো, চলো! কি কাজ? বাড়ির ওদিকে সিস্টার নিবেদিতার ছবি টাঙাতে হবে। এর জন্যে এতো ব্যস্ত যে খাবার নিজেও গিলে গিলে খেলেন। টাইম-জ্ঞান ছিল তাঁর টন্‌টনে।

'প্যাট্রিক্ গেডিস্ শান্তিনিকেতনে এলেন। গুরুদেব ডেকেছিলেন তাঁকে। তখন আমাদের কলাভবন ছিল 'দ্বারিকে'। ওখানে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হবে; তিনি আসবেন বলে আমি সব সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছি। অভ্যর্থনা হবে মালা-চন্দন দিয়ে। এদিকে কিন্তু তিনি আসছেন না। সময় বয়ে গেল তবু আসছেন না। কি ব্যাপার —দেখতে গেলুম। দেখি কি, গেডিস্ সাহেব 'দেহলী'-বাড়ির চারদিকে ঘুরছেন! নোংরা হয়ে আছে ওখানটা —কাগজ-ছেঁড়া, ন্যাকড়া-ছেঁড়া জমে যাচ্ছেতাই আবর্জনার স্তূপ পচে রয়েছে জায়গাটায়। অথচ নির্বিকার হয়ে সাহেব ঘুরছেন তার ওপর দিয়ে!

'অভ্যর্থনার শেষে গেডিস্ বললেন, —বেশ অভ্যর্থনা করেছ, ভালোই লাগলো। কিন্তু তোমাদের একটা বড়ো defect দেখলুম, সারা

আশ্রমটাকে তোমরা একটা ওয়েস্ট্‌পেপার বাস্কেট্‌ করে রেখেছো।

'আমাকে ডাকলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় ছিল আগে থেকেই। বললেন, —তোমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরেই আশ্রম দেখবো। আমরা দু'জনে আশ্রম-পরিক্রমা করতে লাগলুম। রাস্তা দিয়ে চলা হচ্ছে। কলেজ-বোর্ডিং পার হয়ে চলি। আমার বাড়ি, দুগারের বাড়ি পেরিয়ে গেলুম। 'নেপাল রোড' একটু সোজা করে করা হয়েছিল। গেডিস্‌ বললেন, —রাস্তাটা একটু বাঁকিয়ে করলে পারতে। ওটাকে চৌমাথার কাছে সোজা করে দিও।

'ছাতিমতলায় নিয়ে গেলুম গেডিস্‌কে। অনেক খরচা করে তখন ওখানে পোর্সিলেনের টাইল্‌ বসানো হয়েছিল। বিশ্রী হয়েছিল সে দেখতে। দ্বিপুবাবু টাইল্‌ বসিয়েছিলেন। তখন সবে তিনি মারা গেছেন। কি করা যায় বেদীর, জিজ্ঞাসা করলুম আমি। গেডিস্‌ বললেন, —তোমাদের খুব টাকা হয়েছে, না? —দাও মাটীর বেদী করে।

'মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি বললুম, —মন্দিরে কাঁচ লাগানো, আমি পছন্দ করি না। এগুলোকে কিভাবে বদলানো যায়? তিনি বললেন, —তোমাদের অনেক পয়সা হয়েছে, মনে হচ্ছে। গেডিস্‌ ছিলেন, নি-খরচাবাদী। বললেন, —তোমরা ওয়াল-পেন্টিং করছো তো সব। এই কাঁচের ওপর মাটির প্রলেপ দিয়ে পেন্ট্‌ করে দাও না কেন।

'মন্দিরের পাশের সাবেক এঁদো পুকুরটি দেখানো হলো। তিনি বললেন, —থামো, আমি plan করে দেবো, এখানে একটা সুন্দর পার্ক তৈরি হবে। পরিবেশ লক্ষ্য করে, যেখানে যেমনটি মানায় তিনি সেই রকম পরিকল্পনা করে দিতেন। তিনি পরিকল্পনা করতেন পরিবেশ আর প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য বজায় রেখে।

'ঘুরতে ঘুরতে আমরা খাবার ঘরের পিছনে এলুম। সামনেই পাঁচীরের গেটের ওপর দু'টো প্রকাণ্ড গম্বুজ। আমি ডিজাইন দেখালুম, বোঝালুম। তাঁর পছন্দ হলো না। বললেন, —জীর্ণ একটা পাঁচীরের ওপর এত ইঁট-চাপানো! নিয়ে গেলুম 'সিংহসদনে'। গেডিস দেখে

বিদ্রূপ মন্তব্য করলেন। দেওয়াল বাঁকিয়ে এতো ইঁটের খরচা করা! ও ডিজাইনও পছন্দ হলো না তাঁর।

'গেডিস্ সাহেব দিন কতক ছিলেন শান্তিনিকেতনে। এখানে তখন আমরা সেই fresco আঁকার চেষ্টা করছি। দেওয়ালে ছবি করার আমাদের সেই সূত্রপাত। 'দ্বারিকে'র ওপরতলায় উঠতে সিঁড়ির দু'ধারে, থামে ছবি করা হয়েছিল। গেডিস্ দেখে বললেন, —ভালো জিনিস। দেওয়ালে এ-সব করবে। অনেক ঘরের দেওয়াল তো আছে তোমাদের এখানে। এই রকম জিনিস করবে। আমার মনে তখন কিন্তু বিশেষ সঙ্কোচ, এই ছবিগুলো আদৌ ভালো হয়নি বলে। বিশেষ করে, দেওয়ালে তখন কোনো রং টিক্‌ছে না। সব দেখে শুনে তিনি বললেন, —বেশ তো, রং না টেকে, কাঠকয়লা দিয়ে ছবি করো। ছবি করা বন্ধ কোরো না। আর জানবে, যদি একদিন একজন লোকও তোমার ছবি তাকিয়ে দেখে, তা'হলেই বুঝবে তোমার ছবি করা সার্থক হলো। যাই হোক্, দেওয়ালে ছবি করা বন্ধ করবে না কিছুতেই।

'পকেটে তাঁর লেন্স্ থাকতো একটা সব সময়ে। ছুরি, কাঁচি, চিমটি থাকতো সঙ্গে —সে-ও সব সময়ে। একজন অথরিটি ছিলেন তিনি বোটানীতে আর বায়োলজিতে। টাইটেল ছিল তাঁর দু'পাতা-জোড়া। রাস্তায় ফুল ফল বিশেষ কিছু দেখা মাত্র অমনি তুলে নিয়ে পকেটে পুরতেন। অদ্ভুত কিছু পোকা-মাকড় দেখলেই নোট্ করতেন। অর্থাৎ পথে পথে চলতে চলতেই study চলতো তাঁর। বোটানীর আর বায়োলজির ভালো ভালো আর্টিকেল লেখা আছে তাঁর বহু standard পত্রিকায়।

'আমাদের খোয়াইএ একদিন বেড়াতে গেলেন আমার সঙ্গে। ওখানে আমাকে দেখালেন পিঁপড়ে-খেকো ফুল। নামটা ল্যাটিনে বোধহয় Drosera sp আর ইংরেজী নামটা হলো Sundew। সেই ফুলের রং দেখে পিঁপড়ে ওঠে। আর পিঁপড়ে উঠলেই ফুলের পাপড়ি বুজে যায়। পিঁপড়েটাকে আবদ্ধ করে তার রস শুষে খায় রাক্ষুসে ফুলটা। কত মরা পিঁপড়ে তিনি দেখালেন আমাকে ফুলগুলোর ভেতরে ভেতরে।

'খুব বড়ো শিক্ষাবিদ্‌ও ছিলেন তিনি। ছবি আঁকা শেখাবার পদ্ধতি সম্পর্কেও তাঁর চিন্তা ছিল গভীর। গেডিস্‌ বললেন,—শিক্ষা কাকে বলে জানেন? অনেক বই পড়া হলেই তাকে শিক্ষা হলো, বলা চলে না। সঙ্গে সঙ্গে observation চাই। মুখে মুখে, গল্পে-প্রবাদে, ফুলে পাতায় মস্ত শিক্ষা দেওয়া যায়। আর যে লোক পণ্ডিত হবে, তার স্বভাব কেমন হবে, জানেন? সে-লোককে নিয়ে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দিলেও সে দমে যাবে না, বিপদে পড়েও দিক্‌নির্ণয় করে নেবে সে। দিনে হাওয়া, রাতে নক্ষত্র দেখেই সে আপন পথ ঠিক করে নিতে পারবে। Primitive-দের মতন সে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা দেখে দেখে তার প্রয়োজন সে মিটিয়ে নেবে। আপনাদের মুনি-ঋষিরাও ঠিক তাই করতেন। প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ করে মনের পাঠ গ্রহণ করতেন। শরীরের প্রয়োজনে বেছে বেছে আহার্য, সংগ্রহ করতেন। তাঁদের যা' যা' আবশ্যক প্রয়োজনের তাগিদেই যথাযোগ্য বস্তু যোগাড় করে ফেলতেন। অসুখে বিসুখে প্রতিষেধক ওষুধপত্রের জন্যে গাছগাছড়া চিনে চিনে ব্যবহার করতেন। —এইভাবে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বস্তুজ্ঞান জন্মায়; আর তা থেকেই শিক্ষালাভ করে পণ্ডিত হওয়া যায়। গুরু শিষ্যকে, অধ্যাপক ছাত্রকে মুখে মুখেই অনেক শিক্ষা দিতে পারেন। অবশ্য তার বেশি শেখাবার বা শেখবার দরকার হলে পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের আধার বই পড়তে হবে। তবে আমার মতে, মৌখিক শিক্ষা আগে দিতে হবে। পরে, বই পড়ে শিক্ষালাভ করবে। —গেডিস্‌ সাহেব শিক্ষা সম্পর্কে এই রকম যে-সব কথা বলেছিলেন, আমাদের শ্রীনিকেতনের 'শিক্ষাসত্রে' সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হতে লাগলো।

'প্যাট্রিক গেডিস্‌ সাহেবকে খুবই ভালো লেগেছিল আমার। তিনি এখান থেকে কলকাতায় ফিরে দার্জিলিং গেলেন। আমাকেও যেতে বলেছিলেন। গেলুম আমি দার্জিলিং-এ—বাগান বাড়িতে। ডাঃ নীলরতন বাবুর বাড়ি, নাম—'মায়াপুরী'। ডক্টর বোসও থাকতেন গিয়ে সেই বাড়িতে। গেডিস্‌ সাহেব গিয়ে উঠেছেন সেইখানেই। আমি গেলুম। গিয়ে দেখি, দারুণ শীতে বাগানের মধ্যে একটা খাট পাতা, আর তাতে মশারি টাঙ্গানো। জিজ্ঞাসা করায় বললেন, —বাইরে বাগানেই আমি ভালো থাকি। রাত কাটলো। ভোরে উঠে তিনি স্নান করলেন। চা-পর্ব চুকলো। আমাকে

নিয়ে বাগানে ঘুরতে লাগলেন; একটি ফুল দেখালেন। আমাদের বাকস্ ফুলের মতন। মুখ হাঁ করে আছে। গেডিস্ বললেন, —দেখেছেন, এই ফুলটা হাসছে। শুধু হাসি নয়, ফুলটা কথা কইছে। —কেন এরকম করে আছে জানেন? —দেখালেন তিনি নিজে সেই ফুলটার স্কেচ্ করে। —এর রং ধরেনি এখনও, সেজন্যে। —দার্জিলিংএর বাগানে এই আমার একটা মস্ত শিক্ষা লাভ হলো। আর শিক্ষা লাভ হতো তাঁর সঙ্গে একটু ঘুরলেই।

'শান্তিনিকেতনে তিনি যতদিন ছিলেন, 'নতুন বাড়িতে' তিনি দিবারাত্র ঘরের জানালা কপাট খুলে রেখে দিতেন। জিনিসপত্তর চোরে চুরি করে নিয়ে যাবে বললে, তিনি হাসতেন। তাঁর স্ত্রীও সঙ্গে এসেছিলেন।

'বাথরুমে যেতেন যখন, বাইরে পোশাক ছেড়ে একেবারে উলঙ্গ হয়ে যেতেন। কিছুমাত্র লজ্জা করতেন না। গেডিস্ এদেশে থাকতে থাকতেই তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন। তখন হাউ হাউ করে সে কী কান্না। বলতেন তিনি, তিনি তো শুধু আমার স্ত্রী ছিলেন না; তিনি ছিলেন আমার মা।

'দেশে ফিরে গিয়ে বাহাত্তর বছর বয়সে আবার তিনি বিবাহ করলেন —সেবার জন্যে। নিজে ইউনিভার্সিটি স্থাপন করলেন। তাতে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিতে লাগলেন নিজের আদর্শ আর আইডিয়া মতো।

'আর্থার গেডিস্ হলেন তাঁর ছেলে। তিনিও শিক্ষা লাভ করতে লাগলেন বাবার বিদ্যালয়ে। বাবা নতুন বিবাহ করায় ছেলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। শেষে প্যাট্রিক গেডিস্ মারা গেলেন অভাব-অনটনে পড়ে। প্যাট্রিক গেডিসের ছেলে আর্থার গেডিস্ এখানে শ্রীনিকেতনে ছিলেন বহু বছর। তাঁর কথা যথাসময়ে বলবো।

॥ স্টেলা ক্রাম্‌রিশ, ১৯২২ ॥

'এবারে স্টেলা ক্রাম্‌রিশের কথা কিছু বলি। স্টেলা হাঙ্গেরীয়ান মেয়ে। শান্তিনিকেতন-আশ্রমের নামডাক শুনে আর গুরুদেবের আমন্ত্রণে এলেন এখানে। আশ্রমে এসে তিনি গথিক আর বৈজন্তাইন আর্টের ওপর বক্তৃতা দিলেন। আর দিলেন 'ভারতীয় শিল্প-প্রতিভা'র

ওপর। তাঁর চোখে প্রিমিটিভ ধরনের ছবি বেশি ভালো লাগতো। অজন্তা-টজন্তা তত পছন্দ করতেন না। অথচ গথিক আর অজন্তার আর্ট একই সঙ্গে শুরু হয়ে, গথিক কেন পিছিয়ে রইলো, আর অজন্তা কি করে এগিয়ে গেল তার সদুত্তর তিনি দিতে পারতেন না। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়ে আর্টশিক্ষণে ছাত্রছাত্রীদের তিনি কিছু ভুল পথও দেখিয়েছেন সে-কথা বলতেই হবে।

'আশ্রমে এসে তিনি white-ant দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর সে-সাধ মিটতে দেরি হয়নি ; তাঁরই জুতোর তলা আশ্রমের উইএ খতম করে দিয়েছিল। যাই হোক, স্টেলা মডার্ন আর্টের ওপর অনেক চিন্তা করেছিলেন। বিলিতী শিল্পের তিনি একজন বড়ো সমালোচক। ভারতের পরম্পরাগত মূর্তিশিল্পের ওপরেও তাঁর কাজ আছে অনেক। তবে তাঁর গুরু যে কে, তা আমি জানি না। এদেশে অক্ষয় মৈত্রেয় মশায়ের সঙ্গে স্টেলার যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ।

'সে সময়ে বিলিতী মডার্ন আর্ট সম্পর্কে খুব ভালো জানতেন স্টেলা। বিলিতী মডার্ন আর্ট প্রথমে কিভাবে আরম্ভ হলো সে-বিষয়ে তিনি আমাদের বোঝাতে লাগলেন। মডার্ন আর্ট কি, ইটালীয়ান আর্ট কি, —এই সব বিষয়ে তিনি বোঝাতে লাগলেন। তাঁর ইংরেজী উচ্চারণে হাঙ্গেরীয়ান টান ছিল ; সেই জন্যে আমরা তাঁর সব কথা ধরতে পারতুম না। শান্তিনিকেতনে তিনি ক্লাসে বলতেন বসে বসে। মাটিতে বসে ক্লাস হতো। সেকালে বিদেশী পোশাক ছিল মেয়েদের হাঁটু পর্যন্ত ছোট ফ্রক্। সেই পোশাক পরে হাঁটু মুড়ে বসতে তাঁর পক্ষে বড়ো অসুবিধে হতো। স্টেলার অবস্থা দেখে গুরুদেব বললেন, —ওঁকে বসতে একটা মোড়া দাও। ক্লাসে তাঁর কথা প্রথম প্রথম বুঝতে পারতেন কেবলমাত্র গুরুদেব। স্টেলার বলা শেষ হলে গুরুদেব তাঁর ইংরেজীতে আবার ভালো করে, সংক্ষেপ করে সবটা আমাদের বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর বক্তব্যটা গুরুদেব অনেক সহজ করে বোঝাতেন। শান্তিনিকেতনে স্টেলা তখন অনেক লেকচার দিয়েছিলেন। ক্রমে আমরা তাঁর কথা সব ঠিকমতো বুঝতে পারতুম। তিনি 'আধুনিকতা'র পত্তন করলেন আমাদের কলাভবনে।

'ভারতবর্ষে মডার্ন'-আর্ট প্রবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল শান্তিনিকেতনেই। মডার্ন'-আর্টের বিশ্লেষণ আর করণ-কৌশল সম্পর্কে আলোচনা আর তার প্রয়োগ এখানেই হয়েছিল প্রথম। এখন (১৯৫৫) মাদ্রাজ, বোম্বে সব জায়গাতে হয়েছে। আমি খুব তর্ক করতুম স্টেলার সঙ্গে। তাঁর কথা বিশেষ বুঝতে পারতুম না বলেই, খুব বেশি তর্ক করতুম। তর্কে স্টেলা যখন আমাকে বোঝাতে পারতেন না, তখন তাঁর চোখ ছলছল করে উঠতো। অনেক সময়ে কেঁদেও ফেলতেন। স্টেলা ক্রাম্‌রিশ অনেকদিন ছিলেন এখানে। বেশ কিছুদিন ছিলেন।

'সেকালে আমাদের আশ্রমের ছাত্রদের মডার্ন'-আর্টের ওপর অহেতুক ভক্তি জন্মে গেল স্টেলা ক্রাম্‌রিশের কৃপায়। আমার ছাত্রদের দু'একজন ঐ সময় থেকে ঐ পথ ধরলেন। আমার বোধ হয়, বিদেশী বলেই যেন ওঁদের ভক্তির মাত্রা একটু বেড়ে গেল। কিন্তু আমার মন তখন ওঁদের ঐ কর্মে ঠিক সায় দিল না। আমি ঠিক সবটা বুঝতেও পারতুম না। অথচ আশ্চর্য এই, আমার ছাত্র হয়ে ওঁরা সব ঠিক ঠিক বুঝে গেলেন। এবং ক্রমশঃ ঐ মডার্ন আর্টের ফ্যাশানে ছবি আঁকতে আরম্ভ করে দিলেন। আর দেখ, এখানে বসে এখনও কেউ কেউ সেইভাবেই চালিয়ে যাচ্ছেন। —স্টেলার এই অভাবিত গুণপনা দেখে অবনীবাবু তাঁর নাম দিয়েছিলেন —'দিদিমাণ'।

'শান্তিনিকেতনে তখন অবনীবাবু আসতেন মাঝে মাঝে। একবার স্টেলা আমাদের কলাভবনের একটি ছাত্র অর্ধেন্দু ব্যানার্জীকে বললেন, —ছবি কর। —অর্ধেন্দুর আঁকা ছবিতে দোষ ছিল একটু। সে ছবিটা দেখে সমালোচনা করে স্টেলা বললেন, —The artist ought to be hanged। —অতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন স্টেলা ক্রাম্‌রিশ একজন শিল্পশিক্ষার্থীর প্রতি। অর্ধেন্দু কাঁদো কাঁদো হয়ে সব বললে অবনীবাবুকে। শুনে অবনীবাবু বললেন, —'ও তো ডাইনী বুড়ী!' ছেলেরা যখন ছবি আঁকছে, সে-সময়ে সেই ছবির সমালোচনা করতে নাই। যে করে সে তো ডাইনী। অবনীবাবু খুব ধম্‌কে দিলেন স্টেলাকে। বললেন, —তুমি এ-রকম সমালোচনা আর কখনো করো না! আমাদের কলাভবনের কাজেরও সমালোচনা করতেন স্টেলা। তাতেও অবনীবাবু তাঁকে ধম্‌কেছিলেন। —এই রকম

ধমক ক-বারই যেন অবনীবাবু দিয়েছিলেন তাঁকে। আর ধমক খেলেই স্টেলা কিন্তু ফি বারেই কেঁদে ফেলতেন।

'সোসাইটির এগ্‌জিবিশনে একবার ছবি দেখছেন স্টেলা। আমি তখন তাঁকে চিনতুম না। সেই সময়ে আমার কতকগুলো ছবিতে চীনে জাপানী ছবির আভাস পড়েছিল। অবশ্য সে-ছবিগুলো চীনে-জাপানে যাবার অনেক আগে করা। একটা ছবি আমাদের কলাভবনে রাখা আছে —'গরুর গাড়ি করে আমরা শান্তিনিকেতন থেকে যাচ্ছি রাত্রে' —চীনে ধরনে আঁকা আমার এই ছবিখানা। স্টেলা ছবিখানার সমালোচনা করে বললেন, —'Nanda Babu has sold his soul to China'। কথাটা গেল অবনীবাবুর কানে। রেগে কাঁপতে লাগলেন তিনি। বললেন, —আমরা কতো আগে থেকে তোমাদের কাছে নিজেদের 'সেল্' করে দিয়েছি; আর যত দোষ এই চায়নার বেলাতে! —অবনীবাবু এই না বলতেই স্টেলার চোখ ছলছল করে উঠলো। তক্ষুণি তিনি কেঁদে ফেললেন। দেবীপ্রসাদকে একবার বকুনি দিয়েছিলেন অবনীবাবু। —আমার একটা ছবি —পেনসিল ড্রয়িং —'ঘর-ছাড়া সাঁওতাল ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে'। প্রশান্ত মহালনবিশের কাছে আছে সে ছবিটা। তার ড্রয়িং দেখে দেবীপ্রসাদ বলেছিলেন, —এ্যানাটমিতে ভুল আছে ঘাড়ের কাছটায়। শুনে, দেবীকে ডাকলেন অবনীবাবু। —তুমি এই কথা বলেছ? এ্যানাটমির তুমি কি শিখেছ?—এমনি আমার ছবির কিছুমাত্র সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না তিনি।

'স্টেলা খুব ভালো নাচিয়ে ছিলেন। বিলিতী নাচ নয়, হাঙ্গেরীয়ান নাচ জানতেন ভালো রকম। এখানে নাচতেন। গুরুদেবকে তাঁর নাচ দেখাবেন বলে তিনি একদিন নাচের আয়োজন করলেন। গুরুদেব থাকতেন 'দেহলী'তে। দেহলীর পাশের বাড়ির একটা ঘরে থাকতেন স্টেলা। পাশের ঐ খড়ের ঘরগুলি ছিল তখন ফরেন গেস্ট হাউস। এ্যাণ্ড্রুজ, মরিস্—সবাই থাকতেন ঐখানে। স্টেলা তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গুরুদেবকে নাচ দেখাচ্ছেন। মেঝেয় ছিল মাদুর পাতা। স্টেলা নাচছেন জুতো পরে। হঠাৎ স্টেলা পড়ে গেলেন পা slip করে হাঁটু মুড়ে। পড়ে গিয়ে হাঁটুর তাঁর মালুইচাকি সরে গেল। Dislocated হয়ে গেল। গুরুদেব তখন তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দিলেন হাসপাতালে। সেরে গেল কিছু

দিন বাদে। তারপরেও স্টেলা রইলেন এখানে কিছুদিন ধরে। ছবি-টবি দেখতেন আমাদের —অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে। তবে তাঁর মুখে আর বিশেষ কিছু সমালোচনা শোনা যেত না, অবনীবাবুর সেই ধমক খাবার পর থেকে।

'ছবির আঙ্গিক বিষয়ে স্টেলার ব্যুৎপত্তি ছিল খুব ভালো রকম। চিত্রের বা অন্য সুকুমার-শিল্পের ভালো মন্দ তিনি বুঝতে পারতেন চট্ করে। ক্রমে তিনি ভারতশিল্পের ওপর বই লিখতে আরম্ভ করলেন। অক্ষয় মৈত্রেয় মশায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর কাছে যেতেন স্টেলা। মৈত্রেয় মহাশয়ও স্নেহ করতেন স্টেলাকে। মৈত্রেয় মশায় স্টেলাকে বোঝাতেন ভারতীয় ভাস্কর্য আর চিত্রশিল্প। 'অভিলষিতার্থচিন্তামণি' বা এই ধরনের শিল্পবিষয়ে সব শক্ত শক্ত বইয়ের ব্যাখ্যা তাঁর কাছ থেকে শুনে শুনে নোট করে করে বই লিখতে লাগলেন স্টেলা। ক্রমে ভারতশিল্পের ওপর অনেক বই লিখে ফেললেন তিনি। অবশেষে Indian Art-এর ওপর তিনি একজন authority হয়ে গেলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পশাস্ত্রের চেয়ারে বাগেশ্বরী অধ্যাপক হয়ে বসলেন তিনি —সে-কথা আগে বলা হয়েছে।

'এদেশে একজন ইটালীয়ান ধনী ভদ্রলোককে বিবাহ করলেন স্টেলা। নাম তাঁর বোধ হয় 'নেমেনি' সাহেব। কিন্তু যখন পাঞ্জাব বয়কট হলো, ফ্রন্টিয়ারে মারা গেলেন তিনি গুণ্ডাদের গুলিতে। তবে স্টেলা ক্রাম্‌রিশ হলেন স্বনামধন্য মহিলা। তাঁর স্বামীর নাম থেকে তাঁর পরিচয় নয়। তাঁর বিয়ের আগে বা পরে আমরা তাঁকে ডক্টর স্টেলা ক্রাম্‌রিশ বলেই জানি। কলকাতার নব্যকলা-সমাজের প্রতি জার্মান দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর নাক-তোলা স্বভাবের জন্যে তাঁকে আমরা ভালোমতেই জানি। স্টেলার স্বামী তেমন নামজাদা লোকও ছিলেন না।

'আমাদের ও. সি. গাঙ্গুলী মশাই সোসাইটি থেকে কাগজ বের করতেন— RUPAM—A Journal of Oriental Art—Chiefly Indian—Edited by Ordhendra Coomar Gangoly। এগারো বছর বের হবার পরে কাগজটি বন্ধ হলো। অর্ধেন্দ্রবাবু Rupam-এর সম্পাদন-ভার ছেড়ে দিলেন। এর পর সোসাইটি থেকে আর-একটি পত্রিকা বের

হতে লাগল। নাম হলো— Journal of the Society of Oriental Art। এর সম্পাদক হলেন অবনীন্দ্রনাথ আর স্টেলা ক্রাম্‌রিশ। এই পত্রিকাটি চলেছিল পনের-ষোল বছর। পরে সোসাইটির অবস্থা হলো মর মর; পত্রিকাও বন্ধ হয়ে গেল। এর মধ্যে স্টেলা ক্রাম্‌রিশ এদেশ থেকে চলে যাবার পরে, এই পত্রিকাটি চালাতেন আমাদের ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। এ কাগজে স্টেলা আমাদের অনেকের স্বপক্ষে লিখেছেন অনেক কথা। পাতা উল্টে দেখলেই সব বুঝতে পারবে।

'অক্ষয় মৈত্রেয় মশায়ের খবর পাওয়া মাত্র স্টেলা ক্রাম্‌রিশ তাঁর কাছে ছুটে যেতেন। মৈত্রেয় মশায়ের কাছ থেকে স্টেলা আদায় করেছিলেন অনেক-কিছু। স্টেলা আছেন এখন (১৯৫৫) সুইজারল্যাণ্ডে। মাঝে তিনি চেস্টা করেছিলেন সুইজারল্যাণ্ডে বসেই কলকাতার Oriental Art Society-র এই Journal-টা চালাবেন। কিন্তু সোসাইটি-কর্তৃপক্ষ সেটা পছন্দ করলেন না। তবে, আমাদের ডক্টর নীহাররঞ্জন ইচ্ছে করলে ঐ Journal-টা চালাতে পারতেন।'

শান্তিনিকেতনে প্রথম আসার কিছুদিন পরে ডক্টর স্টেলা ক্রাম্‌রিশ ভারতশিল্পের ওপর যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটি ডক্টর শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী বাঙ্গালায় অনুবাদ করেছিলেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসীতে। স্টেলা ক্রাম্‌রিশের এই রচনাটি পড়লে 'ভারতীয় শিল্পপ্রতিভা' সম্পর্কে তাঁর তখনকারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার বোঝা যাবে। পরে, ডক্টর স্টেলা শান্তিনিকেতনের সঙ্গে বিশেষ কোনো যোগ রক্ষা করেননি। আচার্য নন্দলাল প্রমুখ ভারতশিল্পীদের সঙ্গেও তাঁর তেমন কোনো যোগাযোগ ছিল না। তবে, শান্তিনিকেতনে সে-সময়ে মডার্ন-আর্টের প্রবর্তনের ব্যাপারে আমাদের মনে হয়, একমাত্র স্টেলা ক্রাম্‌রিশই দায়ী ছিলেন না। অবনীন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক শান্তিনিকেতন-আগমন এবং আশ্রমে তাঁর ভাষণে আমরা শিল্পক্ষেত্রে ছাত্রদের স্বমত অনুবর্তন করার সম্পর্কে উৎসাহদানের বিশেষ ইঙ্গিত পাই।

॥ স্টেলা ক্রাম্‌রিশের ভারতশিল্প-চিন্তা, ১৯২২ ॥

মানুষের মনে যে সৃজনীশক্তির বেগ আছে তার প্রকাশ চেষ্টাতেই শিল্পকলার জন্ম। সৃষ্টি বলতে আমরা দুটো কথা বুঝি, স্রষ্টা, যে সৃষ্টি করবে, এবং সেই জিনিস যা সৃষ্ট হবে। শিল্পীর উপাদান হচ্ছে জীবন,—প্রাণের প্রাচুর্যকে তার অন্তহীন বৈচিত্র্যকে রূপের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত করে তোলা, শিল্প-রচনার মধ্যে আকার দান করাই হচ্ছে তাঁর সমস্ত সাধনার লক্ষ্য। শিল্পরচনামাত্রেই সৃষ্টি, এবং সেইজন্যে তার মধ্যে একটা প্রাণধর্ম আছে যাকে অবলম্বন করে সে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং নিজের অস্তিত্বের অধিকার ও সত্যতা সপ্রমাণ করে; —তার সার্থকতার মূল কারণ তার নিজেরই মধ্যে নিহিত, বাহিরে বা অন্য কোথাও নয়। প্রত্যেক শিল্পরচনাতেই রেখা, সমতল ক্ষেত্র, আয়তন ও বর্ণ পরস্পরের সঙ্গে একটা গভীর সামঞ্জস্য, একটা নিবিড় সম্বন্ধের গূঢ় যোগসূত্রে বিধৃত হয়ে বিরাজ করে, একটা বিশিষ্ট অভিপ্রায়সূচক আকৃতির মধ্যে তারা একটা ভাবের ঐক্যে মিলিত হয়ে তাৎপর্য পায় এবং অনন্তের চিরন্তন সঙ্গীতকে ধ্বনিত করে তোলে।

দেশে দেশে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জীবনের এক-একটা অংশ সমাদৃত হয়ে থাকে, জীবনের এক-একটা রূপ নূতন করে যেন চোখে পড়ে যায়, এবং সেইজন্যে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বংশানুক্রমেই শিল্পীর মনেরও দিক্-পরিবর্তন না হয়ে পারে না, শিল্পসৃষ্টির প্রবাহ ক্রমাগত নব নব ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়ে তবেই যেন আপনার প্রকৃত সত্তাকে অনুভব করে। এই কারণে পৃথিবীতে অধ্যাত্ম জগতের আর অন্ত নেই, চার দিক থেকেই আমরা এই-সব অদৃশ্য ভুবনের দ্বারা পরিবেষ্টিত ; কোন্ শুভমুহূর্তে অকস্মাৎ কোন্ শিল্পীর কাছে তাদের রহস্যের ঘন-আবরণ সহসা উন্মুক্ত হয়ে যাবে, তাদের অন্তরের গোপন কথাটি আবার এক নূতন প্রাণের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে সজীব সত্য হয়ে উঠবে —সেই আশা-পথ চেয়ে যেন তারা নীরব ধৈর্যে চির-অপেক্ষমাণ হয়ে থাকে।

আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই রূপক এবং সাংকেতিকতা জাতীয় সব কথা ভোলা চাই, কারণ শিল্পরচনামাত্রই স্বপ্রকাশ, মূল সত্যের সঙ্গে তাদের একেবারে সোজাসুজি কারবার, এবং সত্যকে অখণ্ডভাবে ফুটিয়ে তুলছে বলে তার সমগ্ররূপের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়, বাহিরের যুক্তি বা চিন্তা, ব্যাখ্যা বা বিবৃতির কিছুমাত্র দরকার করে না। এলিফ্যাণ্টার গুহা-মন্দিরের দেয়ালের মধ্যে থেকে 'ত্রিমূর্তি'র বিরাট প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্তি তার সমস্ত বিশালতা এবং অপূর্ব রেখাবিন্যাস নিয়ে যেন চতুষ্কোণ অন্ধকারের পুঞ্জে স্তম্ভিত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। নিখুঁৎ সৌসামঞ্জস্য এবং খোদিত আকৃতির ক্রমবিকাশমান রূপপর্যায়ের একটা তরঙ্গ এক মাথার পার্শ্বদেশ থেকে ধীরে ধীরে উত্থিত হয়ে, মধ্যস্থিত মাথার সম্মুখ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, তৃতীয় মাথাটির ধারে ধারে অল্পে অল্পে নিম্নদিকে হ্রাস হতে হতে মিলিয়ে গিয়ে যেন সমস্ত ত্রিমূর্তিকে আলিঙ্গন করে রয়েছে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন দেহগুলি পাথরের ভিতর তলিয়ে গিয়ে আপন আপন স্বতন্ত্র সত্তা এবং বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলল, যা থেকে গেল তা হচ্ছে একটা বিরাট প্রস্তরের স্তম্ভ, এবং সমস্তটাকে ব্যাপ্ত করে একটা অদৃশ্য অপূর্ব দেবত্বের ভাব। অতি কোমল কম্পিত রেখা যেন কপোল ও ভ্রূযুগলের উপর দিয়ে লীলা করতে করতে চলে গেছে। এই ছন্দোময় সমান্তরালগামী গতি মাথায় উপরকার ত্রিকোণাকৃতি কিরীট-সদৃশ আচ্ছাদনাদির উঁচু নিচু নির্মাণ-প্রণালীর আরেকটা বিরুদ্ধগতির সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে একটা স্থিরতা, একটা সমতা, একটা অতি মনোরম এবং নয়নাভিরাম সুষমা প্রাপ্ত হয়েছে। এখন এই যে শারীরিক আকৃতির নানা অংশের অতি সূক্ষ্ম সুনিপুণ সমাবেশ ও রচনা-প্রণালী, উঁচু নিচু ও পাশাপাশি রেখার বিরুদ্ধগতিকে সংযত এবং সংহত করে এই যে একটা অটল অপরিবর্তনীয় ভারসাম্যে নিবদ্ধীকরণ —এ-সমস্তের ভিতর দিয়ে শিল্পীর সেই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে —সেই কল্পনাই মূর্ত হয়ে উঠেছে যেখানে তিনি ভগবানের পরম অদ্বৈত ধ্রুব স্বরূপকে ত্রয়ীরূপে দেখেছেন। এবং শিল্পীর এই মনোভাবটি বুঝতে হলে সরল মন ও যথার্থ অনুভাবিকতার সঙ্গে ঐ বিশেষ শিল্পরচনাটির দিকে তাকালেই যথেষ্ট, কেননা তার অন্তরের বাণী আপনা হতেই ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ছে, বাহিরের কোনো

টীকা বা অন্বয়ের জন্যে কোথাও লেশমাত্র অপেক্ষা রাখেনি।

এ হলো ভারতীয় শিল্পপদ্ধতির একটি ধারা; এ ছাড়াও আর-একটি প্রণালী আছে যেখানে মানসমূর্তিকে রূপ দেওয়া নয়, বাহ্য প্রকৃতিকে ভাবে অনুপ্রাণিত করে দেখানোই হচ্ছে শিল্পীর উদ্দেশ্য। আর ভেবে দেখতে গেলে আধ্যাত্মিক জগৎ এবং প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে যে একটা সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট সীমারেখা আছে তাও ত নয়। 'অসীম সে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ,' যা অরূপ এবং নিরাকার তারও পরিচয় ত আমরা বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে রূপের মধ্য দিয়েই পাই; এই প্রকৃতি এই বাস্তব জগৎ সে-ও ত এক অনির্বচনীয় অপরিমেয় প্রাণশক্তিরই অভিব্যঞ্জনায় স্পন্দমান। সুতরাং শিল্পীর পক্ষে দু-ই সমান সত্য, এবং তাঁর রচনার জন্যে দুয়েরই সমান দরকার। তিনি আমাদের এই মাটির কাছ থেকেই ফুল ধার করে তবে ত তাকে পাথরের গায়ে গায়ে কোমল কম্পিত মৃণাল-বৃন্তটির উপর অপূর্ব লাবণ্যসহরে লীলায়িত করে তুলতে পারলেন। ফুল, পাতা,জল, পাখী সেখানে এক বিশুদ্ধ সুরের অমরাবতীতে স্থান পেল —সেই দ্বন্দ্ববিরোধবৈষম্যবর্জিত ছন্দোময় জগতে যেখানে প্রতি পুষ্পকোরক, প্রতি কোমল পত্রপল্লব এক অনন্ত সৌন্দর্যের রূপরশ্মিপাতে সমুদ্ভাসিত, যেখানে কোনো কিছুই ব্যর্থ বা অপ্রাসঙ্গিক নয়, কল্পনা এবং বাস্তবিকতা যেখানে অপরূপ মিলনের মাধুর্যে বিলীন হলো। এই যে রূপসৃষ্টি এ-ত কেবল আলঙ্কারিক নয়, এ-ত কেবল সাজসজ্জা শিল্পচাতুর্যসংক্রান্ত নয়, এ যে 'সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে' বিকশিত একটি করুণ কমলের মুগ্ধ জয়গান। প্রকৃতির শুধু অবিকল নকল করে যাওয়া, বা কেবল তার ভাবকে রূপ দেওয়া, এর কোনটাই ভারতীয় শিল্পীর ঠিক আদর্শ নয়; প্রকৃতির নিবিড়-নিহিত গতিবেগ, তার গোপন প্রাণস্পন্দনকে তিনি উপলব্ধি করে নেন এবং তারই তালে তালে নিজের মনোধর্ম এবং স্বভাবগত সৃষ্টিপ্রণালী অনুসারে তিনি একটা স্বতন্ত্র ভাবোজ্জ্বল রূপরচনা করতে বসেন। আমরা যে বিশেষ শিল্পরচনাটির কথা বলছিলাম সেখানে প্রস্তর-খোদিত ঐ কম্পিত পদ্মবৃন্তগুলি তাদের উপরকার পূর্ণ-কুসুমিত সুডৌল পদ্মফুল এবং সূক্ষ্মাগ্র কমল-কলিকার মাধুর্যসম্ভার নিয়ে অতি মধুর সুষমার সহিত প্রকৃতির একটা ভারী অপূর্ব ছন্দকে দুলিয়ে তুলেছে।

ভারতীয় শিল্পকলায় প্রত্যেক জিনিসকেই এমনি একটা অনুভূতির প্রাবল্য,

একটা নিবিড়তা এবং একগ্রতার সঙ্গে ধরে দেখানো হয়, কারণ যদিও চেতনা-শক্তির সূক্ষ্মতাহেতু অল্পেতেই শিল্পীর মন সাড়া দেয়, তৎসত্ত্বেও কল্পনাবিকাশের জন্যে তাঁকে কোনো বিশিষ্ট বিষয়ে নিবদ্ধ থাকতে হয় না, কোনো বাহ্যিক বস্তু-সামগ্রীর উপর একান্তভাবে তাঁর অবলম্বন না করলে চলে। তাই তিনি ক্রমাগত নূতন নূতন রচনার বিষয় এবং তার জন্যে নূতন নূতন নিয়ম এবং প্রয়োগপ্রণালী উদ্ভব করে যান। বস্তুত ভারতের মত এমন স্বাধীনতাপ্রিয় এবং স্বাতন্ত্র্যচারী শিল্পপ্রতিভা জগতে আর দ্বিতীয় নেই। নিজের বিশেষত্ব এবং স্বগঠিত নিয়ম-প্রণালীকে এখানে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় যে শেষে আপনার উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছাকেও সম্পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করে তোলা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। এইজন্যে শেষে এমন সব প্রকাশপদ্ধতি এমন সব নিরীক্ষণ-প্রণালীগত নিয়মের সৃষ্টি করতে হয় যা সমগ্র শিল্পরচনার প্রতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না, অথচ ছবির প্রত্যেক অংশের উপর খুব ঘনিষ্ঠভাবে আপন অধিকার বিস্তার করে। এর একটা ভালো দৃষ্টান্ত এলোরায় যে একটা পাথরে কাটা মন্দির আছে সেইটে। এই শিল্পরচনায় অতি সূক্ষ্ম সুনিপুণ কারুকার্য এবং অপর্যাপ্ত জটিল রেখার বৈচিত্র্য যেন সৃষ্টির অজস্রতে উৎসারিত হয়ে সকল বাধাবিঘ্ন একেবারে আচ্ছন্ন করে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। এখানে দেখতে পাই শিল্পজনিত সংযমের বদলে অফুরন্ত শক্তির আতিশয্য, সীমা ও পরিমাণের স্থানে পূর্ণতা ও সমগ্রতা, এবং রচনাবিন্যাসের পরিবর্তে সৃষ্টির একটা বিপুল উদ্যম ও দ্বিধাবিহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

এই প্রকার শিল্পসৃষ্টি রূপপ্রকাশের যা সবচেয়ে সহজ বাহুল্যবর্জিত উপায় —রেখা —তার মধ্যেই নিজেকে সংযত এবং ঘনীভূত করে তোলে, অন্ততঃ এইদিকেই তার বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে বলে ত মনে হয়। অজন্তাগুহার গায়ে গায়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী বা ঘরবাড়ির নক্‌সা, মানুষ, দেবদেবী অথবা প্রাণীজগতের যে-সব নানা বর্ণ ও রূপের ঘনসমাবেশপূর্ণ বিচিত্র চিত্ররচনা আছে তাতেও এই রেখা জিনিসটাই হয়েছে ভাবপ্রকাশের প্রধান বাহন, —ছবির গূঢ় অভিব্যঞ্জনা ও যথার্থ তাৎপর্য তারি মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে।

এই সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেও ভারতীয় শিল্পকলার মূলনীতি এবং

আদর্শ সম্বন্ধে হয়ত কিছু কিছু বোঝা যাবে। এইসব মূলনীতি এবং বিশেষ বিশেষ প্রয়োগপ্রণালী ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে ঠিক্ তেমনিই অবশ্যপ্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক জগতের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধকে চিত্র বা ভাস্কর্যের সমতল ক্ষেত্রে কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে পরিণত করা মিশরদেশীয় শিল্পের পক্ষে যেমন প্রয়োজন হয়েছিল ; এবং ইউরোপীয় রেনেশাঁসের সময়কার ত্রিকোণ-পদ্ধতি কিংবা বারোক্ (Baroque) চিত্রগুলির কোণাকুণি বা তির্যক্‌গামী রচনাবিন্যাসপ্রণালীকে যেমনভাবে মেনে নেওয়া হয় এদেরও ঠিক তেমনিভাবেই মেনে নিতে হবে। তাছাড়া এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় শিল্পের একটা অত্যন্ত বিস্ময়োদ্দীপক বিশেষত্বই এই যে একে কিছুতেই কোনো একটা বিশেষ শিল্পপ্রণালী বা কোনো একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পরিণত করা যায় না, এর অসীম প্রাণশক্তি নানাপ্রকার পরস্পর-বিরোধী গতিকে বা ধারাকে শোষণ করে নিয়েছে, এবং সব ছাড়িয়েও আপন প্রকৃতিকে পূর্ণ প্রকাশিত করতে পেরেছে।

অবিচ্ছিন্ন ভাবকে, কল্পমূর্তিকে রূপের মধ্যে দিয়ে আকারের মধ্যে দিয়ে পাবার জন্যেই ভারতীয় শিল্পে পরিমাণ, আয়তন ও রেখা ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যে বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়, কিম্বা তার বহু পরে হিন্দুশিল্পী যে 'ত্রিমূর্তি' রচনা করেন এ দুয়েতেই এই কথা প্রমাণ করছে। এ ছাড়া এই প্রকার নির্মাণপ্রণালীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রকৃতির আর একটা গতি প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় শিল্পরচনায় দেখা যায়, —সেটা হচ্ছে একটা কম্পমান অসমরেখার তরঙ্গলীলা —প্রায় কোনো মূর্তি বা প্রতিকৃতি বা অঙ্গসমাবেশে এই জিনিসটা আসেনি এমন দেখা যায়না। শিল্পী যেখানেই কোনোপ্রকার প্রাণরূপ, কোনো প্রকার সজীবতা দেখাতে চেয়েছেন —সে মানুষ, তরুলতা বা কর্মজীবন সম্বন্ধীয় কোনো ঘটনা —যারই বিষয় হোক, —এই লীলায়িত রেখাই এ-বিষয়ে তাঁর প্রধান সহায় হয়েছে। এইজন্যে পদ্মের কম্পিত মৃণাল ভারতীয় শিল্পকলার একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে, এবং তার একটা প্রধান উপাদানে পরিণত হয়েছে। —এই উপায়ে জ্যামিতিগত রচনাবিন্যাস অবিচ্ছিন্ন ভাবস্বরূপকে এবং অসম রেখা প্রাণের গতিকে প্রকাশ করেছে। আর এই দুয়ে মিলে শিল্পীর কাছে কত যে অজস্র রচনার বিষয়

এবং রূপের উপলব্ধি এনে দিয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু এ ছাড়াও আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে, এবং সেই তৃতীয় কথাটি হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক দেশের শিল্পকলারই একটা সমগ্ররূপ আছে, সব মিলে তার একটা এমন রচনাপ্রণালীর ভঙ্গি, এমন একটা প্রয়োগবিদ্যাগত স্বাতন্ত্র্য আছে যা বিশেষ করে তার নিজেরই সম্পদ, —এবং এই স্বতন্ত্র রূপ হচ্ছে স্বপ্রকাশ, —অর্থাৎ আপনা হতেই সে নিজের এমন একটা জাতীয়তা ও বিশিষ্টতাকে প্রকাশ করে নিজেকে ফুটিয়ে তোলা ছাড়া যার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। ভারতীয় শিল্পকলায় দেখি আকার সৃষ্টির অজস্রত্ব শিল্পীর শক্তিবেগকে এবং রেখা জিনিসটা তাঁর হৃদয়বেগকে ফুটিয়ে তুলেছে —মন দিয়ে দেখলে বোধহয় ভারতীয় শিল্পের এই বিশেষত্বটাই বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

কিন্তু এ-সমস্তই হচ্ছে যাকে বলে —সাধারণ সিদ্ধান্ত, এবং সেইজন্যে এইসব বাহিরের কথার তেমন যে মূল্য আছে তা নয়, যদিও আর্ট সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে এ-ছাড়া উপায়ও নেই, কারণ আর্ট জিনিসটা হচ্ছে একটা জীবন্ত জিনিস, এবং সজীব পদার্থমাত্রেই এমন একটা জটিলতা এবং রহস্যময়তা আছে যে কথায় তাকে ধরে দেখানো একেবারেই সম্ভবপর নয়। আর এ-কথাও ভুললে চলবে না যে ভারতীয় শিল্পে যেমন আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য আছে তেমনি সে একটা প্রাণপূর্ণ পদার্থও বটে, বিশ্বপ্রকৃতির ধমনীস্পন্দনে তার প্রতিমূর্তি এবং রেখা কম্পমান।

ভারতীয় শিল্পি-জীবনের এই গভীর হৃদ্‌স্পন্দনকে অনুভব করেছেন, তার গতিবেগ তাঁর সমস্ত মনকে আন্দোলিত করে তুলেছে। ভারতীয় চিত্রকলায় বহুকাল থেকেই নারীদেহ ও তরুলতার মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো এবং উভয়কে একজায়গায় উপস্থিত করার যে একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং প্রয়াস প্রকাশ পেয়েছে তাতেও এই কথা বলে, কারণ ঐসব ছবিতে শুধু যে রমণীদেহের রমণীয়তা ও সৌকুমার্য ফুটে উঠেছে তা নয়, একটা সকৌতুক স্নেহময় লাবণ্যলীলা এবং গতিতরঙ্গ যেন রমণীর দেহ এবং তার বক্র বাহু-দুটি, গাছের শাখা-প্রশাখা এবং তার কোমল পত্রপল্লবগুলি সমস্তের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র দৃশ্যকেই যেন একটা অনির্বচনীয় সুষমায় স্বর্গীয় করে তুলেছে।

বুদ্ধদেবের যে সৌম্য শান্ত ধ্যানমৌন মূর্তি, তার চারদিকে একটা বিপুল নীরবতা এবং একটা অচল অটল তপশ্চর্যার ভাব আছে সত্য, কিন্তু দেহের ঐ অনবচ্ছিন্ন স্থিরতার ভিতর দিয়েও একটা প্রাণের ছন্দ স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। আনত নয়নপল্লব এবং মসৃণ বাহু-দুটি থেকে একটা জীবনের কম্প নিম্নপ্রবাহিত হয়ে ভাবমগ্ন করযুগলে এসে শান্তি লাভ করেছে, সমস্ত দেহের উপর দিয়ে একটা প্রাণের তরঙ্গ দুলে দুলে শেষে ঐ পদ্মাসনযুক্ত পদদ্বয়ে যেন এক পরমাশ্রয় পেল। বুদ্ধদেবের ঐ তদ্‌গতভাবপূর্ণ অপূর্ব মূর্তিটির অন্তরের ঐক্য, জীবন্ত দেহের সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্য, কিম্বা অংশ-সমাবেশে সমসঙ্গতির উপর নির্ভর করেনি, সমস্ত মূর্তিকে ব্যাপ্ত করে এবং প্রতি অঙ্গকে গূঢ় যোগসূত্রে মিলিত করে যে অন্তঃশীলা ছন্দগতি নিবিড়-প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে তারই ফলে সেটা ফুটে উঠতে পেরেছে।

শিবের তাণ্ডবনৃত্যের নানা নিদর্শন এবং তাকে অবলম্বন করে যে-সব বিচিত্র শিল্পসৃষ্টি দেখতে পাওয়া যায় তাতে সমুখ বা পিছন, বাম বা দক্ষিণ, সবই যে কোথায় লুপ্ত হয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই, এমন কি, নৃত্যের কোনো অঙ্গভঙ্গি পর্যন্ত প্রকাশ পায়নি, কারণ একটা গতির উন্মত্ততা, নৃত্যের নেশাতেই যেন সমস্তটা মেতেছে, প্রাকৃতিক জগতের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ বোধ এবং সময় ও সীমার বোধকে অতিক্রম করে চলার উদ্দাম গতিবেগের অব্যক্ত আলোড়নে যেন দণ্ড-পল-মুহূর্ত-বিবর্জিত দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য একটা ভাবলোকের স্বতন্ত্র দেশ ও কাল সৃষ্ট হয়ে উঠেছে। এই নৃত্যোন্মত্ত প্রচণ্ড গতিস্রোতকে গোচর করে দেখাবার জন্যে বাধ্য হয়ে এমন একটি দেহের সৃষ্টি করতে হলো যাতে বাহুর বহুত্বই অলৌকিক শক্তিবেগকে রূপতরঙ্গে ব্যক্ত করে তুলতে পারে। এই চলচঞ্চল আবেগবিকম্পিত রূপচ্ছবির মধ্যে জ্ঞেয় অজ্ঞেয় সকল প্রকার বেগের বিকাশ আছে বলে এর মধ্যে এক অপূর্ব গতিসাম্য ঘটেছে, এবং বুদ্ধদেবের ধ্যানস্তব্ধ মূর্তিতেও যেমন একটা নিবিড় জীবনের প্রবাহ দেখতে পাই এখানে আবার তেমনি সমস্ত বিরুদ্ধ গতিকে পরম সামঞ্জস্যে সম্মিলিত করে সমস্তটার একটা বিরাট শান্ত রূপ চোখে পড়ে।

ভারতের শিল্পিজীবনের অন্তরতম গোপনগামী গতিকে উপলব্ধি করেছেন। স্মৃতিস্তম্ভ বা মনুমেণ্ট্ মাত্রেরই একটা বিশালতা, একটা বিস্তৃত স্থিরতার

ভাব থাকা চাই ; কিন্তু তিনি যখন 'স্তূপ' রচনা করলেন তখন তাকে এমন একটা রূপ এমন একটা আকার দিলেন যাতে স্থিরতা আছে বটে কিন্তু সে স্থিরতাকে জড়ত্বের নির্জীবতা বললে ভুল হবে, গতির তরঙ্গ যেন সেখানে স্তম্ভিত হয়ে জমাট বেঁধে গিয়েছে। ভারতবর্ষীয় মনুমেন্ট্ — স্তূপ —আকৃতিতে অর্ধবৃত্তাকার, যেন ভূমণ্ডলের আধখানা টুকরো নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। মিশরের পিরামিড্ মিশরের পক্ষে যেমন মূল্যবান, এই স্তূপ জিনিসটা ভারতবর্ষের পক্ষে তার চেয়ে কিছু কম নয়, কিন্তু দুয়ের মধ্যে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ! পিরামিডের চারটে ধারই সমান, তার প্রতি রেখা দৃঢ় এবং সুনির্দিষ্ট, এবং সমস্তটা মিলে সে যেন খাড়া উপরের দিকে উঠে গিয়েছে, কিন্তু স্তূপের মধ্যে আগাগোড়া একটা গতির লীলা উচ্ছ্বসিত হয়েছে, সে গতি যেন আপনার বেগে আপনহারা হয়ে কেবল প্রবাহের মধ্যেই সার্থকতা লাভ করেছে এবং নৃত্য করতে করতে ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে নিজেরই উপর এসে পড়েছে, —এখানে না আছে সরল রেখা, না আছে সুনির্দিষ্ট দিক্‌নির্ণয়ের কোনো চেষ্টা।

তাহলেই দেখতে পাই একটা গতি, একটা চলন্ত জীবন্ত ভাবই হচ্ছে ভারতীয় শিল্পরচনার প্রধান বিশেষত্ব ; একেই অবলম্বন করে তার সৌধশিল্প বা চিত্রকলা, তার জড়প্রকৃতি বা জীবজগতের নানা রূপচ্ছবি সব ফুটে উঠেছে। মানুষের মুখের ভাবে, তার অঙ্গের আকৃতিতে সকলখানেই এই প্রাণের নিবিড় সঞ্চার অনুভব করা যায়, যেন গোপন অন্তরের 'বেগের আবেগ' 'আকারের অসহ্য পিয়াসে' রূপের ফোয়ারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, আত্মার শুভ্র রশ্মিরাগে দেহ এবং মুখাবয়বকে যেন উজ্জ্বল করে তুলেছে। নাক মুখ বা চোখে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে বিশেষভাবে প্রকাশ না করে ভারতীয় শিল্পী তারও ভিতর দিয়ে জীবনের বিরাট ছন্দকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন।

এই বিরাট ছন্দের তালে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিই ত নিয়ত স্পন্দিত হয়ে উঠছে, তাই আর্টিস্টের কাছে কোনো জিনিসই সামান্য বা তুচ্ছ নয়, কিন্তু শিল্পরচনার সময়ে তিনি কোনো একটা বিশেষ জিনিসকেই বড়ো করে দেখেন, জগৎ যেন তখনকার মতো ঐ একটা রূপের মধ্যে দিয়েই তাঁর কাছে সার্থক হয়ে ওঠে। তা ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই তাঁর কাছে

মূল্যবান এবং অর্থসূচক বলে তাঁর শিল্পরচনাতেও তিনি কোনো জিনিসকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না, পটভূমির কোনো জায়গাতেই শূন্যতা রেখে বা কোনো সামান্য রেখাতেও প্রাণসঞ্চার না করে তিনি সন্তুষ্ট হন না। এইজন্যে এই শিল্পে এমন একটা ছবি বা প্রস্তর-খোদিত মূর্তি নেই যা আগাগোড়া বিবিধ আকারসৃষ্টিতে পরিপূর্ণ নয়, সাঁচির যে অত বড়ো বিশাল তোরণদ্বার তারও সমস্তটা কাঠামো খোদাই-করা বড়ো বড়ো প্রস্তর-ফলকের দ্বারা আবৃত, আর এই-সব ফলকও আবার প্রথম থেকে শেষ অবধি সমস্তখানি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্যে খচিত এবং চিহ্নচিত্রিত। শিল্পী যেন শূন্যতার বিভীষিকায় ভীত হয়ে কোনো একটা জায়গায় এসে থেমে যেতে সাহস পাননি, আর এইজন্যে তিনি ক্রমাগত নূতন নূতন আকারসৃষ্টি করে বিশাল পাথরটার প্রতি কোণ প্রতি রন্ধ্র ভরে তুলেছেন, এবং অত বড় যে তোরণ তারও উপরিভাগ যথাসম্ভব মূর্তি প্রতিমূর্তি দিয়ে সজ্জিত করে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

মন্দিরের বেলাতেও দেখতে পাওয়া যায় ঠিক এই ঘটেছে, তাদের দেওয়াল বা বহির্দেশকে অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি এবং রেখাচিত্রে আচ্ছন্ন না করে ছাড়া হয়নি। স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের মধ্যে যা ব্যবধান ছিল সে যেন অপসারিত হয়ে গেল, কোন্‌খানে এসে যে কার আরম্ভ এবং কার শেষ তাও বোঝা শক্ত। শিল্পী যেন বড় বড় বাড়ির কঠিন আড়ষ্ট জড়ত্বের ভাবে কিছুতেই তৃপ্ত হতে না পেরে, সৌধশিল্প এবং শিলা-শিল্পের (ভাস্কর্য) একটা সম্মিলন করবার চেষ্টা করেছেন, যতক্ষণ তাঁর হাতে একটুকুও নির্মাণসামগ্রী অবশিষ্ট থেকেছে তিনি ক্রমাগত কেবল এক রূপের মধ্যে থেকে অন্য রূপের উৎপত্তি করেছেন, এবং এইভাবে জড়জিনিসের মধ্যেও একটা জীবন্ত ভাব, একটা ছন্দোময় প্রাণের চাঞ্চল্য এসে গিয়েছে, কোঠাবাড়ির কাঠিন্য শিল্পের সৌন্দর্যে কমনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। শিবের তাণ্ডব নৃত্যের প্রস্তরমূর্তিতে যেমন, এখানেও তেমনি— শিল্পের দিক থেকে দেখতে গেলে সম্মুখ বা পিছন বলে যেন কোনো জিনিসের অস্তিত্বই নেই, আছে কেবল একটা বাধাহীন গতির বিকাশ, একটা ঘূর্ণমান বেগের প্রবাহ।

ভারতীয় শিল্পের সম্ভবপরতা অসীম। মানুষ এবং প্রকৃতি, আধ্যাত্মিক

জগৎ বা স্থূল জগৎ, স্থাপত্য বা ভাস্কর্য—সকলের মধ্যে যে গূঢ় সম্বন্ধসূত্র, গভীর অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে এই দেশের শিল্পী ছন্দোময় শিল্পরচনার মধ্যে দিয়ে প্রাণপূর্ণ রেখাবিন্যাসের মধ্যে দিয়ে সেইটিকেই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন, এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের স্বাভাবিক প্রাচুর্যের ভাব অথবা গণিতগত জটিলতার অভাব আছে কি না-আছে সেটা ভাববার বিষয় নয়, আসল কথা হচ্ছে এই যে সহজেই তার মধ্যে একটা সত্য উপলব্ধির আন্তরিকতা, একটা ভাবের স্বচ্ছতা, এবং একটা যথার্থ গভীরতা দেখতে পাওয়া যায়। (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৯।)

॥ উইলিয়াম উইনস্টানলি পিয়ার্সন, ১৯১৪-২৩ ॥

এঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল নন্দলালের। ইনি আর এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব সেকালের শান্তিনিকেতনের ছিলেন দুই সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ। ১৯১২ সাল থেকে পিয়ার্সনের শান্তিনিকেতনে আনাগোনা। এর কয়েক বছর আগে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন লণ্ডন মিশনারী কলেজের বটানির অধ্যাপক হয়ে। তিনি ছিলেন আশাবাদী বিপ্লবী। বাঙ্গালা ভাষা আর সাহিত্য তিনি পড়েছিলেন ভালোভাবে। পিয়ার্সন ছিলেন ইংলণ্ডের বনেদী কোয়েকার পরিবারের ছেলে। ভাবুকতা আর নৈতিকতা তাঁর মধ্যে ছিল এক হয়ে। তিনি লণ্ডনে বিজ্ঞান আর কেম্ব্রিজে দর্শন পড়েছিলেন। কলকাতার মিশনারী-সমাজের ভেদনীতি তিনি বরদাস্ত করতে না পেরে, কাজ ছেড়ে দিল্লী চলে যান একজন ধনী-পুত্রের গৃহশিক্ষক হয়ে। সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন আর শিক্ষাদর্শে মুগ্ধ হয়ে বোলপুরে চলে এলেন। শান্ত সাধকচরিত্র পিয়াসন সাহেবের অন্তরে ছিল আধ্যাত্মিক আকুলতা আর গভীর রসানুভূতি। 'জীবনে যত পূজা হল না সারা' —গুরুদেবের এই গানটি ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। কবির মতে, এঁর চিত্তের সঙ্গে চরিত্রের যোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কবি ১৯১৩ সালের অগাস্ট মাসে একখানি পত্র লিখে পিয়ার্সন সাহেবকে 'শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করিয়া' আশ্রমের কাজে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯১৩ সালের ৩০-এ নবেম্বর পিয়ার্সন এ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা

গিয়েছিলেন গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন চাক্ষুষ করবার জন্যে। যেদিন ওঁরা রওনা হন, সেদিনের ছাত্রসভায় তিনি বলেছিলেন,—শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে যে শান্তি আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি তা দক্ষিণ আফ্রিকার কাজে আমাদের সাহায্য করবে। ১৯১৪ সালের চৈত্রমাসে (১৩২০) পিয়ার্সন সাহেব দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে আশ্রমের কাজে স্থায়িভাবে যোগ দিলেন! তিনি দিল্লীতে বেতন পেতেন মাসে চার-শ টাকা। আশ্রমে এলেন মাত্র এক-শ টাকায়। এই বিষয়ে পিয়ার্সন নন্দলালের সমধর্মী।

পিয়ার্সন বা এ্যাণ্ড্রুজ সাহেবদের মতন উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ শান্তিনিকেতন-আশ্রমের কাজে যোগ দেওয়ায় বৃটিশ সরকার বুঝতে পারলেন যে, কবির বিদ্যালয় কোনো উগ্র রাজনীতিচর্চার কেন্দ্র নয় (১৯১৪)। ১৯১৫ সালে যাদব নামে একটি ছাত্র আশ্রমে টাইফয়েডে মারা যায়। পিয়ার্সন তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তার নামে তিনি তাঁর বই Shantiniketan (১৯১৬) উৎসর্গ করেন। সেই সময়ে আশ্রমে ডাক্তার ছিলেন বিনোদবিহারী রায়। পিয়ার্সন ছেলেটিকে বাঁচাবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা, চিকিৎসা ও সেবা করেছিলেন। এই যাদব অসিতকুমারের কাছে ছবি আঁকা শিখতো।

১৯১৫ সালে আশ্রমে কবির বাড়ি 'দেহলী'র সামনে পিয়ার্সন সাহেব একটি নতুন বাড়ি তৈরি করান। আশ্রমের দ্বারপ্রান্তে অবস্থিত বলে বাড়িটির নাম পরে হয় 'দ্বারিক'। পিয়ার্সন এর একতলা করান নিজের খরচে। পরে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ আশ্রম-বিদ্যালয়ের ব্যয়ে এর ওপর দোতলা তৈরি করেছিলেন সে-কথা আমরা আগে বলেছি। এই বাড়িতে কবি ১৯১৯ সালে কিছুকাল বাস করেছিলেন। এই বাড়িতেই কলা-বিভাগের আস্তানা হয়। পরে, এখানে ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা হয়, তারপরে হয় শিক্ষাভবনে ছাত্রাবাস। [বর্তমান লেখক শিক্ষাভবনের ছাত্ররূপে ১৯৩৬-৩৮ পর্যন্ত এই বাড়িতে ছিলেন।] ক্রমশঃ জীর্ণ হয়ে ১৯৫৬ সালে বাড়িটি ভেঙ্গে যায়। পিয়ার্সন সাহেব রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসে একটি বড়ো স্থান জুড়ে ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পিয়ার্সন যে আদর্শবাদ নিয়ে সব-কিছু ছেড়ে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করতে এসেছিলেন, এখানে এসে বাস্তবের

সঙ্গে তার পার্থক্য দেখে মনে গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন। বিশেষ করে আশ্রম-বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের ইংরাজী পড়াবার জন্যে তিনি এখানে আসেননি। কিন্তু আশ্রমে ম্যাট্রিকুলেশন পড়াবার ব্যবস্থা না-করেও ব্যবহারিক দিক থেকে কবির উপায় ছিল না। পিয়ার্স'নের পক্ষে তাঁর অন্তরের আদর্শের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ব্যবহারিক বাস্তবের আপস সম্ভবপর হয়নি।

১৯১৫ সালে পিয়ার্স'ন সাহেব এ্যাণ্ড্রুজের সঙ্গে ফিজি দ্বীপে রওনা হলেন সেপ্টেম্বর মাসে। ১৯১৬ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ জাপান যাত্রা করলেন। সঙ্গে গেলেন পিয়ার্স'ন, এ্যাণ্ড্রুজ আর মুকুল দে। ১৯১৬ সালেব ৭ই মে কবি 'উইলি পিয়ার্স'ন বন্ধুবরেষু'র প্রতি একটি ছোট কবিতা লিখে তাঁর 'বলাকা' কাব্য উৎসর্গ করলেন। এই কবিতাটিতে পিয়ার্স'নের যথার্থ চরিত্রচিত্র ফুটে উঠেছে। ১৫ই মে পিয়ার্স'ন মুকুল দে-কে সঙ্গে নিয়ে সিঙ্গাপুর দেখতে বের হয়েছিলেন।

পিয়ার্স'ন সাহেবের একটি প্রবন্ধে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ পিয়ার্স'ন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে জাপানের ইদজুরা (Idzura) গ্রামে গিয়েছিলেন। এই গ্রামে ওকাকুরার বাড়ি। স্বর্গত ওকাকুরার বিধবা পত্নী আর পুত্র এঁদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান তাঁদের সমুদ্রতীরের বাড়িতে। মহামানব ওকাকুরা তাঁর জাতির ইতিহাস-পরম্পরা আর চিন্তাধারাকে রূপদান করে গিয়েছেন। ইদজুরা সুন্দর পার্বত্য গ্রাম। গভীর আত্মোপলব্ধির উপযুক্ত স্থান। গ্রামটি বেশ বড়ো। রোদে জলে পাকা কৃষককুল আর কেওট হলো এই গ্রামের প্রধান অধিবাসী। ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে গ্রামে যাবার পথ। বাগান-ঘেরা ওকাকুরার বাড়ি। খাড়ির এক দিকে পাহাড়ের ওপর তৈরি। সামনেই সমুদ্র। ছোট্ট বাড়িটিতে ওকাকুরার প্রিয় প্রকোষ্ঠ। খাড়ির পথে সমুদ্রে আনাগোনা করছে জেলে-নৌকা। পাশেই ওকাকুরার সমাধি। ধূপের গন্ধে সান্ধ্য বাতাস ভরপুর। সমাধি-স্তূপের ওপরে পাথর চাপানো হয়নি; সবুজ ঘাসে ঢাকা সে। পাশে ঘেরা ছোট্ট একটি ফুলের বাগান। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ওকাকুরার পুত্রের সামনে অস্ত আলোর বিকেল বেলায় সবুজ সমাধি-স্তূপের পাশে ছোট্ট একটি 'ফার'

গাছের চারা পুঁতেছিলেন তাঁর বন্ধুর স্মৃতিতে। তারপরে তামাটে রঙের কেওট এলো একজন —সমাধির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ওকাকুরার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলে ধূপ জ্বালিয়ে দিয়ে। সেই জেলেটি ছিল ওকাকুরার নিত্যসঙ্গী —তাঁর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবার। সব শেষে পিয়ার্সন সাহেব গান করলেন—

জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।—

'We could feel sure that his work is not lost nor his worship finished'. (To the memory of Mr. K. Okakura by W. W. Pearson, Mod. Rev. 1916. pp. 541-42)।

জাপানে থাকবার সময়ে পল্ রিশার (Paul Richard) নামে একজন ফরাসী ভাবুকের প্রতি ভাবুক পিয়ার্সনের অনুরক্তি জন্মেছিল। তাঁকে তিনি গুরুর মতো মানতে শুরু করলেন তাঁর ভাবুকতায় মুগ্ধ হয়ে। কবি জাপান থেকে আমেরিকা যাবেন স্থির হলো। তখন পিয়ার্সন বললেন, —মুকুল জাপানে থেকে আর্ট শিখবে। কারণ, টাইকান মুকুলের ছবি দেখে খুশি হয়েছিলেন। পিয়ার্সন কবিকে বললেন, —মুকুল যদি দু-বছর জাপানে থাকে তা'হলে ও খুব একজন বিখ্যাত আর্টিস্ট হয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু কবি মুকুলকে একলা জাপানে রেখে যেতে রাজী হলেন না। অবশেষে কবি মুকুলকে এ্যাণ্ড্রুজের সঙ্গে দেশে ফেরৎ না-পাঠিয়ে পৃথিবীটা দেখে নিয়ে 'মানুষ হয়ে উঠবার' আশায় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকা রওনা হলেন। এ্যাণ্ড্রুজ একলা দেশে ফিরলেন। ১৯১৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর কবি পিয়ার্সন ও মুকুল দে-কে নিয়ে আমেরিকা রওনা হলেন। আমেরিকা থেকে কবি, পিয়ার্সন ও মুকুলচন্দ্র ১৯১৭ সালের ২১এ জানুয়ারী জাপান যাত্রা করলেন। জানুয়ারী মাসের শেষে কবি, পিয়ার্সন ও মুকুল দে ফিরতি-পথে জাপান পৌঁছলেন। জাপান থেকে কবি মুকুলচন্দ্রকে নিয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন মার্চ মাসে। কিন্তু পিয়ার্সন জাপানে রইলেন পল্ রিশারের কাছে। জাপানে থাকবার সময়ে পিয়ার্সন 'for India' নামে একটি বই লেখেন। তার ভূমিকা লেখেন পল্ রিশার। বইখানি পরে ভারত-গভর্নমেণ্ট নিষিদ্ধ করে দেন। ১৯১৭ সালের শেষ দিকে

বৃটিশ গভর্নমেন্ট পিয়ার্সনকে সিঙ্গাপুর থেকে বন্দী করে ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে অন্তরীণ করেন।

কলকাতায় ১৯১৮ সালের ১২ই মে কবি সংবাদ পেলেন পিয়ার্সনকে পিকিঙ-এ ইংরেজ পুলিশ বন্দী করে রেখেছে। পিয়ার্সন প্রায় দেড় বছর জাপানে ও চীনে ছিলেন। সেখানে তিনি ভারতের স্বাধীনতাবাদীদের সঙ্গে মিলেছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে আমরা আগেই বলেছি জাপান থেকে প্রকাশিত (১৯১৭ জুলাই) তাঁর বইখানি ভারত-গভর্নমেন্ট বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব বাঙ্গালার লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী গুরলের কাছে পিয়ার্সনের মুক্তির জন্যে বলতে গেলে, পিয়ার্সন যে-সব আপত্তিকর প্রবন্ধ-ট্রবন্ধ জাপানে ও আমেরিকায় বসে লিখেছিলেন তার ফাইল তাঁকে দেখান।

১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনের পিয়ার্সনের একতলা বাড়িটি দোতলা হয়। ১৯২০ সালের ৫ই জুন —তিন বৎসর পরে কবির সঙ্গে পিয়ার্সনের সাক্ষৎ হয় ইংলণ্ডের প্লিমাথ বন্দরে। তিনি ইংলণ্ডে নজরবন্দী ছিলেন যুদ্ধের সময়ে। মুক্তিলাভ করলেন যুদ্ধের শেষে। পিয়ার্সন এই সময়ে কবির সেক্রেটারীরূপে তাঁর কাছেই থেকে যান। সাড়ে চার বৎসর পরে পিয়ার্সন শান্তিনিকেতনে ফিরলেন বিশ্বভারতী-পর্বে ১৯২১ সালের ২৬-এ সেপ্টেম্বর। ১৯২২ সালে গরমের ছুটীতে পিয়ার্সন ও বেনোয়া সাহেব আশ্রম থেকে সিমলা পাহাড়ে গেলেন। সেখানে তিনি অসুস্থ হন। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে কাজে যোগ দিয়ে ছুটি নিয়ে দেশে ফিরে যান তাঁর মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে। পুনরায় শান্তিনিকেতনে আসার কথা ছিল। কিন্তু ১৯২৩ সালের ৩০-এ সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনে সংবাদ এলো, পিয়ার্সন সাহেব ভারতে ফেরবার পথে ইটালীতে ২৪-এ সেপ্টেম্বর মারা গিয়েছেন ট্রেন-দুর্ঘটনায়। ভারতে ফিরবার সময়ে য়ুরোপের কতকগুলি ইস্কুল তিনি ভালো করে দেখে আসছিলেন। ইটালী ভ্রমণ করবার সময়ে পিস্তোইয়া (Pistsia বা Pistola) নামে স্টেশনের কাছে ট্রেনের কামরার হঠাৎ দরজা খুলে যাওয়ায় তিনি নিচে পড়ে যান ও মারা যান।

পিয়ার্সন সম্পর্কে নন্দলাল বলেন,—'১৯১৪ সালে যখন গুরুদেব

আমাকে প্রথম শান্তিনিকেতনে ডাকেন তখন পিয়ার্সন ছিলেন এখানে। আমার সংবর্ধনায় তাঁরও উৎসাহ ছিল খুব। তখনই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তিনি আশ্রমে পূর্ব-বিভাগের ছাত্রদের ইংরেজী পড়াতেন। তা-ছাড়া ছাত্রদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করতেন। তখন যত সব দুষ্ট ছেলের পাল ছিল আশ্রমে। বিশেষ করে যাদের বাগ মানাতে পারা যেতো না, তারা ভালোবাসতো পিয়ার্সন সাহেবকে। তাদেরও দেখাশুনা করতেন পিয়ার্সন। ক্ষমা করতেন তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি। সহ্য করতেন আবদার অভিযোগ। এক কথায় পিয়ার্সন সাহেব ছাত্রদের সত্যি করে ভালোবাসতেন।

'আশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকদের আর্থিক সাহায্য দান করতেন পিয়ার্সন। তা-ছাড়া তিনি শান্তিনিকেতনের আশ-পাশের সাধারণ গরীব দুঃখীদের সাহায্য করবার জন্যে যথাসাধ্য করতেন মিশনারীদের মতন। পিয়ার্সন সাহেব আশ্রমের আশ-পাশের গাঁয়ে সাঁওতালদের নিয়ে তাঁর সেবার কাজ আরম্ভ করে দিলেন। তিনি নিজে যেতেন তাদের গাঁয়ে, শেখাতেন তিনি নিজে, আর ক্লাস নিতেন নিয়মিত। সাঁওতালদের গাঁয়ে ইস্কুল স্টার্ট্ করলেন তিনি। পিয়ার্সনের সে-ইস্কুল এখনও (১৯৫৫) চলছে। আশ্রমের কলেজের ছেলেমেয়েরা গিয়ে ক্লাস নিতো তখন পিয়ার্সনের ইস্কুলে। এখন (১৯৫৫) কমিউনিটি প্রোজেক্টে সরকার যে শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করবেন বলে কথা হচ্ছে, পিয়ার্সন সাহেব সেকালে সেই পদ্ধতিতেই শিক্ষা দিতেন তাঁর ইস্কুলে।

'পিয়ার্সন মধ্যিখানে কিছুদিন ছিলেন না এখানে। যখন ফিরে এলেন, আমাকে বললেন, —গ্রামের লোকদের যেভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন সে-পদ্ধতি ঠিক হচ্ছে না। শিক্ষা দিতে হবে কাজের সঙ্গে! তা না হলে চাষার ছেলে বাবু হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এ-পদ্ধতি একেবারে ভুল। এর পরিবর্তন দরকার। সাঁওতাল-গ্রামে তিনি নিজের পদ্ধতিতে শেখাতে আরম্ভ করলেন। সাঁওতালদের সঙ্গে খুবই মিশতেন তিনি। ভালোবাসতেন বন্ধুর মতো। সেইজন্যেই তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতি কার্যকর হয়েছিল খুব। এখনকার (১৯৫৫) 'পিয়ার্সন-পল্লী'তে ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র।

'১৯১৬ সালে গুরুদেব প্রথমবার যখন জাপানে গেলেন তাঁর সঙ্গে

গিয়েছিলেন পিয়াস´ন সাহেব। আগেই বলেছি, পিয়াস´ন ছিলেন দুষ্টু ছেলেদের বন্ধু। সেই দলে আমাদের মুকুলচন্দ্র হলেন পাণ্ডা। তার ওপর আবার সেকালের দুষ্টু; কিন্তু পিয়াস´নের অনুগত খুব। ছবিতে মুকুলের হাত ছিল আগে থেকেই। পিয়াস´নও খুব ভালোবাসতেন মুকুলকে। জাপান থেকে গুরুদেব যখন আমেরিকা গেলেন তখন মুকুলকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন পিয়াস´ন। কিন্তু গুরুদেব প্রথমে ওকে নিয়ে যেতে দিতে রাজি হননি। কিন্তু পিয়াস´নের অনুরোধে কবি শেষ পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে গেলেন মুকুলকে।

'এই জাপান-ভ্রমণের সময় থেকেই গুরুদেবের সঙ্গে পিয়াস´নের মতের গরমিল হতে আরম্ভ হলো। সেইজন্যে আশ্রমের প্রতিও তাঁর সহানুভূতি কমে এলো। জাপানে তিনি পল রিশার্ডের অনুরক্ত হলেন। পল রিশার্ড শান্তিনিকেতনেও এসেছিলেন। তাঁর স্ত্রী-ই হলেন পণ্ডিচেরী-আশ্রমের 'মাদার'। পিয়াস´ন বোধ হয় পণ্ডিচেরীতেও গিয়েছিলেন।

'অনেকদিন পর বিলেত থেকে ফিরে এসে পিয়াস´ন শান্তিনিকেতনে বিশেষ কারণে কিছুদিন রইলেন দো-মনা হয়ে। ছিলেন কোনার্কের বাড়িতে। কোনার্ক তখন খড়ের বাড়ি। সেই বাড়িতে পিয়াস´ন তখন থাকতেন আর Naturopathy করতেন। গাই দুইয়ে সেই দুধ খেয়ে থাকতেন সারাদিন। এইভাবে খেয়ে খেয়ে আমাশয় ধরলো কিছুদিন যাবার পরেই। শেষমেশ ছেড়ে দিলেন এ-সব। মন আনমনা হলো —বসলো না এখানে। যাতায়াত করতে লাগলেন প্রবর্তক সঙ্ঘে। —সেই সময়ে একদিন আমাকে বললেন, —কলাভবনে তিনি যে-সব ছবি উপহার দিয়েছেন সেগুলো ফেরৎ চাই। মুরহেড বোনের দামী অনেক এচিং, তাঁর ভগ্নীর মূল্যবান চিত্র-সংগ্রহ, ইটালীয়ান দুর্মূল্য অনেক ছবি পিয়াস´ন আমাদের কলাভবনের জন্যে বাঁধিয়ে এনেছিলেন জাপান থেকে। এক সময়ে সেই ছবিগুলি আ-বাঁধা অবস্থায় আমাকে দিয়েছিলেন কলাভবনে রেখে দিন, বলে। আমি কলাভবনে সেগুলি রেখেছিলুম খুবই যত্ন করে। তালিকাও করা হয়েছিল সে-সব ছবির। কিন্তু মন বিরক্ত হওয়ার দরুন পিয়াস´ন তাঁর নিজের আর তাঁর ভগ্নীর উপহার-দেওয়া সমস্ত ছবি আমার কাছ থেকে ফেরৎ চেয়ে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তখন তাঁর লাইব্রেরীর প্রসঙ্গে মন বিরূপ খুব, তাই উপহৃত

জিনিস ফেরৎ নিলেন। —মুর্‌হেড বোনের লুজ এচিং ছিল দশ পনেরো-খানা। ইটালীয়ান শিল্পী মুরিলোর আঁকা একখানা খুব দুষ্প্রাপ্য ছবি ছিল এর মধ্যে। এই ছবিখানি হলো গেরি মাটির রং দিয়ে আঁকা একটি ড্রয়িং — একজন খৃস্টভক্ত হাঁটু গেড়ে মালা-হাতে জপ-পুজো করছে মেরী মাতার। ছবিখানি আঁকা বার-তেরো থেকে ষোল শতাব্দের মধ্যে। সে-ছবি দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য।

'পিয়ার্স'ন প্রবর্তক-সঙ্ঘে যেতেন। মাঝে মাঝে থাকতেন ওখানে। এই সময়ে আমাকে তিনি মহর্ষির একখানা ছবি চাইলেন। ছিল আমার কাছে, দিলুম বন্ধুলোককে।

'শেষবার শান্তিনিকেতনে এসে পিয়ার্স'ন সাহেব আমার সঙ্গে আমাদের দেশের বাড়ি রাজগঞ্জে গেলেন। ওখানে দেখা-শোনা আর খাওয়া-দাওয়া করা হয়েছিল খুব। ঐ সময়ে আমাকে তিনি দু-খানা জাপানী পেনটিং-এর বই উপহার দিলেন। Old master painter-দের আঁকা ছবি ছিল ওতে। খুবই মূল্যবান বই। তিনি বললেন, —বই দু-খানা আপনাকে দিচ্ছি, আপনি জাপানে যাবেন শুনলাম সেইজন্যে। পড়ে রাখবেন এই বই দু-খানা, অনেক সুবিধে হবে। আমিও তাঁকে একটা একটা আলাদা আলাদা কাগজে ছবি এঁকে, তার নিচে শ্লোক লিখে লিখে উপহার দিলুম। পেয়ে তিনি খুশি হলেন খুব। আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন পরে। তিনি লিখেছিলেন, যে ছবি দিয়েছেন সে খুবই সুন্দর। আবার সেগুলো বন্ধুত্বের দান হিসেবে আরও সুন্দর।

'শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের ইনফ্লুয়েঞ্জার মতন হয়েছিল একবার। সবাই দেখতে যেতো। আমি আর পিয়ার্স'ন যেতুম না। বার থেকে খবর সব জিজ্ঞাসা করে চলে আসতুম। কিন্তু গুরুদেব তা চাইতেন না। পিয়ার্স'ন আর আমি না-যাওয়াতে গুরুদেব খুশি হননি মোটেই। পরে গুরুদেব যখন আমাকে না-যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, আমি বললুম, —আমি তো ডাক্তার নই ; সেইজন্যে ভেতরে আপনাকে বিরক্ত করতে যাইনি। তবে ভেতরে না-গেলেও, খবর রাখতুম সব বার থেকে ; কিছু করার থাকলে করতুম। তবু কিন্তু অভিমান গেল না গুরুদেবের। বরং উল্টোই বুঝলেন।

'পিয়ার্স'ন পণ্ডিচেরীতে গিয়েছিলেন কিনা ঠিক জানি না; তবে, শান্তিনিকেতন থেকে চলে গেলেন। আমরা আগেই বলেছি, তিনি মারা গেলেন ইটালীতে ট্রেন-এ্যাক্সিডেন্টে। মরবার সময়েও নাকি মুখে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন —'শান্তিনিকেতন'।

॥ শশী হেঁস ॥

'পিয়াস'নের সঙ্গে আমাদের মুকুলচন্দ্র যেবারে আমেরিকা যান (১৯১৬) সেই সময়ে শশী হেঁসের খোঁজ পাওয়া গেল। এদিকে বোধ হয় বর্ধমানে বাড়ি ছিল তাঁর। স্কুলমাস্টারি করতেন। ছবিতেও হাত ছিল। মহারাজ মণীন্দ্র নন্দীর টাকায় ইটালী যান তিনি। ওখানে অয়েল-পেন্‌টিং-এ বিশেষজ্ঞ হয়ে আসেন। অনেক পোট্রেট্‌ এঁকেছিলেন শশী হেঁস। তাঁর আঁকা মহর্ষির ছবি আছে উত্তরায়ণে। শশী হেঁসের ছবি দেখে অবনীবাবু অয়েল-পেন্টিং করতেন। ত্রিপুরার রাজবাড়িতে শশীবাবুর আঁকা একখানা পোট্রেট্‌ ছিল। সেটা আমি লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের সময়ে এগজিবিশনের জন্যে আনিয়ে দিয়েছিলুম।

'শশী হেঁসের স্ত্রী ছিলেন ইটালীয়ান মহিলা। এখান থেকে শশীবাবু যান কানাডা। সস্ত্রীক বসবাস করতেন সেখানেই। কিন্তু তিনি অয়েল-পেন্টিং যা শিখেছিলেন, তাতে রোজগার করে কানাডায় তাঁদের খাওয়া-পরা চলতো না। কানাডায় তখন ছিল আলপনার চাহিদা। আলপনা করেই তিনি রুজি-রোজগার করতেন। আমাদের মুকুল যখন প্রথম আমেরিকা যান তখন শশী হেঁসের বাড়িতে গিয়ে তিনি ছিলেন কিছুদিন। শশী হেঁসের কন্যা ছিল বিবাহযোগ্যা। আমাদের মুকুলচন্দ্রের সঙ্গে তার বিবাহ দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

॥ সি. এফ্. এ্যাণ্ড্রুজ, ১৯১৪-৪০ ॥

এ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে নন্দলালের দীর্ঘকাল ধরে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল। গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় ১৯১২ সাল থেকে। গুরুদেব বলেছেন, —তিনি ছিলেন পাদরীর চেয়ে বেশি খৃস্টান। তিনি মানুষকে —তিনি সত্যকে, মঙ্গলকে সকল মানুষের মধ্যে দেখতে আনন্দ বোধ করেন —তা খৃস্টানেরই বিশেষ সম্পত্তি মনে করে ঈর্ষা করেন না।—এই হলেন মহামানব দীনবন্ধু এ্যাণ্ড্রুজ।

গুরুদেবের গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদে এ্যাণ্ড্রুজের কোনও হাত ছিল না। ১৯১২ সালের অগাস্ট মাসে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন —রবীন্দ্র সকাশে এক সন্ধ্যা। এ-টি এদেশে ইংরেজের লেখা প্রথম প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে।

১৯১৩ সালের গোড়াতে (৭ ফাল্গুন ১৩১৯) এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব প্রথম বোলপুর আসেন। ইনি আসবার ক-মাস আগেই দিল্লী থেকে বোলপুরে এসেছিলেন পিয়ার্সন। এ্যাণ্ড্রুজ নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রচার করেছিলেন। কবি তাঁকে শান্তিনিকেতনে সমস্ত শক্তি দিয়ে কাজ করার জন্যে সমস্ত বাধা অপসারিত করে দিয়েছিলেন।

১৯১৩ সালের ৩০-এ নবেম্বর এ্যাণ্ড্রুজ পিয়ার্সনকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে দক্ষিণ-আফ্রিকা রওনা হলেন গান্ধীজির সত্যাগ্রহ-আন্দোলন চাক্ষুষ করবার জন্যে। এ্যাণ্ড্রুজ ফিরে এসে তাঁর সম্প্রদায় ও দিল্লীর সেণ্ট্ স্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগদান করলেন। সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন একটি কবিতা পাঠ করে ৬ বৈশাখ ১৩২১ সালে। এর ছ-দিন পরে কবি সংবর্ধনা করলেন নন্দলালকে আমন্ত্রণ করে এনে, ১৩২১ সালের ১২ই বৈশাখ।

১৯১৪ সালের গরমের বন্ধের পরে এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব এসে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিলেন। এর কিছু আগে পিয়ার্সন এসে গেছেন। মহাত্মাজীর ফিনিক্স বিদ্যালয়ের প্রায় কুড়ি জন ছাত্র আর অধ্যাপক ভারতে এসে প্রথমে হরি-

দ্বার-গুরুকুলে আশ্রয় লাভ করেন। পরে এ্যাণ্ড্রুজের মধ্যস্থতায় ১৯১৪ সালের নবেম্বরের শেষ দিকে তাঁদের শান্তিনিকেতনে আনা হয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে গান্ধীজির প্রবর্তিত স্বকর্মকরণ নীতি ১৯১৫ সালের ১০ই মার্চ থেকে শুরু হয়। তাতে এ্যাণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন ছিলেন অগ্রণী। এঁদের মতো উচ্চশিক্ষিত ইংরাজ আশ্রমের কাজে যোগদান করায় ইংরেজ রাজপুরুষেরা বুঝলেন, কবির বিদ্যালয় কোনোপ্রকার উগ্র-রাজনীতিচর্চার কেন্দ্র নয়। এই সময়ে বাঙ্গালার প্রথম লাট লর্ড কারমাইকেল শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে এলেন। ১৯১৫ সালের ২৭-এ বৈশাখ এ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের কলেরা হলো বর্ধমান-স্টেশনে কাটা-তরমুজ খেয়ে এসে। রবীন্দ্রনাথ সেবা করে সারালেন। অতঃপর এ্যাণ্ড্রুজ কলকাতা গিয়ে একটি নার্সিং হোমে আশ্রয় নিলেন। কবিও কলকাতা গেলেন। ঐ সময়ে কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'বিচিত্রা'-ক্লাবের পত্তন হলো।

এ্যাণ্ড্রুজ কবিকে ভক্তি করতেন যিশুখৃস্টের মতো। উভয়ের মধ্যে অসংখ্য পত্র বিনিময় হয়েছিল নানা প্রসঙ্গে। ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে এ্যাণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন ফিজিদ্বীপে রওনা হলেন।

১৯১৬ সালের ৩রা মে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে জাপানের পথে আমেরিকা রওনা হলেন এ্যাণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন আর মুকুল দে-কে সঙ্গে নিয়ে। জাপানে তিন মাস কাটিয়ে এ্যাণ্ড্রুজ দেশে ফিরলেন। জাপান ও আমেরিকায় ১৯১৬ সালে কবি যে বক্তৃতাগুলি করেছিলেন, তা Personality (May, 1917) আর Nationalism (1917) গ্রন্থদ্বয়ে প্রকাশিত হয়। উভয় গ্রন্থই তিনি উৎসর্গ করেন এ্যাণ্ড্রুজ সাহেবকে।

১৯১৮ সালের চৈত্র মাসে এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব পুনরায় ফিজি থেকে ফিরেছেন —পথে অস্ট্রেলিয়া ঘুরে। এই সময়ে রাজনৈতিক কাজের জন্যে এ্যাণ্ড্রুজের বিদেশ যাওয়া হলো না। ১৯১৮ সালের পূজার ছুটির আগে কবি এক দিন এ্যাণ্ড্রুজ ও রথীন্দ্রনাথকে বললেন, শান্তিনিকেতনে ভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। এখানে জাতীয় আদর্শের চর্চা হবে। প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না। —এ হলো বিশ্বভারতীর আদি পরিকল্পনা।

১৯১৯ সালে এ্যাণ্ড্রুজ কবির দক্ষিণ-ভারতে বক্তৃতা-সফরের প্রোগ্রাম প্রস্তুত করেছিলেন। এই বছর এপ্রিল মাসে তিনি অমৃতসরে গ্রেপ্তার হলেন। বিশ্বভারতীর কাজ আরম্ভ হলে এ্যাণ্ড্রুজ ক্লাস নিতেন। পড়াতেন সমালোচনা সাহিত্য। ম্যাথু আর্নলন্ডের প্রবন্ধাবলীকে কেন্দ্র করে তিনি আলোচনা করতেন ইংরেজী সাহিত্য। পূজার বন্ধের পরে তিনি গান্ধীজির সঙ্গে পাঞ্জাবের কাজ শেষ করে দক্ষিণ-আফ্রিকায় গেলেন।

১৯২০ সালের গরমের ছুটির শুরুতে কবি বোম্বাই গেলেন, সঙ্গে এ্যাণ্ড্রুজ। ১৯২১ সালের মার্চ মাসের দিকে শান্তিনিকেতনে এ্যাণ্ড্রুজ না-থাকলে শিক্ষক ও ছাত্রদের দৈনন্দিন আহার্যবস্তু সংগৃহীত হতো কিনা সন্দেহ। তিনি ঘুরে ঘুরে টাকা আনতেন।

যে শান্তিনিকেতনকে কবি রাজনীতির উত্তেজনা থেকে দূরে রেখেছিলেন, ১৯২০ সালের অগাস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে সেখানে অসহযোগ-আন্দোলন নিয়ে সবাই উত্তেজিত। এ্যাণ্ড্রুজ কবির প্রতিনিধিরূপে আশ্রমে বাস করলেও আশ্রমে এই আন্দোলন সম্পর্কে তাঁরই উৎসাহ ছিল বেশি। ১৯২০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজি এলেন শান্তিনিকেতনে। এবারের আগমন এ্যাণ্ড্রুজের মধ্যস্থতায়। দ্বিজেন্দ্রনাথও এই অসহযোগ-আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন।

১৯২২ সালে কবির পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত ও সিংহল সফরে এ্যাণ্ড্রুজ সঙ্গী ছিলেন। এই সময়ে বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থ-সংগ্রহের ব্যাপারে কৃতিত্ব ছিল এ্যাণ্ড্রুজদের। ১৯২৩ সালে কাঠিয়াবাড় সফরের সঙ্গী ছিলেন এ্যাণ্ড্রুজ। এই সময়ে সংগৃহীত অর্থ থেকে 'কলাভবন' বাড়ি প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯২৬ সালে এ্যাণ্ড্রুজ দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের হয়ে কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ১৯২৮ সালে কবির দক্ষিণভারত সফরে এ্যাণ্ড্রুজ সঙ্গী ছিলেন। ১৯১৯ সালে দেখা যায়, তাঁর জীবনে আধুনিক ভারতের দুই প্রতীক রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী সমভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন। সেইজন্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের ও গান্ধীজির চিন্তাধারা প্রচারে ব্রতী হন। আধুনিক জগতের দুই শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর সরল অনাড়ম্বর কাহিনী শোনানো তাঁর জীবনের ব্রত। মিস মেয়োর Mother India-গ্রন্থের পাল্টা জবাবে এ্যাণ্ড্রুজের উত্তর হয়েছিল পজিটিভ —ভারতের শাশ্বতবাণী —অহিংসা ও বিশ্বমানবতা। তিনি ছিলেন শ্রমদরদী দীনবন্ধু।

১৯২৯ সালে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার বৃটিশ গিয়েনায় ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা পরিদর্শনের জন্যে যান। কবির আমেরিকায় শেষ সফরের ব্যবস্থা করেছিলেন এ্যাণ্ড্রুজ ১৯৩০ সালে। ১৯৩২ সালে ইংলণ্ডের শান্তিকামী কোয়েকার সমাজের পক্ষ থেকে তিন জন সদস্য এ্যাণ্ড্রুজের অনুরোধে ভারত-পরিদর্শনে আসেন। ১৯৩৪ সালে তিনি বহুকাল পরে শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। খৃস্টোৎসবের দিনে তিনি মন্দিরে উপাসনা করলেন।

১৯৩৮ সালে শান্তিনিকেতনে হিন্দীভবন প্রতিষ্ঠা হয়। তার জন্যে এ্যাণ্ড্রুজ ১৯৩৪-'৫ সাল থেকে অর্থ-সংগ্রহের উদ্যোগ করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে খৃস্ট-উৎসবের দিন তিনি মন্দিরে উপাসনা করলেন। এই হলো আশ্রমে তাঁর শেষ ভাষণ। ১৯৪০ সালের ৫ই এপ্রিল কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। কিছুকাল থেকেই তাঁর শরীর খারাপ যাচ্ছিল। ১৭-ই জানুয়ারী কলকাতায় Riordan nursing home-এ তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানেই মৃত্যু হলো।

এ্যাণ্ড্রুজের মৃত্যুর পরে শান্তিনিকেতনে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে আয়োজন চলতে লাগলো। এ-বিষয়ে অগ্রণী হলেন মহাত্মাজী। যে টাকা উঠলো তাতে বিশ্বভারতীতে খৃস্টীয় সংস্কৃতিচর্চার জন্যে 'দীনবন্ধু ভবন' খোলা হয়। এ ছাড়া, শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের মধ্যে Andrews Memorial Hospital-এর ভিত্তিপ্রস্তর মহাত্মাজী প্রোথিত করেন ১৯৪৫ সালে। সে-স্মৃতিমন্দিরে হাসপাতালের কাজ এখন চলছে। খৃস্টধর্মালোচনার ব্যবস্থা হয়েছিল; এখন বন্ধ আছে।

এ্যাণ্ড্রুজ সম্পর্কে নন্দলাল বলেন,

'এ্যাণ্ড্রুজ শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের কাছে থাকতেন। পিয়ার্সনের প্রায় সঙ্গেই আসেন তিনি। পিয়ার্সন আর এ্যাণ্ড্রুজ দু-জনেই ছিলেন গরীবদের পরম বন্ধু। দু-জনেই প্রায় এক রকম; তবে একটু ভিন্ন। পিয়ার্সন ছিলেন দয়ালু আর স্নেহপ্রবণ, মানুষের ওপর দয়াবান। কিন্তু এ্যাণ্ড্রুজের ছিল মানবতাবোধ। দু-জনেই ছিলেন প্রায় এক ধরনের লোক। যখন গুরুদেব আমাকে এখানে প্রথম সংবর্ধনা করেন (১৯১৪) তখন এ্যাণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন উভয়েই ছিলেন উদ্যোগী। ওঁরা এখানে যখন থাকতেন, আমাকে, আমার ছাত্রদের, শিক্ষকদের অনেক সাহায্য করতেন। অসিত যা মাইনে পেতেন, তাতে তাঁর চলতো না। পিয়ার্সন তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন;

বিলাতে যাবার সময়ে তাঁকে অনেক টাকা দিয়েছিলেন।

'যখন কলকাতা থেকে আমি শান্তিনিকেতনে আনাগোনা করি, তখন এ্যাণ্ড্রুজ দেহলীর পাশে ছোট্ট একটা খড়ের ঘরে থাকতেন। গুরুদেব থাকতেন 'দ্বারিকে'। দ্বারিকে কেন ছিলেন, জানি না। বোধহয় অসুস্থ ছিলেন। চায়ের সময়ে এ্যাণ্ড্রুজ গুরুদেবের কাছে যেতেন। গুরুদেব তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করতেন খুব। গুরুদেবের সে-তামাসা বোঝার পরে এ্যাণ্ড্রুজ 'Oh! How good you are বলে আলিঙ্গন করতেন তাঁকে। গুরুদেব সেরে উঠলেন। এ্যাণ্ড্রুজ বরাবরই চায়ের টেবিলে বসতেন গুরুদেবের সঙ্গে।

'আমি যখন সোসাইটিতে যাই, গুরুদেব দুঃখিত হলেন। এখানে যখন শেষবারে পাকাপাকিভাবে এলুম, তখন এসে উঠেছিলুম 'নতুন বাড়ি'তে —সে এ্যাণ্ড্রুজের আস্তানার একই এলাকায়। সোসাইটিতে রিজাইন দিয়ে এখানে ফিরে আসার কথা শুনে এ্যাণ্ড্রুজ আমার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। প্রণাম করতে যান পায়ে হাত দিয়ে। আমি হাঁ, হাঁ করে উঠি। এ্যাণ্ড্রুজ বললেন, —ভারি আনন্দ হচ্ছে আজ আমার, আপনি আশ্রমে ফিরে এসেছেন বলে।

'এ্যাণ্ড্রুজ এখানে ইংরেজী পড়াতেন। গুরুদেবের ছিলেন সেক্রেটারীর মতন। কিন্তু বেশি থাকতে পারতেন না আশ্রমে। দেশ-বিদেশে যেখানে ইংরেজদের অত্যাচার হতো —ভারতের ভেতরে কিংবা বাইরে, তখনই তার ব্যবস্থা করবার জন্যে সবত্র ছুটোছুটি করতেন এ্যাণ্ড্রুজ। ভারতের হিন্দু যারা আফ্রিকাতে গিয়েছিল, তাদের জন্যেও অনেক করেছেন তিনি। এই সব কারণে আশ্রমে থাকতে পারতেন না একটানা।

'সাধারণ গরীবদের সাহায্য করতেন তিনি মিশনারীদের মতন। শান্তিনিকেতনে ভুবনডাঙ্গার বাঁধের ধারে একবার কারা যেন একটা বসন্তরোগী ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। তখন এ্যাণ্ড্রুজ তাকে কম্বলে জড়িয়ে তুলে এনে এখানে হাসপাতালে ভরতি করতে চাইলেন; কিন্তু হলো না। এখানকার হাসপাতালে তখন Segregation ward ছিল না। এ্যাণ্ড্রুজ তাকে শেষে ভরতি করলেন বোলপুর-চিকিৎসা-কেন্দ্রে। ভরতি করেই কি নিশ্চিন্ত! রোজ দেখে আসতেন তাকে হেঁটে বোলপুর গিয়ে। আর প্রত্যহই আশ্রমের চারদিকে ঘুরে ঘুরে খোঁজ-খবর নিয়ে বেড়াতেন। অক্ষয়বাবুর প্রসঙ্গে

এ্যাণ্ড্রুজের সেবার কথা বিশেষ করে বলবো।

'আমাদের কলাভবনের সঙ্গেও এ্যাণ্ড্রুজের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। আমি শুনলুম, —এ্যাণ্ড্রুজের আর্ট সম্পর্কে অনেক জানাশোনা আছে। বিশেষ করে, তিনি নাকি পনেরো-ষোল শতাব্দের য়ুরোপীয় রেনেসাঁ-পেন্‌টিং এর ওপর অথরিটি। একদিন তাঁকে আমি কলাভবনে কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ করলুম। দু-তিনটে বক্তৃতা দিলেন তিনি কলাভবনে —রেনেসাঁ-আর্টের ওপর। বক্তৃতায় যা তিনি তখন বলেছিলেন, তার কিছু আমার এখনও মনে আছে।—

'তিনি বললেন, —রেনেসাঁ যুগে যে ছবি হলো, তার চেয়ে প্রি-র‍্যাফেলাইট্ যুগের ছবি ভালো ছিল। তার কাজ আর আইডিয়া দুই-ই ছিল উৎকৃষ্ট। র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো আর লিওনার্ডো দা-ভিঞ্চি পর্যন্ত ইতালীয় রেনেসাঁর স্বর্ণযুগ। র‍্যাফেলের ম্যাডোনা, মাইকেল এঞ্জেলোর ডেভিড্ আর মোজেসের মূর্তি, দ্য-ভিঞ্চির মোনালিসা জগতের সম্পদ। রেনেসাঁ যুগের রেম্‌ব্রাণ্টের চিত্রের বিষয় ছিল সাধারণ জিনিস; কিন্তু চিত্রগুলি যেন একেবারে জীবন্ত। এঁদের পরে, ছবির টেকনিকে অনেক উন্নতি করলে, কিন্তু আইডিয়া আর ছবির রকমে ক্রমশঃ ডিটিওরেট্ করলে। সে জড়বাদী বা মেটিরিয়ালিস্টিক্ হয়ে গেল।

'গ্রীক্ স্কাল্‌প্‌চারের চেয়ে রোমান্ আর ইজিপ্‌শিয়ান আর্ট ঢের ভালো। গ্রীক্ আর্ট বিশেষ উঁচুস্তরের নয়। ওতে ইমোশন আর রোমাণ্টিসিজ্‌মের পরিমাণই বেশি। —প্রেটি চেহারা-টেহারা এই সব আছে এতে বিশেষ করে। আগে রোমান আর ইজিপ্‌শিয়ান ছবিতে দেবতা আঁকা হতো, মানুষের চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনা করে। আর এরা দেবতাকে মানুষে পরিণত করলে। ডেভিড্ গড়তে গিয়ে উৎকৃষ্ট মানুষের আদর্শ সামনে রাখলে। অর্থাৎ এরা উৎকৃষ্ট মানুষকে দেবতা করলে। গ্রীক্ ভাস্কর্যে চাওয়া হলো পারফেক্ট্ মানুষের চেহারা করতে। কিন্তু রোমান্ বা ইজিপ্‌শিয়ানরা তাদের আইডিয়ালের জন্যে মানুষের চেহারাকে অদল-বদল করতো।—

'ট্রেনে আসতে আসতে বর্ধমান-স্টেশনে কাটা-তরমুজ খেয়ে একবার কলেরা হলো এ্যাণ্ড্রুজের। আমাদের হরিচরণ ডাক্তার চিকিৎসা করলেন। মরণাপন্ন অবস্থা এ্যাণ্ড্রুজের। বললেন তিনি, —ইফ্ লর্ড উইসেস্ টু

টেক্ মি, বেরি মি ইন্ দ্য চার্চইয়ার্ড। বোলপুর যাবার রাস্তায় বাঁ-হাতি চার্চইয়ার্ড আছে। শান্তিনিকেতন থেকে ছেলেরা সেখানে গিয়ে এ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের জন্যে কবরের গর্ত খুঁড়ে ফেললে। কিন্তু এ্যাণ্ড্রুজ সে-যাত্রায় বেঁচে উঠলেন।

'নন্-কো-অপারেশনের সময়ে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ওঁদের সভা বসতো। একদিন জোড়াসাঁকোর ঘরে সভা বসেছে।—এ্যাণ্ড্রুজ, গান্ধীজি আর গুরুদেব —এই তিন জনে মিলে আলোচনা করছেন। গুরুদেবের সন্দেহ ছিল, —নন-কোঅপারেশন ভালো নয়। উপস্থিত কিছু ফল হলেও ভবিষ্যতে ভালো হবে না।—এই সভার ওপর অবনীবাবুর করা ছবি আছে —'ট্রিনিটি'। —গুরুদেব দাড়িতে হাত দিয়ে বসে আছেন চিন্তিতমুখে।

'মহাত্মার নিকটে খুব যাতায়াত করতেন এ্যাণ্ড্রুজ। ব্রিজের মতন ছিলেন তিনি মহাত্মা আর গুরুদেবের মাঝখানে। আর যেখানে যা পেতেন তিনি —ভালো ছবি, বই সব এনে জমা দিতেন শান্তিনিকেতনে। যেখানে যা সংগ্রহ করতেন সব এখানে দিতেন। ভালোবাসার জন্যে সব এনে উপহার দিতেন। বিজয়নগরের রাজার কাছ থেকে এনে তিনি পুরাতন মোগল ছবি আর পুরাতন দিশি ছবির অনেক সংগ্রহ আমাদের কলাভবনে দিয়েছিলেন। প্রথমে দিয়েছিলেন রাখতে। পরে বললেন,—রেখে দিন। সে-সব গচ্ছিত ধন মনে করে, পরে আমি আবার সেগুলো ফেরত দিয়েছিলুম। পঞ্চাশ-ষাটখানা ছবি এনেছিলেন তিনি। আমি তার মধ্যে কিছু রেখে বাকি সব ফেরত দিয়েছি। এখন মনে হয়, ফেরত না দিলেই হতো। তবে সব ছবিরই আমি ফটো তুলিয়ে রেখেছিলুম।

'এলাহাবাদে ছিলেন অধ্যক্ষ সুশীল রুদ্র। তাঁর ওখানে গিয়ে কিছুদিন ছিলেন —এলাহাবাদে। এ্যাণ্ড্রুজ ছিলেন রুদ্রের পরম বন্ধু। ওখান থেকে তিনি আমাদের লিখলেন, —রুদ্র তাঁর পোর্ট্রেট চান, রাখবেন তিনি। 'আমার প্রোট্রেট আঁক না তোমরা'। তখন আমি আর অসিত দু-জনেই আছি এখানে। আঁকলুম দু-জনেই। যেটা তাঁর পছন্দ হয় নেবেন। আমার আঁকাটাই পছন্দ করলেন। টাকা দিলেন পাঁচ-শ। কিন্তু, পোর্ট্রেট্‌টা নিয়ে গেলেন না। আমি তাগিদ দি; দাম দিয়েছেন জিনিস

নিয়ে যান। তিনি বললেন,—ও আর কি হবে। কলাভবনেই রেখে দিন। রাখা আছে এ্যাণ্ড্রুজের সে-পোর্ট্রেট্ শান্তিনিকেতন-কলাভবনে।

'এ্যাণ্ড্রুজ প্রথম জীবনে হতে চেয়েছিলেন একজন আর্টিস্ট। শেষ পর্যন্ত আর্টিস্ট হওয়া তাঁর হলো না। তবে ছবি আঁকতেন তিনি। নমুনা আছে আমাদের কলাভবনে। এ্যাণ্ড্রুজ ছবি এঁকেছেন আমাদের গুরুদেবের—ক্রায়েস্টের মতন করে। ছবিটা আঁকার পরে, প্রথমে তিনি ফিনিশ করতে পারেননি। কি রকম একটা কালো কালো ভাব হয়ে গিয়েছিল। তখন অবনীবাবু করলেন কি, তার পিছন দিকটা ঘষে ঘষে কালো রংটাকে তুলে দিয়ে, রাখলেন কেবল মুখটা। সহসা দেখা গেল কি, সেই মুখের চারদিক বেরে ছড়িয়ে পড়েছে একটা আলোর জ্যোতি। এতেই ছবিটা ফিনিশ হয়ে গেল। সে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ছবি সি. এফ্. এ্যাণ্ড্রুজের আঁকা।

'ভোলা মহেশ্বরের মতো মানুষ ছিলেন এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব। শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতন যখন যেতেন তিনি, হেঁটে যেতেন। চলতেন দ্রুত। হাতে তাঁর ধরা থাকতো কোমরের প্যান্টালুনের খুঁটটা; পাছে খুলে পড়ে যায়।

'গুরুদেবের সঙ্গে এ্যাণ্ড্রুজের শেষের দিকে মতের মিল হতো না। তবে আগেও খিটিমিটি হতো, আবার ভাবও হতো। ভাবের সময়ে সে কোলাকুলি আর চুমো খাওয়া-খাওয়ি সে-সবও দেখেছি।

'রোগশয্যায় দেখতে গেলুম এ্যাণ্ড্রুজ সাহেবকে কলকাতার নার্সিং হোমে। মহাত্মার পরম বন্ধু ছিলেন এ্যাণ্ড্রুজ। মহাত্মা কলকাতায় বিড়লাকে বলে পাঠালেন,—তাঁর যা যা দরকার, টাকা দিয়ে সে সবের ব্যবস্থা করবার জন্যে। বিড়লা নিখুঁত ব্যবস্থা করলেন সব।

'এ্যাণ্ড্রুজ শুয়ে আছেন। আমি গিয়ে প্রণাম করলুম। গুরুদেবকে দেখবার জন্যে পাগল। গুরুদেবের কিন্তু যাওয়া হলো না শেষ পর্যন্ত। মহাত্মা দেখতে গেলেন। মহাত্মাকে বললেন তিনি—মৃত্যু হবে। কিন্তু মরণকে বড়ো ভয় করছে। ডোন্‌ট বি সো কাওয়ার্ড—বলেছিলেন মহাত্মাজী এ্যাণ্ড্রুজকে। ভগবান আছেন। ভয় করছেন কেন। ভীরু হবেন না। মৃত্যুকে ফেস্ করুন বীরের মতন।

'সাহেব ডাক্তার। প্রোস্ট্রেট গ্লাণ্ড অপারেশন করলেন। হেঁৎকা ডাক্তার। সে-অপারেশন সাক্‌সেসফুল হলো না। অপারেশনের পরেই মারা

গেলেন। যাই হোক্, যা হবার হলো। এ্যাণ্ড্রুজ চলে গেলেন। দীনের বন্ধু ছিলেন তিনি। তাই গুরুদেব তাঁর নাম দিয়েছিলেন —'দীনবন্ধু' – সার্থক তাঁর সে নাম।

॥ বিশ্বভারতী-সংবাদ, ১৯২৩-২৪ ॥

১৯২৩ সালে কলাভবন-বাড়ি 'নন্দনে'র পত্তন হলো। শ্রীনিকেতনের পথের ধারে একটি নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে —'প্রান্তিক'। মিস্ গ্রীণের জন্যে এ বাড়ি করেছেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ। শ্রীনিকেতনে নতুন বৃক্ষাবাস বা গাছের মধ্যে বাড়ি হয়েছে। একটি বিশাল বটগাছের ওপর এই নীড়টি নির্মাণ করেছিলেন জাপানী শিল্পী ও বর্ধকী কাসাহারা। এ বাড়ির ছবি এঁকেছেন নন্দলাল। কবি থাকেন শ্রীনিকেতনের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপনের সময়ে এই বাড়িতেই। কবি এই উভয় বাড়িতেই ছিলেন ২৩-এ মাঘ বা ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩। সেই দিন শ্রীনিকেতনে হাট বসানো হয়। ১৯২২, ১৯২৪, ১৯২৫ সালে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও নাটকের ওপর কিছু ছবি আঁকলেন।

১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে কবি গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে। এই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজেও কবি বক্তৃতা দিলেন অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের স্মৃতিসভায়। তিনি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের জ্যেষ্ঠ সহোদর। —ইংরেজী ভাষায় কবিতা-লেখক ও সাহিত্যরসিক। ২৯-এ ফেব্রুয়ারী কবি ভাষণ দিলেন অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটির সভায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সময়ে কবি আরও তিনটি মৌখিক ভাষণ দিলেন। তাঁর শেষ ভাষণটির নাম সৌন্দর্যবোধ বা Aosthetics. এবার কবি আর্টের ওপর জোর দিয়ে বলেছেন। তবে সে Art-এর অর্থ বহুব্যাপক। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূল কথা হলো – লীলা বা খেলা। Life is real, life is earnest কথাটা আপাতদৃষ্টিতে যতই সত্য মনে হোক না কেন, অন্তরের গভীরস্থলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যাবে, সমস্তই একটা বিরাট খেলা, একটা উপহাসের মতনই মনে হয়। —এই লীলাবাদ সম্পূর্ণরূপে হিন্দু-ভারতের দান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দানের

পরেই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। শীঘ্রই চীনযাত্রা করবেন, তার আয়োজনের জন্যে। সঙ্গে যাবেন নন্দলাল।

কিন্তু মাটির মানুষ নন্দলাল আকাশের দিকে যখন দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, নীচটির কথাও তখন তিনি ভোলেন না। তাঁর নানা স্কেচে তার প্রমাণ রয়েছে। দেশের আকাশ দেশের বাতাস তাঁকে ভিতরে ভিতরে ডাক দেয় সর্বক্ষণ। দেশের ঐতিহ্য তাঁর মন জুড়ে আছে। যেখানে বাস করেন তার আশ-পাশ তখনও ভালো করে দেখা হয়নি। ১৯২৩ সালের গরমের বন্ধে ঘুরে এলেন জন্মভূমি মুঙ্গের খড়্গপুর। পুজোর বন্ধে গেলেন বীরভূমের খ্যাতনামা তীর্থস্থান 'বক্রেশ্বর'। ১৯২৩ সালের পৌষ-উৎসবের পরে দেখে এলেন বর্ধমানের 'গড়জঙ্গল'।

॥ বক্রেশ্বর-ভ্রমণ, ১৯২৩ ॥

জুড়িঞা উভয় কর বন্দ দেব মহেশ্বর বক্রমুনি জাহার আহ্বান
কৈলাস ছাড়িঞা শিব উদ্ধার করিতে জীব বীরভূমে হইলা অধিষ্ঠান॥
বীরবংশী মহারাজা করিঞা শিবের পূজা নানাবিধি করে আওজন
পাপহরা নদীতীরে বিরাজিত মহেশ্বরে সেই স্থান দেখিতে বিচক্ষণ॥
সন্ন্যাসী নাগার ঘটা শিরে আবড়িঞা জটা তারা বৈসে শিবের নিকটে
ব্রহ্মচারী দ্বিজগণ করে নানা আওজন পূজা করে পাপহরা তটে॥
শ্বেতগঙ্গা মহাতীর্থ তাহা বা কহিব কত শুন শুন অপূর্ব কাহিনী
একদিগে তপ্তজল আর দিগে সুশীতল হেন বাণী কভু নাহি শুনি॥
প্রবেশ করি অগ্নিকুণ্ডে পাপকর্ম তীর্থ খণ্ডে সেই কুণ্ড দেবের সাক্ষাত
অগ্নির সমান বারি প্রবেশ করিতে নারি চাল্ল দিলে [হয়্যা যায়] ভাত॥
জীওচ কুণ্ডে করিলে স্নান বন্ধ্যা হয় পুত্রবান পুত্র লঞা করে নানা ভোগ
[ফাল্গুন মাসে চতুর্দশী তিথি] অনেক দেশের জাতি আসিঞা করে [পূজা যোগ]॥
কেহু আনে চাল্ল কড়ি কেহু বা গুবাক ছড়ি মানান করয়ে কতজন……

—বীরভূমের এ-হেন বক্রেশ্বর তীর্থ ভিতরে ভিতরে ডাক দিলে ভারতশিল্পী আচার্য নন্দলালকে। ১৯২৩ সালের শারদ অবকাশে গরুর গাড়ি চড়ে বেরিয়ে

পড়লেন শান্তিনিকেতন ছেড়ে। সঙ্গে পুত্র তেরো বছরের বিশ্বরূপ আর ছাত্র দু-একজন। চললেন তিনি বোলপুর থেকে, গেলেন সিউড়ী, সিউড়ী থেকে ঐ গাড়িতে নৈঋত কোণে প্রায় ছ-ক্রোশ দূরে বক্রেশ্বরে। রাস্তা ভালোই বটে। পৌঁছুলেন যখন, তখন রাত হয়ে গেছে। গ্রামে থাকার ইচ্ছা নাই। গ্রাম পার হয়ে রাস্তার ধারে তাঁবু ফেললেন। সঙ্গে খাবার ছিল, খেয়ে নিলেন। ঘুম থেকে সকালে উঠে দেখলেন কি, তাঁবু গাড়া হয়েছে একটা শ্মশানের ওপর। বক্রেশ্বর-তীর্থে পৌঁছেই এক রাত্রি শ্মশানবাস হয়ে গেল।

বীরভূমের বক্রেশ্বর শৈবতীর্থ। প্রাকৃতিক আর দেবকীর্তিময় দৃশ্যাবলীর সমাবেশে এ হলো একটি মনোরম মন্দির-নগর। 'গুহ্য-তীর্থ' বা 'গুপ্তকাশী' —এর পৌরাণিক নাম। বক্রেশ্বর-ক্ষেত্রের পুবে আর উত্তরে নদ 'বক্রেশ্বর'। দক্ষিণে নদী —'পাপহরা'। পাপহরা-তীরের শ্মশান —কাশীর মণিকর্ণিকার মতন —নিত্য শব-সৎকার হয়ে থাকে সেখানে। দূর-দূরান্তর থেকে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে এসে দাহ করা হয়ে থাকে এখানে মুক্তির আশায়। পাপহরার পশ্চিম তীরে ক্ষেত্রস্থানের পূর্বাংশে লতাগুল্মপরিবৃত একটি বনভূমি। বনের পশ্চিম দিকে ৩২০-টি শিবালয়-পরিবেষ্টিত বক্রেশ্বরদেবের উন্নত মন্দির গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণুপদ-মন্দিরের মতন। মন্দিরের দক্ষিণে সারি সারি যোগকুণ্ড —আটটি। এই সব কুণ্ড থেকে গরম জল বুদবুদের আকারে অবিরত প্রসৃত হয়ে মিশছে গিয়ে পাপহরার সঙ্গে। মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি জলকুণ্ড —নাম শ্বেতগঙ্গা। এ-ছাড়া, আর একটি যোগকুণ্ড রয়েছে —নাম জীবৎ কুণ্ড। এর জল ঠাণ্ডা। মন্দির নাই এমন শিবলিঙ্গও রয়েছে এখানে অনেক।

শ্বেতগঙ্গা-কুণ্ডের ঈশান কোণে প্রকাণ্ড একটা বটবৃক্ষ। তার চারদিকে ভাঙ্গা পুরানো পাথরের মূর্তি অনেক। শ্বেতগঙ্গার সঙ্গে বর্ধমান মঙ্গলকোটের রাজা 'শ্বেত'র নাম জড়িয়ে আছে। নতুন প্রতিষ্ঠা-করা শিব আর কালী-মন্দিরে ঠাকুরের নিত্যসেবা হয়। আর অতিথি-সেবারও ব্যবস্থা রয়েছে। বক্রেশ্বরে মেলা বসে শিব-চতুর্দশীর সময়ে। প্রবাদ হলো, অষ্টাবক্রমুনি সিদ্ধি-লাভ করেছিলেন এখানে। তাঁরই নামে মহাদেবের বরে এই ক্ষেত্র সিদ্ধপীঠ। অষ্টাবক্রের সিদ্ধিস্থানে একটি সুবৃহৎ মন্দির, মন্দিরটি বিশ্বকর্মার নির্মাণ বলে লোকের বিশ্বাস। মন্দিরের মধ্যে পাথরের বড়ো লিঙ্গ-মূর্তিটি হলো

অষ্টাবক্রের। আর ছোটটি হচ্ছে বক্রনাথের। মন্দিরে শিলালিপি রয়েছে। তা থেকে জানা যায়, এটি ১৬০৫ শালিবাহন শকে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তৈরি করে দিয়েছিলেন রাজা আসদ জমান খাঁ-এর মন্ত্রী দর্পনারায়ণ। আরো শিলালেখে আরও নাম আছে। এ-সব হলো পরবর্তিকালে মূল পুরাতন মন্দির-সংস্কারের তারিখ। তিন আকারের তিনটি পুরাতন পুকুর রয়েছে —'সাত কোটালী', 'চন্দ্র সায়ের' আর 'ডমু সায়ের'। এর নামগুলি শুনে এই স্থানের বৈদিক, নাথ, তান্ত্রিক আর শামা বৃক্ষ সাধনার ঐতিহ্যের কথাই মনে আসে।

বক্রেশ্বরের কুণ্ডগুলির নাম রয়েছেঃ (১) ক্ষারকুণ্ড (২) ভৈরবকুণ্ড (৩) অগ্নিকুণ্ড (৪) সৌভাগ্যকুণ্ড (৫) জীবৎ-কুণ্ড (৬) ব্রহ্মকুণ্ড (৭) শ্বেতগঙ্গা আর (৮) বৈতরণী। এ-ছাড়া রয়েছে সূর্যকুণ্ড। —এই আটটি কুণ্ডের সঙ্গে এদের মহিমাসূচক কাহিনীও জড়িয়ে আছে অনেক। সাপ আর ব্যাং কুণ্ডের গরম জলে এক সঙ্গে মরে থাকে। স্নান করতে গেলে নামতে হয় এদের ঠেলে। তালপাতার পুঁথিতে কুণ্ডের মাহাত্ম্য লেখা আছে এখানে।

মানগিার গোসাই-এর সমাধি। এই সমাধির মাটী খেলে আর পেটে মাখলে শূল বেদনা ভালো হয়। এর সমাধি-মন্দিরটি শ্বেতগঙ্গার উত্তর-তট-সংলগ্ন, তটের বাঁধা-ঘাটের বাঁ-দিকে অক্ষয়-বটবৃক্ষের কাছে।

গুহা। ধ্রুব গিরি নামে এক যোগী সাধনা করতেন এখানে। এ গুহা তাঁরই। [আমরা বিশ্বভারতীর পুঁথি থেকে প্রথমে বক্রনাথের যে বন্দনাটি তুলে দিয়েছি তার লেখক হলেন প্রায় দু-শ বছর আগের এক সন্ন্যাসী কৃষ্ণ গিরি। ইনি ধ্রুব গিরির পরম্পরায় তাঁর শিষ্য হওয়া অসম্ভব নয়।] এ-ছাড়া, এখানে ভৈরবের বেদী রয়েছে —একটি অতি প্রাচীন আর প্রকাণ্ড শিমুল গাছের তলায়।

বক্রেশ্বরে সতীর ভ্রূ-মধ্যের স্থান —মন পড়েছিল। সেই কারণেও এই পুণ্যভূমি মহাপীঠরূপে পুজো পেয়ে আসছে। এখানে দেবী মহিষমর্দিনী আর মহাদেবের ভৈরব হলেন 'বক্রেশ্বর'। সেইজন্যেই এই পীঠের এই নাম। বীরভূমে রয়েছে তিন 'বক্রেশ্বর'। এ-ই হলো সবচেয়ে পুরানো। দ্বিতীয়টি রয়েছে দুবরাজপুরের কাছে দেগঙ্গা গ্রামের পাশের জঙ্গলে। সেখানে কুণ্ড থেকে ওঠে শীতল জল। আর একটি বক্রেশ্বর' রয়েছে রাজনগর থেকে

কিছু দূরে। সেখানেও গরম জলের ঝর্ণা আর শিবমন্দির আছে। —এই সব দেখে মনে হয়, বীরভূমের গরম জলের ঝর্ণাগুলোই যেন বক্রেশ্বরের মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে। যাই হোক, বক্রেশ্বরের কাহিনী শেষ হলো। গরম জলের ঝর্ণায় স্নান সেরেও আরাম হলো; কিন্তু মনে একটা ভাবনা চলতে লাগল ভারতশিল্পী নন্দলালের। বিশ্বপ্রকৃতিতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মনোহর, যা কিছু একটু বিশেষত্বময় তাতেই ঈশ্বরের বিভূতির বিকাশ কিছু বেশি পরিমাণে বর্তমান —এ-কথা হিন্দু-মনে বদ্ধমূল। তাই সেই চিরসুন্দর, চিরানন্দের দ্যোতনা নিয়ে ভারতবর্ষের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। নদ-নদী-কান্তার-ব্যবধান-বহুল ভারতবর্ষ এই তীর্থ-মালায় একতার বাঁধনে বাঁধা পড়েছে। এ-দেশের লোক স্বর্গাদপি গরীয়সী বলে দেশমাতৃকার চরণে মাথা নত করেছে। ভারতশিল্পী নন্দলাল ১৯২৩ সালের শারদ অবকাশে এই তীর্থ-ভ্রমণ সেরে নিলেন —মাথা নত করে।

॥ রাজনগর-ভ্রমণ, ১৯২৩ ॥

বক্রেশ্বর থেকে কাছেই, এই সংবাদ পেয়ে নন্দলাল দলবল নিয়ে গেলেন উত্তর-পশ্চিম কোণে ক্রোশ তিন দূরে —রাজনগর। রাজনগরে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। তাঁবু ফেললেন একটি ভাঙ্গা মসজিদের পাশে। রান্না-বাড়ার হাঙ্গামা না-করে সঙ্গে যে খাবার ছিল খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেন কারখানার পরিবেশে। হঠাৎ মাঝরাতে একজন পলাতক রাজবন্দী এসে দেখা করলে। সহসা কোথা থেকে এল সে, মনে নাই। সকালে ঘুম থেকে উঠে শোনা গেল, মসজিদে কারা যেন একটা কুকুর-ছানা ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। ফলে, মসজিদ অপবিত্র হয়ে গেছে সেই থেকে।

সামনেই বিশাল দীঘি —'কালীদহ'। তার কালো জলে একপাল হাঁস ভাসছে —খুব চমৎকার লাগলো দেখতে। মুসলমান রাজাদের বংশধর দু-একজনের সঙ্গে আলাপ হলো। বিশেষ সসেমিরে অবস্থা তখন তাঁদের। রাজনগরে কালীদহের তিন পাড় জুড়ে বা অন্যত্র যা যা দেখবার সব দেখতে লাগলেন ঘুরে ঘুরে —সবই বিশাল সৌধের ধ্বংসাবশেষ, আর বড়ো বড়ো মজা পুকুর।

ফারসী বয়েৎ লেখা বাটি একটি আনা হলো ওখান থেকে ডি. এম্‌-এর মাধ্যমে। দু-টো পাথর আনার ইচ্ছে ছিল রাজনগর থেকে। কিন্তু সে আর হয়নি।

'বীর' কথাটা অস্ট্রিক, আসলে হলো জাতিবাচক। এখনও বীরভূম জেলায় 'বীরবংশী'দের অস্তিত্ব রয়েছে। সরকারী রেকর্ডে এদের ধরা হয়েছে 'রাজবংশী' বলে। সেটা নিছক ভুল। আসলে এরা হলো আদিবাসী 'বীর-হর' অর্থাৎ কূর্মলাঞ্ছন বীরজাতি। এদেরই ভূমি —বীরভূম। এই কোলগোষ্ঠীর 'প্রধান' বা রাজার রাজধানী ছিল এই রাজনগরে। শাখাভেদে সেই রাজা বা প্রধানগণ জাতিতে 'নাগবংশী' হতে পারেন। সেই নাগবংশী-অধ্যুষিত বলে এই রাজনগরের আদি নাম 'নাগর' বা 'নগর' শব্দটি এসে থাকবে। 'নাগর' নামে দাক্ষিণাত্যেও একটি তীর্থস্থান আছে কাবেরী নদীর তীরে —শ্রীচৈতন্যদেব সেখানে গিয়েছিলেন। বীরভূমের এই 'নাগরে' সুপ্রাচীন বিশাল এই 'কালীদহ' —প্রতিষ্ঠা সেই নাগবংশী-প্রধানদেরই কীর্তি বলে মনে হয়। এই 'নাগরে'র ধারে-কাছেই ছিল বীরবংশী-প্রধানদের-বসবাস —বীরপুর বা বীরসিংহপুরে। লোকে বলে, কালীদহের দেবী 'কালী' মুসলমানদের দৌরাত্ম্যে বীরসিংহপুরে ভেসে গিয়ে পৌঁচেছিলেন। ইতিহাসে রয়েছে, ১২৬৪ খৃষ্টাব্দে বীরভূমের পশ্চিমদিকের সাঁওতালেরা এই রাজধানী 'নাগর' বা 'নগর' লুণ্ঠন করেছিল। অর্থাৎ উটকো সাঁওতালেরা এসে জ্ঞাতি নাগবংশীদের হঠিয়েছিল। কিন্তু অধিবাসীদের হঠিয়েছিলেন সেনরাজারা। আবার সব দলই হঠে যায় দুর্ধর্ষ পাঠান-আক্রমণে। হিন্দু নাগ-বীর রাজাদের হঠিয়ে দিয়ে প্রায় সাত-শ বছর আগে বখতিয়ার খিলজির সেনাপতি মহম্মদ শেরাণ এই স্থান সেনরাজাদের অধিকার থেকে দখল করেন। বিজেতা পাঠান-ফৌজদারদের জায়গীর দান করে কাজ দেওয়া হলো, প্রতিবেশী আদিবাসীদের হাত থেকে রাঢ়দেশের সীমান্ত রক্ষা করার। মুসলমান ঐতিহাসিকরা 'নাগরে'র, অন্য নাম শুনেছিলেন 'লাখনোর'। সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের একটা আস্তানা ছিল এখানে।

রাজনগরের 'কালীদহের' মধ্যিখানে একটি বিরাম-নিকেতনের জঙ্গলাকীর্ণ ভগ্নস্তূপ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ওড়িষ্যায় এই রকম জলাশয়ে বিরাম-মন্দির আছে অনেক। তাঁরা মনে করেন, তেরো শতাব্দে কোনো কলিঙ্গরাজ এই আরাম-নিকেতনটি তৈরি করিয়েছিলেন পাঠানদের হাত

থেকে রাজনগর-বিজয়ের স্মৃতিচিহ্নরূপে। কিন্তু, এ-কথার কোনো প্রমাণ নাই।

রাজনগরের মাঠের জঙ্গলে এখন ইট-পাটকেল দেখিয়ে লোকেরা বললে, সেখানেই নাকি বীরভূমের আদি বীররাজাদের রাজপ্রাসাদ ছিল। রামপালের সামন্তরাজা 'কোটাটবীর বীরগুণ' এদিককারেরই লোক ছিলেন। এখনও 'কোটা', 'অটবী', 'বীর' 'গুণ' সবই রয়েছে অজয়ের এপারে বীরভূম থেকে ওপারে বর্ধমানের 'ভালকি'-'কোটা' পর্যন্ত। শুধু খোঁজা হয়নি ঠিকমতো। বিদেশী মুসলমান-আক্রমণের সময়ে রাঢ়ের সামন্তরাজারা সবাই হীনবল হয়ে ছড়িয়ে পড়েন। এর আলোচনা অনাবশ্যক। মুসলমানদের ঘাঁটি সেকালের 'লক্ষ্ণৌর' হলো আরো-আগের এই 'নাগর', 'নগর' বা 'রাজনগর'। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা আর রাজনগরের বীর-নাগ রাজারা ছিলেন রাঢ়ের স্বাধীন সামন্তরাজাদের দুই স্তম্ভ-স্বরূপ। পরে, নাগরের পাঠান ফৌজদারেরা বীরভূমের এই স্থান পূরণ করে। তাঁদের ইতিহাস রয়েছে ১৫৩৮ সাল থেকে।

রাজনগরে এখন রয়েছে ভগ্নাবশিষ্ট বারদ্বারী রাজপ্রাসাদ, মন্দির, আর এঁদো 'কালীদহ'। আর রয়েছে মাটি-কাঠ-পাথরের ভাঙা নগর-তোরণ, যা ঘাটোয়াল-রক্ষিত 'ঘাট', ফুলবাগানে কবরখানা; ভাঙা ইমামবাড়া রয়েছে, আর আছে অপূর্ব টেরাকোটা-কাজের ভাঙা দ্বাদশ গম্বুজের মতিচুর মসজিদ, —কষ্টিপাথরের ফলকে আশ্চর্য কারুকার্য। আছে নাগরের হিন্দু বীর-নাগ রাজাদের পতিত নহবতখানা। কিন্তু, সে নহবতখানা থেকে সানাইয়ের সুর আজ আর শোনা গেল না।

॥ গড়জঙ্গল-ভ্রমণ, ১৯২৩ ॥

শান্তিনিকেতনে পৌষ-মেলার পরে, ২৯-১২-১৯২৩ তারিখে আচার্য নন্দলাল 'গড়জঙ্গল' রওনা হলেন —লাউসেন —ইছাইগড় দেখে আসবার জন্যে। এবারে সঙ্গে গেলেন পুত্রকন্যাদের নিয়ে নন্দলালের সহধর্মিণী শ্রীমতী সুধীরা দেবী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর, ছাত্র শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ, মাসোজী, চিত্রা, হরিহরণ আর অধ্যাপক শ্রীহরিদাস মিত্র। শান্তিনিকেতন থেকে রওনা হয়ে

গরুর গাড়িতে ওঁরা ইলামবাজার পৌঁছুলেন। ডাকবাঙ্গলোর মাঠে তাঁবু গাড়া হলো। একরাত্রি কাটলো ওখানে। ইলামবাজারের হাটতলার মন্দিরে অদ্ভুত সব টেরাকোটা দেখলেন। ইলামবাজার থেকে অজয়ের দক্ষিণে বর্ধমান জেলার বনকাটি গেলেন। ওখানেও মন্দিরের টেরাকোটা, পুরানো ভাঙ্গা সব বড়ো বড়ো বাড়ি দেখলেন, আর দেখলেন পিতলের পুরাতন রথ। রথের ভাস্কর্য থেকে অনেক রাবিং নিয়ে নিলেন। পরে ১৯৩৩ সালে বনকাটী গিয়েও অনেক রাবিং এনেছিলেন। সে পরে বলা হবে। বনকাটি-অযোধ্যায় তখন ছিল অনেক তাঁতির বাস। মন্দিরে মন্দিরে টেরাকোটাও ছিল অনেক।

এ সব দেখে, পরের দিন ওঁরা অজয়ের দক্ষিণ তীর ধরে সোজা পশ্চিমমুখে ছ মাইল হেঁটে বর্ধমানরাজের শেষ-সেনানিবাস গড়জঙ্গল দেখতে গেলেন। গিয়ে পৌঁছুলেন বৈকাল নাগাদ। কাছের একটি গ্রামে গিয়ে একজনের বাড়ির এঁদো খিড়কি পুকুরের ধারে দাওয়ায় আশ্রয় নিলেন। রান্না-বান্নার অসুবিধে। রাত কাটানো হলো। সকালে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে সবাই জঙ্গলের পথে হাঁটতে লাগলেন। গড়-বেড়ে খুব চওড়া মজা জল-পরিখা আর ঝামাপাথরের প্রশস্ত ভাঙ্গা প্রাচীর আছে, বাঁশ-গড় রয়েছে, তিনটি তোরণ অতি ভাঙ্গা অবস্থায় —decoration-এ ভরতি ছিল, দেখলেন। ইছাইঘোষের দেউল দেখলেন —বিরাট উঁচু মনুমেন্টের মতন। দেউলে ইঁটের কাজ অপূর্ব। দরজার ওপরে ফুল আর নৃত্যভঙ্গিমায় নানা মূর্তি রয়েছে। সুরেন্দ্রনাথের ছিল একটি কল্যাপসিব্‌ল টেলিস্কোপ। দেউল দেখার কাজে লাগলো সেটি ভালোরকম। বর্ধমানের গোপভূমের এই গড়জঙ্গল। গড়ের উল্টো দিকে বীরভূমের কেঁদুলি, মাঝে নদী অজয়। হরিদাস মিত্রমশায় ইছাই ঘোষের দেউলের সঙ্গে তুলনা করে উড়িষ্যার মন্দির সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলাদেশের পাল যুগ, সেন যুগ, লক্ষ্মণ সেন, জয়দেব-টয়দেবও এসে গেল। এই আলোচনা আপাততঃ আমাদের অনাবশ্যক। কিন্তু, আদি ঢেকুর গড়ের বা এই গড়জঙ্গলের মূল কাহিনী বাঙ্গালার এপিক কাব্য ধর্মমঙ্গলের অন্য কাহিনীর মালাগাঁথার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। এবং আচার্য নন্দলাল কালে কালে গোটা ধর্মমঙ্গলখানিই চিত্রভূষিত করেছেন।

'জঙ্গলমহল' অঞ্চলের এই গড় অতি প্রাচীন। কালে কালে নানা নামে এর পরিচয় রয়েছে —'ঢেকুরগড', 'শামারূপার গড়', 'শ্রীহট্টী গড়', 'ইছাইগড়', 'লাউসেন গড', 'ত্রিষষ্টি' বা 'তিহট্ট' বা 'ডিহট্টের গড়', 'গড় কিল্লা', 'গড সেনপাহাড়ী' বা 'লালগড'। আর সব মিলিয়ে 'গড়জঙ্গল'। এই সব নামের মধ্যে গডকিল্লার আগে পর্যন্ত নামগুলি ধর্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষের নামের সঙ্গে জুড়ে আছে। সম্ভবতঃ পালযুগে এ-গড়ে সামন্ত রাজা শামঘোষের ছেলে ইছাই ঘোষ ছিলেন কুলদেবী শামারূপার অনুগৃহীত ও অজেয় বীর। গৌড়েশ্বর —মহীপাল কিংবা ধর্মপালের সামন্ত রাজা ছিলেন দক্ষিণরাঢ়ের ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেন। তাঁর পুত্রগণ মধ্যরাঢ়ের ঢেকুরগড়ের বিদ্রোহী সামন্ত ইছাই ঘোষকে দমন করতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন। কর্ণসেন ছিলেন গৌড়েশ্বরের বন্ধু। গৌড়েশ্বর পত্নীপুত্রহীন উদাসী বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে নিজের কিশোরী শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহ দিলেন। ধর্মঠাকুরের বরে রঞ্জাবতীর পুত্র হলো লাউসেন। শালেভরে মৃত্যু বরণ করে রঞ্জাবতীর এই সিদ্ধিলাভ।

ইছাই ঘোষকে দমন করবার জন্যে লাউসেনকে ঢেকুরগড়ে পাঠানো হলো। লাউসেন আর তাঁর সেনাপতি কালু ডোম অজয়ের ধারে এসে উপনীত হলেন। ইছাইঘোষের অজেয় সেনাপতি লোহাটা বজ্জরকে বধ করে কালু ডোম তার কাটামুণ্ড গৌড়দরবারে রাজশ্যালক মহামদের কাছে নিয়ে গেল।

লাউসেন ঘোড়ায় চড়ে অজয় পার হতে গিয়ে নদীর জলে পড়ে গেলেন। অজয়নদ তাঁকে ধরে পাতালে বরুণের কাছে নিয়ে গেলেন। লাউসেনের দলবল আত্মহত্যা করবার জন্যে জলে ঝাঁপ দিতে গেল। তখন ধর্মঠাকুর অজয়ের জল হাঁটুভর করে দিয়ে লাউসেন আর তাঁর অনুচরদের উদ্ধার করলেন। অজয়ের তীরে ঢেকুর গড়ে ইছাই-এর সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধ বাধল। শামারূপা দেবীর বরপুত্র হলেন ইছাই। লাউসেন যতবার ইছাই ঘোষের মাথা কেটে ফেলেন, রাম-রাবণের যুদ্ধের মতো ততবারই দেবীর কৃপায় ইছাই-এর কাটা-মাথা ধড়ে গিয়ে জোড়া লাগে। তখন দেবী শামারূপা ইছাইকে অভয় দিলেন যে, তিনি লাউসেনকে বধ করবেন। কিন্তু দেবীর এই প্রতিজ্ঞা ফলেছিল ধৃতরাষ্ট্রের ভীমসেন বধের

মতন। মায়া লাউসেন তৈরি করা হলো, দেবীর প্রতিজ্ঞা রইল, লাউসেনও মরলেন না। তখন দেবতারা ষড়যন্ত্র করে দেবীকে শিবের কাছে নিয়ে গেলেন; আর এই ফাঁকে লাউসেন ইছাইঘোষের মুণ্ড কেটে ফেললেন। বিষ্ণুর কৃপায় কাটামুণ্ড মুক্তিলাভ করল। সুতরাং দেবী আর ইছাই ঘোষকে পুনর্জীবিত করতে পারলেন না। ইছাইঘোষ মারা গেলেন। লাউসেন ইছাই-এর পিতা বিদ্রোহী শামঘোষকে গৌড়েশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করালেন।

আচার্য নন্দলালের ৩৫ সংখ্যক কড়চাতে দেখছি, তিনি ১৯২৩ সালের ২৯-এ ডিসেম্বর গড়জঙ্গল ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তিনি ছবি এঁকেছেন লাউসেন-গড়ের ইছাইঘোষের দেউলের। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মতন ওড়িষ্যার রেখ-দেউলের অনুরূপ ইছাই-দেউল। লাউসেন-গড়ে শামারূপা দেবীর ভাঙ্গা-মন্দিরের ছবি করা রয়েছে। মন্দিরের মধ্যে ইছাইঘোষের মূর্তি আট-দশ ইঞ্চি উঁচু ছিল মনে করে তিনি স্কেচ্ করেছেন।

নন্দলালের প্রথম পর্যায়ের ২৯ সংখ্যক স্কেচ্‌বুকে নানা জন্তু-জানোয়ারের ছবি করা রয়েছে —ঘোড়া, হাতী এই সবের ছবি, আর তার details —নানা জায়গা থেকে করা। চীনা একটি পুরাতন প্রাগৈতিহাসিক বাঘ-শিকার থেকে করা স্কেচ্ রয়েছে। সেইসঙ্গে তাঁর ডায়েরিতে লাউসেনের বাঘবধ, গণ্ডাবধ ইত্যাদির ছবি রয়েছে ধর্মমঙ্গল থেকে করা।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি হলেন রূপরাম চক্রবর্তী। তাঁর পুঁথি বর্ধমান সাহিত্য-সভা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫১ বঙ্গাব্দে। আচার্য নন্দলাল রূপরামের ধর্মমঙ্গল গ্রন্থখানি চিত্রভূষিত করেন ১৯৪৬ সালে। সে-কথা যথাসময়ে বলা হবে। —রূপরামের পাষণ্ডার চৌপাড়ি থেকে প্রত্যাবর্তন, পথে মায়াবাঘ দেখে কাছাড় খাওয়া, ধর্মঠাকুরের দর্শনলাভ —রেখাচিত্রগুলি কবি রূপরামের জীবন সংক্রান্ত। বাকি, রঞ্জাবতীর শালেভর ছবিখানি ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর অনুসরণে আঁকা। বনকাটির পিতলের রথের পুতুলোর আদলে আচার্য নন্দলালের তুলিতে রঞ্জাবতী রূপ পেয়েছে। ধর্মসেবিকা রঞ্জাবতীর কৃচ্ছ্রসাধ্য শালেভরে মৃত্যুবরণ —আচার্য নন্দলালের অনবদ্য সৃষ্টি।

গৌড়দরবারে গিয়ে লাউসেন যাতে আপন শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁর ঈর্ষাপরায়ণ মাতুল মহামদ ময়নায় আটজন মল্ল পাঠিয়েছিলেন, মল্লযুদ্ধে লাউসেনকে হারিয়ে তাঁর হাত-পা ভেঙ্গে তাঁকে অকর্মণ্য করে দেবার জন্যে। কিন্তু, লাউসেন মল্লদের অনায়াসে পরাস্ত করলেন। এই মল্লবধের চিত্র এঁকেছেন নন্দলাল।

মল্লদের পরাস্ত করে ভাই কর্পূরধবলকে সঙ্গে নিয়ে লাউসেন গৌড় যাত্রা করলেন। পথে জলন্দার বনে কামদল অর্থাৎ কেঁদো বাঘ বধ করলেন। —এই দৃশ্যও নন্দলালের তুলিতে রূপ পেয়েছে।

গৌড়েশ্বর শিমুলের রাজা হরিপালের কন্যা কানড়াকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হলেন। কিন্তু, কন্যাপক্ষ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় গৌড়েশ্বর হরিপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। কানড়া আর তাঁর দাসী ধুমসী দু-জনে ছিলেন দেবীর অনুগৃহীত ভক্ত। দেবী একটি লোহার গণ্ডার দিয়ে বললেন, যে এই লৌহ-গণ্ডারের মাথা একচোটে কাটতে পারবে সেই রাজকন্যাকে বিবাহ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। রাজা বা রাজশ্যালক মহামদ কেউই তা পারলেন না। কিন্তু, লাউসেন কৃতকার্য হয়ে কানড়াকে বিবাহ করলেন। লাউসেনের এই লোহার গণ্ডার-বধ কাহিনীও আচার্য নন্দলালের তুলিকাস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে।

গড়জঙ্গলে সেকালের বাঙ্গালীর বীরগাথার প্রত্নাবশেষ যা যা তখনও ছিল, আচার্য নন্দলাল সে-সব যতদূর সম্ভব ঘুরে ঘুরে দেখলেন, অতিকষ্টে জঙ্গল ঠেলে ঠেলে গিয়ে। শ্যামারূপার এই গড়ের কিছুকাল আগেও প্রভাব প্রতিপত্তি এত বেশি ছিল যে, গড়ের বাজনা শুনে সেকালে দুর্গাপূজায় মহাষ্টমী ও মহানবমী সন্ধিক্ষণের বলিদান সম্পাদন করা হতো। লোকে বলে, সে বাজনা এখনও বাজে। তবে সে শোনাব কান আর আমাদের নাই। যাই হোক, আচার্য নন্দলাল গড়জঙ্গল ভ্রমণ করে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। তিনি অন্তর দিয়ে বুঝে এলেন, পুরুষপরম্পরার প্রাণময় সত্তাতেই আমরা আজও সঞ্জীবিত। জঙ্গল থেকে যথাস্থানে ফিরে এলেন ঐতিহ্য-ভাবনার মুঠি মুঠি স্বর্ণরেণু কুড়িয়ে নিয়ে।

॥ শান্তিনিকেতন-সমাজে ॥

গুরুদেবের বিশ্বভারতীতে নানা লোকের সমাগম। নানা গুণী, জ্ঞানী আনাগোনা করেন, কেউ কেউ কিছুদিন ধরে থেকেও যান তাঁদের আপন আপন ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হয়ে। কর্মরত অবস্থায় তাঁরা আচার্য নন্দলালের সংস্পর্শে আসেন। সামাজিক মানুষ নন্দলালও তাঁদের সঙ্গ কামনা করেন। কলাভবনের ক্লাস নিয়মিত চলছে ; চীন-জাপানে যাবারও আয়োজন হচ্ছে।—

॥ কাসাহারা, ১৯২৪-২৮ ॥

'জাপান থেকে এসেছিলেন এদেশে। আমাদের শ্রীনিকেতনে কৃষিবিভাগে কাজ করতেন তিনি। কার্পেনট্রি আর হর্টিকালচার শেখাতেন। কাসাহারা এলেন কলকাতা থেকে এখানে। শ্রীনিকেতনে ১৯২৪ সালের গোড়ায় গাছের ওপর বাড়ি তৈরি করেছিলেন কাসাহারার নির্দেশে কোনো-সান। গুরুদেব থাকতেন সে-বাড়িতে। আমার ছবি করা আছে সেই বাড়ির।

'কলকাতায় মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের বাড়িতে জাপানী ধরনের বাগান করতেন কাসাহারা। জাপানে বড়ো আর্টিস্ট না-হলে মিনিয়েচার টী-গার্ডেন বা বামন গাছ-টাছ করতে পারে না কেউ। ডক্টর জগদীশ বসু কাসাহারাকে ডেকে এনে তাঁর বাড়ির সামনের বারাণ্ডায় আর ভেতরে গার্ডেন করিয়েছিলেন। কাসাহারা যখন প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের বাড়িতে কাজ করতেন, একদিন ওকাকুরা গেছেন মহারাজা প্রদ্যোৎকুমারের সঙ্গে দেখা করতে। কাসাহারাকে ওখানে কাজ করতে দেখে ওকাকুরা মহারাজাকে বললেন, —আপনি রেস্ হর্সকে দিয়ে মাল বহাচ্ছেন! উনি একজন বড়ো আর্টিস্ট। অবনীবাবু বলে কয়ে কাসাহারাকে প্রথমে নিজের কাছে রাখেন। পরে, তাঁর ওখান থেকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিলেন। এলমহার্স্ট সাহেব তাঁকে ফার্মিং-এ লাগালেন শ্রীনিকেতনে। ওখানে কার্পেন্টারিও করতেন তিনি। থাকতেন শ্রীনিকেতনেই সপরিবারে।

'কাসাহারার বড়ো মেয়ে ইতু সানকে বিবাহ করলেন আমাদের ধীরানন্দ

রায়। ছোট মেয়ে মিতু সানকে আমাদের 'আলু' বিয়ে করবেন বলে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সে মারা গেল টি. বি.-তে। এখন বড়ো মেয়ে বাঙ্গালীর বেহদ্দ হয়েছে; জাপানী বলতে ভুলে গেছে। কাসাহারাকেও টি. বি. ধরেছিল। পরে তিনি এতেই মারা গেলেন শ্রীনিকেতনে। লড়াইয়ের সময়ে কাসাহারাকে নজরবন্দী করে রেখেছিল বৃটিশ সরকার। কাসাহারার মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী স্বেচ্ছায় জাপানে ফিরে গেলেন।

'ছুটির দিনে শিকার করতে যেতেন কাসাহারা। কোপাই নদীতে মাছ ধরতেও বসতেন। শিকার করতেন কোপাই-এর ধারেই। সারাদিন থাকতেন ওখানে মাছ ধরতে বা শিকার করতে গেলে। অবনীবাবুর বাড়িতে কাঠের কাজ করেছিলেন তিনি। তাঁকে কোনো কাজ করতে বললে, আগে ধ্যান করতে বসতেন। কোন কাজ করতে গেলে, বা কেউ কোনো কাজের ফরমাশ করলে কাসাহারা চুপ করে বসে থেকে আগে কাজের ফর্ম সবটা ধ্যান করে নিতেন; কাজের আগাগোড়া চোখের সামনে ভিসুয়েলাইজ করতেন: তারপরে করে দিতেন যেমনটি চাই ঠিক তেমনি। অবনীবাবুকে 'বামন গাছ' তৈরি করে দিয়েছিলেন তিনি। একটি স্বদেশী পাকুর গাছকে জাপানী কায়দায় Dwraf Tree করা হয়েছিল। আমি সোসাইটি ছেড়ে যখন শান্তিনিকেতনে আসি, সে-গাছটি তখন অবনীবাবু আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। সেটিকে আমার সোসাইটি-জীবনের প্রতীক ভেবেছিলেন তিনি। সে-কথা আগে বলেছি।

'মজার কিচেন গার্ডেন করতেন কাসাহারা। একফালি জমিতে সমস্ত ফ্যামিলির আনাজপাতি সেই বাগান থেকে সরবরাহ করা যেত। হর্টিকালচারে গাছপালার তকনিমার ব্যাপারে খুব গভীর জ্ঞান ছিল তাঁর। সীড্‌লিং করে গাছ করতেন। গাছ তোলা-টোলাতেও এক্সপার্ট ছিলেন।

'কাসাহারা ছিলেন একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈনিক। শ্রীনিকেতনে থাকতেন সাঁওতালদের মতন মাথায় গামছা বেঁধে সব সময়েই। এদিকে, পরনে থাকতো কোট আর পা-জামা। শান্তিনিকেতনে এলে আমাকে শ্রদ্ধা আর খাতির করতেন খুব। তিনি মারা গেলেন ১৯২৮ সালের ৩রা জুন।

॥ ভীমরাও শাস্ত্রী, ১৯১৪-২৭ ॥

'এঁর সঙ্গে আমার আলাপ ১৯১৪ সাল থেকে। এখানে তিনি গান শেখাতেন। ওস্তাদী গান। বয়সে বড়ো ছিলেন আমার চেয়ে। বাড়ি ছিল কোলাপুর-বেলগাঁও। জাতে মারাঠী। বেলগাঁও হলো গোয়ার কাছাকাছি। এখানে যখন প্রথম এলেন তখন তিনি অবিবাহিত। বেঁটে-খাটো, মোটা-সোটা আর খুব আমুদে লোক ছিলেন। এখানে প্রথম যখন আসেন, মাথায় প্রকাণ্ড এক টিকি। কিন্তু, শান্তিনিকেতনের আব-হাওয়ায় দেখতে দেখতে ক্রমশঃ সে টিকি তাঁর পাতলা হয়ে হয়ে টিকটিকির লেজ হয়ে গেল। তার পরের ধাপে, ওটিকে আঁচড়ে চুলের ভেতরে গোপন করে রাখতেন। গায়ে থাকতো মেরজাই। বাঙলা বলতে শিখে-ছিলেন ভালো রকম। থাকতেন এখানে, ছাতিমতলার কাছে বটতলার বাড়িতে। বেলগাছ আর পেয়ারা গাছ এখানে অনেক লাগালেন তিনি।

'একবার একটা মজার ঘটনা হলো। উনি ছুটীতে বাড়ি গেছেন। বাড়ি থেকে ফিরতে দেরি হচ্ছে। গৌরবাবুর সঙ্গে শলা এঁটে সর্বাধ্যক্ষকে বলে আমরা একটু মজা করলুম। মিছিমিছি করে মাইনে কেটে নেওয়া হলো। গৌরবাবু সর্বাধ্যক্ষ নোটিশ ইস্যু করে দিলেন। শাস্ত্রী গরুর গাড়ি থেকে তাঁর মোট-ঘাট নামানোমাত্র আমাদের বেয়ারা 'কালো' গিয়ে your service is no longer required নোটিশ সার্ভ করলে। নোটিশ পেয়েই শাস্ত্রী তক্ষুনি অফিসে ছুটলেন মোট-ঘাট ফেলে রেখে। আসামাত্র সঙ্গে সঙ্গে নোটিশ দেওয়া হলো কেন, এই বলে তিনি অভিযোগ করলেন। তখন সর্বাধ্যক্ষমশায় গম্ভীর হয়ে বললেন, —আপনার আসতে দেরি হবে, এ কথা চিঠি দিয়ে আগে জানানো উচিত ছিল। লাইব্রেরীর ওপরতলায় তখন আমাদের কলাভবনের ক্লাস বসতো। আমি ওপর থেকে মস্তে মস্তে ওঁদের এই নাটক অভিনয় দেখলুম।

'শাস্ত্রী বিবাহ করলেন শেষ বয়সে —ওঁদেরই দেশের মেয়ে —ভাগ্নী সম্পর্কে। অল্প বয়স ওঁর স্ত্রীর। বৌদিকে আনলেন শান্তিনিকেতনে।

উঠবেন স্থির হলো দেহলীর পাশে নতুন বাড়িতে। ঐ ব্লকের পশ্চিমের দিকটা ঠিক করা হলো। ঘরটা সবই ওঁকে দেওয়া হলো। নতুন বউ এনেছেন। আমি, অক্ষয়বাবু, সরোজ সবাই মিলে ফুলশয্যার ব্যবস্থা করলুম। শাস্ত্রীর আবার পেট খারাপ হতো ছাতিম ফুলের গন্ধ পেলে। শীতের শেষ। সবে ছাতিম ফুল ফুটেছে। ছাতিম ফুলের উগ্র গন্ধে হাতী মাতাল হয়ে যায়। যাই হোক, আমরা ছাতিম ফুল দিয়ে দিয়ে ওঁদের বিছানা ভরতি করে দিলুম। তারপর রাত্রে বাসরঘরে ঢুকেই ভীমরাও-এর সে কী ভীষণ চীৎকার।

'শাস্ত্রীর স্ত্রী কাপড় পরতেন কাছা দিয়ে —মারাঠী মেয়েরা যেমন করে পরে থাকে। পান খেতেন খুব। বৌদি পান খেতেন বলে, সরোজ পান সেজে সেজে নিয়ে যেতো। তাতে চুন থাকতো না —সে না-থাক্। আবার বৌদি পান সেজে দিতেন ভালো করে। রগড় হতো খুব —এই করে করে। মাঝে মাঝে আমাদের ডেকে ডেকে খাওয়াতেন। বিশেষ করে খাবার তৈরি করতেন দেওয়ালীর সময়ে। ঐ সময়ে আমাদের ডেকে খাওয়াতেন তাঁর হাতের তৈরি খাবার —'এলাচ-দানা'। 'এলাচ-দানা' তৈরি করতেন তিনি আবার রং-টং দিয়ে।

'ভীমরাও শাস্ত্রী খুব গান-টান গাইতেন হোলির সময়ে দিনুবাবুর সঙ্গে। তবলাও বাজাতেন। ভালো গাইয়ে ছিলেন তিনি। বই আছে তাঁর স্বরলিপির ওপর —নাম হলো 'রাগশ্রেণী'। গুরুদেব ভীমরাও হাসুরকার শাস্ত্রীর এই বই-এর ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। বিশ্বভারতী হবার আগে থেকে শান্তিনিকেতনে ইনিই প্রথম মার্গ-সঙ্গীতের শিক্ষক। বহু বছর তিনি আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সংস্কৃতেরও ভালো পণ্ডিত ছিলেন তিনি। শেষে, বেশি মাইনের চাকরী পেয়ে চলে গেলেন বোম্বেতে। সেখানে গিয়ে গানের ইস্কুল করেছিলেন; গানের গৃহশিক্ষকতাও করতেন।

॥ গৌরগোপাল ঘোষ, ১৯২০-৪০ ॥

'চন্দননগরে বাড়ি। প্রাক্তন ছাত্র এখানকার। ডানপিটে ছিলেন খুব। সুধী-রঞ্জনের সমসাময়িক। রথীবাবুদের পরের ব্যাচ। থাকতেন তিনি ডরমিটরিতে ছেলেদের কাছে। বি. এস্. সি. পাশ করেছিলেন। এখানে ছিলেন অঙ্কের টিচার। এখানে আসার আগে থেকেই আমি ওঁকে জানতুম। মোহনবাগানদলের ভালো খেলোয়াড় ছিলেন গৌরবাবু। গোঁফ ছিল একজোড়া বিরাট। খেলতেন জুতো পায়ে দিয়ে। ব্যাকে খেলতেন। তখনকার ইংরেজদের টিমের বিরুদ্ধে খেলতেন। —মোহনবাগান-ফুটবল-টিমের ক্যাপ্টেন হয়েছিলেন একবার।

'আমি ফুটবল-খেলা দেখতে ওস্তাদ। দেশ থেকে আসতুম খেলা দেখতে। স্টিমারে আসতুম সকালে। ইডেন গার্ডেনে বসে চীনে বাদাম খেয়ে দিন কাটাতুম। খেলা দেখে স্টিমারেই ফিরে যেতুম। খুব উৎসাহ দিতুম খেলায়। এখানেও খেলতেন গৌরবাবু বরাবর; আর অঙ্ক শেখাতেন ছেলেদের।

'রথীন্দ্রনাথের পরে শ্রীনিকেতনের সচিব (১৯৩১-৪০) হলেন তিনি। পরে, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার হলেন। বিয়ে হলো মুকুলের বড়ো বোন অন্নপূর্ণার সঙ্গে। উদ্যোগ করলেন প্রতিমা দেবী আর রথীবাবু মিলে। তখন রানীর বিবাহ হয়নি। বর কনের বয়সে তফাৎ হলো অনেক। কনের বয়েস আঠারো কুড়ি, আর বরের চল্লিশ-বিয়াল্লিশ।··· বয়সের ফারাক অনেক। যাইহোক, আমাকে শ্রদ্ধা করতেন; আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলো অন্নপূর্ণা। বললে, —ওঁরা বলছেন: তবু আপনি বলেন তো বিয়ে করবো। আমি বললুম, —ছেলে খুব ভালো, স্বভাব-চরিত্র ভালো, শরীরও ভালো। সুতরাং, আপত্তির কি থাকতে পারে।

'গৌরবাবু আছেন শ্রীনিকেতনে (১৯৩১)। আমরা বরযাত্রী যাবার ব্যবস্থা করলুম। কনের নাম অন্নপূর্ণা। কাজেই গৌরবাবুকে শিব সাজিয়ে শোভাযাত্রা বার করা হলো। আগে আগে চলেছে সাঁওতালের দল

দামামা নাকাড়া বাজাতে বাজাতে —এক দফা। তারপর গ্রামের লোকের দল। তার পিছু আমাদের এখানকার বরযাত্রীর দল। বর বিয়ে করতে চলেছেন —এঁড়ে গরুর বদলে, গরুর গাড়িতে চড়ে। শিবের জন্যে বাঘছাল তো পাওয়া গেল না। বাঘছালের ডিজাইন করে এঁকে দিলুম —কম্বলের ওপরে। গাড়িতে খড় বিছিয়ে গদী করে তার ওপর সেই কম্বল পেতে দিলুম। বর চলেছেন। আতরওয়ালা হলেন আমাদের সুরেন। দু-পাশে মশালের লাইন। শিব চলেছেন বিবাহ করতে। সঙ্গে চলেছে ভূতপ্রেত; সেই ব্যবস্থাও করা হলো। ঘোড়ার নাচ হলো। পায়ে ঘুঙুর পরে সাঁওতাল একজন ঘোড়ার নাচ দেখিয়ে দিলে। স্পষ্ট মনে আছে আমার —ঘোড়া নাচছে। সে আগে আগে ঘোড়ার নাচ নাচতে নাচতে চলেছে। —সমারোহে আনা হলো বরকে ঠিক যেন শিবের বিয়ে।

'উত্তরায়ণে শোভাযাত্রা এলো। রথীবাবু সবদিক থেকে সব ব্যবস্থা করলেন। আশ্রমে আনন্দে তখন ভরপুর জীবন আমাদের। এখন ভদ্রলোক —জেন্টেলম্যান সকলে। এ-সব আমোদ-আহ্লাদে কারোর প্রাণ সারা দেয়না। কাছাকাছি সব গ্রাম, আর শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন তখন সব মিলে আনন্দে আমরা একশা হয়ে যেতুম।

'গৌরবাবুর বিয়ে হলো মুকুলদের বাড়িতে। বিয়ে হলো হিন্দুমতে। পুরুত এলো আদিত্যপুর থেকে। অন্নপূর্ণার মা তাঁর 'বুড়ী'র বিয়ে দিলেন হিন্দুমতে। 'বুড়ী' হলো অন্নপূর্ণার ডাকনাম। আমাদের শিব-দুর্গার বিয়ে হলো। ডানপিটে গৌরবাবু শান্ত হলেন।

গৌরবাবু এলমহার্স্ট সাহেবের অনুরোধে শ্রীনিকেতনে কো-অপরেটিভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার হয়েছিলেন। গুরুদেবের বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন তিনি। ওখানেই মারা গেলেন থ্রম্বসিস হয়ে। ওখানেই তাঁকে দাহ করা হলো পুকুরধারে। মরবার আগেই গৌরবাবু তাঁর সম্পত্তির উইল করে গেছলেন 'বুড়ী'র নামে। গৌরবাবুর নামেই হলো শান্তিনিকেতনের ঐ 'গৌরপ্রাঙ্গণ'।

॥ সুরেন ঠাকুর, ১৯১৯-৪০ ॥

'ভাইপোদের মধ্যে গুরুদেব সুরেনবাবুকে ছেলের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। তাঁর স্ত্রী হলেন সংজ্ঞাদেবী। মহর্ষির ভক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর কন্যা। লাইফ ইন্সিওরের কাজে সুরেনঠাকুরই হলেন এদেশে প্রথম সংগঠক। হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর জনক ছিলেন তিনি।

'হ্যাভেল সাহেব, সিস্টার নিবেদিতা বাঙ্গালার তাঁতশিল্পের সঙ্গে আর্টের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিয়েছিলেন। কারুশিল্প হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ এর উন্নতির চেস্টা করেন। ···জমিদারির কাজকর্ম ছেড়ে তাঁর মন জমি-জমার ফটকা ব্যবসায়ের মধ্যে গিয়েছিল।

'ওকাকুরার বন্ধু ছিলেন তিনি। প্রথম স্বদেশী ওঁর বাড়িতেই হয়। সন্ত্রাসবাদের গোড়াপত্তন করলেন এদেশে ওকাকুরা আর সুরেন ঠাকুররা মিলে। সব যুক্তি পরামর্শ হতো ওঁর ওখানে বসে। ওঁরা চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক —যে কোনো প্রকারে। পি. মিত্র, অরবিন্দ ছিলেন ওঁদের দলে। এঁদের থেকেই পরে মুরারীপুকুরের দল হলো। বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্রের আমদানি হতো। আমাদের দেবব্রতও ছিলেন ঐ দলে। সন্ত্রাসবাদের শিক্ষণপদ্ধতি সম্পর্কেও আলোচনা হতো। গগনবাবুও ছিলেন ঐ দলে। হিসেবের খাতা আর চাঁদার খাতা দেখে পরে সব ধরা পড়ল। টেগার্ট্ সাহেব ছিলেন ওঁদের বাড়ির বন্ধু। তিনি ব্যাপারটা হাশ্-আপ করে দিলেন।

'ওকাকুরা জাপানে ফিরে গিয়ে (১৯০১) এদেশে টাইকান আর হিষিদাকে পাঠিয়ে দিলেন। ওঁরা ছিলেন এসে বালিগঞ্জে সুরেনঠাকুরের বাড়িতে। ওকাকুরাও দু-বার এদেশে এসে তাঁর বাড়িতেই ছিলেন। ওকাকুরা শেষবার এসে (১৯১১) সুরেনঠাকুরের শিল্পপ্রীতি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি নিজে ছবি আঁকতেন না। কিন্তু মস্তো সমঝদার ছিলেন।

'ইংরেজী Visva-Bharati Quarterly-র প্রথম সম্পাদক হলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯২৩)। গুরুদেবের বহু লেখার ইংরেজী অনুবাদ করেছেন তিনি। আমার একটা লেখার অনুবাদ করেছিলেন তিনি Decorative Art-এর সম্পর্কে —Ornamental Art (1940) —এই নাম দিয়ে। সেটি ছাপা হয়েছিল ঐ কোয়ার্টার্লির নিউ সিরিজে। আমি যখন সোসাইটি থেকে রিজাইন দিলুম, উনি আমাকে ডেকে নিয়ে, কলকাতায় বসে মোলায়েম করে সে দরখাস্ত লিখে দিয়েছিলেন।

'ওঁকে দেখেছি এখানে সংসদের মীটিং-এ যখন আসতেন। আশ্রমের সকলের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল খুব। সভায় যখন মতদ্বৈধ হতো, তর্ক-বিতর্কের ঝড় বইত, তিনি তখন উভয়পক্ষের কথা শুনে সমস্যার সমাধান করে দিতেন। এখানে এলে আমার সঙ্গে দেখা করতেন। সুরেনবাবু ছিলেন অর্জুনের মতন 'বীভৎসু' ব্যক্তি। মিষ্টি স্বভাব ছিল তাঁর। সর্বদাই মুখে হাসিটি লেগে আছে। রাগতে দেখিনি কখনও তাঁকে। গুরুদেবের ইচ্ছে ছিল, তাঁর অবর্তমানে আশ্রমের ভার নেন সুরেন ঠাকুর। কিন্তু তিনি নেননি। নিলে বোধহয় কল্যাণ হতো। অবনীবাবুর স্থান এখানে তিনি অধিকার করতেন। চালাতে পারতেন ভালোভাবে। এখানে এসে থাকতেন তিনি 'সুবপুরী'তে। ঐ বাড়িতে আমরা ফ্রেস্কো করেছিলুম। সে-কথা পরে বলবো।

'একদিন আমাদের বসে কথা হচ্ছে। তিনি কথায় কথায় বললেন, আশ্রমের ভবিষ্যৎ রূপ সম্পর্কে। বললেন, —হয়তো শেষ পর্যন্ত কলাভবনই টিকে থাকবে। নৃত্য —সঙ্গীত এই সব শিল্পকলাও চলবে। কারণ, আর্টই হচ্ছে মানবসভ্যতার সংহতিসূত্র। আমার চীন জাপান যাবার ব্যাপারে তাঁরও উৎসাহ ছিল খুব।

॥ চীনে-জাপানে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী আচার্য নন্দলাল, ১৯২৪ ॥

রিপাবলিক চীন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদের বাণী শুনতে উৎসুক। পেকিঙের বক্তৃতা সমিতি বা Lecture Association থেকে বক্তৃতা দেবার জন্যে কবি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে।

এর আগে আমেরিকা থেকে জন্ ডিউই আর বৃটেন থেকে বার্টান্ড রাসেল বক্তৃতা দিয়েছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একদা (১৯৭৭) চীনে গিয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা যাবার পথে হংকং বন্দরে থেমেছিলেন। ১৯২১ সালে সিলভ্যাঁ লেভি শান্তিনিকেতনে চীনা ও তিব্বতী ভাষার চর্চা-কেন্দ্র স্থাপন করেছেন।

১৯২৪ সালে কবির চীন-যাত্রার বাসনা বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ সানন্দে অনুমোদন করলেন। যুগলকিশোর বিড়লা কবির চীনভ্রমণের পরিকল্পনা জানতে পেরে ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতায় কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কবিকে তিনি বলেন, ভারতবর্ষের তরফ থেকে কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর সঙ্গী হলে তিনি তাঁদের খরচ যোগাবেন এবং সেজন্যে তিনি এগারো হাজার টাকা এককালীন দান করলেন। স্থির হলো যে, বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন আর শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু কবির সঙ্গে যাবেন। লর্ড এলম্‌হার্স্ট কবির সেক্রেটারীর কাজ করবেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর কালিদাস নাগকে তাঁদের প্রতিনিধিরূপে কবির সঙ্গে দিলেন। এ-ছাড়া, শ্রীনিকেতনের মহিলা কর্মী মিস্ গ্রীণ্ এঁদের সঙ্গী হলেন।

১৯২৪ সালের ১৮ই মার্চ শান্তিনিকেতন মন্দিরে কবি উপাসনা করলেন। সেদিন সন্ধ্যায় আশ্রমবাসীদের তরফ থেকে বিদায়-সভা হলো। তাতে বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় নিজের লেখা দু-টি সংস্কৃত শ্লোক পড়লেন। একটি কবি ও তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে, অপরটি চীনাদের সম্বোধন করে। উত্তম সুহৃৎ সমভিব্যাহারে বুদ্ধের সদ্ধর্ম-সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে মৈত্রীকে পুনরুজ্জীবিত করবার উদ্দেশ্যে বিশ্ব-মৈত্রীর আবাস বিশ্বভারতীর প্রতীকরূপে রবীন্দ্রনাথের চীনগমন। ১৮৪৬ শকাব্দে ফাল্গুনমাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে এই অভিনন্দন দেওয়া হয়। —শান্তিনিকেতনে অভিনন্দনের পরে কলকাতায় বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর পক্ষ থেকে আলিপুর অব্‌জারভেটরির বাগানে এঁদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করলেন শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। কলকাতা বন্দর থেকে 'ইথিওপিয়া' জাহাজ ছাড়ল ১৯২৪ সালের ২১-এ মার্চ।

কবির সঙ্গে আচার্য নন্দলাল চীনে জাপানে চার মাস ভ্রমণ করে এসেছিলেন। এ-সম্পর্কে বিবরণ যথাসম্ভব তাঁর ভাষাতেই দেওয়া গেল :—

'সূচনা আর কি। কবির যাবার সব ঠিক। পেকিঙের 'লেকচার অ্যাসোসিয়েশন' নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাচ্ছে। কবির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাঁদের। নিয়ে গেল সমাদর করে। এদেশ থেকে ক-জন যাবেন কবির সঙ্গে। আমাকে বললেন, কালিদাস নাগকে আর ক্ষিতিবাবুকে। এলম্‌হার্স্ট হবেন কবির সেক্রেটারী। তিনি গুরুদেবের পার্সন্যাল্ সেক্রেটারী —সব তত্ত্বাবধানের ভার তাঁর ওপর। মিস্ গ্রীণ্‌ও গেলেন আমাদের সঙ্গে। আমেরিকান মহিলা তিনি। শ্রীনিকেতনে ছিলেন তিনি কিছুদিন। এনেছিলেন এলম্‌হার্স্ট। গ্রীণ আমাদের সঙ্গী হলেন কলকাতা থেকে।

'যাবার জন্যে যখন সব ঠিকঠাক হচ্ছে, অবনীবাবু আমাকে নিয়ে গেলেন আশুবাবুর কাছে। এর আগে তাঁকে দেখিনি কখনও, পার্সন্যাল্ পরিচয়ও ছিল না। অবনীবাবু আমার পরিচয় দিলে তিনি বললেন, —'স্বনামধন্য লোক উনি।' অবনীবাবু আশুবাবুর কাছে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তখন একটা স্কলারশিপ বাগাবার চেষ্টায়। 'আগে থাকতে জানালে হতো, অনেক অফিশ্যল হাঙ্গামা' —বললেন আশুবাবু। —'তোমরা আছ, তোমরা দাওনা' —বললেন তিনি মুচকি হেসে অবনীবাবুকে। বেগতিক দেখে অবনীবাবু কানে কানে বললেন আমাকে গম্ভীর হয়ে, —'চল হে, সুবিধে হবেনা।' কবি যাচ্ছেন চীনে লোকের টাকায়, আর আমরা যাচ্ছি বিশ্বভারতীর টাকায়। অবনীবাবু তবু আশুবাবুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, যদি কিছু সংগ্রহ করা যায়।

'রিস্ট্-ওয়াচ, কোডাক ক্যামেরা আর নগদ দেড়হাজার টাকা আমার হাতখরচার জন্যে দিলেন অবনীবাবু নিজের পকেট থেকে। স্বয়ং গুরুদেবও আমাকে টাকা দিয়েছিলেন। জাহাজের এজেন্টের নামে চেক-বই করে দিলেন। —চেক-বই হলো কুক-কোম্পানীর এজেন্টের নামে। —সে-টাকার বেশিরভাগ খরচ করলুম কিসে জানো? —রাবিং কেনায়। চীনে রাবিং কিনে আনলুম অনেক। কলাভবনে রাখা আছে দেড়শো-দু-শো চীনে রাবিং, দেখো। চীনে তখন রিপাবলিক। বাইরে জিনিস যেতে দেবে না পুলিশ, কেড়ে নিতে পারে আর্টিস্টিক জিনিস তো পারেই। আমরা করলুম কি, রাবিংগুলোকে বালিশের খোলে পুরে বালিশ বানিয়ে নিলুম; আর আনলুম ঐ রকম করেই।

'সী-সিকনেস্ হতো আমার আর ক্ষিতিবাবুর। ওডিকলনে রুমাল ভিজিয়ে কপালে পটী দিয়ে সেবা করতো মিস্ গ্রীণ্। ক্ষিতিবাবু চটতেন খুব এই নিয়ে তাঁকে ঠাট্টা করলে। জাহাজেই গ্রীণের বাক্স ভেঙ্গে চুরি হয়ে গেল। গহনার বাক্স। তিব্বতী গহনা ছিল গ্রীণের বাক্সে।— বালা, মাকড়ী—এই সব। সোনার গহনাও ছিল। আর ছিল অস্ট্রিচ্ ফেদার। খুবই মূল্যবান জিনিস সে। চোরাই মালের কতক ছিল ছড়ানো জাহাজের ডেকে। জাহাজে ছিলুম ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে। বাথরুম ব্যবহার করতুম ফার্স্ট ক্লাসেরই; কিন্তু, জাহাজের বয়-রা পার্সিয়েলিটি করতো গরম জল দেবার বেলায়। সেইজন্যে আবার বলতে হতো আলাদা করে। মধ্যে মধ্যে দিনের বেলায় সেকেণ্ড ক্লাসে আসতুম। খাওয়া দাওয়া করতুম সেকেণ্ড ক্লাসে। জাহাজের খালাসীরা হলো চাটগাঁয়ের মুসলমান। স্টিউয়ার্ড'ও তাই। আমি বললুম,—মাংস, মাটন্ কারি খাব। সে বললে,—গরুর মাংস আছে। সেই গরুর মাংসই দিলে, এ সকলেই খায়। আমি তখন বললুম,—আমি শূয়োরের মাংস খাব। তখন সে 'তোবা' 'তোবা' করতে লাগলো। কেন? সংস্কার। সকলেরই তো তাই। রাত্রে শোওয়া হতো ফার্স্ট ক্লাসে। আমার আবার খদ্দরের জামা পায়জামা আর ধুতি এক সেট চুরি করে নিলে ধোপা। হাইডেলবার্গের একটি ছেলেও ছিল আমাদের সঙ্গে। সে-ও সেবা করতো খুব। লিমডির রাজকুমার জাহাজে ছিলেন আমাদের সহযাত্রী। রেঙ্গুনে নামলুম যখন, পোর্টে মোটর থেকে নেমে বৃষ্টি পেলুম এক চোট। আমার জুতোজোড়াটা গেল ভিজে। রাজকুমার করলেন কি, তাঁর একসেট জুতো দান করে পরিয়ে দিলেন আমার পায়ে।

'বর্মায় পৌছনো গেল। ইথিওপিয়া জাহাজ ২৬-এ মার্চ রেঙ্গুনের ক্রকিং স্ট্রিটের জেঠিতে এসে নোঙ্গর করলো। ওখানে বর্মী চীনে আর ভারতীয়দের বিরাট জমায়েত হলো অভ্যর্থনার জন্যে। সব ধর্মের লোকেরা এসেছিল। রামকৃষ্ণ-মিশনের মহারাজেরা, মাদ্রাজী চেট্টীরা এলেন অভ্যর্থনা করতে। মিশনের খুহ্ মহারাজ ছিলেন তার মধ্যে। রাখাল মহারাজের শিষ্য তিনি। এলেন তিনি গেরুয়া পরে, লাঠি হাতে। অভ্যর্থনায় তাঁর উৎসাহ দেখা গেল খুব। শুনলুম তাঁর প্রতিপত্তি ওখানে অনেক। আন্‌ক্রাউণ্ড কিং ছিলেন তিনি সে-সময়ে রেঙ্গুনের। সাধারণের হিতৈষী ছিলেন মহারাজ।

হাসপাতাল করে দিয়েছিলেন মিশন থেকে। অনেক বেড্‌ ছিল তাতে। পরে, জাপানী গভর্নমেন্ট বোম্‌ করেছিল সেবাশ্রমে —লড়াইয়ের সময়ে। আমাদের ব্যবস্থা, দেখাশুনা ওখানে তিনিই করেছিলেন বেশি।

[আত্মবিশ্বাস, কর্মসামর্থ্য ও সাহস ছিল তাঁর অসাধারণ। মহাপুরুষের কৃপায় এক অতি সাধারণ মানুষের জীবনে কতদূর পরিবর্তন আসতে পারে তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে খুড়ু মহারাজের জীবন।

১৯১৯ খৃস্টাব্দে ব্রহ্মদেশের আমহার্স্ট জেলায় প্রবল বন্যা হয়। বন্যাপীড়িতদের সেবার জন্যে খুড়ু মহারাজ (স্বামী শ্যামানন্দ) মিশন কর্তৃক প্রেরিত হন। তাঁর সহকারিরূপে যান স্বামী ধ্যানানন্দ। বন্যাপীড়িতদের সেবার কাজ তাঁরা সুচারুরূপে সম্পন্ন করে জনসাধারণের ও সরকারের বিশেষ প্রশংসাভাজন হন।

বন্যাত্রাণ-কার্য শেষ করে তাঁরা প্রচারের উদ্দেশ্যে রেঙ্গুন শহরের Ramakrishna Society-র Guest House-এ বাস করতে থাকেন। ঐ সংস্থাটি বাঙ্গালী এবং দক্ষিণ ভারতীয় ভক্তমণ্ডলীর চেষ্টায় কয়েক বছর আগে গড়ে উঠেছিল এবং মিশনে অর্পিত হয়েছিল।

১৯১৮ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা-মহামারীতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্যে ব্রহ্ম-সরকার রেঙ্গুন শহরের পূর্বাংশে একটি সাময়িক হাসপাতাল খোলেন। খুড়ু মহারাজ ১৯২১ সনের জানুয়ারি মাসে ঐ খালি অস্থায়ী বাড়িগুলিতে রামকৃষ্ণ-মিশন-সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন এবং অচিরে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। অবশ্য ১৯২৪ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ যান তখন হাসপাতাল খুব বড়ো হয়নি।

তাঁর চেহারা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো ছিল না। তবু সামান্য বেশভূষা পরে কাজের জন্যে যখন তিনি রেঙ্গুনের পথে ঘুরে বেড়াতেন, তখন সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতো। এমনও হয়েছে যে লাটসাহেব পথের মাঝে মোটর থামিয়ে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে সেবাশ্রমে পৌঁছে দিয়েছেন।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানী সরকার বোমা ফেলে আর মেশীনগান দিয়ে সেবাশ্রম বিধ্বস্ত করেছিল। এর জন্যে জাপানী বেতারে আবার দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছিল —ভুল হয়েছে বলে। ঐ সময়ে সেবাশ্রমের

একজন ব্রহ্মচারী বিশেষভাবে পীড়িত ছিলেন। তাঁকে অন্যত্র সরানো বা সংকার করা সম্ভবপর হয়নি।]

জাহাজঘাটে স্বাগত জানিয়েছিলেন জে. এ. কে. জমাল সাহেব। বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বর্মার গভর্নরের ঘরে হলো মধ্যাহ্নভোজ। সন্ধ্যায় জুবিলী-হলে সংবর্ধনা হলো 'বন্দেমাতরম্' গান দিয়ে।

'২৫-এ মার্চ সন্ধ্যায় সুনাইরাম-হলে বাঙ্গালীদের সাহিত্যসম্মেলনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা হলো। এই সভায় বাঙ্গালী মেয়েরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন। শিক্ষক মোহিত মুখার্জী আর কবি সুধীর চৌধুরীও আমাদের দেখাশুনা করতে লাগলেন। তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কবিকে। কিন্তু, শহর থেকে দূরে হওয়ায় সেখানে বাইরের লোক তেমন যেত না কেউ। কবির সেটা পছন্দ হলো না। খুড়ু মহাথাজ অন্যত্র ব্যবস্থা করলেন। সুধীরবাবু-মোহিতবাবুর চেষ্টায় বর্মী নৃত্য দেখানোর ব্যবস্থা হলো। বর্মার ক্লাসিক্যাল্ নৃত্য হলো —'পোয়ে'। পোয়ে নৃত্য দেখলুম রেঙ্গুনে —এক বর্মী গেরস্তের ঘরে। আমাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে এন্টারটেন্ করলেন গৃহস্বামী। ভোজসভায় নৃত্য হলো। তাঁরই নিজের মেয়ে নৃত্য করলে। —চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছোট্ট মেয়ে। অপূর্ব নৃত্য। নৃত্যের সময়ে আমি কতকগুলো স্কেচ করে নিলুম। হাতকাটা সাদা জামা, আর সাদা শাড়ি। মাথার খোঁপায় চিরুনি গোঁজা। —এই হলো নর্তকীর বেশ। নাচের সঙ্গে বীণা বাজালে তার বাপ। নৃত্য হলো অপূর্ব। —এ যেন শিউলী ফুলটির মতো' —বললেন মুগ্ধ কবি। ছবিও আঁকলুম আমি সেই ধাঁচে —'পোয়ে নৃত্য'। সে মূল ছবিখানি আছে এখন প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের ঘরে। —ওখানে বাজারের পোয়ে নৃত্য দেখতেও ইচ্ছে হলো আমাদের! তার ব্যবস্থাও হলো। কিন্তু ঘরের আর বাজারের পোয়েতে তফাত অনেক। সে ভাল্গার বলে মনে হলো।

'রেঙ্গুনের রাস্তায় বেরিয়ে দেখি মাঝে মাঝে গাছের নিচে কলসীতে জল-ভরা, গেলাস আর খাবার রাখা —রাহীদের জন্যে। ফুরিয়ে গেলে কলসী আবার ভরতি করে দিচ্ছে। রাস্তায় খাবার বিক্রী হচ্ছে ফিরি করে। —'চলন্ত জ্বলন্ত উনোনে খাবার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করে দিচ্ছে। রেঙ্গুনে শ্বেতকাক দেখলুম, প্রায়ই সাদা, কোথাও কোথাও সাদায় কালোয়

মেশানো। মজা জানো? সেই কাক 'কা' না-ডেকে 'খা' ডাকে। কি জানি, চিটাগঙ্গের জের কিনা। —২৬-এ মার্চ চীনে স্কুলে সংবর্ধনা হলো। উদ্যোগ করলেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর লিন ওয়াঙ চিয়াংগ। এঁর কথা পরে বলবো। ঐ তারিখে বাঙ্গালী-সমাজের পক্ষ থেকেও সংবর্ধনা হলো। রেঙ্গুনে তখন বিখ্যাত আর পণ্ডিত শিল্প-গবেষকদের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। —রেঙ্গুনে কাটলো তিন দিন।

২৭-এ মার্চ জাহাজ ছেড়ে ৩০-এ মার্চ মালয়ের বন্দর পেনাঙ পৌঁছলো। ওখানে থামতে হলো। পি. কে. নাম্বায়ারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করা হলো। পরদিন ৩১-এ মার্চ জাহাজ পৌঁছলো মালয়ের বন্দর সুইটেনহামে। সেখান থেকে ২৭ মাইল দূরে রাজ্যের প্রধান নগর কুয়ালালুমপুরে গেলেন। এখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। আতিথ্য গ্রহণ করা হলো ডাঃ পরেশনাথ সেনের বাড়িতে ওখান থেকে জাহাজ চললো সিঙ্গাপুর। 'রাস্তায় সী-সিকনেস্ হলো সকলের। হয়নি কেবল গুরুদেবের। ডেকে তিনি ছুটে বেড়াতেন। সিঙ্গাপুরে তখন বৃটিশদের ডক তৈরি হচ্ছে।' সিঙ্গাপুরে পৌঁছলেন ৭ই এপ্রিল। 'ইথিওপিয়া' জাহাজের গন্তব্য ঐ পর্যন্ত। ঐ দিনেই সিঙ্গাপুরে জাপানী 'আতসুতামারু' জাহাজে উঠে ১০ই কবি সদলে পৌঁছলেন হংকঙে। হংকঙে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হর্নেল সাহেবের ওখানে না-উঠে, উঠলেন বণিক নেমাজীর বাড়িতে। কবির হংকঙ আসার সংবাদ কান্টনে পেলেন সান-ইয়াৎ সেন। তাঁর দূত এলো পত্র নিয়ে কবিকে কানটনে আহ্বান জানিয়ে। কিন্তু, কবি আমন্ত্রণ রাখতে পারেননি। কবিকে বোঝানো হলো, কানটনের রিপাবলিক সরকার পেকিঙ সরকারের বিরুদ্ধে গঠিত। সেইজন্যে তাঁকে পাশ কাটানো উচিত।

১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে কবি যখন চীনে পৌঁছলেন তখন পেকিঙে চীনা সরকারের প্রেসিডেন্ট হলেন সাও কুন। কবি যে সময়ে চীনে ছিলেন —এপ্রিল থেকে জুন তখন চীনে অপেক্ষাকৃত শান্তিপর্ব। হংকঙে থাকার সময়ে আময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ লিম বুন কেঙ কবিকে তাঁদের নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আসেন। কিন্তু, যাওয়া সম্ভব হলো না। হংকঙে তিন দিন থেকে কবি সদলে সাংহাই

রওনা হলেন। স্বাধীন চীনের বন্দর হলো সাংহাই। 'আতামারু' ১২ই এপ্রিল সাংহাই পৌঁছলো। কবিকে স্বাগত করতে পেকিঙ থেকে এসেছেন সী-মো-ৎসু, চু আর চাঙ নামে তিন জন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। ন্যাশন্যাল য়ুনিভার্সিটির সাহিত্য-অধ্যাপক হলেন সু-ৎসী-মো (Hsu-Tse-Mu) আর National Institute of Self Government-এর ডীন S. Y. Chu। সু-ৎসী-মো আধুনিক যুগের যুবক, ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ছাত্র। ইনি এঁদের চীন-ভ্রমণে দোভাষীরূপে সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। গুরুদেব ৎসুকে পেয়ে ভারি খুশি। ৎসু বরাবর ওঁদের সঙ্গে থাকবেন। আসবেন ভারতবর্ষ পর্যন্ত। আর বন্দোবস্ত করতে পারলে চু-ও ওঁদের সঙ্গে ভারতে আসবেন। কবি সদলে সাংহাই থেকে পেকিঙ গেলেন সাত দিন পরে।

'সাংহাই-এ উঠলুম গিয়ে বার্লিংটন হোটেলে। সাংহাই প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে, এশিয়ার বৃহত্তম বন্দর। ওখানে গিয়ে শুনলুম, ভালো লোক সব দেখা করতে আসবে না। এন্‌কুয়ারি করে জানলুম, ব্যাপারটা কি। আমরা আসছি বাঙ্গালাদেশ থেকে। তখন বাঙ্গালীদের ওপর বিরূপ ওরা। কারণ বৃটিশ তখন বেঙ্গল আর শিখ রেজিমেণ্ট রেখেছে সাংহাই-এ। তারা জনসাধারণের ওপর অত্যাচার করে আর ঘুষ খায়। আর আমরা তো ঐ দেশেরই লোক ; সুতরাং বয়কট। সাংহাই-এ আমাদের প্রথম সংবর্ধনা হলো শিখগুরুদ্বারে ১৩ই এপ্রিল। পথে খাতির পাওয়া গেল খুব। গুরুদ্বারে শিখরা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। প্রণাম করলে মেয়েরা। আঁচল দিয়ে পায়ের ধুলো মুছে নিলে। আর্টিস্ট বলে এই কল্যাণসুন্দর দৃশ্যটি আমার ঠিক মনে আছে। ছবি আছে, ফটো আছে, স্কেচ্ আছে আমার। Fact ভুলে যাই ; ছবি মনে থাকে। এই ছবিটি ভোলবার নয়। মীরাবাই-এর ভজন মেয়েদের গলায় শুনে খুব ভালো লাগলো। সভায় কবি যা বললেন, ক্ষিতিবাবু তার হিন্দী অনুবাদ করে দিলেন। আমাদের মনটা কিন্তু খেঁচড়ে গেল। সেইদিন মিঃ হার্দুন নামে এক ধনী ইহুদীর ঘরে নিমন্ত্রণ হলো। বৈকালে মিঃ কারসন চাঙ-এর বাগান-বাড়িতে নগরের শ্রেষ্ঠ নরনারীদের সঙ্গে পরিচয় হলো। মিঃ কারসন চাঙ সে-সময়ের একজন নামজাদা দার্শনিক ও লেখক। এখানে সী-মো-

ৎস্ন য়ুবচীনের পক্ষ থেকে কবিকে অভিনন্দিত করলেন। কবি প্রতিভাষণ দিলেন। কিন্তু, এর ফলে পূর্ব-এশিয়ায় নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে।

'এর মধ্যে আমাদের ডাক এসেছে হাঙচৌ থেকে। সাংহাই থেকে ১১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কিছু পথ ট্রেনে, কিছু স্টীমারে গিয়ে পৌঁছলুম আমরা ৎসিয়েনৎ-সাঙ নদীর মোহানায় অবস্থিত হাঙচৌ নগরীতে। এই নগর বিখ্যাত প্রাচীনকাল থেকে। বিখ্যাত তীর্থস্থান। অনেক কবি মনীষী শিল্পী গিয়ে থেকেছেন ওখানে। চারদিকে লেক-ঘেরা পাহাড়ী পরিবেশ। এখানকার সি-হু বা পশ্চিম হ্রদের সৌন্দর্য অতুলনীয়। নববর্ষ উদ্‌যাপিত করা হলো এই নতুন পরিবেশের মধ্যে। হাঙচৌ-তে বহু প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির আর কীর্তি এখনও রয়েছে। আমি, ক্ষিতিবাবু আর কালিদাসবাবু এখানকার বৌদ্ধগুহা আর বৌদ্ধ মন্দিরগুলি তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলুম। মন্দিরের পাথরের হুড়কো আর কাঠের থামগুলি অজন্তার মতন দেখতে। কিন্তু, কবির পক্ষে সব দেখা সম্ভব হলো না।

'মাঙ্কি টেম্পল দেখলুম। প্রবাদ, প্রায় দেড় হাজার বছর আগে হুই-লি নামে একজন বৌদ্ধ সাধু ভারতবর্ষ থেকে এখানে এসেছিলেন। তিনি এখানে Linvin Szu নামে একটা বিখ্যাত বৌদ্ধ-বিহার স্থাপন করেন —পশ্চিম-হ্রদের পাশে পাহাড়ের ওপর। এখানে এসে স্থান পরিবেশ দেখামাত্র তিনি বলেছিলেন, এই পাহাড়টা দেখতে আমাদের গৃধ্রকূটের মতো —রাজগীরের পাহাড়ের মতো। জায়গাটা আর পাহাড়টা দেখতে আমাদের রাজগীরের পাহাড় বা গৃধ্রকূটের মতোই বটে। সাধুর কথায় লোকে অবিশ্বাস করলে। কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, —না, এটাই রাজগৃহ; হোয়াইট মাঙ্কি আছে রাজগৃহে; এখানেও দেখ। সবাই দেখলে। দেখলে, সত্যিই হোয়াইট মাঙ্কি সা চীনে নাই। সাধু এখানে এই হোয়াইট মাঙ্কি দেখাবার পরেই এই পাহাড়ে তৈরি হলো এই মাঙ্কি টেম্পল। পাহাড়টা গৃধ্রকূটের মতন বলে গৃধ্র আর সাদা বাঁদরের পুজো হতে লাগলো এই মন্দিরে। —হাঙচৌ-এর শিক্ষাসমিতির বক্তৃতা-সভায় কবি এই ভারতীয় ঋষির কথা বলেছিলেন।

'লেকে বেড়াতুম বোটে করে। কবিদের জায়গা। অনেক কবিতা লেখা হয়েছে, অনেক ছবি আঁকা হয়েছে হাঙচৌ-এর ওপর। তখনও প্রিয় স্থান

ছিল কবিদের। রাস্তা গেছে বাঁশবনের ভেতর দিয়ে। কেকে দ্বীপ রয়েছে, গেলুম সেখানে ; মন্দির রয়েছে। মন্দিরের গড়ন হলো সূচাগ্র।···

'তিন দিন রইলুম ওখানে। সু-ৎসী-মো তো আমাদের সঙ্গেই আছেন। উপরন্তু, এলেন চু। চীনের দার্শনিক তিনি, ছেলেমানুষের মতন স্বভাব, সদাই হাস্যমুখ। ···একটি ঘটনা ঘটলো এই সময়ে। চীনে মহিলা-শিল্পী একজন দেখা করতে এলেন আমার সঙ্গে। দেখাতে আনলেন তাঁর সিল্কের স্ক্রোল্। বিষয় হলো, রং দিয়ে নানান রকম ফুলের ছবি। ভালোই এঁকেছেন। কিন্তু, ভালো লাগলো না আমার। সমালোচনা করলুম বাঙ্গালা ভাষায়। অনুবাদ করে দিলেন কালিদাসবাবু। সে চমৎকার অনুবাদ। মর্ম হলো,—তুমি সব রকম ফুলই তো এঁকেছো ; কিন্তু কোন্ ফুলে তোমার অন্তরের কথাটি পাবো।—ইংরেজী অনুবাদটা নিয়ে গেলেন সেই মহিলা-শিল্পী। হাঙচৌ থেকে ট্রেনে সাংহাই ফিরে এলুম ১৭ই এপ্রিল। কতক পথ স্টিমারে, কতক ট্রেনে। পথে নেমে ইয়াঙসির চাষীদের দেখলুম। বড়ো গরীব তারা। পোর্সিলেনের কারিগরদের সঙ্গেও দেখা হলো। তাদের অবস্থা আরো খারাপ। গ্রাম দেখতে লাগলুম ঘুরে ঘুরে। চীনা-মাটির কারিগরদের বাড়িতে গেলুম। গেরস্থালিতে দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু তাদের পেশা অতি সহজ তাদের কাছে ; আমাদের কুমোরদের মতন আর-কি। বাপ-ঠাকুরদার পরম্পরায় তারা এই সব তৈরি করছে। পাঁজাগুলো দেখতে ছোট ছোট চৈত্য-স্তূপের মতো। তাতেই মাটির আমো বাসনকোসন পুড়িয়ে পাকা করে নিচ্ছে।

'ইয়াংসি থেকে ট্রেনে ফিরছি। ফেরবার পথে সু-এর বাড়ির কাছ দিয়ে এলুম। গ্রামের মেয়ে বিয়ে করেছিল সে। খাপ খায়নি তার সঙ্গে।

আর একটা গ্রামে গেলুম। ওখানে সবাই কাগজ তৈরি করছে। ওদের পর্ণকুটিরগুলি দেখতে আমাদের দেশের কুটিরের মতন। সব লোকই গরীব। বুকে করে চাকা ঠেলে ঠেলে খড় মাড়ছে জল আর চুন দিয়ে। আমাদের দেশে 'সুরকির তাগাড়' তৈরি করে যেভাবে, ঠিক তেমনি করে। ও থেকে ওদের নিত্য-ব্যবহারের কাগজ তৈরি হবে, টয়লেট পেপার তৈরি হবে, ঠোঙ্গা তৈরি হবে। ··আর-একজনদের বাড়ির ভেতর দেখতে গেলুম। সেখানে কুটো খড় চুনের জল দিয়ে ভিজিয়ে মণ্ড তৈরি করছে। সেই

মণ্ড ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে ছেঁকে কাগজের সীট্ তৈরি করা হচ্ছে। আর বাইরে লম্বা লম্বা মাটির পাঁচীলের গায়ে সেই ভিজে সীট্‌গুলো লাগিয়ে শুকিয়ে নিচ্ছে। ...বাড়ির চারদিকে চেয়ে দেখলুম, যেন আমাদের বীরভূমের গোয়ালপাড়ার কোনো বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছি। বরং তার চাইতেও গরীব বাড়িতে ঢুকেছি। এই দেখে আমি আট-দশ টাকার মতন একটা নোট্ ওদের দিতে গেলুম। —বাড়ির ছেলেমেয়েরা মিষ্টি খাবে। —কিন্তু সেটা ওরা নিলে না কিছুতেই, বোধহয় অপমান মনে করলে বিদেশীর কাছ থেকে টাকা নেওয়া। —সে দানই হোক্, আর উপহারই হোক্।

'সু ৎসী-মো সঙ্গী আমাদের। পরম ভক্ত ইনি গুরুদেবের আর নিজেও কবি। ট্রেনে যাচ্ছি। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো সু-ৎসী-মো। ব্যাপার কি ? না, শুয়োর যাচ্ছে। গুরুদেব বললেন, —'দেখ, কবিদের শুয়ার দেখেও আবেগ! এই হলো প্রকৃত কবির লক্ষণ।' —পথেই বাড়ি পড়লো তার : গেলুম না।

'সাংহাই-এ ফিরে আসা গেল। সাংহাই-প্রবাসী জাপানীরা আমাদের সংবর্ধনা জানালেন ১৭ই এপ্রিল। মিস্টার কাডুরির ঘরে সংবর্ধনা করলেন ইহুদী-সংঘ। কাডুরি নিজেও ছিলেন কবি। ১৮ই এপ্রিল সাংহাই-এর পঁচিশটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটি সভায় আমাদের সংবর্ধনা হলো।

'সাংহাই-এ ১২ থেকে ১৮ই এপ্রিল সাত দিন কাটিয়ে উত্তর-পথে পেকিঙ যাত্রা করা হলো। সাংহাই থেকে চীনের গঙ্গা ইয়াংসির জলপথে আমরা নানকিঙ চললুম ১৫০ মাইল পথ। নানকিঙ কথাটার মানে হলো —দক্ষিণীনগর। নতুন দেশের মধ্যে দিয়ে নদী-পথের সৌন্দর্যশোভা আমাদের খুব ভালো লাগলো। গুরুদেব বললেন, —'দেখো হে, ইয়াংসি এমন সুন্দর নদী, আমাদের গঙ্গার মতো ঘোলা জল ; অথচ কোনো মেয়ে নামছে না, স্নান করছে না, কি রকম ? খাবার জলও কেউ তুলছে না, ব্যাপার কি ?' —আসলে, নদীর জলটাই ভালো নয়, খেলে অসুখ করে। ...নদীর দু'পাশে ক্যানেলের ব্যবস্থা —জালের মতন। —সে চাষ-আবাদে ব্যবহারের জন্যে। বহু পুরাতন যুগের ক্যানেল —সেচ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা।

'সাংহাই-এ শাক-সজ্জীর ক্ষেত যথেষ্ট নজরে পড়লো। আর ক্ষেতের মধ্যিখান দিয়ে চললে অতিষ্ঠ হতে হতো মানুষের সারের গন্ধে। কিন্তু সে ওদের নাকে লাগে না। ঐ সার প্রয়োগের জন্যে চীনে স্যালাড খাবার রেওয়াজ নাই। আর প্রচলন নাই জল খাওয়ার। জলের বদলে চা। টায়ফয়েড হয় খুব —এতো খারাপ জল! টায়ফয়েড খুব হতো বলে ঐ সারের প্রয়োগ আর জল খাওয়া বারণ ছিল সে-সময়ে। সাংহাই-এ মেথরের ব্যবস্থা নাই। প্রত্যেক বাড়িতে চাষীদের অগ্রিম দাদন দেওয়া থাকে। তারা প্রতি সপ্তাহে একদিন এসে বাড়ির সমস্ত আর্বজনা আর মলমূত্র সব অতি যত্নে পরিষ্কার করে নিয়ে যায় —চাষের সারের জন্যে। বাড়ি রাস্তা সব সাফ করে নিয়ে যায়। সেইজন্যে ঘরদোর রাস্তা তকতক করে সব সময়ে। এক এক বাড়ি এক এক চাষীর দাদনে নেওয়া থাকে।

'রাস্তায় জুটলো' চাঙ। এক কৌট চীনে কালি দান করলে আমাকে। তাতে আবার প্রশস্তিও খোদাই করিয়ে দিয়েছে। এখনও (১৯৫৫) রয়েছে সেটা আমার কাছে। কিন্তু, উপহার দেওয়ার পরে, সে যেন পেয়ে বসলো আমাকে। চললো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। ইংরেজীর ক-টি কথা মাত্র জানতো সে ; বলতো কিন্তু প্রচুর। মানে তার কিছু বুঝতুম, বললে মিথ্যা বলা হবে। গুরুদেব হেসে জিজ্ঞাসা করতেন, —'ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতো কথা কি কও ওর সঙ্গে।' ওঁদের কাছে সে জমাতে পারতো না। কাগজে ছবি এঁকে এঁকে কথা চালিয়ে যেতুম। কথার মার সহ্য করা যেত বেকায়দায় পড়ে।

'একটা স্টেশনে দেখি, তিলকুটো বিক্রী হচ্ছে। ও আমাকে কিনে দিলে। আর একটা স্টেশনে দেখি না —হাঁস। বাঁশের বাঁকে ঝুলিয়ে এক-গোছা ফিরি করছে। ছাল-ছাড়ানো তার। —স্মোকড্ হাঁস। সে ঝপ করে তার একটা কিনে নিয়ে দাঁত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে খেতে লাগলো। আমি খানিক চিবিয়ে দেখি, অসম্ভব ব্যাপার আমার পক্ষে। সে কিন্তু শেষ করে ফেললে প্রায় সবটা। —বরাবর রইলো সে আমাদের সঙ্গে পেকিঙ পর্যন্ত। সু. চু আর ওয়াঙ রইলো বরাবর। 'সু-সী-ম' নামকরণ করেছিলেন গুরুদেব। 'সী-মো-ৎসু'র —এই চীনে নামের ছাঁচে গুরুদেবের দেওয়া পাল্টা এই নাম।

'নানকিঙ-এ পৌঁছনো গেল। বিশাল নগরী। চীনের রাজধানী ছিল বহুবার। বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি ভাষণ দিলেন। অসম্ভব ভিড়। হল-ঘরের বারাণ্ডা ভেঙ্গে পড়ার জো। কবির ইংরেজী বক্তৃতার দোভাষী হলেন সু-ৎসি-মো। নানকিঙের অসামরিক প্রদেশপাল হান্‌ৎজু-সু-এর সঙ্গে পরিচয় হলো। দীর্ঘ আলোচনা হলো জেনারেল চে-শে-য়ুয়ান-এর সঙ্গে।

'নানকিঙ থেকে আমরা পেকিঙের দিকে যাচ্ছি। নানকিঙে গাছপালা বেশি নাই। খেজুর গাছ চোখে পড়লো স্টেশন থেকেই। ছবির মতন। মধ্যে শানটুঙের রাজধানী ৎসি-নান্‌-এ থামলুম ২২-এ এপ্রিল। এ-টি হলো এই প্রদেশের প্রধান নগর। বৈকালে মুক্ত-অঙ্গনে নাগরিক সংবর্ধনা হলো। সভার পরে শানটুঙ খৃস্টান মহাবিদ্যালয়ে যাওয়া হলো। এখানে কবি বক্তৃতায় বললেন —শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষাদর্শের রূপলাভের কথা।

'শানটুঙ থেকে পেকিঙ ২২৫ মাইল। —লাক্সারি ট্রেন —'ব্লু এক্সপ্রেসে' আমরা ২৩-এ এপ্রিল সন্ধ্যায় চীনের রাজধানীতে পৌঁছলুম। শানটুঙ থেকে এই ট্রেনে সরকারী বডিগার্ড ছিল —পাছে বিরোধী দল অশিষ্টতা প্রকাশ করে মাননীয় অতিথিদের অপমান করে, সেই আশঙ্কায়। পেকিঙ রেল-স্টেশনে সব জাতের সব বয়সের লোকের ভিড়। চারদিক থেকে পুষ্পবৃষ্টি আর চীনে পটকাবাজির কান-ফাটানো আওয়াজ। এ দৃশ্য এখানে আগে আর কেউ দেখেনি।

'পেকিঙে একটি হোটেলে রইলেন গুরুদেব। আমরা উঠলুম আর একটা হোটেলে। তখনই দেখলুম, চীনে পর্দাপ্রথা রয়েছে। খাবার টেবিলে থাকতেন কেবল গৃহকর্ত্রী —অন্য মেয়েরা নয়। জাপানে কিন্তু অন্যরকম। সেখানে দেখেছিলুম, গেরস্থ ঘরে থাকা শক্ত নয়। কিন্তু চীনে, সে যেন আমাদেরই মতন।

'যে-হোটেলে উঠলুম, সকালে ওপর-তলার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি কি, এক ঝাঁক শালিখ। অদ্ভুত লাগলো দেখতে। আমাদের এই শালিখ। বিশেষ হলো, নাকের ওপর ঠোঁটের গোড়ায় গোঁপের থোকা। আর এক রকম পাখী দেখলুম, আমাদের হাঁড়িচাঁচার মতন; ইংরেজী

নাম তার হলো —ম্যাগপাই। —সুরকি রং আর খয়েরী রং। ভয়ানক প্রখরবুদ্ধির পাখী। ডিম পাড়ে বাসায়। পেড়ে চুপড়ির ঢাকনা করে ছিটকিনি দিয়ে আট্‌কে রাখে। সারসগুলো দেখতে ঠিক্ আমাদের দেশের সারসের মতন।...মাঝে মাঝে নজরে পড়তো পা-ছোট চীনে মেয়ে। —'পদ্মকুঁড়ি পা'। লোহার জুতো পরে পরে পা দু-টোকে করতো ঐরকম। আর ছোট লাঠির ওপর ভর দিয়ে চলতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। —এ যন্ত্রণা তারা সহ্য করতো বোধহয় বুদ্ধের পাদপীঠ হবার অন্ধ সংস্কারে। —দাঁতে মিশি দিত তারা আমাদের দেশের মেয়েদের মতন। মিশি দিত দাঁতে তখন আমাদের দেশে। সারা এশিয়ায় এর চলন ছিল। চীনে জাপানেও এই করতো। চীনে মাস্কে (musk) দাঁত দেখা যায় কালো। আতা-বিচির মতন কুচকুচে কালো। গুজরাটে দাঁত লাল করে। তাতে দাঁত গরম হয়ে যায়। ব্যথা থাকে অনেক দিন ধরে। মাঝে মাঝে রং লাগাতে হয়।'

১৪ এ ওঁদের প্রথম পাবলিক সংবর্ধনা হলো —পেকিঙের রাজকীয় উদ্যানে। স্বাগত করলেন লিয়াং-চি-চাও। ২৫-এ অ্যাংলো-আমেরিকান অ্যাসোশিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি হোটেলের হলঘরে সংবর্ধনা হলো। কবি প্রতিভাষণ দিলেন। তার বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। চীনের ভাবুক ও কর্মী কুও মুডো চীনা-পত্রিকায় বিরূপ মন্তব্য করলেন। কিন্তু চীনা বিরূপতার ব্যতিক্রম ছিলেন ডঃ হু-সি। ২৮-এপ্রিল পেকিঙের ন্যাশন্যাল য়ুনিভার্সিটির হলে নানা বিদ্যায়তনের ছাত্রদের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে কথাবার্তা হলো। এই আলোচনায় সুফল ফললো।

'পেকিঙে একটা ঘটনা হলো। একজন ধনী ভদ্রলোক গুরুদেবকে নেমন্তন্ন করলেন, আমাদেরও করলেন। পুরাতন ছবির সংগ্রহ আছে তাঁর। নেমন্তন্ন করলেন সে-সব দেখবার জন্যে। চীনের পুরাতন ছবির সংগ্রহ দেখবার জন্যে বিকেলে আমরা গেলুম সবাই। আর আশ্চর্য হলো এই, ক্রমাগত তিন দিন যাবার পরে তবে সত্যিকার ছবি দেখতে পেলুম। তার কারণ কি জানো? চীনেরা চট্‌ করে তাদের পুরাতন ছবির সংগ্রহ অপরকে দেখায় না। সে বিষয়ে খুব কশাস্ ওরা। কারণ, প্রথমতঃ বিদেশীর কাছে, দ্বিতীয়ত বড়ো লোকের কাছে ছবি দেখালে তারা চেয়ে

বসে। সেইজন্যে জমিদারকে বা রাজাকে আর বিদেশীকে ওরা ছবি-সংগ্রহ দেখাতো না। —নিয়ে নেবার ভয়ে। মটোই ছিল তখন সর্বত্র, শিল্পীর ছবি ধনীকে বা রাজাকে দেখাবে না। আর আমি বলি, পত্রিকা-সম্পাদককে দেখাবে না। কারণ, 'মিনি আর কাবুলিওয়ালা'র ছবি আমার মাঝপথে গায়েব হয়ে গেল। সুতরাং, ছলে বলে কৌশলে নিয়ে নেবার ভয়ে ছবি ওদের দেখাতে নাই।

'সেই ধনীর ঘরে। প্রথম দিনে খাওয়া দাওয়ার পরে ছবি এক প্রস্থ দেখালেন। সেই সময়ের সাধারণ নিচু-দরের বেজেরো চীনে ছবি। গুরুদেব আর আমি চোখ চাওয়া-চাওয়ী করছি। ব্যাপার কি? বললুম মুখ ফুটে, যা দেখতে এলুম সে আসল ছবি কই? —'ও তাই, আচ্ছা কাল দেখাবো' বললেন মালিক। দ্বিতীয় দিনে গেলুম। সেদিন বার করেছে সে-সময়ের চীনে আর্টিস্টদের আঁকা ছবি সব। 'হলো না, হে' —বললেন গুরুদেব সন্দিগ্ধ মনে। আমি কর্তাকে বললুম, —'কই, সব পুরাতন ছবি দেখান।' —'পুরাতন!' আকাশ থেকে পড়লেন যেন তিনি। —'ও, আচ্ছা, কাল হবে সে-সব।'

'তৃতীয় দিনে বাগানে চা-এর ব্যবস্থা। বীণকার এসেছে। বসবার সীটে বসলুম আমরা যে-যার। টিফিন চলছে। চা, চীনে বাদাম আর টুকিটাকি খাবার, আর পরিবেশে বীণার তান। লম্বা লম্বা বাক্স কাঁধে করে বয়ে আনলো ভৃত্যেরা। সে দু-তিন শো ছবি। ছোট ছবিগুলো বয়-রা পতাকার মতন বাঁশের আঁকশিতে ঝুলিয়ে দিতে লাগলো। আর ছবির আদি অন্ত ব্যাখ্যা করে ইতিবৃত্ত বলতে লাগলেন মালিক। —একটানা সন্ধ্যে পর্যন্ত অপলক চোখে চীনের পুরাতন ছবি দেখে আমরা ভরপুর হয়ে গেলুম।—

'একদিন কবি-সংবর্ধনা হলো। আমরাও বললুম। আমি বললুম বাঙ্গালায়। কালিদাসবাবু ইন্টারপ্রেট করলেন। চীনে মহিলা একজন গান করলেন। এই উপলক্ষে শেখা গান গাইলেন। গান গাইলেন কিন্তু আমাদের দিকে পিছন ফিরে। সে হলো সম্ভ্রমের খাতিরে। দেশে দেশে অদ্ভুত কায়দা-কানুন সব।

'একদিন বাজনা শুনতে চাইলুম। বীণকারকে নেমন্তন্ন করা হলো।

লেকের ধারে পাইন গাছের বীথিতে বসে বাজালে। দোভাষী বাজনার সব অর্থ বুঝিয়ে বলতে লাগলো। আগে একবার ছবি দেখাবার সময় গান হয়েছিল। এবারে কিন্তু বীণায় ভৈরবী রাগিণীর আলাপে ছবি প্রতিফলিত করে তুললে। আমাদের (ভৈরবী রাগিণী ওদের সীনারিতে ফুটে উঠলো। বীণার তানে লয়ে মনে হলো, —বালির চরে হংস বলাকা নামছে; তার পাখার শব্দ শোনা যাচ্ছে! …বিভোর হয়ে বাজালে বীণকার —অপূর্ব।

পেকিঙে থাকার সময়ে ওঁরা জানতে পারলেন, চীনের সিংহাসনচ্যুত প্রায়নির্বাসিত মাঞ্চু-সম্রাট আর তাঁর পত্নীর সঙ্গে ওঁদের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়েছে।

১৯১১ সালে চীনে রিপাবলিকের শুরু হয়। ফলে, মানচু-রাজবংশ সিংহাসনচ্যুত হন। তখন এই প্রবল সম্রাট্ Hsuan Tung নামে সিংহাসনে অধিষ্ঠ। তাঁর বয়স যখন ছয়, তখন চীন রিপাব্লিক হয়। তারপরে ১৯১২ থেকে ২৪ সাল পর্যন্ত তিনি পেকিঙের বাদশাহী প্রাসাদে বাস করছেন। জনস্টন নামে এক ইংরেজ তাঁর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি সম্রাটের নাম দেন —হেনরী। তাঁর আসল নাম ছিল পু-য়ী। তখন থেকে তিনি পরিচিত —হেনরী পু-য়ী নামে। ২৭-এ এপ্রিল রবিবার সকালে কবি আর তাঁর সঙ্গীরা প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। প্রাসাদ অবস্থিত হলো পেকিঙ মহানগরীর উত্তরে, সেটি মানচু নগরী; আর দক্ষিণাংশ চীনা সহর। এই উত্তর-নগরী প্রায় ১১ মাইল পাঁচীর দিয়ে ঘেরা। পাঁচীর উঁচু পঞ্চাশ ফুট। উপরের প্রস্থ চল্লিশ ফুট। প্রবেশের দ্বার ন-টি। এই মানচু-নগরীর একাংশ বাদশাহী নগর বা Impereial City। এ-ও আবার পাঁচীর দিয়ে ঘেরা —ভিতর গড়। এর মধ্যে সম্রাটের নিষিদ্ধ পুরী —Forbidden City —এখানেই সম্রাটের প্রাসাদ। এই এলাকায় মানচু শাসনের সময়ে কোনো চীনা রাত্রিবাস করতে পারতো না। এই প্রাসাদ বিরাট —অনেক অট্টালিকা মন্দির-উদ্যান জলাশয়ে শোভিত। এই বিশাল পুরীর সিংহদ্বার থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে।

এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে নন্দলাল বলেন,—

'চীনের এক্স্-এম্পারার। রিপাব্লিকের পরে বন্দী হলেন নিজ প্রাসাদে। তাঁর সম্পত্তি সব স্টেটের সম্পত্তি হয়ে গেল। ছবি-টবি তাঁর সংগ্রহের দামী জিনিস সব পেকিঙ-ম্যুজিয়মের সম্পত্তি হলো। সে-সবও দেখে এলুম আমরা পরে। সম্রাট শেষে আশ্রয় নিয়েছিলেন কোরিয়ায়। গুরুদেবকে আর তাঁর পার্টিকে নেমন্তন্ন করলেন তিনি দেখবেন বলে। নেমন্তন্ন বৈকালে। গুরুদেব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, একটু শঙ্কিতও; বিশেষ করে আমাদের জন্যে। বললেন, —'ভালো করে ড্রেস্ করবে'। আমাদের ড্রেসের দৌড় তো জানা ছিল তাঁর। এদিকে, আমাদেরও মাথায় ফন্দী এসে গেল। গুরুদেব স্বয়ং হল্দে সিল্কের জোব্বা পরে, আর মাথায় কালো টুপি চড়িয়ে সেজেছেন মহারাজার মতন। তাঁর বাড়তি জোব্বাও ছিল অনেক। আমরা তাঁর প্রায় অজান্তে 'অশ্বত্থামা হতঃ ইতি' করে চেয়ে নিয়ে পরে ফেললুম তাঁরই এক-একটা জোব্বা এক এক জনে। আমাদের জোব্বা অবশ্য ছিল; কিন্তু, সেগুলো তেমন জুৎসই নয়। অভিনয়ের আগে স্টিচ করে ফিট্ করে যেমন পোষাক, তেমনি করে ঢিলাঢালা সব এঁটে নিলুম আমরা। ঠিক হলো না তাতেও। দো-ছুট্ চাই যে। গুরুদেবের দো ছুট্ তো দাড়ি। আমাদের দো-ছুট্ হলো এই শাল। শালে পঁ্যাচ দিয়ে দিলুম। পা-জামা পরলুম আর মাথায় টুপি। —এই সব পরে পরস্পর এ্যাপ্রুভ্ করলুম আমরা। তার পর, ফাইন্যাল এ্যাপ্রুভালের জন্যে সবাই হাজির হলুম আমরা গুরুদেবের বরাবরে। আমাদের সাজ দেখে অবশ্য খুশি হয়ে এ্যাপ্রুভ্ করলেন তিনি। এদিকে কি-যে করা হয়েছে সে খেয়ালও নাই তাঁর। আমাদের গুরুদেব ছিলেন 'বুড়োর বাবা', অর্থাৎ কিনা সুন্দরবনের বাঘ বা, বাঘের দেবতা 'দক্ষিণ-রায়'ও বলতে পারো। তাঁকে 'ভাঁওতা' দিলুম। অভিনয়ের কাচ কেচে ভাঁওতা দিলুম তাঁকে। সেই থেকে 'ভাঁওতা' কথাটা আমাদের মধ্যে চল্তি হয়ে গেল। —সাজ সেজে গুরুদেবকে ভাঁওতা দিয়ে ঘরে এসে হাসাহাসি করেছি সেদিন। আজ মনে হয়, সেদিন তাঁর সহজ খুশি দেখেই হাসি এসেছিল আমাদের। তাঁর চরণে অপরাধ যদি কিছু ঘটে থাকে, তাতেই ধুয়ে মুছে গেছে।

'রাজপ্রাসাদকে বলতো তখন এম্পারারের ফর্বিড্ন্ প্যালেস্। অনেক কায়দা-কানুন তার ভেতরে ঢোকবার। ড্রেস্-করা তাঞ্জাম এলো ষোলো

কাহারের —সে গুরুদেবের জন্যে। রাজা তিনি, তাই এই রাজ-ব্যবহার। সেনা-দল চলছে পাশে পাশে। কবি তো নয়; ভারতবর্ষের বাদশা এসেছেন যে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে চলছি হেঁটে হেঁটে। সাত দেউড়ি পার হওয়া গেল। পৌঁছলুম এসে খাসমহলে। গুরুদেবের বিশ্রামকক্ষে গিয়ে মিললুম আমরা। কিভাবে আমরা কি করবো, সব ঠিক হলো এইখানে। রাজ-দর্শনের প্রস্তুতি-পর্ব চলছে। কে কি নেবো উপহারের দ্রব্য। যা নেবার নিলুম সব। গুরুদেব নিলেন আমার কথায়, বাঙ্গালাদেশের বিখ্যাত শাঁখা একজোড়া। ক্ষিতিবাবু নিলেন কি সব যেন পুঁথির শ্লোক। আমি নিলুম সোসাইটিতে করা আমার ছবির প্রিণ্ট্। এলম্‌হার্স্ট নিলেন বিশ্বভারতীর নানা পাবলিকেশন। ...এইবার ভাবা হলো, চলা হবে কিভাবে। —রাজদর্শনে আগে যাবেন গুরুদেব তারপর ক্ষিতিবাবু, তারপর আমি, তারপর কালিদাসবাবু, সব শেষে এলম্‌হার্স্ট। গুরুদেবের সঙ্গে যাবেন রাজার শিক্ষক অধ্যাপক জনস্টন, আর একজন চীনা-দোভাষী। ওঁদের পরে মহিলা দু-জন —মীস্ আর গ্রীণ্।

'খাস প্যালেসে ঢুকলুম। ঢুকে দেখি, অপূর্ব বাগান। আর্টিফিশ্যাল বাগান। সাজানো বাগান। বাগানেই প্যালেস। ভিতরে ঢুকলুম। যেখানে দর্শন করতে হবে সেই ঘরে। ছোট্ট দরজা। পর পর ঢুকলুম। দেখি, একটি কক্ষে একটি কুলঙ্গির মতো দরজাতে দু-টি পরী দাঁড়িয়ে। মাথায় মুকুট-পরা সুন্দরী ছিপছিপে যেন দেবীমূর্তি দু-টি দাঁড়িয়ে তোরণে। আর তার পাশে রাজা। একসঙ্গে দাঁড়িয়ে মেয়ে দু-টি ছবির মতো। —ছবি নয়, পরী নয়· রাজার দু-টি স্ত্রী।

'এখন ভেট তো দিতে হবে। সৌভাগ্যের শাঁখা সঙ্গে নিয়েছিলেন গুরুদেব। কথা ছিল, গুরুদেব শাঁখা-জোড়া পরিয়ে দেবেন রাজমহিষীকে। এখন, দু-জন দেখে, ঘাবড়ে গেলেন কবি। চুপি চুপি বললেন —'তাই তো হে, দু-জন তো ভাবা হয়নি।' চট্ করে বুদ্ধি গজালো আমার মাথায়, —একটা একটা করে পরিয়ে দিন —এক এক জনকে; যুক্তি হলো এই, —যেহেতু তোমরা দু-জন একজনেরই স্ত্রী; আর আমাদের দেশে স্ত্রীকে বলে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী।—

'রাজার ড্রেস দেখলুম চাষাদের ড্রেস। নীল —ইন্‌ডিগো রঙের

জোব্বা আর প্যাণ্ট। বেশ এই রকম। রাজা বন্দী তখন। এইজন্যে চাষাদের ড্রেস পরে থাকেন।

'চা-এর আয়োজন। প্রথমেই কলা-টলা, তারপর খাবার। আর প্রথমেই রাজা সব্বার আগেই খেতে আরম্ভ করে দিলেন। টপাটপ খাবার খেলেন। চা খেলেন। বাস্। আমরা তাজ্জব হয়ে বসে আছি। এ কী প্রথা! উনি আগে খেলেন অতিথিদের বসিয়ে! এ কী রকম ' রকম আর কিছুই নয়, রহস্য খুব গূঢ়। ওরা ভাবে, অতিথির জীবন রাজার জীবনের চেয়েও দামী। এ-হেন মাননীয় অতিথিরা যে-খাবার খাবেন সেটা হবে বিশুদ্ধ আর নির্দোষ। এবং বিশেষ করে বিষাক্ত নয়। যাতে পূজনীয় অতিথিরা স্বচ্ছন্দে এগুলি খেতে পারেন, নিজের জীবনের দায়িত্বে, আগে খেয়ে, রাজা তারই চাক্ষুষ প্রমাণ করে দিলেন। তা ছাড়া, বিখ্যাত লোকেদের খাবারে বিষ মিশিয়ে তখন মারা হতো; আর রাজবাড়িতে খাবারে বিষ দিয়ে মারার চক্রান্ত হতো তো হামেশাই। তাই রীতি অনুযায়ী রাজা আমাদের আগে খেলেন, আতিথ্যধর্মেরই খাতিরে। বিদেশী-অতিথিদের প্রতি এটা হলো ওদেশের সহজ ভদ্রতা।

'চা পর্ব চুকলে সম্রাট নিজে আমাদের নিয়ে প্রাসাদে ঘুরে ঘুরে সব দেখাতে লাগলেন। রাজা তাঁর গার্ডেন দেখাতে লাগলেন। চীনে পণ্ডিত ছিলেন একজন তাঁর সঙ্গে। তিনি রাজ-কবিও। রাজার ড্রেস মান্‌-ডারিনদের মতন। পণ্ডিতের ছিল জরির জামা টুপি। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমাদের পরিচয় হলো। রাজার ফটো তুললুম আমরা। এ ব্যাপার পূর্বে প্রায় কখনও ঘটেনি। আড়াই ঘণ্টা কাটলো ওখানে। আর্ট-সংগ্রহ তন্ন তন্ন করে দেখলুম। সম্রাট্‌ও উপহার দিলেন আমাদের। তিনি দিলেন ছবি —ট্যাপিস্ট্রি আর বুদ্ধমূর্তি। ট্যাপিস্ট্রি হলো তাঁতে-বোনা ছবি। মহলের ভেতরে রাজা তাঁতে-বোনা বুদ্ধের ছবি উপহার দিলেন আমাদের ...আমি প্রথমে জিনিসটা ধরতে পারিনি। এলম্‌হার্স্ট এই ছবিটা নিয়ে আমাকে ঠকিয়ে দিলেন। ছবিখানা তিনি রাত্রে আমাকে দেখালেন। আমি ধাঁধায় পড়লুম। এতো ভালো ছবি, অথচ কালারটা এতো ব্রাইট কেন। তখন এলম্‌হার্স্ট বললেন, এটা ছবি নয়, ট্যাপিস্ট্রি।

'অতিথিদের অভ্যর্থনায় প্রথমে খেতে দেবে ওরা তরমুজের বিচি-ভাজা

আর লিচু-শুকনো। লিচু-শুকনো দেবে কিসমিসের মতো। গেরস্থবাড়িতে এই খাবার; আর রাস্তার দোকানে খাবার খেলেও এই। ··চীনে শহরের ভেতরে রাস্তা সোজা নয়; খানিকটা গিয়ে পাওয়া যাবে তোরণ—গেট। গেট খুলে দেবে প্রহরী। গেট পেরলে আবার পথ পাবে; আবার গেটে ঢুকবে; আবার গেট পেরিয়ে গিয়ে পথ পাবে। তখন লড়াই-টড়াই হামেশাই হতো বলে রাস্তার এই ব্যবস্থা। এ্যানার্কিস্টদের আটকাবার জন্যে তখন কলকাতার রাস্তাতেও কোথাও কোথাও এই রকম ব্যবস্থা ছিল।

৯ই মে লেখা আচার্য নন্দলালের একখানি পত্রে পেকিঙ আর তার শিল্পকেন্দ্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা এই রকম: রাজার প্রাসাদটা আশ্চর্য। এখন ওটা ওদের ম্যাজিয়ম হয়েছে। বড়ো বড়ো কামরা বহুমূল্য সম্পদে পরিপূর্ণ। মুক্ত আঙিনা আর প্রশস্ত সব করিডর্ রূপকথার রাজার মতো সাজানো। অসংখ্য প্রত্নশালা মূল্যবান্ শিল্পসংগ্রহে ভরতি। প্রথম দেখেই আমি বিহ্বল হয়ে গেলুম। এ আশ্চর্য বৈভব কী কখনও আমাদের দ্বারা সংগ্রহ সম্ভব হতো! —যখন এ-কথা ভাবি তখন আমার মনটা একটু মুষড়ে পড়ে। পরে, এই ভেবে সান্ত্বনা পাই যে, আমরা যেন আবার মানুষ হই, তারপরে যদি আমাদের ভাগ্যে এই রকম শিল্পসম্ভারের সমাবেশ ঘটে তো ঘটবে, অবশ্য যদি বিধাতা বিমুখ না-হন। —চীন বিশাল দেশ। এবং মহান্ —বিশেষ করে শিল্পচর্চায়। মনে হয় জগতের মধ্যে চারু ও কারু শিল্পে চীন শ্রেষ্ঠতম। কিন্তু হলে কি হবে, পাশ্চাত্য প্রভাবের চমক এদেশে ঢুকে পড়েছে। আমেরিকা আর জাপান থেকে আমদানী রঙ্গচঙ্গে দেওয়াল-পঞ্জী পাশাপাশি টাঙিয়ে রেখেছে উৎকৃষ্ট গ্রামীণ হাতে আঁকা চিত্রের সঙ্গে। মেয়েরা আমেরিকান গোড়তোলা জুতো পরছে, আর পুরুষেরা কোট্-প্যান্ট চড়িয়েছে আর চুল ছাঁটছে বৃটিশ সৈন্যদের মতন বাটী বসিয়ে। রাজপ্রাসাদে আশ্চর্য নরম আর অদ্ভুত সুন্দর পুরাতন কার্পেটের পাশাপাশি বিছানো রয়েছে একটা কুৎসিত আধুনিক কম্বল —সস্তা নক্সা, বর্বর রঙ্গ-ফলানো ফুলতোলা। দুর্ভাগ্য যে, সবই তৈরি করা হচ্ছে আমেরিকান ঢঙ্গে। এমন-কি, বসত-বাড়ি পর্যন্ত তার আকার বদলে ফেলছে।...আধুনিকদের নিয়েই বিশেষ ঝামেলা, তারা সবই দেখে ঘৃণার চক্ষে। তারা পুরাতন

পরম্পরাকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যে ব্যস্ত ; অবশ্য সর্বদা এটা যে বিবেচনাপ্রসূত তাও নয়। আমার ভয় হচ্ছে, তারা পরিচালিত হচ্ছে অন্ধভাবে —বিদেশী প্রভাবের দ্বারা। পুরাতন পরম্পরা-পন্থীরা রয়েছেন : তাঁরা আবার যা কিছু নতুন তারই বিরোধী। তবে এখনও প্রকৃত সমঝদার কিছু রয়েছেন, তাঁরা দেশের শিল্পসম্ভার ঠিক্‌ঠিক্‌ বোঝেন। তাঁরা একটি সোসাইটির পত্তন করেছেন ঠিক্‌ আমাদের ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্‌ ওরিয়েণ্টাল আর্টের মতো। আমি এঁদের সঙ্গে আমাদের কলকাতা সোসাইটির স্থায়ী যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করছি। তাঁরা কবিকে ছ-খানি মৌলিক ছবি উপহার দেবার জন্যে মনস্থ করেছেন। আমরা অনেক পুরাতন রাবিং সংগ্রহ করেছি। সেগুলি খুব সুন্দর।...আমি চেষ্টা করছি, আমাদের সঙ্গে একজন অথবা দু-জন চীনে শিল্পী নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু, এটা খুব কঠিন কাজ।...চীনেরা আমাদের চাইতে বেশি ঘরমুখো। আমি ঢাইনে-বাঁয়ে আমন্ত্রণ ছাড়ছি —দৈবাৎ যদি কেউ মত করে আমাদের সঙ্গে যায়।

২৭-এ এপ্রিল সন্ধ্যায় পেকিঙের পণ্ডিতেরা ভোজসভায় এঁদের নেমন্তন্ন করলেন। মিস্টার লিন্‌ নামে একজন সাহিত্যিক কবিকে স্বাগত জানালেন। চীনা ছাত্রদের সঙ্গে ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটিতে মিলিত হবার পরে ধরিত্রী মন্দির বা Temple of Earth-প্রাঙ্গণে ছাত্রদের সামনে কবি ভাষণ দিলেন ২৮-এ এপ্রিল। চীনা বৌদ্ধ যুবসমিতির সদস্যগণ পেকিঙের ফে-য়েন নামে প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির-প্রাঙ্গণে কবিকে আমন্ত্রণ করলেন। চীনের বিখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু তাও-কাই এই মন্দিরের আচার্য। লিলাক আর পাইন গাছের ঘন ছায়া আর ফুলের বাগান। তারই মাঝে মাঝে ভালো ভালো বচন-লেখা slab। লিলাক বৃক্ষের ঘনছায়াতলে সমবেত জনতার সামনে কবি ভাষণ দিলেন। কবি ও তাঁর সঙ্গীদের ঐতিহাসিক স্থান দেখানো হলো। —রাজার গ্রীষ্মাবাস, কনফুসাস-মন্দির, জাতীয় সংগ্রহশালা ইত্যাদি। এক সপ্তাহ পেকিঙে থাকার পরে মে মাসের প্রথমে কবি পশ্চিম পাহাড়ে ৎসুঙ-হুয়া কলেজের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। Tsin Hua কলেজের লাইব্রেরী অমেরিকান স্টাইলের। তেতলা। কবিদোর কাঁচের। কাজের ঘর আর ব্যবস্থা ভালোই। এখান থেকে তাঁর সঙ্গীরা গেলেন বিশিষ্ট স্থান পরিদর্শনে।

'Fa-yuan-ssu মনাস্টারীতে নেমন্তন্ন হলো। সেখানে সব দেখানোর পরে খাবার ব্যবস্থা হলো। সাধুরা এক সময়ে নিরামিষাশী ছিল; এখন মাংস খায়। তবে নিরামিষের চেহারা করে নেয় আমিষের। মুরগীর পা গাঁটশুদ্ধ বাঁশের গাঁটশুদ্ধ কঞ্চির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমিষকে এরা নিরামিষ করে নিয়েছে এইভাবে। এটা হলো, এককালে এরা নিরামিষ খেত তারই নিশ্চিত স্মৃতি।

'চীনের পাঁচীর দেখতে গেলুম লো-ইয়াং হয়ে। গুরুদেব গেলেন না। ওয়াল দেখতে যাবার সময়ে একটা স্টেশনে একটা ঘটনা হলো। গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছি আমরা তিনজন। দেখি না, বাজনা বাজিয়ে বাজিয়ে প্রচুর সৈন্য এলো স্টেশনে। বসে দেখছি। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করে জানবার কৌতূহল হলো। —সেই প্রদেশের যিনি গভর্নর —আসছেন তিনি। আসছেন তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাঁরই বাবাকে এখানে রিসিভ্ করতে। ..বসে আছি। এমন সময়ে আমাদের তিন জনকে ডেকে নিয়ে গেল ওয়েটিং রুমে। সেখানে গভর্নর আর গভর্নরের বৃদ্ধ পিতা বসে আছেন। দোভাষীর মার্ফৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কোন্ দেশের লোক। তখন পরনে আমাদের ঢিলে পা-জামা, গেরুয়া জোব্বা আর মাথায় টুপি। চেহারা দেখতে হয়েছে মোঙ্গল সাধুদের মতো। শিল্পী জেনে আমাকে তিনি অনুরোধ করলেন বুদ্ধের ছবি এঁকে দিতে হবে। বিদায় দিলেন। পরে, পেকিঙ থেকে পাঠিয়ে দিলুম ছবি। 'ভেড়া কাঁধে বুদ্ধ' —তাঁর জন্যেই আঁকা।

'রাস্তায় আরও ঘটনা মনে আছে। স্টেশনের পর স্টেশন। চীনে নাম চীনে অক্ষরেই লেখা। দেখছি. দেখছি. আর জিজ্ঞাসা করছি। ওরা বলছে. আমরা শুনছি। ক্ষিতিবাবুও শুনে যাচ্ছেন। স্মরণশক্তি কিন্তু অদ্ভুত ওঁর। ফেরবার সময়ে সব নাম বলতে বলতে এলেন একটার পর একটা। কিন্তু, আমার মনে থেকে যাচ্ছে মাত্র কোনও ছবি, ব্যস্। বিদ্ঘুটে নাম সব একশা হয়ে যাচ্ছে। মন ধরে রাখছে কেবল সেইটি যাতে বিশেষত্ব আছে কিছুমাত্র।

'মাঝ-রাস্তায় ক্ষিতিবাবুর রিক্সা বার্স্ট করলো। ওঁর চেহারা তো নাদুসনুদুস। ওঁকে দেখেই ওদের মনে পড়তো 'হুটি' দেবতার কথা। 'হুটি'

হচ্ছেন অনাগত বুদ্ধ। তাঁরও ঐ রকম স্থূল শিশুর মতো চেহারা। 'হুটি' বলতো ওরা ক্ষিতিবাবুকে। 'হুটি'র এই না বিপন্ন অবস্থা দেখে, চীনে রিক্সওয়ালা হাসতে হাসতে গড়াতে লাগলো রাস্তায়। উচ্চরোলের সে-হাসি। রিক্সওয়ালা আবার মজার জন্যে ওঁকে নিত আগে। আর ঐ হাঁকতে হাঁকতে যেত। রাস্তার দু-পাশের লোকও হাসতো তাতে খুব। যাই হোক্, চীনের লোক উচ্চৈঃস্বরে হাসতে জানে। জাপানে কিন্তু দেখলুম, উল্টো। সেখানে সব নিঃশব্দ। এই হলো উভয় দেশের জাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

'এক বৃদ্ধ চাষা রাস্তার ধারে চাষ করছে। সুঠাম চেহারা বৃদ্ধের। আমাদের দেখে সে টাঙ্গনার বাঁটে ভর দিয়ে দাঁড়াল। আমি তার ফটো তুললুম আমার কোডাক ক্যামেরায়।··· মাঝ-রাস্তায় মন্দির। মন্দিরের পাশে আমলকী গাছ যেমন শান্তিনিকেতনে, তেমনি পাইন গাছ ওখানে। মাঝে মাঝে ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি। অপূর্ব কারুকার্য সে-সবের।···পাহাড় দেখলুম। চীনে পাহাড় যখন দেখতে পাই, বড়ো অদ্ভুত লাগে। মাটির ধ্বসের ওপর ইঁদুরের গর্তের মতন পাহাড়ের ধ্বসে গর্ত করে করে বাস করে গরীব চাষীরা। পদ্মার চরের ধারে গাংশালিকের বাসা যেমন, সেই রকম করে লোক বাস করে থাকে এই সব গর্তে। তবে শীতের সময়ে সুবিধে খুব বাসের পক্ষে। বিশেষ করে গরীবদের তো বটেই।··· 'চীনের পাঁচীর' দেখলুম। বর্ণনা যা পড়েছো, সব ঠিক তাই। পাঁচীরের মাঝে মাঝে তোরণ রয়েছে। পাঁচীরটার ওপরে চড়ে সব দেখে মনে হলো, রাস্তাটায় যেন একটা বিরাট ড্রাগন চলছে —পাহাড়ের ওপর দিয়ে উঁচু নিচু হয়ে। কলাভবনে স্কেচ্‌বুক রাখা আছে, দেখো। [ছোটনাগপুরে রাঁতুর নাগবংশী রাজাদের প্রাসাদের পাঁচীর ঐ আদলে করা, বললুম আমি।]

'লো-ইয়াং যাবার পথে হোটেলে একরাত্রি আশ্রয় নিতে হলো। খাবার দিলে —'ম্যাক্রনি' —লম্বা লম্বা শেওয়াই-সেদ্ধ, আর তাতে ডিম-ভাজা, আর চা। এই হলো টিফিন। বমি আসে খেতে।···ছোট বাজার কাছেই। মুদীর দোকান ঠিক্ আমাদের দেশের মতন। বিক্রী হচ্ছে, রাঙ্গা আলু পোড়া, ছোলার চাক্‌তি আর চীনেবাদাম ভাজা। দেখে এসেই চাকরকে বললুম, —নিয়ে এসো রাঙ্গা-আলু পোড়া। ভাষা বোঝে

না, আকার-ইঙ্গিতও বোঝে না। এঁকে দিলুম রাঙ্গা-আলু —আনলে সে কচু। রাঙ্গাআলু-লতার পাতা এঁকে দিলুম যখন, তখন বটে মাথা নাড়ে। পরে, সব ঠিক ঠিক আনতে পারতো ; ইঙ্গিত শিখে নিয়েছিল।

'পেকিঙে থাকার সময়ে একদিন গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ওখানকার বিখ্যাত শিল্পীরা জমায়েত হলেন। তাঁদের পদ্ধতিতে তাঁরা প্রত্যেকে একখানা করে ছবি আঁকলেন। সে-ছবির সংগ্রহ আছে কলাভবনে। …ওঁদের মধ্যে একজন শিল্পী —ফুটছে এমন একটি লালপদ্মের কুঁড়ি আঁকলেন। ছাপা হয়েছে সে-ছবিটি —'গোল্ডেন বুকে'। ছবির একপাশে ডাঁটিটি টেনে প্রথম আঁকলেন। আঁকার টেকনিকে সে-আঁকা দোষের হলো। আমি ভাবছি, কি করে শোধরাবে। তারপরে দেখলুম, ডাটাটার পাশ দিয়ে ওদের চীনে ক্যালিগ্রাফি অক্ষরে অনেক কি সব লিখে দিলেন। তাতে ঐ দোষ খণ্ডন হয়ে গেল। আর তাতেই বোঝা গেল, একজন ওস্তাদ শিল্পী ইচ্ছামতো ছবির দোষ সংশোধন করে নিতে পারেন। বেতাল হলেও তালে তাল মিলিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। ইচ্ছামতো সংশোধনের ক্ষমতা রাখেন। —সে ছবিটাও আছে শান্তিনিকেতন-কলাভবনে।

'সেই সব ছবি আঁকার পরে, তখনকার চীনের বিখ্যাত আর্টিস্টদের ছবি সব ওঁরা গুরুদেবকে উপহার দিলেন। সে-ছবিগুলোর প্যাকেট কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না, এদেশেই এসে পৌঁছল না।

'এই জমায়েতের পরে। একজন শিল্পী —নাম তাঁর মিস্টার লী°। তাঁর কন্যাও একজন শিল্পী। মিস লীং নেমন্তন্ন করলেন কেবলমাত্র আমাকে। —গেলুম তাঁদের বাড়িতে। চা-এ অভ্যর্থনা করার পরে আমাকে তিনি অনেক রকম রং দেখালেন। রং-এর কেক্ স্টোন-কালারের। দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে গেলুম আমি! জিজ্ঞাসা করলুম —কিনতে পাব না? উত্তরে, হাসলেন তিনি। —এ কোথায় পাবে, চীনের এম্পারার্ আমার বাবাকে এই রং-এর কেকগুলি উপহার দিয়েছিলেন বিশেষভাবে তৈরি করিয়ে। বাবা সভাশিল্পী ছিলেন তাঁর। তারপরে, তিনি একটি কেক্ উপহার দিলেন আমাকে। সে আছে এখন (১৯৩৫) এখানে আমার কাছে।

নীল পাথর থেকে তৈরি লাজবাদ রঙের সেই কেক্ উপহার দিলেন তিনি। নিজের আঁকা একখানি ছবিও উপহার দিলেন তার সঙ্গে।... বললেন আমাকে, —আপনার হাতের আঁকা ছবি আমাকে দিতে হবে। —এখনই তো দিতে পারবো না, —বললুম আমি। 'আপনার বাড়িতে কাগজ পাঠিয়ে দেবো, দু-শ বছরের পুরাতন কাগজ সংগ্রহ আছে আমার, পাঠিয়ে দেবো, তার ওপর ছবি এঁকে দেবেন আপনি। —পুরাতন সে অতি দামী কাগজ। পাঠিয়ে দিলে সেই দুষ্প্রাপ্য কাগজ। সেই কাগজের ওপর বাসায় বসে আমি ছবি এঁকে দিলুম, —বীরভূমের তালগাছ আর কোপাই নদী।

'ছবি পাঠাবার পরে, একদিন নিজে এলেন আমার ঘরে। এসে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন বাজারে। —রঙের বাজার। তখনকার বাজারের সেরা চীনে রং আর সরেস কাগজ কিনে দিলেন। বললেন, —এই কাগজে কখনো ছোপ ধরবে না; সাদাই থাকবে। —সেই কাগজ এখনও আছে আমার কাছে।

'পেকিঙে থাকার সময়ে, অনেক টাকা ছিল আমার কাছে। চীনের রং তুলি কিনে আনবার জন্যে এদেশের অনেক শিল্পী অনেক টাকা দিয়েছিলেন আমাকে। সে টাকা আমার সঙ্গে ছিল। একটি চীনে রং-তুলির দোকানে গেলুম। রংগুলির লিস্টি দেবার পরে, সে প্রায় পাঁচ-ছশো টাকার ফর্দ দেখে দোকানী তো অবাক। রাজা-বাদশার কোনও এলাহি কাণ্ডের স্টুডিয়ো, না, রং তুলির দোকানের মাল, ভাবে তারা। তাদের ধন্দ মিটিয়ে বললুম আমি —না, বহু আর্টিস্টের জন্যে নিয়ে যাব সংগ্রহ করে। শাঁসালো, মোকালো খদ্দের পেয়ে জামাই-আদরে খাতির করতে লাগলো। বসতেই আদর আপ্যায়ন অভ্যর্থনা চললো; চা বিস্কুট এলো। —বললে, —লিস্টি আর ঠিকানা দিন, বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো সব। বাড়ি চলে এলুম। প্যাকেট আর বিল এসে গেল যথাসময়ে।

'ছবি কেনার প্রসঙ্গে একদিন এলমহার্স্ট ওখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেশ-বিদেশের ছবি, বিশেষ করে ওখানকার চীনে ছবি কিনতে গেলে, ভালো ছবি, মন্দ ছবি চিনবেন কি করে; তার সূত্র কি। আমি বললুম, —একটি ভালো যুৎসই স্কেচ —ওড়িষ্যায় যাকে বলে 'তড়া কাজে'

এই সব গুণ থাকা চাই, যেমন, —তুলির টানের সঙ্গে সঙ্গে ভাব ফুটে উঠবে। পাকা হাতের রেখার টানের সঙ্গে সঙ্গে ছাঁদ, অর্থাৎ কিনা বস্তুর গড়নবোধ স্পষ্ট রূপ নেবে। ছন্দের দোল স্বতঃস্ফূর্ত হবে রেখার টানে। শিল্পীর যা বৈশিষ্ট্য তুলির টানে তা আপনি ধরা দেবে। পাকা রাঁধুনীর রান্না যেমন, তেমনি পাকা শিল্পীর স্কেচে উপাদেয় আস্বাদ অর্থাৎ ভাব এসে যাবে। লোকদেখানো মুনশীয়ানা কিন্তু দোষের। আর যদি ছবিতে হেঁয়ালি সৃষ্টি করে লোক ঠকিয়ে কেউ মজা অনুভব করে, সে হবে মস্তো ছেলেমানুষী।...নিচুদরের কাজ কাকে বলে জানেন? এই ধরুন, মাছিমারা নকল করা, বা, ভয়ে ভয়ে নকল করা কাজ। বস্তুর ক্যারেক্টার দেখিয়ে যদি মুনশীয়ানার সঙ্গেও কেউ নকল করেন, তবুও সেটা নকল-ই। বা, সাদৃশ্যের সাহায্যে নকল করা হলেও সেটা নকল বলে মানতেই হবে — এই ধরনের কাজ করার প্রবণতা থাকে যে-সব শিল্পীর মনে, তারা প্রকৃতির সঙ্গে তেলে জলের মতন আলাদাই থেকে যায়। কাজে খুব দক্ষতা থাকলেও এদের কাজ নিচুদরের হবেই।

'তাহলে উঁচুদরের কাজ কাকে বলবো? —এতে প্রকৃতির বিষয়ে আর শিল্পীতে কোনও তফাৎ থাকবে না। শিল্পী প্রকৃতির বস্তুর সঙ্গে নুনে জলের মতন যেন ডাইলুট হয়ে যাবেন। আসল শিল্পীর কাজে ক্যারেকটার, গড়ন, ভাব, ছন্দের দোল —সব-কিছু পুরোপুরি থাকবেই। যদি কাজ এই রকম হয়, ঠিক শিল্পসৃষ্টির ধাপে পড়েছে, বলতে পারেন। আর এই রকম কাজকে ছবি করা না-বলে, ছবি হওয়া বললেই ঠিক বলা হয়।

'এলমহার্স্ট' সাহেবের সঙ্গে এক জায়গায় বেড়াতে গেলুম। সেখানে গরম জলের ঝরণা —চারদিকটা চৌবাচ্চার মতন করা। তার চারধারে বাগান-টাগান। এলম্‌হার্স্টের ইচ্ছে ছিল, সেই জায়গাটা তিনি কিনে নেবেন। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।

'একদিন ওখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমাদের একটি স্মৃতিমঞ্চ দেখালেন। ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি কটা জাতি মিলে একসময়ে কিভাবে চীনেদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেছিল, বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে ফেলেছিল, তারই ধ্বংসাবশেষ দেখাবার জন্যে ওরা একটি মঞ্চ করে রেখেছিল। তার ওপর

উঠে আমাদের সব দেখালেন। সেই ভগ্নস্তূপ যেমনটি ছিল দেওয়াল-টেওয়াল সেইভাবেই রেখে দিয়েছিল। সে-সময়ে চীনেদের তৈরি সূক্ষ্ম বহু যন্ত্রপাতি ছিল আকাশমণ্ডল দেখবার জন্যে। সে-সব নিয়ে যায় ঐ সব লুণ্ঠনকারীরা। পরে বিদ্রোহ মিটমাট হতে সে-সব যন্ত্রপতি ওরা ফেরত পেয়েছিল। রাস্তায় মণি মুক্তো ছড়িয়ে পড়ে অগ্নিকাণ্ডের সময়ে, নিদর্শন রয়েছে তার।

'একটি বুদ্ধ-মন্দির দেখতে গেলুম। সেদিন গ্রাম থেকে মেয়েরা এসেছে পুজো দিতে। ছেলের মাথা মুড়িয়ে নিয়ে এসে বুদ্ধকে প্রণাম করাচ্ছে। দেখেই আমাদের দেশের পঞ্চাননতলা, ধর্ম্মতলার কথা মনে হলো। ধুনো দিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে পূজার পদ্ধতি তিব্বতী মন্যাসটারির মতন। ব্রোঞ্জের বড়ো ধুনোচুরে ধূপ ধুনো গুগ্‌গুল সব একসঙ্গে ফেলে দিলে। তারপরে প্রণাম করে চলে গেল। মানসিক শোধ করতে এসেছিল; শোধ করে চলে গেল। ...জুতো খুলে ঢুকতে হয়না মন্দিরে। আমাদের জুতোর ওপর কাপড়ের জুতো জড়িয়ে দিলে। দুয়ারে যে-লোকটি থাকে তাকে দু-একটা পয়সা দিলেই এই জুতোর ব্যবস্থা করে দেয়।

'সব চেয়ে কষ্ট হতো আমাদের, ওদের বাথরুম সিস্টেমে। একটা পাঁচিল-ঘেরা চত্বর আর একটা ড্রেন্। ব্রাশে করে ময়লা জমা করছে সব সেই পাঁচিল-ধারে। রুমাল ওডিকোলন ঢেলে নাকে দিয়ে বসতে হতো। ভাবলুম, এভাবে তো মারা যাব। তখন দায়ে পড়ে বুদ্ধি এলো, রাস্তার ধুলোয় কাজ সেরে ঢাকা দিয়ে রাখতে লাগলুম আমরা। অবশ্য সহর জাগবার আগেই, লোক-চলাচল হবার আগেই আমাদের সব কর্ম সারতে হতো।

'বেতের খাটিয়া। রাতে ঘুম হয় না। গা জ্বলে যাচ্ছে। কী ব্যাপার? বড়ো বড়ো ছারপোকা, আমাদের কাঁইবিচের মতন। ওরা বলে, সে নাকি আমাদেরই দেশের জীব। 'Indian Worm' বলে ওরা। ছারপোকার এই ফৌজ আবার জাপানে গেছে চীন থেকে। ওখানে তারা একে বলে, 'Chinese Worm'। গেছে কোরিয়া হয়ে জাপানে। গেল কি করে? —বৌদ্ধ সাধুদের কাঁথা-কম্বলে চড়ে ওরাও দিগ্বিজয় করেছে, কি বলো?

'রাত্রে শোবার আগে। বাঁশের চুবড়ি দিয়ে গেল আমাদের একটা

একটা করে। আমরা ভাবি, urinal বুঝি। —বোধহয় ঢাকা-দেওয়া urinal। তরে ঢাকনি খুলে, রাতের কাজ তাতেই সেরে রেখেছি। কিন্তু আসলে সেটা না-কি চা-দান! সকালে দেখি কি, 'জল' গড়াচ্ছে। তখন তাড়াতাড়ি কুঁজো থেকে জল ঢেলে রাতের ভুল সংশোধন করে দিলুম তার ওপর। কৌতূহলবশে ওঁদের ঘরে গিয়ে দেখি, ক্ষিতিবাবু ও আর-সবাই ঐ একই কর্ম করে রেখেছেন।

'চানের ব্যবস্থা। কাঠের টব। ভেতরে লোহার চোঙায় আগুন দিয়ে জল গরম হচ্ছে। আবার গরম হলেই হয় না, জলটা ফুটন্ত হয়ে যায়। সেই টবে নেমে নেমে চান করছে সবাই। কিন্তু আমাদের ঘেন্না হতো। আমরা চান করতুম মগে করে জল ঢেলে ঢেলে। সব্বার আগে গিয়ে পৌছতে পারলে অবশ্য টবে নেমেই চান করা যেত। —গ্রীষ্মকাল। তবুও আমাদের দেশের ৭ই পৌষের মতো শীত ওখানে। দু-তিন প্রস্থ জামা পরে থাকতে হয়। সবার ওপর জোব্বা। ক্ষিতিবাবু বলতেন, —আমরা যেন বাঁধাকপি হয়ে আছি।

'পেকিঙে দিনকতক ছিলুম একজন পার্শীর বাড়িতে। সিন্ধী সদাগর —নাম হলো তালাটি। সিন্ধী রান্না খাবার খেতুম রাত্রে তালাটির বন্ধু গোখুমলের ঘরে। রাঁধতেন তাঁর একজন চীনে মহিলা রান্নী বা দাসী। সিন্ধী রান্না শিখে নিয়েছিল সে। তালাটির ছোট দু-টি শিশুকন্যা ছিল। তারা ভারি নেওটো ছিল আমাদের। সব সময়ে থাকতো আমার কোলে পিঠে। —তালাটির কথা বড়ো মজার। সান-ইয়াৎ-সেন চীন যখন রিপাবলিক করলেন, তখন তালাটি করলেন কি, তাঁর বাড়িতে ইণ্ডিয়ান্ ফ্ল্যাগ তুলে দিয়েছিলেন চাইনীজ্ ফ্ল্যাগের সঙ্গে।

'ওখানে হল্স্টাইন্ ছিলেন জার্মান প্রোফেসর। বৃদ্ধ ঋষিতুল্য লোক। তিনি ছিলেন তিব্বতীর বড়ো স্কলার। তাঁর আমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতেও গেলুম আমরা। তিনি তাঁর নানা সংগ্রহ দেখালেন। ছবি উপহার দিলেন আমাকে —তিব্বতী উড্কাট্ প্রিন্ট —লাল রঙের রেখায় ছাপা— —বোধিসত্ত্ব-মূর্তি। আছে শান্তিনিকেতন-কলাভবনে।

'আমেরিকান মিশন্যারিরা প্রোপাগাণ্ডা করেছিলেন গুরুদেবের বিরুদ্ধে। গুরুদেব নিন্দে করেছিলেন ওখানে মিশন্যারিদের। তাঁরা বললেন, —আমরা

এদেশের জন্যে এতো করলুম, আর কিনা আমাদেরই নিন্দে! ফলে, চায়নার কাগজে মিশন্যারিরা আর যুব চীন নিন্দে করলে গুরুদেবের। গান্ধীর বচন প্রীচ্ করা চলবে না; ব্রহ্মের প্রকাশ, আত্মনের গরিমা, প্রেমের বাণী —এই সব বলে আমাদের আফিম বা তাড়ি খাওয়ানো চলবে না, ইত্যাদি।

'আমেরিকানরা নেমন্তন্ন করলেন একবার গুরুদেবকে। সেই নেমন্তন্নে গিয়েও সেই কটু বললেন গুরুদেব মিশন্যারিদের। এক ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিলেন —তার আগাগোড়াই মিশনরিদের বিরুদ্ধে। এলম্‌হার্স্ট ব্যাপার দেখে গুরুদেবকে কেবল চোখ টিপছেন। কিন্তু তখন কে কার কথা শোনে। খেয়ালই নাই কবির, যাঁরা নেমন্তন্ন করেছেন, তাঁদেরই দাড়ি ওপড়াচ্ছেন বুকে বসে। ⋯যাই হোক্, গুরুদেবের বলা শেষ হলো। ওঁরা কবিকে ধন্যবাদ দিতে উঠলেন। বললেন, —কবির ভাষা বা বলার ভঙ্গি অত্যন্ত সুন্দর, —ইত্যাদি। —পরে, গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি। তিনি বললেন, —'আমি আদি অন্ত পরিবেশ ভুলে গেছলেম, যা সত্য তাই আমার ভাষায় প্রকাশ পেয়েছিল।'

'এ দেশের এখনকার কুষ্টিমণ্ডলী। মাথায় ওদের কোঁকড়া লম্বা চুল। যেন আফ্রিকার নিগ্রো সেজেছে ছেলেরা। আমাদের ছবি আঁকলে ওরা। নমুনা রাখা আছে শান্তিনিকেতন-কলাভবনে। পরিচয়ের জন্যে কার্ডের সঙ্গে ছোট্ট স্কেচ্ করে রাখতুম। সে সব স্কেচ্ কলাভবনে আছে।

'আমেরিকান মহাবিদ্যালয় থেকে কবি পেকিঙে তাঁর হোটেলে ফিরলেন তাঁর জন্মদিন ৮ই মে। জন্মদিনে ক্রেসেন্ট্‌মন্ সোসাইটির উদ্যোগে উৎসব হলো। ডক্টর হু-সি পৌরোহিত্য করলেন। সমস্ত অনুষ্ঠান হলো ইংরেজি ভাষায়। কবিকে উপাধি দেওয়া হলো তাঁর 'রবি' ও ইন্দ্র' নামের সঙ্গে মিলিয়ে —চু-চেন-তান। রবীন্দ্র (রবি ও ইন্দ্র) অর্থাৎ রৌদ্র ও বজ্র। চীনের পুরাতন হিন্দুস্থানী নাম হলো 'চেন-তান' (চীনস্থান) বা বজ্রগর্ভ প্রভাত। পক্ষান্তরে, হিন্দুস্থানের পুরাতন চীনা নাম হলো 'চু'। তা-হলে, 'চু চেন-তান' কথাটির মানে হচ্ছে —হিন্দুস্থানের বজ্রগর্ভ প্রভাত; এবং এই অর্থে ঠাকুর কবি হলেন হিন্দুস্থান আর চীনস্থানের সম্মিলিত সংস্কৃতির প্রতীক —বজ্রগর্ভ উদয় সবিতা'। গবেষণা করে এই নাম বের করেছিলেন

ডক্টর লিয়াঙ-চি-চাও। একটি দামী পাথরে এই অক্ষর তিনটি খোদাই করিয়ে কবিকে দেওয়া হলো। উৎসবের শেষে কবির ইংরেজী 'চিত্রা' অভিনয় হয়। কবি ধুতিপাঞ্জাবী পরে বাঙ্গালী সেজে রঙ্গমঞ্চে বসলেন। কবির পাশে ছিলেন চীনের বিখ্যাত নট মাইলন-ফাঙ। এর পরে 'চিত্রা' নাটক সম্পর্কে কবি ভূমিকা করলেন। নাট্যভূমিকায় চীনা তরুণ-তরুণীরাই নেমেছিল। চীনাদের ভারতীয় ড্রেস করে দিলুম আমি। ওদের ছোট চোখের জন্যে একটু অসুবিধে হয়েছিল। ওরা শেষে কিন্তু দেখতে হলো মণিপুরীদের মতন। যুবতী চীনে মেয়ে একটি —মিস্ লিন্ চিত্রাঙ্গদার পার্ট নিলে। পরে মেয়েটি সময়ে সময়ে থাকতো কবির কাছে। এন্টারটেন্ করতো। কবিও খুশি হতেন খুব তাকে দেখে।

'উৎসব-শেষে চীনা ভক্তরা কবিকে পনেরো-ষোলখানি উৎকৃষ্ট ছবি, একটি চীনেমাটির সহস্রপুষ্প পেয়ালা, আর অন্য অনেক রকম সামগ্রী উপহার দিলেন। আমরা কবিকে শ্রদ্ধা-সংবর্ধনা করলুম। ক্ষিতিবাবু শ্লোক পড়লেন। কালিদাসবাবু কবিতা পড়লেন। আমি ছবি উপহার দিলুম।'

আচার্য নন্দলাল এই ২৫এ বৈশাখের বিবরণ লিখেছিলেন একখানি পত্রে। তিনি লিখেছিলেন, —আমরা ভারতীয় তিনজন আমাদের এবং আমাদের দেশবাসীর হয়ে গুরুদেবের চৌষট্টিতম জন্মদিন পালন করলুম।

৯ই মে পেকিঙের চেন কোয়াঙ থিয়েটারে কবি ভাষণ দিলেন। এর ক-দিন পরে কবি ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্যে পেকিঙের কাছাকাছি ২০ মাইল দূরে পশ্চিম-পাহাড়ে গেলেন বিশ্রাম করতে। কবির সঙ্গীরা এই সময়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থান এবং চীনা বৌদ্ধ-শিল্পের কেন্দ্র পরিদর্শন করতে গেলেন। অধ্যাপক লী চী হলেন ওঁদের গাইড আর দোভাষী ভাষ্যকার। ভ্রমণ করেছিলেন আরামে। প্রাইভেট গাড়িতেই খাবার ঘর, শোবার ঘর, রান্নার ঘর ছিল। ঠাকুর চাকরও পেয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল মিলিটারী গার্ড! …পেকিঙ থেকে পশ্চিমে প্রায় ন-শো মাইল দূরে ওঁরা লো-ইয়াঙ পৌঁছুলেন। লো ইয়াঙ হলো আসল পুরানো চীনা শহর। কেউ এখানে ইংরেজী বলে না, বোঝেও না। …এখান থেকে ওঁরা গেলেন লাঙ-মেন-এ। এর দু-দিক ঘেরা য়ী-নদী। ওখানে রয়েছে হাজার-হাজার গুহামন্দির, আর প্রত্যেকটিতে রয়েছে বৌদ্ধ চৈত্য আর মূর্তি। দু-হাজার বছর

পূর্বের মানুষের পূজা আর ভক্তির নিদর্শনরূপে। ওঁরা কয়েকটি মন্দিরে ধূপ জ্বালিয়ে দিলেন। ...এরপরে ও৺রা পাইমাসৃসু দেখলেন। পাইমাসৃসু মঠ হলো 'শ্বেত অশ্বের মঠ'। এইখানেই দু-হাজার বছর আগে বৌদ্ধধর্ম প্রথম প্রচারিত হয়ে ভারতের বাণী শুনিয়েছিল।

১৮ই মে পেকিঙে কবি ফিরে এলেন পশ্চিম-পাহাড় থেকে। ১৮ই ন্যাশন্যাল য়্যুনিভার্সিটিতে কবির বিদায়-সভা হলো। কবি বিশ্বমৈত্রী প্রচারে তাঁর ব্যর্থতার বিষয়ে উল্লেখ করে ভাষণ দিলেন। ডক্টর হু-সী দিলেন প্রতিভাষণ। চার সপ্তাহ পেকিঙে বাস হলো। পেকিঙ ত্যাগের আগের দিন ১৯-এ মে ইন্টার ন্যাশন্যাল ইন্স্টিটিউট-এর তত্ত্বাবধানে কবির শেষ বক্তৃতা হলো। এই সম্মেলনে ন-টি ধর্মের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ জাতীয় পোশাক পরে মঞ্চে বসেছিলেন। সন্ধ্যায় মাইলন ফাঙের নৃত্যের ব্যবস্থা হয়। তিনি তাঁর বিখ্যাত Goddess of the Lo River নৃত্যটি দেখান। এই অনুষ্ঠানের পরের দিন কবি সদলে পেকিঙ ছাড়লেন।

'পেকিঙ থেকে সান্‌সীর পথে পশ্চিম-পাহাড় দেখলুম। অতি সুন্দর পাহাড়। বুদ্ধের মূর্তি —রিলিফের কাজে রয়েছে অনেক। গাছ-পালা বেশি নাই। বেশি উঁচুও নয়। হ্যাঙচাউএর মতো কবি আর দার্শনিকদের লোভনীয় স্থান। খুব ভালো লাগলো আমাদের। গুরুদেবকে বললুম, —এখানে মরে গেলেও ভালো হতো। আমার কথা শুনে গুরুদেব বললেন, —'ভালো-লাগার এর চেয়ে ভালো উপমা আর নাই। ভালো লাগলে 'মরি' 'মরি' বলে থাকে আমাদের বৈষ্ণব পদে'।

'শান-সীর রাজধানী তাই-য়ুআন পৌঁছনো গেল। সান-সীর চীনে গভর্নর ইয়েন সী সান ছিলেন কঙফুৎসু মতের আদর্শ শাসক। ছবি আছে তাঁর শান্তিনিকেতন-কলাভবনে। আমাদের নেমন্তন্ন করলেন। তিনি আমাদের শ্রীনিকেতনের আদর্শের ভক্ত ছিলেন। প্রজার হিতসাধনাই ছিল তাঁর আদর্শ। আমরা প্যালেসে পেঁাছলুম সন্ধ্যাবেলা। গেট্ থেকে প্যালেস — সারিবন্দী লোক আর চীনে লণ্ঠনের বাহার দেখতে অপূর্ব হয়েছিল। ...বড়ো লোক গেলে দেশ-শাসনের নীতি জিজ্ঞাসা করা ওঁদের প্রথা। এই গভর্নরের প্রশ্নের উত্তরে গুরুদেব বললেন, ভারতবর্ষের রামরাজত্বের আদর্শের কথা।...সেই প্রথম শেরী খেলুম। খেলুম খুব চমৎকার। লাল রঙের

শেরী আর খাবার। খাবার টেবিলেই গুরুদেবকে দেশ-শাসনের নীতি জিজ্ঞাসা করলেন গভর্নর। গুরুদেব শেরী খেলেন কিনা জানবার কৌতূহল হলো; তিনি যেন খাচ্ছিলেন বলেই মনে হলো। কৌতূহল নিবৃত্ত করবার জন্যে জনান্তিকে আমাকে বললেন, —'মদ টাচ করেছি; কিন্তু খেয়েছি কিনা, আমার গোঁফ-দাড়ির আড়ালে তোমরা বুঝবে কি করে? ডিম খাওয়া হলো। পুরাতন ডিম। দু-তিন শো বছরের পুরানো পায়রার ডিম। নুন দিয়ে জারিয়ে রাখে। সেই ডিম খেতে দেওয়া বিশেষ সম্মানের ব্যাপার। সূপ দিলে এক কাপ করে। পাহাড়ের গায়ে পাখীর বাসার …সূপ। সে বাসা পাখীর লালা দিয়ে তৈরি। লালা জমে দেখতে হয় সাবু-দানার মতন। —সে সূপ ভাগ্যবানে খায়। আমাদের খেতে দিলে। আমাদের টেবিলে বসিয়ে দিয়ে গেল এক-একটা বাটীতে করে এক এক রকমের সূপ, এর সঙ্গে চিকেন সূপ, মাটন্ সূপ —এই সব। খাবার প্রথায় এঁটো নাই ওদের দেশে। 'জগন্নাথের দেশ' —বললুম আমি। আবার পথের পাশে দুর্গন্ধ পেয়ে 'গন্ধবিলাসিনীর দেশ' —বললেন ক্ষিতিবাবু।

সান-সীর পরে, ওখান থেকে ওঁরা গেলেন চীনের মধ্যস্থলে, ইয়াংসের ওপর আর হান নদীর মোহনায় হ্যাঙ্কাও। চীনের জাতীয় কুওমিন্‌টাঙ সরকার পুনর্গঠিত হবার পরে, ক্যানটন থেকে রাজধানী ১৯২৭ সালে হ্যাঙ্কাও চলে আসে। চিয়াঙ-কাই-সেকের নেতৃত্বে পরে রাজধানী হয়েছিল নানকিঙ। ‥হ্যাংকাও থেকে ৫৮৫ মাইল নদীপথে স্টিমার-যোগে সাংহাই ফিরে এলেন ২৮-এ মে। এখানে বিদায়-সংবর্ধনা দেওয়া হলো মিস্টার কারসন চাঙের বাড়িতে। পরদিন সাংহাই ত্যাগ করলেন। সেদিন সকাল থেকে নানা প্রতিষ্ঠান আর সম্প্রদায় মিলে বিদায়-সভা আহ্বান করলেন — জাপানী, চীনা, পার্সী, সিন্ধী, ভারতীয় মুসলমান সকলেই উপস্থিত। কবি সেখানে তাঁর শেষ বিদায়-সম্ভাষণ দিলেন। এবং সেইদিনেই নন্দলাল, কালিদাস নাগ আর এলম্‌হার্স্ট'কে সঙ্গে নিয়ে কবি জাপান যাত্রা করলেন। ক্ষিতিমোহনবাবু জাপানে কোয়াসান বৌদ্ধমঠে যাবেন বলে, আর এর মধ্যে চীনা পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার উদ্দেশ্যে

কিছুকাল চীনে থেকে, পরে জাপানে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে মিলিত হবেন। পেকিঙ ও সাংহাই থেকে আচার্য নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথকে ও রামানন্দবাবুকে তাঁর চীনভ্রমণ প্রসঙ্গে একাধিক পত্র লিখেছিলেন। রামানন্দবাবুকে লেখা (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩১, পৃ ৭৮৪-৮৭) একখানি পত্র এই—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাকে পিকিং হ'তে পত্র দিয়েছি ও কতকগুলি পিকিঙের দৃশ্য পাঠিয়েছি। পেলেন কি না জানি না। পিকিং বেশ পুরাতন শহর, তবে বড় শুক্‌না, মরুভূমির নিকট রাত-দিন ধূলা; এখানকার আর্টিস্টরা কি করে কাজ করে ভেবে অস্থির হয়েছি। দক্ষিণ চীনে বেশ সরস বড়-বড় নদী গঙ্গার মত, চতুর্দিক সবুজ পাহাড়। খোঁজ নিয়ে জানলুম দক্ষিণেই বড় বড় আর্টিস্ট জন্মেছেন। পিকিঙে কতকগুলি আর্টিস্টের সঙ্গে দেখা হলো —দুই একজন ভাল আর্টিস্ট আছেন, তাঁরা পাগল। আর্টিস্ট কারো সঙ্গে বেশি কথা বলেন না, যদিও বা অনেক কষ্টে কথা কওয়ান যায়, সে যা-কথা দোভাষীরাও বুঝে না; ইসারায় যা বোঝা গেল —পাগলামি চাই ও হাতেরও কসরৎ চাই। তবে বেশির ভাগ আর্টিস্ট কসরৎই করেন। এরা আর্টিস্ট্‌দের এই কয় ভাগে ভাগ করেছেন—

(১) আর্টিস্ট্ কারিগর, ইহারা বহু পুরাতন; হাতের অদ্ভুত কুশলতা দেখিয়ে আসছে।

(২) পাগ্‌লা আর্টিস্ট —এরা cultured, বড় সাধু, বড় সেনাপতি, বড় বাদশাহ, বড় ফকির; এদের পয়সার বা নামের জন্য ভাবতে হয় না। এরা খেয়ালী লোক।

(৩) অ-পাগল (sane) আর্টিস্ট বা পেশাদার আর্টিস্ট্ —এরা শিল্পে দক্ষ, শিল্পের আইন-কানুন জানে, কখন কখন এরাও পাগলা আর্টিস্টের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। এরা বড় লোক, বাদশাহ প্রভৃতির অধীনে থেকে কাজ করে।

(৪) চোর আর্টিস্ট্।

(৫) পোটো।

প্রথম নম্বর আর্টিস্টরা শিল্পের যুগ বদলে দেন। আর এদের ছবি নকল করা যায় না। দ্বিতীয়-তৃতীয় নম্বর আর্টিস্টদের ছবি নকল করা

যেতেও পারে। চতুর্থ নম্বর আর্টিস্টরা দ্বিতীয়-তৃতীয় নম্বর আর্টিস্টদের ছবি নকল করে, জাল করে, কেবল মাত্র পয়সার জন্যে। পাঁচ নম্বর পোটো চিরকালই আছে।

একজন আর্টিস্ট একটি কাগজে তাঁর বক্তব্য কিছু লিখে দিয়েছেন। চীনা ভাষায় লেখা অনুবাদ করবার চেস্টা করছি।

গুরুদেব যে মৈত্রীর কথা বলতে আজ চীনে এসেছেন, এরা তাতে কর্ণপাতও করে না, একেবারে গোঁয়ারগোবিন্দ হয়ে বসে আছে। এরা মিটিং, লেক্‌চার ইত্যাদি বড়ো ভালবাসে। সুরেন বাঁড়ুয্যে বা বিপিন পালরা এখানে এসে বেশ তোলপাড় করতে পারতেন। যাক শীঘ্র-শীঘ্র ঘরে ফিরলে বাঁচি; গুরুদেবের কতকগুলো ভাল-ভাব লেখা হয়ে গেল। সেই সকলের লাভ; আর্ট সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা করে লিখেছেন; আপনারা সেখানে বসেই সব দেখবেন।

১১ই এপ্রিল চীনে এসেছি, আর আজ ৩০শে মে সাংহাই এলুম — প্রায় দেড় মাস এখানে কাটল। তুলি রং কিছু কিছু কিনেছি। ফিরবার মুখে হাঙ্কাও হতে ইয়াংসিকিয়াং নদী ধরে সাংহাই-এ এসেছি। প্রায় ৪০০ মাইল পথ। শরীর আর বয় না। নদীগুলো বেশ সুন্দর, যেন পদ্মানদী দিয়ে আসছি। দুধারে ধান ও যবের ক্ষেত, আর সবুজ পাহাড়।

৩১শে নাগাদ জাপান যাত্রা করব। জাপানে দশ-পনর দিন অথবা একমাস থাকা হবে ঠিক নেই। পরে পত্র দ্বারা জানাব। জাপানে জিনিসপত্র বড় মাগগি। তাই এখান হ'তে সব ক্রয় করলাম। সিল্ক সস্তা নয়, কলকাতা হ'তে বেশি দাম; তবে অল্প নমুনার মত নিয়েছি।

প্রকাণ্ড দেশ। বড অরাজক। এক প্রদেশ আর-এক প্রদেশের ধার ধারে না। কিন্তু যে-যে প্রদেশের ভিতর দিয়ে গুরুদেব যাচ্ছেন, তারা সৈন্যপাহারা, স্পেশ্যাল ট্রেন, থাকায় বন্দোবস্ত, সব করছে, এবং বাদশাহের মত খাতির করছে — যেন চীনের বাদশাহ তাঁর গভর্নরদের দেখতে এসেছেন।

কতকগুলি লোকের সঙ্গে পিকিঙে দেখা হলো — বেশ বুঝ্‌দার, তারা একটু মাথা ঘামাচ্ছে। জাপানের লোকেরা যদি বুঝেসুঝে তবেই কিছুদিন থাকা হবে; কিন্তু তা না হলে শীগ্‌গির জাল গুটানো হবে।

এখানে যে-সব কারুকার্য হতো তা সব হু-হু করে মরে আসৃচে। এদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দেখছি মাথাটা ঠিক করাই আগে দরকার। হাতের কারিগরিতে মাথা তৈয়ার হলে অন্যও হবে। লোকে যে-সব বাড়ি ইত্যাদি আজকাল তৈয়ার করছে সব বিলাতী ধাঁচের। পুরাতন চিত্রকলায় পারস্পেকটিভ নেই বলে এরা লজ্জিত, বড় decorative বলে নিজেদের অসভ্য মনে করছে, 'সিম্পল' হবার চেষ্টা করছে। বিলাত হতে আর্টিস্ট্ এসে শেখাচ্ছে, এবং বেশ সভ্য করছে।

'মেয়েরা ঘোড়তোলা জুতা পরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে —লোহার জুতা ছেড়েই ঘোড়তোলা জুতা পরেছে।

'দু-একজন নতুন ধরনের কবি হচ্ছেন, তাঁরা চাঁদ দেখলে ক্ষেপে ওঠেন, কোন সুন্দর জিনিস দেখলে চেঁচিয়ে ওঠেন, এবং তৎক্ষণাৎ ইংরেজীতে একটা কবিতা লিখে ফেলেন। কয়েকজন পুরাতন কবিও আছেন, তাঁরা খুব বড় কবিও বটেন, তবে নূতন ঢল্লায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

'এরা এখনও যা হাতের কাজ করে দেখলে অবাক হতে হয়। কাজটাই এদের ধর্ম —একটু অবকাশ নেই, মাথা গুঁজে কাজ করছেই, —দেখলেই প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

॥ জাপানের শিল্পী-সমাজে, ১৯২৪ ॥

'চীন থেকে আমরা জপানে গেলুম। চীনের সাংহাই বন্দর থেকে জাপানের কোবে বন্দরে পৌঁছানো গেল। কোবে-টেগোর-সোসাইটি নিমন্ত্রণ করে কবিকে ও আমাদের নিয়ে গেলেন। খরচ-খরচার সব ব্যবস্থা তাঁরাই করলেন। নিয়ে গেলেন সংবর্ধনা করবার জন্যে। সোসাইটির পাণ্ডা হলেন বড়ো একজন জাপানী মার্চেন্ট্ —সিন্দা কোম্পানীর মিংসুভূষণ। বেশি টাকা তুলে দিয়েছিলেন ইনিই। কোবের ভারতীয় সদাগরেরাও অনেক কন্ট্রিবিউট্ করলেন। এঁদের একজন হলেন গুজরাটী মুসলমান —বড়ো কারবারী —নাম হলো কাদেরী খোজা। তিনিও টাকা দিয়েছেলেন অনেক। —এইভাবে ফাণ্ড্ সংগ্রহ করে ওঁরা আমাদের

জাপানে নিয়ে গেলেন।

'কোবে থেকে গেলুম নাগাসাকি —জাহাজে করে। সানো সান শান্তিনিকেতনে জুজুৎসু শেখাতেন ১৯০৫ সালে। ইনি এলেন দেখা করতে। সানো সান পরে গুরুদেবের 'গোরা' অনুবাদ করেছিলেন জাপানী ভাষায়। নাগাসাকিতে ইনি এলেন আমাদের রিসিভ করতে জাহাজেই। সানো সান ও আরো ক-জন রইলেন আমাদের সঙ্গেই।

'নাগাসাকি থেকে আমরা টোকিও গেলুম মোটরে। রাস্তায় সুন্দর বহু জিনিস দেখতে দেখতে চলেছি। গ্রাম থেকে একটা গরুর গাড়ি আসছিল। আমাদের মোটরের সামনে পড়লো। আমাদের ড্রাইভার গাড়ি থামালে। গ্রামের গরুর গাড়ি বেরিয়ে গেল। আমাদের ড্রাইভার গ্রামের গাড়োয়ানের কাছে ক্ষমা চাইলে: কারণ তার একটু অসুবিধে ঘটেছে, আমাদের গাড়িটা তার সামনে পড়েছিল বলে; তারপর আবার চললো। সব দেখে গুরুদেব বললেন, —'দেখ, এটিকেট্ দেখ। আমাদের ড্রাইভার নমস্কার করলে, ক্ষমা চাইলে গ্রামের গাড়োয়ানের কাছে। ওদের ছোট বড়ো নেই, সকলেই সকলকে রেস্‌পেক্ট করে।' ···গাছে গাছে লাকার্ট ফল পেকে আছে। মোটা কাগজের ঠোঙ্গায় করে করে সব বেঁধে রেখেছে। পাখিতে পাছে খেয়ে যায় সেইজন্যে।

'বরাবর গেলুম মোটরে। মোটর থেকে নেমে ট্রেনে শহরে যেতে হলো। ট্রেনে ব্যবস্থা সে বলবার মতন। সব ক্লাসেই গদী-আঁটা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। যাচ্ছি। রাস্তার দু-পাশের বিধ্বস্ত বিস্তৃত এলাকায় শ্রমিকরা কাজ করছে নিঃশব্দে। তখন সেই জাপানী ভূমিকম্পে দেশটা যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। এখানে মাটি, ওখানে বালির স্তূপে ভরতি ছিল সব। সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে গুরুদেব মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করলেন, —'দেখ, জাতটা কেমন উইয়ের মতো তাদের ভাঙ্গা ঘর সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করে নিচ্ছে, মুখে কোনও হা-হুতাশ না করে।'

'এলম্‌হার্স্ট উঠতে বসতে সব সময়ে গুরুদেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী। সে কেমন জানো? 'Where is my key ?' —জিজ্ঞাসা করলেন গুরুদেব। আর অম্‌নি এলম্‌হার্স্ট বুঝে নিলেন সঙ্কেতটা; গুরুদেব বাথরুমে যাবেন। —এ-সব সঙ্কেত ছিল ওঁদের নিজস্ব। শুধু লেখাপড়ার নয়,

কবির শরীর সম্পর্কেও যাবতীয় খবরদারি সব সময়ে তাঁকে করতে হয়। —এই ভাবেই চলেছে।

'টোকিওতে যাবার পথে ট্রেনে আমাদের কামরায় আমি বসে আছি। সহসা এলম্‌হার্স্ট ইঙ্গিতে আমাকে ডাকলেন, —একটা জিনিস দেখবে, এসো'। —তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখি কি, একজন লোক বসে রয়েছে। এলমহার্স্ট বললেন —'রাসবিহারী বসু'। —কথা কইছেন তিনি গুরুদেবের সঙ্গে গভীরভাবে। টোকিও পৌঁছবার আগেই মাঝপথে তাঁকে দেখলুম।

'টোকিওতে নেমেই দেখি না আরাই কাম্পো এসেছেন! 'বিচিত্রা'র বন্ধু আমার। এসেছিলেন তিনি কবিকে অভ্যর্থনা করতে। আমি যে কবির সঙ্গে যাব তিনি তা আশা করেননি। আমাকে দেখেই তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। কাম্পো এসেছেন অভ্যর্থনা করতে, আর এসেছেন সামামুরা খানজাম। সামামুরা হলেন তখনকার জাপানের একজন বড়ো আর্টিস্ট্। তিনিও এসেছেন। আমাকে দেখে আবাই কাম্পো উচ্ছ্বসিত হলেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে পিঠে দমাদম কিল মারতে লাগলেন। দেখে গুরুদেব বললেন, —'একী আদর হে মেরে ফেলবে যে!' এদিকে সামামুরা স্টেশনে প্রথম অভ্যর্থনায় গুরুদেবের মুখে মুখ দিয়ে ক্রমাগত চুমো খেতে লাগলেন; আর অসীম ধৈর্যে গুরুদেবকে সে-অত্যাচার সহ্য করতে হলো। আর আমার পিঠে আরাই-এর সেই দমাদম কিল।

'টোকিওতে নামবার পরে প্রেস-রিপোর্টাররা গুরুদেবকে আগ্রহভরে দেখতে দেখতে আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলে গেল অনেক দূর পর্যন্ত। এলম্‌হার্স্ট তাড়াতাড়ি গিয়ে ভিড়ের চাপ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন তাঁকে যথাস্থানে।

'সাংহাই থেকে জাপানে আসবার সময়ে জাহাজে উড়ো-জাহাজের একজন পাইলট আসছিলেন আমাদের সঙ্গে। লণ্ডন থেকে জাপান —কোথাও না-থেমে তিনি জাহাজ চালানোর রেকর্ড করেন। তাঁকেই ওরা সংবর্ধনা জানিয়েছিল সাড়ম্বরে সভা করে। বেশি খাতির করেছিল তাঁকে আমাদের গুরুদেবের চেয়েও। এই যুগে বিজ্ঞানীর খাতির বেশি হলো পোয়েটের চেয়ে। মেটিরিয়েলিস্ট — বাস্তববাদী হয়ে গেছে জগৎ।

কবি ঋষিতুল্য লোক। সে-সম্মান ওরা দিলে কই? সেই পাইলট্ আমাদের সেই জাহাজেই ছিল। বৈজ্ঞানিক হলেও তাঁর স্বভাবচরিত্র দেখলুম অত্যন্ত দুর্নীতিপূর্ণ। মদ খাচ্ছে, মেয়ে তুলে নিচ্ছে। সেদিকে সমাজের লক্ষ্য নাই। বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের দিকে বেশি ঝোঁক দিয়েছে চরিত্রের উৎকর্ষের চেয়ে। ...তখনই বুঝলুম, জাতটা অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। মনে হলো ওকাকুরার কথা। —জপান upstart জাত।

'জাপানে সান ইয়াৎ সেন টেলিগ্রাম করে জানালেন, —জাপান থেকে যখন ফিরবেন, তখন ক্যানটন হয়ে যাবেন অবশ্যই। গুরুদেবকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। যাবার ব্যবস্থা হবে উড়োজাহাজে —সে তিনিই পাঠিয়ে দেবেন।... কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই শোনা গেল, সান ইয়াৎ সেন মারা গেছেন। মারা গেছেন brain fever হয়ে। —জাপানে একমাস ছিলুম আমরা, চীনে দু-মাস।

'জাপানী মার্চেন্ট মিৎসুভূষণের গ্রামের বাড়ি ছিল টোকিওর কাছাকাছি। তিনিই প্রধান উদ্যোক্তা হয়ে নিয়ে গেলেন আমাদের তাঁর গ্রামের বাড়িতে। বিশেষ ধরনের বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। সকলেই উঠলুম তাঁর সেই বাড়িতে। খুবরি খুবরি ঘর কাঠের তৈরি। মিৎসুভূষণের বাড়িতে গুরুদেব দলবল নিয়ে প্রথম উঠলেন। গুরুদেব ওখানে পৌঁছবার আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন রাসবিহারী বসু। তিনি ওখানে গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করলেন মালাচন্দন দিয়ে।

'আমাদের মালপত্তর সব ঠিক এসে গেল। মিৎসুভূষণের কাঠের খুবরি খুবরি ঘর। একদিকে বাথরুম লাইন-করা। তার আবার দরজা বড়ো অদ্ভুত। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করবার ছিটকিনি নাই। ওখানে মজার ঘটনা হলো একটা। খুব সকালে উঠতুম আমি। উঠে শৌচে গেছি। সম্পূর্ণ নিরপরাধ।... সকালে চায়ের টেবিলে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হতে গম্ভীর হয়ে বললেন তিনি, —'ছিটকিনি দাওনি তুমি বাথরুমে গিছলে!'

'সানো সান বরাবর ছিলেন আমাদের সঙ্গে। ১৯১৬ সালে তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনে। তিনি ছিলেন জুজুৎসু-শিক্ষক। আমরা যখন জাপানে যাই তখন 'গোরা' অনুবাদ করছিলেন তিনি জপানী ভাষায়। তাঁর বাড়িতেও ছিলুম আমরা। দিন কতক থাকতেই সে বাড়িতে গুরুদেবের

অসুবিধে হতে লাগলো। আমাকে সানো সান বললেন, —'গোরা'র জন্যে ছবি চাই। এঁকে দিলুম 'বাউল', আর একটা বোধহয় 'পদ্মার চর'। তবে তাঁর সে-ছবি আঁকিয়ে নেবার যে-ব্যবস্থা সে-ও বড়ো নতুন ঠেকলো। তাঁর বাড়িতে আছি। ছবি এঁকে দিতে বললেন। শুধু বলা নয়, ছোট্ট কুঠরি দিলেন একখানা। তুলি, রং, আর যা যা দরকার সব সে-ঘরে সাজিয়ে দিয়ে বললেন, —একলা একলা বসে আঁকুন। একলা বসেই ছবি আঁকলুম। বুঝলুম, আর্টিস্টদের কাজ করতে দিতে হয় কি করে সে-পদ্ধতি ভালোমতেই জানা আছে তাঁর। আমার ছবি আঁকা হয়ে গেল। খানিক বাদে তিনি এসে ছবি নিয়ে গেলেন।...ওদেশের সবাই আর্ট সম্পর্কে কিছু না কিছু জানে। রসবোধ আছে খুব। আর্টের ব্যাপারে অল্পবিস্তর সবাই অভিজ্ঞ।

'কাম্পো আরাই তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন আমাকে। তাঁর বাড়িতে আমি গেলুম একা। গেলুম অবশ্য গুরুদেবের অনুমতি নিয়েই। পার্টি রয়ে গেল টোকিওতে গুরুদেবের সঙ্গে ইম্পীরিয়েল হোটেলে। দু-একদিন বাদে শুনলুম, ক্ষিতিমোহন বাবুকে গুরুদেব পাঠিয়েছেন কোয়াসানে একটি বৌদ্ধ মনাস্টারীতে। বৌদ্ধ পুঁথিপত্র, ওদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি —এই সব ভালো করে খুঁজে পেতে দেখবার আর নোট করবার জন্যে। উনি কিছুদিন সেখানে থেকে চলে এসেছেন। কিন্তু তাঁর ফেরার খবর গুরুদেব বোধহয় জানতেন না।...মনাস্টারী থেকে একজন সাধু দেখা করতে এলেন গুরুদেবের সঙ্গে। গুরুদেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, —'আমাদের সাধু ওখানে গিয়ে কেমন কাজ করছেন'? সাধু তাঁকে বললেন, —'তিনি তো চলে এসেছেন।' শুনে গুরুদেব চুপ করে রইলেন।

'কোবেতে মার্চেন্ট খোজা বাদেরী ক-দিন তাঁর বাড়িতে রাখলেন গুরুদেবকে। আমরাও গেলুম সেখানে। রাখলে খুব যত্ন-আত্তি করে। সেবা সে অদ্ভুত রকম। এমন অতিথিসেবা দেখিনি কখনও। রাত্রে গুরুদেবের খাওয়া-দাওয়া যতক্ষণ না সারা হতো ততক্ষণ, ঠায় হাজির থেকে দেখাশোনা করা, আঁচিয়ে জল ফেলার জন্যে বাটা তুলে ধরা — এই সব দেখে ঠিকঠাক করে, গুরুদেবকে শুইয়ে তবে তিনি নিজে যেতেন খেতে শুতে। আবার সেই ভোরে গরম জল দেওয়া গুরুদেবের প্রাতঃকৃত্যের

জন্যে —আর সে নিজের হাতে বয়ে আনা থেকে শুরু করে চলতো তাঁর অনন্যপরায়ণ সেবা। খাবার টেবিলে নিজের হাতে জল ঢেলে গুরুদেবকে আচমন না করাতে পারলে তাঁর সোয়াস্তি হতো না যেন কিছুতেই। গুরুদেবের সব সেবা সেরে তবে যেতেন তিনি।

'কাদেরীর ঘরে একটা ঘটনা হলো। বড়ো করুণ সে ঘটনা; আসবার মুখে। সেবা যতটা সাধ্য কাদেরী করেছেন গুরুদেবের। যখন চলে আসবেন গুরুদেব, কাদেরী প্রণাম করলেন গুরুদেবকে। হাত জোড় করে বলতে লাগলেন, —'আপনার আশীর্বাদে আমার ছেলেটি ভালো হয়ে গেছে।' —মুখে ফুটে উঠলো তাঁর একান্ত-নির্ভরতার স্নিগ্ধ প্রশান্তি! অতিথি, —গুরুদেবের মতো অতিথি, সাক্ষাৎ দেবতা যে! —'হাম হয়ে লাট খেয়ে গিয়েছিল,' —বললেন কাদেরী। গুরুদেব শুনে বিস্মিত হলেন। —'কেন বলনি আমাকে, আমি ভালো হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, আমি ওষুধ দিয়ে সাহায্য করতে পারতুম!' তবে গুরুদেবের ওষুধের প্রয়োজন হয়নি তার। আশীর্বাদেই সেরে গেছে —এই বিশ্বাস পাকা ছিল কাদেরীর। …ঘটনা শুনে আমার কি মনে পড়লো জানো? সেই চার-শো বছর আগেকার একটি ঘটনা। —শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীর্তন জমে উঠেছিল যখন। কীর্তনে ব্যাঘাত হবে বলে ছেলের মৃত্যু-খবর দেননি তিনি মহাপ্রভুকে। —ভারতীয় আতিথেয়তার কি তুলনা আছে হে? কাদেরী ছিলেন হিন্দু থেকে কন্ভারটেড ভারতীয় খোজা মুসলমান। সংস্কারে পুরাপুরি হিন্দু।

'ওখানকার ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টদের সার্ভেন্ট, মেড্ সার্ভেন্ট সব জাপানীজ। ইণ্ডিয়ানরা কিন্তু জাপানে গিয়ে সেখানকার চাকরবাকরদের প্রতি দরদ দিয়ে ব্যবহার করতো না। প্রকৃত চাকরবাকরদের মতোই দেখতো। কিন্তু জাপানীরা এতে বড়ো কুণ্ঠিত হতো।

'আর একটা ঘটনা হলো কাদেরীর বাড়িতে। সে আমার জীবনের অবিস্মরণীয় ঘটনা। রাসবিহারী বসু উপস্থিত সে বাড়িতে এসে। এসে প্রণাম করলেন গুরুদেবকে। অনেক কথা হলো তাঁর সঙ্গে। জাপানী স্ত্রী ছিল তাঁর —সে-কথা পরে বলছি। রাসবিহারীর গড়ন ছিল বেঁটে, ময়লা।

কিন্তু যেন ভিন্ন রকমের চেহারা। চোখ-মুখ দিয়ে যেন প্রতিভা ঠিকরে বের হচ্ছে। কথা বলতেন তাড়াতাড়ি —খুব দ্রুত। আমি প্রণাম করলুম তাঁকে। আমাকে বললেন তিনি, —'গুরুদেবের ব্যবহার-করা একটা জোব্বা, এক জোড়া জুতো, একটা টুপি চেয়ে নিয়ে প্যাক্ করে রেখে দেবে। রাখলুম আমি সব ঠিক্ করে। আর একদিন এসে তিনি সেই প্যাকেট্‌টা নিয়ে গেলেন টক্ করে। স্মৃতি সংগ্রহ করে রাখলেন আর-কি। মহাপুরুষের স্মৃতি মনে বল যোগাবে তাঁর।

'রাসবিহারী বাবুকে বললুম একদিন, আপনার বাড়িতে নিয়ে চলুন। তিনি বললেন, —'কেন যাওয়া আমার বাড়ি? ফিরে গিয়ে দেশে বসবাস করতে হবে তো?' স্পষ্টবক্তা তিনি, তীক্ষ্ণধী। তাঁর বাড়ি গেলে, আমি চিহ্নিত হয়ে থাকবো; ফলে, দেশে ফিরে যাবার পরে আমার অসুবিধে ঘটাবে বৃটিশ সরকার, তা তিনি যেন প্রত্যক্ষ করলেন। ...দুঃখ ছিল, ক্ষোভ ছিল তাঁর মনে অপরিসীম। আর ছিল স্বদেশের প্রতি তাঁর করুণ স্মৃতিবিজড়িত অসীম মমতা।

'রাসবিহারীবাবু জাপানে আমাদের নানা সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কার্যকর ব্যবস্থা; সে-কথা পরে বলছি। ১৯১৫ সালের মে মাসে বিপ্লবী রাসবিহারী 'পি. এন. ঠাকুর' এই ছদ্মনাম নিয়ে, কবির আত্মীয় এই পরিচয় দিয়ে পাশ্‌পোর্ট যোগাড় করে বৃটিশ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে কলকাতা বন্দর ছেড়ে জাপানে গিয়েছিলেন।...

'১৯০৭-৮ সাল থেকেই তিনি উত্তর ভারতে বিপ্লবী নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ঐ সময়ে তিনি চাকরি করতেন সরকারী ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটুটে। তিনি চলে গিয়েছিলেন ভারতে বিপ্লব ফেঁসে যাবার পরে। দিল্লীতে বড়োলাট হার্ডিঞ্জের ওপর হাতীর হাওদা লক্ষ্য করে তিনি বোমা ছুঁড়েছিলেন। পরে আবার নিজে পাঞ্জাবী সেজে লেকচার দিয়েছিলেন। ...যাই হোক, তিনি জাপান গেলেন পালিয়ে পালিয়ে। কিন্তু, কি করে জানতে পারলো জাপানী ব্ল্যাগার্ড। তাদের একজনের সঙ্গে আলাপ হলো। জাপানে বৃটিশ স্পাই তখন ওঁকে ফলো করছে। একজন হিন্দুস্থানী স্পাই সে-খবর ওঁকে দিলো। তিনি বৃটিশ স্পাইটাকে মেরে ধরে শেষ করে দিলেন। তাকে শেষ করেই একটা রিক্সায় উঠলেন। বৃটিশ লিগেশন্

আর একফুট এগোলেই তাঁকে ধরবে। এমন নেটওয়াক করা ছিল। এমন সময়ে আর একজন রিক্সা-কুলি ওঁকে বাঁচিয়ে দিলে। জাপানী সেই ব্লাগার্ড লোকটি তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঘেরে রাখলে। লুকিয়ে রেখে দিলে ছ-মাস ধরে। তার মেয়ের সঙ্গে রাসবিহারীবাবুর বিবাহ দিলেন।...জাপানী জার্নালে লিখতেন তিনি। খুব ফ্লুয়েন্ট্ লেকচার দিতে পারতেন। জাপানী ভাষায় লেখায় বা বলায় তিনি খুবই দক্ষ ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম ছিল মাসাহিদে। তিনি পরে জাপানী সেনা-বাহিনীর একজন মেজর হয়ে ছিলেন। আজ (১৯২৮) বললেন, —'কোনো রকম করে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পার না আমাকে।' বলে, নিজেই বুঝতে পারলেন, ব্যর্থ আশা। তবুও চোখ তাঁর যেন জ্বলে উঠলো। বুঝলুম, কাতর হয়েছেন দেশে যাবার জন্যে।...এসেছিলেন তিনি সিঙ্গাপুরে। সে ইন্-চার্জ হয়ে জাপানী আজাদ হিন্দের'। ফার্স্ট কমাণ্ডার ছিলেন তিনি। তার পরে হলেন আমাদের সুভাষ।

'রাসবিহারীবাবু বললেন —'এক কাজ করবে। দেশে গিয়ে প্রতি বৎসর কিছু ছেলে পাঠিয়ে দেবে জাপানে, শিখতে।' আমার মুখে জিজ্ঞাসার ভাব দেখে তিনি বললেন, —'একটা স্বাধীন দেশ, দেখে যাবে আর-কি। হাতের কাজ নয়, কোনো কাজ নয়; কেবল দেখে যাবে। একটা স্বাধীন দেশ। একটা কোনো কাজের অছিলা করে এসে শুধু দেখে যাবে।' 'মেয়েদের পাঠাবো কি?' —জিজ্ঞাসা করলুম আমি। 'না, না, না। মেয়েদের পাঠিয়ো না। ওদের দ্বারা কিছু হবে না। সব কাজ ফাঁসে ওদের জন্যে।' —তখন চিটাগঙ্গ রেড্ কেস্ ফেঁসেছে কিনা, তাই মেয়েদের উপরে রাগ ছিল বোধহয় অতো। 'আর বাঙ্গালী ছেলে পাঠাবে। একটা বাঙ্গালী ছেলে পাঁচটা জাপানী ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। আর দু-জন করে পাঠাবে।' —আচ্ছা, তাই করবো, বললুম আমি।'

'শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে কিছুদিন পর থেকে বরাবর আমি ছেলে পাঠিয়েছি। প্রথম গেলেন (১৯৩০) আমাদের বিশ্বরূপ। তাঁর সঙ্গে গেল হরিহরণ —কলাভবনের মালাবারী ছাত্র। জাপানে তিন বছর ছিল বিশুরা। বিশ্বরূপ গেলেন রঙ্গিন উডব্লক, তুলি তৈরি আর

ছবি মাউন্ট্ করা শেখবার জন্যে। আর হরিহরণ গেলেন চীনে-মাটির কাজ শিখতে। যাঁর কাছে হরিহরণ সিরামিকের কাজ শিখতেন, থাকতেন তাঁরই ঘরে। এই পোর্সিলেনের অর্থাৎ কুমোরের কাজ শিখবার জন্যে গুরুর বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা হলো। সে-ব্যবস্থা করে দিলেন রাসবিহারী বাবু। তবে থাকার বদলে গুরুর বাড়ির কাজও করতে হবে। হরিহরণের কাজ ছিল, কাঠের বাড়ির পাটাতন ধোওয়া মাজা এই সব। কিন্তু বিরক্ত হতো সে খাটুনিতে। আমাকে চিঠি লিখলেন। আমি উত্তরে জানালুম —ভাগ্য ভালো তোমার, গুরুসেবা করবার সুযোগ পেয়েছো। —এই হলো আমাদের প্রাচীন ভারতের আদর্শ। —এ কথাটা তার জানা ছিল না। অথচ জাপানে ওটাই গুরুগৃহ-বাসের দক্ষিণান্তে-র রেওয়াজ। বাড়িতে ওরা চাকরবাকর রাখে না। ছাত্রছাত্রীকে কাজ দেয়। বিশেষ করে তাঁর বাড়িতে পুত্র কন্যা স্ত্রী ছাত্রছাত্রী সবাই কাজের জন্যে বেতনও পায়। গার্ডেনিং পোল্ট্রি ইত্যাদিতে যার যেমন কাজ সেই অনুপাতে বেতন পেয়ে থাকে। তাঁর বাড়িতেই খাওয়া-থাকা সব চলে।

'বিশ্বরূপকে একজন ধনী জাপানী ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকবার খাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন রাসবিহারীবাবু। জাপানে তখন এই-ভাবে ছাত্র রাখা বড়োলোকদের একটা কেতা ছিল। আমাদের দেশের সেকালের ধনী গেরস্তের মতন আর-কি।

'পরে রাসবিহারীবাবু 'Indian House' করে এদেশী ছাত্রদের সব থাকার খাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন নিজেই। ...এদের পরে আমাদের বিনোদ গেল, লেড়ু গেল, মণি সেন গেল। শেষ গেল কৃপাল সিং। কৃপাল এখন (১৯৫৫) জয়পুরে আর্টকলেজের অধ্যক্ষ। লেড়ু হলেন নেপাল বাবুর ভাইপো। লেড়ু, মণিসেন —এর পরে যারা সব গেছে তারা সবাই উঠেছে ঐ 'Indian House'-এ।

'রাসবিহারীবাবু বিনোদকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি রকম টাকা আছে সঙ্গে। অর্থাৎ যা এনেছ, তাতে চলবে কিনা। নিজেই খুঁটিয়ে হিসের ধরতে লাগলেন। সে বড়ো অভিজ্ঞ সংসারী হিসেব। কাপড় জামা থেকে শুরু করে ওখানে চলাফেরা সব নিয়ে খুঁটিনাটি হিসেব। —'আর টাকার দরকার থাকলে আমি দেব' —বিনোদকে সহজভাবেই সে-কথা

তিনি জানিয়ে দিলেন। আরও মজার সব হিসেব ধরলেন তিনি। চোখ ছিল তাঁর সব দিকে। কাপড়-চোপড়ের হিসেব, সিগারেটের হিসেব, মদের খরচের হিসেবও ধরলেন তিনি। আরও গুহ্য ব্যাপার। —'যেখানে সেখানে যেও না' —সাবধান করে দিলেন তিনি ছেলেদের। —'চার দিকেই লোক আছে আমার।' —এমনই বিচক্ষণ লোক ছিলেন রাসবিহারী বসু।

'জাপান থেকে ফিরে এসে বিনোদ বললেন রাসবিহারী বসুর কথা। বিনোদ একখানা Introduction letter চেয়েছিলেন রাসবিহারীবাবুর কাছে। ইচ্ছা তাঁর, জাপানী সব বড়ো আর্টিস্টদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবেন। বিনোদের কথাটা প্রথমে তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন 'আমার সঙ্গে কারো আলাপ-পরিচয় নাই' —এই বলে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, বা, তিনি চাইতেন, আমাদের দেশের ছেলেরা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াক। নিজে তিনি ছিলেন শক্ত লোক। তাঁর কথার মানে হলো এই, তুমি নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বড়ো হয়ে সব কর। কিন্তু তাঁর এই উত্তর শুনে আমাদের বিনোদ হতাশ ও বিরক্ত হয়ে বসে আছেন। দু চার দিন বাদে তিনি সহসা একখানা চিঠি পেলেন রাস-বিহারীবাবুর কাছ থেকে; টী-পার্টির নেমন্তন্ন তাঁর বাড়িতে। বিনোদ যাঁদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন তাঁদের সবাইকে নেমন্তন্ন করেছেন রাসবিহারীবাবু। আর তাঁর বাড়িতে চায়ের টেবিলেই তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি বিনোদের। চিঠি ও কার্ডও চেয়ে দিলেন। এই সব করার পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন বিনোদকে —'হলো তো। একজন একজন করে কোথায় যেতে সবার ঘরে ঘরে দেখা করতে? একসঙ্গে এখানে সবাইকে পেয়ে গেলে।' খুব প্রভাব ছিল ওখানে তাঁর। জাপানী পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন রাসবিহারীবাবু। তাই এত প্রতিপত্তি।

'রাসবিহারীবাবুর প্রসঙ্গ শেষ হলো। এখন আমাদের যে-কথা হচ্ছিল। — জাপানী গভর্নমেন্ট আমাদের সমস্ত পার্টিকে নিয়ে গেল নেমন্তন্ন করে একটি হোটেলে। সে-হোটেল একটি দ্বীপে। নাম হলো —ফু-কু-ওকা। যেতে হলো স্টিমারে করে। স্টিমারে করে গিয়ে পৌঁছলুম ফু-কু-ওকা দ্বীপে; উঠলুম হোটেলে। চমৎকার সেই কাঠের বাড়িটা জাপানী কায়দায়। দোতলা বাড়ি। সরকারী নিমন্ত্রণে উঠলুম গিয়ে সেখানে সন্ধ্যাবেলায়। জিনিসপত্র

যার যা এক একটা ঘরে রাখলো। আলাদা আলাদা ঘর দিলে সবাইকে। চা-টা যে যার আপনার নিজের ঘরেই খেলুম। আমাদের কাপড়-চোপড় চাইতে গ্রেড়ৈল্ দেওয়াল-আলমারির ভেতর থেকে সব বের করে দিলে। —আর জানিয়ে গেল সঙ্কেতটা, —'হাততালি' দিলেই সে আসবে।

'জাপানে যতদিন ছিলুম, ওঁরাই সঙ্গে ছিলেন সব সময়ে। জাপানের যত সব দেখবার জায়গা সমস্ত তাঁর সঙ্গেই ঘুরে ঘুরে দেখা হলো। ফু-কু-ওকার হোটেল থেকে আমরা কি-ও-টো গেলুম। কি-ও-টো শহরটাই দেখি মন্দিরে ভরা, আমাদের দেশের কাশীর মতন। City of Temples বলা হয় কি-ও-টো-কে। এক সময়ে জাপানের রাজধানী ছিল কি-ও-টো। কি ও-টো-তে শিল্পের নিদর্শন অনেক আছে পুরাকালের বৌদ্ধ আমলের। বুদ্ধের মূর্তি —ব্রোঞ্জের, কাঠের, মাটির —এই সব রয়েছে। সব চেয়ে নাকি বড়ো ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি আছে জাপানের এই কি-ও-টো-তে। আর প্রকাণ্ড সে তিরিশ ফুট উঁচু বুদ্ধের বসা মূর্তির ওপর কাঠের মন্দির। এক সময়ে আগুন লেগে ব্রোঞ্জের বুদ্ধের মাথাটা গলে যায়। আবার অবশ্য মেরামত করা হয়েছে। কি-ও-টো-র হিরিওজি মন্দির। কাঠের মন্দির। কাঠের দেওয়ালের ওপর ওপর মাটীর প্রলেপ দিয়ে —তোমরা যাকে বলো টেম্পারা' নাই করে, অজন্তার মতো ছবি আঁকা হয়েছে। দেখলেই মনে হয়, অজন্তার ছবি যেন। আমরা যখন দেখতে যাই তখন বর্ষাকাল। ড্যাম্প্ লাগবার ভয়ে তখন মন্দিরের ছবি —ফ্রেস্কো সব প্রোটেক্ট্ করছে। বড়ো বড়ো লেপ —গদির মতন করে ছবির ওপর এঁটে দিয়েছে জলো আবহাওয়া থেকে ছবি বাঁচাবার জন্যে। ভারতীয় আর্টিস্ট গেছি, আর গুরুদেবের সঙ্গে গেছি বলে, কিছুক্ষণের জন্যে লেপগুলো খুলে দিলে। আমরা ছবি দেখলুম।

'হিরিওজী মন্দিরের অজন্তা ফ্রেস্কোগুলো অতি যত্ন করে রেখেছিল ওরা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, হালে (১৯৫২-৫৩) সেগুলো পুড়ে গেছে। পুড়ে গেল অসাবধান শিল্পীদের পাল্লায় পড়ে। নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে ওরা ছবি নকল করছিল। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্যে আসনের নিচে heater রেখে ওরা কাজ করছিল। যাবার সময়ে ভুলে গেল সুইচ্ অফ করে দিয়ে যেতে। ফলে আর কি, আগুন ধরে সব পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল।

ছবির নকল, আসল আর কাঠের মন্দির সব পুড়ে গেল।

'ভারতের বাইরে, অজন্তার ছবির কপি সব পুড়ে গেছে। এ যেন একটা অভিশাপের মতন। এই অভিশাপের সংস্কার মিসেস হ্যারিংহামের মনেও বদ্ধমূল ছিল। অজন্তা কপি করবার সময়ে, কপি-তে আগুন লাগবার ভয়ে তিনি আমাদের টেন্টে দিনের দিন কপি-গুলি রেখে যেতেন। তাঁর ধারণা ছিল, ভারতশিল্পীদের জিম্মায় ওর মার নাই। বিলিতী মেম সাহেব হয়েও তিনি এই 'কুসংস্কার' মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। বরং আমাদের চেয়েও বেশি করে মানতেন। সত্যিই কার্স্ ছিল যেন কপিতে। গ্রিফিথ সাহেবের কপি-করা অজন্তার ছবি বিলেতে পুড়ে গেছে। তাঁর আগে কপি যা হয়েছিল সে-ও পুড়ে গেছে। জাপানের শিল্পীরা অজন্তা থেকে যা যা কপি করে নিয়ে গিয়েছিল সে-ও পুড়ে গেছে সব ভূমিকম্পের সময়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার, অজন্তার সঙ্গে এই হিরিওজি মন্দিরের যোগ ছিল; সেই জন্যেই এগুলোও পুড়ে গেল —নকল আর আসল সব সমেত।

'ট্রেনে যাবার সময়ে রাস্তায় দেখি, স্টেশনে খাবার কিনতে পাওয়া যায়। কিছু পয়সা দিলেই একটা কাঠের বাক্সে ভাত ডিম আর কিছু ভেজিটেবল-সেদ্ধ দেবে তোমাকে; আর দেবে দু-টি কাঠি। ভাত খায় ওরা 'গরাস' করে। ভাত রান্না হয়ে যাবার খানিক পরে একটু শক্ত হয়ে যায়। তারপরে করে কি, ডিমের অম্লেট করে, রোল্ করে সেই ভাতের পুর দিয়ে জড়িয়ে নেয়। শক্ত ভাতের পুর দেওয়া অম্লেটের সেই রোল্গুলিকে টুকরো টুকরো করে কেটে গরাসের বা আমাদের 'গড়গড়ে' পিঠের মতো করে নেয়। তার তিন চারটে করে টুকরো একটা প্যাক্‌বাক্সে থাকে। তুমি চাইলে সেই গরাসের বাক্স দেবে, আর দেবে দু-টি কাঠি। খাওয়া হলে, পরে দেবে চা। চা-খাওয়া সে আবার মজার। চা চাইলেই চা দেবে তোমাকে কেটলি সমেত। তবে সে কেটলি ফেলে দেওয়া যেতে পারে গাড়িতেই। জল খাবার ব্যবস্থা নাই। খেতে পার কেবল 'বিয়ার'। আমি 'বিয়ার' খেলুম সেই প্রথম। একটু কড়-নেশা হতো এক বোতল খেলে। আর ওদের শা-কে মদ খেতে হয় আমাদের 'পচুই'-মদের মতন গরম করে। সে-ও খেয়েছি যাবার সময়ে, আসবার সময়ে।

'রেলওয়ে জংশনে ব্যবস্থা চমৎকার। স্টেশনের মাঝখানে একটা

জায়গায় সামনেই আবশি-লাগানো। ট্যাপে জল। নতুন তোয়ালে। সাবান। সাবান দিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে, পাশেই একটা বাক্সে তোয়ালেটা ফেলে দেবে। সাবানটাও ফেলে দেবে। সব যাত্রীর জন্যেই এই ব্যবস্থা। এখানে প্রত্যেকে ফ্রেশ্, সাফ্ হয়ে নাও। এতে কতো খরচ করে ওরা। আর ওদের দেশের লোকের নিজেদের আভিজাত্য বোধ থাকার দরুন এই সব জিনিস কেউ কখনো চুরি করে না। ও দেশের জনসাধারণের ক্যারেক্টার ফর্মড হয়ে গেছে। আমাদের দেশে যা এখনও (১৯৫৫) সম্ভব হয়নি। অবশ্য আগে ছিল। ও-দেশের ঐ চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলিই আমাদের দেশের ছেলেদের ওদেশে গিয়ে দেখে আসতে বলেছিলেন রাসবিহারীবাবু।

'কি-ও-টো থেকে সব দেখে ফিরলুম। এসে উঠলুম সেই ফু-কু-আকা-র হোটেলে। ফিরে এসে আমার জিনিসপত্তর খুঁজে পাই না। এলম্হার্স্ট বললেন, ওয়েট্রেস্ আছে প্রত্যেকের ঘরেই আলাদা আলাদা। হাততালি দিলেই আসবে সে। সব সময়ে সে সজাগ থাকে। কেবল ইসারা কর দিনরাত। আমার জিনিসপত্তর ঘরের দেওয়ালের বাক্সের ভেতর রাখা ছিল সব। আমি দেখতে পাইনি। ওয়েট্রেস এসে দেওয়াল-বাক্স থেকে চাবি খুলে যা দরকার সমস্ত বের করে দিলে। এলম্হার্স্ট বললেন, গরম জলে স্নান করতে আরাম করে। ওয়েট্রেস্ এ্যাটেণ্ড্ করতে চায় স্নানের সময়েও। ভারতীয় সংস্কার আমার, বাধলো। বললুম,—তুমি যাও। এলম্হার্স্টের কিন্তু ও-সব সঙ্কোচের বালাই ছিল না কিছু।

'সকালে চা খেতুম গুরুদেবের সঙ্গে। তখন ওয়েট্রেস্‌রা থাকতো সব কাছাকাছি। একদিন করলে কি, চা-পর্ব চোকবার পরে আমার ঘরে জাপানী হাতপাখা আর সিল্কের টুকরো নিয়ে এলো ওরা—সে প্রায় পনেরো ষোলো জন। এনে বললে,—এঁকে দিন। আমি একের পর এক ছবি আঁকছি। গুরুদেব আস্তে আস্তে এসে দেখে আমাকে বললেন,—'কি ব্যাপার হে? আর্টিস্ট্ দেখে তোমার কাছেই যত মেয়ের ভিড়; আমার কাছে আর ঘেঁষছে না কেউ।'

আর্টিস্ট হলে জাপানে তার অনেক কন্‌সেশন। থিয়েটার, অভিনয়, সিনেমা

—সর্বত্র কনশেসন। আর্টিস্ট্ দেখলেই ওরা এ্যাটেণ্ড্ করবে। আমাদের দেশ থেকে জাপান এই হিসেবে একেবারে আলাদা। শিল্পের প্রতি আদরের জন্যে ওদের তফাৎ এই সূত্রে অন্য যে-কোনো দেশের সঙ্গে।

'ওখানে থাকার সময়ে একদিন আরাই সান আমাকে নিয়ে গেলেন শিল্পী সামামুরার বাড়িতে। দু-একদিন ছিলুম ওখানে। খুব মাতাল ছিলেন সামামুরা। যেদিন আমরা যাই, সেদিন এতো মদ খেয়েছেন, আমাদের দেখে উঠতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেলেন। শুয়েছিলেন একটা লেপ গায়ে জড়িয়ে। আমার পরিচয় দিলেন আরাই। আমি নমস্কার করলুম। তিনি চুমো খেলেন আমার। মত্ত অবস্থায় অবশ হয়ে উঠতে পারছেন না কিছুতেই; উঠতে চেষ্টা করতে গিয়ে গড়িয়ে পড়লেন অনেক দূরে।

'স্নান করতে হবে। বাথরুমের কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে, দরজার মুখ থেকে ভিতর পানে, আমার পিছন থেকে দিলেন এক ধাক্কা। সেই ধাক্কার ধমকে আমি বাথরুমে সিঁদিয়ে গেলুম। ওদেশে রেওয়াজ হলো কাপড়-চোপড় খুলে স্নান করার। মেড্সার্ভেণ্ট্ তোয়ালে সাবান সব দিয়ে গেল বাথরুমের ভিতরে এসে।

'সামামুরার খেয়াল হলো, সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবেন। সঙ্গে গেলুম আমরা। যাওয়া হলো ছোট বোটে করে। সমুদ্রে খাড়ির ধারে গেলুম। বেশি ঢেউ নাই সেখানে। সামামুরা মাছ ধরায় মনোযোগ দিলেন। ছিপের ডগায় ঝোলা, রেশমী হাত-সুতোতে রূপালী বঁড়শী এক থোক লাগানো। সেই বঁড়শীর থোকে আবার টোপ নাই। জলের ভেতর বঁড়শী ঝকমক করছে—হাতসুতো নাড়াব সঙ্গে সঙ্গে; মাছধরা হবে তাতেই। লম্বা লম্বা বাছা মাছের মতন সার্ডিন মাছ। দেখে মনে হলো খুবই সুখাদ্য সে মাছ।

'সামামুরা বোটে এনেছেন মদের বোতল। নিজে খাচ্ছেন সব সময়ে; আর প্রত্যেকবারেই আমাদের অফার করছেন; আমাদের দেশে যেমন চা, ওদেশে তেমনি মদ আর-কি। অতিথিকে গৃহস্বামী নিজে মদ দেবে একবার, গৃহিণী দেবেন আর এক গ্লাস, অবশেষে সাকী দেবে এক গ্লাস। এখন, যার না-খাবে তারই অপমান। অভদ্রতা তো বটেই; আন্সোস্তাল —অসামাজিকতা।

'বোটে তাঁর এর মধ্যেই মদ খাওয়া হয়ে গিয়েছে চার-পাঁচ বার। কি বারেই অফার করেছেন আমাদের, আর আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি। এখন আমি বিদেশী বলে যদি আমার দ্বারা তাঁর অসম্মান হয় তো সে মহা কেলেঙ্কারি, মহা-অপরাধের ব্যাপার। এই পরিস্থিতিতে অবশেষে উদ্ধার করলেন আরাই। নৌকোয় দাঁড়িয়ে হাত জোড় করলুম আমি। কিন্তু রেগে গেলেন শিল্পী সামামুরা। রেগে গিয়ে তিনি নৌকোর খোলে মদ ঢেলে দিলেন সেই মাছ-গুলোর ওপরে।

'বাড়ি ফিরছি আমরা। সমুদ্রের ধারে এক জায়গায় বোট থেকে নামলুম। পায়চারি করতে লাগলেন সামামুরা। সহসা বালির ওপর বসে কয়লা দিয়ে আঁকছেন তিনি একটুকরো কাঠের ওপর কি যেন। আমাকে তাঁর কাছে এগোতে দেখে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি কাঠের টুকরোটাকে। আমি কুড়িয়ে নিয়ে দেখি কি, কাঠটার ওপর এঁকেছেন তিনি ওকাকুরার মুখ। এঁকেছেন কাঠকয়লা দিয়ে। এঁকেছেন গোঁফ আর চশমা। রাখা আছে সেই টুকরোটি আমাদের শান্তিনিকেতন-কলাভবনে। দেবদারু কাঠের টুকরোর ওপর আঁকা।

'বাড়ি ফিরে এসে আমি বললুম,—আপনার হাতের কিছু ছবি আর তুলি দিন আমাকে। বলতেই তুলি দিলেন। কিন্তু ছবি দেবেন না। স্কেচ্ও দিলেন না। দিলেন তিনি আরাইকে। অথচ বলা-কওয়ায় বড়ো ছবি আঁকবার খসড়া দিলেন। দিলেন দুখানা।—একটি হলো, লাল রঙের রেখার ওপর কালো রঙের ইসারা দিয়ে আঁকা মানুষের চেহারা। আর একটি হলো, কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা ল্যাণ্ড্ স্কেচ—একটি হাঁস জলের ওপর দিয়ে সাঁতার কেটে চলে যাচ্ছে। রাখা আছে ছবি দুটি আমাদের কলাভবনে। তুলি কিছু দিলেন আমাকে। তাঁর নিজের ব্যবহার-করা তুলি—নিদর্শনের জন্যে আমি চাইতে দিলেন আমাকে। তাঁর তুলি অপর শিল্পীর তুলির চেয়ে অন্যরকম। খুব নরম সিল্কের মতন লোম দিয়ে তৈরি।

'জাপানে গেরস্তবাড়িতে ভালো মেয়ে থাকলে তাকে ভালো লোকের কাছে দিয়ে যাওয়া হচ্ছে রেওয়াজ। প্রতিভাশালী লোকের কাছে থেকে সে আচার-বিচার, আদব-কায়দা শিখবে এই উদ্দেশ্য। শিল্পী সামামুরার কাছেও ছিল ঐ রকম সাকী—একটি অল্পবয়সের মেয়ে। শিল্পী সামামুরার রং গুলে দিচ্ছে

সে, এটা সেটা ফাইফরমাস খাটছে ; সব সময়ে আছে সে কাছে কাছে। আমার ধারণা, এটা পার্শিয়ান প্রভাব।

'দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সারা হলো। তার পরে ঢালা বিছানা আর বালিশ। একসঙ্গে আহার সেরে একসঙ্গে ঘুম। সদাই আমরা পাশাপাশি শুলুম ছেলেমানুষের মতন। আত্মীয়-স্বজন যেন সবাই এক ফ্যামিলির। ঘুম থেকে উঠেই মুখ ধুয়ে চা। চায়ের সময়ে বিকেলে মুরগী আনতে বললেন চাকরকে। মদ খাচ্ছেন নিজে, আর সেই মুরগীটিকে ঝোল করে খাওয়াচ্ছেন ঢোঁকে ঢোঁকে। মাতালের মজা আর-কি।

'চা পর্ব চুকতেই আমাকে ডাকতে এলো। —গেলুম একটা ঘরে। বাড়িতে যত লোক সবাই মিলে লাইন করে হাঁটু গেড়ে বসে গেছে। সিল্ক-মাউন্ট করা কয়েকটি ফ্রেম সামনে রাখা রয়েছে নানা আকারের। ছবি এঁকে দিতে হবে। জাপানী কায়দায় সিল্কের ওপর আঁকার ভালো অভ্যাস নাই, সেইজন্যে সঙ্কোচ হলো আমার মনে। তবে তা কে শোনে। অনুরোধ করতে লাগলো, আপনাকে আঁকতেই হবে। সেই মেয়েটি রং-গোলার পাথরে রং তৈরি করে দিলে কালো রং। বড়ো একটা কৃস্টালের বাটিতে করে জল রেখে দিলে পাশেই তুলিতে জল নেবার জন্যে। তুলি রাখা আছে খুঙ্গিতে। যে ধরনের ছবি হবে সেই অনুপাতে তুলি ওরা বেছে নেয়। আমি চেপ্টা তুলি একটা নিয়েছি মতলব এঁটে। কোন ছবি কোন তুলি দিয়ে ওখানে আঁকার নিয়ম সে আমি জানি না তাই আমি নিলুম ওটা⋯ ⋯

সিল্কের ওপর আঁকছি রং বেশি হয়ে গেছে। রং বেশি হলে ওরা চুষে নেয়। বা, অন্য বাটিতে জল দিয়ে হালকা করে নেয় রং-টাকে। আমি নার্ভাস হয়ে, পাশে রাখা আর একটা বাটিতে ডুবিয়ে রং হালকা না করে, কৃস্টাল বাটির জলে আমার তুলিটা ডোবাতেই জলটা ঘোলা হয়ে গেল। এই দেখে আমি একেবারে ঘাবড়িয়ে গেছি।⋯ জল বদলে বাটিটা ধুয়ে আনলে মেয়েটি।⋯ আমি এঁকে দিলুম ছবি।⋯ পালতোলা নৌকো। মাস্তুলে পাল তুলে নৌকা জল কেটে কেটে চলে যাচ্ছে। নিচে জলের ঢেউ আর আমার সই।⋯ প্রশংসা পেলুম। আরাইকে কি যেন বললেন সামামুরা কানে কানে। আমি আরাইকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি বলছেন উনি। আমি তো এখানে শিখতে এসেছি, তাই আমার জানা দরকার ওঁর মতামত। আরাই বললেন, —উনি বলছেন, —ছবি

আঁকা ঠিকই হয়েছে ; কিন্তু ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি এঁকেছেন। উত্তেজিত হয়ে ছবি আঁকতে নাই। ভেবে চিন্তে ধ্যান করে তবে আঁকতে হয় ধীরে ধীরে। ধীরভাবে ধীরে ধীরে আঁকাই হচ্ছে ছবি উৎরানোর আসল রহস্য।

'সামামুরার বাড়িতে আমি ছবি আঁকবার পরে সামামুরা একখানি ছবি আঁকলেন। —একটা বাঁশগাছের গুঁড়ি, আর তার কিছু পাতা। যখন পাতাগুলি আঁকলেন তখন সরু তুলি দিয়ে আঁকলেন। গুঁড়ি আঁকলেন বড়ো চেপ্টা তুলি দিয়ে। গুঁড়িটা আঁকলেন দ্রুত। সরু তুলি দিয়ে পাতা আঁকবার সময়ে মন নিবিষ্ট করে আঁকলেন। অনেক সময় নিলেন তাই পাতাগুলি আঁকতে।

'সামামুরা হলেন স্টেট্ আর্টিস্ট বা রাজশিল্পী। সমুদ্রের ধারে বাড়ি আছে তাঁর দু-তিনটে। স্টেট্ দিয়েছে। —ও-গুলো সামার-হাউস। ভালো ভালো জায়গায় বাড়ি। রাজা সব ব্যবস্থা করেন তাঁর। — থাকা-খাওয়ার জন্যে মাসো-হারা দেন। আমি যখন দেখা করতে যাই, তখন সামার-হাউসেই ছিলেন তিনি। তাঁর ছবিও সব স্টেট-প্রপার্টি। বেশির ভাগ ছবিই তাঁর কিনে নিতো স্টেট —বাইরে বিক্রী হবার আগেই।

'সামামুরার বাড়ি থেকে আমরা ফিরে এলুম হোটেলে। সেকালের বিখ্যাত আর্টিস্টদের জমায়েত হলো একদিন। চল্লিশ-পঞ্চাশ জন হবেন। উদ্দেশ্য, আমাদের গুরুদেবের সঙ্গে পরিচয় হবে। আরাই তো সঙ্গেই আছেন। সামামুরা, টাইকান ও আরও সব শিল্পী, চিত্রকর, ভাস্কর, সঙ্গীতজ্ঞ, নট মিলে এসে আসনে বসলেন একঘর। বসলেন তাঁরা গুরুদেবের চারদিকে। আমিও বসলুম। খাবার আনলে। —চা, শা-কে মদ আর কাপ। এ্যাটেণ্ডের জন্যে এক-একটি মেয়ে এক-একজনের কাছে বসে আছে। সে খাবার দেবে, মদ ঢেলে দেবে —এই সব। এলমহার্স্ট এই দৃশ্যের ফটো তুলে নিতে ইচ্ছে করলেন। কিন্তু গুরুদেব সেটা পছন্দ করলেন না। প্রত্যেকের পরিচয় দেওয়া হলো। —কেউ চিত্রকর, কেউ ভাস্কর, কেউ কবি —এই সব। আমার সঙ্গেও সবার পরিচয় হলো। ...এইবারে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার শুরু হলো। —আমাকে মদ খেতে দিক্, তাতে আপত্তি নাই ; কিন্তু কারো এঁটো খাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু জাপানী কায়দায় সে অসম্ভবকেও সম্ভব করতে হলো। —সাকী মদ খাচ্ছে কাপে করে, আর তার সেই এঁটো কাপেই আমাকেও খেতে দিচ্ছে। আর নিয়ম হলো, ঐ এঁটো কাপে অতিথিকে তো খেতেই হবে ; উপরন্তু অতিথি মদ ঢেলে দেবেন

তার কাপেও।... আমাকে বাধ্য হয়ে ঐ কর্ম করতে হলো। এ কী অভিনব তান্ত্রিকতার দেশ রে বাপ্!

'টাইকান তাঁর টোকিওর বাড়িতে নেমন্তন্ন করলেন আমাকে। গেলুম বৈকালে। আমাকে নিয়ে গেলেন আরাই। ছোট্ট ঘরের ছোট্ট একটি বারাণ্ডা। সামনে-মাঝে একটা কুণ্ড। বাঁধানো কুণ্ড। বাঁধানো ধুনি যেন। ধুনির মতন আগুনও জ্বলছে। তাতে চায়ের জল গরম হচ্ছে। একটা বড়ো লোহার কেটলি জল ভরতি; ছাতের আংটার সঙ্গে শেকলে বাঁধা. সেটা ঝুলছে আগুনের ওপর। জল গরম হচ্ছে চায়ের; চা চলছে সব সময়েই।...যেখানে টাইকান বসে আছেন তার পিছনে দেবতার মূর্তি বসানো বেদীর ওপরে। অগ্নিদেবতা ফু-দে। ইনিই হলেন শিল্পী টাইকানের ইষ্টদেবতা। ইষ্টদেবের ধ্যান করে কাজে বসেন তিনি। এই ছিল তাঁর নিত্যকার নিয়ম।

'টাইকানের জন্যে অনেক জিনিস উপহার নিয়ে গেছি। কলকাতায় অনেক দিন ছিলেন তিনি অবনীবাবুর ওখানে। আমার হাতে অবনীবাবু পাঠিয়েছিলেন ঢাকাই শাড়ী, কাশ্মিরী শাল-টাল। আমি নিজে নিয়ে গেছি টুকিটাকি নানা জিনিস। উপহার-দ্রব্য সব তাঁর সামনে রাখলুম। এ-সব দেখেই তাঁর পূর্বস্মৃতি জেগে উঠলো। যেন আর-এক জন্মে জেগে উঠে বললেন,—এতোদিন তোমাকে Indology-র সার খাইয়ে একটি সুমিষ্ট আম ফলিয়েছেন অবনীবাবু। যেন চৈতন্যদেবের খড়ম রাখবার জন্যে গঙ্গাতীরে মন্দির বসানো হয়েছে।

'চৈতন্যদেবের খড়মের কথায় চৈতন্যদেবের কথা মনে পড়লো টাইকানের। চৈতন্যের জীবনী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়েছিলেন তিনি অবনীবাবুর কাছে। চৈতন্যচরিতামৃতে সেকালের বাঙ্গালীর খাবারের menu আছে। ছত্রিশ ব্যঞ্জনের কথা। অবনীবাবু একদিন তাঁকে ছত্রিশ ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত খাইয়েছিলেন, সেই কাহিনী বলতে লাগলেন। কলাপাতা আর পদ্মপাতা পেতে সুগন্ধি আতপ চালের ভাত আর গাওয়া ঘি দিলেন, আর দিলেন ছত্রিশ ব্যঞ্জন। ব্যঞ্জন দিলেন মোচার খোলায়। মাটীর খুরিতে দিলেন পায়েস আর দই। কেবল গাওয়া ঘি সহ্য করতে পারলেন না টাইকান। যাই হোক, এইভাবে চৈতন্যযুগের বাঙ্গালীর খাবার হুবহু খাইয়ে দিলেন তাঁকে অবনীবাবু। —সে ঘটনা পরিষ্কার তিনি মনে রেখেছেন। বললেন, —এ-রকম এস্থেটিক্ খাবার কখনও দেখিনি। আজও আমার মনে জ্বল জ্বল করছে।

'টাইকানের স্ত্রী আর সাকী মিলে চা-টা সার্ভ করতে লাগলেন। ঐ হলো নিয়ম। চা-এর ঘরে ঢোকার মুখেই দেখি, আট-দশজন ছোকরা বসে ছবি আঁকছে। একটি ছোট্ট ঘরে বসে তারা আঁকছে। আমরা বসার খানিক বাদে টাইকানের স্ত্রী এসে এক-টুকরো কাগজ বের করে টাইকানকে দেখালেন। —সংশোধন করে দিতে হবে। দেখে তিনি ফেলে দিলেন। বললেন, মাসখানেক শিখে এরা সব বাইরে গিয়ে নাম কিনতে চায়। ছোকরারা সিন্সীয়ার নয় কেউ। —পরে তিনি বাড়িতে শেখানো প্রথা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

'চা এক পেয়ালা খেয়ে টাইকানের স্টুডিয়ো দেখতে গেলুম। স্টুডিয়ো দোতলায়। মেঝেয় ফেল্ট্ কম্বল পাতা আছে। সাদা ধব্‌ধব্ করছে। সাদা রং-এ মুড্ স্নিগ্ধ করে আনে। আমরা তাঁর রং, তুলি দেখলুম। একখানি ফ্রেমের মধ্যে সিল্ক খাটানো; ছবি আঁকছেন। তার নিচে একটি ছবি —গোলাপ গাছের। কালির রেখায় আঁকা রাখা রয়েছে। সিল্কের ওপর যা আঁকবেন, সেটা থেকে তিনি নকল করে নিচ্ছেন।

'রাত্রে গায়েসার নাচ হলো। গায়েসা হলো আমাদের দেশে গণিকা যেমন। ওরা টাইকানের গায়েসা। পাঁচ-ছ জন গায়েসা। এরা ঠিক্ বেশ্যা বলতে যা বোঝায় তা নয়। এরা সসম্মানে বাস করে সমাজে। গণিকা বা গায়েসা বিয়ে করা খুব বাহাদুরি। খুবই গৌরবের এই বিয়ে। চৌষট্টি কলায় বিদুষী হতেন এই গণিকা বা গায়েসারা। আমাদের অম্বাপালী ছিল রাজগৃহের গণিকা। তাঁরই আম্রকুঞ্জে ভালো ভালো সম্ভ্রান্ত লোক সব আসতেন। আর বুদ্ধ তাঁর বাণী প্রচার করতেন তাঁদের মধ্যে। ছবি আছে আমার — Times of India-তে প্রিন্ট্ হয়েছে।

'জাপানে মেয়েদের চুল বাঁধার নানা রকম রেওয়াজ। এই চুল বাঁধা দেখে বুঝতে পারবে বিবাহযোগ্যা, না, করবে না; কুমারী, না, কথা চলছে; বিবাহিতা, না বিধবা; বেশ্যা, না গায়েসা। —এই সব পরিচয় ওদের চুল-বাঁধা দেখলেই বুঝতে পারবে। স্কেচ্ আছে আমার ওদেশের এই বিচিত্র চুল বাঁধার।

'ছেলেপেলে ছিল না টাইকানের। ছিলেন কেবল স্ত্রী। আর গায়েসার

দল। রাত্রে আমাদের যেতে দিলেন না ঐ নাচের জন্যে। নাচ দেখা হলো। নাচের পর আমার গা ঘেঁষে বসলো ঐ গায়েসারা। খাবার খেতে দিলে আর শা-কে। সে দিলে ওরাই। আমি নোটেবল গেস্ট্‌ কিনা। আর নিয়ম এই, গেস্টের প্রশংসা করতে হবে হোস্টকে। —মাথায় আমার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। চিরুনি-ভাঙ্গা চুল ছিল। আমার চুল দেখিয়ে ওরা বললে.—সুন্দর চুল, —যেন বুদ্ধের চুলের মতন। আমার হাতের আঙ্গুল আর কপাল দেখিয়েও প্রশংসা করলে। আমার আঙ্গুল আর কপাল ভারতশিল্পে মূর্তির মতন। ওদের দেশে এমনটি হয় না। আঙ্গুলগুলি খুব লম্বা আর গড়ন খুব সুন্দর, ভারত-শিল্পে চিত্রের মতন। —টাইকানের গায়েসাদের সেদিনের এই রকম প্রশংসা আমি ফালতু পেয়ে গেলুম।

'হাত-মুখ ধোবো; বাথরুমে যাব। সেখানেও গায়েসা। আমার ইজেরের ফিতেতে গিঁট পড়ে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারছিলুম না। আমার এই অবস্থা একটি মেয়ে লক্ষ্য করছিল। সে তাড়াতাড়ি এসে গিঁট খুলে দিয়ে গেল।…আবার বাথরুমের দরজা সর্বদাই অবারিত। কিন্তু, ঐ মেয়ে যখন সভাতে গিয়ে বসবে তখন তার পা দেখা যাবে না। সভাতে ঐ কায়দা, আর গেরস্তালির সময়ে সম্পূর্ণ অন্য রকম।

'টাইকান স্টেট আর্টিস্ট হননি। তিনি নিজে কাজ করতেন স্বাধীনভাবে। এখনও (১৯৫৫) তিনি বেঁচে আছেন। বয়েস প্রায় নব্বুই-এর কোঠায়। অবনীবাবুর প্রায় সমবয়সী ছিলেন। একদিন জাপানী স্টেট্‌ ম্যুজিয়ম দেখতে গেলুম। বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, পুরাতন ছবি দেখবার। পোর্সিলেনের একটি পুরাতন ঘোড়া দেখলুম। বহু পুরাতন যুগের কবর থেকে পাওয়া গিয়েছিল। চাইনীজ গ্রেভ থেকে যেমন পাওয়া যায় সেই রকম ঘোড়া। সেই ঘোড়াটি দেখে টাইকানের খুব ভালো লাগলো। টাইকান আরাইকে বললেন তক্ষুণি স্কেচ করে দিতে। —আরাই ছিলেন স্কেচে ওস্তাদ। যে-কোন জিনিস দেখে ইচ্ছেমতো দেড়-গুণ, দু-গুণ বড়ো করে তিনি নির্ভুলভাবে স্কেচ্‌ করে দিতে পারতেন। —স্কেচে এমন এক্সপার্ট্‌ ছিলেন আরাই। আমাদের অবনীবাবু স্কেচ্‌ করতেন মন থেকে। নেচার থেকে দেখে দেখে তিনি স্কেচ্‌ করতেন না কখনও। আমরাও নেচার দেখে মন থেকে ছবি

করা শিখেছি। নেচারের সামনে বসে বিলিতী আর্টিস্টদের মতন স্কেচ্ করতে অভ্যাস করিনি আমরা।

'টাইকান গুরুদেবকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন। টাইকান থাকতেন অতি সহজভাবেই। কোনও আড়ম্বর নাই। গুরুদেব তাঁর বাড়ি গেলে তিনি তাঁর আঁকা দু-খানি বিশেষ ছবি গুরুদেবকে উপহার দিয়েছিলেন। রাখা আছে শান্তিনিকেতন-কলাভবনে। তার মধ্যে একটি বিখ্যাত ছবি হলো —নদীর জন্ম। আর একটি বিখ্যাত ছবি হচ্ছে —অন্ধের সূর্য-উপাসনা।

'আরাই সানের বাড়ির কথা শোনো এবার। আরাই হলেন গেরস্ত লোক। টোকিওতে তাঁর বাড়িতে গেলুম প্রথমে একদিন সন্ধ্যাবেলায়। আমাকে থাকতে দিলেন একটি আলাদা ঘর। চা খাওয়া হলো সন্ধ্যার পরে। যে-ঘরে বসে আরাই কাজ করতেন সেই স্টুডিয়োতেই আমার বসার জায়গা করে দিলেন। আর তার পাশের ঘরটি দিলেন আমার শোবার জন্যে। আরাইয়ের মেয়ে আমার শোবার ঘরে সিল্কের লেপ তোশক কাঁধে করে করে এনে বিছানা পেতে দিলে। তখন বর্ষাকাল। কিন্তু শীত আমাদের দেশের পৌষ মাসের মতন। ওখানে ঠাণ্ডা। তাই এই গরম বিছানার আয়োজন। দু-টো করে লেপ গায়ে জড়াতে হয়। লেপ আনলে দু-টো। বালিশ আর নতুন মশারি। দেওয়ালে সুতো বাঁধছে মশারি টাঙ্গাবে বলে। বোনেরা পরস্পর সাহায্য করছে। দেখে ভারী ভালো লাগলো। ঠিক্ আমাদের দেশের ঘরোয়া ব্যাপারের মতন। মশারি টাঙ্গানো হলো। খাওয়া দাওয়ার পরে শুয়ে পড়লুম।...সকালে উঠতেই প্রথমে হাত-মুখ ধুয়ে নিতে বললে। বাথরুমে যাবো। ট্যাপে মুখ ধুতে গিয়ে প্যাঁচ ঘুরতেই তার মাথাটা খুলে গেল। ট্যাপটা খারাপ ছিল। জল দরকার মতো না বের হয়ে, ছুটতে লেগেছে। আমি মুখটা টিপে ধরে চীৎকার করছি। আরাই-এর স্ত্রী এলেন ছুটে; ঠিক করে দিয়ে গেলেন।

'ঘরের চারদিকে বারাণ্ডা। জানালাগুলোর কাঁচ লাগানো নাই; সাদা কাগজ দিয়ে বন্ধ করা। আলো আসছে; কিন্তু দেখা যায় না। ফজমনি গোছের আর-কি। বারাণ্ডার দোকানের ঝাঁপের মতন চারদিকে কাঠের স্লাইডিং।

ঝাঁপ লাগানো। দিনের বেলায় ঠেলে গুটিয়ে এক কোণে রেখে দেয় সেগুলো। রাত্রিবেলায় ঝাঁপ ফেলে চাবি এঁটে দেয়। ভোরবেলায় প্রাতঃকৃত্য করতে যাবো বলে খুলতে গিয়ে দেখি কি, সব বন্ধ। চাবি দেওয়া আছে। বিছানায় বসে আছি চুপটি করে। ওদিকে দেওয়ালে একটা কাঁচ লাগানো আছে। জানালা থেকে সেই দেওয়াল-কাঁচের ভেতর দিয়ে আরাই-এর মেয়ে উঁকি মেরে দেখছে। আমি ইসারা করে ডাকতেই সে এসে দরজা খুলে দিয়ে গেল।

'ছোট্ট বাগান। বিঘেখানেক জায়গা হবে। চীনে বাঁশের ঝোপ। সুন্দর বাগান। বেড়াচ্ছি। দেখি, একটি ছোকরা। লম্বা ডাঁটাওয়ালা ঝাঁটা —আঁচড়া দিয়ে বাগানের ঝরা-পাতা লতা সব সাফ করছে। ...আবার ঘরে ঢুকে দেখি, সে ছবি আঁকছে। ..আবার চা খাবার সময়ে দেখি, সে চা খেতে বসেছে আমাদের সঙ্গে। ব্যাপার দেখে আরাই সানকে বললুম, তোমার চাকর দেখি ছবিও আঁকে, আবার সঙ্গে চা-ও খায়। আরাই সান বললেন, —না, ও আমার চাকর নয়, —ছাত্র। আমার বাড়িতেই থাকে।

'খাবার টেবিলে; আরাই সানের স্ত্রী পরিবেশন করছেন। ভাত খেলুম আর চা। ম্যাক্রনি —সে সয়াবীনের সেয়াই আর-কি। তার সঙ্গে আবার করেছে কি, কাঁচা ডিম ভেঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে, আমি বিশিষ্ট অতিথি বলে খাতির করে। বমি আসে আমার সেই হড়হড়ে জিনিস খেয়ে। পাওরুটি আর মাখন দিলে, সেই খেলুম শেষে। ওরা খুব সস্তায় থাকে। ডিম পাওরুটি মাখন খুবই মাগগি ওখানে। সাধারণ লোকে খেতে পায় না। তারা ভাত-টাত আর ম্যাক্রনি খেয়ে থাকে।

'তিন প্রস্থ খাওয়া হতো আরাই সানের বাড়িতে। সকালে চা। দুপুরে ভাত —সে সকাল ন-টা দশ-টার সময়ে। বৈকালে আবার ভাত ছ-টা সাত-টার সময়ে। ভাতের সময়ে তার সঙ্গে ছোট ছোট জলচৌকির ওপর বাটি সাজানো। কোনোটায় একটু মিষ্টি দিয়ে সয়াবীন-সেদ্ধ, কোনোটায় মাছ সিদ্ধ। একটা বড়ো বাটিতে আতপ চালের আঁট আঁট ভাত। ভাত খায় চা মেখে। সী-উইড্ একরকম পাতলা আমসত্ত্বের মতন। আর থাকতো

মুলোর আচার। মুলোটাকে মদের গাদে জারিয়ে-রাখা আচার। সে টাকনা দেবার জন্যে। নুন আর মশলা বা মিষ্টির বালাই নাই। কদাচিৎ একটা গুলি একটু ঝাল লাগলো। খুব সম্ভব চৈ। চৈ-এর মতন রং আর লাল। দিলে মটর প্রমাণ। একটিই হলো মসলা। ভাতের সময়ে গৃহকর্ত্রী এসে খাবার শেষে অনুরোধ করবেন, আর দু-টি ভাত নাও, বলে। এটা হলো দস্তুর। মাথা নেড়ে সঙ্কেত করে হুঁ। বা না বললেই হলো। যাই হোক্, তিন বেলা এই খাওয়া। আর চা তো সব সময়েই চলছে। সকালে চায়ের সঙ্গে খাকে শ.-কে। বা চা, শ.-কে একক ভাবেও চলে —ছোট বাটিতে করে। রাত্রে ন-টা দশটার মধ্যে শোওয়া হয়। শোবার আগে মুড়ির বিস্কুট আর ক্র্যাকার-জাতীয় খায় আর বসে বসে গল্প করে।

'আরাই সানের বাড়িতে খাবার সময়ে কেডাকো হতো খুব।' টোকিওতে 'গোল্ডেন টেম্পল' দেখতে গেলুম। নিয়ে গেলেন আরাই। মন্দিরের ভেতরে পুরাকীর্তি রয়েছে আরো অনেক। চারদিকে বাগান আর পুকুর। মন্দিরের চারদিকের বারান্দাটি কাঠের। কাঠের সেই বারান্দার ওপর দিয়ে চললেই পকপক্ করে পাখি ডাকার মতো শব্দ হবে। কাঠের পাটাতন সাজানো আছে এইভাবে। আস্তে আস্তে চললেও শোনা যায়। তবে এটা আর কিছু নয়: চোর ধরার ফন্দি। ছবি আর শিল্পের মূল্যবান সংগ্রহ থাকতো তখন মন্দিরে। পাহারা করতো সামুরাইরা। মন্দিরে বাইরের লোক এলেই টের পাবার জন্যে এই শব্দ প্রচারের ব্যবস্থা। মন্দিরের দেওয়ালে ফ্রেম-আঁটা কাগজের ওপর বড়ো বড়ো শিল্পীর আঁকা বিখ্যাত নানা ছবি রয়েছে। দেওয়ালের ফ্রেমে জাপানী কাগজ মাউন্ট-করা। অনেক সারসের ছবি আছে খুব বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা। নানা ফুলের ছবিও রয়েছে। ক্রিসেন্থেমাম ইত্যাদি নানা ফুলের ছবি। আমি যখন ছবি দেখছি, তখন একজন গাইড্ এলেন। ছবির সব-কিছু বর্ণনা করে দর্শককে বোঝানোই তাঁর কাজ। তিনি জাপানী ভাষায় সুর করে —আমাদের দেশের ভাটের মতো ছবির বিলকুল বর্ণনা গড়গড় করে বলে যেতে লাগলেন। সমস্ত আদি অন্ত ইতিবৃত্ত বলে যেতে লাগলেন। আমি আরাইকে জিজ্ঞাসা করে করে ব্যাপারটা আর ছবির পরিচয় জেনে নিতে লাগলুম। মন্দিরের সীলিং-এ অনেক কারুকার্য রয়েছে। সোনা-রুপোর কারুকার্য আছে। সেইজন্যেই

এই নাম —Golden Temple। ওখানে একটা মজার জিনিস দেখলুম। সীলিং-এর কাছাকাছি কাঠের থাম্বার ওপর একটা কড়ির নিচে জাপানী পাখা একটা গোঁজা রয়েছে। ঘটনা হলো এই, যে-সময়ে এই মন্দিরটি তৈরি হয়, শিল্পী কাজ করতে করতে তাঁর হাতপাখাখানি ওখানে গুঁজে রেখেছিলেন। আর সেই পাখা এইভাবে রাখা অবস্থাতেই সংরক্ষণ করা হচ্ছে! আজ সে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে একই ভাবে রাখা আছে। কী অদ্ভুত শ্রদ্ধা এদের পুরাবস্তুর ওপরে, দেখে আমার অবাক্ লাগলো। সীলিং-এ ড্রাগন আঁকা রয়েছে। কাঠের মাথাতে টোকা দিলে ড্রাগনটা ডাকে —গড়গড় শব্দ করে। এমনভাবে তৈরি, resound করে টোকা দিলেই। resound করে সীলিং-এর তক্তাগুলো। কোথাও ঢিলে আছে আর-কি।

'উল-জেন-এ গেলুম। গরম জলের প্রস্রবণ আছে সেখানে। স্নান করতে লাগে ঠিক আমাদের রাজগীরের সপ্তধারার মতন বা বক্রেশ্বরের ঝরণার মতন। যে-জায়গাটায় ঝরণার জল পড়ে সেখানটায় কুণ্ড করে সেই জল ধরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই ঝরণাধারার জল নিয়ে একটা হোটেলে সরবরাহ করছে। জলটাকে বহানো হচ্ছে স্নানের ছোট ছোট ঘরের ভেতর দিয়ে। চর্মরোগ বা এই রকম কোনো অসুখ-বিসুখ কিছু থাকলে এই জলে স্নান করলে ভালো হয়। —স্যানাটোরিয়াম আর-কি! আমাদের রাজগীরে বা বক্রেশ্বরে যা এই রকম জল আছে তা দিয়ে এর চেয়ে বড়ো বড়ো স্যানাটোরিয়াম হতে পারে। এবং সে সারা ভারতবর্ষের লোকেদের উপকারে লাগতে পারে। জাপানের এই জলে গন্ধকের গন্ধ ঠিক্ বক্রেশ্বরের মতন। আমার হাতের রুপোর ঘড়ি কালো হয়ে গেল এই গন্ধকের ধোঁয়া লেগে। জাপানে অনেকে তাঁদের অসুখ-বিসুখ করলে উল-জেনে-এ গিয়ে, থেকে সেরে আসে। স্যানাটোরিয়াম তো।

'টোকিওর কাছেই আর-একটা ভালো জায়গায় গেলুম। দৃশ্যও সব খুব মনোরম। ঝরণা রয়েছে। পাশেই হোটেল। দর্শকেরা গিয়ে সেই হোটেলে সারা দিন থাকে। হোটেলের ছোট ছোট কামরা। সেখানে আহার আর বিশ্রাম করা যায়। আমরা হোটেলে গিয়ে থাকলুম, খেলুম। গিয়েছিলুম আরাই সানের সঙ্গে। দরজায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিতেই ওয়েট্রেস্ এলো। —ভেতর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে সব

ব্যবস্থা করে দিলে। চা, খাবার-টাবার সবই দিয়ে গেল।

'জাপানে মন্দির দেখলুম দু-রকমের। প্রথম হলো বৌদ্ধমন্দির। শহর অঞ্চলে বিশেষ করে বেশি হলো বৌদ্ধমন্দির। এই মন্দিরে বুদ্ধের পূজা আর উপাসনা হয়ে থাকে। আর একরকম হলো — সেণ্টো মন্দির। এটা আসলে হলো, মৃত পিতৃপুরুষদের পুজো করবার জায়গা। এখানে উপাসনা-পদ্ধতি হলো অন্যরকম। এই মন্দিরে পুজো করে হাততালি দিয়ে, আর গালবাদ্য করে। পুজায় বসে সেণ্টো দেবতাকে ওরা জাগায় হাততালি দিয়ে। এই পূজা যেন আমাদের শৈব তান্ত্রিক পদ্ধতির অনুরূপ। শূন্য মন্দিরে একটা ধূপ জ্বলছে —এই হলো দেবতা। আমাদের যোগী-পদ্ধতির মতন মনে হলো। হাততালি আর গালবাদ্য হচ্ছে এই সেণ্টো-পূজার বিশেষ পদ্ধতি। —এই সব মন্দিরের গড়ন সাদামাটা। আর জাপানের যেখানে সেখানে এই সেণ্টো মন্দির। কোনো মন্দিরে হাততালি দিচ্ছে শুনলেই বুঝবে, সেটা হচ্ছে সেণ্টো মন্দির। এই মন্দিরের সামনে দিয়ে যদি যাও, সেখানে দাঁড়িয়ে একবার হাততালি দিয়ে তবে যাবে। হাততালি দিয়ে আর গাল বাজিয়ে বম্ বম্ করে যেতে হবে। এটা হলো মহাযানী বৌদ্ধ Zen-সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ আর বিশ্বাসের ব্যাপার। Zen আমাদের ধ্যান আর-কি। ধ্যান করাই হলো এঁদের উপাসনা। পারসী, চীনে আর ভারতীয় বৌদ্ধতান্ত্রিক ঐতিহ্য মিলে এই পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়।

'আরাই সানের সঙ্গে চারদিকে খুব বেড়াচ্ছি। যখন বেড়াতে বার হয়ে যাই, বাক্স-পেটরা সব অগোছালোই পড়ে থাকে। আর ফি বারই ফিরে এসে দেখি, কাপড়-চোপড় সব নতুনভাবে ইস্তিরি করে, পাট করে রেখে দিয়েছে। বাড়িতেই ওরা ধোপার কাজটা সেরে নেয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে অন্ততঃ এই নিয়ম দেখলুম।

'আরাই সানের ছোট ছোট মেয়ে চার-পাঁচটি। সব চেয়ে ছোট মেয়েটি সব সময়ে আমার কাছে এসে বসে থাকতো। আমি জাপানী কথা শিখতুম তার কাছে। একদিন দেখি, সে আমার ছবি আঁকবার জলে তার ফ্রক্ ভিজিয়ে আমার হাতের ওপর লাগিয়ে ঘষছে, আবার মুছছে। আরাই আসতে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপারটা কি। আরাই তাকে জিজ্ঞাসা

করে জেনে আমাকে বললেন, ওর ধারণা, তোমার গায়ে চাইনীজ ইঙ্ক লেগে গেছে। তাই ও সেটা তোলবার চেষ্টা করছে।

'আমি ওখানে থাকতে থাকতেই আরাই সান তার বড়ো মেয়েকে নিয়ে এলো। তাকে আমি আগে ছবি পাঠাতুম, পত্র দিতুম। সেইজন্যে আমি গিয়ে তার খোঁজ করেছিলুম। নাম তার —থে-ও-কো। একদিন সকালে এলো। জামাইও এসেছে সঙ্গে। সন্ধ্যাবেলায় সে চলে গেল। জামাই সঙ্গে এসেছিল, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে বলে।··· মেয়েদের বিয়ে দিতে দিতেই সর্বস্বান্ত হয়ে গেল আরাই। মেয়েদের কাপড়-চোপড়, মেয়ের সখীদের কাপড়-চোপড় সব দিতে হবে। এটা দস্তুর। তাতেই ফতুর। বরপণের নগদ টাকা দিতে না-হলে কি হয়।

'দেখতে দেখতে প্রায় এক মাস হয়ে এলো। এবার দেশে ফেরবার পালা।···গুরুদেব চীনে জাপানের অনেক স্থানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন বাঙ্গলা ভাষায়। আমরাও বক্তৃতা দিতুম বাঙ্গলাতে। ইংরেজী কেন বলতে যাব ওখানে। একদিন জাপানে গুরুদেব বললেন বাঙ্গলাতে। বক্তৃতার শেষে ওরা বললে, —আপনার ইংরেজী বড়ো সুন্দর। তার মানে হলো এই, ওরা বেশির ভাগই ইংরেজী বোঝে না; বাঙ্গলা তো বোঝেই না। জাপানে গুরুদেব যে-সব বক্তৃতা দিতেন সেগুলো হোরি সান নামে একটি মহিলা ইংরেজীতে অনুবাদ করে শুনিয়ে দিতেন। হোরি সান ভারতে এসেছিলেন গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে। গুরুদেবের তখন শরীর খারাপ। তবু যখন বক্তৃতা করতেন, এক ঘণ্টার কম থামতেন না।

'চীনে-জাপানে যখন ছিলুম তখন ওখান থেকে ভারতে যে চিঠি পাঠাতুম সেগুলি প্রবাসীতে ছাপা হয়েছে। এবং মূল চিঠিগুলি আছে আমাদের শান্তিনিকেতন-কলাভবনে। সে-সব চিঠি থেকে এখানে এঁরা গুরুদেবের আর আমাদের ভ্রমণের সব খবর পেতেন। সে-সব চিঠির একখানি এইরকম (প্রবাসী, ১৩৩১):—

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আমরা তোকিওতে আছি। আমি আরাই সানের বাড়িতে আছি। ক্ষিতিবাবু কিয়োতোতে একটি মন্দিরে আছেন। কালিদাসবাবু, এল্‌মহার্স্ট ও গুরুদেব তোকিও ইম্পীরিয়াল হোটেলে আছেন। তাজিমা বলে একটি জাপানী ব্যবসাদার অনেক দিন কলকাতায় ছিলেন, আপনাদের সহিতও খুব আলাপ আছে; তাঁর ওখানে কয়েকদিন ছিলাম। সানু সান, কুসুমোতো সান, আরাই সান এবং অনেকগুলি পূর্বকার বন্ধু মিলে আমাদের যত্ন করছেন।

তাইকান সানের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বাড়িটি বেশ সুন্দর। একটি চালা-ঘরের মধ্যে একটা গর্ত করে তাতে ধুনি জ্বালিয়ে তার চতুর্দিকে সকলের বসবার জায়গা করেছেন, বাড়িটি ছবির মত। বড় অমায়িক লোক। আপনাদের কথা শুনে আহ্লাদিত হয়ে উঠলেন, সকলের কথা একে একে জিজ্ঞাসা করলেন। তাইকান সানের শরীর বড় খারাপ হয়েছে—অত্যন্ত মদ খাওয়ায় শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। এখানকার প্রায় সকলেই একটি একটি ছোটখাট মাতাল বললেই হয়। তাইকান সান সম্প্রতি একখানি ছবি শেষ করেছেন; তার একটা ফটো দিয়েছেন; এঁর শরীর ভাল হলে আগামী বৎসর ভারতে যাবার বিশেষ ইচ্ছা আছে বললেন; সঙ্গে পনের-ষোল জন আর্টিষ্ট নিয়ে যাবেন। এঁরা সব বিজুইৎসিন সোসাইটির আর্টিষ্ট। ইনি আমাদের ছবির একটি একজিবিশন এখানে করতে চান—এ বৎসরই করতে চান। ছবিগুলি তথা হতে আগষ্ট মাসের প্রথমে পাঠান দরকার—বড় তাড়াতাড়ি হবে। আর এক সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পাঠালেও হয়। একজিবিশনের মত ছবি হবে কিনা জানি না।—এ বৎসর হবে কিনা বলতে পারি না। যদি সম্ভব হয় আপনি তাইকান সানকে একটা টেলিগ্রাম করে দেবেন।

আমরা এখান হতে ৩১শে জুন ছাড়ব। মাঝ-পথে জাভা হয়ে যাব। কালিদাসবাবু জাভায় থাকবেন। আমরা তিনজন ফিরব—আগস্ট মাসের গোড়ায় কি মাঝামাঝি ফিরব।

আমাদের শরীর বড় জখম হয়ে গেছে।—১দাই ছুটোছুটি করতে

হচ্ছে —বড় তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে —এত তাড়াতাড়ি দেখা অভ্যাস না থাকায় একটু অসুবিধা হচ্ছে।

এ-দেশটা ঠিক বাংলা দেশের মত —তবে বেশীর ভাগ পাহাড় বোধ হয় মণিপুরের মত; লোকেরাও মণিপুরের মত মিশুক। কিন্তু কোন জিনিস শেখাবার ইচ্ছা এদের বিশেষ নেই।

এখানে এসে তাইকান সানকে দেখে মন বড় খুসী হয়েছে। গুরুদেব ভাল আছেন, তবে বড় ধকল যাচ্ছে, উনি তাই সইছেন —আশ্চর্য সহ্য করবার শক্তি। সেবক —শ্রীনন্দলাল বসু

'জাপানে শিল্পী হারা সানের ঘরের একটি কাহিনী। শিলাইদহ থেকে ফেরবার পথে আমরা ডাক্তাই স্টেশনে অপেক্ষা করছি (১৯১৫)। যাত্রীদের মধ্যে একটি মেয়ে স্টেশনে বসে ছেলেকে মাই দিচ্ছে বুকে কাপড় আড়াল দিয়ে। সেই দৃশ্যের স্কেচ করলুম আমি। আমার সেই স্কেচ্ খাতাটি থেকে ঐ স্কেচটি পিয়ার্সনের পছন্দ হলো। নিয়ে নিলেন। জাপানে গিয়ে তিনি ছবিটি দেখিয়েছিলেন শিল্পী হারা সানকে। পিয়ার্সনের কাছ থেকে হারা সান ছবিটি চেয়ে নিলেন (১৯১৬)।

জাপানে ছবি টাঙানো থাকে যে ঘরে তার নাম হলো —তোকোনোমা। হারা সানের বাড়ি গিয়ে গুরুদেব ছিলেন হারা সানের ঐ তোকোনোমায়। ভোরবেলা গুরুদেব উঠে বসতেন সেই ঘরে। আর হারা সান সে ঘরে রোজ একটা করে ছবি টাঙিয়ে দিতেন। পুরাতন ভালো ছবি. আর সেই ঘরে বেদীতে ছবি রেখে পুজো করে থাকেন হারা সান। আমার আশ্চর্য লাগলো দেখে, আমার সেই স্কেচটি সেই ঘরে এককভাবে সেই বেদীতে রেখে পুজো করছেন! এতো ভালো লেগেছিল হারা সানের আমার সেই ছবিটি!

'জাপানের বিখ্যাত শহর কিয়োতো. নারা। এ সব শহর দেখলুম। নারাতেই বোধহয় প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি আছে। ওখানেও আমাকে নিয়ে গেলেন আরাই সান। সেখানে একটি মন্দির রয়েছে। সে-মন্দিরের গায়ে নানা ফ্রেস্কো করা আছে। আর সেই মন্দিরের গায়ে আরও দু-একটি দেওয়াল এমনি খালি রাখা আছে। ওঁরা বললেন, —এই দেওয়ালগুলিতে আপনারা ভারতবর্ষের বুদ্ধের সামনে ছবি আঁকুন। শেষ পর্যন্ত সে আর হয়ে ওঠেনি। মন্দিরের নামটি আমি ভুলে গেছি। কালিদাসবাবু জানেন।

'জাপান থেকে ফেরবার পথে ক্ষিতিমোহন বাবুকে গুরুদেব ওখানকার বিখ্যাত পুরাতন বৌদ্ধ মঠ কোয়াসান দেখতে পাঠালেন। ওখান থেকে সাধুরা এসে আগ্রহ করে ক্ষিতিবাবুকে নিয়ে গেলেন। ক্ষিতিবাবু দেখে এসে বললেন, —ঐ মন্দিরে ভারতবর্ষের অনেক নজির সংগ্রহ আছে। এমন-কি ভারতীয় বৌদ্ধ সাধুদের মাদুর আছে, খড়ম আছে। এ-ছাড়া, মন্দিরের নিয়ম-কানুন ভারতীয়দেরই মতন তারা রক্ষা করছে। —খেয়ে উঠে মুখ ধোওয়া, খড়কে নেওয়া —এ-সব প্রথাও মানা হচ্ছে। ক্ষিতিবাবু ওঁদের জিগ্যেস করে জেনেছিলেন, ভারতবর্ষের সাধু যাঁরা ওখানে গিয়েছিলেন তাঁদের কাছ থেকেই তাঁরা প্রথম শিখে এই পরম্পরা মেনে আসছেন।

'ভারতবর্ষের সঙ্গে জাপানের এই সব যোগাযোগ বুঝে upstart জাপানী জাতটাকে জাগাবার জন্যে ওকাকুরা ১৯০১ সালে ভারতে এসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু স্বামীজী দেহরক্ষা করায় তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। গুরুদেবের সঙ্গে তখন থেকেই ওকাকুরার হৃদ্যতা হয়। ১৯১১ সালে ওকাকুরা আবার ভারতে আসেন। ১৯১২ সালে গুরুদেব যখন আমেরিকা যান তখন ওকাকুরা বস্টনে Field Museum-এর অধ্যক্ষ। ঐ সময়েও তিনি গুরুদেবকে চীন-জাপান যাবার জন্যে বলেন। ১৯১৬ সালে গুরুদেব যখন জাপান যান তখন ওকাকুরা পরলোকে। তিনি তাঁর গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ১৯২৪ সালে আবার এই আসা হলো আমাদের নিয়ে।

'আসবার পথে জাহাজে এলুম। কারগো বোট —নাম 'সুয়ামারু'। কারগো বোটেই বরাবর আসছি। এই জাহাজে মাল চলে বেশি ; মানুষ নয়। মাল-জাহাজ আর-কি। আমাদের এই জাহাজটায় আমরা ছাড়া যাত্রী নাই বললেই হলো। জাহাজের কর্তৃপক্ষ গুরুদেবকে আর আমাদের আনছেন খুব যত্ন করে। এমন ব্যবহার, যেন গুরুদেবই সে জাহাজের কর্তা মালিক।

'মাঝে মাঝে আমরা কাপ্তেনের কাছে গিয়ে বসে বসে তাঁর কাজ আর সমুদ্র দেখতুম। একটি ম্যাপের ওপর পিন দিয়ে চলার পথের স্থান নির্দেশ থাকতো ডাইনিং টেবিলে। আমি কাপ্তেনের কাছে বসে কম্পাস-টম্পাস চালানোর কাজ দেখতুম। কাপ্তেন সব সময়ে গুরুদেবের সংবাদ নিতেন।

দেখে আসতেন তাঁর ছোট্ট সেলুনে গিয়ে। সেখানে বসেই খেতেন তিনি ; খাবার ঘরে যেতে হতো না। কাপ্তেন গুরুদেবকে এতো সমীহ করতেন, তাঁর ঘরে ঢুকতেই সাহস করতেন না। আমাদের কাউকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে গেলে তবে খানিক ভরসা পেতেন। জিজ্ঞাসা করতেন তিনি, তাঁর ঘুম হয়েছে কিনা, অসুবিধে কিছু হচ্ছে কিনা, এই সব। পথে ব্যবস্থার কিছু অদল-বদল করতে হলো।

'মাঝ রাস্তায় একটি পোর্ট থেকে এলমহার্স্ট বিলেতে চলে গেলেন। কালিদাসবাবু গেলেন শ্যামদেশে। রইলুম ক্ষিতিবাবু আর আমি। ক্ষিতিবাবুর অবশ্য আমাদের সঙ্গে আসবার কথা ছিল না। ওঁর কথা ছিল জাভায় যাবার। নামতে বলেছিলেন গুরুদেব। কিন্তু কেন জানি না, এটাকে তিনি 'ক্যাপিটেল্ পানিশমেন্ট' ভেবে নামলেন না। অগত্যা রাজি হলেন গুরুদেব। ফলতঃ, শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদেরই সঙ্গী হলেন। ...জাহাজে আমরা হলুম দু জন ; আর গুরুদেব থাকেন সেলুনে। আমরা খাওয়া-দাওয়া করতুম খাবার ঘরে। গুরুদেব খেতেন নিজের সেলুনেই।

'এর মধ্যে আমার ছবি আঁকা চলছে। জাহাজের কাপ্তেন থেকে নাবিক-খালাসীরা পর্যন্ত আমাকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নিলে। একখানা সিল্কের জামা দিয়ে কাপ্তেন বললে,—এর পিঠে ছবি এঁকে দিন। এঁকে দিলুম সাঁচীর স্তূপ আর সাঁচীর গেট। গেটের ভেতর দিয়ে স্তূপ দেখা যাচ্ছে। আমার আঁকার পরে গুরুদেবকে দিয়ে তার ওপরে কিছু আবার লিখিয়ে নিলে। পরে বোধ হয় সেটা বাঁধিয়ে ঘরে রেখে দেবে।

'আমাদের জাহাজটা ছিল লড়াই-এ জাহাজ। রুশো জাপানী যুদ্ধের সময়ে রাশিয়ানরা ঘেরাও করেছিল এটাকে। গুজব হলো, রাশিয়ান বহর ঘিরে ফেলেছে এই জাহাজটা। এই গুজব শুনেই ছ-জন জাপানী কমাণ্ডার হারিকিরি করেছিলেন। যে ঘরে তাঁরা হারিকিরি করেছিলেন সেই পবিত্র সেলুনটিতেই গুরুদেবকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। হারিকিরির পরেই জানা গেল, জাহাজটা ধরা পড়েনি, ঘেরা পড়েছিল ; উদ্ধার পেয়েছে। যাই হোক্, এ ঘরে ছ-জনের ভূত আছে। গুরুদেব বললেন হাসতে হাসতে, —'দেখো তো হে, কী রকম কাণ্ড, ছ' ছ-টা ভূতের ঘরে আমাকে থাকতে দিয়েছে।'

'পরলোকগত কমাণ্ডারদের হারিকিরির দিনক্ষণ ধরে উপাসনা হলো সেবারে জাহাজেই। গুরুদেব কবিতা লিখলেন, সেই দেশপ্রাণ বিদেহী বীরদের উদ্দেশে। লিখলেন বাঙ্গালাতে। ওরা বাঁধিয়ে টাঙ্গিয়ে রাখলে। গুরুদেবের সেই কবিতাটি বোধ হয় এখনও (১৯৫৫) আছে সেই সেলুনে।

'এই উপলক্ষে আমাকে ওরা ছবি আঁকতে বললে। এঁকে দিলুম ছবি। —গুরুদেবের মূর্তি —পিছন থেকে, যা দেখে ভালো লাগতো সেই জাহাজে। জোর ঝোড়ো হাওয়ায় উনি ডেকে পায়চারি করছেন। ঢেউয়ের জল এসে পায়ে লাগছে। বাবরি উড়ছে, জোব্বা উড়ছে —সেই মূর্তি, পেছন থেকে আঁকা —মহাসমুদ্রের প্রেক্ষাপটে। এঁকেছিলুম কালি দিয়ে। —আমার এই ছবিখানাও ওরা বাঁধিয়ে টাঙ্গিয়ে দিলে সেই সেলুনে।

'পথে কিন্তু সত্যিই ভুতুড়ে কাণ্ড হলো। ঝড় —ভয়ঙ্কর ঝড়। সিঙ্গাপুরের কাছে এসে ভয়ানক টাইফুন। কাপ্তেনের ভয় হয়ে গেল সব চেয়ে বেশি। কাপ্তেনের মুখ শুকিয়ে আমসি। বিশেষ কারণ হলো, এই কারণো বোটে তাঁরই জিম্মায় সব চেয়ে দামী মাল যাচ্ছেন —Poet Tagore। যদি হানি হয় কিছু, সেই আশঙ্কা।

'যখন ঝড় ওঠে জাহাজকে তখন পাশে বা পেছনে কখনও রাখতে নাই। সব সময়ে মুখ করে থাকতে হবে ঝড়ের দিকে। ঝড় এলে তাকে face করতেই হবে। পালাবার জো নাই। পালাতে গেলেই মারা যাবে। পাশে বা পেছনে গেলেই জাহাজ উল্টে যাবার আশঙ্কা।

'যখন ঝড় হচ্ছে। ক্যাবিন সব বন্ধ করে দিলে বার থেকে। নাবিকরা এসে গেল ডেকের ওপর। দড়ি-দড়া, লাইফ্‌বেল্ট্‌ নিয়ে সবাই প্রস্তুত। যদি ভেসে যায় কেউ তাকে উদ্ধার করা হবে সঙ্গে সঙ্গে। ঝড় চলতে লাগলো, বেগ আরও বাড়তে লাগলো। জাহাজে তখন এ্যালার্ম্‌ সিগন্যাল দিচ্ছে। —সাবধান! সাবধান! ···প্রত্যেক ক্যাবিনের লাইফ বোটে নম্বর সেঁটে দিয়ে যাত্রীদের কাছে দিয়ে গেল। ফ্লোটিং স্যুট্‌ অর্থাৎ ভেলা, পোষাক কি করে পরতে হয় দেখিয়ে দিয়ে গেল। আর বলে গেল ওয়ার্নিং পড়লে এই স্যুট পরে নিজের নিজের লাইফ্‌বোটের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।···রিহার্সেলের ঘণ্টা বাজলো। আমরা যার যা স্যুট পরে জাহাজের কিনারে আমাদের বোটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

…এই সময়ে কাপ্তেন এসে আমাকে জাহাজী ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বললেন, —আপনি গুরুদেবকে বলুন। উনি যেন ড্রেস পরে প্রস্তুত থাকেন। আমি গিয়ে গুরুদেবকে বললুম কাপ্তেনের কথা। শুনে, গুরুদেব শান্তস্বরে বললেন, —'ব্যস্ত হয়ো না। মরি যদি এখানেই মরবো। জলে পড়ে হাঁপিয়ে মরবো না।' —কাপ্তেন আমার পিছু পিছু এসেছিলেন। চলে গেলেন মুচকি হেসে। আমরা রিহার্সেল দিলুম। …কিন্তু কপালক্রমে ঝড়ের বেগ পর পর কমে এলো। কাপ্তেন পরে বললেন, —প্রচণ্ড ঝড়। ঝড়ের বেগ আমাদের জাহাজখানা প্রায় দু-শো মাইল চলে গেছলো লাইন ছেড়ে। ডুবো পাহাড় মৈনাকে' ধাক্কা লেগে জাহাজটা ডুবে যেতে পারতো, কিন্তু যায়নি বরাতজোরে। এতো দোলা খেয়েও গুরুদেবের কিন্তু সী-সিক্‌নেশ পর্যন্ত হয়নি। আগেও ছোটখাটো ঝড়ের শুরুতে দেখতুম, তিনি ডেকের ওপর ঘুরছেন —পিছনে হাত রেখে। চুল উড়ছে; জোব্বা উড়ছে। ভারী ভালো লাগছে দেখতে। —এই ছবিই এঁকে দিয়েছিলুম সেদিন হারিকিরির উৎসবে। ছ' ছ-টা ভূতের দৌরাত্ম্যে আমাদের ভাগ্যে সে উৎসব যে আসন্ন হয়ে আসবে, তা তখন ভাবিনি।

'জাহাজ আমাদের ঘরমুখো চলছে। পথে কোথায় যেন এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব আমাদের জাহাজে উঠে এসে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে আবার নেমে গেলেন।

'কারগো বোটে থিয়েটার করে মাঝে একদিন আমাদের এন্‌টারটেন করেছিল। —ছোটখাট নাটক একটি play করলে। জাপানী অভিনয়।

'ঠিক্ হলো, মালয়ের ভেতর দিয়ে আমরা মোটরে করে আসবো। একটা পোর্টে আমাদের নামিয়ে দিয়ে আর একটা পোর্টে তুলে নেবে। মালয়ের একটা পোর্টে নামলুম আমরা। মালয়ের ভেতর দিয়ে মোটরে চলি। মাঝ রাস্তায় ভীষণ জঙ্গল। দেখতে দেখতে এলুম। —ঝাড়-ঝোপ, বেতবন —এই সবে ভরতি। মাঝে মাঝে বসতি। উঁচু মাচার ওপর বাড়ি। কারণ, সাপ খোপ হাতি বাঘ —এই সবের ভয়। আমরা তখনও কুয়ালালামপুরে পৌঁছইনি। ওখানেই আমরা আবার আমাদের জাহাজে উঠবো। কিন্তু কারগো বোটটি আমাদের পৌঁছবার আগেই ওখানে পৌঁছে গেছে। পৌঁছে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। এতে

ওদের খুবই ক্ষতি হয়। সে সত্ত্বেও গুরুদেবের খাতিরে ওরা দু-একদিন অপেক্ষা করে রইলো। কুয়ালালামপুরে পৌঁছবার পরে আবার আমাদের তুলে নিলে।

'গুরুদেবের তখন সেক্রেটারী কেউ নাই। আছেন ক্ষিতিবাবু আর 'মুখ্যু' সেক্রেটারী আমি। গুরুদেব আমাকে বলতেন, —'কপি করে দাও, কবিতা লিখেছি।' দিতুম কপি করে —ভাঙ্গা ভাঙ্গা হস্তাক্ষরে। এদিকে ছবি আঁকা আমার চলছে বরাবরই।

'গঙ্গাসাগরের মুখে এসে ঢুকলুম। ঘোলা জল। ঘোলা জল দেখামাত্র গুরুদেব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন আনন্দে। ঘোলা জল দেখা যাচ্ছে বরাবর, আর কিনার পর্যন্ত সবুজ ঘাস। আর মেয়েদের ঘাটে আনাগোনা দেখতে দেখতে গুরুদেব বললেন, —'দেখ দেখি আমাদের দেশের মেয়েরা কেমন গঙ্গার ঘাটে নেমে স্নান করছে, কাঁখে কলসী করে জল তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এমনটি দৃশ্য কোথাও আর দেখলেম না।' —বলেই গান ধরলেন গুরুদেব। উচ্চৈঃস্বরে নিজের গান ধরলেন। তান দিয়ে দীর্ঘসুরে সে গান —'সার্থক জনম আমার জন্মেছি মা এই দেশে।'

গত চৈত্র মাসে (১৩৩৩) এই পথ দিয়ে যাবার সময়ে কবি লিখেছিলেন, —'কাল গঙ্গার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলুম। তখন কেবলি জলের থেকে আকাশ থেকে তরুছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি থেকে এই প্রশ্ন আমার কানে আনছিল, 'মনে পড়ে কি।' এবারকার এই দেহের ক্ষেত্র থেকে যখন বেরিয়ে চলে যাব, তখনো কি এই প্রশ্ন ক্ষণে ক্ষণে আমার হৃদয়ের উপর হাওয়ায় ভেসে আসবে। এবারকার এই জীবনের এই ধরণীর সমস্ত 'জন্মান্তর সৌহৃদানি'।'

'বরাবর আসছি। তমলুকের কাছাকাছি গঙ্গার বুকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। গঙ্গার পাইলট এবারে জাহাজ চালাবে। —কাপ্তেন নয়। চড়া চোরাবালি —এ সবের মধ্যে দিয়ে জাহাজ চালাতে পাইলট ওস্তাদ। দিনের দিন গঙ্গার জলপথের হিসেব তাদের নখদর্পণে। বিচ্ছিরি পথ। জাহাজ যে-কোনো সময়ে চরে বসে যেতে পারে। আমাদের যাবার সময়ে জাহাজটা বালির চরে আটকে পড়েছিল। জোয়ারের জন্যে অপেক্ষা সন্ধ্যে পর্যন্ত করতে হয়েছিল।

'এবারে একটি ঘটনা হলো। ছোট সেলার একজন অত্যন্ত কাঁচুমাঁচু হয়ে বসে আমাকে ছবি চাইছে। তাকে এঁকে দিলুম গঙ্গার ছবি —যা দেখছি, নৌকো সব যাচ্ছে পাল তুলে। এই পথের আমি এই শেষ ছবি আঁকলুম।

'মেটেবুরুজের কাছাকাছি এসে পড়তেই customs officer-রা এসে জাহাজে উঠলো। আমাদের মালপত্তর সব ওজন করে দেখলে। রাস্তায় কিন্তু কোথাও আর এমনটি করেনি। করলে ইংরেজ। করলে দিশী অফিসার দিয়ে। বললে, —কবির বাক্সপেটরা সব সার্চ করবো। আমি বললুম, —এই তো সব রয়েছে, দেখুন। চিঠিপত্র, কাগজ-টাগজ সব পড়তে লাগলো চিঠির এ্যাটাচি থেকে বের করে। ··আমরা ভাবছি। কি করা যায়। গুরুদেব বললেন, —'দেখছি, ব্যস্ত হয়ো না।' কিন্তু সবই সার্চ করলে। এবং পরাধীন দেশ বলেই এই রকমটা সম্ভব হলো। চীনে-জাপানে কেউ কোথাও-কিছু টুঁ-টি করেনি। 'Tagore's Party' বললেই ব্যস। বরং উল্টে তারা সাহায্য আর ব্যবস্থা করে দিতো, মাল ওঠানো-নামানোর ব্যবস্থা করে দিতো। সব পোর্টেই এই রকম ব্যবহার পেয়েছি। আর আমাদের স্বদেশে ঢুকে এই ব্যবহার পেলুম। আমাদের দেশের অফিসাররা আমাদের সততার সার্চ করলে। সব শুনে গুরুদেব খুব বিরক্ত হলেন।

'অবশেষে নামলুম এসে চাঁদপাল ঘাটে। অনেক জিনিস, —বহু বাদ্যযন্ত্র এনেছি চীন জাপান থেকে। সাত-আট শ টাকার যন্ত্র। শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতভবনে রাখবার জন্যে সে-সব আনা হয়েছিল। পোর্টে যখন মাল নামানো হলো, সেই বাক্সগুলো সার্চ করলে। কিন্তু কলাভবনের জন্যে আনা সেই রাবিং-পোরা বালিশগুলো এড়িয়ে গেল। সে ঠিক্ আসছে আমাদের এই লটবহরের সঙ্গে সঙ্গে। সেটা এড়িয়ে গেল আমার বিছানার সঙ্গে। কলকাতার পোর্টে ঘোরতর তল্লাশী চালিয়ে সবই দেখলে।

'গুরুদেব আর আমরা চলে এলুম। মালপত্তর সম্পর্কে ওরা বললে, —পরে নিয়ে যাবেন। পরে সে-সব Customs office থেকে ছাড়িয়ে আনতে হলো। দেখা গেল, সব কিছু ওলট-পালট, অনেক জিনিস নষ্ট আর তছনছ করে দিয়েছে।

॥ আশ্রম-সংবাদ, ১৩৩১, শ্রাবণ ॥

গত ৬ই শ্রাবণ বিকালবেলা পূজনীয় গুরুদেব দীর্ঘ প্রবাসের পরে আশ্রমে শুভাগমন করেছেন। তাঁর অভ্যর্থনার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সকাল থেকেই রশুন-চৌকির রাগিণীতে উৎসবের দিন নির্দেশ করে দিচ্ছিল। আশ্রমের প্রবেশ-পথ তোরণ ও মঙ্গল-কলসীতে সুসজ্জিত করা হয়েছিল, আশ্রমের ছাত্রীগণ পীত বসনে সজ্জিত হয়ে গুরুদেবের মস্তকে লাজবর্ষণ করেছিল; আর ছাত্রগণ তাঁর চারিপাশে ধ্বজা ছত্রাদি তুলে ধরেছিল, কেউ কেউ শাঁখ বাজাচ্ছিল। তাঁকে অভ্যর্থনার জন্যে শিশুবিভাগের দালানটি সুচারুরূপে সাজানো হয়েছিল। পূজনীয় গুরুদেব আসন গ্রহণ করার পরে বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তাঁকে মাল্যচন্দনে সজ্জিত করেন। তারপরে বেদগান হয় আর শাস্ত্রী মহাশয় তাঁকে সংস্কৃত ভাষায় আশ্রমবাসিগণের পক্ষ থেকে ভক্তিজ্ঞাপন করেন। এর উত্তরে গুরুদেব নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেন। এই সঙ্গে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ও আশ্রমে ফিরে এসেছেন। তাঁকেও সম্ভাষণে মাল্যচন্দন দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়।

৬ই শ্রাবণ (১৩৩১)-এর দিন কয়েক আগে আচার্য নন্দলাল চীন-জাপান ভ্রমণের পর্ব শেষ করে কলকাতা ও বাণীপুর ঘুরে প্রায় চার মাস পরে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে স্বয়ং বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় আর নেপাল রায় মহাশয় আশ্রমের তরফ থেকে বোলপুর স্টেশনে গিয়েছিলেন।

॥ শান্তিনিকেতনে সুসীম চা-চক্র প্রবর্তন ॥

চীন-জাপান ভ্রমণ শেষে শান্তিনিকেতনে এসে আচার্য নন্দলাল কলাভবনের নানা কাজে আর আশ্রমের আনন্দ-উৎসবে যুক্ত হলেন নবতর প্রেরণা নিয়ে। বৃহত্তর প্রাচ্য সমাজ ঘুরে এসে তাঁর মানবপ্রীতি প্রশস্ততর ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হতে লাগল। পূজনীয় গুরুদেব চীন থেকে ফিরে এসে একটি চা-বৈঠকের প্রবর্তন করেছেন। —এর নাম সুসীম চা-চক্র। চীন-ভ্রমণের সময়ে ওঁদের চীনা দোভাষী আর নিত্যসহায় সীমোৎসুর নাম ঘুরিয়ে এই

নামকরণ। সুসীমো বিশ্বভারতীর একজন বিশিষ্ট চীনীয় বন্ধু। তিনি আশ্রমে একটি চা-বৈঠক স্থাপনের জন্যে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন সেইজন্যে তাঁরই নামে এর এই নামকরণ করা হলো। এবং এই সময়ে হলো চা-চক্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

পূজনীয় গুরুদেব প্রথমে এই চক্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। প্রথমতঃ এই হলো আশ্রমের কর্মী আর অধ্যাপকগণের অবসর সময়ে একটি মিলনের ক্ষেত্রের মতো স্থান। এখানে অর্থাৎ চক্রে বসে সকলে একত্র হয়ে আলাপ-আলোচনায় পরস্পরের যোগসূত্র দৃঢ় করতে পারবেন। এ হবে আশ্রমের কর্মী আর অধ্যাপকদের শ্রেণীহীন বৈকালিক মজলিস।

দ্বিতীয়তঃ চীনদেশে চা-পান একটি আর্টের মধ্যে গণ্য। সেখানে এ আমাদের দেশের মতন যেমন তেমনভাবে সম্পন্ন হয় না। গুরুদেব আশা করেন, চীনের এই দৃষ্টান্ত আমাদের ব্যবহারের মধ্যে একটি সৌষ্ঠব ও সুসঙ্গতি দান করবে। আচার্য নন্দলাল বলেন, জাপানে চা-পান হলো যেন পূজার উপচার। এর মিল রয়েছে, আমাদের দেশের তান্ত্রিক চক্রে বসে, কারণ-বারি পান করে পূজা-পদ্ধতির সঙ্গে। সুতরাং যেন-তেন-প্রকারে চা-পান পর্ব সমাপ্ত করলে আমাদের মৌলিক সংস্কৃতির অবমাননা করা হবে। চীনে জাপানে চা-চক্রে 'ভৈরবী চক্রের ছায়া' দেখে ওঁরা 'স্তম্ভিত হয়ে' গিয়েছিলেন।

বর্ষা-ঋতুর জন্যে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চা-চক্রের 'চক্রবর্তী'-পদে অভিষিক্ত হলেন। এর পরে গুরুদেবের নবরচিত একটি গান হয়। গানটি চা-চক্রের উদ্বোধন উপলক্ষে লেখা। কয়েক বছর আগে বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ আশ্রমের মুখ্য অধ্যাপকদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে যেমন ছড়া বেঁধেছিলেন, কবিও তেমনি তাঁদের বিশেষ বৃত্তির ইঙ্গিত দিয়ে এই গীতি-কবিতাটি রচনা করেন। গানটি দিনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গাওয়া হলো। এই গানের মধ্যে যে-সব চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে তাঁরা সে-সময়ে চা-চক্রের নিত্যসভ্য ছিলেন।

গানটি হলো এই :

হায় হায় হায় দিন চলি যায়।

চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকদল চল' চল' চল' হে॥

টগ'বগ'-উচ্ছল কাথলিতল-জল কল' কল' হে।

এল চীনগগন হতে পূর্বপবনস্রোতে শ্যামলরসধরপুঞ্জ॥

শ্রাবণবাসরে রস ঝর' ঝর' ঝরে, ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ দলবল হে।

এস' পুঁথিপরিচারক তদ্ধিতকারক তারক তুমি কাণ্ডারী।

এস' গণিতধুরন্ধর কাব্যপুরন্দর ভূবিবরণভাণ্ডারী।

এস' বিশ্বভারনত শুষ্করুটিনপথ- মরু-পরিচারণক্লান্ত।

এস' হিসাবপত্তরত্রস্ত তহবিল-মিল-ভুল-গ্রস্ত লোচনপ্রান্ত- ছল' ছল' হে।

এস' গীতিবীথিচর তম্বুরকরধর তানতালতলমগ্ন।

এস' চিত্রী চট' পট' ফেলি তুলিকপট রেখাবর্ণবিলগ্ন।

এস' কন্‌স্টিট্যুশন- নিয়মবিভূষণ তর্কে অপরিশ্রান্ত।

এস' কমিটিপলাতক, বিধানঘাতক এস' দিগভ্রান্ত টল' মল' হে॥

—এই গানের পরে সমাগত নিমন্ত্রিতগণ চীন থেকে আনা বিবিধ খাদ্য আনন্দের সঙ্গে ভোজন করলেন।

চা চক্র সম্পর্কে আচার্য নন্দলালের বিবরণ আরও সর্বাত্মক :—

'সেই ১৯২০ সাল থেকে আমরা ক'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলুম —অক্ষয়বাবু, তেজুবাবু, দিনুবাবু আর আমি। আরও ক-জন এখানকার শিক্ষক মিলে দেহলীর নিচেতলায় তাঁর আবাসে দিনুবাবু আমাদের বিকেলের চায়ের ব্যবস্থা করতেন। সেই থেকে হলো চা-চক্রের গোড়াপত্তন। আমাদের চায়ের সঙ্গে নানা রকম খাবারও থাকতো কমলা দেবীর হাতে-করা। আমাদের চা-যোগের তখন সব ব্যবস্থা করতেন কমলা দেবী। কিছুদিন চললো এইভাবে। অধ্যক্ষেরা আসতে লাগলেন, আর মেম্বারও বাড়তে লাগলে। ফলে, দিনুবাবুর দেহলীর বাড়িতে আর অাঁটলো না। চা-চক্র তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। তবে, দিনুবাবু, তেজুবাবু — আমরা সব একসঙ্গেই রইলুম।

'দেহলী থেকে উঠে এসে সুরপুরীতে আমাদের চা-চক্র বসতে লাগলো। সুরপুরী হলো সুরেন ঠাকুরের বাড়ি। দিনুবাবু দেহলী ছেড়ে সুরপুরীতে

গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চা-চক্রও উঠে ওখানে গেল। ওখানে আমাদের চায়ের আড্ডা জমতো সন্ধ্যার সময়ে। চায়ের পরে চলতো দিনুবাবুর মধুর আর দরাজ কণ্ঠের গান।

'চা-চক্রের সভ্যদল বাড়তে লাগলো। আমরা বসলুম গিয়ে লাইব্রেরীর ওপরতলায়। দোতলার খোলা ছাতাতে ঐ যে বেঞ্চির মতন করা আছে আলসে ঘেঁষে, ঐগুলোই ছিল আমাদের বসবার জায়গা। সেই সময়ে দিনুবাবু কিছুদিনের জন্যে আশ্রম ছেড়ে কলকাতা চলে গেলেন। আমাদের চায়ের আড্ডাও ভেঙ্গে গেল। যে ক-জন সভ্য টিকে রইলুম, আমরা লাইব্রেরীর ওপরতলাতেই বসতুম ঐ ভুঁয়ে-ন্যুয়ে বেঞ্চিগুলোর ওপর। সে-সময়ে চা চক্রের মেম্বার সে হবে প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জন। আমাদের সে-আসরে মাঝে মাঝে স্বয়ং গুরুদেব এসে উপস্থিত হতেন। ওখানে চা আর রান্নাঘর থেকে খাবারও আমরা পেতুম মাঝে মাঝে। সে খাবার ছেলেদের জল-খাবারের অংশ থেকেই আসতো। চায়ের দুধও আসতো রান্নাঘর থেকে। চায়ের আসরে বিড়ি সিগারেটও খুব চলতো।

'লাইব্রেরীর ওপরতলায় যখন চা-চক্র চলছে, সেই সময়ে ১৯২৪ সালে চীন থেকে আমরা ফিরে আসার পরে, গুরুদেব আনুষ্ঠানিকভাবে চা-চক্রের উদ্বোধন করলেন। নাম দিলেন —সু-সী-মো চা-চক্র। বিদ্যাভবনের লম্বা হলঘরে এখন (১৯৫৫) কাঠের পার্টিশন দিয়ে তোমরা যেখানে বসো, ওটা তখন একটা গোটা ঘর ছিল। তবে বিদ্যাভবনের পণ্ডিতেরা তখনও বসতেন না ওখানে। ওখানে সে-সময়ে আমাদের কলাভবন চলছে। বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায়। তাঁর বসবার জায়গা ছিল হলের পশ্চিম দিকের ঘরটাতে। ঐ ঘরে বসেই তিনি কাজ করতেন। আমাদের ঐ কলাভবনের হলে-ই চা-চক্রের প্রথম মজলিস উদ্বোধন করলেন গুরুদেব। চা-চক্রের ওপর তাঁর বিখ্যাত গানটি গাওয়া হলো। এই উপলক্ষেই তিনি এই গানটি বেঁধেছিলেন।

'দিনে দিনে চা-চক্র খুবই জমে উঠলো। বিড়ি-সিগারেটের ধুমও বেড়ে গেল। এদিকে আমাদের হৈ-হল্লাতে শাস্ত্রী মশায়ের গবেষণা কাজের ব্যাঘাত

হতে লাগলো। তিনি আপত্তি জানালেন। আমরা ওপর থেকে নিচে নেমে এলুম। নেমে এলুম প্রসন্ন মন নিয়েই।

'লাইব্রেরীর পিছনে ছিল দু-টো মহুয়া গাছ। আমরা নেমে এসে সেই মহুয়া-তলায় চাটাই পেতে চায়ের আসর জমালুম। আপিসের পুবদিকের বারাণ্ডায় একটা প্যাক-বাক্সের ভেতর রাখা থাকতো আমাদের চায়ের সরঞ্জাম। চা-চক্রে চা সার্ভ করবার কাজ করতো তখন আপিসের পিওন —কালো। কিছুদিন চললো। একদিন আমাদের ঐ আস্তানা থেকেও আড্ডা তুলতে হলো। এবারে আপত্তি এলো অফিসারদের তরফ থেকে। আমাদের হল্লার তোড়ে তাঁদের ঠিকে ভুল হয়।

'আবার আমাদের চাটাই উঠলো। চৌমাথায় চৈত্য দেখেছো? —বেলতলায়? আমাদের চাটাই পাতা হলো ঐ বিল্ববৃক্ষতলে। —সে হলো কিচেনে আনাগোনার পথের ধারে। —আমাদের আসর কিন্তু বেশি দিন জমলো না ওখানে। কারণ মান্যগণ্য অধ্যাপকদের লজ্জা হলো এতে। —এই প্রকাশ্য পথের ধারে বসতে। কিন্তু তাতে কি হয়, কিচেন থেকে এখানে সরবরাহটা হতো সোজা। কিছুদিন চললো এইভাবে। এমন সময়ে রথীবাবু বললেন, —আমি কিছু টাকা দেবো, আপনারা চক্রের বাড়ি তৈরি করুন। জায়গা ঠিক করুন চা-চক্রের বাড়ির জন্যে।

'আমরা জায়গা ঠিক করলুম, নাট্যঘরের পিছনে চাতালটায়। ওখানে আগে থাকতেন শাস্ত্রী মশায় আর জগদানন্দবাবু। ঐ পীঠস্থানটাই আমরা ঠিক্ করলুম চা-চক্রের বাড়ির জন্যে। চা-চক্রের আস্তানা বসবে ওখানেই। তখন ওদিকে আবার এক বাধা পড়লো। এই স্থানটি খাস শান্তিনিকেতন আশ্রমের ভেতরে —সেইজন্যে ট্রাস্ট প্রপারটি। আপত্তি হলো এখানে।

'অবশেষে আমরা বেণুকুঞ্জের বাড়ির কাছে, তার দক্ষিণে একটা স্থান ঠিক করলুম। তখন রথীবাবু বললেন, —'আমি টাকা দেবো, কিন্তু ঘরের plan করতে হবে আমার মতে।' ওঁর টাকা আমরা নিলুম না ঐ শর্তে। শেষ পর্যন্ত তাঁর টাকার আর দরকারই হলো না। তিনিও এই টাকার কথা ভুলে গেলেন। আমাদের টাকা এসে গেল অন্য সূত্র থেকে। দিনুবাবু তখন মারা গেলেন সহসা। তাঁর স্ত্রী কমলা দেবী তখনও জীবিত। দিনুবাবুর নামে চা-চক্রের বাড়ি করবার জন্যে তিনি আমাদের কিছু টাকা

পাঠিয়ে দিলেন। সেই টাকাতে এখনকার চা-চক্র বাড়ির ভিত্তি স্থাপন হলো। এই বাড়ির plan আমার করা। এই বাড়িতে চা-চক্র এখনও (১৯৫৩) চলছে। —এর নাম হলো—'দিনান্তিকা চা-চক্র।' —এ নামকরণ গুরুদেবের। 'দিনান্তিকা/দিনেন্দ্র স্মারক চা-চক্র/তদীয় পত্নী/কমলা দেবী কর্তৃক স্থাপিত। ১লা বৈশাখ ১৩৪৬।'

'চা-চক্রের ভার ছিল দিনুবাবুর ওপর। তিনি ছিলেন এর আজীবন 'চক্রবর্তী'। তাঁর অবর্তমানে এর ভার গ্রহণ করেছিলুম আমি। আমাদের চা-চক্র ছিল ডেমোক্র্যাটিক। উঁচু-নিচু ভেদ ছিল না এখানে। ফলে, অনেক গণ্যমান্য অধ্যাপক অফিসারের মানে ঘা পড়লো। তাঁরা আমাদের সঙ্গ ছেড়ে দিলেন। কথায় কথায় গুরুদেবকে আমি বললুম একদিন, যাঁরা বড়ো অধ্যাপক, অফিসার তাঁরা আমাদের চক্র ছাড়ছেন। আমাদের সব মুখ আলগা, উঁচু-নিচু মানিনে আমরা, এই হলো আমাদের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ। আমাদের চক্র ভেঙ্গে যাচ্ছে। শুনে গুরুদেব বললেন —'আচ্ছা, আমি প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমায় তোমাদের চা-চক্রের ব্যবস্থা করবো উত্তরায়ণে। দেখি, সবাই কেমন না আসে।'

'উত্তরায়ণের 'কোণার্কে' চায়ের ব্যবস্থা করলেন। বৌমা চা-চক্রের চায়ের আর তার সঙ্গে খাবারের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। বোধহয় পাঁচ-ছটা অমাবস্যা-পূর্ণিমায় আমরা ওখানে উপস্থিত হয়েছিলুম। চায়ের মজলিসে গুরুদেবের নতুন নতুন কবিতা, গল্প পড়া হতো। গান হতো। সে-সব শুনতে যেত সবাই সেই চা-চক্রের অধিবেশনে। তবে, গুরুদেব বলতেন, —'শুধু আমার শুনলে হবে না, তোমাদেরও গান কবিতা চাই।' আমার ছবি আর স্কেচও নিয়ে যেতে হুকুম করতেন। সকলে মিলে আমার ছবি দেখতেন। ... কিছুদিন চললো এইভাবে। ক্রমে চায়ের সঙ্গে চাট অপ্রতুল হতে লাগলো। আমরাও দেখলুম, ওঁদের অসুবিধা। ফলে, পুনর্মূষিক হয়ে চা-চক্র আবার ফিরে এলো যথাস্থানে। ...আবার চাট-ছাড়া চা আর গল্প নিয়েই আমাদের আসর জমে উঠলো সেই চাটাইয়ের ওপর। আমাদের আলগা মুখের অপরাধও কম ঘটতো না। পাইকারী হারে ক্ষমা চেয়ে সে অপরাধ ক্ষালন করে নিতুম।

'আশ্রমের একটা মিলনকেন্দ্র এই চা-চক্র। বাইরের নতুন বড়ো বড়ো

গেস্ট, প্রোফেসর বা আশ্রমের নতুন কর্মী কেউ এলে তাঁকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হতো চা-চক্রে। শান্তিনিকেতনে সামাজিকতার বড়ো মিলনস্থান হলো আমাদের চক্র। জগদানন্দবাবু, বেনোয়া, সুনীতিবাবু, গুরুদয়াল মল্লিক, জিয়াউদ্দীন —এরা সব নিয়মিত আসতেন চা-চক্রে। আওয়াগড়ের মহারাজা এখানে এলে চা-চক্রে আসতেন। প্রায়ই চক্রে বসে মল্লিকজী তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে ভজন গাইতেন।

'সাধারণতঃ প্রতিদিন সব মেম্বার হয়তো চক্রে অসেন না। কিন্তু, বছরে দু-বার বড়ো ছুটির আগে যে প্রীতিভোজ হয় তাতে জোটেন এসে সবাই। ছোট বড়ো প্রায় কেউ-ই ফাঁক যান না।

'যাকে ভালোবাসি তাকে সাজাতে মন যায়। চা-চক্র আমার একটা প্রিয় সংস্থা। তাই তাকে সুন্দর করবার জন্যে আমি ছেলেদের নিয়ে 'দিনান্তিকার' ওপরে নিচে ফ্রেস্‌কো করলুম। তার বিবরণ 'ফ্রেস্‌কো'-প্রসঙ্গে বলবো। বাড়িটার চারদিকে কিছু রিলিফ্‌ ওয়ার্কস্‌ও করবার ইচ্ছে ছিল। সে আর হয়ে ওঠেনি। এখন আমার শরীর অপটু হওয়ায় (১৯৫২) তেজুবাবুর হাতেই সব ভার চা-চক্রের। ওটা যে উঠে যাবে সে আশঙ্কা আমার নাই।

'চা-চক্রে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী, ভারতীয়-অভারতীয়, হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্ম-খৃস্টান কোনো ভেদ আমাদের মনে আসতো না। কথা বলে যাওয়া হতো বেপরোয়া। একদিন কথা হলো, ইতালীয়দের মতন আমাদের দেশের উড়িয়ারা plumber-এর কাজ বেশি মাত্রায় করে থাকে। এর প্রতিফলে সহসা দেখা গেল, আশ্রমের উড়িয়া প্রধান অধ্যাপক পরের দিন থেকে চক্রে অনুপস্থিত। ঠাট্টা না বোঝায় তাঁর মানে আঘাত লাগলো। তখন আমরা করলুম কি, চক্রের সকল সভ্য মিলে তাঁর কাছে লেখাপড়া করে এ্যাপলজি চেয়ে নিলুম। জিয়াউদ্দীন —পাঞ্জাবী মুসলমান। তিনি ছিলেন চক্রের পাকা সভ্য। কোরাণ থেকে বয়েত্ শোনাতেন তিনি চক্রে বসে। আবার কারো কোনো গলদ থাকলে চক্রে বসেই অপারেশন করা হতো। আত্তাবুদ্দীনের বিমতি জানতে পেরে, চক্রে বসে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করলুম। পরের দিন থেকে তিনি চা-চক্র থেকে অন্তর্ধান করলেন। চা খেতেন না, এমনও কেউ কেউ চা-চক্রে এসে বসতেন —সে আড্ডার মোহে।

॥ কলাভবনে জাপানী চা-চক্রের মহড়া, ১৯৩৭ ॥

'জাপানী মেয়ে হো-সি এলেন (১৯৩৭) শান্তিনিকেতন কলাভবনে। কলাভবনে তিনি একদিন জাপানী টী-সেরিমোনি দেখিয়েছিলেন। দেখালেন সব জাপানী কায়দায়। খুব মজার ব্যাপার। ওরা বলে, এই পদ্ধতি চীন থেকে পেয়েছি। চীন বলে, ভারত থেকে গেছে। ফুল সাজানোর পদ্ধতিটাও জাপান পেয়েছে চীন থেকে; আর চীন পেয়েছে ভারতবর্ষ থেকে।

'হো-সি Tea Ceremony করলেন। এই অনুষ্ঠানে host থাকতে হয় একজনকে। আমাদের ক্ষিতিবাবুকে host করা হলো। host চা তৈরি করবেন আর offer-ও করবেন তিনি। আমরা চার-পাঁচজন হলুম গেস্ট। জাপানী ড্রেস্ পরে, জাপানী কায়দায় পাউডার্-টী—তাতে শেরী মাখিয়ে, bouquet of tea আমাদের অফার করলেন ক্ষিতিবাবু। আর আশ্চর্য, এতে আমাদের তান্ত্রিক পদ্ধতির সব নিদর্শন দেখতে পাওয়া গেল। পাউডার-টী ঠাণ্ডা খেতে হয়। মন্থন করে খেতে হয়। মন্থনদণ্ড দিয়ে মন্থনের ব্যাপারটা আমাদের সেকালের সোমরস মন্থনের মতো যেন। অবশ্য নেশা হয় না এতে। তবে উগ্র খুব। সঙ্গে খাবার-টাবারও ছিল কিছু।...বাঁশের চোঙায় চালগুঁড়ি, কিছু মিষ্টি দিয়ে, আর একটা কাঠি সীল করা হলো। সেই চালগুঁড়ি আর মিষ্টি কিছু খেতে দিলে। খাবার টী-রুমে খেতে নাই। বিধিনিষেধগুলো গরীব সাধুদের ব্যাপার আর-কি। খানিকটা আমাদের তান্ত্রিক চক্রের মতো। গেস্টদের মধ্যে একজন গুরু থাকবেন। তাকেই মদ অফার করতে হয় প্রথমে। এই প্রসঙ্গের বর্ণনার জন্যে 'তত্ত্বাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' বইটা দেখতে পারো। ভৈরবীচক্রের বর্ণনার সঙ্গে মিল আছে। এটা তান্ত্রিক সাধনার একটা রেমন্যান্ট মাত্র। মহাচীনতন্ত্রও দেখতে পার। তিব্বতেও ছিল এই প্রথা। এক পাত্র থেকে চা খেলুম আমরা। তান্ত্রিক মদও এইভাবে খেতে হয়। প্রথমে খাবেন হোস্ট। তার পরে খাবেন গেস্টরা। খাবেন একই পাত্র থেকে। চা যখন সার্ভ করতে আসবে, তখন চলাফেরার শব্দ হবে না একটুকুও। চা তৈরি করবার শব্দ আর ঘোঁটার শব্দ হতে হবে rythmic ভাবে। চাকর আসবে পা টিপে টিপে। আসবে সাপের মতো নিঃশব্দে।

মনে হবে, ঘরের ভেতর যেন কোনও অদৃশ্য মহাপুরুষ বসে আছেন। যেন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ না-হয় কোনোক্রমে। এর মধ্যে তাঁকে চা দিয়ে যেতে হবে।

'গরীবদের কুঁড়ে ঘরের মতো আদল হবে চা চক্রের। তৈরি করতে হবে আর্টিফিসিয়েলী। বাটিটা হবে খর্পরের মতো। —সে হবে হাতে তৈরি করা। যেন মাথার খুলি কেটে তৈরি। চামচটা হবে হাতের হাড় যেন। —এই সব দেখে আমার দৃঢ় ধারণা, সবটাই যেন তান্ত্রিক আচার। এলোমেলো শব্দ নাই কিছুর ; সবই rythmic শব্দ। আবার এতে মেয়েদের চা সবাই খায়। পুরুষদের খাবে না। মেয়েরা ময়াল সাপের মতন প্লাইডিং ; আর পুরুষেরা হলো কাটা কাটা। আমার স্কেচটা মনোযোগ দিয়ে দেখলেই সব বুঝতে পারবে : (১) Tea House বা সাধন কুঠির ? (২) Sky light —যেখান দিয়ে ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার সোনার আলো এসে দেয়ালে পড়ে। (৩) পা-ধোওয়া বাঁশের পাবের মগ বা পাত্র। (৪) সাদা খাদি লিনেন-এর রুমাল কেতলির গরম ঢাকনা ধরবার জন্যে। (৫) মোটা ঢালাই করা লোহার কাতলি চায়ের জল গরম করার জন্যে। (৬) চা তৈরি করার পাত্র বা Tea Pot। দেখতে খর্পরের মতন। চীনা মাটির তৈরি ; রং-টাও খর্পরের মতন। তান্ত্রিকদের কারণ-বারি পান-করা পাত্রের মতন। চক্রে একটিমাত্র পাত্র ব্যবহার করা হয়। তাতেই হোস্ট ও স্বাগত অতিথিরা চা পান করেন। অতিথি তিনজন বা পাঁচজন থাকে। বিজোড় সংখ্যা হওয়া চাই। পাঁচজনের বেশি অতিথি কোনোমতে আসার নিয়ম নাই। ঘরে কোনো রকম শব্দ করা চলবে না। যতক্ষণ থাকবে কেউ কথা কইবে না। খাওয়ার জন্যে চামচ লাগে না। পাত্রতেই মুখ দিয়ে সকলে পান করেন। (৭) আগুন রাখার পাত্র। (৮) কাতলি রাখার stand বা তেপায়া। (৯) Churner বা মাথানি। (১০) চা মন্থন করার ডাঁটি। (১১) কাতলিতে জল ভরার পাত্র। (১২) হোস্ট সব আগে পান করবেন, আর সকলে সেই পাত্রেই বারে বারে খাবেন। (১৩) চা ঠাণ্ডা খেতে হয়। স্বাদ খুব তিতো।

Thoma বাটি

কেতলি (Kettle)

জল গরম করার জন্য

চা তৈরির পাত্র Tea pot

Stand

ওঁ

ভোগে রোগভয়ং
কুলে চ্যুতিভয়ং
বিত্তে নৃপালাদ্
ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং
বলে রিপুভয়ং
রূপে জরায়া
ভয়ম্ ।
শাস্ত্রে বাদভয়ং, গুণে খলভয়ং
কায়ে কৃতান্তাদ্ ভয়ং,
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং
ভুবি নৃণাং
বৈরাগ্য-মেবা-ভয়ম্ ।

অর্থাৎ কিনা বৈরাগ্য বইএর উপর রাগ
করিয়া, মেবা কিনা মেওয়া খাইলে
আর ভয় থাকেনা। নমো নমঃ।

॥ তেজেশচন্দ্র সেন ॥

'আমাদের তেজুবাবু আশ্রমের বহু পুরাতন লোক। তিনি ছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের একজন সরেস ছাত্র। তাঁর আত্মীয়-স্বজনের আশা ছিল, তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় ভালো ফল করবেন। কিন্তু, পরীক্ষা দেবার আগেই তিনি ঘর পালিয়ে চলে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে —রবীন্দ্রনাথের নাম শুনে। প্রথমে আসেন ছাত্র হবার জন্য —সে হলো ১৯০৯ সালের কথা। ঢাকাতেই বাড়ি তাঁর, ভাইদের মধ্যে ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর দাদারা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে আবার ঢাকার স্কুলে ভরতি করে দিলেন। তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলেন। কলেজে ভরতি হলেন। কিন্তু, আবার পালিয়ে এলেন শান্তিনিকেতনে। মহর্ষির জীবনীর 'পরিশিষ্ট' আর ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে ক্ষিতিমোহনবাবুর বক্তৃতা তেজুবাবুকে ঘরের চার-দেওয়ালের মধ্যে টিকতে দিল না। তিনি ব্যাকুল হয়ে চলে এলেন শান্তিনিকেতনে।

'আশ্রমে এখন (১৯১৫) থাকেন তিনি মন্দিরের পাশে —'তালধ্বজে'। তালধ্বজের দক্ষিণে যে পুকুর তার পুব পাড়ে যে পাহাড় তারই পাশে এসে বসে-ছিলেন আমাদের ঘর-পালানো তেজুবাবু তাঁর পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে। উঠলেন গেস্ট হাউসে। কিচেন ছিল তখন লাইব্রেরীর পিছনে—উত্তর দিকে। খাবার সময়ে অনুষ্ঠান হতো মন্ত্রপাঠ— 'সহ নৌ ভুনক্তু।' খাবার সামনে নিয়ে বসে আগেই একসঙ্গে ঐ মন্ত্রপাঠ করতো। সেদিন খেতে দিলে ঝোল ভাত। শুরু হয়েছিল গাওয়া ঘি দিয়ে। টিফিন দেওয়া হলো চিঁড়েভিজে, তাতে বাতাবী লেবুর পাতা কচলে তার রস। রাত্রে খেলেন রুটি। খাচ্ছেন শিক্ষক ছাত্র একসঙ্গে। কিচেনেই দেখলেন, সেই ঢাকার ক্ষিতিবাবু। ক্ষিতিবাবুও দেখে চিনলেন তাঁকে। তেজুবাবু বললেন, আমি চলে এসেছি। সকালে গুরুদেবকে তিনি বললেন তাঁর কাহিনী।

'পরের দিন ভোরে গুরুদেব পায়চারি করছেন শালবীথিতে। তেজুবাবু তাঁর সামনে গিয়ে প্রণাম করলেন। গুরুদেব তক্ষুণি বললেন, —'তোমার থাকবার জন্যে এখানে ব্যবস্থা করে দিয়েছি।' —আর কোনো প্রশ্ন করলেন না তিনি। তেজুবাবু তখন থেকেই রয়ে গেছেন এখানে ছাত্র হয়ে, কর্মী হয়ে।

'আশ্রমের ছোট ছেলেদের পড়াবার ভার দেওয়া হলো তাঁর ওপর। কিছুকাল চালালেন তিনি শিশুদের অধ্যাপনা। আবার তাঁকে কিছুদিনের জন্যে যোগ দিতে হলো কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজের আই-এ ক্লাসে। কিন্তু শান্তিনিকেতনের খোলা মাঠের হাওয়ার টানে কলকাতায় তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন। আই-এ পরীক্ষার জন্যে অপেক্ষা করার তাঁর তর সইলো না। তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে আবার শিশুদের নিয়ে পাঠ পড়ানোয় রত হলেন। আশ্রমে তখন ইলেকট্রিক ছিল না। কেরোসিন তেলে লণ্ঠন জ্বালানো হতো। সন্ধ্যাবেলায় সে আলো জ্বালানোর ভার দেওয়া হলো তেজেশবাবুকে। তখন গুরুদেব তাঁর নাম বদল করে হাসতে হাসতে ডাকতেন, তাঁকে 'তেজসচন্দ্র' বলে।

'জ্ঞানচর্চা ছিল তাঁর জীবনের প্রধান কাজ। বিজ্ঞানের জটিল তথ্যগুলো সরলভাষায় লিখে তাঁর নাম হয়েছিল খুব। হর্টিকালচারে ছিল তাঁর বিশেষ প্রীতি। আশ্রমের বাগান, গাছপালা, তরিতরকারি— এই সব বিষয়ে তাঁর ছিল বিশেষ মমতাবোধ আর উৎসাহ। এই কাজও আশ্রমে তিনি করে এসেছেন বরাবর। ছোট ছেলেমেয়েদের নেচার স্টাডি করাতেন তিনি। এক সময়ে আশ্রমের শোভাবৃদ্ধির জন্যে গাছপালা লাগানো হতো তেজুবাবুর নির্দেশ মতো। গুরুদেব নিজে ছিলেন প্রকৃতি-বিলাসী। তাঁর চিঠিপত্রে তাঁর আশ্রমের বৃক্ষলতায় ফুলফোটার খবর-টবর অনেক কথা লেখা আছে। সেই জন্যে বিশেষ করে 'তরুবিলাসী তেজেশচন্দ্র গুরুদেবের প্রিয় হয়েছিলেন। 'বনবাণী' গ্রন্থে গুরুদেব তেজুবাবুর প্রতি তাঁর প্রীতির কাহিনী লিখে রেখে গেছেন।

'শান্তিনিকেতনে গুরুদেব বৃক্ষরোপণ উৎসব প্রবর্তন করেছিলেন সর্ব প্রথম ১৯২৫ সালে। উত্তরায়ণের ঈশান কোণে 'পঞ্চবটী'র কথা আমরা আগে বলেছি। সেই হলো এই উৎসবের আদি। আশ্রমের ছেলেমেয়েরা নৃত্যগীত করতে করতে পাঁচটি শিশু বৃক্ষের দোলনাটি নির্দিষ্ট স্থানে আনলে। গুরুদেব স্বয়ং গরদের জোড় পরে এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। এই উৎসবের অনুষ্ঠানে তেজুবাবুর ছিল একটি বিশিষ্ট স্থান। তাঁকে 'জোড়' দিয়ে বরণ করা হয়েছিল। সাধারণতঃ তিনি পোষাক পরতেন

পা-জামা আর হাফসার্ট। কিন্তু, সেদিনে জোড় পরে প্রসন্নমূর্তিতে তেজুবাবুকে মানিয়েছিল বেশ।

'শান্তিনিকেতনের 'তালধ্বজ' হলো তেজুবাবুর কীর্তি। মন্দিরের কাছে একটি তালগাছকে ঘিরে তাঁর নিজের থাকার জন্যে আমার সঙ্গে plan করে মাটির একটি ঘর করিয়েছিলেন। স্বয়ং গুরুদেব মন্দিরে বুধবারের উপাসনা আরম্ভ হবার কিছু আগে আসতেন। এসে তেজুবাবুর ঘরের বারাণ্ডায় চুপ করে বসে থাকতেন। মন্দিরে আগমনী ঘণ্টা-বাজা শেষ হলে তিনি ধীরে ধীরে মন্দিরে আসতেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায় এই বাড়িটির নাম রেখেছিলেন —'তালধ্বজ'; আর তেজুবাবুকে সরস করে বলতেন —'রাজা তালধ্বজ'।

'তেজুবাবু ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয়। সুর ছিল তাঁর গলায়। আকাশে মেঘ জমেছে, আর তেজুবাবু তাঁর আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাচ্ছেন। এ দৃশ্য আমার মনে গাঁথা আছে। —স্কেচ্ও করেছি, —তেজুবাবুর বেহালাবাদন।

'আমার অন্তরঙ্গ জীবনে তেজুবাবুর কথা অনেক জমা হয়ে আছে। কত মজা করেছি আমরা। আমরা যখন চীন-জাপানে যাই, বার্মাতে খেতে দিলে নাপ্পি। ভাতের ওপর রুপোর বাটিতে করে নাপ্পি খেতে দিয়েছে। আমরা মনে করি গাওয়া ঘি দিয়েছে। সামান্য মুখে ঠেকিয়েই ওরে বাপ্। কী দুর্গন্ধ! ইঁদুর-পচা গন্ধ! আমি আর ক্ষিতিবাবু খেলুম কিছু। গুরুদেবও খেয়েছিলেন। আমি তাঁকে বললুম, আপনি খাবেন না। —সেই নাপ্পি কিছু সঙ্গে করে এখানে তালধ্বজে তেজুবাবুর স্টোর-রুমে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলুম। পরে, স্টোরে ইঁদুর পচেছে বলে আমরা হৈ চৈ করি। তেজুবাবু বললেন, —না মশায়, আমি তো গন্ধ পাইনি, হলেও, ও বোধহয় শুঁটকী মাছের সুগন্ধ। তিনি সে খেতেন তোয়াজ করে। পরে আমি তাঁকে 'নাপ্পি' বের করে এনে দেখালুম। তিনি শুঁটকী মাছ আর নাপ্পি খেলেন আদর করে।

'আশ্রমে কোনো ছাত্র ভরতি হতে এলে তেজুবাবু তাকিয়ে দেখতেন তার আপাদমস্তক। বলা বাহুল্য, তাঁর সে-চাউনিতে ছেলের প্রাণ উড়ে

যেত ভয়ে। আবার, তেজুবাবু বুঝে উঠতে না-পারলে, বলতেন গিয়ে দ্বিপুবাবুকে। তিনি শিক্ষক-নির্বাচনও করতেন।

'তেজুবাবু ছিলেন নিরিবিলি লোক। আর ছিলেন স্পষ্টবক্তা। তাঁর মতন বন্ধুবৎসল লোক দেখা যায় না বলেই আমার ধারণা। তাঁর তালধ্বজের পরিবেশে আমার বহু সময় কেটেছে। তিনি ছিলেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি নিজে সংসার করেননি; কিন্তু তাঁর প্রিয়জনের অভাব ঘটেনি কোনো দিন। আশ্রমে তিনি স্নেহময়, শ্রদ্ধাপূর্ণ আর শান্তিময় জীবনের আদর্শ রেখে গেছেন। ১৯৬০ সালে আশ্রমেই তাঁর দেহান্ত হয়েছে। এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগে নতুন নতুন শিক্ষক এসে তাঁর কাজের ভার নেবেন। কিন্তু, তেজুবাবুর সে দরদ আর সে নিষ্ঠার তুলনা কাহিনী হয়ে রইলো।

॥ অক্ষয়কুমার রায় ॥

'অক্ষয়বাবুর বাড়ি ছিল বরিশালে। স্বদেশীযুগের লোক তিনি। সেকালের স্বদেশী সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁর। উঁচু মহলে দহরম-মহরমও ছিল বেশ। বিপিন পালের বিশেষ ভক্ত ছিলেন তিনি। শান্তিনিকেতনে এসে হাসপাতালের কাজ নিয়েছিলেন। সেবার কাজ। তিনি একাধারে নার্স আর কম্পাউণ্ডার। কম্পাউণ্ডারি-বিদ্যায় নিয়মিত শিক্ষা ছিল তাঁর।

আশ্রমের ভেতরে বা বাইরে কারও মারাত্মক রকমের কোনো অসুখ-বিসুখ হলে বা কলেরা-বসন্ত হলে সে-রোগীর সেবার ভার নিতেন অক্ষয়বাবু হাসিমুখে। কারও দুরারোগ্য কোনো ব্যাধি হলে তিনি ছিলেন তার একমাত্র সহায়। সাঁওতাল-গ্রামে আর আশ্রমের আশপাশের গাঁয়ের গরীবদের ঘরে ঘরে গিয়ে তিনি দেখাশোনা আর সেবা করে আসতেন।

'আমার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল নিবিড়। তাঁর অনেক সব অনুভূতির কথা তিনি বলতেন আমাকে। স্বদেশীর সময়ে থাকতেন তিনি কলকাতায়। থাকতেন একটা মেসে। মেসে একটা চৌবাচ্চা ছিল। তাতে স্নান করতেন তিনি দুপুর বেলাতে। অক্ষয়বাবু তেল মাখতে ভালোবাসতেন। তেল

মেখে দিন দুপুরে মেসের সেই চৌবাচ্চায় স্নান করতে যেতেন। কিন্তু, আশ্চর্য এই, সেই চৌবাচ্চার পথে দুপুরে যাবার সময়ে তাঁর গায়ে কাঁটা দিত। গায়ে কাঁটা দিত শীত গ্রীষ্ম সব কালেই। তিনি এর কারণ বুঝতে পারতেন না। তাঁর ঘরটা থেকে চৌবাচ্চাতে যেতে আরও দু-তিনটে ঘর পেরিয়ে যেতে হতো। তিনি তখন যুবক, সময় ভর দুপুর, অথচ রোজ রোজ এই ভয় হয় কেন? কিছুদিন পরে তিনি ভালোভাবে খোঁজ নিয়ে জানলেন, ওঁর পথের ধারের দু-খানা ঘরের একটাতে, অনেক আগে একটি মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। —ঠিক এই বেলা বারোটার সময়ে।

'আমি অক্ষয়বাবুর কাছে শুনে গুরুদেবকে বললুম ঘটনাটা। বলে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, —ব্যাপারটা কি? গুরুদেব বললেন, —'যেখানে যে বিশেষ ঘটনা ঘটে থাকে সেখানে সেই ঘটনার বিকিরণে একটা অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার তৈরি হয়ে থাকে। ছাপ পড়ে। যেমন আমাদের এই আশ্রমে মহর্ষির সাধনার ছাপ রয়েছে। আর সে ছাপ একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। আমরা তীর্থদর্শনে যাই কেন। কারণ সেখানে যুগযুগান্তের সাধনা-ধারার সম্মিলনে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে আছে। আমাদের সূক্ষ্ম মন তীর্থস্থানে গেলে সেই ছাপটি ঠিক ঠিক অনুভব করতে পারে। এরই নাম হলো তীর্থমাহাত্ম্য। তীর্থে যাবে —তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য পাবে। ভূতের স্পিরিটটা ঐ মেসের ঘরে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিল। এবং অক্ষয়বাবুর সূক্ষ্ম অনুভূতিতে তার ছাপ পড়েছিল।' —গুরুদেবের এই ব্যাখ্যা শুনে আমার খুব ভালো লাগলো। ঠিক বলেই মনে হলো। কারণ এর আগে আশ্রমে এসে এখানকার ছাপ আমি পেয়েছিলুম দু-রকম-ভাবে। মল্লিকজী একবার বলেছিলেন, —মন্দিরের পুকুরের পাশে বটগাছতলায় মহর্ষি বসে সূর্য-উপাসনা করতেন। সূর্য উদয় হচ্ছে। মহর্ষি তা প্রত্যক্ষ করছেন। তাঁর মনেরও মালিন্য ধুয়ে যাচ্ছে।

'তাঁর সেই তপস্যার ফলে আশ্রমের সবই যেন সূর্যময় হয়ে গেল। এই রকম একটা অনুভূতি এখানে আমারও হতো ওদিকে গেলেই। আমাদের আশ্রমের মন্দিরে আচার্যের চারিত্রিক প্রভায় এখানকার তীর্থমাহাত্ম্য বিশেষভাবে আমাদের মনে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। ওখানে এই মূল্যবোধ নির্মূল করে নাটমন্দিরের চৌকো ন্যাড়া ছাতের মতন, কোনোদিন যে

গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে, সে অপঘাতের আশঙ্কা আমার নাই।

'আর একটা অনুভূতি আমার হয়েছিল তার বিবরণ আগে দেওয়া হয়েছে। —১৯১৪ সালে গুরুদেব আশ্রমে আমাকে প্রথম অভ্যর্থনা করলেন। পদ্মফুলের মালা দিলেন আমার গলায়। অভ্যর্থনার শেষে ফিরে গেলুম কালাচাঁদবাবুর বাড়িতে। একজন বৈষ্ণব কীর্তন শোনালেন। আমি হঠাৎ ভুলে গেলুম সবার অস্তিত্ব, এমন কি আমারও। বাইরের একটা ঘরে আমার থাকবার জায়গা। দাঁড়িয়ে আছি দরজা-গোড়ায় বারাণ্ডায়। হঠাৎ মাথাটা আমার ঘুরে গেল। আর দেখলুম কি, আমার গায়ের ভেতর দিয়ে হাওয়া পাস্ করছে। দেহটা আমার স্বচ্ছ হয়ে গেছে। দেহটার অস্তিত্ব রয়েছে বটে, কিন্তু, সেটা ফাঁক। তার ভেতর দিয়ে বাইরের হাওয়া চলাচল করছে। আমার দেহের ভেতরেই সব যেন এক হয়ে গেল। এই রকম ঘটনা এই আশ্রমের পরিবেশেই আমার ঘটেছে। —এই তো তীর্থমাহাত্ম্য।

'যাই হোক, অক্ষয়বাবুর অনুভূতির কথা বলতে বলতে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। আমাদের শ্রীনিকেতনের স্বাস্থ্য-বিভাগ তখনও তৈরি হয়নি। তখনকার কথা। অক্ষয়বাবু কোন্ গাঁয়ে সেবা করতে গিয়েছিলেন ; বোধহয় কুষ্ঠরোগীর। ফলে, হঠাৎ এক সময়ে তাঁর দেহেও আক্রমণ হলো ঐ রোগের। দীনবন্ধু এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব বড়ো ভালোবাসতেন অক্ষয়বাবুকে। তিনি তখন দিল্লীতে। কিন্তু অক্ষয়বাবুর এই অসুখের সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি দিল্লী ছেড়ে চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। অক্ষয়বাবুকে নিয়ে গিয়ে তিনি ভরতি করে দিলেন কলকাতায় গোবরার কুষ্ঠ হাসপাতালে। হাসপাতালের যাবতীয় খরচা বহন করলেন এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব। শুধু কি তাই? তিনি যেখানেই থাকুন, প্রায় মাসে মাসে গিয়ে দেখে আসতেন। অক্ষয়বাবুর মহাব্যাধি চিকিৎসার গুণে প্রায় সেরে এসেছিল। কিন্তু, একসময়ে তিনি দেশে ফিরে গিয়ে মারা গেলেন শেষে আমাশয়ে ভুগে।

॥ প্রতিমালক্ষণের পুঁথি ॥

১৯২৪ সালে বিশ্বভারতী-শ্রীনিকেতন থেকে 'ভূমিলক্ষ্মী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বের হয়। সম্পাদক ছিলেন শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু আর শ্রীনিকেতনের কৃষিবিৎ সন্তোষবিহারী বসু। ফণীন্দ্রবাবু তখন বিশ্বভারতী-লাইব্রেরীতে পুঁথি নিয়েও নাড়াচাড়া করতেন। এখানে এই সময়ে শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধেও কিছু পুঁথি তাঁর গোচরে আসে। এর মধ্যে ভারতশিল্পে 'প্রতিমালক্ষণ' নামে একখানি পুঁথির পরিচয় তিনি প্রকাশ করেন ১৩৩১ সালের ভাদ্র সংখ্যার 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকায়। আচার্য নন্দলালের সঙ্গে আলোচনা করে ফণীন্দ্রবাবু এই বিষয়ে লিখেছেন:—
বিশ্বভারতী-লাইব্রেরীতে শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধেও কিছু পুথি আছে। সেই সব পুথির মধ্যে (১) বাস্তুপ্রকরণম্ (২) কাশ্যপ-সংহিতা ও (৩) মূলস্তম্ভ-পুরাণম্ উল্লেখযোগ্য। শিল্পশাস্ত্রের পুথি আজকাল দুষ্প্রাপ্য, সেইজন্য এই তিনখানি পুথি খুব মূল্যবান মনে হয়। এর মধ্যে কাশ্যপ-সংহিতার ও তার সঙ্গে যে প্রতিমালক্ষণ আছে তার কিছু পরিচয় দেব। এটি তালপাতায় মালয়ালম অক্ষরে লেখা, মোট ৯৪ পৃষ্ঠা, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৭।৮ লাইন লেখা আছে। আকার ১৫"×১৫"। তবে পুথির বয়স বা লেখকের কিছুই উল্লেখ নাই। এর প্রারম্ভে একটি সূচী দেওয়া আছে, তা থেকে এর আলোচ্য বিষয়টি বেশ বোঝা যাবে। যথা—

অধিষ্ঠানম্	২ (পৃষ্ঠা)	একাদশতলম্	১৯ (পৃষ্ঠা)
একতলম্	৬ (,,)	দ্বাদশতলম্	২০ (,,)
দ্বিতলম্	৭ (,,)	ত্রয়োদশতলম্	২০ (,,)
ত্রিতলম্	১০ (,,)	ষোড়শতলম্	২১ (,,)
চতুর্ভূমি	১২ (,,)	প্রাকার	
পঞ্চভূমি	১৪ (,,)	মণ্ডপঃ	২৬ (,,)
ষড়ভূমি	১৬ (,,)	গোপুরম্	২৯ (,,)
সপ্তভূমি		পরিবারবিধি	৩১ (,,)
দশভূমি	১৭ (,,)	পরিবারপ্রলয়শ্চ	৩৩ (,,)

সূচী এই অবধি এসে হঠাৎ থেমে গেছে, হয়ত বাকি পৃষ্ঠাটা নষ্ট হয়ে গেছে। এর পরে আসল মূল আরম্ভ হয়েছে—

"হরিঃ শ্রীগণপতয়ে নমঃ অবিঘ্নমস্তু।"

দুঃখের বিষয়, এই পুথিটি হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। শেষ হবার পর একটা সাদা তালপাতা আছে, তারপর আবার চারের পৃষ্ঠায় লেখা আছে। এই শেষ অংশটি আমাদের আলোচ্য বিষয়। এটি আরম্ভ হয়েছে এইভাবে—

"মার্কণ্ডেয় মত বাস্তুশাস্ত্রং প্রতিমালক্ষণম্।"

এর পরে যে অংশ আছে তা একটি অধ্যায়ের শেষ অংশ। সেই অধ্যায়ের শেষে আছে—

"ইতি মার্কণ্ডেয়মতে বাস্তুশাস্ত্রে দেবালয়বিধিঃ সমাপ্ত।"

এতে মনে হয়, মার্কণ্ডেয়-লিখিত যে বাস্তুশাস্ত্র পূর্বে প্রচলিত ছিল, এখানে তারই দু-টি অধ্যায় —দেবালয়-বিধি ও প্রতিমালক্ষণের ছিন্ন অংশ রয়েছে। সুখের বিষয়, প্রতিমালক্ষণ অধ্যায়টি সম্পূর্ণ আছে। প্রতিমা সম্বন্ধে বেশি বই পাওয়া যায় না। যা কিছু পাওয়া যায় তা শুক্রনীতি, বৃহৎসংহিতা ও দু-একটি পুরাণে আছে। সেই হিসাবে আলোচ্য প্রতিমালক্ষণটি মূল্যবান বলে মনে হয়। তবে এটি কার রচিত ঠিক করা শক্ত। প্রথমতঃ এটি কাশ্যপসংহিতার সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে; দ্বিতীয়তঃ আরম্ভে এটিকে মার্কণ্ডেয়ের লেখা বলা হচ্ছে। আবার এই অধ্যায়ের শেষে এটিকে বিশ্বকর্মার লেখা বলা হয়েছে যেমন — ইতি বিশ্বকর্ম কৃতে সারসমুচ্চাত্তে প্রতিমালক্ষণম্ বিধানং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।'

সুতরাং এর লেখক কে তা বলা শক্ত। এই বইটিতে প্রতিমার মাপ কি রকম হবে তার আলোচনা করা হয়েছে, এই মাপের সঙ্গে শুক্রনীতির দেওয়া মাপের অনেক মিল আছে। এটির আরম্ভ এই রকম :—

"অথ তৎ প্রবক্ষ্যামি প্রতিমামললক্ষণম্।
ভূবিয্যাব্যগর্ভস্য বিস্তারং দ্বাবিংশতি ভাগশঃ।
দ্বারশ্চ দ্বিত্রিদীর্ঘমেক বিংশতি ভাগশঃ।"

এর শেষ অংশ ঃ—

"সর্বলক্ষণমিত্যুক্তং আচার্যানান্তথোক্তিতা।
শিল্পিনাং সর্ব য়গেন্নেৎ বুদ্ধিমান্ বিদুঃ।
ইতি বিশ্বকর্মকৃতে সারসমুচ্যতে প্রতিমালক্ষণ-
বিধানং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।"

চীন-জাপান থেকে ফেরবার পরে রবীন্দ্রনাথ আর্ট সম্পর্কে ভাষণ দেন। ভ্রমণ-বিবরণও বলেছিলেন। সে প্রবাসীতে (১৩৩১, কার্ত্তিক) প্রকাশিত হয়েছিল। চীন সম্বন্ধে ক্ষিতিমোহনবাবু গল্প বলেছিলেন শান্তিনিকেতনে। কলাভবনে ছাত্রেরাও চীন-জাপানের চিত্রকলা নিয়ে আলোচনা করছিলেন আগে থেকেই। আচার্য নন্দলালের নির্দেশে তাঁর ছাত্র শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত চীন জাপানের চিত্রকলার ইতিহাস বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তিনি যা লিখেছিলেন সে হাতে-লেখা পত্রিকা 'বিশ্বভারতী'র প্রথম বর্ষের তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যায় (কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩১৮) সংকলিত হয়েছিল। 'বিশ্বভারতী'র সেই রচনা-সংকলন অতি আবশ্যক-বোধে প্রসঙ্গতঃ উদ্ধার করে দেওয়া হলো। কারণ, নন্দলাল বলেন, —'ওকাকুরা বলেছিলেন Asia is One অর্থাৎ প্রাচ্যভূমির একই ভাও। তফাৎ যেটুকু সে হলো দেশে দেশে পাশ্চাত্য প্রভাবের উত্তাপের ডিগ্রীর তারতম্যে। প্রাচ্যভূমির শিল্পাদর্শও মূলতঃ এক। সুতরাং ভারতশিল্পকে বুঝতে চাইলে চীন-জাপানের শিল্পকলাও বুঝতে হবে বিধিমতে। এশিয়ার সব রকম আদর্শ ছিল সে প্রায় একই; পার্থক্য যেটুকু সে হলো মাত্র পরিবেশের মাত্রাভেদে।'

॥ চীনের চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু ॥

চীনের প্রতিভা চিত্রকলার ভিতর যেমন প্রকাশ পেয়েছে, অন্য কিছুর ভিতর তেমন পায়নি। চীনকে জানতে হলে তার চিত্রকলার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। চীনে বর্ণমালা আর চিত্র এক মূল থেকেই উদ্ভুত। পুরাতন চীনে অক্ষর কোনো বস্তুর যথার্থ সাদৃশ দিতে চেষ্টা

করতো। এই সাদৃশ্য প্রকাশ করার চীনে পরিভাষা হলো —'ওয়েন'। এই লেখায় কোনো ঘটনা চিত্রদ্বারা ব্যক্ত করা হতো। লেখক তাতে ব্যক্তিগত ভাব প্রকাশ করতে পারতো না। ক্রমে এই চিত্রাক্ষর বিশেষ কোনো চিহ্নে পরিণত হলে ব্যক্তিগত ভাব প্রকাশের উপযোগী হতো। এই চিত্রাক্ষরকে আইডিওগ্রাফ্ বলা হয়, এ কেবল ভাব প্রকাশ করে, কিন্তু শব্দ প্রকাশ করে না। অনেক পরে এই অক্ষর ধ্বনিদ্যোতক বা phonetical হয়েছিল। আর সেই থেকেই চিত্র আলাদা হয়ে গেল লিখিত ভাষা থেকে। এই সময়ে সিয়েন আর হ্যান্ রাজত্বের কাছাকাছি চীনের চিত্রকলাকে আর্ট হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। চিত্র লিখিত ভাষা থেকে ক্রমশঃ মুক্তি পেয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজের সত্তাকে প্রকাশ করেছিল।

চীনের চিত্রকলার উদ্ভবের কারণ বিভিন্ন যুগের চিত্রাবলীর ভিতর প্রচ্ছন্ন আছে। চীনে চিত্রকরেরা ছবি আঁকে না, বরং ছবি লেখে। এই ছবি লেখার নাম হলো —ক্যালিগ্রাফি বা লিপিকলা। চীনের চিত্রের মতন পারস্য ও জাপানের চিত্রও ক্যালিগ্রাফিক আর্টের অন্তর্গত।

জাপানী চিত্র চীনের চিত্রের কাছাকাছি, কারণ চীনই জাপানের গুরু। পারস্যের চিত্র কিছু ভিন্ন রকমের। তারাও ছবি হিসাবে আঁকেনি, বই চিত্রিত করবার জন্যে এঁকেছে। রেখার কোনো বিশেষত্ব নাই। রেখার কাজ হলো বস্তুর সীমানা নির্দেশ করে দেওয়া। চীনের চিত্রের রেখা তা নয়। তার টানে-টোনে এমন একটা কৌশল, এবং ছন্দ আছে, যা কেবল বস্তুর সীমানা নির্দেশ করে না, তার বিশেষত্ব বা character ফুটিয়ে তোলে।

চীনের চিত্রকরেরা তুলি-চালনায় আশ্চর্য দক্ষতা লাভ করেছিল। তুলির টানে যেমন জোর তেমনি নমনীয়তা রয়েছে। অবলীলাক্রমে তারা তুলি চালিয়ে ছবি ফুটিয়ে তোলে। এ যেন খেলা। প্রত্যেক বস্তুর একটি ভাষা আছে। প্রত্যেক বস্তুর রেখায় ভিন্নতা আছে। তুলির টানে সে-ভিন্নতা ধরা পড়ে। প্রত্যেক বস্তু আঁকতে তারা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কন-রীতি বা technique অবলম্বন করে। বিভিন্ন বস্তুতে বিভিন্ন রকমের লাইন ব্যবহার করে। তার নাম রয়েছে, যেমন ঘাসের শাষের লাইন, জলে-ভেজা সুতোর লাইন —এই সব। চীনা-শাস্ত্রে এ সম্পর্কে অনেক লেখা আছে।

সমগ্র এশিয়ার এক ঐক্য আছে। সেই ঐক্য হলো রেখায়। য়ুরোপীয় আর্টের ঐক্য হচ্ছে মূর্তির আকার আর ডৌলের মধ্যে। সে জন্যে য়ুরোপীয় আর্টের ঝোঁক রিয়েলিজম্ বা বাস্তব জগতের হুবহু প্রকাশের দিকে; আর এশিয়ার আর্টের ঝোঁক আইডিয়ালিজমের দিকে। তার প্রকাশ অলঙ্করণ বা ornamental। অবশ্য পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আর্টের এই সীমাভাগ সব সময়ে টেনে দেওয়া যায় না। প্রাচীন খৃস্টীয় আর্ট, এশিয়ার আর্টের কাছাকাছি। গথিক মন্দিরের চারদিকের সাধুদের ভাস্কর্য আর ভিতরে মেরী ও খৃস্টের জীবন-চিত্র দেখলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

পরে রেনেসাঁসের যুগে আর্টের ভিতর যখন পরিপ্রেক্ষণ, আলো ও ছায়ার সম্পাত সম্পর্কিত প্রকৃতির নিয়ম ঢুকলো, তখনই আর্ট আইডিয়ালিজম্ থেকে রিয়েলিজমের দিকে ঝুঁকে পড়লো। প্রাচীন দেবদেবীরা তাদের দেবত্ব থেকে মানবত্ব পেল।

আর্টের মধ্যে দুটো দিক্ আছে। একটা হলো ইন্‌টেলেক্ট বা বিজ্ঞানের দিক; আর একটা কল্পনা বা সৃষ্টির দিক। য়ুরোপের ঝোঁক হলো বিজ্ঞানের দিকে, আর এশিয়ার ঝোঁক সৃষ্টির দিকে। আমাদের দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অধিকাংশই আমাদের আর্টকে পছন্দ করে না, কারণ তাদের গ্রন্থপুষ্ট মস্তিষ্ক সমস্ত জিনিসই বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করে বুঝতে যায়। তাদের মস্তিষ্কে কল্পনার স্থান শূন্য। কাজেই ছবি যখন এই বাইরের দৃশ্যমান বাস্তব জগতের সীমানা ছাড়িয়ে কল্পলোকে গিয়ে পৌঁছায়, সেখানে তারা থই পায় না। কোনো আর্টিস্ট যদি হুবহু ঠিক করে কিছু আঁকতে পারে, তারা তার তারিফ করতে থাকে। তখন তাদের বোঝার আর কিছু বাকি থাকে না; সব ঠিক্ পরিষ্কার জলের মতন বুঝে যায়।

গ্রীক্ ভাস্কর প্রেক্সাইটাল্‌স্ আঙ্গুরের গাছ এমন স্বাভাবিক করে খোদাই করেছিলেন যে পাখী তাকে সত্যি মনে করে ঠোকর মারতো। চীনের এক চিত্রকর সম্পর্কে একটি আখ্যান আছে, তিনি দেওয়ালের ওপর ড্রাগন এঁকেছিলেন। যখন শেষ বর্ণপাত হলো, ড্রাগন তখন প্রাণবান্ হয়ে বাড়ির ছাদ ভেঙেচুরে আকাশে উড়ে গিয়েছিল। এই আখ্যান থেকে চীনের

আর্টের একটা দিক্ বোঝা যাবে। তাদের আদর্শ হচ্ছে ছবির রেখায়-রেখায় ছন্দে-ছন্দে জীবনের স্পন্দন আনা।

চীনের চিত্রে গীতি-কাব্যের দিকটা প্রধান। ওদের প্রবাদ: ছবি হলো শব্দহীন কবিতা। ওদের প্রাচীন চিত্রসম্ভার বেশির ভাগই লুপ্ত হয়ে গেছে। কেবল চতুর্থ শতাব্দের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর কু-কাই-চিনের ক-খানা আছে। চিত্রের উদ্ভব প্রথম কবে হয়েছিল, তা ঠিক করে বলা যায় না; তবে চীনা সাহিত্যে উল্লেখ আছে, খৃস্টপূর্ব প্রায় তিন হাজার বছর আগে চীনা চিত্রের জন্ম হয়েছিল। এতো পুরানো হোক্ বা না-হোক্, অন্ততঃ খৃস্টপূর্ব দেড় হাজার বৎসর আগে ছিল। প্রমাণ আছে, তখন চিত্রকরেরা তস্বির আঁকতো। ধাতুপাত্রের ব্যবহার খৃস্টপূর্ব বহু প্রাচীন কাল থেকে ছিল। সে-সময়ে ব্রোঞ্জের তৈরি নানা-রকম পাত্র আর ধূপদানি এখনও রয়েছে। সব পাত্রে রয়েছে আশ্চর্য কারুকার্য।

বুদ্ধদেবের সমকালের কনফুসিয়াসের দীক্ষার আর্ট চিত্রবিদ্যার উৎসাহ পায়। মিস্টিক সাধক তাও মতের প্রচারক লাওটসের দীক্ষার চিত্রে এবং সাহিত্যে কল্পনার বিকাশ হয়েছিল। আর্টের ভিতর একটা দ্বিত্বের ভাব আছে। তার একটা হলো শৃঙ্খলা আর নিয়মানুগতা। আর একটা হলো শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য। উভয় সাধকের দীক্ষায় এই দু-টি দিক।

কু-কাই-চি-এর ছবি খুব সমাদর লাভ করেছিল। একটি ঘটনা থেকে জানা যায়, একবার একটি বৌদ্ধমঠ স্থাপনের জন্যে তাঁর কাছে চাঁদা চাওয়া হয়। শিল্পী লক্ষ মুদ্রা দান করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। বৌদ্ধ পুরোহিতেরা তাঁকে বিদ্রূপ করেন। তখন তিনি একমাস সময় প্রার্থনা করে নিজে ঘরের ভিতর বন্ধ থাকেন। এক মাস পরে যখন দরজা খুললেন তখন দেখা গেল, দেওয়ালে আঁকা বৌদ্ধসাধক বিমলাকীর্তির প্রমাণ-মূর্তি ঘরটিকে উজ্জ্বল করে শোভা পাচ্ছে। দলে দলে দর্শক আসতে লাগলো; আর দর্শনী দিয়ে শিল্পীর প্রতিশ্রুত অর্থ পূরণ করে দিলে।

তাঁর একটি ছবির কিছু অংশ আছে বিলাতের যাদুঘরে, নাম—কেশ-প্রসাধন। দাসী একটি মহিলার চুল আঁচড়িয়ে দিচ্ছে সামনে একটা গোল আয়না, আর কতকগুলি কৌটো রয়েছে। তাঁর আরও দু-একখানা ছবি পাওয়া গেছে, আর সব নষ্ট হয়েছে। সে-সব ছবির নাম—'সৎকীর্তি সাধু,'

'স্বর্গের সুন্দরীত্রয়ী,' 'শীতে ঘুমভাঙ্গা বসন্তের ড্রাগন,' 'বীণা-নির্মাণ,' 'বাঘ', 'চিতা ও শকুন,' 'বৌদ্ধসঙ্ঘ' ইত্যাদি। ড্রাগন আর বাঘ চীনা-চিত্রে খুব বড়ো আসন পেয়েছে। অধিকাংশ শিল্পীই এই উভয়ের একটি বিষয় নিয়ে ছবি এঁকেছেন। চীনাদের কাছে বাঘ হচ্ছে শক্তির প্রতীক, আর ড্রাগন হলো আত্মার প্রতীক।

চীনা-কাব্যরসিকদের মধ্যে এক রকম সাহিত্যের খেলা প্রচলিত ছিল। কু-কাই চি-র বন্ধুমহলে এই খেলা হচ্ছিল। প্রস্তাব হলো, একটা ভয়ের ছবি কল্পনার। নানাজনে নানারকম কথা বললে। শেষে চিত্রকর বললেন, —একজন অন্ধ একটি অন্ধ-ঘোড়ায় চেপে অতলস্পর্শ একটি হ্রদের কিনারায় এসে পড়েছে। এক বন্ধু এ-ছবি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেলেন, কারণ তাঁর চোখ কিছু খারাপ ছিল। চিত্রকরের কল্পনার জোর এ থেকে আন্দাজ করা যাবে।

চতুর্থ শতাব্দ থেকে একেবারে অষ্টম শতাব্দে এসে পড়তে হয়। এই সময়ের মধ্যে ভালো ভাস্কর্যের নমুনা পাওয়া যায়; কিন্তু, ভালো চিত্রের নমুনা মেলে না। এ-সময়ে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব চীনে এসে পড়েছিল। বৌদ্ধ অর্থাৎ যাঁরা ভারত থেকে চীনে ধর্ম ও শিক্ষা প্রচার করতে এসেছিলেন তাঁদের প্রস্তরমূর্তি গড়েছেন শিল্পীরা। এই সব মূর্তির মধ্যে অনেক বাঙ্গালী পণ্ডিতের সাদৃশ্য দেখা যায়। বৌদ্ধ দেবদেবীরা চীনে এসে নতুন নাম পেলেন। যেমন, করুণার দেবতা অবলোকিতেশ্বর চীনে এসে হলেন কোনান্-ইন, আর জাপানে হয়েছেন কোয়ান্নন। হারীতি দেবী ভারতে শিশুভক্ষণকারী; কিন্তু চীনে শিশুরক্ষণকারী। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে চীনে সভ্যতার যে মিলন চলছিল তার ফল ফললো টেঙ্-রাজত্বের সময়ে।

ষষ্ঠ শতাব্দে হসিয়ে-হো, যাঁর জাপানে নাম হচ্ছে শাকাকু তিনি আর্টের ষড়ঙ্গ লিখেছেন। ভারতীয় ষড়ঙ্গের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ তার তুলনা করেছেন সে-কথা আমরা আগে বলেছি। চীনারা তাদের আর্ট সম্পর্কে কি ভাবে, তা এই ছ-টি নিয়মের মধ্যে আছে। —(১) প্রতি বস্তুতে জীবনের স্পন্দন বা ছন্দ অঙ্কন করবার জন্যে আত্মার জ্ঞান, (২) তুলির দ্বারা দেহের অস্থি-সংস্থান অঙ্কন, (৩) স্বভাবের সঙ্গে অঙ্কিত বস্তুর সাদৃশ্য,

(৪) বস্তুর সাদৃশ্যে বর্ণপাত (৫) প্রয়োজন আর গুরুত্ব-অনুসারে রেখাবিন্যাস, আর (৬) কল্পনার উপযোগী রূপ-সৃষ্টি। —রবীন্দ্রনাথের মতে, যা 'সামঞ্জস্যে ঐক্য' বা Harmonic Unity, সেই হলো চীনাদের 'ছন্দে প্রাণশক্তির বিকাশ' বা Rhythmic Vitality। আর্টের বন্ধন ও মুক্তির বিবরণ মিলবে এই চীনা ষড়ঙ্গের মধ্যে।

টেঙ্-রাজত্বের সময়েই (খৃ ৬১৮-৯০৯) চীনের আর্ট সবচেয়ে উন্নত হয়েছিল। এই সময়েই বৌদ্ধধর্মের আদর্শ তাদের কল্পনাকে পুষ্ট করে সাহিত্য আর শিল্পকলাকে মহত্তর করেছিল। টেঙ্-রাজত্বের রাজধানী লো-ইয়াঙ নগরে তিন শো বৌদ্ধ সাধু এবং আরও অনেক ভারতীয় বাস করে ভারতীয় সভ্যতা প্রচার করেছিল। অষ্টম শতাব্দের সম্রাট মিং-হুয়াঙ্ তাঁর সভায় বড়ো বড়ো চিত্রকর আর কবিদের আসন দিয়েছিলেন। চীনের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর উ-তাও-ৎসু এবং এক শ্রেষ্ঠ কবি লি-পো সম্রাটের শাসনকালকে গৌরবিত করেছিলেন। উ-তাও-ৎসুর তুলিচালনায় অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। চিত্রকর একবার এক দেবতার মূর্তি আঁকছিলেন। সে-স্থানে যুবা বৃদ্ধ শিক্ষিত অশিক্ষিত যোদ্ধা মজুর সবরকম লোক জমে গিয়েছিল তাঁর কাজ দেখবার জন্যে। শিল্পী তুলির একটানে দেবতার আলোকমণ্ডল এঁকে ফেললেন। প্রথম বয়সে তিনি সরু তুলি, পরে মোটা তুলি ব্যবহার করতেন। চীনের পরবর্তী লেখকেরা তাঁর ছবি সম্পর্কে অনেক লিখেছেন। তার বর্ণনা আমাদের কল্পনাকে প্রলুব্ধ করে। তাঁর অধিকাংশ ছবিই নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর বিখ্যাত ছবি বুদ্ধের মহানির্বাণ। মূল ছবিটি নাই। পুরাতন এক জাপানী আর্টিস্টের নকল বিলাতের যাদুঘরে রাখা আছে। চারদিকে ক্রন্দনের রোল,—রাজা প্রজা সাধু যোদ্ধা দেবযোনি দেবদেবী পশুপক্ষী সমস্ত সৃষ্টি চীৎকার করছে ; মধ্যে বুদ্ধদেব শান্তিতে শয়ান। সকল ছবিতেই শিল্পীর কল্পনার বিরাট ভাব অনুভব করা যায়। মূল ছবি না জানি কি ছিল। বৌদ্ধবিষয়ে শিল্পী আরও ছবি এঁকেছেন —'শাক্যমুনি', 'বোধিসত্ত্ব,' 'সামন্তভদ্র', 'মঞ্জুশ্রী'।

শিল্পীর শেষ ছবি হলো একটি landscape বা স্থানচিত্র। এটির সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে। সম্রাট বলেছিলেন, এই ছবি আঁকতে। আঁকা শেষ করে, শিল্পী তার আবরণ খুলে দেখালেন। সম্রাট্ মুগ্ধ

হয়ে দেখলেন,—অপূর্ব দৃশ্য —বন, পর্বত, পর্বতের ওপরে মানুষ, অনেক দূরে আকাশে পাখীর দল উড়ে চলেছে। শিল্পী বললেন, দেখুন সম্রাট্,— পর্বতের গহ্বরে এক দেবযোনি বাস করে। —এই কথা বলে, তিনি হাততালি দিলেন, আর অমনি গহ্বরের প্রবেশ-পথ খুলে গেল। শিল্পী আবার বললেন, —এর ভেতর অনিন্দ্যসুন্দর পথ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। —এই বলে শিল্পী ভেতরে ঢুকলেন, আর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বিস্ময়াবিষ্ট সম্রাট্ কিছু বলার আগেই দেখলেন, সমস্ত ছবিখানা লুপ্ত হয়ে গেছে, পড়ে রয়েছে কেবল খালি সাদা দেওয়াল।

এই সময় থেকে স্থানচিত্রের খুব আদর শুরু হয়। লি-সু-হিসুন, ওয়াঙ-উই স্থানচিত্রশিল্পী হিসাবে বিখ্যাত। এঁরা লম্বা লম্বা স্থানচিত্রের roll এঁকেছেন। এ-ছবি ঝুলিয়ে রাখার নয়, গুটিয়ে রাখতে হয়। চীনা-প্রতিভা স্থানচিত্র অঙ্কনে বিশেষভাবে পরিস্ফুট। পাহাড় ঝরণা বন জঙ্গল ফুল লতা পাতা পাখী জীবজন্তুরা চিত্রশিল্পীর কাছে যেমন আমল পেয়েছে, মানুষ তেমন পায়নি।

তারা বাইরের দৃশ্যমান যে-জগতের ছবি আঁকে সেটা তার মূর্তির প্রকাশ নয়, তার ভাবের বা mood-এর প্রকাশ। যেমন, ঝরণা আঁকবে —তার তীব্র গতির আর জলোচ্ছ্বাসের রূপ দেখিয়ে। পর্বত আঁকবে তার উচ্চতা দেখিয়ে। আকাশ আঁকবে তার দূরত্ব আর বিস্তৃতি বা space দেখিয়ে।

ওয়াঙ-উই ছিলেন একজন উঁচুদরের কবিও। চীনেরা বলতো,— ওয়াঙ-উই-র ছবি ছিল কবিতা, আর তাঁর কবিতাই ছিল ছবি। তিনি সাহিত্যিক আর্টিস্টদের একটি দল স্থাপন করেন।

হান্-ক্যান্ বিখ্যাত ছিলেন ঘোড়া আঁকার জন্যে। তাঁর আঁকা ছবি পরবর্তী যুগের চীনা আর জাপানী আর্টিস্টদের আদর্শ ছিল। তাঁর সময়ে সম্রাটের আস্তাবলে ঘোড়া ছিল চল্লিশ হাজারের ওপর। শিল্পী সেখানে গিয়ে ঘোড়া অনুশীলন করতেন। তাঁর ছবি হলো: 'তাতার শিকারী,' 'শস্ত অশ্বশাবক', 'খোটানের উপহার পীত অশ্ব' ইত্যাদি। খোটানের সঙ্গে একসময়ে চীনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। খোটানের পুরাকীর্তি এখন আবিষ্কৃত হচ্ছে। মধ্য-এশিয়ার খোটান একসময়ে সমগ্র এশিয়ার আর পূর্ব-য়ুরোপের

মিলনস্থল ছিল। গ্রীক পারস্য ভারতীয় চীনা ইত্যাদি দেশের শিল্পকলা ও সভ্যতার মিলনের নিদর্শন সেখানে পাওয়া যাচ্ছে।

হ্যান-ক্যানের ইতিবৃত্ত কৌতুকবহী। প্রথম জীবনে এক সরাইএ বালকভৃত্য ছিলেন তিনি। ওয়াঙ্-উই যখন বাইরে ভ্রমণে বের হতেন, তখন ক্যানের কাজ ছিল তাঁর সঙ্গে মদের পাত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া। ওয়াঙ্-উই তার মজুরী দিতে চাইতেন না। বালক ক্যান অবসর সময়ে বালির ওপর ছবি এঁকে কাটাতেন। তাঁর প্রভু সহসা তাব এই শিল্পকর্ম দেখে মুগ্ধ হন, আর বালক ভৃত্যটিকে চিত্র অনুশীলন করবার জন্যে অর্থ দেন। প্রসঙ্গতঃ স্পেনের প্রসিদ্ধ শিল্পী মুরিলো আর তাঁর ক্রীতদাসের কথা মনে আসে।

চীনেদের ইতিহাসে টেঙ্-রাজত্বের তিন-শো আর্টিস্টের নাম পাওয়া যায়। শিল্পে সাহিত্যে রাজনীতিক্ষেত্রে টেঙ্-রাজত্ব গৌরবিত। ঘরোয়া বিবাদের ফলে তিন কোটি লোকের প্রাণ যায়। টেঙ্-রাজ্য ক্রমে ক্ষীণবল হয়ে পড়ে; স্বর্ণযুগের অবসান ঘটে।

টেঙ্-রাজত্বের পরে অর্ধশতাব্দ কালের মধ্যে বিদ্রোহ আর অশান্তিতে ছোট ছোট পাঁচটি রাজত্বের অবসান হয়। তার পরে এলো সুঙ্-রাজ্যের আমল (খৃঃ ৯৮০-১২৮০)। সুঙ্-রাজত্ব ঐশ্চর্যের চরম সীমায় উঠেছিল। ভেনিসের পর্যটক মার্কো পোলো সুঙ্-রাজত্বের সময়ে চীন-ভ্রমণে যান। তাঁর মতে —সুঙ্-রাজধানী হ্যাংচাউ পৃথিবীর মধ্যে নিঃসন্দেহে সব চেয়ে সুন্দর আর ঐশ্বর্যশালী নগর। ফুলের বাগান, পথ রাজপ্রাসাদের মতন ঘরবাড়ি, পণ্যবাহী বৃহৎ নৌকাসমূহ চীনের বিপুল ঐশ্বর্যের পরিচয় দিচ্ছে। গরম জলের স্নানাগার রয়েছে তিন শো —সে সাধারণের ব্যবহারের জন্যে।

সুঙ্-রাজত্ব শুধু বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিল তাই নয়, বহু শিল্পী কবি আর দার্শনিক এই সময়ে জাতীয় সংস্কৃতির পুষ্টি সাধন করেছেন। জেন্-দর্শনের (Zen Sect) প্রভাব এই সময়ে বেশি। চীনের নিজস্ব খাঁটি জিনিস এই সময়ের চিত্রের মধ্যে দেখা যায়। কেবল কালি দিয়ে ছবি আঁকা এ-সময়ে খুব উন্নত হয়েছিল। টেঙ্-রাজত্বের আর্টের ভিতর একটা খুব জোর ছিল; আর এ-সময়ের ছবি লীলায়িত রেখায় কোমল আর মনোরম হয়ে উঠেছিল। টেঙ্-রাজত্বের চিত্রে ক্যালিগ্রাফির চরম উৎকর্ষ হয়েছিল। কিন্তু সুঙের চিত্রকলা ক্যালিগ্রাফি থেকে দূরে সরে এসেছিল।

সুঙ্-রাজত্বের প্রধান চিত্রকর হলেন লি-লুং-মিএন। তিনি তিরিশ বছর সরকারী কাজ করেছিলেন। ছুটি পেলে তিনি বনে পাহাড়ে বা ঝরণার পাশে সময় কাটাতেন মদের পেয়ালা নিয়ে। ছবি আঁকায় ছিল তাঁর আসক্তি। বৃদ্ধ বয়সে বাতে পঙ্গু হয়ে বিছানা নিয়েও. চাদরের ওপরে ছবি আঁকার মতন করে তাঁর পঙ্গু-হাত বুলাতেন।

প্রথম জীবনে তিনি ঘোড়া আঁকতেন। সম্রাটের আস্তাবলে যেতেন অনুশীলন করতে। বৌদ্ধ পুরোহিত তাঁকে বললেন, —এমন করলে নিশ্চয়ই পরজন্মে ঘোড়া হয়ে জন্মাবে। কিন্তু শিল্পী সে-কথা কানে নেননি। তাঁর ক-টি বৌদ্ধ চিত্র আছে —'শাক্যমুনির পাঁচ শত শিষ্য', 'কোয়ন-ইন্' ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর প্রতিভার বিশেষ দান হলো স্থানচিত্রে আর কালির কাজে।

এই সময়ে আর একজন নামজাদা দৃশ্য-চিত্রকর ক্সু-হু-সি স্থানচিত্র সম্পর্কে লিখেছেন. —আর্টিস্ট অবশ্যই সমস্ত জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করবেন, আর তাঁর সর্ববিষয়ে জ্ঞান থাকবে ; কিন্তু আঁকার সময়ে দেখতে হবে, সবচেয়ে প্রধান অংশ কোন্টুকু। অপ্রধান অংশগুলি ছবি থেকে বাদ দিতে হবে। ছবিতে দূরত্ব আনতে হবে। আর্টিস্টরা ছবিতে সবটাই দেন না। তাঁরা বিষয়টিকে ইঙ্গিত করেই ক্ষান্ত হন। অদেয় অংশটুকু পূর্ণ করে নেয় দর্শক। এ যেন ভারতশিল্পেরই মর্মকথা। য়ুরোপের Impressonist-দের মতও এই। সুঙ্-যুগের স্থানচিত্রের একটি বিশেষত্ব হলো তার Space বা আকাশ।

মু-চি একজন দৃশ্যচিত্রকর। তাঁর একখানি ছবি হলো —দূরের মন্দির থেকে সন্ধ্যার ঘণ্টা। গোধূলির ম্লান আকাশে উঁচু-নিচু পাহাড়ের শিখর। কুয়াশাচ্ছন্ন পাদদেশে বনের মাঝে মন্দিরের চূড়ো জেগে আছে। সন্ধ্যার ঘণ্টা যেন কানে এসে পৌঁচচ্ছে। ফরাসী চিত্রকর 'মিলে'র বিখ্যাত চিত্র 'গির্জার ঘণ্টা শ্রবণে'র সঙ্গে তুলনা চলে। কাজের শেষে কৃষক ও কৃষকপত্নী ঘণ্টা শুনে দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ হয়ে। এখানে আমরা সামনে দেখছি মানুষকে। মু-চি-র চিত্রে মানুষ নাই ; দর্শক সে অভাব পূরণ করে। সে কৃষক ও কৃষকপত্নীর মতন ঐ রকম স্তব্ধ হয়ে মন্দিরের ঘণ্টা শুনতে পায়।

চীনা স্থানচিত্র বাস্তব জগৎ থেকে আমাদের নিয়ে যায় স্বপ্নরাজ্যে। ছবিতে দেখা যায়, দূরে সূর্যের আলো পড়েছে, ছোট ছোট ঢেউ ভেঙে

পাল তুলে জেলে-ডিঙি চলেছে। আঁকাবাঁকা পথের ওপর এবড়ো-খেবড়ো পাহাড় ঝুঁকে পড়েছে। গ্রামের ছোট ছোট কুটীরগুলি পাহাড়ের নিচে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাচ্ছে। সহসা ভীষণ ঝড়, পাহাড়ের শিখরে কালো মেঘ জমেছে, জলপ্রপাত উঠছে ফুলে ফুলে।

তুষার চাঁদ ফুল —এই তিনটি বস্তু সুঙ্-চিত্রে খুব প্রাধান্য পেয়েছে। তাদের ফুলের ছবিতে ফুলের কোমলতা ছোঁওয়া যায়; আর গন্ধ শোঁকা যায়। য়ুরোপীয় চিত্রে শিল্পী বাগান থেকে ফুল এনে দর্শককে উপহার দেন; আর চীনে-শিল্পী দর্শককে একেবারে ফুলের বাগানে নিয়ে যায়।

সুঙ-রাজত্ব তাতার মোঙ্গোল প্রভৃতি দুর্ধর্ষ বৈদেশিক আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে। মোঙ্গোল-অধিপতি কুবলাই খাঁ সুঙ্-রাজের সিংহাসন দখল করে বসলেন। সুঙের পরে মোঙ্গোল বা য়ুন্-রাজত্ব আরম্ভ হলো (খৃ. ১২৮০-১৩৬৮)। মোঙ্গোলেরা চীনের সভ্যতাকে গ্রহণ করে চীনাদের সঙ্গে মিশে গেল। কুবলাই খাঁ কেবল রণপ্রিয় ছিলেন না, আর্ট ও সাহিত্য তাঁর অধীনে খুব উৎসাহ পেয়েছিল। মোঙ্গোলদের অধীনে চীনা আর্টে পারস্যের প্রভাব পড়েছিল।

এই কালের প্রধান চিত্রকর চু মেঙ-ফু ঘোড়া এবং স্থানচিত্রের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি কুবলাইয়ের দরবারে সমাদর পেয়েছিলেন। য়েন-হুউ-তাও আখ্যানের ছবি আঁকতেন। চিন-সুন চু আঁকতেন তসবির। এ-সময়ের আর্টিস্টরা সুঙ যুগের চিত্রকেই অনুসরণ করে চলেছেন। পারস্যের প্রভাবে রেখায় মৃদুতা এসেছিল। কোনো কোনো ছবিতে রং-এর ঔজ্জ্বল্য দেখা যায়। কিন্তু এ-যুগের আর্টে কোনো সৃজনীশক্তি ছিল না।

১৩৬৮ খৃস্টাব্দে মোঙ্গোলদের বিতাড়িত করে মিঙ-রাজত্ব শুরু হলো। সুঙ-রাজত্বের চিত্রকলায় যে সরল সহজ ভাব ছিল মিঙ্-রাজত্বের সময়ে সেটা আলঙ্কারিক আর আয়াসসাধ্য হয়ে পড়েছিল। এ-যুগে চীনের genre painting বা সংসারের দৈনন্দিন চিত্র আঁকা শুরু হয়। এতে জাপানের ইউকিয়োয়ি-পদ্ধতির বা জন-শিল্পের পূর্বাভাস পাওয়া যাবে।

দরবারী ছবি, পোলো খেলা ঘূর্ণ্যমান জলের খেলা, মেয়েদের বিভিন্ন অবস্থা —এই সব বিষয়ে ছবি হয়েছে। আবর্তমান জলের খেলা হচ্ছে কবিতার খেলা। একটা বাটি ঘোরানো-জলধারার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া

হতো। বাটিটা আগের জায়গায় ফিরে আসার মধ্যে একটা কবিতা রচনা করতে হতো।

লিন্-লিয়াঙ্ এ যুগের শ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট। তাঁর একখানি ছবি হলো — 'নদীতীরে শরবনে হংস-মিথুন'। এই ছবিতে শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় সুস্পষ্ট। হাঁসের শুভ্র কোমলতা যেন অনুভব করা যায়।

উ-উয়েই আর-একজন বড়ো আর্টিস্ট। কালিতে আঁকা তাঁর একখানি ছবি হচ্ছে —'পরী ফিনিক্স পক্ষী'। ফিনিক্স পাখী হলো একটি কল্পিত পাখী। পাখীর লেজ পরীর মাথা ছাড়িয়ে উঠে তাকে একটা খুব গাম্ভীর্য দিয়েছে। এই শিল্পীর হাত ছিল monochrome বা একরঙা ছবি আঁকায়।

এ-যুগের আরও আর্টিস্ট হলেন, —লু-চি, ওয়েন-চেং, মিং-চিয়া-ইঙ্।

১৬৪৪ খৃস্টাব্দে হলো বিদ্রোহ। সম্রাট দুরন্ত যাযাবর মাঞ্চু তাতারদের সাহায্য চান। তারা এলো; কিন্তু তারা এসে রাজ্য দখল করে বসলো। এ যেন ঠিক হিন্দু-রাজা জয়চাঁদের মামুদ গজনীকে নেমন্তন্ন করে আনার মতন ব্যাপার।

মিং-সাম্রাজ্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে চীনের স্বাধীনতা অস্তমিত হলো। মাঞ্চুরা পরাধীনতার চিহ্নস্বরূপ চীনাদের টিকি রাখতে বাধ্য করলে। চীনের culture আর art ধীরে ধীরে দেশ থেকে অন্তর্ধান করলে। এক সময়ে খৃস্টধর্ম আর য়ুরোপীয় সভ্যতা চীনে ঢুকলো। তারা য়ুরোপের মোহে ভুলে গেল যে, তাদের সভ্যতা আর আর্ট ছিল।

মাঞ্চুদের শাসন থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে অনেক চীনে পণ্ডিত, সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং আর্টিস্ট্ জাপানে পালালেন। এঁদের প্রধান আড্ডা ছিল নাগাসাকি বন্দরে। এই দলের আর্টিস্টদের প্রধান হলেন চেন-নান-পিঙ। তাঁর কাছে জাপানী আর্টিস্টরা ভিড় করলে শেখার জন্যে। তাঁর একটু ঝোঁক ছিল য়ুরোপীয় বস্তুতন্ত্রতার দিকে। এই আন্দোলনের ফলে, জাপানে চীনের ক্লাসিক অধ্যয়ন করার যুগ আরম্ভ হলো। আমরা যেমন বৌদ্ধ-ভারতের অনেক তথ্য চীন থেকে জানতে পাই, চীন সম্বন্ধে অনেক তথ্য তেমনি জাপান থেকে জানা যায়।

য়ুরোপের রেনেসাঁও হয়েছিল এইভাবে। তুর্কীদের আক্রমণে বাইজান্টাইন

সভ্যতা, মধুচক্রের মধুর মতন সারা য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, ক্লাসিক চর্চার সূত্রপাত হয়।

সদ্য চীন-জাপান ভ্রমণ সেরে এসে আচার্য নন্দলাল তাদের কালচার আর আর্টের নিদর্শন যা সঙ্গে এনেছিলেন সে-সব গোছাতে লাগলেন। আলোচনাতেও ব্যাপৃত হয়ে রইলেন। কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীগণও নতুন প্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

কিছু দিন পরে, জাপান থেকে অনেক উপহার-দ্রব্য এসে পৌঁছলো। আচার্য নন্দলালের চীন-জাপান ভ্রমণের ফলে, কলাভবনের জন্যে ওদেশের বড়ো বড়ো চিত্রকরদের অনেক ছবি এলো। জাপানের টাইকান-সান একখানা প্রকাণ্ড মাকিমনো শান্তিনিকেতন-কলাভবনে উপহার দিয়েছেন। সামামুরা খানজানেরও একখানা মাকিমনো পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের পেরু যাত্রার ফলেও দু-খানা বড়ো বড়ো তৈলচিত্র পাওয়া গেল। কলাভবনের Museum-এ নানারকম জিনিসের সংগ্রহ রয়েছে। দিনে দিনেই Museum-এ জিনিস বৃদ্ধি হচ্ছে। চীন থেকে শান্তিনিকেতনের কলাভবন ও সঙ্গীতভবনের জন্যে যে বিশাল শিল্পসম্ভার আচার্য নন্দলাল সঙ্গে নিয়ে এলেন তার বিস্তৃত বিবরণ আগে দেওয়া হয়েছে।

মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের জাপানী চিত্রকলা সম্বন্ধে রচনাটিও প্রসঙ্গতঃ সঙ্কলন করে দেওয়া হলো। -

॥ জাপানের চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু ॥

মস্ত বড়ো একটা গাছের গুঁড়ি, তার উপর একটা ফড়িং বসে—এ একটা জাপানী ছবি, বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের আঁকা। আমাদের এ ছবি দেখে সাধারণতঃ এই প্রশ্ন মনে উঠবে,—'একটা গাছ আর একটা ফড়িং নিয়ে আবার ছবি! এর মধ্যে কি আর্ট আছে?' কিন্তু আমরা যদি জাপানী আর্ট বুঝতে চেষ্টা করি তবে এ প্রশ্ন আমাদের মনে আসতে পারে না। নগণ্য কীটপতঙ্গও জাপানী চিত্রকরদের দৃষ্টি এড়ায় না। জাপানীরা কিছুকে ছোট বলে অবহেলা করে না। পৃথিবীর সমস্ত পদার্থের মধ্যে তারা এক মহাসৌন্দর্য অনুভব করে। নর-নারীর মধ্যে যে মহিমা প্রকাশিত হয়েছে তা

পশুপক্ষী বা ছোট ছোট কীটপতঙ্গতেও রয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—'জাপানী শিল্পীর কাছে সুন্দর অসুন্দর, স্বর্গ-মর্ত্ত্য সকলি সমান। গোচর-অগোচর সমস্ত পদার্থের মর্ম্ম গ্রহণ করে, এবং সেই মর্মকথা সহজে সুসংযতভাবে পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করে।' জাপানের চিত্রকলার পরিচয় অবনীন্দ্রনাথ এই অল্প কথার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দিয়েছেন। জাপানীদের তুলির টানে যেন একটা ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে। ঐন্দ্রজালিক যেমন তাহার দণ্ডস্পর্শে মৃত বস্তুতে জীবন সঞ্চার করে, জাপানীরাও তেমনি তাদের তুলির টানে নিতান্ত নগণ্য এবং যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না এমন জিনিসে অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে।

এ জিনিসটা অন্য দেশের আর্টিস্টদের চিত্রে পাওয়া যাবে না। অন্যান্য দেশের আর্টে একটা Psychology আছে ; জাপানের আর্টে তেমন কোনো একটা তত্ত্ব পাওয়া যায় না। তারা একটা তত্ত্ব হিসাবে কিছু আঁকে না। আঁকবার বস্তুকে তারা ভালোবাসে তাই আঁকে। তাদের মধ্যে একটি মৈত্রীভাব আছে —যা দিয়ে তারা বিশ্বের সমস্ত পদার্থকে সুন্দর করে তুলেছে। জাপানীরা প্রকৃতই সৌন্দর্যের উপাসক।

প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে কেবল সেই সৌন্দর্যের উপাসনা দেখতে পাই। তারা বলতো 'Gymnastics for the body and music for the soul'। তাদের আদর্শ ছিল ভিতর ও বাহিরকে আনন্দ ও সৌন্দর্য দিয়ে গড়ে তোলা। প্রাচীনভারতও ছিল বিশেষ সৌন্দর্যপ্রিয়। গিরিগুহার ভাস্কর্য ও চিত্র এবং কাব্য-নাটকাদির ভিতর দিয়ে সেটা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বোধহয় সৌন্দর্যপ্রিয়তা তেমন গভীরভাবে প্রকাশ পায় নাই, যা পেয়েছে সেটা একটা মর্মবোধের অঙ্গ হিসাবে। —জাপান দেশটা জাপানীদের সৌন্দর্যপ্রিয় করে তুলেছে। জাপান যেন একটি ছবির album. জাপানের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে গেলে মনে হবে যে, ছবির পাতা উল্‌টিয়ে যাচ্ছি। উঁচু-নিচু ভূমির ওপর আঁকা-বাঁকা রাস্তা, পাইনের বন, ঝরণা, ছোট ছোট পাহাড়, পাহাড়ের নিচে কুটীর, কুটীরের পাশে ছোট একটি বাগান, সবই দেখায় ছবির মতো। অনন্ত সৌন্দর্য এবং মহিমা নিয়ে ফুজি-সান গিরি উঠেছে পদ্মের মতো। ফুজি-সান আমাদের 'দেবতাত্মা হিমালয়ে'র মতো জাপানীদের মন অধিকার করে রেখেছে। কত কবির কবিতা

এবং কত চিত্রকরের চিত্র ফুজি-সানকে করেছে অমর।

চন্দ্রমল্লিকায় যখন মাঠ ছেয়ে ফেলে, তখন জাপানীদের দেখা যাবে, নিস্তব্ধভাবে সবাই প্রকৃতির উৎসব দেখতে মিলিত হয়েছে। এই দেখাটা যেন তাদের কাছে আহারেরই একটি অঙ্গ। ধনী দরিদ্র সকলেই প্রকৃতির এই উৎসবে যোগ দেয়। তাদের জীবনযাত্রার মধ্যে একটি সহজ এবং সুসংযত ভাব···। তাদের গৃহসজ্জায় কোনো আড়ম্বর নাই; ঘরের সমস্ত মেঝেতে মাদুর পাতা, দেওয়ালে কেবল একটি ছবি ঝুলানো, এবং কুলুঙ্গির মধ্যে একটি ফুলদানি। এমন কি যারা খেতে পায় না তাদেরও ছবি ও ফুল রাখা চাই। জাপানে চিত্রকরদের খুব আদর। তারা আমাদের দেশের মতো ভাতে মরা আর্টিস্ট নয়, জাপানে অসংখ্য চিত্রকর, এক টোকিও শহরেই আট-শত চিত্রকর।

জাপানীদের ওপর দু-জন মহাপুরুষের প্রভাব পড়েছে। একজন কনফুসিয়াস, অন্যজন বুদ্ধদেব, তাই তাদের সভ্যতায় চীন ও ভারতবর্ষের ছাপ।

তৃতীয় শতাব্দে চীনের পরিব্রাজকেরা জাপানে কনফুসিয়াসের ধর্ম প্রচার করে। ষষ্ঠ শতাব্দে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। এ-সময় থেকেই জাপানের শিল্পের আরম্ভ।

জাপানের প্রাচীন চিত্রকরদের মধ্যে অনেক কোরিয়াবাসীর নাম পাওয়া যায়; অনেক কোরিয়ান বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে জাপানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। শোটোকু (Shotoku) নামে একজন রাজকুমারের নাম পাওয়া গেছে। তিনি শিল্পীদের খুব উৎসাহ দিতেন। তিনি আর্টিস্টদের দিয়ে নিজের portrait আঁকিয়েছিলেন। পরবর্তী যুগে ৭০৯ খৃস্টাব্দ থেকে ৭৮৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে অনেক সুন্দর চিত্র হয়েছে।

এ-সময়ে হরিউজি-মন্দিরের দেওয়ালে সুন্দর fresco painting-গুলি করা হয়েছিল। এগুলি ঠিক অজন্তার চিত্রের মতো বৌদ্ধচিত্র। বৌদ্ধযুগের আর্টিস্টদের মধ্যে অধিকাংশই পুরোহিত ছিল। অনেক ভালো ভালো ছবি জাপানের বৌদ্ধমন্দিরে পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগ থেকে এ পর্যন্ত প্রাচীন চিত্রসকল পুরোহিতেরা রক্ষা করে আসছেন।

অজন্তার ১নং কুঠরিতে ঢোকবার দরজার বাঁ-দিকে যে বোধিসত্ত্বের মূর্তি আছে, তার সঙ্গে হরিউজি মন্দিরের বোধিসত্ত্বের মূর্তির তুলনা করা

হয়েছে একখানি জাপানী পত্রিকায় (Kokha No—374, July 1921); তাতে লেখা আছে, 'এই মূর্তিটি খুব স্বাভাবিক হয়েছে, এবং প্রাচীনভারতের ভাবপ্রবণতা বেশ সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের হরিউজি মন্দিরের বোধিসত্ত্বের সঙ্গে এতো সাদৃশ্য আছে যে আমাদের মূর্তির আদর্শ অজন্তার মূর্তি থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, আমাদের মূর্তির বর্ণসমাবেশ এই বোধিসত্ত্বের বর্ণসমাবেশ থেকে অনেক কিছু রকমের।'

নারা-যুগ বা বৌদ্ধযুগের পরে এলো ইয়মাটো (Yamato School) চিত্রকরদের যুগ।

জাপানীর প্রাচীন জাপানকে ইয়মাটো বলে থাকে। এই চিত্রকরদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো কানোকা (Kanoka)। তিনি বর্তমান ছিলেন নবম শতাব্দে। তিনি অনেক portrait ও দৃশ্যচিত্র এঁকেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত চিত্র হলো নাচির জলপ্রপাত —গিরি শিখর উপরে চাঁদ মেঘে ঢাকা, ঝরণায় জল অনেক উঁচু থেকে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে নিচে নিস্তব্ধ পাইন গাছ।

তারপর টোসা (Tosa) চিত্রকরদের পালা। এরা প্রধানতঃ দরবারের দৃশ্য ও ওমরাহদের ছবি আঁকতো।

এরপর এলো সেসূস্থ (Sessta) ও অন্যান্য চিত্রকরদের যুগ; সেসূস্থ একজন প্রতিভাবান ও উঁচুদরের দৃশ্যচিত্রকর ছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দে কানো (Kano school) চিত্রকরদের পালা আরম্ভ হয়। এই সম্প্রদায় স্থাপন করেন বিখ্যাত শিল্পী কানো। এই শিল্পীরা জাপানের চিত্রকে একেবারে হরণ করে নেয়। আজ পর্যন্তও এদেরই ঢেউ চলেছে। এই চিত্রকরদের বিশেষত্ব হলো রেখার দৃঢ়তা, রঙের উজ্জ্বলতা এবং আলোছায়ার খেলা। প্রথমে এরা চীনা চিত্রের ধরনে দৃশ্যচিত্র আঁকতো।

কানোদের মধ্যে কোরিন ওকিও প্রভৃতি আরও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। কোরিন চিত্রকরেরা লাক্ষার ওপরে ছবি আঁকার জন্যে বিখ্যাত। ওকিও-চিত্রকরেরা খুব স্বাভাবিক করে ছবি আঁকতে পারতো। এদের নাম জাপানীদের ঘরে ঘরে বিরাজ করছে। এদের মধ্যে সোসেম (Sosem) বানর আঁকার জন্যে বিখ্যাত, আর ছিকাদো (Chikado) বাঘ আঁকার জন্যে।

জাপান যখন প্রথম য়ুরোপের সংস্পর্শে এসেছিল, তখন য়ুরোপের চাকচিক্য

এতটা মুগ্ধ হয়েছিল যে, তারা নিজের শিল্পকে অবহেলা করে, য়ুরোপের শিল্পকে বরণ করে নিয়েছিল। য়ুরোপীয় ধরনে যারা আঁকতো তাদের মধ্যে প্রধান হলো গাহো (Gaho)। তিনি য়ুরোপে গিয়েছিলেন পাশ্চাত্য শিল্প শেখার জন্যে। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সময়ে তাঁকে জাপানের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলা হতো ; তিনি দৃশ্যচিত্র আঁকতেন। জাপানের Imperial University-র অধ্যাপক Yone Noguchi তাঁর চিত্রকে বিলাতের চিত্রকর Tasser-এর চিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

এখানে একটু আলোচনা করার দরকার, জাপানী দৃশ্যচিত্রের সঙ্গে টার্নারের দৃশ্যচিত্রের প্রভেদ কোথায়।

কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে আমরা দেখি, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির কী গভীর সম্পর্ক, যেন মানুষের সম্বন্ধের মতো হাসি-অশ্রুজলে গড়া। জাপানী চিত্রকরের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ সেইরূপ হাসি-অশ্রুজলের সম্বন্ধ। টার্নারের বর্ণসমাবেশ যতই চমৎকার, পরিবেশন ও আলোছায়ার সম্পাত যতই আশ্চর্যজনক হোক না কেন, তাঁর চিত্রে সেই প্রীতির সম্বন্ধ পাই না।

আমাদের আর্টে দৃশ্যচিত্র যতটুকু আছে, তা ছবির প্রেক্ষাপট (back ground) রূপে আঁকা হয়েছে ; কারণ, আমরা আমাদের আর্ট নরনারীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছি, আর জাপানীরা করেছে প্রকৃতির ভেতর দিয়ে। মানুষের দৈহিক সৌন্দর্যে তাদের কল্পনা কখনও উদ্বুদ্ধ হয়নি। মানুষের দেহ-সম্বন্ধে তাদের কোনো মোহ নাই। সে-জন্যে জাপানী চিত্রে কোনো নগ্ন নরনারীর মূর্তি দেখা যায় না।

জাপানী চিত্র বিশেষভাবে folk art বা জনসাধারণের শিল্প হয়েছিল উকিও চিত্রকরদের সময়ে। ভারতবর্ষে এতো বড়ো folk art গড়ে ওঠেনি। অজন্তার চিত্র মোটেই folk art নয় ; তবে, রাজপুত চিত্র অনেকটা folk art বটে। মোগল-চিত্রকে folk art বলা চলে না, কারণ তাতে দরবারী গন্ধ আছে। বাঙ্গালাদেশের পটুয়াদের আর্ট folk art।

উকিও-সম্প্রদায় স্থাপন করেন মাতাহেই (Matahei)। এই সম্প্রদায় টোসাদের সমসাময়িক। উকিও-রা ছবি ছেপে এক পয়সা দামে এক-একখানা ছবি বেচত। তাদের বিষয় হলো দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো ব্যাপার। এ-সব ছবি মুটে মজুর কৃষক প্রভৃতি লোকেরা কিনতো। এখনও জাপানে

এ-সব ছবির খুব কাট্‌তি। পশ্চিমে উকিওদের জন্যেই জাপানের শিল্প বিশেষ প্রচারিত হয়েছে। জাপানের শিল্পিমহলে উকিওদের বেশি আদর নাই; তারা বলে এগুলি ছাপা জিনিস, আর্টে'র খাঁটি জিনিস নয়।

জাপান এখন তাদের পাশ্চাত্য মোহ ছেড়ে উঠেছে। কাউন্ট ওকাকুরা প্রথম তাদের নিজেদের আর্টে'র মাহাত্ম্য প্রচার করেন, এবং জাপানের আর্ট নিজেদের মধ্যে প্রচার করবার জন্যে একটি সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির প্রধান শিল্পী হলেন টাইকন-সান। টাইকন-সান এখন জীবিত শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জাপানের এই শিল্পিসমিতি ঠিক আমাদের দেশের প্রাচ্যকলা-সমিতির মতো।

পশুপক্ষীর চিত্র। তাদের পশুপক্ষীর চিত্রে খুব একটা প্রীতির ভাব দেখা যায়। জাপানী চিত্র সম্বন্ধে যে-সব ইংরাজলেখক লিখে থাকেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, পশুর চিত্রে জাপানী চিত্রকরগণ বিলাতের বিখ্যাত চিত্রকর Landsur-এর সমকক্ষ হতে পারেননি। এটা সম্পূর্ণ ভুল; সমকক্ষ তো হয়েছেনই, এমন-কি Landsurকে ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠেছেন। Landsur-এর চিত্র হলো আশ্চর্যরকমের স্বাভাবিক, এবং তিনি পশুর মুখে সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না ইত্যাদি মানুষোচিত ভাব আর সেই রকমের association-এর মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন। স্বীকার করি, এ-রকম ভাব ফোটাতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে, এবং কেউ এ-বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ হতে পারেননি। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি স্থূল। প্রত্যেক পশুর একটি নিজস্ব ভাব আছে —কুকুরের কুকুরোচিত ভাব, বানরের বানরোচিত ভাব, বিড়ালের বিড়ালোচিত ভাব ইত্যাদি। আর্টিস্টের কাজ হচ্ছে এই ভাবটি চিত্রপটে প্রকাশ করা। জাপানী আর্টিস্ট পশুচিত্রের এই spiritটি ঠিক ধরতে পেরেছেন; কিন্তু Landsur পারেননি। তাঁর চিত্র তাঁর প্রতি প্রশংসা জাগিয়ে তোলে, কিন্তু আমাদের ভাব অনুপ্রাণিত করতে পারে না।

জাপানের জীবজন্তুর চিত্রকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।—

১ম—যে-সব চিত্র মানুষের কোনো ব্যাপারকে ব্যঙ্গ করে আঁকা হয়েছে।

২য়—যে-সব চিত্র জীবন থেকে স্বাভাবিকভাবে আঁকার চেষ্টা করে হয়েছে।

৩য়—যে-সব চিত্র বিশেষ কোনো ভাবকে ফোটাবার জন্যে আঁকা হয়েছে।

জাপানীদের ব্যঙ্গের মধ্যে সহৃদয়তা আছে, তারা কিছুকে আঘাত

করার জন্যে ব্যঙ্গ করে না। ব্যঙ্গ শুধু একটু মজা করার জন্যে। ব্যঙ্গচিত্রের মধ্যে (Joba Sojo) জোবা-সোজোর বানরের ব্যঙ্গ-চিত্র খুব বিখ্যাত। ছবিটি কেবল সরু রেখা দিয়ে আঁকা হয়েছে, বানরগুলি খুব স্বাভাবিক এবং হাস্যরসাত্মক হয়েছে।

ঐ তিন রকমের মধ্যে শেষেরটাই শ্রেষ্ঠ। পশু-পক্ষীকে তারা এমন আবেষ্টনের মধ্যে আঁকে যে, আমাদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে। বাঘ, হরিণ, কাঠবিরাল প্রভৃতি জন্তু আঁকতে তাঁরা ভালবাসেন। বাঘ জঙ্গলের মধ্যে দুই থাবার মধ্যে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে, তার ডোরাকাটা কোমল লোমে এবং চোখের চাহনিতে, শরীর ও লেজের বাঁকা রেখার মধ্যে চিত্রকর বাঘের ভীষণ-মধুর ভাব ফুটিয়ে তুলছে। জাপানী আর্টে পশু হলো দৈহিক শক্তির প্রতিমূর্তি। আর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীক হলো ড্রাগনের ছবি। ড্রাগনকে আঁকা হয় আকাশের ঝোড়ো মেঘের মাঝে, কিংবা পাহাড়ের কোলে ঝরণার পাশে। ড্রাগন জলের দেবতা, সে বৃষ্টি আনে, ঝড় বওয়ায়। তারই ইঙ্গিতে পাহাড়ের কোল থেকে ঝরণার জল ছুটে চলে।

সব রকম পাখীই তারা এঁকে থাকে ; কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভালবাসে হাঁস আঁকতে। জানালায় ঝোলানো পর্দাতে হাঁসের ছবি, দরজার ওপরে হাঁসের ছবি। মেঘলোকে শুভ্র বলাকাশ্রেণী পক্ষ বিস্তার করে সুদূরের উদ্দেশে ভেসে চলেছে। চিত্রকরের আনন্দ, হাঁসের আনন্দকাকলী এবং অবাধগতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে। অজন্তার চিত্রে দেখা যায় আনন্দমুখর হাঁসের দল —কেউমধুপানে মত্ত, কেউ মৃণালখণ্ড মুখে করে চলেছে, রাজপুতচিত্রে দেখা যাবে, জলভারাক্রান্ত ঘন নীল মেঘের নিচে বলাকার দল।

আলঙ্কারিক শিল্প। জাপানের আলঙ্কারিক শিল্প বা decorative art পৃথিবীর অন্য আলঙ্কারিক শিল্প থেকে মূলতঃ একেবারে পৃথক। পৃথিবীর সকল আলঙ্কারিক শিল্পেই একটা uniformity বা সমান্তরালবর্তিতা আছে। কিন্তু, জাপানী আর্টে তা একেবারেই নেই। তবে কি জাপানী আলঙ্কারিক শিল্পে কোনো harmony বা সামঞ্জস্য নেই ? সব একেবারে এলোমেলো ? তা নয়, তাদের আলঙ্কারিক শিল্পকে balance বা সমান-ওজন, সংহত এবং সুনিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে। ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ শিল্পী রোঁদা বলেছেন, —'Balance is the spirit of art'। আর্টের এই balance জিনিসটার একটু ব্যাখ্যার

দরকার —ধরুন, দু-জন শিল্পী পর্দার ওপর আঁকছে —একজন বিলিতী ওস্তাদ, অন্য জন জাপানী ওস্তাদ। বিলিতী ওস্তাদ কাঁটা, কম্পাস, রুল ইত্যাদি নানা প্রকার যন্ত্রপাতি নিয়ে বসেছে। প্রথম সে মাপজোক করে পর্দার চারদিকে খুব যত্ন করে, সরু মোটা কতকগুলি লাইন টানলো; তারপর ভেতরে আঁকলো কতকগুলি আঙ্গুরফলের গুচ্ছ। প্রত্যেক গুচ্ছ ঠিক একরকম হওয়া চাই; এবং প্রত্যেক গুচ্ছের ব্যবধান এক হওয়া চাই। এটা হলো আলঙ্কারিক শিল্পের uniformity.

জাপানী ওস্তাদ কিন্তু আঁকবে ভিন্ন রকমে। সে প্রথমতঃ পর্দাখানি ভালো করে কয়েক মিনিট দেখবে, তারপর কিছু সময় ভেবে নেবে, কি আঁকবে। শেষ তুলিতে চাইনিজ রং নিয়ে ফস্ ফস্ করে মুখস্থ বলে যাওয়ার মতো এঁকে যেতে থাকবে। পর্দার নিচে একটা বক আঁকলো। তার চোখ অর্ধেক বোজা, এবং একটা পা একটু উঁচু করে তোলা। পিছনে ম্লান চন্দ্র একটা শুকনা গাছের ডালের মাঝ দিয়ে উঁকি মারছে। চাঁদ, গাছ, বক এই তিনটাকে এমন এমন জায়গায় রাখতে হবে যাতে সমস্ত মিলে একটা সংহত জিনিস হয়ে ওঠে। ঠিক জায়গা মতো প্রত্যেক জিনিসটাকে আঁকার নামই হলো balance। একটা জিনিস যদি ঠিক জায়গা মতো না হয়, তবে balance কেটে যাবে এবং ছবির জমাট ভাব থাকবে না। balance হলো গানের তালের মতো, এই balance নিজের নজর এবং পরিমাপ বোধের ওপর নির্ভর করে।

Balance বোধটাই হলো আর্টের জিনিস। এটা সজীব। আর আর্টের uniformity নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর, —এর উৎপত্তি Geometry-বিদ্যা থেকে; কাজেই এই uniformity-টা কতকগুলি আইন-কানুনে বদ্ধ থাকায় নির্জীব। জাপানীরা তাদের চিত্রে বা গৃহের সাজসজ্জায় কোথাও uniformity পছন্দ করে না।

উপসংহার। জাপানী আর্টের একটি বিশেষত্ব হলো চিত্রের space বা বিস্তার। একটা ছবিতে অনেকগুলি জিনিস এঁকে সেটাকে ভরে ফেলে না। ছবির যথেষ্ট অংশ শূন্য এবং অস্পষ্ট থাকে। অধিকাংশ ছবিতেই আমরা দেখতে পাই, স্পষ্ট সীমা টেনে আকাশ এবং পৃথিবীকে

ভাগ করা হয়নি। দিগন্তরেখা দূরে দূরে সরে গিয়ে আকাশের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। তাই আমাদের মন ছবিতে আবদ্ধ হয়ে না-থেকে, মুক্তি পায়। যে-গৃহে বেশি কোনো আসবাব-পত্র নাই, এবং চারদিকের আলো-বাতাস ঢুকতে পারে, সে-গৃহে প্রবেশ করলে আমাদের মন শান্তি আরাম এবং আনন্দ পায়; আর যে-গৃহ জিনিসপত্রে ঠাসা এবং যেখানে বাইরের আলো-বাতাস যায়না, সে-গৃহে আমাদের মন সোয়াস্তি পায় না, এবং সেখানে দু-দণ্ড থাকাও যায় না। জাপানীরা এই তত্ত্বটি ভালো করে বুঝেছে, তাই তাদের চিত্রের মধ্যে একটা গভীর শান্তি এবং বিশ্রাম পাওয়া যায়।

জাপানী চিত্র suggestive বা ইঙ্গিতধর্মী। তারা অল্প-কিছুতে, তাদের ভাব ব্যক্ত করার চেষ্টা করে; যেমন একটি ছবি —নববর্ষ। একটা শুকনো ডাল, তার ওপর থেকে বরফ গলে পড়ছে, আর ডালের ডগায় দু-একটা কচি পাতা। এই অল্পতেই নতুন বছরের ভাব সূচিত হচ্ছে।

একদল য়ুরোপীয় চিত্রকরের ওপর জাপানী আর্টের প্রভাব আছে। এই সম্প্রদায়কে Impressionist school বলা হয়। এই সম্প্রদায় প্রথম স্থাপিত হয় France-এ। প্রথম চিত্রকরের নাম হচ্ছে Velasquez। এই সম্প্রদায়ের Whistler খুব বিখ্যাত ছিলেন, তিনি আমেরিকান। তিনি যথেষ্ট পরিমাণে জাপানের Impressionism গ্রহণ করেছিলেন। Impressionism-এর মূল তত্ত্ব হচ্ছে 'L'art d' ennuyer est detat dire' অর্থাৎ চিত্রের অপ্রধান অংশ চেপে যাওয়া। কবিতার মধ্যেও এই Impressionism লক্ষ্য করা যায়, —যেমন জাপানী কবিতা—

'Asagao
Tsurube torarale
Moral Midza.

বাঙলা মানে হচ্ছে— 'আশাগাও মোর
চাকিল গাগরী
আজি জল মাগি ফিরি।'

একটি মেয়ে ভোরবেলায় কূয়াতে জল তুলতে গিয়েছে ; গিয়ে দেখে, জলপাত্রটি —'আশাগাও' নামে ফুলের লতায় ঢেকে ফেলেছে ; সে আর ফুল, লতাপাতা ছিঁড়ে ফেলে, কলসীটাকে তার রাতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে জল তুলতে গেল না, স্থানান্তর থেকে জল যোগাড় করে নিলে। —এই উপলক্ষে এই কবিতাটি লেখা। এ ধরনের ছোট কবিতাকে 'হাইকাই' বলে ; আর যারা হাইকাই লেখে, তাদের বলা হয় 'হাইজিন'। ভাব এবং রস গ্রহণ করতে জাপানীদের পক্ষে ছোট ছোট এই দু-চারটি কথাই যথেষ্ট। সমস্ত ভাব এই অল্পকথার মধ্যেই তারা প্রকাশ করে। তাদের ভাষায় এই যে সংযম, চিত্রেও এই সংযম, এবং দারিদ্র্যেও এই সংযম। (বিশ্বভারতী, শারদীয় সংখ্যা, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা ১৩২৮)।

—এই সময়কার কলাভবনে ভারতশিল্পের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১৯২১ সাল থেকে অসিতকুমার হালদার, শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, শ্রীহরিপদ রায় ও শ্রীঅন্নদাকুমার মজুমদারের চিত্রকর্ম ছাড়া, সাহিত্যিক প্রচেষ্টাও দেখা যাচ্ছে। অসিতকুমারের 'বাগগুহা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার কথা আমরা আগে বলেছি। শ্রীহরিপদ রায় 'ভারতবর্ষের চিত্রের কথা', 'গথিক ও পারসিক চিত্র' সম্পর্কে আলোচনা করে লিখেছেন। যে-সব ছাত্রের চিত্র উৎকৃষ্ট বলে তখনই পরিচিত হচ্ছে তাঁরা হলেন : শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ, শ্রীহরিপদ রায়, শ্রীঅন্নদাকুমার মজুমদার, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমাসোজী, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবীরভদ্র রাও চিত্রা। হাতেলেখা পত্রিকা 'বিশ্বভারতী'-র প্রায় জন্ম-সন থেকেই প্রচ্ছদপট এঁকেছেন আচার্য নন্দলাল। অসিতকুমার, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা প্রচ্ছদও রয়েছে এই সময়ে। ১৯২১ সালে অসিতকুমার 'প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য' সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আচার্য লেভি সাহেব ১৯২২ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ (১৩২৯) সংখ্যায় Nepali Artists in China —এই নামে একটি ঐতিহাসিক নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। —তাঁর মতে, তেরো শতাব্দে নেপালী শিল্পী অ-নি-কো তিব্বতে ও চীনে গিয়ে ওদেশের শিল্পজগতে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। আচার্য নন্দলালের নেপাল-ভ্রমণ প্রসঙ্গে এ-কথা পরে বিশদভাবে বলা হবে।

॥ বিশ্বভারতীতে 'আর্ট' ও স্বদেশী' ১৯২৪-২৫ ॥

নির্দিষ্ট দিনে বিদ্যাসাগর আর তিলক মহারাজের মৃত্যুতিথি উদ্‌যাপন করা হলো। করলেন শিক্ষক আর ছাত্রছাত্রীরা মিলে। সমাজশাস্ত্র ও অর্থনীতির অধ্যাপক রজনীকান্ত দাস শান্তিনিকেতনের আশপাশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে গ্রামবাসীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-সঙ্কলনের কাজ শেষ করেছেন। ভবিষ্যতে বিশ্বভারতীর সুনাম লাভের আশা। সুহৃদ কাপের ফাইন্যাল ফুটবল খেলা হলো লর্ড সিংহের রাইপুরের সঙ্গে এখানকার ছাত্রদের। সুহৃদকুমার সেন ছিলেন শান্তিনিকেতনের ছাত্র। একবার কলকাতায় মাঘোৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। বর্ধমান স্টেশনে লাইন পার হতে গিয়ে মারা যান। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে একটি কাপ খেলার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে।

শ্রীনিকেতনে কৃষিকর্ম চলছে। বয়ন ও চর্মশিল্পের কাজের জন্যে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। চিকিৎসালয়ের কাজও চলছে। বয়ন বিভাগে বর্তমান (১৯২৪) বৎসরে মোট ৪৪ জন ছাত্র গুরুল-শ্রীনিকেতনে এসে বয়ন-বিভাগে নানারূপ কাজ শিখেছেন। এদের মধ্যে বীরভূম জেলার ১০টি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও ছিলেন। তাঁরা এখান থেকে শিখে গিয়ে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে বয়ন ও অন্যান্য কাজ শুরু করেছেন। গত ১লা জুন থেকে বোলপুর গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ের ১৫জন ছাত্র প্রত্যহ বৈকালে ৩ ঘণ্টা করে এই বিভাগে কাজ শিক্ষা করছেন। গুরুলের চারপাশের গ্রামে যে-সব তাঁতী আছে তারা যাতে মহাজনের কবলে না পড়ে অথচ যাতে তাদের সংসার স্বচ্ছন্দভাবে নির্বাহ করতে পারে সে-জন্যে ঐ সব তাঁতীদের এখান থেকে সুতো সরবরাহ করা হয় এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে তাদের কাছ থেকে টুইল, জিন তোয়ালে ধুতি গামছা, শাড়ী ইত্যাদি তৈরি করে নেওয়া হয়। গৃহশিল্পগুলি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করাই এই বিভাগের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বিভাগের পরিচালনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কাজ বর্তমানে চলছে। —Cotton weaving, Silk weaving, Blanket weaving, Dnrry weaving, Carpet weaving, Chemical vegetable Dying আর Calico printing.

চামড়া পাকানোর কাজ (Tannery)। —গতমাসে (আষাঢ়, ১৩২১) গুরুকুল-শ্রীনিকেতনে চামড়ার কাজ পুনরায় আরম্ভ করা হয়েছে। গত বৎসর Chrome tanning বিশেষ লাভজনক হয়নি। এবারে Bark tanning শুরু করা হয়েছে। চারপাশে গ্রামের মুচিদের ভিতর তাদের জাতিগত ব্যবসায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এই বিভাগের উদ্দেশ্য। বর্তমান সময়ে গ্রাম থেকে ৩জন মুচি এনে তাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে মহিদাপুরের একটি মুচি-পরিবার এখানকার কার্যপ্রণালী অনুযায়ী নিজের বাড়িতেও এই ব্যবসায় শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষ আশা করেন ক্রমে অন্যান্য সকল মুচিই তাদের জাতিগত ব্যবসায় পুনরায় আরম্ভ করে এই শিল্পের উন্নতি করবে।

শান্তিনিকেতনে ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্যসভা হলো শিশুবিভাগে। মঞ্চসজ্জা প্রশংসার দাবী রাখে। কোপাই নদীতে আর অজয় নদীতে স্নান করতে আর বেড়াতে যান অধ্যাপক আর ছাত্র ছাত্রীর দল। অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব জামশেদপুরে গেছেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন থেকে আশ্রমে বাস করছেন। তেজেশচন্দ্র সেনের পরিচালনায় বাগান তৈরি হচ্ছে।

গরমের বন্ধের পরে আশ্রমের বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর কাজ পূর্ণোদ্যমে চলছে। বিশেষ. সাধারণ ও তর্কসভা হয়েছে। অধ্যাপক আশানন্দ নাগ বৃটিশ মুাজিয়ম সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দিয়েছেন। সভাপতি ছিলেন হিডজিভাই মরিস। মৌলবী জিয়াউদ্দীন আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। ফার্ণাণ্ড বেনোয়া একটি তর্কসভায় সভাপতিত্ব করেন।

পূজনীয় গুরুদেব পুনরায় দীর্ঘ দিনের জন্যে বিদেশ যাত্রা করেছেন। তিনি ২৪-এ সেপ্টেম্বর কলম্বো থেকে মার্সেঁজ অভিমুখে জাহাজে ভাসবেন। সেখান থেকে স্পেন যাবেন। এবার তিনি দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। সেখানেই যাবার জন্যে বের হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন কন্যা (নন্দিনী, জন্ম ১৯২১) সহ রথীন্দ্রনাথ ও শ্রীমতী প্রতিমা দেবী আর চিত্রকর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর।

আশ্রম থেকে বিদায়ের পূর্বদিন সায়াহ্নে পূজনীয় গুরুদেবকে আশ্রম-বাসিগণ একটি সভায় মিলিত হয়ে অভিনন্দিত করেন। শাস্ত্রী মহাশয় সকলের হয়ে তাঁকে শ্বেতপদ্মের অর্ঘ্য দান করেন। এই উপলক্ষে গুরুদেব যা বলেন সে 'অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক'। ...পরদিন বৈকালে তিনি আশ্রম থেকে

কলিকাতা যাত্রা করেন। আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর সঙ্গে স্টেশনে গিয়েছিলেন। সকলের ভক্তিপূর্ণ অভিবাদন নিয়ে তিনি গাড়িতে চড়লে 'শান্তিনিকেতন' গানের মধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিলে।

এই সময়ে কবির মন অত্যন্ত বিষণ্ণ, তার হেতু হলো, বিশ্বভারতীর মধ্যে নানা 'বিরুদ্ধ শক্তি সত্যকে আচ্ছন্ন' করছে। রবীন্দ্রনাথ তখন একা আন্তর্জাতিকতার বাণী বহন করে বিশ্বপথিক; কিন্তু আশ্রমের প্রায় সকল কর্মীই কম-বেশি 'স্বদেশী'। স্বরাজ কর্মের প্রেরণায় তাঁর বিশিষ্ট কর্মীদেরও কেউ কেউ আশ্রম থেকে স্থানান্তরে। বুদ্ধের বিশ্বমৈত্রীর বাণী বা ভাবের দ্বারা কবি তাঁর বিশ্বভারতীর কর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে পারেননি বলে তাঁর এই বিষণ্ণতা।

যাই হোক, বিদেশ যাত্রার আগে কলকাতায় অ্যালফ্রেড থিয়েটারে ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৯২৪) 'অরূপরতনের' মূকাভিনয় হলো।—এটি 'রাজা' নাটকেরই রূপান্তর; বহু নতুন গান এতে সংযোজিত হয়। গীতবহুল যাত্রার আদর্শে এটি গীতিনাটকে রূপ নেয়। গানগুলি নাটকের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে গান ছাড়া নাটকটি অসম্পূর্ণ থেকে যেত। গানগুলিকে মূকাভিনয়ে রূপ দেওয়া হয়। দেহভঙ্গিতে কোথাও কোথাও যে একটু নাচের আমেজ দেখা না গিয়েছিল তা নয়। গুরুদেব নাটকে কথার অংশ পাঠ করেছিলেন। গানের দল ছিল পিছনে। এই সময় থেকেই মেয়েদের মধ্যে সামান্য একটু নাচের চর্চা শুরু হয়েছিল কাথিয়াবাড় ও গুজরাতের লোক-নৃত্যের আদর্শে। তার সঙ্গে ছিল একটুখানি 'ভাও-বাৎলানো' নৃত্যপদ্ধতি। ...শান্তিনিকেতনে গুজরাতের গরবা নাচের প্রথম প্রবর্তন করেন বিশ্বভারতীর ইংরিজি-ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [জাহাঙ্গীর] ভকিলের পত্নী। এঁরা এখানে আসেন ১৯২৪ সালে। শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন ১৯২৮ সালে। এই যুগে ভকিল-পত্নী ১৫।১৬ জন ছাত্রীকে গরবা নাচ শেখান। গুরুদেবের যে ক-টি গানের সঙ্গে নাচ শেখানোর কথা আজও মনে পড়ে সেই গান ক-টি হলো—'যদি বারণ কর তবে গাহিব না,' 'মোর বীণা ওঠে' ও 'কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে'। —(রবীন্দ্রসঙ্গীত, পৃ ২৩৭)। —আচার্য নন্দলাল এই গরবা-নৃত্যের ওপর ছবি এঁকেছিলেন সে-কথা আগেই বলেছি। কলকাতায় এই নাটক অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চসজ্জাও আচার্য নন্দলালের।

কবি দলবল নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার উদ্দেশ্যে য়ুরোপ রওনা হ'ন; আর এর মধ্যে নন্দলাল দলবল নিয়ে গৌড়-ভ্রমণ সেরে এলেন। কবিগুরু ও শিল্পিগুরু উভয়েই বিশ্বভারতীর ঝুলি ভরিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে, কার্ত্তিক ও গণেশের মাতৃপূজার কাহিনী। মাতার নির্বন্ধে কার্ত্তিক ময়ূরে চড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণে রওনা হলেন; আর গণেশ তাঁর মায়ের চারদিকে ঘুরে ঘুরে, পাকে পাকে তাঁকে প্রণাম করতে লাগলেন। একজন বিশ্বভারতীর জন্যে করেছেন বিশ্বমৈত্রীর সংস্থান; আর অপরে স্বদেশের সুপ্রাচীন শিল্পপরম্পরার সন্ধান, সংগ্রহ এবং তাতে প্রাণসঞ্চার করে বিশ্বভারতীতে গড়ে তুললেন ভারতশিল্পের পীঠস্থান।

॥ অধ্যক্ষ নন্দলালকে লেখা কলাভবনের অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথের পত্র ॥

রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী শিল্পী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর পোর্টসৈয়দ থেকে শান্তিনিকেতনে তাঁর 'নতুনদা'-কে লিখেছিলেন :—

শ্রীচরণেষু—

মাদ্রাজ থেকে আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম আশা করি পেয়েছেন। মাদ্রাজ ছেড়ে পথে বিশেষ কোনও ঘটনা হয় নাই। দিন রাত্রি যখনই হোক বড় স্টেশন এলেই লোকের ভিড় এসে গুরুদেবকে ফুল, মালা, খাদ্য উপহার দিয়েছে, কিন্তু শেষটা বড় অসহ্য হয়ে উঠেছিল, সব জানালা বন্ধ করে দিতাম যে রাত্রে আর কেউ জ্বালাবে না, কিন্তু গভীর রাত্রি হোক আর শেষরাত্রিই হোক ঠিক লোকেরা এসে দরজা ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে গুরুদেবকে উঠিয়ে মালা খাবার দিয়ে তবে ছাড়ত, মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙ্গে দেখি ঘরের ভিতর যত পারে লোক ঢুকেছে, গুরুদেব দাঁড়িয়ে অকূল পাথারে ভাবছেন, ঘুম না ভাঙ্গলে আমায় ডেকে দিয়ে বলতেন ওদের সামলাতে. গাড়ী না ছাড়লে নিস্তার পেতেন না। ২৫শে কলম্বো পৌঁছাই; সেখানে ২৪ঘণ্টা থাকি, সি হল যায়গাটি পাহাড়, বন আর জলা যায়গা, লোকগুলোকে দেখলেই দেশী খৃস্টান মনে হয়; আর বেশির ভাগ তাই। সবচেয়ে কুৎসিত লাগল মেয়েদের পরিচ্ছদ;

আর পুরুষদের ফিরিঙ্গির মত পোষাক। তারা মোটে ২০মাইল ভারতবর্ষের থেকে দূরে আছে, কিন্তু সহস্র মাইল দূরের ইংলণ্ড তাদের কাছে ভারতবর্ষের চেয়ে ঢের নিকটের। ভারতের সঙ্গে তাদের কোনও যোগাযোগ নাই, খবরের কাগজে ভারতের সংবাদের চেয়ে ১০গুণ বিলাতের খবর থাকে। কোনও movement নাই, যতদূর প্রাণহীন হবার তারা তা হয়েছে। এখানে এখন বর্ষাকাল, দিনরাত্রি বৃষ্টি হচ্চে, কোথাও বেরুতে পারি নাই, একবার Museum দেখতে গিয়েছিলাম। Museum-এ অনেক জিনিস আছে, তার মধ্যে অনুরাধাপুরের পাথরের বাক্স ও sculpture, কিন্তু পাথরের চৌকাঠ, জানালা, থাম sculpture-এর চেয়ে ঢের ভালো লাগল। সবচেয়ে ভাল সংগ্রহ হচ্চে ধাতুমূর্তি পিলসুজ, প্রদীপ ইত্যাদি। একটা নূতন জিনিস দেখলাম, কাঠের mask, বিশেষ করে জাপানের mask দেখে যেটা চোখে পড়ল, অসভ্যদের তৈয়ারি, Devil dance-এর সময়ে পরে নাচে, কতকগুলো খুব ভাল লাগল, আর কাঠের খেলনা, পাতার ছাতা, আসন ইত্যাদি। বেশ সময় নিয়ে দেখলে, আর photo নেবার permission নিলে এখানে অনেক জিনিস আছে যা ভারতবর্ষের অন্যত্র বোধহয় নাই। ২৮শে সকাল ৮টায় আমরা জাহাজে এসে চড়লুম, জানতুম ৮টার পরই জাহাজ ছাড়বে, কিন্তু জাহাজে উঠে জানলাম, মাল বোঝাই হতে সন্ধে হবে, তার আগে ছাড়বে না। গুরুদেবকে একটি Suite of Room দিয়েছে। আমায় যে কেবিনে দিয়েছে তাতে ৬জন থাকবে, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ১জন জাপানী ছাত্র ছাড়া আর কেহ সে ঘরে নাই; অন্য সমস্ত ব্যবস্থা বেশ ভাল। জাপানী সঙ্গী Germany যাচ্ছেন, ডাক্তারি শেখবার জন্যে। ইংরাজি একেবারে জানেন না। ইসারায় কথা কইতে হয়। হাঁ, বাসু, এই জাহাজেই Paris যাচ্ছে। বেশির ভাগই জাপানী যাত্রী, ভারি ভদ্র, কয়েকজন ইংরাজ আমেরিকান জার্মান পর্তুগীজও আছেন। বিশেষ কোনও গোলমাল নাই বেশ সকলেই মিশুক, খোলা হাসিতে সময় কাটিয়ে দিয়েছে। ২৮শে সন্ধ্যার পর জাহাজ ছাড়ল, সমস্ত দিন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

বন্দরটাতে সমুদ্রের খানিকটা নিয়ে একটা পাথরের পাঁচীল দিয়ে ঘেরা। জাহাজ ঢোকবার বেরুবার জন্য একটা পথ আছে। বন্দরে বেশি ঢেউ নাই, কিন্তু ঐ পাঁচীলের বাহিরে সমুদ্র ক্রমাগত আস্ফালন করছে, মাঝে মাঝে

ঢেউ পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে ভিতরে এসে পড়ছে, মনে হচ্ছে যেন এখনই ও বেড়া ভেঙ্গে ফেলবে। গুরুদেব আমাকে Sea-sickness হবে বলে খুব ভয় দেখিয়েছিলেন, আমি জাহাজ ছাড়বার আগেই বিছানা আশ্রয় নিয়েছিলুম, যাতে ঘুমিয়ে পড়ি কিন্তু ঘুম কিছুতেই এল না, বন্দর ছেড়ে জাহাজ বাহিরে বেরুতেই টলমল করতে লাগল, ক্রমশঃই দোলা বাড়তে লাগল, আমিও এইবার বুঝি Sea-sickness হয় হয় করে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, টের পাই নাই। ভোর হতে বিছানা ছেড়ে নিজেকে অনেক রকম করে যাচাই করে নিলাম, বুঝলাম কিছু হয় নাই, তখন ডেকে গেলাম, কেউ নাই। সাঁ সাঁ করে বাদলা হাওয়া দিচ্ছে, থেকে থেকে বৃষ্টির ঝাপট এসে সব ডেক ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, জাহাজটা ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। খানিক পরে চা খেয়ে গুরুদেবের কাছে গেলাম তিনি আমার কিছু হয় নাই শুনে আশ্চর্য হলেন, প্রতিমাদেবী বাবু সব পড়ে আছেন আর বমি করছেন। তৃতীয় দিন বাদলা কেটে গিয়ে বেশ রোদ্দুর উঠল। ওঁরা ক্রমশঃ সুস্থ হলেন।

সেই যে কলম্বো ছেড়েছে তারপর দিনরাত্রি হু হু করে জাহাজ চলেছে, বিরাম নাই একেবারে এই পোর্ট সৈয়দএ গিয়ে থামবে। কেবল জল জল জল, কোথাও আর কিছু নাই, কি ভয়ানক একঘেয়ে লাগে কি বলব। Red Sea-তে ঢোকার মুখে কতগুলো মরা পাহাড় দিকে দিকে দেখা যায়। যদিও পাহাড়গুলোতে কোনরকমই জীব নাই, কিন্তু তবুও টানে, মাটীর টান মানুষের পক্ষে কি দুঃসহ টান তা বুঝতে পারলাম। এই জায়গাটা naviga-tion এর পক্ষে খুব বিপদজনক। কোন পাহাড়, রাত্রে সব পাহাড়ের চুড়োয় Light House-এর আলো দেখতে পাওয়া যায়। সামুদ্রিক জীবের মধ্যে শুশুক, মাছ, উড়ো মাছ আর জমির কাছাকাছি থাকলে ২।১ রকম পাখী ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি।

আজ সুয়ামারুর কাপ্তান wireless করে গুরুদেবকে তাঁহাদের শুভকামনা জানিয়েছেন, তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে wireless করা হলো, সে বিলাত হতে এসেছে এখন ১৫০ মাইল দূরে আছে। কাল দেখা হবে। হাঁ ইতিমধ্যে plan একটু বদলেছে; Portsaid-এ নেমে Palestine-এ এক সপ্তাহ ও Eygpt-এ এক সপ্তাহ থাকা হবে এইরকম বন্দোবস্ত করার

জন্য আজ wireless করা হলো। সুমাত্রা খুব কাছ দিয়ে গেল, সমস্ত জাহাজসুদ্ধ লোক গুরুদেবকে cheer করল। এবারে গুরুদেব এর মধ্যে ৫-টা বেশ বড় কবিতা লিখেছেন বেশ নূতন রকম, সন্ধেবেলা রোজ শোনান। দিনলিপি লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু থেমে গেছে। আজ wireless এল Plaestine-এ সব ঠিক হয়েছে। গুরুদেবকে Jerusalem University ও ওখানকার High Comm. আমন্ত্রণ করেছেন, ১ই একটা lecture হবে। এ জাহাজ Portsaid-এ ছেড়ে দেওয়া হবে। পনের দিন বাদে আর একখানা জাহাজ যাবে সেইটে ধরে Marseilles যাওয়া হবে। আমার যে কি দশা হবে তা জানি না, কখন বলছেন, ওঁর সঙ্গে আমেরিকা যেতে, কখন বলছেন, Paris থেকে কোনও একটা crafts শিখতে, কিছুই ঠিক হচ্ছে না, দেখি শেষে কি হয়।

আজ Portsaid-এ এসে পৌঁছলাম, পৌঁছেই cable এল Geneva থেকে যে, ২২শের মধ্যে না এলে South America-এর জাহাজ পাওয়া যাবে না, তাই Palestine যাওয়া স্থগিত করা হল, সোজা Paris যাওয়া হবে। Telegram-এর খরচ এবারে বেশ মোটা অঙ্ক হবে।

Portsaid-এ কিছু দেখার নাই। Suez খাল্টা বেশ লাগল, ২ দিকে ধু-ধু করচে মরুভূমি, মাঝে মাঝে খেজুরের ঝোপ, ২।১০টা মাটির বাড়ি, সবই মাটির ছাত, বৃষ্টির সংস্রব এখানে নাই। উটের সারি বালি ভেঙ্গে কোথাও চলেছে। মেয়েরা কালো বোরখা পরা, মুখে জালের আবরণ। আর Portsaid শহরটা, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজ, ইটালিয়ান, আরবী মেশা একেবারে জগাখিচুড়ি। একটু পশ্চিমে কি রকম হবে আভাস পাচ্ছি।

আজ ১১টার সময় জাহাজ ছাড়বে, একেবারে Marseilles-এ গিয়ে, আমার বোধহয় ১২।১৩ই পৌঁছবে।

ইতি—

সুরেন।

—এই পত্রখানিতে আচার্য নন্দলালের সিংহল-ভ্রমণের ভূমিকা করা হয়েছে। শান্তিনিকেতনে মাটির ছাদ-দেওয়া 'চৈত্য' ও 'শ্যামলী' বাড়ির পূর্বাভাসও এতে দেখা যায়। সুরেন্দ্রনাথের এই যাত্রার ফলাফল যথাসময়ে বলা যাবে।

।। ডক্টর স্টেন কোনো ।।

এই সময়ে আশ্রমে কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথি আগমন করেছেন। তাঁর মধ্যে অন্যতম হলেন স্টেন কোনো। কিছুদিন হলো বিশ্বভারতীর অধ্যাপকরূপে ডক্টর স্টেন কোনো আশ্রমে এসেছেন। ইনি নরওয়ে দেশের ক্রিশ্চিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ইনি ভারতীয় শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্যে য়ুরোপে প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ এঁর খ্যাতি পৃথিবীর সর্বত্র। ভারতীয় শাস্ত্রচর্চার জন্যে ড. উইন্টারনিজ, ড. লেভি আর এঁর আসন য়ুরোপে সম্প্রতি সর্বোচ্চে। এবং এঁরা সকলেই বিশ্বভারতীতে যোগ দিয়েছেন। ড. স্টেন কোনো প্রসিদ্ধ প্রাচীন-লিপিবিৎ ও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ। বয়স প্রায় ষাট। তাঁর পত্নী সর্বদাই সঙ্গে থাকেন। য়ুরোপ-ভ্রমণের সময়ে ১৯২১ সালে এঁর সঙ্গে গুরুদেবের সাক্ষাৎ হয়। তখন থেকেই তাঁর বাসনা ছিল, বিশ্বভারতীতে যোগ দেবেন। শান্তিনিকেতনে আসবার পথে আগ্রাতে তিনি তাঁর জামাতা ড. মর্গেনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং জৈন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়েছেন। ড. স্টেন কোনো ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রে গভীর পণ্ডিত। তিনি ষোলো বছর আগে সারনাথ-খননকার্যের সময়ে প্রাপ্ত কতকগুলি শিলালিপির পাঠোদ্ধারের জন্যে ভারত-গভর্নমেণ্টের অনুরোধে এদেশে এসেছিলেন।

সম্প্রতি তিনি এই বিষয়গুলি বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করবেন :

(ক) প্রাচীন খোটানিজ ভাষায় বজ্রচ্ছেদিকা ও অন্যান্য পুঁথির পাঠোদ্ধার। (সপ্তাহে একদিন —শনিবার প্রাতে ৮টা থেকে)।

(খ) ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র : আর্যগণের ভারতাগমনের সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয় ধর্মচিন্তার বিকাশ বিষয়ে। (শনিবার —সন্ধ্যা ৬॥ থেকে)।

(গ) খরোষ্ঠি লিপিতে লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্র ধর্মপদের ব্যাখ্যা—ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক ও ঐতিহাসিক অবতারণা। (রবিবার প্রাতে ৮টা থেকে)।

(ঘ) কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ড. স্টেন কোনোর কাছ থেকে পাঠ নেবার জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কালিদাস নাগ ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রতি

শনিবারে শান্তিনিকেতনে এসে থাকেন।

ড. কোনো কলকাতাতেও ক-টি বক্তৃতা করেছেন। বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে তাঁকে ভট্ট শ্রীশৈল কণ্ঠ আর তাঁর পত্নীকে শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী নাম দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে চৈনিক অধ্যাপক ভো-চিয়াং-লিম্ শান্তিনিকেতনে চীনা ভাষা সাহিত্য ও সভ্যতা সম্পর্কে বক্তৃতা করছেন; ফ্রান্সের অধ্যাপক বেনোয়া এখানে স্থায়িভাবে থেকে ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিখিয়ে থাকেন।

আচার্য নন্দলাল স্টেন কোনো সম্পর্কে বলেন, — 'স্টেন কোনো ছিলেন লম্বা চওড়া, প্রশান্ত চেহারার লোক। গোঁফ-দাড়ি-কামানো ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণের মতন ছিলেন দেখতে। ইনি এলেন নরওয়ে থেকে। এলেন সস্ত্রীক। সঙ্গে এনেছিলেন একটি ছেলে। ছেলেটি ছিল সুইডিস। ছেলেটিকে এখানে ভরতি করে দিলেন আমাদের কলাভবনে। ছাত্রটি খুবই বিনয়ী আর শ্রদ্ধালু। বিদেশী য়ুরোপীয় হলেও তার বিনয় আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

'স্টেন কোনোকে আমি একটি ছবি এঁকে উপহার দিলুম। —উত্তাল সমুদ্রে ঢেউএর তোলপাড় —এই ছবি এঁকে দিলুম। তারিফ করলেন তিনি সেই ছবিটি দেখে।

'শান্তিনিকেতনে স্টেন কোনো ধুতি পাঞ্জাবী পরতেন; আর তাঁর স্ত্রী শাড়ী পরতেন আমাদের গেরস্থ ঘরের মেয়েদের মতন করে।

'স্টেন কোনো যখন আশ্রম থেকে দেশে ফিরে যান তখন তাঁকে মানপত্র দেওয়া হলো আশ্রমের তরফ থেকে। তালের বাগড়ার ভেতর থেকে কেটে নিয়ে তার মাঝে একটা কোটোর মতন করে নেওয়া হলো। তার ওপর একটা সিলভার প্লেটের ওপর বিশ্বভারতীর ব্যাজ আর গুরুদেবের আশীর্বাদ কবিতা লেখা ছিল। গুরুদেবের লেখা মানপত্রটি সিল্কের ওপর ডিজাইন করে বগলীর ভেতরে দিয়ে দিলুম। বছরখানেকের পরে তিনি চলে গেলেন। আমাদের সঙ্গে যোগ তিনি রেখেছিলেন দেশে ফিরে যাবার পরেও। দেশে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিঠি লিখতেন তখনও। তারপর কি হলো জানি না।'

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-আশ্রমে তাঁর সাধনার উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠপুত্র ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথ এই সময়ে তাঁর নিচুবাঙলার বিজন কুটীরে মায়ার ফাঁদ পেতে বসে আছেন। নন্দলাল প্রত্যহ দু-বেলা আসেন, তাঁকে প্রণাম

করে প্রাণিজগতের প্রতি মমতা-মাখা তাঁর জীবনচর্যা প্রত্যক্ষ করে যান। শিল্পী নন্দলাল তাঁর নিজের জীবনটিকেও আশ্রমের তরুলতা এবং প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর সঙ্গে মিলিয়ে দেন। সেই প্রথম সংবর্ধনা-দিবসের আকস্মিক অপরোক্ষ-অভিজ্ঞতার অনুভূতি স্মরণ হয়ে তাঁর সমগ্র সত্তাটিকে শিহরিত করে।

॥ বিজন কুটীরে মায়ার ফাঁদ ॥

সাধের মশা, সাধের মাছি,
সাধের পিঁপড়ে পোকা-মাকোড়।
বোস্‌রে গায়ে বোস্‌রে পায়ে,
কোর্‌বো না আমি ধর্‌ পাকড় ॥
আয় আয় কাক, ছাড়ি কা কা ডাক,
তোরে বড় বেশী ডাকতে হয় না।
তুই রে শালিক বড় বেরসিক—
খাবার দেখ্‌লে সবুর সয় না ॥
কাঠবেরালী, কোথা পালালি,
আয় আয় আয়—দৌড়ে আয়।
বড় তুই বোকা! ছাতু খাবি তো খা।
কথা বুঝিস্‌ নে এ বড় দায় ॥
সাবাস শূর তুই কুকুর!
ভয়ে এগোয় না চোর ডাকাত।
যুধিষ্ঠির, ধর্মবীর
ঠাকুর মানিত কুকুর জাত ॥
সুখের সুখী দুখের দুখী,
পরম বন্ধু তুইরে মোর।
দ্বিজ এ দীন শুধিবে ঋণ
কেমনে রে তোর—ভাবিয়া ভোর।
বেড়াল-ডাকিনী, তোরে আমি চিনি,
মায়া কাঁদুনিতে মূলে না ভুলি।
আয় পিছু পিছু, দেবো তোরে কিছু,
পাত থেকে মাছ নিসনে তুলি' ॥
আতপ চাউল—ঘৃত সুরভি।
ভোজে বসি' গেল বিজনে কবি ॥
শত্রু মিত্র চপল ধীর।
বাছারা সবাই এসে হাজির ॥
কাক চাহে আড়ে আড়ে।
বুদ্ধি তার হাড়ে হাড়ে।
না করিয়া কাল-ব্যাজ—
কুকুর নাড়িছে ল্যাজ ॥
মেনিমণি লয়ে বাচ্ছা পাঁচ
কাঁটা-শুদ্ধ বাটা মাছ
চিবুচ্ছে দিক্‌বিদিক্ ভুলি'।
মিউ মিউ করে বাচ্ছাগুলি ॥
কাঠবেরালী পাশে-পাশে
ভোজে বসি' গেল ছাতুর থালে ॥
শালিক দিচ্ছে শিরে ঠোকর।
কাঠবেরালী পায়ে কামোড় ॥
ওধারে ঝাঁকিল ভূচর ভূচরী,
খেচর এধারে বসিল সরি' ॥
মিটিল বিবাদ—ঘুচিল জ্বালা।
ভালোয় ভালোয় ফুরালো পালা ॥
—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

'—কাঠবিরালী, শালিক, কুকুর প্রভৃতি জীবগুলি পরম পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গের সাথী। রাত্রে ইলেকট্রিক্ আলোয় যখন তিনি লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত থাকেন—নানাপ্রকার পোকা-মাকোড় তাঁহাকে বিরক্ত করে। প্রত্যুষে উঠিয়া উত্তমরূপে সরিষার তৈল মর্দন করেন বলিয়া তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে তৈলের সুগন্ধে পিঁপড়েরা তাঁহাকে আক্রমণ করে। কাঠবিরালী তাঁর লেখার সময় হাতে পায়ে গায়ে উঠিয়া নৃত্য করে। শালিক আসিয়া খাবার জন্য মাথায় ঠোকর দেয়।'—এই হলো প্রত্যক্ষদর্শী 'শান্তিনিকেতন-পত্রিকা'র তৎকালীন সম্পাদক মহাশয়ের বিবৃতি।

সেকালের আশ্রমে শিশু-বিভাগের ছেলেদের বাগানের ফুলগাছে জল দিতে হতো। তারপরে জলখাবারের ঘণ্টার আগে শিশুরা ছোট ছোট মাটির সরাতে করে ছাতু টাতু পাখীদের খাওয়াত। শালগাছের তলায় তলায় কাঠবিরালীর জন্যে ছাতু ছড়িয়ে রাখা হতো। ছাতু ছেলেরা পেত ভাণ্ডার থেকে নিয়মিতরূপে। ১৯১৭ সালের দিকে শিশুবিভাগে একটা পুরস্কার ছিল, পাখীকে যে তার হাত থেকে খাবার খাওয়াতে পারবে সে দশ টাকা পুরস্কার পাবে। বলা বাহুল্য, এ নিয়ম আশ্রমে প্রবর্তিত হয়েছিল, আশ্রমের সাক্ষাৎ বিশ্ববন্ধু ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথের আচরণের প্রত্যক্ষ নিদর্শন থেকে।

এই সময়ে শান্তিনিকেতনের মহামুনি দ্বিজেন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত প্রশ্ন দু-টি শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন :—

১। কোন্ অবস্থায় কিসের জন্য অধিকাংশ লোকে ঈশ্বরকে ডাকে।

২। কোন্ অবস্থায় কিসের জন্য অতি অল্পলোকে ঈশ্বরকে ডাকে।

অনেকেই প্রশ্ন দু টির উত্তর দিয়েছিলেন। তার মধ্যে বিধুশেখর শাস্ত্রী ও পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীর উত্তর দু-টি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত ভাষায় উত্তর দু-টি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।—

১। দৈব প্রতিকূল হইলে বিপদের কশাঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অধিকাংশ লোকে ঈশ্বরকে ডাকে।

২। দৈব অনুকূল হইলে সম্পদের মায়াজাল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অতি অল্প লোকে ঈশ্বরকে ডাকে।

এঁদের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে প্রশ্নকর্তা মহাশয় নিম্নলিখিত উপদেশটুকু পুরস্কাররূপে এঁদের দিয়েছেন।

ঈশ্বর আমাদের সকলের উপরে সুমঙ্গল শান্তিবারি বর্ষণ করুন। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—ন বিভেতি কদাচন। ব্রহ্মের আনন্দ সমস্ত জগতের মাতৃক্রোড়। যে বালক মাতৃক্রোড়ে বসিয়া আছে —তাহার আবার ভয় কিসের? তাঁহার আনন্দ আমাদের সকলের একমাত্র অভয় কূল হোক—তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আমাদের একমাত্র ধ্রুবতারা হোক্—তাঁহার চরণচ্ছায়া আমাদের একমাত্র শান্তিনিকেতন হোক্। ওঁ শান্তি! শান্তি। শান্তি। হরিঃ ওঁ।

॥ নন্দলালকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রধারা ॥

ওদিকে সমুদ্রের জাহাজ থেকে আচার্য রবীন্দ্রনাথ আচার্য নন্দলালকে পত্র লিখছেন, বিধাতার সৃষ্ট প্রকৃতি আর মানুষ; আর মানুষের সৃষ্ট কলের মৌলিক বিরোধ সম্পর্কে বুঝিয়ে ব্যাখ্যা করে। ক-খানি পত্রের টুকরো এই:

'সিন্ধু শকুন'।

'বিধাতার সৃষ্টি মানুষ, আর মানুষের সৃষ্টি কল, তাদের পাশাপাশি দেখ। কে হার মেনেছে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। মানুষের ভিতরে সব রকম দরকারের কল আছে অথচ দরকারটাকে দেখাই যাচ্ছে না। কলটার চেহারায় দরকার ছাড়া আর কিছুই দেখ্‌চিনে। এর চেয়ে বে-আব্রু আর কিছুই নেই। * * * সুন্দরের বুকের ভিতর দিয়ে কালো নিঃশ্বাস ফুঁস্‌তে ফুঁস্‌তে কালো কালো দৈত্য চলেচে। সেকালের জলতোলা কলটি মানুষের প্রাণের জিনিষ তাই পাহাড়ের সঙ্গে আকাশের সঙ্গে রঙে রঙে মিশ খেয়েচে। আর হাল আমলের ঐ জাহাজটা বিশ্বের রাসলীলার প্রতিবাদ করতে করতে বেসুরটাকে সুরলীলার দিকে উৎক্ষিপ্ত করতে করতে চলেচে। * * * ছোট্ট ফুল, ছোট্ট পাখী কি সম্পূর্ণ অথচ কি সরল। আর ঐ বৃহৎ যন্ত্রটা তার অসম্পূর্ণতার জটিলতা নিয়ে যেন চীৎকার করচে তার শান্তি নেই। ফুল হলো লক্ষ্মীর বাহন, আর যন্ত্রটা হলো যন্ত্ররাজ কুবেরের; পাখী লক্ষ্মীর দরবারে গান গায়, আর ঐ যন্ত্রটা কুবেরের ভাণ্ডারে শিঙে ফুঁকতে থাকে। * * * ঐ পাখীটার, এই রিক্ত শাখার কয়েকটি ফুলের কত বড় গাম্ভীর্য ওরা যেন সিংহাসনে বসে আছে। আর নির্লজ্জ যন্ত্রটা যেন ওদের কাছে ভাঁড়ামি;

ওরা ফিরেও তাকাচ্ছে না। * * * লোকালয় আর প্রকৃতি গলাগলি ভাব করে আছে —কল আর প্রকৃতি কেবলই লড়াই করচে। কলটা আগে নম্র হোক, গাছের মতো, পাখীর মতো তবেই প্রকৃতি তাকে নিজের ঘরের মধ্যে বরণ করে নেবে। নইলে কিছুতেই সন্ধি হবে না।'

॥ আশ্রম-সংবাদ—বহির্ভারতীয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য প্রবাহ ॥

পূজাবকাশে (১৯২৪) এবার অনেক ছেলেই আশ্রমে ছিল। লক্ষ্মী-পূর্ণিমার রাত্রে একটি সভায় আশ্রমের অধিবাসিগণ মিলিত হয়ে সঙ্গীত শ্রবণ করেন। সঙ্গীতান্তে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। বিদ্যালয় খোলার পরে আশ্রমের ছাত্রীরা একটি সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় ছোট একটি অভিনয় আর কতকগুলি সঙ্গীত হয়। ভাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে আশ্রমের মহিলাগণ ও ছাত্রীগণ আশ্রমের অধিবাসিগণকে নিমন্ত্রণ করে পরিতৃপ্তি সহকারে খাইয়েছিলেন। দু-টি ছাত্র বিনা বেতনে শিক্ষাসত্রে লেখাপড়া শেখার সুযোগ লাভ করে। তারা সবাই কম্বলের আসন আর সতরঞ্চি বুনতে পারে। আশ্রমে সর্বেশ কাপ ম্যাচের খেলা হয়। অধ্যাপক ভকিলের চেষ্টায় আশ্রমে একটি সুন্দর 'হকি' দল গড়ে উঠেছিল। ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বোম্বে ভাস্কর্য বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। স্কলারশিপ নিয়ে তিনি ঐ বিদ্যা শেখার জন্যে ইংলণ্ড-যাত্রা করেন। শচীন্দ্র সেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবহবিদ্যা গবেষণা করে 'ডাক্তার' উপাধি পান। রেঙ্গুন-কলেজের অধ্যক্ষ লিম্ চীনা ভাষা শেখাবার জন্যে আশ্রমে আসেন।

আচার্য নন্দলাল বলেন: লিন্ ওয়াং-চিয়াং (Dr. Lin Wong Chiang) চীনে পণ্ডিত চীনাভবনে চীনা পড়াতেন। তখন চীনাভবনের বাড়ি হয়নি। তিনি চীনে পড়াতেন আর বাঙ্গালা শিখতেন। তিনি আমাদের কলাভবনে আসতেন। এসে চীনা আর্টের বই থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি তখন অনুবাদ করতেন আমাদের চীনা আর্টের বই যা সংগ্রহ ছিল তার থেকেই। ছবি, রং —এই সব বিষয়ে অনুবাদ করতেন। আমি আর বিনোদ তাঁর কাছে বসে থাকতুম। তিনি যা বলতেন, আমরা সব লিখে নিতুম। তাঁর স্ত্রী বাঙ্গালা খুব ভালো শিখেছিলেন। গুরুদেবের বই ভালো

পড়তে পারতেন।

'ওঁরা চীনে ফিরে গেলেন। আমাদের এখান থেকে যে-সব ছাত্রছাত্রী পরে পেকিঙে গেল, তখন ওঁরা এদের খুব সাহায্য করেছিলেন। সে-সময়ে নব-চীন সকলের ওপর খুব অত্যাচার করছে। ডক্টর লিনের মা অন্ধ হয়ে মারা গেছেন।'

আশ্রমে পৌষ-উৎসব এসে গেল। উৎসবের জন্যে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হলো। অতিথিদের থাকার জন্যে তাঁবু খাটানো হলো। পানীয় জলের ভালো ব্যবস্থা ছিল। শান্তিরক্ষার জন্যে Boy's Scouts বা ব্রতী-বালকের ব্যবস্থা হলো। দোকান এসেছিল মোট ষাট-টি। কলাভবনের পোস্টকার্ড আর ছবির একটা দোকান ছিল। যাত্রা-গান এলো আদিত্যপুর থেকে। যাত্রা-গান শুনে অধ্যাপক স্টেন কোনো অবাক হয়েছিলেন। সাঁওতালদের নানারকম খেলার ব্যবস্থা হলো। বাজি পোড়ানো হয়েছিল। ৭ই পৌষ সকালে মন্দিরে আচার্যের কাজ করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ৮ই পৌষ সকালে আম্রকুঞ্জে প্রাক্তন ছাত্রদের সভা হলো। বর্তমান ছাত্রেরা তাতে যোগ দিয়েছিল। সভাপতিত্ব করেন ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৯ই পৌষ সকালে পরিষদের অধিবেশন হয়। অধ্যাপক স্টেন কোনো প্রথমে ভাষণ দেন। এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব আর শাস্ত্রীমহাশয়ও বক্তৃতা দেন। দুপুরে কলাভবনে পরিষদের পুনরায় অধিবেশন হয়।

পৌষ-উৎসবের পরে আশ্রমবাসীদের দিগ্বিজয়ের পালা। সাধারণতঃ পৌষ-উৎসবের পরে ভ্রমণের জন্যে সপ্তাহখানেক ছুটি থাকে। বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রী আর অধ্যাপকগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নানা দিকে দিগ্বিজয়ে বের হন। আচার্য নন্দলাল, প্রমদাবাবু আর নেপালবাবুর নেতৃত্বে ছাত্রেরা মালদহের দিকে যান, —গৌড় আর আদিনার পুরাতন শিল্পকর্মাদি দেখে তার অনু-অঙ্কন আনবার জন্যে। দ্বিতীয় দল বের হয় সন্তোষবাবু আর অক্ষয়বাবুর সঙ্গে। তাঁরা গিয়েছিলেন লাউসেন-গড় দেখতে। তৃতীয় দলের নেতা ছিলেন মণি গুপ্ত। বিহারের দুমকা-দেওঘরের দিকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যান তিনি। সঙ্গে ছিলেন মাসোজী, কায়সনজি আর নির্মলা। চতুর্থ দল বের হয়েছিল কোপাই নদীর উৎস-সন্ধানে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয়নি। পথিমধ্যে একটি গ্রামের আতিথ্য-প্রাচুর্যে মুগ্ধ হয়ে

সেখানে তাঁরা তাঁবু গেড়েছিলেন। পরে ফিরে আসেন। এই দলের নেতা ছিলেন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। আর একটা দল বের হয়েছিল কাটোয়া-নবদ্বীপের দিকে। তাঁদের নেতা ছিলেন নগেন্দ্রনাথ আইচ। কেন্দুলি-মেলা। কালীমোহনবাবুর নেতৃত্বে আশ্রমের স্বেচ্ছাসেবক-দল জয়দেবের কীর্তিপীঠ কেন্দুলির মেলাতে যায়। সঙ্গে গিয়েছিলেন অধ্যাপক স্টেন কোনো। তিনি মেলা দেখে বেশ প্রীতিলাভ করেন। স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ বেশ ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছিল।

এই সময়ের দিকে শান্তিনিকেতন কলাভবনে বিদেশী পাশ্চাত্য অধ্যাপকদের অবদান সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। আঁদ্রে কার্পেলেস ১৯২৩ সালে এখানে বিলাতী অয়েল-পেন্টিং শেখাতেন। কলাভবনে ভারতশিল্পের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী শান্তা চট্টোপাধ্যায় (নাগ) তাঁর কাছে তৈলচিত্র অঙ্কনের পদ্ধতি শিক্ষা করতে লাগলেন। কলাভবনে প্রথম মূর্তি-গঠন শেখাতে আরম্ভ করলেন (১৯২৫) লিজা ফন্. পট্ নামে একজন অস্ট্রীয়ান মহিলা-শিল্পী। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী, শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধীরচন্দ্র খাস্তগীর, শ্রীরামকিঙ্কর বেজ এ'র কাছে প্রথম পাঠ নিলেন। লিজা ফন্. পটের পরে মাদাম মিল্ওয়ার্ড্ এই ক্লাস বিধিবদ্ধভাবে শুরু করেন। কলাভবনে মূর্তি-গঠনের ক্লাস নিয়মিত প্রবর্তিত হলো। মাদাম মিল্ওয়ার্ড্ ছিলেন ইংরেজ মহিলা। ইনি রোদাঁ, বুর্দেলের পরম্পরায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী। এই ক্লাসে পূর্বতন সত্যেন্দ্র বিশী, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুধীর খাস্তগীর, রামকিঙ্কর বেজ আর বাসুদেবন্ ছাড়া, শ্রীমতী কিরণবালা সেন যোগ দিলেন। ১৯২৫ সালে শ্রীরামকিঙ্কর বেজ সবে এসে বিশেষভাবে মিল্ওয়ার্ডের মূর্তিগঠন-ক্লাসে পাঠ নিতে শুরু করলেন। —ভারতশিল্প সাধনার পীঠস্থানে এই উভয় পাশ্চাত্য শিল্পরীতি-প্রবর্তনের মূলে হলো ডক্টর স্টেলা ক্রামরিশের প্রত্যক্ষ প্রভাব। আচার্য নন্দলালের বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এই সময়ে ভিন্ন পথেও ঝুঁকে পড়লেন ক্রামরিশের শিষ্য হয়ে। যাইহোক, কলাভবনের অধ্যক্ষ নন্দলাল কিঞ্চিৎ বিস্মিত হওয়া ব্যতীত এ-সবে কোনো আপত্তি প্রকাশ করেননি। মিল্ওয়ার্ড্ সম্পর্কে নন্দলাল বলেন :—

'মিলওয়ার্ড্ ছিলেন খাস বিলিতী ভালো মহিলা-ভাস্কর। আমাদের

প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর খাস্তগীর, রামকিঙ্কর বেজ—এঁরা সব ছাত্র ছিলেন তাঁর। মিল্‌ওয়ার্ড্‌ গুরুদেবের পোর্ট্রেট্‌ তৈরি করলেন। গুরুদেবের প্লাস্টারে পোর্ট্রেট্‌ তিনি তৈরি করলেন এখানে। করে, সেটি বিলেতে নিয়ে গিয়ে মার্বেলে কেটেছিলেন। —হয়নি ও গুরুদেবের মূর্তি—বললুম আমি। বদলান, বললুম আমি। আসল পোর্ট্রেটটাই বাদ দিয়েছেন। ‘কেন, কি হলো?’ জিগ্যেস করলেন তিনি। —গলা থেকে শুধু মুখটা ধরেছেন. এ তো ঠিক পোর্ট্রেট নয়—বললুম আমি। —মুখটা important তো বটেই; ঐ কাঁধ আর ঘাড়টাও important যে। বৃষস্কন্ধ হলেন আমাদের গুরুদেব। চালের মতন কাঁধ আর পিঠ তাঁর। তাই শুধু মুণ্ডুতে আমাদের চলবে না। যাই হোক্‌, ভালো হলো না গুরুদেবের সেই মূর্তিটা। ও-সব যোজনা করলেন না বলে। ফোটো আছে রবীন্দ্রভবনে। আমাদের কিঙ্কর শেষে স্কাল্‌প্‌চারের মাস্টার হলেন মিলার্ডের কাছে পাঠ নিয়ে। আমার পাঠ এগোল না—তাঁর ছাত্র হয়েও।'

॥ মালদহ, গৌড়, পাণ্ডুয়া ভ্রমণ, ১৯২৪-২৫ ॥

আচার্য নন্দলালের ১৬শ খাতা ডায়েরীতে গৌড় ট্যুরের বিবরণ রয়েছে। নোটবই এ বিভিন্ন মসজিদের ও টেরাকোটা কাজের নক্সা আঁকা আছে।

‘প্রমদাবাবু তখন আশ্রম-সচিব। ছাত্রদের ইতিহাস পড়াতেন। প্রমদাবাবু আমার কাছে গৌড়-টৌড় ঘুরে আসার প্রস্তাব করলেন। অনেক ঐতিহাসিক বস্তু দেখবার আছে ওখানে। প্রমদাবাবু, নেপালবাবু আর গৌরবাবু শিক্ষকদের ভেতর সঙ্গী হলেন আমার। ঐ সময়ে এখানে ছিলেন এস্‌. আর এম্‌. নাইডু। তাঁর কথাতে আমরা বুঝেছিলুম, তিনি একজন প্রতিভাশালী বিরাট ইঞ্জিনীয়ার। তাঁর ডিগ্রীও ছিল নাকি বিস্তর। তাঁর তত্ত্বাবধানে আশ্রমে তখন বৈদ্যুতিক আলোর বিশেষ সুব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁর অমায়িক সরল ব্যবহারে আর গভীর পাণ্ডিত্যে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছিলুম। তাঁর বয়স তখন ছিল মাত্র চব্বিশ বছর। যাই হোক, তিনিও আমাদের সঙ্গী হলেন। ছাত্রছাত্রীদেরও কেউ কেউ সম্ভবতঃ সঙ্গে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজনের নাম মনে আছে —শ্রীমতী ঠাকুর। সে বোধহয় আমাদের সঙ্গে পাণ্ডুয়া অবধি গিয়েছিল।

'নামলুম মালদহ স্টেশনে। ওখানে ডাক্তার ছিলেন ষোড়শী সরকার। ষোড়শীবাবু হলেন আমাদের ছাত্র কানাই সরকারের বাবা। ওঠা হলো তাঁর বাড়িতে। ওঁদেরও স্কেচ্ করা আছে আমার নোট্-বইয়ে, দেখো। তাঁরই অতিথি হলুম। খাওয়া-দাওয়া সারা হলো।

স্টেশন থেকে মহানন্দা পার হয়ে মালদহ শহরে পৌঁছুতে হয়। ইংরেজ আমলে মালদহের নাম হয়েছিল ইংরেজবাজার। ১৭৭০ খৃস্টাব্দে এখানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশমকুঠি উঠে আসে পুরোনো মালদহ শহর থেকে। ওলন্দাজ, ফরাসীদেরও এখানে কুঠি ছিল। মুসলমানদের পরে, ইংরাজ-রাজকর্মচারীরা এখানে বাস করতো বলে ইংরেজবাজার হলো জেলার সদর। মহানন্দা নদীর ওপর তখন সেতু হয়নি। স্টেশন থেকে শহরে যেতে হতো নৌকোয় করে। নদীর বান থেকে শহর রক্ষা করবার জন্যে নদীতীরে উঁচু বাঁধ রয়েছে। মালদহ নামটি খুব পুরোনো। রামায়ণে 'মলদ' নামের উল্লেখ আছে। পুরাণেও আছে। এ ছিল নাকি তাড়কা রাক্ষসীর দেশ। পরে আসেন আর্যেরা। মালদহের পাশেই হিন্দু বৌদ্ধ আর মুসলমান যুগের রাজধানী গৌড়-পাণ্ডুয়া। আমের জন্যে মালদহের বিশেষ খ্যাতি। কাছারি-বাড়ির হাতার মাঠে একটা খুব পুরোনো আমগাছ আছে। নাম হলো বৃন্দাবনী আমগাছ। মালদহের রেশম জগদ্বিখ্যাত। এখানকার রেশমী ধুতি শাড়ী আর রুমালের খ্যাতি বেশি। সে কাপড়ের কত রকম নাম —টুহু, গুলবিশি, বুলবুল, চসম, চাঁদতারা, কদমফুলী, মাপচর —এই সব। রং করবার জন্যে এখান থেকে মট্কা পাঠানো হয় মুর্শিদাবাদে। সেখান থেকে যায় দেশ-বিদেশে।

মালদহ শহরে দেখবার জিনিস হচ্ছে —ঐতিহাসিক গোলাম হুসেনের কবর, চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন, জহর-তলার থান। মালদহের চিত্রশালায় বরেন্দ্রভূমি থেকে সংগৃহীত পাথরের মূর্তি আর শিলালিপি-টিপি অনেক আছে। এখান থেকে রাজমহল-রাস্তার ধারে একটি উঁচু স্থান। লক্ষ্মণসেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী বা 'লখনৌতী' ছিল এখানে। অষ্টম শতাব্দের গোড়ায় আদিশূর এই গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীতে ছিলেন বলে প্রবাদ। বৌদ্ধধর্মের কবল থেকে হিন্দুধর্মকে তিনি উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিলেন। কনৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এনে তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন।

এই পাঁচজন ব্রাহ্মণই হলেন এখানকার রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষ। রামপালের 'রামাবতী' বা 'রমৌতী'-ও ছিল এখানেই কোথাও। শহরে একটি বড়ো মসজিদ আছে আকবরের সময়ে তৈরি। মালদহ ছিল শাক্তপ্রধান। মঙ্গলচণ্ডী, কালী, সর্বমঙ্গলা দেবীর বেদী ছিল সর্বত্র। বাশুলী, মশান-চামুণ্ডা —এঁদেরও পুজো হতো। চৈতন্যদেবের সময় থেকে মালদহ হয় বৈষ্ণবপ্রধান। চৈতন্য মহাপ্রভু আর নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোসাঞী মালদহে এসেছিলেন। মখদুমশাহ, কুতুবশাহ আর পিরাণ পীর —এই তিন পীর বিখ্যাত এখানে। মখদুমশাহ বেড়াতেন বাঘের ওপর চড়ে, আর নদী পার হতেন খড়ম পায়ে দিয়ে। মালদহের গম্ভীরা-গান বিখ্যাত। এ খুবই প্রাচীন। সামিয়ানার নিচে শিবের মূর্তি স্থাপন করে এই উৎসব হয়। আর বছরের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি নাচগান আর অভিনয় করে দেখানো হয়। প্রবাদ, শিবভক্ত বাণরাজা এই উৎসবের প্রচলন করেন। মালদহ-স্টেশনের কাছে একটি ধর্মশালা আর শহরের মধ্যে একটি পান্থশালা আছে।

॥ গৌড়-দর্শন ॥

'ষোড়শীবাবুর বাড়িতে বসেই স্থির হলো, আমরা হেঁটে যাব গৌড় দেখতে। তাঁর ওখান থেকে মাইল চার-পাঁচ হাঁটলেই গৌড়ের সীমানা পাওয়া যাবে। গৌড়ে গিয়ে উঠলুম আমরা সিল্ক-ফ্যাক্টরীতে। ওখানে সিল্কের গুটি —কোকুন বা পলু থেকে সিল্কের সুতো বের করে কাজ হচ্ছে, দেখলুম। এই পলুগুলো যেখানে রাখা হয়, সেই ঘরের পাশেই একটা বাড়ি আমাদের ছেড়ে দিলে থাকবার জন্যে। জায়গাটার নাম হলো —পিয়াসবাড়ি। ওখানে থেকে, দেখবার জায়গা সব দেখলুম। বড়ো বড়ো পুকুর, বড়ো বড়ো বাড়ি, বাগানের মধ্যে বাড়ি, গড়বাড়ি ফোর্টের মতন —সব ঘুরে ঘুরে দেখলুম।'

পূর্ববঙ্গ ছাড়া, বাঙ্গালাদেশের প্রায় ভূভাগ পরিচিত ছিল গৌড় নামে। রাজধানী গৌড়ের সমৃদ্ধি থেকেই একদা সমগ্র দেশ 'গৌড়' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। খৃস্টপূর্ব যুগের পাণিনি থেকে বর্তমানের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙ্গালাদেশ বোঝাতে 'গৌড়' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। সম্ভব, সুপ্রাচীন 'গোণ্ড' জাতির

নামের সঙ্গে 'গৌড়' নামটির যোগ আছে। উত্তরভারতে ছিল 'পঞ্চগৌড়'। ষষ্ঠ শতাব্দের আগেই বাঙ্গালাদেশের এই নগর এই নামে প্রসিদ্ধ হয়। গুপ্তরাজাদের সময়ে গৌড় তাঁদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দে শশাঙ্ক ছিলেন গৌড়রাজ'। হিউয়েনৎ-সাঙ্ বলেছেন, শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে গৌড়ে সমৃদ্ধ ও জনপূর্ণ সংঘারাম আর বিহারাদি ছিল। তিনি গৌড়পৌণ্ড্রবর্ধনে কুড়িটি বৌদ্ধ সংঘারাম আর এক-শোর বেশি দেবমন্দির দেখেছিলেন। আর দেখেছিলেন দিগম্বর-সম্প্রদায়ের বহু জৈন। অষ্টম শতাব্দের মাঝামাঝি উত্তরাপথের প্রাচ্যখণ্ডে চলেছিল অরাজকতা' বা মাৎস্যন্যায়'। এই মাৎস্যন্যায় দূর করবার জন্যে প্রজারা মিলে বপ্যট নামে একজন যুদ্ধকুশল লোকের পুত্র গোপালদেবকে রাজা নির্বাচন করলো। বাঙ্গালাদেশে এই হলো প্রথম গণতন্ত্র। জনগণের নির্বাচিত গৌড়েশ্বর গোপালদেব থেকেই গৌড়-মগধ বঙ্গে পাল সাম্রাজ্যের ও রাজধানী গৌড় মহানগরীর ইতিহাসের শুরু। ধর্মপাল ও দেবপালের সময়ে এদেশে শিল্পের চরম উৎকর্ষ হয়েছিল। মগধ ও গৌড় হয়েছিল ভারতবিখ্যাত তার প্রস্তর শিল্পের জন্যে। হিন্দু ও বৌদ্ধ বহুবিধ ধাতু ও প্রস্তর-মূর্তি এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়ে প্রসিদ্ধ নাগবংশী ভাস্কর ধীমান্ ও বীতপালের খ্যাতি ভারতের বাইরেও ছড়িয়েছিল। গৌড়েশ্বর মহীপাল অশোকের মতন যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করে সর্বাঙ্গীণ ও পারত্রিক কল্যাণকর্মে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই সময়ে ওদিকে সুলতান মামুদ উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ নগর সব ধ্বংস করছিলেন। কৈবর্ত-বিদ্রোহের সময়ে অভ্যুদয় হলো রামপালের। পালবংশের শেষ রাজা গোবিন্দপাল। এই সময়ে সেনবংশের পরম্পরা। লক্ষ্মণসেনের তিন ছেলে বারো শতাব্দের শেষদিকে কিংবা তেরো শতাব্দের গোড়ায়, গৌড়-সিংহাসন নিয়ে যখন কাড়াকাড়ি করছিলেন সেইসময়ে গৌড় দখল করে নিলেন বখতিয়ার খিলজীর সহকারী আলিমর্দান ও পরে গিয়াস উদ্দীন। কিন্তু কিভাবে করলেন, সে-ইতিহাস আজও অজ্ঞাত। বর্তমানে গৌড়ে যে ধ্বংসস্তূপ প্রত্নবস্তু হয়ে রয়েছে তাতে রয়েছে পরবর্তী ইসলাম অধিকারের স্বাক্ষর। আর সে-সব প্রত্নবস্তুর বেশির ভাগই আনা হয়েছিল, কালিন্দী নদীর তীরে পালরাজাদের প্রাসাদ ভেঙে।

ইংলিশবাজার শহর থেকে দক্ষিণমুখে একটি রাস্তা গেছে কানসাটের

দিকে। ঐ পথ ধরে তিন-চার মাইল গেলেই গৌড়-নগরের সীমানা শুরু। ওখান থেকে পশ্চিমে তিন মাইল গেলে সাদুল্লাপুরের পুরাতন ভাগীরথীর স্নানের ঘাট, বল্লালবাড়ি আর তাঁর বড়ো সাগরদীঘি পাওয়া যায়। এর কাছেই দ্বারবাসিনী-দেবীর মন্দির। বড়ো সাগরদীঘির ধারে মখদুম শেখ অখি সিরাজ-উদ্দীন নামে এক সাধুর সমাধি। হুসেন শাহের তৈরি একটি ফটকও রয়েছে। কাছেই হুসেন শাহের ছেলে ও নসরৎশাহের ভাই সুলতান গিয়াসুদ্দীন মহম্মদ শাহের তৈরি (১৫৩৪-৩৫) জানজান মিঞার বা জহানিয়া মসজিদ।

সাদুল্লাপুরের দিকে না-গিয়ে সোজা দক্ষিণে ইংলিশবাজার থেকে ৭।৮ মাইল গেলেই গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন দেখা যায়। গৌড় ঢোকার মুখে পথের ধারে একটা ঘেরা জায়গায় দু-টী প্রস্তরস্তম্ভ।—নাম হলো শূলদণ্ড। এখানে অপরাধীকে শূলে দেওয়া হতো। এই স্তম্ভ দু-টী থেকে এক মাইল নৈঋতে পিয়াসবারি-দীঘি। লোকে বলে, 'পিয়াজবাড়ি' পুকুর। এখানে উঁচু ঢিপির ওপর একটি ডাকবাঙলো হয়েছে। এখান থেকে গৌড় দেখা যেতে পারে। পিয়াসবারিতে সরকারী তত্ত্বাবধানে একটি রেশমের কারখানা। ওঁরা গিয়ে ঐ কারখানায় উঠেছিলেন। পিয়াসবারি থেকে দক্ষিণদিকে আধ মাইল গেলে রামকেলি গ্রাম। গাঁয়ে ঢোকবার মুখেই রূপ-সনাতনের মদনমোহনের ঠাকুরবাড়ি আর কেলিকদম্বের গাছ। মদনমোহন-মন্দিরের দক্ষিণে এই বৃক্ষ। একটি বেদীর মধ্যে চারটি গাছ। তার মধ্যে দু-টী তমাল আর দুটি কদম্ব। একটি তমালগাছ খুব বড়ো। শ্রীচৈতন্যদেব রামকেলিতে এসে এরই ছায়ায় বিশ্রাম করেছিলেন। গাছটির নিচে একটি ছোট কালো পাথর। তার ওপর শ্রীচৈতন্যের পদচিহ্ন-আঁকা। শ্রীচৈতন্যদেব জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিনে রামকেলিতে এই গাছের তলায় বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তাঁর পদচিহ্ন, মদনমোহন-বিগ্রহ, রূপ-সনাতনের বাসাবাড়ি, রূপগোস্বামীর রূপসাগর দীঘি, জীবগোস্বামীর শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড—এই সব পুকুর আছে বলে রামকেলি বৈষ্ণবের পবিত্র তীর্থ। রামকেলির নামান্তর হলো গুপ্তবৃন্দাবন। জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তিতে মেলা বসে। রূপসাগর দীঘিটি বড়ো, কুণ্ডগুলি ছোট। সকল পুকুরেই কুমীর আছে।

রূপসাগরের দক্ষিণদিকে বড়ো সোনা মসজিদ। এর নামান্তর বারদুয়ারী। এ হলো গৌড়ের বৃহত্তম মসজিদ : ১৬৮ফুট লম্বা আর ৭৫ফুট চওড়া। ইঁট ও পাথর দু-ই উপকরণই ব্যবহার করা হয়েছে। পাথরের ওপর নানারকম কারুকার্য। গম্বুজগুলি ছিল সোনালী-রঙের গিল্টি করা। বাদশাহের দপ্তরখানা ছিল এখানে, এখন ধ্বংসাবস্থা। মসজিদটি চারকোণা পাথরের তৈরি। ভেতরে একটি প্রকাণ্ড দালান বা হলঘর আছে, তাতে স্তম্ভ ছিল দু-সারি। এখন বেশির ভাগই ভেঙ্গে গেছে। হলঘরের ওপরে ছাদ আর ইঁটের তৈরি গম্বুজ ছিল ৪৪টি। খিলানের আকার দেখে সে বোঝা যায়। মসজিদের উত্তর অংশে মেয়েদের বসবার জন্যে উচ্চমঞ্চ এখনও রয়েছে। এই মসজিদের সামনে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি পুকুর। তাতে পদ্মফুল ফুটে থাকে। আলাউদ্দীন হুসেনশা এই মসজিদ তৈরি শুরু করেছিলেন, আর তাঁর ছেলে নসরৎ শাহ এটি সম্পূর্ণ করেছিলেন ১৫২৬ খৃস্টাব্দে। মসজিদটি নসরৎশাহের সৌন্দর্যবোধ আর শিল্পানুরাগের পরিচয় দিচ্ছে। কেউ কেউ এটিকে গৌড়ের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হর্ম্য বলে থাকেন।

এখান থেকে নৈঋতকোণে এক মাইল গেলে মুসলমান-রাজাদের গৌড়দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যাবে। এই দিকে ঐ দুর্গের উত্তরদ্বার। আর এই ছিল প্রধান প্রবেশদ্বার।—এর নাম দাখিল দরওয়াজা। সম্ভবতঃ রুকনুদ্দীন বারবক শাহের তৈরি। এই দুর্গ আর প্রাসাদ এক মাইল বিস্তৃত। দুর্গের চারদিকে ৮ফুট চওড়া আর ৬৬ফুট উঁচু পাথরের ভীম প্রাচীর। ৬৬ফুট বা ২২গজ উঁচু বলে এর নাম 'বাইশ গজী'। এখন প্রাচীর ভেদ করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ উঠেছে; আর জঙ্গলে পূর্ণ। প্রাচীরের নিচে গভীর পরিখা ছিল। সে এখন শুখনো আর তাতে সরষে-টরষের চাষ-আবাদ হচ্ছে। দাখিল দরওয়াজাটি উঁচু হলো ৭০ফুট। তার ভেতর দিয়ে তিনটি প্রকাণ্ড হাতী পরপর পিঠে চড়ে যাতায়াত করতে পারে। ছোট ছোট লাল ইঁটে তৈরি দরওয়াজার প্রাচীরগাত্রে নানারকম কারুকার্য রয়েছে। দু-পাশে প্রহরীদের থাকবার ছোট ছোট কক্ষ। এক সময়ে এই প্রকাণ্ড দরওয়াজার দু দিকে চারটি ইঁটের মিনার ছিল। এই দরওয়াজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলে প্রাচীন দুর্গের এই ধ্বংসাবশেষগুলি দেখা যায়, —প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত হাবেলী খাস

রাজপ্রাসাদ, বাদশাহ্-কবর, কদমরসুল, চিকা-মসজিদ, গুমটি-দরওয়াজা ইত্যাদি। দাখিল-দরওয়াজার পরে কিছুদূর এগোলে পরপর ভাঙা চাঁদ-দরওয়াজা, নিম-দরওয়াজা ইত্যাদি অতিক্রম করে, বাইশগজী প্রাচীর ও পরিখাবেষ্টিত বিশাল রাজপ্রাসাদের ধ্বংস দেখা যায়। এর পশ্চিম পাশে গঙ্গার প্রাচীন মজা খাত। রাজপ্রাসাদের পুরাতন নাম হলো হাবেলি খাস। এর চারদিকের পরিখা শেওলা আর জঙ্গলে ভরতি। লোকে বলে, এই প্রাসাদ পূর্বে ছিল হিন্দু-রাজাদের, আর এ ছিল তাঁদের অন্দরমহল। অন্দরমহলের পিছনে ছিল বড়োপুকুর আর টাঁকশাল। গৌড়প্রাসাদের তিনটি অংশ —উত্তরাংশে দরবার-গৃহ, মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ, আর সর্বদক্ষিণে হারেম বা বেগম-মহল। এই স্থান এখন নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা।

রাজপ্রাসাদের ঈশান কোণে সুলতান হোসেন শাহের বিশাল সমাধিস্থান। এর নাম 'বাঙ্গালা কোট' বা বাদশা-কী-কবর। এঁর সমাধিস্থানের পাথরের দরওয়াজা দেখতে ছিল অতি সুন্দর। এর সামনে আর পাশে সাদা ও নীল মীনা-র কাজ-করা ইঁট দিয়ে তৈরি। চার কোণে চারটি গোলাপ আঁকা ছিল। —এই অঞ্চলটি হলো হোসেন শাহের রাজধানী --একডালা।

দাখিল-দরওয়াজা থেকে এক মাইল দক্ষিণে ফিরোজ মিনার বা ফিরোজ শাহের 'ছড়ি'। এটি ৮৪ফুট উঁচু আর নিচের দিকে পরিধি ৬২ফুট; দ্বাদশ-ভুজ আর ওপর দিকে বৃত্তাকার। ভেতরে ৭৩টি ধাপের ঘোরানো সিঁড়ি। আগে এর চুড়োয় একটি গম্বুজ ছিল। প্রথম হাবশী সুলতান সৈইফ-উদ্দীন ফিরোজ শা এ-টি তৈরি করান (১৪৮৬-৮৯)। স্থানীয় লোকে একে বলে পীর-আশা-মিনার বা চিরাকদানি। এটি ছিল সঙ্কেতের আড্ডা। মিনারে আলো জ্বেলে মহানন্দা-তীরের নিমা-সরাইয়ের মিনারের আলোর সঙ্গে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান হতো। নিমা-সরাইয়ের মিনারটি মহানন্দা আর কালিন্দীর সঙ্গমস্থলে। ফিরোজ-মিনার থেকে গৌড়ের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের আর রাজমহলের পর্বতমালার ধূসর শোভা খুবই সুন্দর।

ফিরোজ-মিনার থেকে এক পোয়া দক্ষিণে লুকোচুরি বা লক্ষছিপি দরওয়াজা। এ-হলো গৌড়-দুর্গের পূর্বদ্বার। দুর্গের এই উত্তর আর

পূর্ব দু-টি দ্বার আছে, বাকি দু-টি ধ্বংস হয়েছে। ১৫২২ খৃস্টাব্দে হোসেন শাহ এই দরওয়াজা নির্মাণ করান। শাহ সুজা যখন গৌড়ের সুবেদার তিনি কিছুদিনের জন্যে তাঁর রাজধানী গৌড়ে এসেছিলেন। সেই সময়ে তিনি এই দরওয়াজার জীর্ণ-সংস্কার করান। বাদশাহের বেগমেরা এখানে লুকোচুরি খেলতেন। এরই পাশে কদমরসুল-ভবন দেখবার মতন। ১৫৩০ খৃস্টাব্দে নসরৎ শা নির্মাণ করান। এর গম্বুজ একটি। চার কোণে মিনার চারটি। মিনারগুলি কালো পাথরের। মসজিদের গম্ভীরায় একটি বড়ো বেদীর ওপর আর-একটি ছোট বেদী তার ওপর কষ্টিপাথরের তৈরি ৯টি পদচিহ্ন—পয়গম্বর মহম্মদের। মসজিদের ভেতরের দরওয়াজা কাঠের তৈরি। চার-শ বছরের পুরানো। তার ওপরে কাপড় মেরে পলস্তারা-করা। এখনও সে কাজ টিকে রয়েছে। কামরার ভেতর কাঠের একটা প্রকাণ্ড সিন্দুক। তার ভেতরে করেই 'কদম' আনা হয়েছিল। হোসেন শা এটি আনিয়েছিলেন মক্কা থেকে। রাখা ছিল পাণ্ডুয়ার বড়ো দরগার চিল্লাখানায়। মসজিদের সম্মুখভাগ পূর্ব দিকে। গায়ের ইঁটের ওপর নক্সার কাজ অতি সুন্দর। দরজার ওপরে তোগরা লিপিতে শিলালেখ রয়েছে। কদমরসুলের পাশেই বিষ্ণুমন্দিরের মতন দো-চালা কুঁড়েঘরের অনুকরণে তৈরি একটি সৌধের মধ্যে অনেকগুলি কবর। তার মধ্যে রয়েছে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি দিলির খাঁ-র পুত্র ফতে খাঁ-র—একটি। এই বাড়িটি রাজা গণেশের তৈরি বলে প্রবাদ।

কদমরসুলের এক রশি দক্ষিণে পাঁচীর ভেদ করে একটি গুপ্তপথ। এর পশ্চিমে পাঁচীরের গায়ে গুমটি-দরওয়াজা। এর গায়ে সাদা ও নীল মীনার কাজ-করা ইঁট।

গুমটি-দরওয়াজার পশ্চিমে চিকা মসজিদ। বাদুর থাকতো বলে এর এই নাম। এর আবার নাম চামখানা বা চোরখানা। এর গম্বুজগুলি একটু বড়ো। এবং দেওয়ালে সাদা আর নীল মীনার কাজ-করা ইঁট। এখানে সুলতান জালাল-উদ্দীনের পুত্র মাহমুদ শাহের কবর রয়েছে। এই মসজিদটিকে দেখলে একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদের ভগ্নাংশ বলে মনে হয়। মাথায় একটি প্রকাণ্ড গম্বুজ। ভেতর দিকে ইঁটের ওপর মীনার কাজ। মেঝে পাথরের। এনামেল-করা ইঁট দিয়ে পাঁচীরের গায়ে বাঁধন দেওয়া হয়েছে। এই মসজিদের

পশ্চিমেই বাইশগজী। এখানকার মাটি খুঁড়ে কয়েকটি সমাধিস্থান পাওয়া গেছে। এর উঠোনটি যে আগাগোড়া এনামেল-ইঁট দিয়ে বাঁধানো ছিল তারও প্রমাণ রয়েছে।

কদমরসুল থেকে আধ মাইল পুবে দক্ষিণমুখে গেলে তাঁতিপাড়া মসজিদ (১৪৮০)। এটিও ভেঙে গেছে। এরও স্তম্ভ আর গম্বুজ ছিল। এখন ছাদ আর গম্বুজ নাই। কিন্তু ভেতরের দেওয়ালের গায়ে কুলুঙ্গীতে বা মিহরাবে সুন্দর, সূক্ষ্ম ও অপূর্ব নক্সার কাজ এখনও রয়েছে। অলঙ্করণে টেরাকোটা-রীতির নিদর্শন রয়েছে। তাঁতীদের বাস ছিল এখানে।

বাইশগজী থেকে জেলাবোর্ডের রাস্তা ধরে একটু উত্তরে এগোলেই চামকাঠি মসজিদ। ইংরেজবাজার থেকে ন-মাইল দূরে। মসজিদটি ইঁটে তৈরি। ভেতরের কিছু-অংশে পাথরের কাজ রয়েছে। নির্মাণকাল হলো ১৪৭৫ খৃস্টাব্দে শামসুদ্দীন সুফ শাহের সময়ে। 'চামকাটি' নামে এক মুসলমান-সম্প্রদায়ের জন্যে তৈরি।

তাঁতিপাড়া-মসজিদ থেকে আধ মাইল দক্ষিণে গেলে লোট্টন বা লোটন মসজিদ। এর ওপর একটি গম্বুজ। এর ইঁটে সবুজ হলদে নীল ও সাদা মীনার কাজ অতি সুন্দর। তৈরি করিয়েছিলেন ১৪৭৫ খৃস্টাব্দে সুলতান শমস্-উদ্দীন ইউসুফ শাহ্। প্রবাদ, লোটন নামে একজন নর্তকী এটা তৈরি করিয়েছিল। এটা মসজিদ হলেও, ঐশ্বর্যে ধনীর বিলাসভবন থেকে কোনো অংশে কম নয়। কেউ কেউ বলেন, সারা হিন্দুস্থানের মধ্যে এই রকম সুন্দর হালকা গাঁথুনির কারুকার্যখচিত সৌধ আর নাই। লোটন মসজিদের ঈশানকোণে আর চামকাটি মসজিদের এক মাইল আগ্নিকোণে একটি বৃহৎ পুকুর। নাম হলো —ছোট সাগর-দীঘি। এ-হলো পিয়াসবারি-দীঘির প্রায় চারগুণ বড়ো। এখান থেকে আগে রাজপ্রসাদে জল-সরবরাহ হতো। এর পাড়ে ক-ঘর চাষী বাস করছে। প্রবাদ, হিন্দুরাজত্বের সময়ে এই দীঘি কাটানো হয়েছিল। ধনপতি ও চাঁদসদাগর এর পাড়ে নাকি বাস করতেন।

লোটন মসজিদ থেকে দু-মাইল দক্ষিণে পাঁচখিলানের একটি পুরানো সাঁকো পার হয়ে রাজধানীর দক্ষিণ-প্রাচীর ভেদ করে কোতোয়ালি-দরওয়াজা। দ্বারের দু-দিকে শহর-কোতোয়ালদের বাস করবার জন্যে অর্ধচন্দ্রাকার কামরাগুলি ভেঙে গেছে। এই দরওয়াজার খিলান ৫১ ফুট চওড়া আর ১৭ ফুটের বেশি

উঁচু। এই দরওয়াজা আর সাঁকোটি পনেরো শতাব্দের মাঝামাঝি ইলিয়াস্ শাহী বংশের সুলতান নাসির-উদ্দীন মাহমুদ শাহের তৈরি।

কোতোয়ালি-দরওয়াজা ছাড়িয়ে একটু দক্ষিণে বল্লদীঘি। এ-টি বল্লালসেনের সময়ে কাটা। বল্লদীঘির দু-মাইল দক্ষিণে গৌড়ের পুরানো শহরতলি ফিরোজপুরে ফকির নিয়ামৎ-উল্লার মসজিদ। ইনি গুজরাটী ছিলেন। সেইজন্যে প্রতি পৌষ-সংক্রান্তির দিন এখানে গুজরাটী-পীরের মেলা বসে। সমাধিসৌধটি সুলেমান কররানির সময়ে ১৫৫৯ খৃস্টাব্দে তৈরি। এই সমাধির কাছেই টাকশাল-দীঘির ধারে ছোট সোনা-মসজিদ। এর সামনের পাথরে উৎকীর্ণ কারুকার্য অতি সুন্দর। বড়ো সোনা-মসজিদের মতন ছোট সোনা-মসজিদেও সোনালী রঙের গিল্টির কারুকার্য কতক আছে। ষোড়শ শতাব্দের এই মসজিদটিকে কেউ কেউ গৌড়ের মণি বলেছেন। বড়ো সোনা মসজিদের মতন এটি বারান্দাওয়ালা মসজিদ। এমন সুন্দর পাথরের নক্সা গৌড়ের অন্য কোনো মসজিদে নাই। হুসেন শাহের সময়ে এ-টি তৈরি।

গৌড়ে আরও ক-টি দেখবার স্থান দেখলেন ওঁরা। —কাঁচাগড়, লোহাগড়, চন্দ্রসূর্যের প্রস্তর, গৌড়েশ্বরীর মন্দির, জহরাবাসিনী, মনস্কামনা শিব, রমাভিটা, পাতালচণ্ডী —এই সব।

নিমা-সরাই বা পুরাতন মালদহ। এই ছিল রাজধানী পাণ্ডুয়ার বন্দর, অবস্থিত হলো মহানন্দার পূর্বতীরে —মহানন্দা ও কালিন্দীর সঙ্গমের ওপর। নতুন মালদহ বা ইংলিশবাজার থেকে জলপথে কিংবা পাকা রাস্তা ধরে যাওয়া যায়। ওঁরা গেলেন নদী পার হয়ে পাকা রাস্তা ধরে। আগে নগরটির চারদিকে প্রাকার ছিল। এখনো পারঘাটায় এই দুর্গের দুয়ার রয়েছে। এই দরওয়াজার সামনে মহানন্দার ওপারে একটি উঁচু মিনার আছে। এর নাম হলো —নিমা-সরাই মিনার। মিনারের গায়ে অনেক পাথর বেরিয়ে আছে। দেখতে ফতেপুর-সিক্রির হিরণ-মিনারের মতন। শিকার করবার জন্যে বা শত্রুর আসা লক্ষ্য করবার জন্যে তৈরি। শত্রু আসছে দেখতে পেলে মিনারের গায়ের পাথরগুলির ওপরে মশাল জ্বেলে গৌড়-রাজধানীর লোকদের সতর্ক করে দেওয়া হতো। এখানে রয়েছে ছোট সোনা-মসজিদ। দাউদ খাঁ-এর সময়ে তৈরি (১৫৬৬)। দু-টি বড়ো গম্বুজ আর একটি খিলান সুন্দর দেখতে। চারকোণে চারটি মিনার আর ঢোকার মুখে সুন্দর

কারুকার্য-করা পাথরের স্তম্ভ। এই সময়ে তৈরি হয়েছিল মালদহের কাট্‌রা। কাট্‌রা হলো একটি প্রকাণ্ড উঠোনের চারদিকে বাড়ি তৈরি করে তার দু-দিকে বড়ো বড়ো দরজা রাখা। এ ছাড়া, এখানে আরও মসজিদ রয়েছে। সবচেয়ে মজার হলো, তোতাপাখীর কবর। এই পাখিটি নমাজ পড়তে শিখেছিল। তার কবর রয়েছে ফকীর শাহ্ গদার দরগাহে। উল্টোদিকে দুধ-পীরের কবর। একটি গর্তে দুধ ঢেলে এই পীরের পুজো করতে হয়। পুরাতন মালদহের পুবদিকে দু-টি পুকুর —'ধর্মকুণ্ড' আর 'দেবকুণ্ড'। পালরাজাদের সময়ে কাটা। দেবকুণ্ডের এক মাইল উত্তরে বেহুলা নদী। প্রবাদ, বেহুলা লখিন্দরের মৃতদেহ নিয়ে ভেলায় চেপে ভাসতে ভাসতে কালিন্দী নদী দিয়ে এই নদীতে পৌঁচেছিলেন।

॥ পাণ্ডুয়া ॥

আদিনা গৌড় থেকে কুড়ি মাইল দূরে। আদিনা-স্টেশনে নেমে মুসলমান আমলের বাঙ্গালার প্রথম রাজধানী পাণ্ডুয়ায় যেতে হয়। স্টেশন থেকে আদিনা মসজিদ মাইল তিনেক দূরে। ওঁরা হেঁটে গেলেন পাণ্ডুয়া। পাণ্ডুয়ার উত্তর সীমানায় রায়দীঘি, পূর্ব-সীমানায় আদিনা মসজিদ, পশ্চিম সীমানায় মহানন্দা আর দক্ষিণে শমসাবাদ। পাণ্ডুয়া দীর্ঘে হলো ষোল মাইল, আর আড়ে আট মাইল। এই হলো 'হজরৎ পাণ্ডুয়া'। পাণ্ডুয়া অতি প্রাচীন নগর। কেউ বলেন, এই হলো সেকালের পৌণ্ড্রবর্ধন। আদিনা স্টেশন থেকেই বনজঙ্গল। দু-মাইল দূরে প্রত্নকীর্তি পাণ্ডুয়ার প্রান্ত। প্রথমেই পাণ্ডুয়ার বড়ো দরগাহ্। এখানে রয়েছে পীর সৈয়দ মকদুম শাহ্ জলাল তবরিজীর সমাধি। পীরোত্তর জমি বাইশ হাজার —সেইজন্যে নাম বাইশ-হাজারী দরগাহ্। শ্রীক্ষেত্রে যেমন মহাপ্রভুর দাঁতন-কাঠি থেকে প্রকাণ্ড গাছ হয়েছিল, এখানেও তেমনি একটি নিমগাছ ফকির সাহেবের দাঁতন-কাঠি থেকে হয়েছে বলে প্রবাদ। দরগাহের ভেতরে জুম্মা মসজিদ। মসজিদের মধ্যে ফকির সাহেব যেখানে বসে উপাসনা করতেন সেখানটা নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা রুপোর বেড়া দিয়ে ঘেরে দিয়েছিলেন। সে-বেড়া এখন নাই। এখানে বড়ো মেলা বসে। এই দরগাহের খিলান হলো

পাঁচটি। বাইরের চত্বরে কষ্টিপাথরের দু-টি স্তম্ভ আছে। বড় দরগাহের পূর্বদিকে হিন্দু মন্দিরের মতন একটি ছোট মসজিদ আছে। আগে ও-টি মন্দিরই ছিল। কষ্টিপাথরের ওপর নক্সা দেখেও মনে হয়, এটি হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ যুগের। দরগার ভেতরে একটী ভাঙ্গা সৌধ। —নাম হলো —লক্ষ্মণসেনী দালান। এই দরগাহে 'সেখশুভদয়া'র পুঁথি ছিল। বড়ো-দরগাহের পাশে ছোট দরগাহ বা ছয়হাজারী দরগাহ। এই দরগার উঠনে কাজী নুর মসজিদ। এর উত্তর দিকে প্রাচীরের বাইরে স্তূপ খনন করে বিচিত্র কারুকার্য-করা চারকোণা কষ্টিপাথরের স্তম্ভ আর উজ্জ্বল পাথরের খণ্ড অনেক পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে কালোপাথরের গোল গোল আসন। এর পুবদিকে ভাঙ্গা 'মুরিদখানা'; এইখানে নাকি হিন্দুদের কলমা পরানো হতো। রাজা গণেশের ছেলে যদু ও নাকি ইসলামে দীক্ষা নিয়েছিলেন এখানেই। ছোট-দরগাহের গম্বুজ হলো তিনটি —একটি ভাঙ্গা। সামনে পুকুর —পাথরের পাঁচীর-বেড়া। উঠনে বিস্তর কবর। অনেক পাথরের ওপর হিন্দু-দেব-দেবীর মূর্তি আঁকা।

ছোট-দরগাহ থেকে একটু উত্তরে সোনা-মসজিদ (১৫৮৪)। এর অপর নাম কুতুবশাহী মসজিদ। এ-টী মুরিদখানার উত্তরে। এর দশটি গম্বুজ; একটিও নাই। দ্বার বা স্তম্ভ টস্ত এখনও আছে। এর ঈশানে বৃহৎ সমাধিসৌধ —পাণ্ডুয়ার একলাখী। এর ওপরে প্রকাণ্ড একটি গম্বুজ। এর দক্ষিণ দিকে কষ্টিপাথরের প্রবেশদ্বারের পাশে পাথরে হিন্দুদের দেবতার মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। দরজার পাথরের চৌকাঠে বুদ্ধমূর্তি আছে। কোনো হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দির ভেঙ্গে এই তোরণটি আনা হয়েছিল। হিন্দু আর বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন একলাখীর বহু পাথরে দেখা যায়। পাথরের দেওয়ালে লতা-পাতা ফুল টুল খোদাই করা। ইঁটের গাঁথুনি চমৎকার। তার ওপর নক্সার কাজ আরও সুন্দর। পাথরের দরজার মাথায় পাথরে খোদাই-করা গণেশ-মূর্তি। সেইজন্যে কেউ কেউ বলেন, এটি রাজা গণেশের তৈরি। আগে মিনার ছিল চারটি, এখন সব ভেঙ্গে গেছে। এখানে রাজা গণেশের ছেলে যদুর, তাঁর পত্নীর ও পুত্রের সমাধি আছে। একলাখী বাঙ্গালার পাঠান সুলতানদের স্থাপত্যশিল্পের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তৈরি করতে এক লক্ষ টাকা খরচ হয়, সেইজন্যে এই নাম। একে আবার 'একলক্ষী'-ও বলে। এ-টি হিন্দু-মন্দির

ছিল, দেখেই বোঝা যায়। নির্মাণকাল ১৪১০ থেকে ১৪১৮ সালের মধ্যে।

পাণ্ডুয়া আর আদিনা যাবার যে পুরানো পথ, সে ১৫ ফুট চওড়া, তার ওপরটা কাঁচা, কিন্তু নিচের ইঁট। এই পথের দু-দিকে ভাঙ্গা ইঁটের স্তূপ, একদা আমীর-ওমরাহদের আবাস ছিল, তা বোঝা যায়। একলাখী থেকে এক মাইল উত্তরে একটি পুরানো সেতুর স্তম্ভে গণেশ আর তাঁর সঙ্গে অন্য দেবতার মূর্তিও খোদাই করা রয়েছে। পুরাতন গৌড় থেকে পাথর-টাতর এনে পাণ্ডুয়া নগর তৈরি করা হয়েছিল তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সেতু থেকে দু-মাইল উত্তরে বিশাল আদিনা মসজিদ।

আদিনা মসজিদের তিনদিকের ছাদ আর গম্বুজ পড়ে গেছে; পশ্চিমের ভগ্নস্তূপ আছে। মসজিদটি ৫০০ ফুট লম্বা আর ৩০০ ফুট চওড়া, আর ৬০ ফুট উঁচু। এমন বিশাল মসজিদ ভারতে নাই; পৃথিবীতেও কম আছে। দামাস্কাসের জুম্মা-মসজিদের মাপে ও অনুকরণে এ-টি তৈরি। বাঙ্গালার মুসলমান আমলের স্থাপত্যশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মসজিদের ভেতরে একটি কষ্টিপাথর-মোড়া বৃহৎ প্রকোষ্ঠ আছে। ওখানে আচার্য উপাসনা করতেন। উপাসনা-বেদীটি কালো পাথরের তৈরি; দেখতে ঠিক হিন্দু মন্দির বা রথের মতন। এ-টা যে হিন্দু-মন্দিরের অংশ ছিল তাতে সন্দেহ নাই। আর একটি বিরাট ব্যারাকের মতন কামরার অবশেষ, ওখানে হাজার লোক নমাজ করতে পারতো। মসজিদের ক-টি কামরার দরজার কষ্টিপাথরের চৌকাটে লতা ফুল সাপ ইত্যাদির চিত্র-আঁকা সুন্দর কারুকার্য রয়েছে। এ-সবও আগেকার হিন্দু-মন্দিরের অঙ্গ। মসজিদের ভেতরে পাথরের থাম আর ইঁটের দেওয়াল দিয়ে ১২৭টি সমভুজে ভাগ-করা, আর প্রত্যেকটির ওপর একটি করে গম্বুজ ছিল। ছোট-বড়োয় মিলিয়ে এর গম্বুজ ছিল প্রায় চার-শ। ভেতরে উপাসনার কক্ষটি খানিকটা দোতলা। এতে বাদশাহের বসবার স্থান ছিল। বাদশাহ আসতেন ওখানে গুপ্ত-পথ দিয়ে। স্থানটির নাম হলো —বাদশাহ-কী-তখৎ। এখানে বেগমেরা নাকি নমাজ পড়তেন।

আদিনা মসজিদের অধিকাংশ স্তম্ভ, মিনার, গম্বুজ পড়ে গেছে; তবু যা অবশিষ্ট আছে সে-ও দেখবার জিনিস। কোনো কোনো গোলাকার পাথরের থামগুলি এতো মসৃণ যে আয়নার মতন মুখ দেখা যায়। কোনো কোনো

কক্ষপ্রাচীর ওপর-নিচে মোড়া কষ্টিপাথর দিয়ে। কক্ষপ্রাচীরের গায়ে তোগরা অক্ষরে বয়েত লেখা আছে, মর্ত্যবাসীদের আল্লাহ্‌র উপাসনা করবার জন্যে উপদেশ দিয়ে।

স্থানীয় লোকেরা বলেন, আগে এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন শিবলিঙ্গ; নাম ছিল তাঁর —'আদিনাথ'। সেই আদিনাথ'-এর 'থ' কেটে 'আদিনা'-র উৎপত্তি। মদিনার সঙ্গে মিলও হলো এতে। এই ব্যাখ্যা শুনে স্থানীয় সাঁওতালেরা একবার মসজিদ দখল করতে গিয়েছিল। বাধা দিয়েছিলেন বৃটিশ সরকার। কেউ বলেন, এটি একটি বৌদ্ধ-স্তূপও হতে পারে।

মসজিদে উপাসনা-বেদীর ওপর ওঠবার সিঁড়িতে ছ-টি ধাপ আছে। তার মধ্যে ওপরে শেষের ধাপটির গায়ে একটি ভাঙ্গা দশভুজা-মূর্তি গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। মসজিদের গায়ের পাথরগুলিতেও গণেশ-টনেশের মূর্তি খোদাই করা আছে। আর এখান থেকে পাথরেব হিন্দু-দেবদেবীব মূর্তি আর মন্দিরের উপকরণ অসংখ্য পাওয়া গেছে। এই জন্যে হ্যাভেল সাহেব বলেছিলেন, আদিনা মসজিদ আর পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের অন্য অনেক প্রাসাদ ও মসজিদ, আগের হিন্দু-মন্দির আর হিন্দু-প্রাসাদ ভেঙ্গে গড়া হয়েছে। আদিনা-মসজিদের খিলান আর বেদীর চারপাশের কারুকার্য অতি সুন্দর। কঠিন ব্রহ্মশিলা বা কষ্টিপাথর কেটে যেভাবে নক্সা করা হয়েছে তেমন সুন্দর কারুকার্য দিল্লীতেও নাই। সুলতান শম্‌স্‌-উদ্দীন ইলিয়াস্‌ শাহের পুত্র সিকন্দর শাহ ১৩৪৭ খৃস্টাব্দে এর নির্মাণ শুরু করান; শেষ করেন তিনিই ১৩৬৯ খৃস্টাব্দে। এখানে সুলতান সিকন্দর শাহের সমাধি আছে। মসজিদ হলেও এর ভেতরে বাদশাহের বসবার তখৎ আর সামনের বিরাট উঠোন দেখে এটিকে আম-দরবার বলে মনে হয়। কেউ বলেন, রাজা গণেশ এখানে তাঁর কাছারি করতেন। হিন্দু-দেবদেবীর মূর্তি আর মূর্তির প্যানেলগুলি তাঁর সময়ে তৈরি হতে পারে। তাঁর পরে, এ-সব বোধহয় ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল।

—গৌড-ট্যুরে গিয়ে, প্রায় বিশ থেকে তিরিশ বর্গমাইল ব্যাপী গৌড়ের বিশাল ধ্বংসাবশেষে যুগ যুগান্তরের পদচিহ্ন পরিক্রমা সমাপ্ত করে আচার্য নন্দলাল শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। —'গৌড়-পাণ্ডুয়ার শিল্প নিদর্শনের কিছু পরিচয় আমার হয়েছিল প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বাগান-বাড়ির সংগ্রহ দেখে। এবার যথাস্থানে সব দেখে মন বিষাদে ভরিয়ে এলুম। লোটন-

মসজিদের নক্সা, মসজিদের গায়ের টেরাকোটার কয়েকটি নক্সা, চামকাটি মসজিদের একটি নক্সা, হাতীর পায়ের আর মুণ্ডুর নক্সা, ইত্যাদি করে আনলুম। মসজিদের গায়ে হিন্দু-দেবদেবীর মূর্তি উল্টে বসানো আছে, তাতে লিপিও আছে। ছাপ তুলে আনলুম আমি। আছে শান্তিনিকেতন-কলাভবনে।

'লোটন মসজিদের গায়ে পোর্সিলেনের টাইল বসানো। ছড়ানো রয়েছে চারদিকে। খানিকটা সিন্ধু-টাইলের মতন। সিন্ধু-টাইলের বই আছে। সেই স্টাইলে কাজ এখনও করে বীরভূমের খুজুটিপাড়াতে। টেরাকোটার ওপর পোর্সিলেনের কাজ। আমাদের সন্তোষ ভঞ্জ গেছলেন শিখতে। কিন্তু ওরা শেখালে না। সব চেয়ে ইন্টারেসৃটিং হচ্ছে, অর্ডিন্যারি উনুনে পোড়ায়। এদেশে এ-পদ্ধতি হলো মুসলমান আমলের আমদানি। সিন্ধে আর গৌড়ে নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে এর। দক্ষিণে দৌলতাবাদের ফোর্টের সামনের দিকে মিনার আছে, তাতে ঐ-রকম একই ধারার কাজ রয়েছে। আমাদের সুরেন পরে গৌড় ঘুরে এসে, শান্তিনিকেতনে সিংহসদনের দু-পাশে 'পূর্ব-তোরণ' আর 'পশ্চিম-তোরণ' বাড়ি করেছিলেন গৌড়ের দাখিল-দরওয়াজা, চাঁদ-দরওয়াজা-টরওয়াজার পদ্ধতিতে।'

।। আশ্রম-সংবাদ ১৯২৫ ।।

মহর্ষিদেবের তিরোভাব-দিবস পালন করা হলো ৬ই মাঘ। গুরুদেব অনুপস্থিত। সভা হলো দু-টি—একটি ছোটদের, একটি বড়োদের। ছোট-তরফে সভাপতি ছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়। মহর্ষির জীবনী পর্যালোচনা করে শোনালেন নেপালবাবু; শাস্ত্রী মহাশয় কিছু বললেন শিশুদের উপযোগী করে। বড়ো-তরফে সভাপতি ছিলেন রামানন্দবাবু। বক্তৃতা করলেন স্টেন কোনো। তাঁর বক্তৃতার পরে ক্ষিতিমোহন বাবু, কালীমোহন বাবু আর সবশেষে স্বয়ং সভাপতি মহাশয় যথাযোগ্য বক্তব্য প্রকাশ করলেন।

স্টেন কোনো এবার আশ্রম থেকে বিদায় নেবেন। এই উপলক্ষে বিশ্বভারতীর ছাত্র ও অধ্যাপকগণ তাঁকে একদিন বৈকালে জলযোগের নিমন্ত্রণ করলেন। সন্ধ্যায় গরবা নৃত্য হলো। ছাত্রেরাও আচার্যকে একদিন বিশেষ

জলযোগে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ছাত্রদের সভা সবচেয়ে ভালো হয়েছিল। সস্ত্রীক স্টেন কোনো এবং আশ্রমের সবাই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সভা হয়েছিল আম্রকুঞ্জে। গান হয়েছিল ; আর হয়েছিল 'সাত ভাই চম্পা' নামে একটি নাটকের অভিনয়। আচার্য-দম্পতি বিদায় নেবার আগের রাত্রে একটি সভা হলো কলাভবনে। বিশ্বভারতীর তরফ থেকে শাস্ত্রী মহাশয় কিছু বললেন। আচার্যকে সোনার আংটি, পট্টবস্ত্র আর শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীকে উপহার দেওয়া হলো পাটের শাড়ী। আচার্য তাঁর আশ্রমবাসের কথা বললেন। অতঃপর বেদমন্ত্র ও শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করে সভা ভঙ্গ হলো। এই বিষয়ে নন্দলালের প্রদত্ত বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

কলাভবন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-আশ্রমে তাঁর স্বপ্নের 'কলাভবন', 'গ্রন্থাগার', 'ছাত্র নিবাস,' অতিথিশালা' দিনে দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু কবির সঙ্গে কর্মীদের ভাবাদর্শের সংঘাতে তাঁর মন হয়ে উঠেছিল বিষণ্ণ। তিনি দক্ষিণআমেরিকা-যাত্রার প্রাক্কালে আশ্রমে কর্মীদের সহযোগিতা 'ভিক্ষা' চেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্রমকর্মীদের মধ্যে কাজেকর্মে কবির ব্যাকুল আবেদনে উদ্বুদ্ধ হওয়া তখন কারও পক্ষে সম্ভব হয়েছিল কিনা, এবং কেন হয়নি, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। শান্তিনিকেতনের 'অপ্রকাশিত অধ্যায়ে' দেখা যাচ্ছে, শান্তি' (১৯২১) নামে হাতে লেখা একটি পত্রিকার সংবাদ হলো এই, —১৯১৪ সালে পূজনীয় গুরুদেব কলকাতায় কলা ও শিল্পের উন্নতির জন্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছেন—এর নাম হয়েছে 'কলাভবন'। এই কাজে ব্যাপৃত থাকায় তিনি অধিকাংশ সময় শান্তিনিকেতনে উপস্থিত থাকতে পারেননি। —এরই পরিণতি হলো 'বিচিত্রা'। তার আলোচনা আমরা আগে করেছি। কবি 'বিচিত্রা'র সানুচর মুগ্ধ শিল্পীটিকে ১৯১৭ সাল থেকে ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শান্তিনিকেতনে টেনে এনেছেন। বিশ্বভারতীতে কলাভবন চলছে উৎসাহভরে। কবির স্বপ্ন সার্থকতার পথে। সর্বনাশের আশঙ্কা তাঁর —সে-যেন স্বপ্ন ছায়া।

॥ শান্তিনিকেতন-সংবাদ ॥

আশ্রমে ছাত্রদের সাহিত্যসভা দু-টি চলছে বিশেষ উৎসাহসহকারে। ছোটদের সাহিত্যসভার অধিবেশনও হচ্ছে নিয়মিত। বিশ্বভারতীর ছাত্রদের

উদ্যোগে একটি সভা স্থাপিত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আচার্য রবীন্দ্রনাথের কাব্য-আলোচনা। এই সভা প্রতিমাসের শেষ বুধবারে বসে। গত মাসের অধিবেশনে পূজনীয় শাস্ত্রীমহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীমান্ রামচন্দ্র সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। তার পরে বিশ্বভারতীর চৈনিক অধ্যাপক মি. লিম্ সাঙ্গোপাঙ্গ-সমেত রবীন্দ্রনাথের চীন-ভ্রমণের ফলাফল সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ছেলেদের আশ্রম-সম্মিলনীর কাজ নতুন উৎসাহে চলছে। গত পূর্ণিমা-সম্মিলনীতে ছেলেরা 'ধ্রুবতারার দেশ' নামে একটি ছোট নাটক অভিনয় করেছিল। গত অমাবস্যা-সম্মিলনীতে পূজনীয় শাস্ত্রীমহাশয়, রামানন্দবাবু, নেপালবাবু প্রমুখ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

শান্তিনিকেতন-আশ্রম স্থাপিত হবার পরে এখানকার আদর্শ দেশে-বিদেশে উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। এর অনুসরণে সেকালে অন্যস্থানেও এই রকম আরো আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী দামোদরের তীরে 'যোগানন্দ আশ্রম' খুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। বোলপুর-ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নিয়মাবলী-অনুসারেই ওখানকার কাজ শুরু হয়েছিল। বাঙ্গালাদেশের বাইরে মধ্যপ্রদেশ থেকে যমুনালাল বাজাজ ১৯১৭ সালে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তাঁর দেশে। তিনি চেষ্টা করছিলেন, যাতে তাঁর বিদ্যালয়টি শান্তিনিকেতন-আশ্রমের মতন হয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের এই আশ্রমটি স্থাপিত হয়েছে দেশের মঙ্গলের জন্যে। গুজরাটের অম্বালাল সরাভাই তাঁর বাড়িতে আর্টস্কুল করেছিলেন। পাঁচ-শ টাকা বেতন দিয়ে পরিচালনার জন্যে তিনি শান্তিনিকেতন থেকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন নন্দলালকে। সে-কথা যথাসময়ে বলা হবে।

১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শান্তিনিকেতন-আশ্রম দেখতে এসেছিলেন। আচার্য রায়কে পেয়ে আশ্রমবাসীরা কৃতার্থ ও আনন্দিত হয়। ইনি আশ্রমে ছিলেন মোটে দু-দিন। কিন্তু এই দু-দিনেই তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরলতায় আশ্রমের ছাত্রগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে নিয়েছিলেন। স্টেশন থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে জগদানন্দবাবু, নেপালবাবু, শাস্ত্রীমহাশয় ও আরো

অনেকে গিয়েছিলেন। সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় কলাভবনে আচার্যকে সংবর্ধনা করা হয়। পরদিন সন্ধ্যায় তিনি একটি সভায় বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে অতি সরল ভাষায় নিজের বক্তব্য বলেন। তার পরদিন সকালে তিনি আশ্রম পরিত্যাগ করেন। এই দু-দিনের অনেকটা সময়ই আচার্য রায় পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে তখন যে-আলোচনা হয়েছিল সংক্ষেপে সে এই :—

॥ মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র-সংবাদ ॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাবতেন, আমাদের দেশের লোক আমাদের দেশের নিজস্ব চিরার্জিত জ্ঞানধর্মকে জাগিয়ে তুলে তার ভিত্তিতে মঙ্গলের গোড়াপত্তন করবে। এর জন্যে পরের দ্বারে ভিক্ষা করতে যাওয়া নিরর্থক। আমাদের দেশে ইংরেজদের মতন পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, বা কলকারখানা বসাতে হবে, এই কুসংস্কার দেশের লোকের মনে তখন বদ্ধমূল হয়েছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে দেখে, আর তাঁর সদুপদেশ শুনে লোকের সে-মোহ কেটে যাচ্ছে।

বড়োবাবু ভাবতেন, স্বরাজ পেতে হলে প্রথম দরকার, মিলেমিশে কাজ করা। এমন কাজ দেশের সামনে ধরা চাই, যা দেশের ছোট-বড়ো সকলে করতে পারে। —আর সে হলো চরকার প্রবর্তন। দ্বিজেন্দ্রনাথের মতে, চরকা হলো একই কর্মসূত্রে দেশের লোকের মধ্যে পরস্পরে মিলবার প্রণালী। তাঁর মতে চরকা হলো thin end of the wedge। কারণ, দেশের ছোট বড়ো সবাই এ-কাজ করতে পারে। এই অল্প সূত্রে মহৎকাজ ঘটিয়ে তোলা যায়। যাঁরা নাম চান না, কাজ চান, তাঁদের কাছে চরকা হলো স্বরাজের সোপান। আর যাঁরা কাজ চান না, নাম চান, তাঁদের কাজ আর-একরকম। তাঁরা বাক্যে সোনা-রূপা বর্ষণ করেন বটে, কিন্তু কাজে রাশিরাশি কাদামাটি দান করেন। লোকে ভাবে, মস্ত বড়ো কাজ কিছু আরম্ভ না-করলে বুঝি হয় না, কিন্তু সে-সব মিথ্যা, দু-দিন পরেই ভেঙে যায়। আসল দরকার হলো কাজ। মহাত্মা গান্ধী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

দেশের সামনে চরকার মতন একটি ছোট কাজ ধরেছেন যা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা করতে পারে, সে-জন্যে বড়োদাদা অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। তিনি ভাবতেন, আসল দরকার, প্রজাদের নিজের চেষ্টায় নিজেদের ভালো করা, নিজেদের বড়ো করে তোলা। তাহলে আর রাজা বা জমিদার তাদের ওপর অত্যাচার করতে সাহস পাবে না।

বড়োবাবুর মতে, দরকার হচ্ছে দেশের লোকের moral state বা চরিত্রের উন্নতি করা। বিদেশী-শাসন মুক্ত করে স্বরাজের জন্যে দরকার আমাদের নিজেদের মধ্যে মিলিত হওয়া। চরকার কাজে আমরা সকলে মিলতে পারি।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মতে, হিন্দু-মুসলমানের মিলও খুব শক্ত নয়। হিন্দু-মুসলমানের দু-দলেই কতকগুলো গোঁড়া লোক আছে, তারা নিজেদের অন্ধ-সংস্কার নিয়ে বসে আছে। কিন্তু আবার এমন অনেক হিন্দু-মুসলমানও আছেন যাঁরা এ-সব ছেড়ে দেশের কাজে মিলিত হতে পারেন। এখন দরকার হচ্ছে, আমাদের দেশের সব লোকে যে-সব কাজ করতে পারে, এমন কাজ দেশের সামনে ধরা।

বড়ো বড়ো কলকারখানা তৈরি-করা আমাদের দেশের ধাতে নাই। বড়োবাবু বলেছিলেন, —'একবার ইংরেজদের দেখাদেখি আমাদের বাড়ির জ্যোতি এবং কেউ কেউ জাহাজ, কলকারখানা করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে-সব দু-দিনেই মিলিয়ে গেল। আসল কথা, যে যে-কাজ পারে না, তাকে দিয়ে সে-কাজ করানোর চেষ্টা বৃথা।' আচার্য রায় বললেন,— অনেক চেষ্টা করে বঙ্গলক্ষ্মী মিল কোনো রকমে দাঁড়িয়েছে, অন্য আর সব টিকল না। আচার্য রায়ের কথা শুনে বড়োবাবু বললেন, —কথা হচ্ছে কাজ নিয়ে, এ-কাজ তো নামের জন্যে নয়। নাম ক-দিনই-বা থাকে। সেক্সপীয়ার জগৎ-বিখ্যাত লোক। কিন্তু সে-নামের অর্থ কি। ক-জন ভক্ত ভোরে উঠে সেক্সপীয়ারের নাম জপ করে। নাম-যশ হলো একটা মায়া। এ-রকম অনেক ইলিউশন আমাদের আছে। তাই দরকার এ-সব ইলিউশন ছেড়ে দিয়ে কাজ করে যাওয়া।

বড়োদাদার মতে, আচার্য রায়ের কাজ হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। এই রকম কাজই হলো ভবিষ্যৎ-বংশের কাছে আদর্শের কাজ। কর্তব্যকর্ম করে যেতে হবে সব সময়ে! পৃথিবীর ভবিষ্যতে কি হবে না হবে সে-ভাবনা

করে কোনো লাভ নাই। তবে একটা লক্ষ্য স্থির রেখে কাজ করা দরকার। বড়োবাবুর এই সব কথা শুনে আচার্য রায়ের মনে হলো, তিনি যেন ভীষ্মদেবের কাছ থেকে শান্তিপর্বের উপদেশ শুনছেন। বড়োবাবু বললেন,— আমাদের দেশের মুনিঋষিদের দর্শন-আলোচনার লক্ষ্য ছিল, মুক্তিলাভের উপায় বলে দেওয়া। এই মুক্তির কথা নানা ছলে নানা রকমে আমাদের দেশে বলা হয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব আমাদের দেশেই সম্ভব। লোকের উপকার করা আমাদের দেশের সকলের লক্ষ্য ছিল। কুরুক্ষেত্রে ভীষণ লড়াইয়ের মধ্যেও গীতাকার শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে অর্জুনকে উপদেশ দেওয়ালেন। এ একেবারে অসম্ভব কাজ। কিন্তু গীতাকার চান মুক্তির উপায় বলে দিতে। তাই তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। এই মুক্তির আবহাওয়া আমাদের দেশে আছে। ওদের দেশে নাই। মহাত্মা গান্ধী ব্রাহ্মণ নন। কিন্তু আমাদের দেশের নগণ্য লোকেরাও সেদিকে তাকালে না। তারা বুঝেছে, এ লোকটি সত্যিকার ব্রাহ্মণ। তাই তাঁকে ভক্তি করতে কারো বাধেনি। বড়োবাবু আরও বললেন, আমাদের দেশের এই ভিতরকার সম্পদ ভুলে আমরা ওদের অনুসরণ করতে ছুটে গিয়েছিলুম। এমন সময়ে ভগবান মহাত্মা গান্ধীর মতন লোক, আচার্য রায়ের মতো লোক এদেশে পাঠালেন। পরের অনুকরণ করে আমাদের দেশে পার্লিয়ামেন্ট তৈরি করে কিছু হবে না। তার গলদ অনেক। আমাদের পঞ্চায়েত প্রথা অতি চমৎকার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এ-সব বললে, লোকে ভাবে বুঝি আবার ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণদের কালে ফিরে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। তা নয়। আমাদের যে-সব ভালো জিনিস ছিল সেগুলো পুনরুদ্ধার করতে হবে। বড়োবাবুর মতে, মহাত্মা গান্ধী বা আচার্য রায়ের কাজ দেশের অল্প লোকে গ্রহণ না করলেও সে মরবে না। এই হলো সত্যিকার জিনিস। ভবিষ্যৎ বংশ এই বীজের দ্বারা ফললাভ করবেই। বিধাতার নিয়মেই মহাত্মা গান্ধী বা আচার্য রায় এদেশে জন্মেছেন। ভগবানের বিধানে economy রয়েছে। সেইজন্যে তিনি এঁদের মতো লোক বেশি পাঠাননি। বিধাতা economically উপযুক্ত লোক দিয়ে উপযুক্ত কাজ করাচ্ছেন। বড়োবাবু বললেন, তিনি অক্ষম। তিনি ওঁদের মতো কাজ করতে পারবেন না, কিন্তু এ-কাজ তাঁকে স্বীকার করতেই হবে। তা না হলে নিজেরাই

ঠকবেন। কেন-না, এমন হতে পারে, এর পরের যুগে হয়তো এ-রকম লোকের অভাবে মানুষ হাহাকার করবে।

তখন বড়োবাবু চোখে দেখতে পেতেন না। তবুও আচার্য রায়ের উপস্থিতিতে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। আচার্য রায় বললেন, তিনি আট বছর বয়সে বড়োবাবুর কবিতা প্রথম পড়েন। তাঁর 'স্বপ্ন-প্রয়াণে'র দার্শনিক তত্ত্ব ভালো বুঝতে পারতেন না। তবু সেই সময়ে বড়োবাবুর মুখে আর্যামি ও সাহেবি-আনার নামে বক্তৃতা শুনে তাঁর খুব ভালো লেগেছিল। তারপর তিনি তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। তাতে ওঁদের প্রকাশিত লেখা পড়েই আচার্য রায় অনুপ্রেরণা লাভ করতেন। এ-কথা শুনে বড়োবাবু খুশি হয়ে বললেন, —'তাই বলুন, তাহলে তো আপনার বনিয়াদ খাঁটি এদেশীয়'।—

আচার্য নন্দলাল ছিলেন এই আলোচনার নীরব শ্রোতা। কিন্তু এই আলোচনা গভীর রেখাপাত করলো তাঁর শিল্পিমানসে। —'বিশ্বমৈত্রীর আইডিয়াটা খুবই ভালো। কিন্তু আমার মনে ঐ আইডিয়াটা তেমন বসেনি। আমি চিনতে চেষ্টা করেছি খুঁটিনাটি নিয়ে আমার ভারতবর্ষকে, আর ভারতের ঐতিহ্যপরম্পরা, আর তার প্রসারকে। এই সময়ে আচার্য রায়ের কথা শুনে আমার প্রধান চিন্তা হলো, রাজনীতির উর্ধ্বে রেখে গ্রামের কারুশিল্পকে কিভাবে জাগিয়ে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে আমাদের কলাভবনে সংহৃত করা যায়। অবনীবাবু আর আঁদ্রে কারপেলেস এখানে আগে কিছু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু, আমি এই সময়ে কুমারস্বামীর 'Art and Swadeshi'-চিন্তাকে মনে গেঁথে নেবার চেষ্টা করলুম বিশেষভাবে। চরকাকে কোনো দিন আমি রাজনীতির হাতিয়ার বলে মনে করিনি। আমার কাছে চরকা হলো কুটিরশিল্পের প্রতীক।'

কলকাতায় ফিরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শান্তিনিকেতনের সর্বাধ্যক্ষকে ২১-২-২৫ তারিখে একখানি পত্রে তাঁর শান্তিনিকেতন-দর্শনের অভিজ্ঞতা লিখে জানালেন।—

॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পত্র ॥

'শান্তিনিকেতনে যাহা কিছু দেখিলাম তাহাতে অবাক হইয়াছি। আমার

কেমন একটা ধারণা ছিল, কবীন্দ্র ভাবলোকে বাস করেন —তাহাতে আবার ধনীর সন্তান হইয়া ভূমিষ্ঠ. সুতরাং যে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার সহিত বাস্তব রাজ্যের বড় সম্পর্ক থাকিবে না। কিন্তু ওখানকার ছেলেরা ও মেয়েরা যে-ভাবে শিক্ষা পাইতেছে, তাহাতে তাহারা যে ভাবী জীবনে অকর্মণ্য পুতুল হইবে এমন আশঙ্কা নাই। Plain living ও high thinking-এর এক সমাবেশ হইয়াছে। পুস্তকালয় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি ! যদি Europe বা America-র এরূপ সুবিধার পাঠাগার থাকিত তাহা হইলে শত শত জ্ঞানপিপাসু নানাস্থান হইতে আসিয়া তৃষ্ণা মিটাইত। কিন্তু আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য hall mark ভিন্ন আর কোন রকম বিদ্যার চর্চা করিতে চায় না। সুরুলের ব্যাপার আমার মনকে বড়ই আকর্ষণ করিয়াছে। চারিধারে দরিদ্র কৃষকদিগের সহিত সংস্পর্শ রাখিয়া যে কার্যকলাপ নির্ধারণ হইতেছে ইহা অসাধ্য বিষয়। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ হইতে সন্তোষ [বসু] বাবুকে যে 'ধার' করিয়া আনা হইয়াছে তাহাতে সুফল ফলিবে আমার মনে হয় —কেন-না তিনি একজন hide bound routine worker নন, কিন্তু enthusiast। আর কালীমোহনবাবুর বিষয় কি বলিব ?

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকগণ হইতে শুরু করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা এমন-কি সুকুমারমতি শিশুগণ পর্যন্ত আমাকে যে প্রকার আদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। আর বড় কর্তার ত কথাই নাই একটুখানি ঘা দিলেই অফুরন্ত প্রস্রবণের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে ; তাঁহার অমৃতনিঃস্যন্দিনী বাণী তাহাতে Kant, Hegel, সাংখ্য, গীতা harmoniously blended —শুনিতে কান জুড়ায়। চলিয়া আসিতে ইচ্ছা হয় না। আমি আজ আত্রাই রওনা হইতেছি, সেখান হইতে ফিরিয়া Diamond Harbour-এর দক্ষিণে ৭।৮ ক্রোশ দূরে যাইতে হইবে। সেই 'বড় হাঁড়ী'-দিগের অনুষ্ঠিত সভায় —ফিরিয়া আসিয়া কুমিল্লা অভয়াশ্রমে। সেখান হইতে ফিরিবামাত্রই Benaras বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থাৎ ১৫ই মার্চ পর্যন্ত booked in advance এমন টানাছেঁড়ায় পড়িয়া গিয়াছি যে. এই জীবনসন্ধ্যায় 'Heaven of repose', শান্তিনিকেতনে যে মনের

সাথে ১০।১৫ দিন কাটাই তাহা ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। যাহা হউক কবিবরের এই অদ্ভুত কীর্তি যাহাতে চিরস্থায়ী ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়া ভবিষ্যৎবংশীয়দের শিক্ষা ও দীক্ষার পথ নির্দেশ করিয়া দেয় তাহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা।

শুভার্থী

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

পুনশ্চ —এবার Khulna Dist. Conference আমাদের গ্রামে, এমন কি আমাদের বাড়িতে আহূত। কিন্তু ২।৪ দিন যাইয়া যে সমস্ত ঠিকঠাক করিব এমন ফুরসৎ পাইয়া উঠিতেছি না।'

গত তিন বৎসর যাবৎ কংগ্রেসের কর্মতন্ত্র ছিল —অসহযোগ নীতি। ১৯২৪ সালে সে স্থগিত হলো। এখন নীতি হলো চরকা-কাটা আর খদ্দর পরিধান। কংগ্রেসকর্মীদের মনোযোগ হলো এই নীতিপ্রচারে দেশের সবাই স্বরাজের আশায় এই গান্ধী নীতি গ্রহণ করবেন। শান্তিনিকেতন গান্ধীজির প্রত্যক্ষ প্রভাবপুত। সুতরাং এখানেও চরকা-তক্‌লির চল্‌ হলো। 'বড়োদাদা' দেবকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং সদ্য-আগত জ্ঞানতপস্বী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সাক্ষাৎ প্রেরণায় বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং কলাভবনের অধ্যক্ষ নন্দলালও চরকা-কাটায় প্রবৃত্ত হলেন। বিদেশে পাঁচ মাস কাটিয়ে ১৯২৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ সব দেখলেন, সব শুনলেন, কিন্তু কোনো মতামত প্রকাশ করলেন না। শান্তিনিকেতনে কবির সাধের কলাভবনে তাঁর বহুবাঞ্ছিত অধ্যক্ষের এই হাল দেখে রবীন্দ্র-জীবনীকার এখানে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নভঙ্গের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই ?

।। শান্তিনিকেতন কলাভবন-সংবাদ ।।

বিশ্বভারতীর কলাভবনের বর্তমান (১৯২৫) অধ্যক্ষ বিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়। তাঁর অধীনে অনেকগুলি ছাত্র ও ছাত্রী চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করছেন। তাঁদের মধ্যে ৮ জন ছাত্র আর ৬ জন ছাত্রী

অন্যতম। তাঁরা শিখছেন বিশেষভাবে। শুধু শিক্ষাই নয়; তাঁরা শিক্ষকরূপে সমাদৃত হয়ে নিযুক্ত হচ্ছেন দেশে-বিদেশে। আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ও কলাভবনের উদীয়মান তরুণ শিল্পী শ্রীমান্ মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত কলম্বোর আনন্দ-কলেজে চিত্রবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে সিংহলে গেছেন। আশ্রমে সংবাদ এসেছে, সেখানে তিনি বিশেষভাবে সংবর্ধিত হয়েছেন।

১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসের আগে থেকেই কলাভবনে ছাত্র ছিলেন অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅন্নদাকুমার মজুমদার, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ, শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রী ভি. এস. মাসোজী, শ্রীহরিপদ রায় আর জানুয়ারীতে এলেন শ্রীবীরভদ্র রাও চিত্রা। কিছু আগে হীরাচাঁদ দুগার আর কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ চলে গেছেন। শ্রীমতী হাতী সিং আর বাসন্তী মজুমদার এলেন ১৯২২ সালে। এঁদের পরে আসেন মাসীমা সুকুমারী দেবী, সবিতা ঠাকুর, গৌরী বসু। ১৯২৩-এ এলেন পি. হরিহরণ, সুকুমার দেউস্কর, আর কানু দেশাই। এঁদের পরে এলেন রেণুকণা কর। ১৯২৩-এ আরও এলেন শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবন আর সৌভাগ মল গেহলোট। ১৯২৭-এ আসেন ইন্দুসুধা ঘোষ, মন্দাকিনী চট্টোপাধ্যায়, অনুকণা দাসগুপ্তা, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী, গোষ্ঠবিহারী সিংহ, শ্রীমতী কিরণবালা সেন আর বীরসিংহ। ১৯২৫ সালে এলেন শ্রীরামকিঙ্কর বেজ, বনবিহারী, শ্রীসুধীরচন্দ্র খাস্তগীর, শ্রীমতী গীতা রায় আর বাসুদেবন। এঁরা ছাড়া, এই সময়ে আরও এলেন: শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী, কাত্যায়নী দেবী, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপানাথ রামানুজ, কেশব রাও, রঘুবীর, বিষ্ণুপদ ও আরও অনেকে।

শান্তিনিকেতন-কলাভবনের এই সময়ের ছাত্রগণ কে কোথায় গিয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করলেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে;—অর্ধেন্দুপ্রসাদ ১৯২৪ সালে আদেয়ারে শিল্পশিক্ষক নিযুক্ত হলেন। শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত সিংহল থেকে এসে আহমেদাবাদে অম্বালাল সরাভাইয়ের শিল্পবিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষক হয়েছিলেন। শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ লণ্ডনে ইণ্ডিয়া-হাউস অলঙ্করণের জন্যে চারজন শিল্পীর মধ্যে একজন নির্বাচিত হলেন। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত কলকাতার আর্টস্কুলে শিল্পশিক্ষক

নিযুক্ত হন। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পরে আর্টস্কুলের উপাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কলকাতার আর্টস্কুলে হেডমাস্টার নিযুক্ত হলেন। ওখান থেকে গেলেন দিল্লীতে সরকারী পলিটেকনিক স্কুলের শিল্প-বিভাগের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট্‌ হয়ে। শেষে, কলকাতায় এসে আর্ট্‌স্‌ এ্যাণ্ড ক্রাফ্‌টস্‌ কলেজের প্রিন্সিপাল হন। ইনি সর্বপ্রথমে মসুলিপট্টনমে অন্ধ্র-জাতীয়-কলাশালার শিল্পশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরে। শ্রী ভি. এস্‌. মাসোজী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের পরে অম্বালালের স্কুলে শিল্পশিক্ষক হন। শ্রী ভি. আর. চিত্রা ১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাসে লক্ষ্ণৌ সরকারী চারু ও কারু বিদ্যালয়ে ইন্‌স্ট্রাক্টর হয়ে যোগ দিলেন। পরে তিনি হেডমাস্টার হলেন মাদ্রাজের সরকারী আর্টস্কুলে। তারপরে হলেন মাদ্রাজের কুটিরশিল্প-বিভাগের সহ-পরিচালক। অতঃপর নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের কুটিরশিল্পাধিকারিক। এর পরে, ইউনাইটেড্‌ নেশন্‌সের হস্তশিল্প-বিশেষজ্ঞরূপে প্রথম কাজ করেন আই. এল্‌ ও-র সঙ্গে এবং পরে ইউনেস্‌কোর সঙ্গে। পি. হরিহরণ মহীশূর সরকারী পোর্সিলেন ফ্যাক্টরীর সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট হয়েছিলেন। সুকুমার দেউস্কর হয়েছিলেন হায়দরাবাদ আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ। প্রথম দিকের শ্রীবিশ্বরূপ বসু শ্রীবিনোদবিহারী, শ্রীরামকিঙ্কর প্রমুখ অপর ছাত্রেরা শান্তিনিকেতন-কলাভবনে শিল্পশিক্ষকরূপে নিযুক্ত রইলেন।

নিশিকান্ত রায়চৌধুরী কলাভবনে এলেন মাসোজীর পরে। ১৯২২ সালে সেকেণ্ড গ্রুপের ছাত্র তিনি। নিশিকান্ত সম্পর্কে নন্দলাল বলেন—

।। নিশিকান্ত ।।

'নিশিকান্ত কলাভবনে বরাবর ছাত্র ছিলেন আমার। মাসোজীর পরে আসেন নিশিকান্ত। এলেন প্রথম গ্রুপের পরে, কলাভবনের সেকেণ্ড গ্রুপের ছাত্র হলেন তিনি। পুরাতন হাসপাতালে কলাভবনের ছাত্রেরা থাকতো। সে-বাড়ির নাম ছিল—'গৈরিক'। নিশিকান্ত থাকতেন 'গৈরিকে'। প্রথমে ছবি আঁকা সবাই যেমন করে শেখে সেই রকম ভাবেই শিখতে লাগলেন নিশিকান্ত। কিন্তু তিনি ছিলেন কবি, আর ছিল তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। গান-টান আর কবিতা-টবিতা লিখতেন তিনি। গুরুদেবের আঁকা ছবি দেখে

নতুন স্টাইল ধরতে গেলেন নিশিকান্ত। আমি বললুম, —গুরুদেবের ছবির পেছনে কত ঐতিহ্য রয়েছে। তুমি পারবে না গুরুদেবের স্টাইলে ছবি করতে। কিন্তু তিনি শুনলেন না সে-কথা। ফলে, তিনি একটা পিকিউলিয়র ধরনের ছবি করতে লাগলেন। শেষে তাঁর দু-কূল গেল। না হলো এদিক্, না হলো ওদিক্। বললুম, আমার কাছে তাহলে তুমি শিখতে পার না আর; জিনিয়াস্ তো নও। —ছড়্ খেয়ে গেল আর-কি। সেই থেকে বিপথে গিয়ে পড়ল। বিপথে মানে, অন্যপথে গেল, আমার নাগালের বাইরে।

'তারপরে তাঁর ইচ্ছে হলো অরবিন্দের আশ্রমে যাবেন। এর মধ্যে আরও ঘটনা আছে। বড় ভোজনরসিক ছিলেন নিশিকান্ত আর সুজিত। সুজিত, নিশিকান্ত আর প্রভাত মিলে 'বোহেমিয়ান ক্লাব' করেছিলেন। আমাদের ধীরেনও ছিলেন তার সদস্য। ঐ ক্লাবের গুপ্ত-সদস্যও ছিলেন অনেকে। ভুবনডাঙ্গার ভজুদাসের দোকান থেকে জিনিসপত্র আনতেন ধারে শোধ দেবার কথা ওঁদের প্রায়ই খেয়াল থাকতো না। ওঁদের ক্লাবের motto ছিল -ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ঘৃত ডিম মাংস ওঁরা খেতেন খুব। যে-দিন মিলতো, একদমে দশ বারোটা করে ডিম খেয়ে নিতেন। আবার একদিন খেয়ে দু তিন দিন উপোস করেও থাকতে পারতেন। খেয়ে-দেয়ে বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতেন; রাত দিন থাকতেন গেস্ট হাউসে। কবিতা লিখতেন। ...পরে নিশিকান্ত চলে গেলেন অরবিন্দের আশ্রমে। ওখানে গিয়ে 'নন্দবাবুর ছাত্র' বলে পরিচয় দিলেন। তবুও 'মাদার' চট্ করে তাঁকে ভরতি করে নেন্‌নি। ওঁকে ওঁরা টেস্ট্ করে দেখলেন। নাছোড়্‌বান্দা দেখে অবশেষে ভরতি করলেন। ওঁর ভোজনরসিকতা ওখানেও জানাজানি হয়ে গেল। বাইরে গিয়ে খাবেন তিনি, —সে-অনুমতিও মাদারের কাছে থেকে যোগাড় করে নিলেন। দিলীপকুমারের বন্ধু নিশিকান্ত। অনেক কবিতা লিখেছেন, গান বেঁধেছেন দিলীপের সঙ্গে।

ভালো খাবার জিনিসে বরাবরই তাঁর উৎসাহ ছিল। গ্যাস্টিক্ আল্‌সার হলো, ডায়াবিটিস ধরলো। গ্যাস্টিক আলসারের ওষুধ পেয়েছিলেন নিশিকান্ত অদ্ভুতভাবে। তখন তাঁর কাছে রহস্যময় পরীরা সব আনাগোনা করতো। তাদের একজনের কাছ থেকেই দৈব-ওষুধ পেয়ে গ্যাস্টিক্

আল্‌সার সারিয়ে ফেললেন নিশিকান্ত। ১৯৫০ সালের লেখা নিশিকান্তের চিঠি আছে আমার কাছে। তখন উনি ডায়াবিটিসে ভুগছেন। আমাকে লিখে পাঠালেন। ডায়াবিটিসের জন্যে আমি তাঁকে ওষুধ বাত্‌লে লিখলুম —বন-ধনের পাতা। গ্যাস্টিক আলসারের জন্যে আমি তাঁকে লিখেছিলুম গেঁদল পাতার রস খেতে। যাই হোক্, তাঁর দু-টো অসুখই এখন (১৯৫৫) সেরে গেছে। নিশিকান্ত গরীদের বাত্‌লানো ওষুধ খেয়েছিলেন অরবিন্দ আর মাদারের কথামতো।

'দিলীপের বন্ধু হওয়ায় অরবিন্দ-আশ্রমে অনেক কন্‌সেশন পেলেন নিশিকান্ত। আশ্রম জীবনের কড়াকড়ি থেকে অনেকটা রেহাই পেয়েছেন, বিশেষ করে বাইরে গিয়ে খাওয়ার ব্যাপারে ; আশ্রমে কিন্তু তিনি লয়াল রইলেন বরাবর। ওখানে আছেন এখনও। শরীরও সুস্থ।

'আমাদের সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর ভাই হলেন নিশিকান্ত। কবিতার অনেক বই আছে তাঁর। শান্তিনিকেতনে আমাদের কলাভবনে নিশিকান্ত ছবি যা এঁকেছিলেন, টাকা দিয়ে কিনে নিলেন আমাদের আশ্রমেরই একজন ছাত্র। তাঁর হাতে তখন টাকা ছিল না। তিনি ছবিগুলো কিনে নিয়ে পরে টাকা পাঠিয়ে দিলেন। নিশিকান্তর আরও ছবির প্যাকেট আছে তাঁর দাদা সুধাকান্তের কাছে।

'এখান থেকে পণ্ডিচেরী গিয়ে নিশিকান্ত অরবিন্দকে ছবি দেখিয়েছিলেন। ছবি দেখে অরবিন্দ বলেছিলেন, —এ-সব কেন আঁকছ। এতে মন যে ড্রাই হয়ে যাবে। তুমি দেব-দেবতার ধ্যান করে ছবি আঁক। সেই আমার পথই বাতলে দিলেন অরবিন্দ। শান্তিনিকেতন থেকে আমার অনেক ছাত্র গেছেন অরবিন্দের আশ্রমে। গুজরাটী ছাত্র কৃষ্ণ ভট, জয়ন্ত পারেখ, নিশিকান্ত এঁরা সব পাঁচ-ছ জন ছাত্র আমাদের কলাভবনের ব্যাচ। আমি অরবিন্দের আশ্রমে যাইনি কখনও। তবে আমার ছাত্র বলে ওখানে অরবিন্দ ওঁদের যত্ন করে জায়গা দিতেন।

॥ আর্থার গেড্ডিস ॥

'প্যাট্রিক গেড্ডিসের ছেলে আর্থার গেড্ডিস শ্রীনিকেতনে এলেন ১৯২৩

সালে। বেশ কিছুদিন ধরে রইলেন এখানে। শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে তাঁর লেখা বইয়ের কথা আগেই বলেছি। Geographical Magazine-এ অনেক লেখা লিখে তাঁর নাম হয়েছিল খুব। তিনি একদিন আমাকে তাঁর পরিকল্পনার কথা বললেন। তিনি Eleciric Plant করতে চান শ্রীনিকেতনে। আমি বললুম, —তোমার পরিকল্পনা খুব ভালো। তবে তাতে প্রভূত পয়সা খরচ হবে। অত টাকা কোথায় পাওয়া যাবে। আর গ্রামের লোকে অত খরচ করে ব্যবহারই বা করবে কি করে। আমার মতে, পরম্পরাগত ঐতিহ্যগুলোকে মেজে-ঘষে গাঁয়ের লোককে তাদের আয়ত্তমাফিক উন্নত করাই ভালো। পশ্চিমের বিলাসিতা এদেশের গাঁয়ের মানুষের রক্তে বিষের মতন মেশাতে চেষ্টা না করলেই মঙ্গল হবে। —এই ধরনের সব কথা তখন আমাদের হতো আর্থারের সঙ্গে।

আর্থার গেডিসকে আমি গ্রামে নিয়ে যেতুম সঙ্গে করে। সুপুরে গেলুম একবার। সুপুরে বড়ো বড়ো পুকুর সব মজে রয়েছে। রাস্তা থেকে কিছু দূরেই একটা পুকুরের পাবাতে শ্মশান রয়েছে। আর্থার দেখেই বললেন, —diriy! sanitation দূষিত হয় এতে। আমি বললুম, —তুমি হিন্দুর পুকুর-পাবার শ্মশানের কথা বলছো, মুসলমানেরা কবর দেয় তাদের ঘরের আশেপাশে। আর্থার বললেন, —না, কবর ঘরের পাশে না-দিয়ে পুকুরপাড়ে দিতে পারে। আমি বললুম, —এ-সব হলো superstition এর ব্যাপার। ওদের ধারাই হলো এই ; তুমি বোঝাবে কি করে। তখন আর্থার বললেন,— ওদের education দাও, superstition আপনি যাবে। হাজারও preaching-এ কোনো কাজ হবে না।

'সুপুরে বিষ্ণুমূর্তি দেখতে গেলুম একজন ব্রাহ্মণের বাড়িতে। গেলুম আমি, কালীমোহন ঘোষ আর আর্থার। বামুনঠাকুরের বাড়ির ছোট্ট দাওয়া। বসলুম আমরা সেখানে গিয়ে। গ্রামে কিন্তু দেখলুম কোনো ঘৃণা নাই সাহেবদের ওপর। অর্থাৎ সাহেবদের সঙ্গে ব্যবহারে গ্রামের লোকের ঘৃণা করবার মতন কিছু ঘটেনি। আমার মনে হয়, মুসলমানদের প্রতি হিন্দুর যে-ঘৃণা সেটা ধর্মগত নয় মোটেই, সেটা হলো ব্যবহারিক। নইলে, ওরা ঘৃণা করতো খৃস্টানকেও ; কিন্তু তা তো করে না ; সাহেবদের ওপর বিতৃষ্ণা নাই গাঁয়ের লোকের। ...বামুনঠাকুর আমাদের খেতে দিলেন গুড়ের শরবৎ। খেলুম

আমরা তৃপ্তি করে। আর্থারের পকেটে ছিল সিদ্ধ-ডিম। পকেট থেকে বের করে মুখে পুড়লেন। আমি বললুম, —ডিমের খোলাটা এখানে ফেলো না, বামুনের বাড়ি। আর্থার সেটা পকেটে রাখলেন। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। ভাত খেলুম আমরা সেই বামুন-বাড়িতে। কলাইয়ের ডাল, পোস্ত-চচ্চড়ি আর মৌরলা মাছের অম্বল —তাহা বীরভূমের খাবার। পকেট থেকে আবার ডিম বের করে আহার সম্পূর্ণ করলেন আর্থার গেডিস।

'সুপুরে একটি বিষ্ণুমূর্তি দেখলুম। অতি সুন্দর মূর্তি। পাথরের মূর্তি দেখে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছি, দেখি কি, ছোট্ট একটি ছেলে প্রায় উলঙ্গ। ছেলেটি দেখতে ঠিক্ সেই বিষ্ণুমূর্তিটির মতন। সেইরকম চোখ, সেইরকম নাক-মুখ, আর মাথায় ঝুঁটি। —সেই জীবন্ত বিষ্ণুমূর্তিটি আমার মনে বসে গেল।

'আর্থার অভিনয় করেছিলেন সুরুলে। নিজে নাটক তৈরি করে সুরুলে ছোট্ট একটি পুকুর-পাড়ে স্টেজ্ বেঁধে অভিনয় করেছিলেন। প্রিমিটিভ্‌দের বিষয় নিয়ে অভিনয় হলো। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস দেখিয়ে দিলেন। কিভাবে মানুষ চাষবাস শিখলে, যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখলে, কাপড়-পরা শিখলে —এই সব বিবর্তনের দৃশ্য নিয়ে নাটক অভিনয় হলো। আদিমযুগের মানুষেরা কিভাবে জীবনধারণ করতো সে-সবই দেখালেন। তবে বড়ো নীরস হলো। প্রোগ্রেস্ দেখানোর ফলে অভিনয়টা বড়ো ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল হয়ে উঠলো। নাটকের রস জমে বরফ হয়ে গেল। আমাদের দেশের ধাতই আলাদা। আমাদের মন চায় রসের সৃষ্টি। আমাদের তথ্যানুসন্ধান চলে রসকে আশ্রয় করে। আর ওদের হলো জ্ঞানলাভের জন্যেই জ্ঞানের চর্চা। আমাদের কাছে জ্ঞানলাভ হচ্ছে গৌণ ব্যাপার। মুখ্য হলো রসসৃষ্টির আদর্শ। আর জ্ঞানচর্চা হবে সেই আদর্শের অনুসারী। ওদের পথ হলো উল্টো পথ। আমরা আগেভাগে একটা লোককে আগাগোড়া জেনে, তারপর তাকে ভালোবাসি না। আমাদের শ্রদ্ধা আগে ; নলেজ পরে। উল্টো পথে গেল বলে আর্থারের নাটক নীরস হলো।

'আর্থার গেডিস বেহালা বাজাতে পারতেন খুব চমৎকার। গুরুদেবের গান অনেক জানতেন তিনি। গুরুদেবের গান তিনি বেহালার নোটেশনে তুলে নিয়েছিলেন। সেই দেখে দেখে বাজাতেন।

'তখনকার শান্তিনিকেতন-আশ্রম সম্পর্কে অনেক সমালোচনা করতেন তিনি। স্যানিটারি পায়খানার কথা তুলে বললেন, এই ব্যবস্থা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হচ্ছে। আট-দশটা করে টায়ফয়েড্ কেস্ লেগেই আছে। আশ্রমের স্যানিটেশনটির ব্যবস্থা ভালো নয়। তবে এর ফলে, ম্যালেরিয়াটা কম বটে।

'গুরুদেব শ্রীনিকেতনের জন্যে আর্থার গেডিস্‌কে এনেছিলেন এখানে। ভিলেজ-কলোনি প্রসঙ্গে তাঁর অনেক কথা হতো আমার সঙ্গে। গ্রামে পাকা-বাড়ি করা হোক্ —এই রকম পরিকল্পনা ছিল তাঁর। আমি বললুম, —গাঁয়ে পাকা-বাড়ি তো করবে বলছো, কিন্তু টাকা দেবে কে। এই বিরাট খরচ বহন করবে কে। বুঝিয়ে বলায়, তিনি আমার কথা ঠিক্ বটে বলে স্বীকার করলেন। —'আমি তোমার কাছ থেকে অনেক শিখেছি' —বলতেন তিনি। 'রথীবাবুকে ঠিক্ বুঝতে পারিনি। আমি তোমাকে ঠিক্ বুঝেছি —তোমাদের দেশের গ্রামের আদর্শের ব্যাখ্যা চেয়ে। পিতার আদর্শ রথীবাবু কতখানি অনুসরণ করতে পেরেছেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে সে আমি বুঝতে পারিনি।' —এ-হলো তাঁর শ্রীনিকেতন থেকে বিদায় নেবার আগেকার কথা।

॥ শোকলা সাঁওতাল ॥

'শোকলা একজন সাঁওতাল ছেলে যাকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। শুক্রবারে জন্মেছিল বলে নাম তার 'শোকুরা' বা 'শোকলা'। এ অঞ্চলে সাঁওতাল গানের নাম রটে গেছে —'শোকলার গান'। কারণ হলো অনেক সাঁওতালী গান আর ছড়া-টড়া সব সে সংগ্রহ করেছিল। পড়ত শান্তিনিকেতন আশ্রমের পূর্ব-বিভাগে। ইস্কুল ছেড়ে নিজে সে গাঁয়ের কাজ করতে লাগলো। গাঁয়ে শেখাতো সে। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার ফলে অনেক সব গুহ্য-গান আর ছড়া সে সংগ্রহ করতে পেরেছিল। তার অনেক সংগ্রহ তখন আমাদের কলাভবনে আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলুম। ইস্কুলে পড়ার সময়ে শোকলা ফুটবল খেলতো ব্যাকে।

'আমাদের সুরেন বিলেত থেকে বই-বাঁধার কাজ শিখে এসে শান্তিনিকেতনে

শেখাতে লাগলেন। তখন তাঁর বড়ো শাগরেদ হয়েছিল শোকলা সাঁওতাল। শোকলা বই-বাঁধার বিদ্যে ভালো করে শেখার পরে কলাভবনে তাকে বই-বাঁধার কাজ দিয়েছিলুম। ঐ বিদ্যে শান্তিনিকেতনে সে শিখেছিল। আরও ভালো করে শেখবার জন্যে তাকে কলকাতাও ঘুরিয়ে আনা হলো। লাইব্রেরীতেও বই বাঁধতো সে। শেষ-মেস গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে তার যখন বনিবনা হলো না, তখন আমি তাকে কাজ দিলুম কলাভবনে। কলাভবনে জাপানী পোর্টফোলিও সে বেঁধেছিল খুব ভালোভাবে।

'অল্প-বয়সে মারা গেল শোকলা। হয়েছিল টি. বি.। তার মা তখনও বেঁচেছিল। বাড়িশুদ্ধ ধ্বংস হলো টি. বি-তে; একমাত্র ছেলে শোকলাই বেঁচেছিল বুড়ীর। আগে-আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতো শোকলার মা। এখন (১৯৫৫) সে আর আসে না।

'শোকলা শ্রীনিকেতনে কাজে যোগ দিলে। তখন তার পিয়ার্সন-পল্লীর বাড়িতে সে তাঁতের কাজ করতো, চরকা চালাতো। মুদির দোকান করেছিল শোকলা। সে-দোকান open করতে গিয়েছিলেন আমাদের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। গুরুদেব শোকলার দোকানে গিয়ে পৌঁছবার পরে সাঁওতালরা তাদের নিজের হাতে-বোনা চাদর দিয়ে বরণ করলে তাঁকে। সাঁওতাল-সমাজ সেদিন নিজেদের পদ্ধতিমতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে বরণ করলে।

'বহুকাল আগে তার বাড়ির আঙিনায় পিয়ার্সন সাহেব নিজের হাতে একটি ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের চারা পুঁতেছিলেন। ও-পাড়ায় সবচেয়ে লম্বা সেই বিদেশী গাছটি আজও চিনিয়ে দেয় —শোকলা সাঁওতালের বাড়ি।

॥ শ্রীসুরেন্দ্রনাথের বিদেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা-বর্ণনা ॥

'গুরুদেব বললেন, —'চল ঘুরে আসি'। সিংহল হয়ে গেলুম। নামা হলো মার্সাই-এ। ট্রেনে গেলুম প্যারিসে। ওঠা হলো গিয়ে ওতুম্ দ্যু ম'দ-এ ম'সিয়ে কান্-এর অতিথি হয়ে তাঁরই বাড়িতে। ম'সিয়ে কান্ ভদ্রলোক art-এর একজন বড়ো সমঝদার। তাঁর বাগান সে দেখবার মতন। ...আমরা ওখানে কিছুদিন থেকে প্যারিস শহরে গেলুম। ইউনিভার্সিটি-

এরিয়ার একটা হোটেলে ওঠা হলো। আট-দশ দিন ছিলুম সেখানে। ‥ প্রতিমা দেবী গেলেন আঁদ্রে কারপ্লেসের বাড়িতে। প্যারিস থেকে আমি, রথীবাবু আর প্রতিমা দেবী গেলুম বিলেতে। বৃটিশ ম্যুজিয়ম সব দেখা হলো ঘুরে ঘুরে। কাছেই একটা হোটেলে উঠেছিলুম। হোটেল থেকে tube-এ বৃটিশ-ম্যুজিয়মে যাওয়া-আসা করতুম। এই সময়ে ঠিক্ করা হলো County Council স্কুলে ভরতি হয়ে লিথোগ্রাফি আর বুক-বাইণ্ডিং শিখে নেবো। মাস তিনেক থাকা হলো বিলেতে। শিখেছিলুম প্রায় দু-মাস ধরে।

'ফেরবার পথে মিলান থেকে ভেনিসে এলুম। গুরুদেব দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে ফিরে অসুস্থ হলেন; তাঁর ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো হলো। ডিউক স্কোত্তি খুবই যত্ন-আত্তি করে সারিয়ে তুললেন। ভেনিসে দ্রষ্টব্য অনেক ফ্রেস্‌কো —Last Supper ইত্যাদি দেখলুম। ডিউক গুরুদেবকে মাটির cup উপহার দিলেন। এই সময়ে গুরুদেবের সস্নেহ সান্নিধ্যে দিন কাটতে লাগলো।

'শান্তিনিকেতন-কলাভবনে আমার রঙ্গিন স্কেচ্ রাখা আছে অনেকগুলি। বৃটিশ-ম্যুজিয়মে, ভেনিসে আমি সে-সব স্কেচ্ করেছিলুম। ভারতশিল্পের সঙ্গে যার মিল আছে, সেইসব শিল্পবস্তুর আমি স্কেচ্ করেছিলুম। কিছু এ্যাবরিজিন্যাল, কিছু ইজিপ্‌সীয়ান, আফ্রিকান, সুমেরিয়ান, যেখানে যেখানে আমাদের সঙ্গে মিল দেখেছি, সেইসব বস্তুর স্কেচ্ করে এনেছি। ইজিপ্‌সীয়ান ছেলেদের খেলনা, বেড়ালের গাড়ি, ভাঙ্গা হাঁড়ির টুকরো সবই আছে আমার ঐ সব স্কেচে।

'দেশে ফিরে এসে আমার শেখা বিদ্যে কাজে লাগাতে লাগলুম। জোড়াসাঁকোতে অবনীবাবুদের একটি লিথো-প্রিন্টিং প্রেস ছিল। সেটি শান্তিনিকেতনে এনে লাইব্রেরীর ওপরতলায় কলাভবনে বসানো হলো। আমাদের ছাত্র রমেন চক্রবর্তী শিখতে লাগলেন। তিনি কাজ শিখলেন ভালোভাবেই। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শিখলেন রমেন অতি নিষ্ঠাসহকারে।

'বিলেত থেকে বুক-বাইণ্ডিং-এর যন্ত্রপাতি বা প্রয়োজন সে-সব কিনে এনেছিলুম। গুরুদেব টাকা দিলেন। Cutter ইত্যাদি বা, যা দরকার সব আনা হয়েছিল। শেষে সে-সব যন্ত্র শ্রীনিকেতনে পাঠানো হলো। বুক-বাইণ্ডিং এখানে আর তেমন কেউ শেখেনি। কিছু মাত্র শিখেছিল আমাদের ছাত্র ভি. আর. চিত্রা আর ভালোমতো শিখলো শোকলা সাঁওতাল।

সেই হলো বিশ্বভারতীর সেই সময়কার একমাত্র বুক-বাইণ্ডার। সে শ্রীনিকেতনে কাজ করতো। তারই চার্জে এই বিভাগ দেওয়া হলো।

১৩৩২ সালের শ্রাবণ সংখ্যার 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকায় আশ্রম-সংবাদে জানানো হয়েছে, —'শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় বিলেত হইতে Litho ও Book binding-এর কাজ শিখিয়া আসিয়াছেন এবং সম্প্রতি এই দুই রকম crafts এর কাজ তিনিই আশ্রমে শিক্ষা দিতেছেন।

'১৯২৫ সালে গুরুদেবের সঙ্গে আমরা শান্তিনিকেতন-আশ্রমে ফিরে এলুম। সে-সময়ে আশ্রমের স্বদেশীর বান ডেকেছে। শাস্ত্রীমশায়, নতুন দা', সবাই চরকা কাটছেন। নেপালবাবু, কালীমোহনবাবু রাজনীতি করবার জন্যে সাময়িকভাবে আশ্রম ত্যাগ করেছেন। এই সব দেখে শুনে গুরুদেবের মনে ক্ষোভ হলো। কিন্তু সে সাময়িক। আমরা আসন্ন বসন্ত-উৎসবের উদ্যোগে ব্যাপৃত হয়ে পড়লুম।'

১৩৩১ সালের চৈত্র-সংখ্যার সংবাদে এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। —'অসমাপ্ত বসন্তোৎসব। বিগত দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে 'সুন্দর' নামে ছোট একটি গীতি-ভূমিকা অভিনয় হইবার কথা ছিল। স্বয়ং গুরুদেব ছাত্র-ছাত্রীদের ইহার গানগুলি শিখাইয়াছিলেন। আম্রকুঞ্জের অভিনয় স্থলটি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের তত্ত্বাবধানে সুচারুরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। অভিনয়ের দল ও অভিনয়ের স্থল যখন প্রস্তুত এমন সময়ে সন্ধ্যাকালে আকাশ মেঘে ভরিয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে বান-ডাকানো বৃষ্টিতে অনভিনীত উৎসবের উপরে অকস্মাৎ জল-যবনিকা টানিয়া দিল।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা 'হার' মানিনি। লাইব্রেরীর ওপরতলায় কলাভবনে বসন্তোৎসবের আয়োজন করা হলো —গুরুদেবের উৎসাহে সেইদিনেই। আমাদের সজ্জা দেখে গুরুদেব বললেন, —'কি হে, তোমরা কি প্রকৃতির কাছে কিছুতেই হার মানবে না বলে ঠিক্ করেছো?' —যাই হোক্, উৎসবে জনসমাগমে তিল-ধারণের স্থান ছিল না। উৎসব সম্পন্ন হলো। গুরুদেব খুশি হলেন।'

। ফর্মিকি (Karlo Formichi) ।

বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথের দেওয়া-নেওয়ার আদর্শ নিয়ে এবারকার বিশ্বপরিক্রমার প্রত্যক্ষ ফল হলো ফর্মিকি ও তুচ্চির বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনার কাজে যোগদান। ফর্মিকি ছিলেন রোম-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের অধ্যাপক। ইংরেজীও জানতেন ভালোই। মিলানের ডিউকের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতা হয়। কবির দোভাষীর কাজ করবার জন্যে রোম থেকে মিলানে এসেছিলেন ফর্মিকি। ১৯২৫ সালের পূজার ছুটীর পরে ইতালী থেকে কার্লো ফর্মিকি শান্তিনিকেতনে এলেন কবির আমন্ত্রণে। তিনি অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

ফর্মিকি সম্পর্কে আচার্য নন্দলাল বলেন, —'ফর্মিকি হলেন ইটালীয়ান পণ্ডিত। শান্তিনিকেতনে এসে ইনিও বক্তৃতা দিতেন আমবাগানে। আমার সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। এখানে তিনি ছিলেন মাস ছয়েকের মতন। শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর বিদায়-উপলক্ষে বিশ্বভারতীর ছাত্রেরা 'মুদ্রারাক্ষসে'র কয়েকটি অঙ্কের অভিনয় করেছিল।

'যাবার আগে ফর্মিকি আমার কাছে একটা ছবি চাইলেন। ছবি আমি এঁকে দিলুম। কালি-তুলি দিয়ে ভালো ছবি করে দিলুম। ওয়াটার-কালারের বিশেষ ছবি হলো, —বীরভূমের কোনও গাঁয়ের গেরস্ত-ঘরের দাওয়ায় বসে একটি বাঙ্গালী মেয়ে রান্না করছে। সে-ছবির কপিও নাই, প্রিণ্ট্‌ও হয়নি। খুব খুশি হলেন তিনি আমার সে-ছবিখানি পেয়ে। তারপরে দেশে চলে গেলেন।

। তুচ্চি (Guissepe Tucci) ।

ফর্মিকির সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এলেন অধ্যাপক তুচ্চি (Guissepe Tucci)। ইনি বহুভাষাবিদ্‌। সংস্কৃত জানতেন ভালো রকম। তা-ছাড়া চীনা ও তিব্বতী ভাষা আর বৌদ্ধ-দর্শনাদি বিষয়ে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। ইতালির মুসোলিনী-সরকার তাঁর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। এঁদের মাধ্যমে মুসোলিনী বিশ্বভারতীর জন্যে বহুমূল্যবান ইতালির গ্রন্থরাজি

এখানে পাঠিয়েছিলেন। অধ্যাপক তুচ্চি শান্তিনিকেতনে চীনা ক্ল্যাসিকস্ আর চীনা বৌদ্ধ-গ্রন্থ অধ্যাপনা করেন।

তুচ্চি সম্পর্কে আচার্য নন্দলাল বলেন, —'ফর্মিকি বোধহয় ইতালি ফিরে গিয়ে তুচ্চিকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিলেন। তুচ্চি হলেন চীনে-তিব্বতীতে পণ্ডিত। ভারতবর্ষে এসে তিনি তিব্বত ঘুরে এলেন। ঐ সময়ে অনেক তিব্বতী পুঁথি আর তিব্বতী ছবি সংগ্রহ করে আনলেন।

'তবে যে-দরের পণ্ডিত ছিলেন তিনি, তাঁর চরিত্র সে-রকম উঁচু ছিল না। চরিত্র-নীতি সম্পর্কে তাঁর ধারণাই ছিল ভিন্ন। জ্ঞানের সঙ্গে স্বভাব-চরিত্রের যোগ থাকা তিনি দরকার বলে মনে করতেন না। এখানে তাঁর আচার-আচরণ দেখে শাস্ত্রীমশায় বিরক্ত হলেন খুব। তাতে তুচ্চি বললেন, —আমি ব্যবস্থা করে নেব।

'আমার সঙ্গে তাঁর আর্ট সম্পর্কে কথা হতো খুব। আমার 'শিল্পকথা' বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ তাঁকে পাঠানো হয়েছে (১৯৫৫)। তিনি আমার সে-বই পেয়েছেন নিশ্চয়ই।

'তিব্বত থেকে দেশে ফেরবার পথে তুচ্চি আবার আসেন শান্তিনিকেতনে। আমার সঙ্গে তাঁর আলোচনা হলো তিব্বতী ব্যানার সম্পর্কে। তাঁর সংগ্রহের অনেক ছবি দেখালেন আমাকে। ময়লা ব্যানার কি করে পরিষ্কার করতে হয়, সে-পদ্ধতি আমাকে তিনি দেখিয়ে দিলেন। ময়দা খুব টাইট্ করে মেখে নিতে হয় —ময়েন না-দিয়ে। তারপরে সেই ময়দাটাকে লম্বা নেচির মতন করে, ব্যানারের ওপরে গড়িয়ে নিলে ব্যানারের ধুলো-ময়লা সব ঐ নেচিতে লেগে গিয়ে ব্যানার পরিষ্কার হয়। নতুন-সংগ্রহ তিব্বতী ছবি দেখালেন আমাকে সে অনেক।

'এই সময়ে একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা সঙ্গে ছিল তাঁর। স্ত্রী নয়, বান্ধবী। সঙ্গে থাকে, সেবা করে, আর সাহায্য করে কাজে। এই রকম স্বভাব ছিল কুমারস্বামীর। দু-তিনটে বিয়ে করেছিলেন তিনি। শেষের স্ত্রীর ছেলেটিকে আমাদের কলাভবনে ভরতি করে দিতে কুমারস্বামীর ইচ্ছে ছিল খুব। এ-কথা আগে বলেছি।'

॥ কলাভবনের ছাত্রমহলে শিল্পসাহিত্যচর্চা, ১৯২১-২৫ ॥

আচার্য নন্দলালের প্রেরণায় বিশ্বভারতীর শুরু থেকেই কলাভবনের ছাত্রমহলে শিল্পসাহিত্য-চর্চার উৎসাহ দেখা দেয়। শিল্প-শিক্ষকদের মধ্যে অসিতকুমার হালদার এই বিষয়ে প্রথম থেকেই উদ্যোগী ছিলেন। ছাত্র শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের কথা ও রচনা আমরা আগে কিছু কিছু উদ্ধার করেছি। এবার আর-একজন ছাত্র শ্রীহরিপদ রায়ের রচনা, হাতে-লেখা 'বিশ্বভারতী' পত্রিকা থেকে সঙ্কলন করে দেওয়া হলো। প্রবন্ধটির নাম 'ভারতবর্ষের চিত্রের কথা'। এই প্রবন্ধটি সাহিত্য-সম্পদেও সমৃদ্ধ। শ্রীহরিপদ রায় হচ্ছেন সংস্কৃতে পণ্ডিত আর বি. এ. পাশ-করা। আচার্য নন্দলালের ছেলে-মেয়েদের তিনি চিত্র বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু সংস্কৃত পড়াতেন সেকালে।

॥ ভারতবর্ষের চিত্রের কথা ॥

প্রথম কেমন করিয়া কল্পনা আসিয়া মানুষের মন অধিকার করিয়াছে তাহা আলোচনা করিতে আসি নাই। তবে যতদূর অতীতে মানবের করস্পর্শ চিহ্ন দেখিতে পাই,—তাহা যত ক্ষুদ্র, যত অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন, তাহা কল্পনারই রাগে রঞ্জিত। কল্পনার প্রকাশ-পথ দুইটি; —এক ভাষা, অপর শিল্প। মনের গভীর অন্তর্গুহাবাসী যে অপরূপ-সুন্দর —তাহা বাহিরের বস্তুময় জগৎকে আশ্রয় করিয়া ব্যঞ্জনায় আপনাকে প্রকাশিত করিতেছে —রূপে। কবি বা শিল্পী তাঁহাদের মনে সুন্দরের স্পর্শ পাইয়া তাহাকে কাব্যে বা শিল্পে প্রকাশ করেন। সেই ব্যঞ্জনার স্পর্শমণি-স্পর্শে অন্য যত উন্মুখ মন, —সকলেই সুন্দরকে নিজ নিজ মনে ফিরিয়া ফিরিয়া স্পর্শ করিয়া ধন্য হন।

রূপ ও সৌন্দর্য এক নহে। —মানুষ পৃথিবীতে প্রথম যখন চক্ষু মেলে তখন তাহার হৃদয়-কোরকের গোপন-প্রকোষ্ঠে লুকাইয়া আনে একটু-কণা আনন্দ —যে-আনন্দ আছে এই বিশ্বসৃষ্টির মূলে, যে স্রষ্টা একদিন শেষ-শয়ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন, 'একোঽহম্ বহু স্যাম্' —যে আনন্দ একদিন এই তমোমহাসমুদ্র আনন্দের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া

উঠিয়াছিল। আনন্দের প্রকাশই হয় বিচিত্রকে সৃষ্টি করিবার মধ্যে —তাই 'একোঽহম্ বহু স্যাম্' —তাঁহার প্রথম বাণী। এই আনন্দই সুন্দর। এই সুন্দরের প্রকৃতি যেখানে আমার চোখে পড়ে —যেখানেই দেখি একের মধ্যে বহুর বিচিত্রতা, বহু-সৃষ্টির মিলন —যাহাতে আমার মন সৃষ্টির আনন্দে লীলাচঞ্চল হইয়া উঠে, তাহাকেই আমরা বলি সৌন্দর্য।

রূপ কি? —রূপ হইল ব্যঞ্জনার আনন্দ —সুন্দরের অভিব্যক্তি। রূপ— সেই রূপকথার সোনার কাঠি যাহার একটু স্পর্শে আমার মনের অসীমতার তেপান্তর মাঠের মধ্যে সেই কোন্ বিজনগৃহের নীরব শরণলগ্না সৌন্দর্যলক্ষ্মী জাগিয়া ওঠেন।

হয়তো পথ চলিতে দু-টি চোখের গভীর-কালো দৃষ্টি আমার দৃষ্টিকে স্পর্শ করিল, —সমস্ত মনটা যেন তড়িৎস্পর্শে উন্মুখ হইয়া উঠিল, —তাই আবার ফিরিয়া দেখিলাম, —দেখিলাম বিশেষত্ববর্জিত মুখে সেই দু-টি গভীর কৃষ্ণ আঁখি-তারকা। —আবার পথ চলিলাম; —বাহিরের শত কাজে সেই দৃষ্টিটুকু ভুলিয়া গেলাম। —কিন্তু একদিন ছায়াশ্যামল দীঘির জলে সন্ধ্যার গভীরতা ঘনাইয়া আসিতেছে —আমি আনমনে তাহা দেখিতেছি, —ক্রমে সেই কালো জল আরও গভীর হইল, কালো আরো কালো, আরো গভীর, আরো গভীর —শেষে একি! সমস্ত মন অবশ-করা, সেই পথের বাঁকে দেখা —সেই তরুণীর গভীর কালো দৃষ্টি! চোখ বুজিয়া আসিল। মনে মনে বলিলাম 'সুন্দর'। —এ সুন্দর কি? —এই দুই রূপের সঙ্গে —ঐ একই সুন্দরের সম্পর্কই বা কি? এ সেই সুন্দর যাহা আমাদের প্রাণের সেই গোপন আনন্দ, যাহা আমাদের সহজাত —যাহা সব সময়ে সকলের কাছেই তাহার অনির্বচনীয়ত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। আর এই রূপ হইল সুন্দরকে জাগাইবার কারণ। ঐ আনন্দের কাছে গভীর দৃষ্টি আর দীঘিকার অঞ্জনঘন-বর্ণ একই দামে বিকাইয়া গেল। কিন্তু প্রশ্ন করুন —'কেন সুন্দর—?' 'কোথায় সুন্দর?' —আপনাকে কেমন করিয়া দেখাইব, কোথায় সুন্দর? —তর্কে ত সে-সুন্দর ধরা দেয় না। উপনিষদের ঋষি বারুণি পিতাকে ধরিয়া বসিলেন—'অধীহি ভগবোব্রহ্ম' —পিতা আমাকে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের সন্ধান বলিয়া দিন। পিতা বলিলেন —'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব'। —বাছা —তপস্যা দ্বারা চেষ্টা কর তাঁহাকে জানিতে পারিবে। পিতা ব্রহ্মবিৎ, —তিনি কি তাঁহার প্রিয় পুত্র

বারুণিকে সে সন্ধান বলিতে পারিতেন না?—তিনি পারিতেন না বলিয়াই বলেন নাই—। কারণ 'ব্রহ্ম বিদ্‌ ব্রহ্মৈব ভবতি'—তিনি আনন্দকে জানিয়াছেন, আনন্দিত হইয়াছেন,—তিনি কেমন করিয়া দেখাইবেন আনন্দ তাঁহার কোথায় আছে?—তাই সুন্দর সুন্দর। 'কেন সুন্দর', 'কোথায় সুন্দর' এর উত্তর নাই। সুন্দর আছে তোমার প্রাণে—বাহিরের রূপ হইল ভাবব্যঞ্জনা (suggestiveness) বা সুন্দরকে জাগাইবার করণ। সেইজন্যেই সুন্দরের কাছে রূপের দর নাই।

রাজার সভায় ওস্তাদ সঙ্গীতে রূপের বান ডাকাইয়া দিতেছে—সুরের তান কর্তবে পর্যায়ে পর্যায়ে সূক্ষ্মতম শ্রুতিগুলি পর্যন্ত তোমার কাছে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। সেখানে সমস্ত স্বরগ্রাম কত ভঙ্গিতে কত বিচিত্রতা লইয়া তোমার কাছে নৃত্য করিয়া গেল, তুমি বিস্মিত হইয়া বলিলে—গুণী বটে! কিন্তু যখন বাহিরে আসিলে তখন তুমি ক্লান্ত। কত রূপ কত ভাবে আসিয়া তোমার সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলিকে নাচাইয়া দিয়া গিয়াছে—তাই তুমি ঘরের পানে চলিয়াছ—অবশ-শরীরে শ্রান্তচরণে। কিন্তু ঐ জনহীন প্রান্তরের পারে বসিয়া কে ঐ সাধক, তাহার অশিক্ষিত কণ্ঠে গান গাহিতেছে,—তাহা যেমন তোমার কানে গেল, অমনি তোমাকে সেই দিকে প্রবল শক্তিতে আকৃষ্ট করিল। তুমি কাছে গেলে, তোমার গতি থামিল,—তোমার চক্ষু মুদিয়া আসিল,—শেষে একটির পর একটি করিয়া অশ্রুবিন্দু গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গান থামিল,—তুমি বলিলে 'সুন্দর'। —কয়েক মুহূর্ত পূর্বের কথা স্মরণ করিলে,—আপনিই দেখিলে—রূপের সেই বিচিত্র বর্ণসম্পৎ ফিকা হইয়া গেল। তাই বলিয়া রূপ কি কিছুই নয়? রূপের সার্থকতা আছে ততক্ষণ, যতক্ষণ সে আপনাকে কেবলমাত্র অস্তিত্ব লইয়াই সন্তুষ্ট রাখে এবং আপনাকে না-দেখাইয়া সুন্দরকে, অব্যক্তকে নির্দেশ করে।

এতখানি ভূমিকার পরে চিত্রের কথায় আসিয়া পড়িলাম।—

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় অমুক দেশের সভ্যতার পরিচয় কি? উত্তর হইবে সেই দেশের সাহিত্য এবং শিল্প আলোচনা করিয়া দেখ। আবার শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সভ্যতার ধারার দিকে না চাহিলে চলে না। ভারতীয় চিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে প্রথমে দেখিতে হইবে ভারতীয় সভ্যতার প্রাণ কি।—

ঐতিহাসিক সূত্র ধরিয়া অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমে আমরা একমাত্র ঋগ্বেদের সাক্ষাৎ পাই। তখন হইতে ধারাবাহিকক্রমে মুসলমান-শাসনের প্রারম্ভ পর্যন্ত চলিয়া আসিলে একটি বিশেষ ভাবই আমাদের চোখে পড়ে —সেটি —অন্তর্মুখিন্ দৃষ্টি। —এটিই ভারতীয় সভ্যতার প্রাণ।

ঋগ্বেদে আলেখ্য-রচনার কোনও কথা পাওয়া যায় না, সেজন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেকালে চিত্রশিল্প ছিল না, এমন একটা মতের আভাস দেন। আমি তাহাকে বলি —তর্কশাস্ত্রে যাহাকে বলে —Argumentum-ex-silencio। ঋগ্বেদের ঋষিগণ তাঁহাদের স্তোত্রগুলির ভিতর দিয়া সেই সময়ের ইতিবৃত্ত লিখিয়া রাখিয়া যান নাই। সেকালের ধরিবার ছুঁইবার মত যখন কিছুই হাতের কাছে পাওয়া যাইতেছে না তখন ঋগ্বেদে যে যে বিষয়ের আভাস পাওয়া যায় তাহাকেই মূলসূত্র ধরিয়া তাহার সহিত যুক্তি জুড়িয়া তবে কল্পনার সাহায্যে সেই বিষয়গুলিকে পূর্ণ করিয়া দেখিতে হইবে।—

চিত্রের প্রধান সম্পদ্ কল্পনা ও সৌন্দর্যের অনুভূতিতে। ঋগ্বেদের অধিকাংশ সূক্তই নানা মধুর কল্পনায় ও সর্বোপরি একটি সৌন্দর্যের অনুভূতিতে পূর্ণ। অনেক সময় তাঁহাদিগকে সৌন্দর্যের রসে এমন মগ্ন হইতে দেখি যে, তাঁহাদের উচ্ছ্বসিত আবেগময় হৃৎস্পন্দন দেশকালের এত বড় অভ্রভেদী বাধাটাকেও নিমেষে লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া আমাদিগকে স্পর্শ করে।

চিত্রের দ্বিতীয় প্রয়োজন শিল্পে দক্ষতা। ঋগ্বেদে আমরা নানা অলঙ্কার ও নানা বর্ণের বস্ত্রাদির উল্লেখ দেখিতে পাই। যাঁহাদের সৌন্দর্যকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার ও সম্ভোগ করিবার এতবড় ক্ষমতা ছিল —যাহারা নানা শিল্পে বর্ণযোজনা করিতে পারিতেন তাঁহারা সমস্ত শিল্পের মূলে যে মানুষের চেষ্টাটি থাকে —কেবল তাহা হইতে অনেক দূরে ছিলেন, বা সেই শিল্পটি তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টার বাহিরে ছিল, একথা কোনমতেই বিশ্বাস হয় না। মিশর প্রথমে লিপিতে আপনার ভাষা দিতে গিয়া ছবির পর ছবি আঁকিয়াছে। স্পেনের গিরিকন্দরে ইয়ুরোপের আদিম নিবাসী বর্বর স্থানীয় নানা-বর্ণের মৃত্তিকা ও প্রস্তর কুড়াইয়া লইয়া প্রকৃতির অনুকরণ করিতে বসিয়া গিয়াছে। তাহাদের পক্ষে যাহা সত্য হইতে পারিয়াছে, তাহা কোন বিষয়ে উন্নত ও প্রতিভাবান্ আর্য ঋষিদের সমসাময়িক শিল্পীদের পক্ষেই

মিথ্যা হইয়া গেল —এ অতি আশ্চর্য কথা। ইহা লইয়া তর্ক করিয়া লাভ নাই। কিন্তু, আমাদের শিল্প যতটুকুই থাকুক না কেন —তাহারা যাহাই করুক —তাহাদের সমস্ত রূপ ও সমস্ত সজ্জা ছিল শুধু অন্তরের সুন্দরকে নির্দেশ করিতে।

বৈদিক যুগ ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে এক রকম অতীতের সুখস্বপ্ন-যুগ বলিলেও চলে। তাহার পর হইতে বৌদ্ধযুগ বা ভারতের স্বর্ণযুগ পর্যন্ত একটা বিরাট ফাঁকা। —কেবল ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও সূত্র লইয়াই এ ফাঁকাটা কোনও রূপে পূর্ণ হইয়াছিল, —এই হইল ঐতিহাসিকগণের মত। কিন্তু মানুষের মনে যে-মানুষটা কাজ চায় না কেবল নিরন্তরই আঁকিতে চায় —কেবলই 'গল্প বল' বলিয়া তাগাদা দেয় সে-টি ততদিন কোথায় ছিল? সকলেই ত আর সেই যুক্তিতর্ক লইয়া মাথা ঘামাইত না —এই অবিশ্রাম কাজের বাহিরে যে একদল অকাজের লোক আনাগোনা করিয়া বেড়ায় তাহারা ততদিন কোথায় ছিল? ইতিহাস হয়ত বলিবে —তাহারা ছিল না। সে কথার উত্তরে বলিব, ইতিহাসের ঘটনাগুলিই সত্য নয় — সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাস্রোতের মানুষের মানব-প্রকৃতিটিই একান্ত সত্য। কারণ ঘটনা নানাকালে পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু মানবপ্রকৃতিটি এই সমস্ত ঘটনাস্রোতের বাহিরে থাকিয়া স্থির হইয়া আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যতদিন মাটি খুঁড়িয়া তর্ক-বিতর্ক করিয়া স্থির করিবেন যে বৈদিক ও তৎপরবর্তী যুগে চিত্র বলিয়া একটা শিল্প ছিল কিনা —আমি তার অনেক পূর্বে আজই বলিয়া রাখিলাম বৈদিকযুগ এমন-কি তাহারও অনেক পূর্বকাল হইতেই চিত্র এদেশে প্রচলিত ছিল —এবং সেটি অনেক লোকপরম্পরায় সাধনার ধারা বাহিয়া চলিয়া আসিতেছিল —নহিলে হঠাৎ অজন্তায় এমন চিত্র আসিল কোথা হইতে?

বৌদ্ধযুগের শিল্পকীর্তির ছবি কতকটা পাই ইতিবৃত্তের পাতায় আর বাকি সবটাই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া আজও অতীতগৌরবের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। ইতিহাসে পাই প্রথমতঃ চীনদেশীয় পরিব্রাজক Fa-Hien-বর্ণিত বিবরণ হইতে। তিনি অনেক শিল্পকীর্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদের কথাই উল্লেখযোগ্য। সেটী খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট্ অশোক কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। ফা-হিয়েন খৃষ্টীয়

পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সেই প্রাসাদ দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, সেই প্রাসাদের নির্মাণকৌশল ও কারুকৌশল মানুষের সাধ্যের বাহিরে।

ফা-হিয়েনের আগমনের কিঞ্চিদধিক দুই শতাব্দ পরে প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক Hiuen-Tsang তীর্থপর্যটন-মানসে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া শেষে অজন্তা-গুহায় চিত্রদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ফা-হিয়েনের বিবরণের মধ্যে চিত্রের উল্লেখ না-পাইয়া যদি এমন আপত্তি উঠে যে তখন তক্ষণলিপি থাকিলেও চিত্রের অস্তিত্ব ছিল না, তবে তৎকালীন সাহিত্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন হইবে।

চিত্র এখনও যাহা বর্তমান আছে তাহা অজন্তা ইলোরা ও বাগ প্রভৃতি গুহার ভিত্তিগাত্রে, স্তম্ভে ও ছাতে। এখানেও চিত্রের প্রাণের পরিচয় পাইবার জন্য ইতিহাসের কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

ভগবান বুদ্ধের জীবিতকালেই একশ্রেণীর বুদ্ধভক্ত —বুদ্ধের কেশ, পদ নখ, দন্ত ইত্যাদি ভিক্ষা করিয়া লইয়া স্তূপগর্ভে রক্ষা করিত ও সেখানে উপাসনা করিত। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে অন্যদিকে একদল ভক্ত বুদ্ধের ধ্যানমূর্তি ও অন্যান্য অনেক ভাবের মূর্তি নির্মাণ করিয়া তাহার পূজা আরম্ভ করিল। তাঁহাদের মধ্যে পূর্বোক্তগণ হীনযান ও শেষোক্তগণ মহাযান নামে পরিচিত। কালক্রমে মহাযানগণ সত্যসত্যই মহাযান হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের নানা কল্পনা ও নানা সৌন্দর্যে সাজান পূজা-পদ্ধতিতে আর্যাবর্তের অধিকাংশ লোকই মহাযান আশ্রয় করিল। তাঁহাদের পূজার সহিত শিল্পের একটা অখণ্ড যোগ ছিল, তাই প্রায় সমুদয় কুশলী শিল্পী মহাযানদিগের সহিত যুক্ত হইলেন। মহাযানগণ ভাস্কর্য ও চিত্র ইত্যাদি ললিতকলার সাহায্যে ভগবান বুদ্ধের বাণী ও জাতক-সমূহের উপদেশ বর্ণনা ও প্রচার করিতেন। পূজাটিকে সুন্দর করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, তাই দাক্ষিণাত্যে হীনযানগণও তাঁহাদের স্তূপ ও অন্যান্য পূজার স্থান ও পূজাসামগ্রী সাজাইয়া তুলিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে অজন্তায় যখন তাহাদের দুই শ্রেণীকে পাশাপাশি সাজান দেখি তখন কোন্‌টি মহাযান বা কোন্‌টি হীনযান নির্ণয় করা দুষ্কর।

অজন্তা ইত্যাদি চৈত্য ও বিহারগুলির উদ্দেশ্য ছিল বিজন প্রকৃতির মধ্যে লুকাইয়া বৌদ্ধ-সাধকগণের যুবক ও যুবতীগণকে চিত্রের ব্যঞ্জনার সাহায্যে

সুপ্ত সুন্দর প্রাণের অনুভূতি দেওয়া এবং সেই প্রাণের টানে বৌদ্ধসঙ্ঘ গঠিত করা। ঐ চিত্রগুলিকে আমাদের মনে হয় আধুনিককালে Kindergarten-প্রণালীর শিক্ষায় যাহাকে বলে Object lesson। স্থূল বস্তুময় জগতের Object lesssons দিয়া মনগুলিকে ফুটাইয়া তোলাই কত কঠিন —মনের মধ্যের সুপ্ত-সুন্দরের খোঁজ বলিয়া দিতে যে Object lessons তাহা কত সাধনার ফল, তাহা নিশ্চয়ই কাহারও চিন্তার অযোগ্য হইবে না, বা সেই ছবিগুলি স্থূল বস্তুর প্রতিকৃতি না-হইলে এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ হয় না।

এখানে আমার প্রতিপক্ষ প্রশ্ন করিয়া বসিবেন —তোমার জাতকের উপদেশ তো বেশ বুঝিলাম —তাহার প্রকৃতিকে অমন করিয়া লঙ্ঘন করিবার কি আবশ্যক ছিল ? ভোটকান প্রভৃতি স্থানে কি উপদেশপূর্ণ চিত্র নাই ? সেখানে তো প্রকৃতিকে অবিকল বজায় রাখা হইয়াছে।—

উত্তরে প্রথমতঃ অতিশয় বিনয়ের সহিত বলিব, —ভোটকান প্রভৃতি এদেশে নয়, সেটি রোমে ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানে ; আর অজন্তা ইউরোপে নয়, সেটি আমাদের দেশে —ভারতবর্ষে। ইউরোপের মন চায় সেটি। আমাদের দেশে —ভারতবর্ষে চায় অন্য। ইউরোপের মন চায় বাহিরকে ; আমাদের মন নিয়ত চাহিতেছিল অন্তরকে।

দ্বিতীয়তঃ বলিব সেই পুরানো কথাটা —ভাবব্যঞ্জনা। ইউরোপে প্রকাশের জন্য ভাব, আমাদের দেশে ভাবের প্রকাশের জন্য রূপ। তাই রূপেরই আড়ম্বরে চিত্রপট ভারাক্রান্ত, আর আমাদের দেশে রূপই একান্ত নয়, —সে আছে ব্যঞ্জনার স্পর্শে অরূপকে জাগাইতে, ভাবকে অনাহত রাখিতে, —তাই সুপ্ত ভাবের দরজায় ঘা দিয়া সে নীরবে সরিয়া দাঁড়ায়। এদেশের চিত্র নিজের কথাই বেশি একটা কিছু বলিতে চায় না। —তোমার মন যতখানি গভীর ততখানি পর্যন্তই সে স্পর্শ করিবে। এখানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রূপের ব্যাখ্যা একটুখানি উদ্ধৃত করিলেই এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ করিতে পারিব আশা করি। —তিনি রূপের কথায় বলিতেছেন—

'রাজোদ্যানের সিংহদ্বারটা কেমন ? —তাহা যতই অভ্রভেদী হোক, তাহার কারুনৈপুণ্য যতই থাক তবু সে বলে না —আমাতেই আসিয়া

সমস্ত পথ শেষ হইল। আসল গন্তব্য পথটি যে তাহাকে অতিক্রম করিয়া এই কথাই তাহার জানাইবার কথা। এইজন্য সে কঠিন তোরণ কঠিন পাথর দিয়া যত দৃঢ় করিয়াই তৈরি হোক না কেন, সে আপনার মধ্যে অনেকখানি ফাঁক রাখিয়া দেয়। বস্তুত সেই ফাঁকটাকে প্রকাশ করিবার জন্য সে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে যতটা আছে নাই তাহার চেয়ে অনেকটা বেশি। তাহার সেই 'নাই' অংশটা যদি একেবারে ভরাট করিয়া দেয় তবে সিংহোদ্যানের পথ একেবারেই বন্ধ। তবে তাহার মত নিষ্ঠুর বাধা আর নাই। তবে সে দেয়াল হইয়া ওঠে এবং যাহারা মূঢ় তাহারা মনে করে এইটেই দেখিবার জিনিস, ইহার পশ্চাতে আর কিছুই নাই; এবং যাহারা সন্ধান জানে তাহারা ইহাকে একটা অতি স্থূল মূর্তিমান বাহুল্য জানিয়া অন্য পথ খুঁজিতে বাহির হয়। রূপমাত্রেই এরূপ সিংহদ্বার। সে আপনার ফাঁকাটা লইয়াই গৌরব করিতে পারে। সে আপনাকেই নির্দেশ করিলেই বঞ্চন করে, পথ নির্দেশ করিলেই সত্য কথা বলে।'

আমাদের মন নিয়ত যে ছবি সংগ্রহ করিতেছে তাহা বাহির হইতে, বস্তুর জগৎ হইতে, এ-কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করি, কিন্তু অন্তর যে ছবিখানি আঁকে সে-টি বাহ্যবস্তুর অবিকল নকল নয়। সে তার খুশি মতন বাদ দিয়া জুড়িয়া একটা কিছু দাঁড় করাইয়া লয়! তাহাতে যে ছবি লইতেছে ও যাহার ছবি লইতেছে উভয়েরই প্রকৃতির ছাপ পড়ে। এখানে যে ছবি আঁকে সে তাহার নিজের প্রকৃতির কাঠিন্য যে পরিমাণে পরিহার করিতে পারে সেই পরিমাণেই সিদ্ধির পথ সুগম হইয়া ওঠে। নিজের ব্যক্তিত্বের গুরুত্বটা ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলেই চিত্রের বিষয়ের মধ্যে সে আপনাকে সম্পূর্ণ ডুবাইয়া দিতে পারে এবং তখনি বাহিরের রূপের বাধা লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হয়। একটা কথা সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে কতগুলি ঘটনার সমষ্টির যথাতথ্য যেমন প্রকৃত জীবনচরিত নয়, তেমনি অঙ্গের খুঁটিনাটির যথাতথ্যও চিত্র নয়। জীবনচরিত-লেখককে যেমন সমস্ত ঘটনা-জালের ভিতরে যে মানুষটি স্থূলদৃষ্টির অগোচরে রহিয়াছে তাহাকে ধরিতে হয়, চিত্রকরকেও তেমনি রেখা ও বর্ণজালের ভিতরে যে মানুষটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাকেই ধরিতে হয়। তাই বলিয়া ঘটনা বা রূপও উপেক্ষণীয় নহে। জীবনচরিত-লেখককে যে-মানুষটিকে ঘিরিয়া ঐ সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাকে

প্রকাশ করিতে হয়; চিত্রকরকেও যে মানুষ বা যে বস্তুর চারদিকে নানা রেখা, নানা বর্ণ ও আলোছায়া ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে তাহাকে প্রকাশ করিতে হয়।

অন্তরের গুপ্ত ছবিটিকে প্রকাশ না করিয়া কেবল বাহিরের রূপ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে কেমন হয়, যেমন কোথাও বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গেলাম, —গান বাজনা শুনিলাম, নানাবিধ আহার্য দ্বারা রসনার তৃপ্তিসাধন করা গেল, অথচ কাহার বিবাহ হইল, বা বিবাহ হইল কিনা, তাহার খোঁজ লইলাম না। বিবাহে —'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ' বলিয়া যে-কথাটা আছে, তেমন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ঐ শ্রেণীতে পড়িয়া যান। চিত্রেও কেবল রূপটা ঐ শ্রেণীর জন্যই!

ভারতবর্ষীয় চিত্রসম্বন্ধে এরূপ আপত্তি শুনিয়াছি যে তাহা রেখাপ্রধান ও বর্ণ-সম্পদ্‌হীন।

বস্তুময় জগতে রূপ যাহা তাহার প্রধান সম্পদ্‌ রেখা। বর্ণ হইল রেখার ভাবটিকে অন্তরের আভাস দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে উপায়স্বরূপ। আগম জিনিসটিই যদি আসর জমকাইয়া বসে তবে আসরই মাটি! তাই রং হইতে রেখাকে বাদ দেওয়া যায় না —কিন্তু কেবলমাত্র রেখা-সম্পাত বা Drawing-এ ছবি হয় না। ঐ চিত্রে অপর একটি বিশেষত্ব এই যে পাশ্চাত্য চিত্রে বহুবর্ণ সম্পাতের ভিতর দিয়া যে কমনীয়তা দিবার চেষ্টা করে —এখানে তাহা রেখাসম্পাত সুষমার ভিতর দিয়া অতি-আশ্চর্যরূপে ফুটিয়া ওঠে। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতেও এই বর্ণবাহুল্য মুছিয়া রেখার উপর নির্ভর আসিতেছে।

চিত্র লইয়া বিচার করিতে বসিবার পূর্বে এই কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে যে ছবিখানি লইয়া বসিলাম তাহা প্রকৃতির কোনও উদাহরণ দিবার জন্য অবিকল নকল নয়, উহা শিল্পীর মনে যে আনন্দ-মূর্তি আছে তাহারই একটি বিশেষ রূপ। অন্তরের আনন্দের রাজ্য যেখানে স্থূল জগৎ কেবলমাত্র ব্যঞ্জনার গবাক্ষ দিয়া আভাসে তাহার দৃষ্টি প্রেরণ করিতে পারে সেখানে যে রসের মূর্তিসকল অবিরাম ক্রীড়া-চঞ্চলতায় মগ্ন, সাধকশিল্পী যদি তাহাকে বাহিরের রূপে প্রকাশ করিতে গিয়া স্থূল রূপকেই তন্ন তন্ন করিয়া আশ্রয় করেন তবে তাহার সে অন্তরের মূর্তিকে প্রকাশ

করা হয় না —প্রকাশিত হয় আর একটা-কিছু যাহা নিতান্তই বস্তুময়—নিতান্তই সাধারণ। যদি কাহারও মানসী-মূর্তি এমন —'পর্যাপ্ত-পুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' হয় —তবে তাহাকে সেই মূর্তির উপর এমন ব্যঞ্জনাপাত করিতে হইবে —যাহাতে দেখি সেই তরুণী গণ্ডে ললাটে অসংখ্য ব্রীড়া কুসুমভার-পীড়িতা, নবোদ্গত আতাম্র নবীন কিশলয়-গুচ্ছের মত তাহার নিখিল কর-বল্লরী, জগতের এই অপরিসীম মুক্ততা হইতে সে যেন প্রতিনিয়তই আপনাকে বাঁচাইতে চায়, যেন সে ঐ রক্তরাঙ্গা মুখখানিকে প্রকাশের মুখ হইতে লুকাইয়া সরিতে পারিলে বাঁচে, —তাই যেন তার ঐ কুণ্ঠিত গতি, —তাই শিল্পী তরুণীর মুখে আনিবেন রক্তপুষ্পস্তবকের আভাস, হাত-দু-খানিতে দিবেন কিশলয়ের কমনীয়তা, চরণে দিবেন অপরিসীম লজ্জাজনিত শিথিল গতিভঙ্গি। শিল্পীর রসের ছবিখানি দেখিতে হইলে দর্শকেরও রসজ্ঞ হওয়া আবশ্যক, নতুবা সে-শিল্প সম্বন্ধে চর্চা তাঁহার ব্যর্থ। যদি তাঁহার মানসপটে ঐ চিত্রখানি সুপ্তভাবে না থাকে তবে কেবলমাত্র নয়নের তৃপ্তি সেখানে তিনি পাইবেন না।

যদি কোনও শিল্পীর চটুল কটাক্ষ আঁকিতে গিয়া খঞ্জন মনে পড়ে তবে তিনি চোখের রেখাসম্পাতে খঞ্জনের আভাস আনিয়া দিবেন। দর্শকের খঞ্জনের চপল গতির সহিত চটুল চাহনির গতির ধারণা থাকা চাই নতুবা তিনি ব্যর্থমনোরথ হইবেন।

আমাদের দেশের মন বোধিসত্ত্বকে দেখিবার জন্য যখনি অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করে তখনি দেখে বুদ্ধের ধ্যানসুন্দর মূর্তি। কতকালের কত তীব্র সাধনা তাঁহার শরীরকে যেন আগুনের মত দগ্ধ করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু সেই প্রশান্ত মুখচ্ছবি ললাটপটে সেই সংহত জ্ঞান-জ্যোতি —আনত নয়নেন্দীবর হইতে অশ্রান্ত করুণাধারা ঝরিয়া পড়িতেছে, তাঁহার শরীর কি তপঃক্লিষ্ট হইতে পারে? —তাই ভারতের সাধক-শিল্পী তাঁহার মূর্তি গড়িয়াছেন নবনীত সুকুমার দেহ দিয়া, অনুদ্গতশ্মশ্রু চারু-মুখ পদ্ম দিয়া —চির-কিশোরের রূপ দিয়া। কিন্তু অধ্যাপক ফার্গুসন প্রভৃতির অনুমানানুযায়ী গ্রীক্‌-প্রভাবে অনুপ্রাণিত যে গান্ধার শিল্পের সৃষ্টি বুদ্ধমূর্তি —তাহা মনকে উপেক্ষা করিয়া বস্তু লইয়া আছে তাই সে-মূর্তি কি বীভৎস! মস্তকের রুক্ষ কেশ জটাকারে বদ্ধ, চক্ষু কোটরাগত, ললাট ও মুখ শুষ্ক অস্থিবহুল ও শ্মশ্রুমণ্ডিত, বক্ষস্থলের

প্রত্যেকটি অস্থি দেখা যাইতেছে, তাহার উপর শিরা-উপশিরাগুলি জালের মত ছড়াইয়া আছে, উদর কুঞ্চিত ও মেরুদণ্ডের সহিত যুক্ত, হস্ত পদ মৃতের মত অসাড়! এই বুদ্ধমূর্তি কি প্রাণে অসীম শান্তি, অনন্ত করুণার আভাস জাগাইয়া তুলিতে পারে?

তাই বলিতেছিলাম—ভারতের শিল্প প্রাণবস্তুকে উপেক্ষা করিয়া প্রাণে প্রবেশ করে এবং সেখানে গোপন আছে যে রসের অরূপ সুন্দর মূর্তি তাহাকে বস্তুর আভাসমাত্র লইয়া প্রকাশ করে।

অজন্তায় কৌতুকাবহ ছবিও অনেক আছে যেমন—মাতাল পারসীক, গান-বাজনা, বানরের দৌরাত্ম্য ইত্যাদি। সেখানেও বহিরঙ্গকে যথাসম্ভব বাদ দিয়া অন্তরের কৌতুকের রসটিকেই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। বর্ণের দিকে দেখিতে গেলে যেখানে কেবল বর্ণবাহুল্যই প্রয়োজন—যেমন ছাতের ও স্তম্ভগুলির পুষ্প-পল্লবের ছবিতে—সেখানে অজস্র উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশে সে স্থানগুলি মহিমান্বিত। আজ কত শত শত বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্তু বর্ণের উজ্জ্বলতা একটুও ম্লান হয় নাই। সুতরাং ভারতের তৎকালীন শিল্পিগণ যে উজ্জ্বল বর্ণ প্রস্তুত করিতে জানিতেন না এমন নহে।

তারপর কতকাল পার হইয়া গিয়াছে। মুসলমান-যুগে আলেখ্য রচনাই বহুলপ্রচলন হইল, তাহাতে ভাব-মাধুর্যের আদর অনেক কমিয়া আসিল। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সেই আলেখ্য ও চিত্রের বিষয় যে ব্যক্তি, তাহার স্বভাব ফুটাইতে গিয়া পাশ্চাত্য anatomy-র অবমাননা করিয়া বসিয়াছে।—

ক্রমে বস্তু-বর্ণনার ঝোঁক আসিল, যেমন সরাইখানা, শোভাযাত্রা ইত্যাদি। তাহাতে অজন্তার ইত্যাদির চিত্রে যে perspective-এর সুসঙ্গত আভাসগুলি ছিল বর্ণনার ঝোঁকে বা মোহে তাহাও লুপ্ত হইল। তাহার সমসাময়িক কালের বা পরের রাজপুত-শিল্প একটা নাম মাত্র। তাহা মুসলমান-শিল্পেরই নামান্তর।

ক্রমে কতদিন আরও কতদিন পার হইয়া তবে আমরা এই বর্তমান-যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। শৈশব হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের জন্ম—আমরা পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত তাই আমাদের দেশের সাধনাজনিত যে রুচি তাহাও গুহাবাসী আনন্দের ন্যায় হৃদয়ের অজ্ঞাতদেশে লুপ্ত হইয়া

আছে। তাই ব্রীড়া মনে করিতেই হিমানীশুভ্র দেহের উপর রক্তগোলাপনিভ মুখখানি মূর্ছিত হইয়া পড়িতে দেখি —লুণ্ঠিতা মাধবীলতা দেখিতে পাই না। তাই ভারতীয় চিত্রের প্রাণের পরিচয় পাইবার পূর্বে ভারতীয় সাহিত্য ও মনের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত হইতে হইবে। এমন করিয়া আপন মনে রসের সন্ধান পাইলে তবে শিল্পীর শিল্প-বিষয়ে চর্চার অধিকারী হওয়া যায়। আচার্য দণ্ডীর কথায়—

'কৃশে কবিত্বেহপি জনা কৃতশ্রমাঃ
বিদগ্ধগোষ্ঠীষু বিহর্তুমীশতে ॥'

অজন্তা-গুহায় চিত্রদর্শনার্থী পথিকও হয়ত এই উপদেশই লাভ করে। প্রথমে গুহায় প্রবেশ করিলে অন্ধকারে কোন চিত্রই দৃষ্টিতে পড়ে না। তখন যে ফেরে সে বাহিরে আসিয়া বলে গুহায় কোনও চিত্র নাই। কিন্তু যে সহিষ্ণু,সে সেই অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে —তখন ধীরে ধীরে তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে থাকে সেই হৃদয়বিদারক 'ছদন্ত'-জাতক-কাহিনী। দূতের মুখে সেই অশ্রুজল চাহনি। শিথিল হস্তে ধৃত পাত্রের উপর ছদন্ত হস্তীর প্রেরিত ছয়টি শুভ্র দন্ত। পর্যটকের নিকট মূর্ছিত রাজ্ঞীর লুণ্ঠিত দেহলতা। মুখে তাঁহার মর্মন্তুদ অসীম বেদনার চিহ্ন —অধরোষ্ঠ যেন বিষপানে কুঞ্চিত বিবর্ণ. —যেন এইমাত্র হৃদয়ভেদী আর্তনাদ শব্দ মুখ দিয়া নির্গত হইয়া গেল। পশ্চাতে অশ্রুরুদ্ধ দৃষ্টিতে বাহু বাড়াইয়া তাঁহাকে আকস্মিক পতন হইতে রক্ষা করিতেছে।

অথবা গৃহদ্বারে ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধ দাঁড়াইয়া। —দুই শ্লথ হাত অঞ্জলিবদ্ধ তাহার উপর ভিক্ষাপাত্র। ভ্রূযুগলে তাঁহার অসীম শক্তি, চক্ষুতে পৃথিবীর বেদনাক্লিষ্ট নরনারীর জন্য অপরিসীম করুণা, পুষ্পদলের মত পেলব সুকুমার ওষ্ঠ-যুগল কি প্রীতিহাস্যে সমুজ্জ্বল —চরণযুগল পৃথিবীর বুকে ফুটিয়াছে যেন যুগপদ্মের মত —আর ঐ গৃহদ্বার দিয়া তরুণী জননী আসিতেছেন শিশুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া। শিশুটির মুখ সরলতার আধার, দেহ যেন নবনীতকোমল, চরণের সলজ্জ সম্ভ্রান্ত গতি কটিতে প্রকাশ পাইতেছে। আর মাতা দুই হাতে কাঁধে একটু মৃদু চাপ দিয়া যেন শিশুটিকে অগ্রসর করিয়া দিতে চাহিতেছেন —নইলে সলজ্জ শিশু যাইতে চাহে না। সেই হাত

দু-খানি দিয়াছেন যেন শিশুটিকেও দান করিতেছেন। মুখে তাঁহার মায়ের অসীম স্নেহ, চোখে তাঁহার তরুণীর সলজ্জ প্রীতি, সমস্ত দেহ শ্রদ্ধার ভারে অবনত।'—(অসমাপ্ত বা খণ্ডিত)।

এই প্রবন্ধটি ১৩২৮ সালের (১৯২১) হাতে-লেখা শারদীয় 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় সংকলিত হয়েছিল। পরে কোথাও মুদ্রিত হয়নি। এর পরে শ্রীহরিপদ রায়ের 'গথিক ও পারসীক চিত্রের সাদৃশ্য কোথায়' নামে আর একটি প্রবন্ধ ১৩২৯ সালের (১৯২২) বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সংকলিত হয়। এটিও এই সঙ্গে উদ্ধার করা গেল। শ্রীরায়ের এই প্রবন্ধটি অনুবাদ-ঘেঁষা। আচার্য নন্দলালের উৎসাহে সেকালের কলাভবনে ছাত্রদের শিল্পসাহিত্য-চর্চার বৃত্ত-পরিক্রমার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধটিও সংযোজিত হলো। এ ছাড়া, ১৩২৯ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যায় সংকলিত শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের 'মাদ্রাজ অভিযান' নামে ভ্রমণ-কাহিনীটিও তথ্যসমৃদ্ধ রচনা। উত্তরকালে কিন্তু শ্রীগুপ্ত যেমন একাধারে 'তুলি ও বুলি'-পটু হয়েছেন, শ্রীরায় তেমনটি হতে পারেননি।

॥ গথিক ও পারসীক চিত্রের সাদৃশ্য কোথায় ॥

চিত্রের উদ্ভব কেমন করিয়া হইল —বা কোন্ সময়ে হইল ইহা কোনও ইতিহাসই বলিতে পারে না। যখন মানবসমাজে ইতিহাসের জন্ম হইয়াছে তাহার বহু বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে সমস্ত কালের প্রান্তরটি নানা ঘটনা ও নানা চিন্তার পথরেখায় জালের মত ছাইয়া গিয়াছে। তাহার আরম্ভ হইল কবে —বা কেমন করিয়া, আর তাহা বুঝিবার জো নাই। তবে একটিমাত্র সুবিধা আছে, —সেটি হইল —চোখের সামনে যে বস্তুগুলি আছে তাহা বিচারের সাহায্যে তাহাদের একটি সাধারণ নিয়ম বা ক্রম ঠিক্ করিয়া লইয়া তাহার সাহায্যে সেই বস্তুগুলি সাজাইয়া তাহার পারম্পর্য স্থির করা।

গথিক ও পারসীক চিত্র কবে প্রথম জন্মলাভ করিল তাহা বলা ইতিহাসের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে আজ সেই দুই প্রকার চিত্রই আমাদের চোখের সম্মুখে আছে —তাহার মধ্যে সামান্য একটু সাদৃশ্যও আছে — কিন্তু সেই সাদৃশ্যের জন্য কোনো একটি অপর কোনোটির জন্য দায়ী কি না তাহা বলা দুষ্কর। তবে দুইটিরই যথাসম্ভব প্রথম হইতে পর্যবেক্ষণ

করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের গতি ও ভাবের যে সাদৃশ্য আছে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে।

যে-কালের চিত্রকে আমরা প্রকৃত গথিক বলিয়া চিনিতে পারি প্রায় সেই সময় হইতেই আমাদের চোখে পড়ে ক্রমাগত নয়টি ক্রুজেড্ বা ধর্মযুদ্ধ। এই ক্রুজেড্‌গুলির মুখ্য ফল দুইটি —একটী কখনো পোপ্, কখনো জর্মন সম্রাট্, কখনো বা ফ্রেঞ্চ সম্রাট্, কখনো বা ইংরেজরাজের অধিনায়কত্বে এই ধর্মযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হওয়ায় সকল জাতিই মিলিতভাবে কোনো-না-কোনো একটি জাতির কাছে সাময়িক নতিস্বীকার করিয়াছে। অন্য কোনও প্রয়োজনের খাতিরে নতিস্বীকার করিলেও, তাহাদের অজ্ঞাতসারে আপনাদিগের মধ্যেও অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে সভ্যতার, ভাবের ও আচার-আচরণের অনেক আদান-প্রদান হইয়া গিয়াছে। জ্ঞাতসারে হইলে কোনমতেই একে অন্যের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিত না। আর্টের আরেকটি বিশেষত্ব এই যে জ্ঞাতসারে ইহাকে কেহ গ্রহণ বা দান করিতে পারে না। যে যখন পায় তাহাকে নিজের বলিয়াই পায় ও জানে।

ক্রুজেডের দ্বিতীয় ফল হইতেছে বারে বারে এশিয়ার সংস্পর্শে আসা। তাহারা যুদ্ধ করিতে আসিত; সুতরাং সুকুমার-কলাকে প্রীতির ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইবার সময় কম। তাই বার বার নয় বার তাহারা আসিয়াছে আর্টের গতি ও চরিতার্থতাকে সাহায্য করিতে। স্মৃতির একটি নিয়ম আছে —সে কোনো একটি বস্তুর ছাপ নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইলে হয়তো একবারে অনেকক্ষণ সময় লয়, নতুবা বারে বারে একটি বস্তুর ছাপ লইয়া প্রকৃতিটি নিজের মধ্যে পরিস্ফুট করিয়া লয়। বারে বারে ক্রুজেডের ফলে সমস্ত জাতির স্মৃতিতে ধীরে ধীরে এশিয়ার নানা সুকুমার-কলার ছাপ স্পষ্টাঙ্কিত ও দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গেল। ক্রুজেডে আগ্রহও নেহাৎ সোজা ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে ধর্মযুদ্ধ আহ্বান করা হয় তাহাতে সমস্ত ইয়োরোপখণ্ড হইতে পঁয়ত্রিশ হাজার শিশু সংগ্রহ করিয়া এই অত্যাশ্চর্য শিশুবাহিনী দ্বারা জেরুজালম-তীর্থ-জয়ের অভিযান করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই শিশুরা আর তাহাদের মায়ের বুকে ফেরে নাই। —এমন তীব্র যাহাদের আকাঙ্ক্ষা তাহাদের উপর কোন সুন্দর সুন্দর

বস্তুর ছাপ পড়িলে তাহা শীঘ্র নষ্ট হয় না।

ছাপ যাহাই হউক না কেন —ক্রুজেডের পর হইতেই ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও culture-এর উপর অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হয়।

এদিকে ক্রুজেডের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে একদল কলাগুরু (সম্ভবতঃ যুদ্ধের ফেরৎ) আপনারা স্বতন্ত্র কুটির নির্মাণ করিয়া তাহাতে কয়েকটী করিয়া ছাত্র লইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা সেই সব ছাত্রদিগকে ধর্মমন্দিরের স্থাপত্য হইতে আরম্ভ করিয়া ভাস্কর্য, ভিত্তিচিত্র, এমন-কি দীপ-নির্মাণ পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা দিতেন। প্রত্যেক গুরুরই কলাকৌশল পৃথক ছিল —কিন্তু সকলের প্রস্তুত মন্দির দেখিলে তাহার মধ্যে অধিকাংশ জিনিসই প্রয়োজন ও ভাবের ঐক্যবশতঃ প্রায় এক হইয়া দাঁড়ায়। ইহার সহিত ভারতবর্ষের ছাত্রদিগের গুরুগৃহে বাস ও তাহাতে ক্রমে নানা শাখা একই ধর্মকে আশ্রয় করিয়া নানা আচার-অনুষ্ঠান ও নানা মতের তুলনা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ গথিক মন্দিরে যখন দুইপার্শ্বে সমতল ভিত্তির স্থান ছিল তখন সেই সমতল স্থানগুলিকে ভিত্তিচিত্র দ্বারা মণ্ডিত করা হইত। বৌদ্ধযুগের ন্যায় এই চিত্রগুলিও কেবলমাত্র যিশুখৃস্টের জীবনের নানা কাহিনীই বর্ণনা করিত। মাঝে মাঝে খৃস্টের ভক্ত অনেক প্রেরিত পুরুষের কল্পিত প্রতিকৃতিও অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগকে প্রায়ই অনন্ত এবং অপূর্ব-সুন্দর আলোকের মাঝখানে দাঁড় করাইতে গিয়া পৃষ্ঠভূমি (background) উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করা হইয়াছে। তখন মন্দিরের মধ্যে আলোক-প্রবেশ-পথ কম থাকাতে এই স্বর্ণপটগুলি সমস্ত আলোক টানিয়া লইয়া আগুনের মত জ্বলিত। —পরে ক্রমে ভিত্তি উঠিয়া গিয়া সেইস্থানে স্তম্ভ বসিতে আরম্ভ করিল। ভিতরে যেমন মাটির পরম্পরা স্তম্ভ, দুই পার্শ্বের ভিত্তিতে তেমনি স্তম্ভ ও মাঝে মাঝে স্তম্ভের নক্সায় জালিকাটা জানালা হইতে আরম্ভ করিল। তাহাতে কিছুদিন চিত্র প্রায় মন্দির হইতে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়। যাহা দু-একটি থাকিত তাহাও পড়িত দুইদিকে দুইটি স্তম্ভ ও উপরে একটি নানাবর্ণে রঞ্জিত কাঁচের জানালা এই তিনের মাঝখানে। তাই অনেক শিল্পগুরু ওখানে চিত্র রাখা অযৌক্তিক বিবেচনা করায় সেখানে পারস্য দেশ হইতে আনীত নানা সুন্দর সূচিকার্য-করা কাপড়

ঝুলাইয়া রাখা হইত।

পরে যে সমস্ত মন্দিরের মোহান্তগণ অধিক ব্যয় করিতে অসমর্থ হইতেন তাঁহারা তাঁহাদের মন্দির অত কারুকার্য-করা নানা মূর্তি উৎকীর্ণ-স্তম্ভে সাজাইয়া তুলিতে পারিতেন না। তাঁহারা পূর্বের ন্যায় দুইদিকে সমতল ভিত্তি নির্মাণ করাইয়া পরে তাহা পারসীক সূচিকর্মমণ্ডিত বস্ত্রদ্বারা আবৃত করাইয়া লইতেন। ক্রমে এই পারসীক আলঙ্করিক চিত্রের (decorative design) ঠনঠ্ (composition) গথিক চিত্রের পৃষ্ঠভূমি (background) পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। —তখন চিত্রের স্থানের বিস্তৃতি (space) কেবলমাত্র জনতার ঘনত্ব (depth) ও দুই একটি বস্তুর পারিপ্রেক্ষিক (perspective) হইতে বুঝিয়া লইতে হইত। কিন্তু আলঙ্কারিক চিত্রের উপর যতই পারিপ্রেক্ষিক চাপানো যাউক না কেন তাহা আসিয়া বর্ণিত বস্তুকে চাপিয়া ধরিবেই। —এই চাপিয়া ধরা ভাবটিই শেষে ইতালিতে বিকৃত হইয়া তাহা কাষ্ঠফলকের উপর ঢালাই করা সোনার পাতে রূপান্তরিত হয়। তখন কাঠের উপর ছবি আঁকিয়া কেবলমাত্র মূর্তিগুলিকে বাদ দিয়া আর সব স্থান সোনা ঢালাই করিয়া ভরান হইত। পরে সময়ে সময়ে সেই সোনার পাতে আবার নানা মণিরত্ন বসাইয়া সাজানো হইত। তাহাতে চিত্র জিনিসটি প্রায়ই স্বর্ণরত্নে ঢাকা পড়িত।

পরে, গথিক চিত্রে যখন জনতার পরিবর্তে দু-টি একটি মানুষ আসিয়া দেখা দিতে লাগিল — তখন পৃষ্ঠভূমি সোনার পাতের উপর নীল অথবা অনুরূপ অন্য কোনও বর্ণের আলঙ্কারিক চিত্রে ঢাকা থাকিত। তাহাতে অগ্রভূমি (fore-ground) ও পৃষ্ঠভূমির মাঝখানে একটি সমতল রেখা টানা হইয়া পড়িত।

আরো অনেক পরে যখন পৃষ্ঠভূমিতে নৈসর্গিক দৃশ্য আসিতে আরম্ভ করিল তখনো প্রতিকৃতির পশ্চাতে অন্ততঃ খানিকটা স্থান একটু দেওয়ালের মত করিয়া তাহাতে আলঙ্কারিক চিত্র দেওয়া হইত।

তাহারো পরে, প্রায় আনুষ্ঠানিক যুগে অনেক গথিক প্রতিকৃতিতে (portrait)-এ পৃষ্ঠভূমি পারসীক সূচিকার্যের অনুকরণে সাজানো হয়।

কিন্তু এসমস্ত একপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়া দিলেও মধ্যযুগেব দুইখানি

গথিক চিত্র এই নিয়মে ব্যাখ্যা করা কঠিন হইয়া উঠে। একখানিই উরোপে প্রসিদ্ধ —প্রেমোদ্যানে জননী মেরী (Mary in the love garden), অপরটি দক্ষিণ ফরাসী দেশে এভিনয়ে (Avignon-এ) রক্ষিত একখানি নৈসর্গিক দৃশ্য। ইহার মধ্যেও প্রথমটি ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীর অঙ্কিত পারসী কপ্রথায় অনুপ্রাণিত চিত্র বলিয়া শেষ করিলেও শেষোক্তটিকে লইয়া একটু গোলে পড়িতে হয়। তবে এভিনয়ের চিত্রটি সম্বন্ধে একটু কথা আছে। এভিনয়ের বিশপ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী লোক ছিলেন। তিনি ধনবলে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে শিল্পী আনাইয়া আপন দেবমন্দির সাজাইয়াছিলেন। এই কথাটিতে সাহস করিয়া বলা চলে যে, সে-চিত্রখানি পারসীক শিল্পীদ্বারা অঙ্কিত। এই কথাটি সাহস করিয়া বলিবার অন্য একটি কারণও আছে —সে ছবিখানি কোনও ধর্ম-আখ্যায়িকা বর্ণনা করিবার জন্য নহে।

এখন পারসীক চিত্র সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিয়া 'প্রেমোদ্যানে মাতা মেরী' ছবিখানি সেই সঙ্গে বলিবার চেষ্টা করিব।

পারসীক চিত্রে ইতিহাস সম্বন্ধে বলা চলে আরও অনেক কম। পারসীক শিল্প দেখিতে গেলে প্রথমতঃ একটা জিনিস চোখে পড়ে। সেটা চিত্রের ও কার্পেটের সূচিশিল্পের যোগ। পারসীক চিত্রে অলঙ্কারের ভাগই বেশি তাহার লতাপাতা তৃণ এমন-কি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পুষ্পটি পর্যন্ত সমান যত্নে মিনার কাজে আঁকা। মানবদেহের ভঙ্গিতেও সেই অলঙ্কারের ভাবটাই ধরা পড়ে। পারসীক চিত্রে অলঙ্কার যতই পরিস্ফুট হইয়াছে পারসীক গালিচা ও অন্যান্য বস্ত্রও ততই আলঙ্কারিক চিত্র-সুষমায় ভরিয়া উঠিয়াছে। এই ঝোঁকের বশে সেখানে পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি চিত্রের ক্ষুদ্র অঙ্গগুলি আরও ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে।

গথিক চিত্রে 'প্রেমোদ্যানে জননী মেরী' চিত্রখানিতে সমস্ত চিত্রফলক আলঙ্কারিক ও পরিস্ফুট detail-এ পূর্ণ। অগ্র ও পৃষ্ঠভূমির সংযোগস্থলটি কৌশলে একটি প্রাচীরের সাহায্যে ভিন্ন এবং তিন চারিটি বৃক্ষের সাহায্যে প্রাচীরের একঘেয়ে ভাব (monotony) ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। জননী মেরীর এক পার্শ্বে একটি ষট্‌কোণ মেজ। তাহাতে পরিপ্রেক্ষিত বলিয়া একটা জিনিস যাহা তৎকালীন বা তৎপূর্বকালীন গথিক চিত্রে প্রচুর ও পরিমাণেও সূক্ষ্ম নিরিখের হিসাবে দেওয়া গিয়াছে, যাহা একেবারেই

নাই। এই ছবিখানি কোনও ইউরোপীয় শিল্পীর অঙ্কিত হইলে তিনি যে পারসীক প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্ততঃ ঐ ছবিখানি আঁকিয়াছেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ করা চলে না।

সর্বশেষে গথিক ও পারসীক দুই চিত্রশিল্পের মধ্যেই একটি বিষয় সাধারণ বলিয়া চোখে পড়ে। সেটি চিত্রে অঙ্কিত ব্যক্তির মুখ পৃষ্ঠভূমির আলঙ্কারিক চিত্রাবলী হইতে পৃথক করিবার নিমিত্ত মুখের চতুর্দিক মাস্তুলাকারে একটি জ্যোতির্লেখা। পারসীক চিত্রে তাহা চিরকালই সমতল ও একবর্ণ হইলেও গথিক চিত্রে কিছুদিন তাহা নানা কারুকার্যভূষিত একখানি সোনার থালার মতো করা হইত। পরে আবার তাহা ত্যাগ করিয়া পূর্ববৎ সমতল করা হয়। সম্ভবতঃ এই জিনিসটি দুই দিকেরই একই প্রকার প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু গথিকশিল্পে পূর্বে সমতল রাখিয়া মধ্যে একবার কারুকার্য করিয়া দেখিয়া পরে ভুল দেখিতে পাইয়া ভুল সংশোধন করিয়া আবার পূর্বের ন্যায় সমতল করাতে, এবং পারসীক চিত্রে ঐ স্থানটি চির-দিনই একরকম রাখাতে —এ-বিষয়ে ভাবিতে গেলে মন হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠে। পারসীক চিত্র যখন ভারতবর্ষে আসে তখনকার দু-একখানি ছবির মধ্যে একখানি ছবির নামোল্লেখ করা চলে —সেখানি সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রতিকৃতি। ইহারও পৃষ্ঠভূমি পারসীক গালিচার আলঙ্কারিক নক্সায় পূর্ণ কিন্তু প্রতিকৃতির মস্তকটি একটি স্নিগ্ধ শ্যামল বর্ণের ডিম্বাকৃতি জ্যোতিলেখা দ্বারা বেষ্টিত। ভারতবর্ষে আসিয়াও ইহার কিছুমাত্র বিকৃতি হয় নাই। এক স্থানে বিকৃত হওয়ার পর সংশোধিত হইয়াছে, অন্যত্র তাহার কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটে নাই, ইহাতে জ্যোতিলে'খা পদার্থটিই পারসীক বলিয়া মনে হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। তবে জোর করিয়া কিছু বলা চলে না —কারণ সকলেরই প্রয়োজন একরকম ছিল —তাহাতেই ঐ জিনিসটির উৎপত্তি। কেহ হয়তো একেবারেই ঠিক্ বুঝিয়া লইলেন —কাহারো হয়তো বুঝিতে একবার ভুল হইল, তিনি পুনরায় ভুল সংশোধন করিলেন।

সকলেই দেখিয়াছি অন্যের প্রভাব স্বীকার করিতে ইতস্তত করেন। স্বীকার করিলে ক্ষতি কি? প্রভাব লইয়া ত বিচার নয়, বিচার চলে ভাব ও তাহার প্রকাশের ক্ষমতা ও চাতুর্য লইয়া।

॥ আনন্দ কুমারস্বামীর 'আর্ট ও স্বদেশী'-চিন্তা ও নন্দলাল ॥

একদা হ্যাভেল সাহেব ও সিস্টার নিবেদিতা বাঙ্গালার তাঁতশিল্পের সঙ্গে আর্টের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিয়েছিলেন। গান্ধীজি চরকায় সূতা-কাটা কংগ্রেসের নীতিরূপে গ্রহণ করলেন। শান্তিনিকেতনে মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ বললেন, চরকা হচ্ছে thin end of the wedge ; এই খুঁটোয় দেশের ছোট-বড়ো সকলকে মিলিয়ে কাজ শুরু করা হোক্। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর কলাভবনের অধ্যক্ষ শিল্পাচার্য নন্দলাল চরকায় মনোযোগ দিলেন। তিনি ভাবলেন, চরকা আমাদের ভারতবর্ষের স্বরাজের একমাত্র সোপান না-হোক্ একটি সোপান বটে। এই সময়ে তিনি আনন্দ কুমারস্বামীর স্বদেশী-শিল্প-চিন্তায় অবহিত হলেন বিশেষভাবে। কুমারস্বামী বলেছিলেন,—

'স্বদেশী' রাজনীতির অস্ত্র নয়। এ হলো ভারত-ধর্মের পত্রপুটে বিশেষ শিল্পাদর্শ। ভারতশিল্পকে অন্তর দিয়ে জেনে তাকে ভালোবেসে থাকলে, আমাদের আজ বোঝা উচিত, এখনও ভারতের কারুশিল্পিগোষ্ঠী সুযোগ পেলে আমাদের জন্যে সব-কিছু তৈরি করতে পারে, শোভন অঙ্গাবরণে আমাদের সাজাতে পারে, অঢেল টাকা ঢাললেও আধুনিক য়ুরোপের পক্ষে এ সম্ভব নয়। কুমারস্বামী সেইজন্যে ধনীদের বলেছিলেন, আড়াই শো টাকা দিয়ে স্বদেশী রঙ্গে ছাপানো বেনারসী শাড়ী কিনে টাকার সদ্ব্যবহার করতে ; কারণ, এই টাকার মধ্যে দু-শো টাকাই দেওয়া হবে রং আর ছাপার জন্যে স্বদেশী কারিগরদের। নিব্ বা কাপড় তৈরির স্বদেশী-কারখানায় টাকা ঢাললে লাভ পাওয়া যাবে বটে প্রচুর, কিন্তু স্বদেশীর জন্যে ত্যাগ স্বীকার হবে না তাতে কিছুই। কেবল রাজনীতি বা অর্থনীতির মাধ্যমে ভারত পুনর্জীবিত হতে পারে না ; পারে কেবল তার শিল্পাদর্শকে জাগিয়ে তুলে। এই বিষয়ে কুমারস্বামী হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে ছিলেন একমত।

জাতীয় শক্তির অপচয় কতখানি হচ্ছে, আমাদের গ্রামের তাঁতীদের দেখলেই বোঝা যাবে। ভারতীয় রং আর নক্সা আমরা এখন বুঝি না, ভালোবাসি না ; ফলে, তাঁতীদের জীবিকা গেছে। তারা এখন চাষীদের সঙ্গে ক্ষেতে নেমেছে। হাতের তৈরি কারুকলা বা ব্যক্তিগত ফুলকারির কাজ যে উন্নততর সে বোধ আমরা হারাচ্ছি, আর সেইজন্যেই গ্রামের

তাঁতীদের বা তাঁতশিল্পের প্রতি আমরা উদাসীন থেকে, কল-কারখানায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে ভারতে ম্যাঞ্চেস্টার আমদানি করার চেষ্টায় লেগেছি। মীর্জাপুরী কার্পেটের এখন আর কদর নাই। আমাদের শিল্পরুচির অভাবেই কারুশিল্পীদের এই দুর্গতি। আমাদের শিল্পবোধ উদ্বুদ্ধ না-হলে ভারতীয় কারুশিল্প পুনর্জীবিত হতে পারে না। সস্তার জন্যে য়ুরোপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারা যাবে না। পাল্লা দিতে হবে গুণগত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে। কেবল সস্তার পণ্য চাওয়া ভারতীয় মনের ধর্ম নয়; কারণ, শিল্পবিহীন শ্রম হলো পাশবিকতা। আমাদের মন সে স্তর ছাড়িয়ে উঠেছিল।

আসল 'স্বদেশী' হচ্ছে এক প্রকারের জীবনদর্শন। মূলতঃ এ হলো আন্তরিকতা। মন আর মুখ এক করাই হচ্ছে জীবনশিল্প। ফলে দেখা যাবে, আমাদের প্রাচীন সভ্যতা যতখানি আধ্যাত্মিক ততখানি শ্রম বা বস্তুতান্ত্রিক। এই আদর্শ গ্রহণ করলে তবে দূর হবে আমাদের আজকের দিনের কুরুচি আর পরগাছামি।

পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদের শিল্পরুচি বিকৃত হয়ে গেছে। আমাদের রূপদর্শী আর মধ্যযুগের সংস্কৃতি আমরা প্রায় ভুলে গেছি। ভারতবর্ষ পুনর্জীবিত হতে পারে শিল্পরুচির মাধ্যমে, কেবল রাজনীতি আর অর্থনীতির চর্চার দ্বারা নয়। আমাদের সৃজনী শক্তি নির্জীব হয়ে পড়েছে, আমরা আত্মবিশ্বাস হারিয়েছি। আমরা আমাদের দেশকে বার্মিংহাম আর প্যারিসের পরগাছা করে তুলতে চাচ্ছি। কিন্তু এটা হলো ভুল পথ।

আমাদের জাতীয় জীবন পুনর্গঠন করতে হলে জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন। আমাদের দেশের কারুশিল্পিগোষ্ঠীকে ডাক দিয়ে আনতে হবে। আমরা ভারতীয় হয়ে ভারতীয় কারুশিল্পীদের বয়কট করতে পারি না। এই বিষয়ে লর্ড কার্জনের ভ্রান্তপথ প্রদর্শনে আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই। জর্জ বার্ড্উডের ধারণা মতো, আমাদের ভারতশিল্প প্রকৃত 'ভারতশিল্প' হয় যেন; সে য়ুরোপীয় শিল্পকলার ব্যর্থ অনুকরণ না হলেই মঙ্গল। কুমারস্বামী বুঝেছিলেন দশ বছরের মধ্যে ভারতশিল্প পরগাছামি থেকে আত্মনির্ভর হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু বর্তমানের যে শিক্ষাধারা বা সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা সে যেন আমাদের ভারতীয় পরম্পরাকে অবজ্ঞা করেই চলেছে। তিনি বলেন,

যুক্তপ্রদেশে যে ভারতীয় শিল্পপ্রদর্শনী হয়েছিল (১৯১০) তাতে 'ভারতীয়' বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। সেই প্রদর্শনীতে ভারতশিল্পের উল্লেখযোগ্য বস্তুও বিশেষ কিছু দেখানো হয়নি।

আধুনিক ভারতীয় স্থাপত্য —সে গৃহস্থবাড়ি বা রাজপ্রাসাদ যাই হোক তাতেও বিদেশী ঢেউ এসে পৌঁচেছে। বেশির ভাগ আধুনিক বাড়িই হলো খামার-বাড়ি আর সরকারী ব্যারাকের জগাখিচুড়ি। য়ুরোপীয় স্থাপত্য হলো যাবতীয় স্থাপত্যবিধি, অলঙ্করণ আর সমতাবোধের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা। আধুনিক ভারতীয় স্থাপত্যেও সুষম ভারতশিল্পের সুষমা বিবর্জন করা হচ্ছে। কুমারস্বামী স্বদেশী রাজনীতিকদের অনুরোধ করেছিলেন, তাঁরা যেন দাবী করেন, সরকারী বাড়িঘর ভারতীয় পদ্ধতিতে তৈরি করতে হবে। তার ফলে, ভারতীয় কারুশিল্পীদের অন্নসংস্থানের সুরাহা হতে পারবে। ভারতের কোনো কোনো দেশীয় রাজ্যে ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পকেই কাজে লাগানো হয়েছে। এই বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম বরোদা। [কিন্তু বরোদা-প্রাসাদের স্থাপত্য-রীতি পাশ্চাত্যভাবাপন্ন এবং ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যকে অশ্রদ্ধা করে থাকলেও, আমরা পরে দেখবো, ১৯৪২-৪৩ সাল পর্যন্ত ভারতশিল্পের মুখপাত্র আচার্য নন্দলাল আহূত হয়ে, সদলে বরোদায় গিয়ে 'কীর্তি-মন্দিরে' ফ্রেস্কো নির্মাণ করে এসেছিলেন। যথাসময়ে সে-আলোচনা করা যাবে।]

এখনও ভারতের সর্বত্র পুরুষপরম্পরায় কারুশিল্পিগণ তাদের নিজস্ব ধারায় কাজ করে চলেছে। এখনও ভারতের পরম্পরাগত স্থপতিরা বেঁচে রয়েছে ; কিন্তু তারা খেতে পায় না, কারণ তাদের আমরা উপেক্ষা করছি। তারা তাদের কাজ না পেয়ে চাষবাস বা অন্য বৃত্তি ধরছে।

পাশ্চাত্য-পদ্ধতিতে তৈরি বাড়িতে বাস করলে ঘর সাজাতে আর আদবকায়দা করতেও পাশ্চাত্য ঢং-ই মনে উদয় হবে। ফলে, পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আমরা আপন জিনিস হারিয়ে ফেলবো। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন সভ্য ছিলেন, তখন য়ুরোপের লোকেরা গাছের ছাল পড়ে আদিম-জীবন যাপন করতো। কিন্তু কুমারস্বামী এ-কথা মানেননি। তিনি বলেছিলেন, প্রাচীন কেল্টিক বা টিউটনিক য়ুরোপ খুবই উন্নত ছিল। বিশেষতঃ সৃজনধর্মী ও কাল্পনিক শিল্পসৃষ্টিতে। কুমারস্বামী বলতে চেয়েছেন, সে যাই হোক্, আমরা পরানুকরণ

করবো না, সে স্বদেশী ফ্যাক্টরি বানিয়েই হোক্ কিংবা আমাদের ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কেই হোক্। আমরা য়োরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ করতে গেলেই, আপন সমাজে ও শিল্পে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো এবং সমগ্র জগৎ আমাদের উপেক্ষা করবে।

মাত্র বারাণসীতে নয়, সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে শিল্প-নিদর্শনের উদ্ভাবনা করা হয়েছিল সে-সব এখন পরিত্যক্ত হচ্ছে। এবং সে সব আদর্শ রূপকল্পনা বর্তমানের মেকো জিনিস দিয়ে ভরানো হচ্ছে। এখন ভারতবর্ষের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ রৌপ্য-শিল্পীর দোকানে পাওয়া যাবে য়ুরোপীয় কারখানার প্যাটার্ন-বই। এবং বিলাতী আদর্শে তাদের ছবি জিনিস পছন্দ না-হলে ফিরতে হবে বিলেতে। আমরা জানি, বিদেশী শিল্পের স্বদেশী-অনুকরণও কখনো নিখুঁত হতে পারে না। কুমারস্বামী বলেন, 'স্বদেশী' বলতে আমরা এখন যেন বুঝছি, য়ুরোপীয় শিল্পবস্তুকে আমাদের দেশে যথাযথভাবে উৎপন্ন, আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবনকে পাশ্চাত্য রং দেওয়া আর, আমাদের জীবন যাত্রার মানকে নামিয়ে আনা।

হিন্দু বা মোগল সভ্যতার যুগে দেখা যায়, দরিদ্রতম লোক যে সজ্জা ও সৌন্দর্যবিহীন পরিবেশ অপছন্দ করতো, আমরা আধুনিক হয়ে সেই বিশ্রী অথচ ব্যয়বহুল পরিবেশকেও স্বাগত জানাচ্ছি। বারাণসীর তাঁতীদের কাজ খুব উত্তম। বারাণসীর কিংখাব সুপরিচিত। তার জন্যে এখন জরি ভারতে আমদানি হয় বিদেশ থেকে। কিন্তু সাবেকের হাতের তৈরি জরি তার চেয়ে অনেক ভালো। ভারতে শিল্পরুচিসম্মত তাঁতশিল্পের মান অনেক নেমে গেছে। এই সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা রঙের মৌলিক উপাদান Aniline আমদানির কথাও বলতে হয়। এক্ষেত্রে আসল ব্যাপারটা হলো গাঁটের কড়ি খরচ করে নিজের কারুশিল্পকে ধ্বংস করা। —ভারতশিল্প আমরা বুঝি না বলে এই অবজ্ঞা, এটা ঠিক নয়। কুমারস্বামী জোর দিয়ে বলেছেন, ভারতীয় কারুশিল্পীদের বয়কট করছেন ভারতীয়েরাই। কিন্তু প্রকৃত 'স্বদেশী' এ নয়।

প্রকৃত স্বদেশী হচ্ছে, আমাদের গ্রামের কারুশিল্পী আর দক্ষ স্থপতিদের জীবন-মান বজায় রাখা। আমরা যদি আমাদের দেশের লোকদের মানুষ

বলে গ্রাহ্য করি তাহলে তাদের মূল্য স্বীকার করতেই হবে। কুমারস্বামীর মতে, এই হলো খাঁটি স্বদেশী-চিন্তা। আর মিথ্যা স্বদেশী হলো, স্বদেশের কারুশিল্পীদের কলকারখানায় টেনে আনা। সেখানে তারা মদ খাবে, চরিত্র নষ্ট করবে ইত্যাদি। সুতরাং আসল স্বদেশী হলো in restoring the status and the prosperity of the skilled artizan and the village craftsman. এই কারুশিল্পীদের মাধ্যমেই আমাদের জাতীয় আদর্শবাদ বেঁচে থাকবে। আর আমাদেরও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যে এই কারুশিল্পীদের সহযোগিতা অপরিহার্য করে তোলা আবশ্যক।

মনীষী কুমারস্বামী আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে কুটির-জাত কারুশিল্পের যে সম্পর্ক দেখিয়ে গেছেন সে-ও বিশেষভাবে ভেবে দেখবার বিষয়। তিনি বলেছিলেন, এমন দিন ছিল, যখন আমাদের সব কারুশিল্পই ছিল ঘরোয়া। এখনও আমাদের সেই দিকেই মুখ ফেরানো দরকার। জালির কাজ, এনামেলের কাজ বা বই-বাঁধার কাজ তিনি তত পছন্দ করতেন না, খুচরো কাজ ভেবে। কিন্তু স্বর্ণশিল্প, রৌপ্যশিল্প ইত্যাদি আমাদের অন্দর-মহলের সঙ্গে যুক্ত, সুতরাং আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আধুনিক জীবনে অন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা সবাই অশান্ত হয়ে উঠেছি। এর হেতু হলো কুঁড়েমি। তিনি বলেছেন, —thought is stimulated by rhythmic (but not unintelligent) labour। কারুশিল্পে শিল্পীর চিন্তা উদ্দীপ্ত হয় ছন্দোময় কর্মের মাধ্যমে। এখন আমাদের প্রয়োজন, এই কারুশিল্পীদের শক্তিকে কাজে লাগানো, তার অপব্যবহার না করা।

১৯০১ সালে ফলিত রসায়নের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। এই সময়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় Aniline Dyes সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন। কুমারস্বামী প্রবন্ধটি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে আচার্য রায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কুমারস্বামী বলেন, যে-সব জিনিসকে রঙানো হবে সেগুলিকে সুন্দর করাই এর উদ্দেশ্য। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে রঙের গূঢ় তাৎপর্যটি বুঝে নিয়ে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। এই সব প্রাকৃতিক রঞ্জন-দ্রব্যের চেয়ে ব্যবসায়ীরা ভালো রং তৈরি করতে পারে না। কারখানার রং

প্রকৃতির রঙের চেয়ে সুন্দর হয় না। জগতের যাবতীয় শিল্পী যাঁদের রঙের সম্পর্কে জ্ঞান টনটনে, তাঁরা এই কারখানা থেকে তৈরি Aniline Dyes পছন্দ করেন না। তাঁদের মতে, এ হলো মোটা আর জাকাঁলো আর এ -সব রং টেকসইও হয় না। যখন ফ্যাকাশে হয়, দেখতে হয় কুৎসিত ; কিন্তু আমাদের দেশের পুরোনো কালের রং বিবর্ণ হয়, কিন্তু দীর্ঘকাল টিকে থাকে। জার্মানি থেকে আমদানি করা রং আমাদের দেশের রংকে একেবারে কোণঠাসা করে দিয়েছে। কুমারস্বামীর মতে, আমাদের দেশের রাসায়নিকদের কাছে স্বদেশী রঙের উপকরণ অন্ততঃ পাঁচ-শো রকমের রয়েছে। তা থেকে রং তৈরি করলে অসংখ্য বিচিত্র রঙে ভারতের বাজার ভাসিয়ে দেওয়া যায়।

রঙের ব্যবহারে প্রাচ্য জাতির অভিজ্ঞতা অসাধারণ। সাউথ কেন্‌সিংটন-মাজিয়মে গেলে পারস্য, ভারত, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কাম্বোডিয়া এবং প্রশান্ত মহাসমুদ্রের অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিবৃন্দের 'প্রাকৃতিক' রঙের উৎপাদনের আর তার ব্যবহারের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে। এর মধ্যে বেশির ভাগ কাজই আমাদের সমান, কোনো কোনো দিকে বরং নিকৃষ্ট।

কুমারস্বামী বলেছেন, অধ্যাপক রায় নিজে The History of Hindu Chemistry নামে দু-খণ্ড বই লিখে স্বদেশের জন্যে অমূল্য কাজ করেছেন। কিন্তু এ-বিষয়ে কাজ আরও করবার আছে। এবং সে-কাজে যদি আমরা লেগে থাকতে পারি তাহলে ভারতের চারু ও কারুশিল্প নতুনভাবে প্রেরণা লাভ করবে। কুমারস্বামীর এই ভাবনা অনুসরণ করে আচার্য নন্দলাল সারা জীবন ধরে স্বদেশী কারুশিল্পীদের ডাক দিয়েছিলেন আর বহু স্বদেশী রঙের সন্ধান করে গেছেন তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের মতো। কুমারস্বামী বলেছিলেন, —The true work of schools of Art in India to-day, is to gather up and revitalise the broken threads of Indian traditions। নন্দলাল মনেপ্রাণে এই বাণীর বাহক।

॥ আশ্রম-পরিবেশে নন্দলাল—১৯২৫

১৩৩১ সালের চৈত্র মাসের সংবাদে দেখা যাচ্ছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে আশ্রমে একদিন অনধ্যায় ছিল। ঐ দিন সকালে মন্দিরে উপাসনা আর সন্ধ্যায় একটি সভা হয়েছিল। সভায় রামানন্দবাবু, নেপাল বাবু আর এণ্ড্রুজ সাহেব জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা করেন।

এর মধ্যে নেপালবাবু আর ফণীবাবু উত্তর-বিভাগের ও পূর্ব-বিভাগের কয়েকটি ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ, পলাশী ঘুরে এলেন।

বৈশাখ, ১৩৩২। বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। দু-দিনই গুরুদেব মন্দিরে উপাসনা করেছিলেন। বিশ্বভারতীর অনেক সভ্য যাঁরা পরিষদ উপলক্ষ্যে এখানে এসেছিলেন তাঁরাও উৎসবে যোগদান করেছিলেন। নববর্ষের দিন মন্দিরের পরে আম্রকুঞ্জে আশ্রমবাসী সকলের জন্যে এবং সমাগত অতিথিগণের জন্যে জলযোগের আয়োজন করা হয়েছিল।

বর্ষশেষের দিন রাত্রে উত্তরায়ণে গুরুদেবের বাড়িতে 'সুন্দর' নামক একটি গীতিনাট্য অভিনয় করা হয়। সবশুদ্ধ তেরটি গান অভিনয় করে গাওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ১১টি গানই ছিল সম্পূর্ণ নূতন। আশ্রমবাসী ছাত্রছাত্রীগণ অভিনয়ে যোগদান করেছিল। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীগণ আলপনা দিয়ে এবং নানাপ্রকার রঙিন কাপড় ও ফুল দিয়ে অভিনয়-স্থলটি অতি সুন্দর ভাবে সাজিয়েছিলেন। এই অভিনয়টি গত দোলপূর্ণিমায় করবার কথা ছিল, এবং সেই অনুসারে দোলপূর্ণিমার দিন আম্রকুঞ্জ সাজান হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শেষমুহূর্তে ঝড়ে ও বৃষ্টিতে সমস্ত নষ্ট করে ফেলেছিল বলে ঐ-দিন অভিনয় স্থগিত ছিল; পরে বর্ষশেষের দিন অভিনীত হয়। অভিনয় এবং গান বেশ ভালো হয়েছিল।

বিহার ও উড়িষ্যার Co-operative Societyর দু-জন কর্মী এ. রহমান এবং এন. কে. রায় 'Salvation of India through Co-operation' শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন।

গত ১২ই এপ্রিল বিশ্বভারতী পরিষদের একটি সভা হয়ে গিয়েছে।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর জনৈক কর্মী ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে আমাদের দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন।

গত ১২ই এপ্রিল বিশ্বভারতীর পল্লীসেবা বিভাগের পক্ষ থেকে বীরভূম জেলার কতকগুলি স্কুলের এবং গ্রামের ব্রতীবালকগণকে (Scouts) নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। প্রায় দু-শত বালক সমবেত হয়েছিল। ঐদিন অপরাহ্নে তারা নানাপ্রকার ক্রীড়া-প্রদর্শন করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শেষ-মুহূর্তে প্রবল ঝড়ে সমস্ত নষ্ট করে দিয়েছিল। সমস্ত খেলা ঐ-দিন শেষ না হওয়াতে পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত খেলা শেষ করে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পূজনীয় গুরুদেব পুরস্কার বিতরণ করেন।

গুরুদেবের স্বাস্থ্য বেশ ভালই আছে; তিনি বর্তমানে কিছুদিন এইখানে থাকবেন। তাঁর জন্মোৎসব করার আয়োজন হচ্ছে। এই বৎসরে তাঁর ৬৫ বৎসর পূর্ণ হবে।

১৩৩২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের খবরে প্রকাশ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক পরলোকগমনে আশ্রমের সবাই সন্তপ্ত। এই উপলক্ষে শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীতে একদিন অনধ্যায় ছিল। তাঁর জীবনী আলোচনা করবার জন্যে কলাভবনে একটি সভার অধিবেশন হলো। সভায় রামানন্দবাবু, চৈনিক অধ্যাপক লিম, কালীমোহন ঘোষ, নেপালবাবু প্রমুখ অধ্যাপকেরা দেশবন্ধুর নানামুখী কর্মজীবন ও বিস্ময়কর ত্যাগ-মাহাত্ম্যের পর্যালোচনা করেন।

প্রসিদ্ধ বীণকার সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী পুনরায় আশ্রমে এসেছেন। ইনি প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় বীণা বাজিয়ে থাকেন। পূজনীয় গুরুদেব এঁর বীণাবাদন শুনতে খুব ভালোবাসেন।

আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র যতুকিশোর ভট্টাচার্য সমবায়-বিভাগের ভার নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসেছেন।

১৩৩২ সালের ৩রা শ্রাবণ মহাসমারোহে বর্ষামঙ্গল সম্পন্ন হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে কলাভবনটিকে পদ্মে আর পদ্মপাতায়, ধূপে আর আলিপনায় উত্তমরূপে সাজানো হয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় আশ্রমবাসিগণ সমবেত হলে প্রত্যেকের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হয়; আর প্রত্যেককে একটী করে পদ্ম আর একখানি করে গীতি-পুথিকা বর্ষার মাঙ্গলিক প্রতীকস্বরূপে দেওয়া হয়। সভায় স্বয়ং গুরুদেব উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী বীণাবাদন

করেন। তারপরে ভীমরাও শাস্ত্রী একখানি হিন্দী গান করেন। এরপর স্বয়ং গুরুদেব গানের দল নিয়ে এই উপলক্ষে নির্দিষ্ট পনেরোটি গান করেন। তার মধ্যে দু-টি গান আধুনিকতম। তারপরে একজন মহিলা গুরুদেবের লেখা একটি গান গাইলেন। ভীমরাও-জী এই গানটিতে সুর-সংযোগ করেছিলেন। সবশেষে সকলে দাঁড়িয়ে উঠে 'শান্তিনিকেতন' গানটি গেয়ে সভা ভঙ্গ করেন।

কলাভবনের ছাত্র শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ ক-মাস বাড়িতে থাকার পরে আবার এসে কলাভবনে যোগ দিয়েছেন (শ্রাবণ, ১৩৩২)। অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আদিয়ারে Guindy School এর চিত্রবিদ্যার অধ্যাপক হয়ে গিয়েছেন। শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত Ceylon-এ Colombo Ananda কলেজে চিত্রাধ্যাপক হয়ে গিয়েছেন।

শান্তিনিকেতন-কলাভবনে নতুন ছাত্র এসেছেন দু-জন। একজন এসেছেন মহারাষ্ট্র থেকে, অপরজন বাঙ্গালা দেশের। দু-জন ছাত্রই চিত্রবিদ্যায় অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট উন্নতি করেছেন। বামনমোহন শিরোকর তিন বছর আশ্রমে গানের চর্চা করে সম্প্রতি চিত্রবিদ্যা শিখবার জন্যে কলাভবনে প্রবেশ করেছেন। তিনি সঙ্গীতে যেমন পারদর্শী, চিত্রবিদ্যাতেও তেমনি উন্নতি করতে পারবেন বলে সবাই আশা করছেন।

এ-বছর কলাভবন থেকে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ছবি পাঠানো হয়েছে। ছবি গেছে কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, আদিয়ার, সিমলা ইত্যাদি স্থানে। লক্ষ্ণৌ All India Art Exhibition থেকে আচার্য নন্দলাল আর ছাত্র শ্রীরামকিঙ্কর বেজ (প্রামাণিক) সুবর্ণপদক পেয়েছেন। সুকুমারী দেবী কলাভবনের ছাত্রীদের সূচের কাজ আর decorative design বা, ফুলকারির কাজ অতি যত্ন করে শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি আলপনা আঁকায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর ছাত্রীরা তাঁর যত্নে ও শিক্ষায় আলপনা আর সীবন কাজে পাকা হচ্ছেন। 'কারুসজ্জা'-অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে আমরা বিশেষভাবে বলবো। আশ্রমের উৎসবে সুকুমারী দেবীর আর তাঁর ছাত্রীদের সাহায্যে সমস্ত কাজই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ফুটে উঠছে। সুকুমারী দেবী গত বছর লাহোরে decorative design-এর প্রদর্শনী থেকে এক-শ টাকা পুরস্কার

পেয়েছিলেন। আচার্য নন্দলাল তাঁর বই প্রকাশ করলেন —ফুলকারির কাজ সম্পর্কে 'ফুলকারী'।

আচার্য নন্দলালের সঙ্গে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা গৌড়-ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা অতি চমৎকার সব শিল্পবস্তুর ছাঁচ তুলে এনেছেন। তাঁদের সংগৃহীত শিল্পসামগ্রীগুলি কলাভবনের ম্যুজিয়মে সযত্নে রাখা আছে।

কলাভবনের ছাত্র শ্রীবিনায়ক মাসোজী গরমের বন্ধে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীকুন্দাপ্রসাদের সঙ্গে সাইকেলে চড়ে রাঁচী গিয়েছিলেন। এবং রাঁচী থেকে নাগপুরে গিয়েছিলেন ঐ সাইকেলেই। তাঁর বৈচিত্র্যময় ভ্রমণকাহিনী শুনবার জন্যে আশ্রমের সকলেই উদগ্রীব হয়ে আছেন।

ক-দিন আগে (কার্ত্তিক, ১৩৩২) কলাভবনে একটি চিত্রপ্রদর্শনী খোলা হয়েছিল। এতে কলাভবনের ছাত্রদের অনেক ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল। শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথের ও আচার্য নন্দলালের ক-খানি ছবিও দেখানো হয়েছিল। শান্তিনিকেতন-কলাভবনের ছাত্রেরা প্রতিদিনই দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করছেন। এঁদের অনেকের আঁকা ছবি লাহোর, লক্ষ্ণৌ, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, কলকাতা ইত্যাদি স্থানে চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রশংসিত হয়, আর বিক্রী হয় চড়া দামে। এ-ছাড়া এখানকার ছাত্র অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মাদ্রাজ জাতীয়-কলাবিভাগে, শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত সিংহলের আনন্দ কলেজে আর রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লক্ষ্ণৌ-কলাবিভাগে প্রশংসনীয় কাজ করছেন।

এই সময়ে (কার্ত্তিক, ১৩৩২) এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব আশ্রম থেকে আফ্রিকা রওনা হয়ে যান। বিদায়ের আগে শান্তিনিকেতনে একটি সভা হয়েছিল। তাঁর আফ্রিকা যাবার কারণ হলো, শ্বেতাঙ্গ আর ভারতীয়দের বিবাদের অবসান ঘটানো। তখন আফ্রিকার সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ ছিল কেবল দাসত্বের, প্রাণের নয়। এলম্‌হার্স্ট সাহেব এই সময়ে দেশে ফিরে গিয়ে বিয়ে করলেন। তিনি নিজের দেশে একটা স্কুল খোলার চেষ্টা করছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের আদর্শ অন্য বিদ্যালয়ের আদর্শ থেকে আলাদা হবে; এবং সেখানে অনুসরণ করা হবে শান্তিনিকেতনের আদর্শ।

এই সময়ে আশ্রমের ছাত্রদের প্রত্যহ বৈকালের দিকে হাতের কাজ

শেখানো হয়। কাজের মধ্যে কাঠের কাজ, তাঁতের কাজ, লোহার কাজ, রাজমিস্ত্রির কাজ শেখানো হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে ছাত্রেরা গামছা, আসন, ডেস্ক, বাক্স, আলমারি এই সব তৈরি করেছিল।

শান্তিনিকেতন পত্রিকার ১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার একটি সংবাদ —বাঙ্গালার লাট সাহেব লর্ড লিটন সপরিবারে আচার্যদেবের অতিথি হয়ে আশ্রমে আসেন ২৪-এ নভেম্বর। কিছুদিন আগে লর্ড এস. পি. সিংহ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে নিয়ে আশ্রমে বেড়াতে এসেছিলেন। আশ্রমে তাঁরা ছিলেন ৩-দিন।

এবার (১৯২৫) পৌষ-উৎসবে গুরুদেব উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বছরের তুলনায় অতিথি এসেছিলেন অনেক বেশি। তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাঁবু গেড়ে। এ-ছাড়া, অতিথিশালা আর ছাত্রদের আবাস দু-টিতেও অতিথি ছিলেন। মেয়েরা ছিলেন ছাত্রী-নিবাসের কাছে একটি ঘরে। মেলায় নহবৎ বসেছিল, আর ছিল রসুনচৌকির বাজনা। ৭ই পৌষ মন্দিরে গুরুদেব ভাষণ দিয়েছিলেন সকালে। শেষে 'কর তাঁর নাম গান' গানটি গেয়ে গেয়ে ছাতিমতলা প্রদক্ষিণ করা হয়েছিল। দুপুরবেলায় আদিত্যপুরের দল এসে যাত্রা-অভিনয় করে গেল। অভিনীত হয়েছিল আদিশূরের পালা। রাত্রে হলো বাজি পোড়ানো। ৮ই পৌষ আদিত্যপুরের যাত্রার দল অভিনয় করলে —যুগলবীর পালা। যাত্রা ছাড়া, খেলাধূলা আর ব্যায়াম-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। রাত্রে হলো বায়োস্কোপ। ৯ই পৌষ সকালে আম্রকুঞ্জে পরিষদের বার্ষিক সভা হলো। ১০ই সকালে খ্রীস্টোৎসব উপলক্ষ্যে মন্দিরে ভাষণ দিলেন গুরুদেব।

আশ্রমের অন্য সংবাদের মধ্যে, প্রাক্তন ছাত্র অনাথনাথ বসু শান্তি-নিকেতনে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেছেন। মি. ও মিসেস বাকে নামে এক ডাচ্ দম্পতি আশ্রমে এসে সম্প্রতি বাস করছেন। এঁরা আশ্রমে শিখছেন ভারতীয় সঙ্গীত, আর শেখাচ্ছেন য়ুরোপীয় সঙ্গীত।

কিছুদিন পূর্বে পূজনীয় আচার্যদেব আর্ট কনফারেন্স উপলক্ষ্যে লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন আচার্য নন্দলাল, রথীন্দ্রনাথ, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী, মি. মরিস এবং মি. ও মিসেস বাকে। তিনি বেশিদিন লক্ষ্ণৌ-এ থাকতে পারেননি। অকস্মাৎ বড়োবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে

আশ্রমে ফিরে আসেন।

বড়বাবুর মৃত্যু-সংবাদের তার পেয়ে আমেদাবাদ থেকে মহাত্মাজী পূজনীয় আচার্যদেবকে সমবেদনা জানিয়ে তার-বার্তা পাঠিয়েছিলেন। এ্যাণ্ড্রুজ সাহেবও বড়বাবুর মৃত্যু-সংবাদের তার পেয়ে আচার্যদেবকে সমবেদনা জানিয়ে তার পাঠিয়েছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-আশ্রমে প্রবর্তিত ব্রহ্মসাধনার প্রকৃত উত্তরাধিকারী তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে শান্তিনিকেতন-আশ্রম থেকে তাঁর সাধনার অবিচ্ছিন্ন ধারাটিতে ছেদ পড়লো। সুপ্রাচীন ভারত-পরম্পরার পূর্ণপ্রতীক দ্বিজেন্দ্রনাথ দেহরক্ষা করলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং তৎপুত্র মহামুনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভারতধর্মের যে অবিমিশ্র প্রবাহটি শান্তিনিকেতন আশ্রমের পুণ্যক্ষেত্রে প্রবাহিত করেছিলেন, মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সেই পুণ্যতীর্থে ভারতসংস্কৃতির সঙ্গে বিশ্বসংস্কৃতির ধারা মিশিয়ে বিশ্বভারতীর পত্তন করলেন। এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসংস্কৃতির সমবায়ে গঠিত বিশ্বভারতীর সুষম সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপদানে ব্যাপৃত হলেন আচার্য নন্দলাল।

॥ মহামুনি দ্বিজেন্দ্রনাথের তিরোভাব ॥

বিশ্বভারতী-সংবাদে শান্তিনিকেতন-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখেছিলেন, (মাঘ, ১৩৩২), 'গত ৪ঠা মাঘ সোমবার শেষরাত্রে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তিনি বলিতে গেলে কোনো কষ্ট পান নাই। মৃত্যুকে কত সহজে যে গ্রহণ করা যায় —এই মৃত্যুতে আমরা তাহাই বুঝিতে পারিয়াছি। মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রশান্ত মুখশ্রী দেখিয়া ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে ব্যবধান কাহারো চোখে পড়ে নাই।

মৃত্যুর পূর্বদিনেও শান্তিনিকেতন-পত্রিকার জন্য তাঁহার কবিতার প্রুফ্ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং নূতন একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। ঠাণ্ডা লাগিয়া সামান্য একটু ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া মাত্র হইয়াছিল। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বেও কেহ এই আসন্ন সম্পূর্ণতার কথা বুঝিতে পারে নাই।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর পূর্ণপ্রায় হইয়াছিল।

পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ গত ত্রিশ বৎসর হইতে এই আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। যে স্থানটিতে তিনি থাকিতেন তাহার নাম নীচু বাংলা। স্থানটি অপেক্ষাকৃত নির্জন। প্রাচীন আমলকী, বট প্রভৃতি বনস্পতির তলদেশে সযত্নবর্ধিত জবা, কামিনী, পেয়ারা প্রভৃতি নানা জাতীয় গাছে বেষ্টিত এই টালির গৃহটি —দক্ষিণে একটি জলাশয় আছে। বর্ষায় স্ফীত হইতে হইতে তাহার জলতল অতি কষ্টে মুখটি উঁচু করিয়া রাখা লাল শাপলার দল লইয়া ধীরে ধীরে তীরের তালের গুঁড়িগুলিকে ডুবাইয়া দিতে থাকে। পরপারে ভুবনডাঙ্গা গ্রামের অস্পষ্ট জন-কূজন জলে প্রতিধ্বনিত হইয়া স্পষ্টতর রূপে এই নীচুবাংলায় আসিয়া পৌঁছে। বৈশাখের খরায় জলাশয়ের তলাবলম্বী জলমধ্যে গো-মহিষাদি গা ডুবাইয়া পড়িয়া থাকে। এই বাংলার শাখায় শাখায় শালিক, কাকের বাসা —বৃক্ষ-কোটরে কাঠবেরালির ঘরকরণা। কাঠবেরালির দল প্রভাতে কোটর ছাড়িয়া মাটিতে আহার অন্বেষণ করিতে করিতে এই টালির গৃহের বারান্দা পর্যন্ত আসে —উদ্যত চাকরের বা তাহার ঘুন্‌সি-পরা ছেলেটার পরিচিত তাড়া খায় না —বারান্দা ছাড়িয়া ঘরে প্রবেশ করে —দক্ষিণের বারান্দায় যেখানে রৌদ্রে পা রাখিয়া বড়বাবু বসিয়া আছেন সেখানে যায়। মৃদু শব্দে জানাইয়া দেয় ক্ষুধিত তাহারা। খাদ্যের ভাগ চায় — সাহস পাইয়া শালিক আসে, অবশেষে অবিশ্বাসী এবং Cynic কাকও দেখা দিতে থাকে। আর আসে তাঁহার প্রিয় ভৃত্য মুনীশ্বরের শিশু ছেলে দুইটা —তাহাদের মুখে নিজহাতে নিজ খাদ্যের অংশ তুলিয়া দিতে দিতে আহার করিতে থাকেন —মনে তাঁহার তখন সেই সব চিন্তা যেখানে ওই ছেলে দুটার কোনো প্রবেশ নাই। ক্রমে বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহকারী অনিলবাবুর ডাক পরে —তখন উচ্ছ্বসিত হাস্যের মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় শৈশবের ছড়াগুলি লিখিবার ধুম পড়িয়া যায় —যাহার অনেক পরিচয় আমাদের পাঠকগণ পাইয়াছেন।

ঠাকুর-পরিবার প্রতিভার যে বৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত দ্বিজেন্দ্রনাথে তাহার অনেকগুলিই বর্তিয়াছিল। তিনি কবি, দার্শনিক, মানব-প্রেমিক। প্রথম বয়সে তিনি কবিতা লিখিতেন, অবশেষে তাহা ত্যাগ করিয়া দর্শন-শাস্ত্রে মনোনিবেশ করেন, কিন্তু কাব্যের সরসতা তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই।

তাঁহার কথা মনে হইলে ইংরাজ কবি কোলরীজের জীবনী মনে পড়ে। সকলেই জানেন কোলরীজের শ্রেষ্ঠ কাব্যরচনা অল্পবয়সে সমাপ্ত হইয়াছিল; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি জর্মান তত্ত্ববিদ্যার জটিল ও অহিফেনের অন্ধকার পথে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথও অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে স্বপ্ন-প্রয়াণের পথ ত্যাগ করিয়া তত্ত্ববিদ্যার গভীরতায় প্রবেশ করেন। কোলরীজের সহিত তাঁহার আর একটি ঐক্য আছে। কোলরীজের কাব্য কল্পনাপ্রধান, আবেগ-প্রধান নহে। তাঁহার বৃদ্ধ নাবিকের গল্প, ক্রিস্টাবেল এবং কুবলা খাঁর গল্প পাঠকের চারিপাশে ধীরে ধীরে একটি স্বপ্নের কুয়াশা রচনা করিয়া দিয়া এমন এক অলৌকিক রাজ্যের আভাস সৃষ্টি করিয়াছে যেখানে স্বপ্ন ও সত্যের প্রভেদ বুঝিবার ক্ষমতা আর থাকে না। কঠিন পাথর ও অশরীরী বাষ্পের মধ্যে প্রভেদ যতই অপরিহার্য মনে হোক্ না কেন —আসল যে প্রভেদ তাহা কেবলমাত্র একটা অবস্থাভেদের অর্থাৎ তাহা নির্ভর করে আবহাওয়ার উপরে —প্রকৃতিগত সে প্রভেদ নহে। সেইরকম স্বপ্ন ও সত্যের মধ্যে যে ভেদ তাহা দেশ ও কালের আবহাওয়ার সাহায্যে স্বপ্নও সত্য হইয়া দাঁড়াইতে পারে— কোলরীজের সেই অলৌকিক শক্তি ছিল যাহার প্রভাবে দেশ কাল পরিবর্তিত হইয়া স্বপ্ন সত্য হইয়া দাঁড়াইত। স্বপ্নকে সাধারণত আমরা মনে করি মিথ্যার নামান্তর। স্বপ্নমাত্রেই যদি মিথ্যা হইত, তবে মিথ্যাস্বপ্ন নামে একটা কথা সৃষ্টি হইবে কেন? সময়বিশেষে কোনো সত্যও মিথ্যা। স্বপ্ন ও সত্যের এই আশ্চর্য লীলা আছে দ্বিজেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ —স্বপ্নপ্রয়াণে। এই গ্রন্থখানি কবির দোষগুণ উভয়ে বিজড়িত। কিন্তু তাহার বিশদ ব্যাখ্যার ইহা সময় নহে। অন্য কোনো বারে হইবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে সেইদিন বিকালে ৪টার সময়ে তাঁহার দেহকে পুষ্পচন্দনে সুসজ্জিত করিয়া ছাতিমতলায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাঁহার প্রিয় 'কর তাঁর নাম গান' সঙ্গীতটি গীত হয়। অবশেষে আশ্রমের উত্তরে খোয়াই-এর মধ্যে যেখানে মহেশ্বরের পিঙ্গল জটাজালের মত একসারি তালগাছ উঠিয়াছে —সেইখানকার শ্মশানে সকলে শবানুগমন করে। মানুষ মৃত্যুর পরে এই পর্যন্তই আসিতে পারে। দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে তাঁহার পুত্রদ্বয় সুধীন্দ্রনাথ ও কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।'

১৪ই মাঘ পরলোকগত আত্মার মঙ্গলকামনার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ছাতিমতলায় শ্রাদ্ধবাসর হইয়াছিল। ঠাকুরপরিবারের প্রথামত শাস্ত্রপাঠ করিয়া এই ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর দান ও বৃষ উৎসর্গাদি করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আচার্য রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। ক্ষিতিমোহন সেন ও বিধুশেখর শাস্ত্রী আচার্যের কাজ করিয়াছিলেন। ভীমরাও শাস্ত্রী, গোখলে, রঙ্গস্বামী ও শ্রীযুক্ত আয়াস্বামী এই উপলক্ষ্যে বেদপাঠ করেন।

বিকাল বেলা আম্রকুঞ্জে তাঁহার জীবনী-আলোচনার জন্যে একটি সভা আহূত হয়। প্রথমে ভীমরাও শাস্ত্রী গীতাপাঠ করেন, তৎপরে ক্ষিতিমোহন সেন মহাভারতের শান্তিপর্ব হইতে কিয়দংশ পড়িয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী বড়বাবুর জীবনীর কয়েকটি ঘটনা বিবৃত করেন। অবশেষে নেপালবাবু বাঙ্গলা-সমাজের উপর বড়বাবুর প্রভাব সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন।

॥ মহামানবের প্রসঙ্গে একখানি চিঠি —অজিতকুমার চক্রবর্তীকে সতীশচন্দ্র রায় লিখিত ॥

'একবার গিয়া কবি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার সুমুখে সুবোধবাবু ও মনোরঞ্জনবাবুকে আসীন দেখিতে পাইলাম। দুজনকেই পা ছুঁইয়া নমস্কার করিলাম। পরে রবিবাবু আমাকে তাঁহার অগ্রজের কাছে চিনাইয়া দিলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিলেন, 'তাই বটে —তোমার সমালোচনাটি বড় ঠিক্ হয়েছে। বড় আশ্চর্য, তুমি আমাকে কেমন করে ঠিক্ ঠিক্ ধরলে? অনেকে ভাল মন্দ বলে, কিন্তু অমন ঠিক্ ঠিক্ কাউকে ধরতে দেখিনি —তুমি আমার মনের কথাগুলি কেমন করে জান্‌লে হে?—ইত্যাদি। ক্রমে নানা কথাবার্তায় পরিচয় হইতে লাগিল।

এখন দ্বিজেন্দ্রবাবুর একটি প্রতিকৃতি আমি তোমায় দেখাইতেছি। প্রতিকৃতিটি অবশ্য অন্তরের।

এইরূপ লোকের প্রতিকৃতি লিখিত করা খুব কঠিন হয় provided তোমার প্রাণ থাকে। তোমার প্রাণ না থাকিলে এরূপ লোকের সৌন্দর্য

বুঝিতে পারিবে না, এমনকি একটু ভোলানাথ মনে হইতেও পারে। তুমি কি নির্বিশেষেই ভোলানাথের admirer? আমি ত নই। এক রকম ভোলানাথগিরি শুদ্ধমাত্র earelessness বা 'হযবরলত্ব' হইতে জন্মিয়া থাকে —তাহাকে আমি admirable মনে করি না —এই সব ভোলানাথদের বাহিরও যেমন শিথিল, অন্তরও তেমনি শিথিল —হৃদয়ে কোন গভীর স্রোত নাই —এমনকি হৃদয় নিতান্ত মলিন —অবশ্য এদের মধ্যে helplessness-এর একটা সৌন্দর্য থাকিতে পারে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবুর মত ভোলানাথ কি admirable? ইঁহার সবে Idea-র Art বল, Philosophy বল, সমস্তের উচ্চতম শিক্ষা দ্বিজেন্দ্রনাবুর মাথায় আছে। সাধারণ লোকের মত যে আছে তা নয়, Genius-এর মত আছে, originally আছে। ইনি modern literature হয়তো জানেন না (আমি খুব modern-এর কথাই বলিতেছি) অথচ তাহার কোন ভাব ইঁহার অনায়ত্ত নাই; ইনি originally যে-সব জানেন, তা তো ইঁহার কবিতা পড়িয়াই বুঝিতে পার। বিনা নকলে আমাদের দেশে অত বড কবি আধুনিক কালে আর কেউ আছে —তোমার মনে হয়? আমার তো মনে হয় না।

দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন —'তখন (যৌবনে) আমি কবিতা লিখিতেও পারিতাম না ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতাম। একটা তেতলা কামরায় থাকিতাম, সামনে একটা বাগান, দূরে একটি পুকুর করে আমি মনে কত্তুম, ঐ উপবন, ঐ সরোবর ইত্যাদি, nature-এর scenery-তে বিভোর হয়ে থাকতুম। চাঁদকে যে আমি কি ভালবাসতুম, সে আর বলতে পারিনে। তোমাদের এই Keats (দ্বিজেন্দ্রবাবু ফোকলা দাঁতে কীট্ বলিয়া থাকেন) —এই কীটের কবিতা আমার খুব ভালো লাগে —আমারও অনেকটা এই রকম ভাব ছিল,' এই বলিয়া Keats-এর St. Agnes Eve হইতে—

St. Agnes Eve ah! bitter chill it was

And the owl for all his feathers were a-cold —এই প্রথম লাইন দুটি বলিলেন। বাস্তবিক তাঁহার কবিতার সঙ্গে Keats-এর কবিতায় সৌসাদৃশ্যই আছে —নয় কি?

পোষাক পরিচ্ছদ বিষয়ে ইনি —শুন। একদিন একটি বিছানায় পাতিবার লাল কম্বল গায়ে দিয়া আসিয়া উপস্থিত —সে আবার ময়লা। ইনি সন্ধ্যাকালে

আসিয়া আমাদের সঙ্গে বসেন। আসিয়া প্রথমে একথা ওকথা বলিতে বলিতে যদি একবার দর্শন ধরিলেন ত Kant, Spinoza, Herbert Spencer, বেদান্ত ইত্যাদি বিষয়ে ইহার যতগুলি মতামত সমস্ত আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন —দু-একবার হয়তো বলিলেন —'আপনাদের আমি detain কাচ্ছি কি?' আবার আরম্ভ করেন। শেষে আমরা হয়তো খাইতে যাইব এই যোগাড় দেখিয়া 'ওঃ তবে আপনাদের খাবার এসেছে' বলে —দু-তিন বার বলে ধীরে ধীরে অনিচ্ছা সত্ত্বে 'তবে এখন পালাই' বলিয়া চলিয়া যান। হয়ত কিছুদূর আলোচনা করিতে করিতেই নিজের খাতাটি বাহির করিয়া 'আপনারা আমার এই সার সত্যের আলোচনাটি শুনবেন কি?' এই বলিয়া আমাদের মত একটু সঙ্কোচের সঙ্গে পড়িতে থাকেন, এবং পাঠান্তে আমাদের মত সঙ্কোচে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করেন 'কেমন হইয়াছে?' 'ভাল হইয়াছে' শুনিলে, 'এ ভাল হইয়াছে?' বলিয়া প্রীত হন। এত জ্ঞানী অথচ এত সরল লোক আমি আজ পর্যন্ত দেখি নাই। বাস্তবিক প্রকৃত জ্ঞানীরাই সরল। আজ সকাল বেলা Materlink-এর Wisdom and Destiny বা 'প্রজ্ঞা ও নিয়তি' নামক বইটি পাড়তেছিলাম —পড়িয়া দেখিও, তার মধ্যে প্রজ্ঞার কি গভীর কি সুন্দর ব্যাখ্যা Meterlink করেছিলেন। অত্যন্ত ব্যগ্র, পরম বিশ্বাসী, মেঘের মত প্রেমী, নিশাথের মত শ্রান্ত নিরহঙ্কার অথচ অতি উদার, সমস্ত বিশ্বজগতের রহস্যের মুখামুখী শয়ান, অভিভূত যে চিত্তের একটি ভাব, তাহাকেই বলে 'প্রজ্ঞা' বা Wisdom। সেই প্রজ্ঞা দ্বিজেন্দ্রবাবুর আছে।

তিনি বলেন —'কেউ যদি আমার কাছে জানতে চায় Philosophy কি করে পড়তে আরম্ভ করবে, তাহলে আমি ঠিক পেয়ে উঠি না তাকে কি উপদেশ দেব? তাকে কি পড়তে বল্‌ব? Philosophy পড়বে? —কেন পড়বে? তোমার কি দরকার? —এই প্রশ্নটি আগে জিগ্যেস কত্তে হয়!' ভাবিয়া দেখ কি গভীর। আমরা এই রকম করিয়া যদি জ্ঞান উপার্জন করিতে যাই, —তবেই প্রকৃত মানুষ হইতে পারি না কি? —একটা জিনিস কেন পড়ি? ভাব দেখি অধিকাংশ লোক কেন পড়ে? —টাকা —নয়ত নাম, নয়ত বিদ্যাগেলানো, নয়তো গড্ডালিকা প্রবাহে চলন। কিন্তু বাস্তবিক আমায় Humanity গরুড়ের মতো ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া

হাঁ করিয়া খাইতে চায় —Spiritual life ক্ষুধায় হা হা করিতেছে, তার ক্ষুধা মিভাইতে দর্শন বিজ্ঞান কবিতা অঙ্ক কিছু একটা পড়িব —এ-ভাবে ক-জন পড়ে ? —Life-এর ক্ষুধায় না পড়িলেই বিদ্যাটি জীবনের কাঁধে চড়িয়া বসে —আত্মার চেয়ে বিদ্যা প্রবল হয় —এ বিদ্যায় জ্ঞান হয় না, অবিদ্যা জন্মে —অজ্ঞান জন্মে। ইহাকে দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন দোমেটে জ্ঞান—অর্থাৎ কিনা অসরল জ্ঞান— আমার যাহা common sense আছে তার উপরে বিদ্যা লেপিয়া দিলাম। ইহা অজ্ঞান —ইহার উপরে যদি আবার তা নিয়া অহঙ্কার হইল (হওয়াই স্বাভাবিক) তাহা হইলে হইল দোমেটে অজ্ঞান (দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাষায়)।

এখন বুঝিবে দিজেন্দ্রবাবু কোন্ জায়গাটিতে দাঁড়াইয়াছেন। —অর্থাৎ প্রকৃত Wisdom-এর উপরে। বাস্তবিক, একেক সময়ে ঐ সরল হৃদয়টি ভেদ করিয়া যে গভীর অধ্যাত্মব্যগ্রতা বাহির হয় তাহাতে যার হৃদয়ে না স্পর্শ করে —সে পাষাণ হইতে পাষাণ। আমার চিরদিন এই দৃশ্যটি মনে থাকিবে —রাত্রি প্রায় এগারোটা ! শান্তিনিকেতনের নীচের বৈঠকখানায় couch-এ শুইয়া সেই বৃদ্ধ কবি, পাশে চেয়ারে বসিয়া আমি। এই পাশে চেয়ারে গ্লোবের মধ্যে মোমের বাতি জ্বলিতেছে। বুড়ার মাথাটি দৃঢ়, সারল্যব্যঞ্জক গঠনটি দেখিতেছি —উন্নত কপালের চৌদিকে পিছে উল্টান সাদা চুল। নাকের উপর চশমা আলোতে চক্‌চক করিতেছে —একেক সময়ে চক্ষুটিও জ্বলিয়া উঠিতেছে। ইংরেজদের scientific spirit-এ scientific basis-এ দাঁড়াইয়া জগতের একরূপ ভ্রান্ত synthetic মাপ (Herbert Spencer-এর Synthetic Philosophy), Napoleon, দ্বিজেন্দ্রবাবুর কবিতা প্রভৃতি অনেক কথার পরে মন্দস্বরে বৃদ্ধ যেন নিজের কাছে বলিতে লাগিলেন 'এসব লেখা সব ছেড়ে ছুড়ে দেব, এখন সাধন-ভজন নিয়ে থাকব' —আমার হৃদয় বড়ই স্পৃষ্ট হইয়াছে।'

প্রকৃত Idealist-এর প্রতিকৃতি এতদিনে আমি দেখিলাম। ইঁহাদের একটি লক্ষণ এই যে, ইঁহারা যে কথা বলুন, তাহা নিজের অন্তরাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া যেন বলিতে থাকেন —বাইরের লোক সামনে দাঁড়াইয়া থাকে মাত্র। ভাবিয়া দেখ দেখি —জাগ্রত অন্তরাত্মাকে সম্মুখে রাখিয়া

আমরা যদি কথাবার্তা সব বলি, তাহা হইলে আমাদের বাক্যে কি সত্য, কি তীব্রতা, কি তেজ, স্ফুরিত হইতে বাধ্য! আমরা যাহাকে ভালবাসি তাহাদের কথা এইভাবে বলিতে গেলে, তার মধ্যে কি একটি মর্মঘাতী সুর থাকে—ভাব দেখি। দ্বিজেন্দ্রবাবুর মুখে এই দুই দিনে কয়বার কালীবর বেদান্তবাগীশের কথা শুনা গেল। সেই নাম উচ্চারণের সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার মূর্তি আমি দেখিয়াছি। ভুল করিয়া দ্বিজেন্দ্রবাবু বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'তুমি ভবানীপুরে কালীবর বেদান্তবাগীশ কেমন আছেন? তাঁকে জান?' —দ্বিজেন্দ্রবাবুর কোনক্রমে বিশ্বাস হইয়াছে—আমার বাড়ি ভবানীপুরে।

কালীবর বেদান্তবাগীশের কথা পাড়িয়া বলিলেন, 'বাস্তবিক আমাদের দেশে রাজা রাজড়ারা যে কেন ওঁকে patronise করে না!—আমার তেমন সুবিধা নাই, থাকলে আমি patronise কত্তুম। এবার গিয়ে তাঁকে দেখতেই হবে—হয়তো তিনি জীবিত নাই, এতদিনে অন্তর্ধান করিয়াছেন।' —এই সব কথায় বুড়ার স্বরটি এমনি তীব্র করুণ হইল, যে তাহা তুমি নিজে না শুনিলে বুঝিবে না। ঐ সুরেই আমি সশ্রদ্ধ প্রীতির মূর্তি দেখিতে পাইলাম। দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাষা ঠিক তাঁহার অন্তরটির ছবি। ঠিক, ঐরকম সরল, তেজস্বী, চিরযুবা, সত্যান্বেষী, একাগ্র, দ্বিজেন্দ্রবাবুর চিত্তটিও।

রবিবাবুর সহস্র সৌন্দর্যের সঙ্গে একটি অশ্রুর বৃষ্টি আছে—এবং তাঁহাদের হাস্য তীব্র ও চতুর কিন্তু সহস্র করুণা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রবাবুর একটি সবল বীর্যের সঙ্গে একটি খোলা অচতুর 'হো হো' হাস্যের ভাব সঙ্গীর চিত্তটিকে বড়ই আরাম প্রদান করিয়া থাকে। রবিবাবুর সমস্ত কবিতা পড়িয়া দেখ—তাঁর বুকে দুঃখ কোথায় যেন জোরে মাড়াইয়া দিয়াছিল—কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবু যেন যৌবনপূর্ণ আনন্দলোক হইতে কোনদিন নামেন নাই। এই জন্যে উভয়েরি দোষগুণ দুইই উঠিয়াছে। রবিবাবুর দোষ—অশ্রু। গুণ—বড় scope—complex creation বেশী practicality. দ্বিজেন্দ্রবাবুর দোষ—রবিবাবুর গুণগুলির অভাব। গুণ—অজস্র জ্যোতির্ময় উচ্ছ্বাস।

মানুষ দু-টিও ঠিক ওই রকম। আহা, রবিবাবুর সংযত মাধুর্য কি স্নিগ্ধ করুণ! বালকদের মুখের দিকে যখনি চাই, তখনি সেই কাঁচা মুখগুলি ভাবিতে ভাবিতে আমি একটি স্নেহময় নারীমূর্তিতে গিয়া উপস্থিত হই

—রবিবাবুর মুখে তেমনি মর্ত্য 'মা' নহে কিন্তু আর একজন যেন কোন বড় মায়ের চেহারা মনে করাইয়া দেয়। দ্বিজেন্দ্রবাবুর মুখে (বৃদ্ধের চেহারা তাঁহারা অন্তরেই দেখিতে পাইবেন। আবার অন্তর তাঁহার কথাবার্তায়ই দেখা যায়) —সরল ভাব তো আছেই কিন্তু অন্তরের চেহারায় একটি বড় জোরের অথবা বীর্যের ভাব আছে। দ্বিজেন্দ্রবাবুতে নারীভাবের কিঞ্চিৎ অভাব আছে কি? —জানি না। বুড়াদের বন্ধুত্ব একটি চমৎকার জিনিস। কালীবর বেদান্তবাগীশের কথায় দ্বিজেন্দ্রবাবুর সেই ভাবটি বেশ দেখিলাম।

দ্বিজেন্দ্রবাবুর কথাবার্তায় কতকগুলি ভঙ্গী ঠিক রবিবাবুর মত —দেখিতে আমার বড় একটু আমোদ লাগিতেছে! মনে কর একটা নিতান্ত অপরিচিত দুর্গম castle-এর মধ্যে গিয়া যদি দেখি যে ভাঙ্গা castle-এর ভিতরের পুরীতে দাঁড়াইয়া রবিবাবুর মত একটি লোক পরিচয়ের হাসি হাসিতেছে —তবে যেমন আমোদ লাগে, —বিস্মিত হইয়া মনে করি, কি প্রেমের বন্ধনে কবি আবার এখানে আইলেন। বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রবাবুর মধ্যেও রবিবাবুর কথা কহিবার ভঙ্গী দেখিয়া সেইরকম একটি বড় মধুর ভাব অনুভব করিতেছি।

এ সম্বন্ধে অনেক লিখিলাম। ভবিষ্যতে আরো অনেক হয়ত লিখিতে হইবে। কিন্তু সম্প্রতি থাক। গতরাত্রের পর আর দ্বিজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আজ এখন পর্যন্ত দেখা হয় নাই। তিনি, কাল আমি উঠিয়া আসিবার সময়ে যে নিদ্রালু চোখে বিদায়কালীন আশীর্বাদ আদরসূচকভাবে আমার পিঠে মৃদু মৃদু করাঘাত করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়া শূন্যের উপর (ইঁহার এক হাতের আঙ্গুলগুলি বাঁকা) হাতটি নাড়াইতেছিলেন —আজ তাহাই কেবল মনে পড়িতেছে। এই সকল জ্যোতির স্পর্শে অন্তরাত্মা জাগে।'

॥ আচার্য ফরমিকির বিদায়সভা ॥

গত ৩রা মার্চ আচার্য ফরমিকির বিদায় উপলক্ষে উত্তরায়ণে সন্ধ্যার সময় একটি সভা হয়। সভাটি কলাভবনের ছাত্ররা সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলেন। সভার কাজ আরম্ভ হলে শ্রীযুক্ত আয়ার স্বামী ও আয়েঙ্গার একটি বৈদিক শ্লোক পাঠ করেন। পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত বক্তৃতায় আচার্যকে অভিনন্দিত করেন। তিনি আচার্যকে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে পাদ্যার্ঘ্য প্রদান

করেন। তাঁর সংস্কৃত অভিনন্দন পাঠ হলে পর পূজনীয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় একটি ইংরাজী বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে অধ্যাপক বকিল যে অভিনন্দনটী লেখেন অধ্যাপক আরিয়াম উইলিয়মস্ সেটি পাঠ করেন। এর পর বিদ্যাভবনের ছাত্র শ্রীমান্ গোখলে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের পক্ষ হতে আর একটি অভিনন্দন পাঠ করেন। পরিশেষে আচার্য ফরমিকি উত্তরে বলেন যে, প্রথম যেদিন তিনি এখানে আসেন, সেদিন তিনি অভিনন্দনের উত্তরে সকলকে 'বন্ধু' বলে সম্ভাষণ করেছিলেন, কিন্তু, আজ তিনি সকলকে ভাই বলে সম্বোধন করছেন। তিনি যখন প্রথম সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করেন, সে সময় অনেকে তাঁর সম্বন্ধে হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু এইটাই তাঁর পক্ষে খুব গৌরবের যে তিনি ইটালীতে সংস্কৃত ভাষার চর্চা শুরু করাতে পেরেছেন। আজ তিনি যে সম্মান লাভ করলেন, তিনি জীবনে তা কখনও ভুলবেন না। আজকার দিন তাঁর জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ দিন বলে মনে করেন। তাঁর সকলের চেয়ে দুঃখ এই যে তাঁর জীবনের এই সাফল্যের দিনে তাঁর মা জীবিত নেই; তিনি আজ জীবিত থাকলে খুব খুশী হতেন।

পরিশেষে তিনি বলেন যে যদিও তিনি শান্তিনিকেতন থেকে চলে যাচ্ছেন, তবু তাঁর প্রিয় ছাত্র অধ্যাপক টুচি এখানে থাকছেন। অধ্যাপক টুচি সাহেবের থাকাতে তাঁর এখানে থাকা হবে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে যাঁরা গান করেন তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী ও সঙ্গীত-ভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের নাম উল্লেখযোগ্য।

॥ সমকালের শান্তিনিকেতনে ভারতশিল্প-সাহিত্য চর্চা ॥

সেকালের শান্তিনিকেতনে কলাভবনের সঙ্গে ছাত্র বা অধ্যাপকরূপে যুক্ত না হয়েও এখানকার কোন কোন অধ্যাপক আচার্য নন্দলালের ব্যক্তিগত আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে শিল্পচর্চায় ব্যাপৃত হতেন। ইতিহাসের অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসুর নাম এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তিনি এই সময় 'মুসলমান যুগের আগে ভারতীয় শিল্প' ও 'আধুনিক ভারতীয় শিল্পকথা'

সম্পর্কে দু-টি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রসঙ্গতঃ প্রবন্ধ দু-টি উদ্ধার করে দেওয়া গেল।

॥ মুসলমান যুগের আগে ভারতীয় শিল্প ॥

আজকাল ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস সংগ্রহ করবার চেষ্টা হচ্ছে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রথম ভারতীয় শিল্পের সম্পূর্ণ ইতিহাস দেবার চেষ্টা করেন, আংশিক ইতিহাস অনেকেই দিয়াছেন। ডাক্তার আনন্দ কুমারস্বামী সিংহলের শিল্পের ইতিহাস ও তাহার ভারতীয় শিল্পের কিছু বিবরণ দিয়াছেন, একটি কথা অনেকেই স্বীকার করেন যে, মুসলমান যুগের আগে হয়ত ভারতে শিল্পের নিদর্শন অনেক ছিল যা মুসলমান আক্রমণে নষ্ট হয়ে গেছে। এ কথার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা কিছু নেই। ইতিহাসের দিক থেকে আলোচনা করলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসের জন্যে মুসলমান আক্রমণকারীরা অনেক পরিমাণে দায়ী।

সুলতান মামুদ যে ভারত আক্রমণ করেছিলেন সতের বার তা আজকালকার বিদ্যালয়ের ছেলেরাও জানে। তাঁর আক্রমণের সময় ভারতের নানাস্থানে দেবমূর্তি ও দেবমন্দির ছিল যা তিনি নষ্ট করে দিয়েছেন। খৃ ১০০৯ অব্দে তিনি কাংড়া লুট করেন। সেখান থেকে তিনি যে সব জিনিস নিয়ে যান তার মধ্যে একটি ছিল রূপার বাড়ি। সেই বাড়িটি ৩০ গজ লম্বা ও ১৫ গজ চওড়া ছিল। এই বাড়িটি এমন মজার ছিল যে এটী টুকরা টুকরা করে খুলে নেওয়া যেতে পারত, আবার পরান যেত।

সে সময় মথুরায় অনেক মন্দির ছিল, সম্ভবতঃ বিষ্ণুমন্দির। একটি মন্দির ছিল শহরের মাঝখানে, সেটি অন্য সব মন্দিরের চেয়ে বড় ও সুন্দর ছিল। সুলতান মামুদ সে মন্দিরটি দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, সেটী নির্মাণ করতে নিশ্চয়ই দু-শ বৎসর লেগেছিল। সে মন্দির এত সুন্দর ছিল যে সেটা নাকি বর্ণনা করা যায় না। এই মন্দিরে পাঁচটি মূর্তি ছিল; সেই মূর্তিগুলি সোনা দিয়ে তৈরী। এক একটি মূর্তি পাঁচ গজ উচ্চ ছিল আর তাদের চোখ ছিল খুব দামী রত্নে তৈরী। সুলতান মামুদ হুকুম দিয়েছিলেন এই সব মন্দির আগুনে পুড়িয়ে ফেলবার জন্যে।

কান্যকুব্জে সে সময় নাকি দশ হাজার মন্দির ছিল। মামুদ এ শহরও আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু এ সব মন্দির ভাঙতে বলেছিলেন কিনা তার কোন সঠিক প্রমাণ নেই।

তারপর সোমনাথের বিখ্যাত মন্দির। সেটী কাঠের তৈরী ছিল। এ মন্দিরের মধ্যখানে যে বড় হলটী ছিল, সেখানে ৫৬টী স্তম্ভ ছিল। এ স্তম্ভও কাঠের তৈরী, কিন্তু সীসা দিয়ে ঢাকা ছিল। এখন শুধু এই বিখ্যাত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে।

মুসলমানদের আসবার আগে এই রকম ভারতে অনেক মন্দির ও মূর্তি ছিল, যার কোন বিস্তৃত বিবরণ আমরা এখন পাই না। সেই সব শিল্পনিদর্শনের বিস্তৃত বিবরণ পেলে আমরা ভারতীয় শিল্পের একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখতে পারি। আমরা বল্‌তে চাই না যে, মুসলমান আগমনে ভারতের লাভও না হয়েছে। শিল্পের দিক্ থেকে আমরা তাজমহল পেয়েছি, সোনা মসজিদ পেয়েছি, জুম্মা মসজিদ পেয়েছি। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে মোসলেম সভ্যতার দান অনেক আছে। কিন্তু যতদিন না আমরা ঠিক্ জান্‌তে পারব যে, ভারতীয় শিল্পের কি কি নিদর্শন মুসলমান যুগের আগে ছিল, যা এখন নষ্ট হয়ে গেছে, ততদিন ভারতীয় শিল্পের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা অসম্ভব।

॥ আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা ॥

আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসের কথা বলতে হলে আগে সেই সব মনীষীদের কথা বলা দরকার যাঁদের চেষ্টায় আজ ভারতীয় শিল্পের গৌরবের কথা সকলের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। সুতরাং প্রথমেই মেজর আলেকজাণ্ডার কানিংহামের কথা বলতে হয়, কারণ তিনিই সকলের আগে ভারতীয় শিল্পের গৌরবস্তম্ভ খুঁজে বের করেন। মধ্যভারতে অনেক দিন থেকে ভরহুত ও সাঁচির স্তূপ পড়েছিল, কিন্তু কোন শিল্পরসিকই সে সকলের কোন সন্ধান নেননি, যতদিন না তিনি সেগুলি আবিষ্কার করলেন। এ ছাড়া তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে যে সব নানা মূর্তি ও মন্দির আবিষ্কার করলেন তার কথা আমরা তাঁর রিপোর্টে পাই। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র

উড়িষ্যার মন্দির ও শিল্পকলার কথা এবং বৌদ্ধগয়ার শিল্পের কথা সকলের কাছে জানিয়ে দিলেন। ফার্গুসন সাহেবও ভারতীয় স্থাপত্যের কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন। ভারতীয় শিল্পকলার অনেক গৌরবের জিনিস মানুষের অত্যাচারে নষ্ট হচ্ছিল। সেইজন্য লর্ড কর্জন পুরাণ মন্দির ও মূর্তির রক্ষার ব্যবস্থা করে সকলের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। শেষে যখন অজন্তার গুহা পুনরায় লোকচক্ষুর গোচরে এল এবং সেখানে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার পরিচয় পাওয়া গেল, তখন ইউরোপীয় পণ্ডিতরা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, ভারতেও শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। সম্প্রতি বাগগুহার চিত্রকলা দেখিয়ে দিচ্ছে যে ভারতীয় শিল্প কত দূর উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল।

কিন্তু তখনও কেহ কল্পনা করেননি যে, সেই প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে আবার বর্তমান ভারতে একটি আন্দোলন চলতে পারে। এতদিন ঐতিহাসিকেরা প্রাচীন ভারতের শিল্পকলার পরিচয় নিতে ব্যস্ত ছিলেন প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনার সুবিধা হবে বলে। প্রথমে কলিকাতার সরকারী আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব এ বিষয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। শুধু যে ভারতশিল্পনিচয় ভারতের সভ্যতার ইতিহাস সংগ্রহ করবে তা নয় তাদের মধ্যে যে প্রভাব আছে তা আধুনিক শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করবে। যখন হ্যাভেল সাহেব কলিকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন মোগলপদ্ধতি অনুসারে আঁকা কতকগুলি ভারতীয় ছবি তাঁর চোখে পড়ে। তিনি সেই সব ছবি কলিকাতা আর্ট গ্যালারীতে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন আর তাঁর ছাত্রদের সেই সব ছবি থেকে অনুপ্রেরণা নিতে বললেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য শিল্পগুরু শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি প্রথমে পাশ্চাত্য প্রথামতে ছবি আঁকতে ব্যস্ত ছিলেন। এখন তাঁর দৃষ্টিও তার অঙ্কনপদ্ধতির দিকে আকৃষ্ট হল। তিনি ভাবলেন যে আজকালকার ভারতীয় চিত্রকরদের উচিত বিদেশী চিত্রকরদের অনুকরণ না করে প্রাচীন শিল্পীদের প্রথা অনুসরণ করা, কারণ প্রাচীন শিল্পের মধ্যেই ভারতের নিজস্ব সাধনার জিনিস রয়েছে। সেই সময় থেকেই আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। এই রকমে তিনি এক নতুন দল গঠন করতে লাগলেন। সেই দলকে এখন ভারতীয় চিত্রের

দল বলা হয়।

সৌভাগ্যের বিষয় অনেক গণ্যমান্য দেশী ও বিদেশী ভদ্রমহোদয় এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। তাঁরা ১৯০৭ অব্দে মার্চ মাসে একটি সমিতি গঠন করলেন, সেটির নাম —Indian Society of Oriental Art. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয় শিল্পকলার প্রতি যাতে সাধারণের উৎসাহ জাগে ও যাতে সাধারণে ভারতীয় শিল্পের মূলকথা বুঝতে পারে তার চেষ্টা করা। এই সমিতির আরও উদ্দেশ্য যে যোগ্য শিল্পীদের বৃত্তি দিয়ে সাহায্য করা। সুখের বিষয় যে এই সমিতি এখনও বর্তমান আছে এবং এর কাজ খুব শৃঙ্খলার সঙ্গে করছে। বিচারপতি উড্রফ যখন এই সমিতির সভাপতি ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে এই সমিতির দ্বারা সাধারণের মধ্যে যখন জাতীয় ভাব সম্পূর্ণ জাগরিত হবে তখনই ভারতীয় শিল্পের নবজাগরণ আরম্ভ হবে।

যে সকল উপায়ে এই সমিতি ভারতীয় শিল্পকলার পুনরভ্যুদয়ের চেষ্টা করছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রতিবৎসর চিত্রপ্রদর্শনী করা। ১৯০৮ অব্দ থেকে প্রায় প্রতি বৎসর সমিতির চেষ্টায় কলিকাতায় চিত্রপ্রদর্শনী হচ্ছে। সেই সব চিত্র প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর শিষ্যদের ছবি সাধারণের কাছে প্রদর্শিত হয়। আর এক উপায়ে সমিতি এই আন্দোলনকে সাহায্য করবার চেষ্টা করছেন. সেটী হচ্ছে —যোগ্য শিল্পীদের বৃত্তি দেওয়া। সেই উদ্দেশ্যে বিচারপতি উড্রফ ও শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর দুটি বৃত্তি দেন। তার মধ্যে একটি বৃত্তি দেওয়া হয় প্রসিদ্ধ শিল্পী নন্দলাল বসুকে ও অপরটী ৺সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে। এই রকমে ভারতীয় শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের আন্দোলন শুরু হয়। সেই আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত হলেন আচার্য অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এখন অনেকেই সাধারণের নিকট পরিচিত। তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, নিজের শিল্পকলার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, এখন তিনি বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যক্ষ। তিনি গুরুর কাছে যে শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করেছেন, সেই শিক্ষা তাঁর নিজের সাধনা বলে আরও বিস্তৃত করে নিয়তই তাঁর নতুন নতুন ছবিতে নিজের সাধনার পরিচয় দিচ্ছেন। অবনীন্দ্রনাথের অপর ছাত্র শ্রীঅসিতকুমার হালদার এখন লক্ষ্ণৌ আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ। তিনিও তাঁর শিল্পপরিচয় তাঁর

ছবিতে দিচ্ছেন। এ ছাড়া, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন মজুমদার ও চারু রায় সাধারণের কাছে সুপরিচিত। অবনীন্দ্রনাথ শুধু যে নিজের ছবির দ্বারা সাধারণের কাছে ভারতশিল্পের কথা জানাচ্ছেন তা নয়, তিনি সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে, লেখার দ্বারা, বক্তৃতার দ্বারা এই আন্দোলনের কথা সকলকে জানাচ্ছেন। ভারতশিল্প সম্বন্ধে ইংরাজী ও বাংলায় তাঁর লেখার কথা অনেকেই জানেন। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কাজকে স্বীকার করেননি। কিন্তু পরলোকগত স্যার আশুতোষের ভারতশিল্প সম্বন্ধে যে গভীর দরদ ছিল, তার পরিচয় আমরা পেলাম যখন তিনি ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলার বাগীশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত করলেন। বাগীশ্বরী অধ্যাপকরূপে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ যে-সব বক্তৃতা দিয়াছেন তা অনেককাল শিল্পরসিকদের রস জোগান দেবে। প্রত্যেক শিল্পরসিকেরই এই বক্তৃতাগুলি পাঠ করা দরকার। কিছুকাল সরকার থেকেও এই সমিতিকে সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু এখন তা বন্ধ হয়ে গেছে।

আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের চিত্রকলা এদেশে ও বিদেশে সুপরিচিত করবার জন্যে শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয় অনেক কাজ করেছেন। তিনি তাঁর 'রূপম্' নামে কাগজে ভারতীয় শিল্পকলার সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের চিত্রকলা সম্বন্ধে যে-সব মনোজ্ঞ বই প্রকাশ করছেন সেগুলিও তাঁর ভারতীয় শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা ও উৎসাহের পরিচয় দেয়। ডাক্তার কুমারস্বামীও আমেরিকায় অনেক কাজ করেছেন। তাঁর রাজপুত চিত্রকলা সম্বন্ধে বই তাঁর প্রকৃত কীর্তিস্তম্ভ। এ প্রসঙ্গে পাটনায় ব্যারিস্টার মানুক সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় চিত্রের সংগ্রহ তাঁর অপূর্ব। ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ছাড়া এমন সংগ্রহ আর কাহারও আছে কিনা সন্দেহ। কলিকাতার শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সংগ্রহও উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতায় যে প্রতিষ্ঠানটি এই রকমে গড়ে উঠল, তার প্রভাব ভারতের নানাস্থানে দেখা যায়। দক্ষিণভারতে 'অন্ধ্র' জাতীয় কলাশালা এই উদ্দেশ্য নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। লক্ষ্ণৌতে এক নতুন আর্টস্কুল স্থাপিত হয়েছে। জয়পুরে কলাভবনের উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে। ভারতের নানাস্থানে মাদ্রাজ,

লক্ষ্ণৌ, লাহোর ও অপরাপর শহরে চিত্রপ্রদর্শনী আরম্ভ হয়েছে। এ সবই ভারতে শিল্পকলার নবজাগরণের চিহ্ন।

॥ ছাত্রবন্ধু আচার্য নন্দলাল ॥

১৯২৬ সালের জানুয়ারীতে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-পত্রিকার সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে: পূর্ববিভাগে ছাত্রসংখ্যা ১২২, ছাত্রী ৫৩, মোট ১৭৫। শিক্ষাভবনে ছাত্র ২৩, ছাত্রী ৯, মোট ৩২। বিদ্যাভবনে ছাত্র-সংখ্যা মোট ৪ জন। কলাভবনে ছাত্রসংখ্যা হলো ১০ জন। বলা বাহুল্য, কলাভবনের এই ছাত্রসংখ্যা মাত্র এই বছরের নবাগতদের ধরে। কিন্তু, ছাত্র-ছাত্রী যে-ভবনেরই হোক্, আশ্রমের দ্বিতীয় ব্যক্তি আচার্য নন্দলালের স্নেহধারা থেকে বঞ্চিত হতো না কেউই। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'আশ্রমের সাধনা-ক্ষেত্রে দেখা দিলেন নন্দলাল। ছোটো বড়ো সমস্ত ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আর্টিস্টের একাত্মতা অতি আশ্চর্য। তাঁর আত্মদান কেবলমাত্র শিক্ষকতায় নয়, সবপ্রকার বদান্যতায়। ছাত্রদের রোগে, শোকে, অভাবে তিনি তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁকে যারা শিল্পশিক্ষা উপলক্ষে কাছে পেয়েছে তারা ধন্য হয়েছে।'

॥ শিল্পীর চোখে সাদা-কালোর 'আর্যা' ॥

১৩৪৮ সালে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—'সেই ছেলেবেলা কবে কোন্‌কালে দেখেছি রাজেন মল্লিকের বাড়িতে নীলে সাদায় নকশা কাটা প্রকাণ্ড মাটির জালা, গা ময় ফুটো, উপরে টানিয়ে রাখত। ভিতরে চোঙের মতো একটা কী ছিল তাতে খাবার দেওয়া হোত। পাখিরা সেই ফুটো দিয়ে আসত, খাবার খেয়ে আর এক ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেতো। অবাধ স্বাধীনতা, ঢুকছে আর বের হচ্ছে। মানুষের মনও তাই। স্মৃতির প্রকাণ্ড জালা তাতে অনেক ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে স্মৃতি ঢুকছে আর বের হচ্ছে। জানলা খুলে বসে আছি, কতক বেরিয়ে গেছে কতক ঢুকছে, কতক রয়ে গেছে মনের ভিতর ঠোকরাচ্ছে তো ঠোকরাচ্ছেই, এ না হোলে হয় না

আবার। আর্টেরও তাই। এই ধরো না বিশ্বভারতীর রেকর্ড, রবিকাকা কোথায় গেলেন, কী করলেন সব লেখা আছে কিন্তু তা আর্ট নয়, ও হচ্ছে হিসেব। মানুষ হিসেব চায় না, চায় গল্প। হিসেবের দরকার আছে বই কি কিন্তু ঐ একটু মিলিয়ে নেবার জন্যে, তার বেশি নয়। হিসেবের খাতায় গল্পের খাতায় এইখানেই তফাত। হিসেব থাকে না মনের ভিতরে, ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায়, থাকে গল্প।

অবনীন্দ্রনাথ ১৩৫১ সালে বলেছিলেন,—'জীবনতরু জল না পেলে বাঁচে না। পাথরের থেকেও রস নিতে চায়, যে পাষাণের মঞ্চে সে বাঁধা থাকে তা থেকে।

তখন কে এল? তখন প্রভু এলেন তাকে বাঁচাবার জন্যে। বললেন, 'সেই দিকে শিকড় পাঠা যেখান থেকে সে চিরদিন রস পাবে, বনবাসের আনন্দ পাবে।'

'জোড়াগাছের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেছে, ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে। অন্য গাছটিতে পড়েছে অস্তরবির আলো, তাপ দিয়ে বাঁচাতে চাচ্ছে। সবুজ মরে গিয়ে গৈরিক রঙের শোভা প্রকাশ পেল। সেখানে শুরু হলো বনের ইতিহাস। অন্ধকার রাত্রে আর-এক সুর বাজল মনে। বনদেবীদের দেওয়া সেই সুর।

সোনার স্বপ্ন যেন আর-একবার ধরা দেবে দেবে করলে, যেখানে সোনার হরিণ থাকে।

অলকার রঙছুট ময়ূরী এল। সে-জগতে সে রঙের অপেক্ষা রাখে না। সেই যে কুঞ্জে নূপুর বাজে সেখানে রঙছুট ময়ূরী খেলা করে। বিরহের গভীর সুর বাজে। মন ময়ূরী একলা।

শক্ত পাথরে মন-পাখি বাঁধছে বাসা।

রঙছুট ছবি। ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে এল সবুজ রঙ। সেখানে ভোরের পাখি শীতের সকালে গান গেয়ে বলে, 'বেরিয়ে আয়-না আমার কাছে, রঙিন জগতে।'

'স্মৃতি জাগায় বহুকাল আগের। মন চায় বাড়ি ফিরতে, বোঝা বাঁধাছাঁদা করে। স্বপ্নে দেখে বহুকাল আগের ছেড়ে আসা বাড়িঘর ঘাট মাঠ গাছ।

তার পর সবশেষে প্রকৃতিমাতা দেখা দেন নিশাপরীর মত। নীল ডানায় ঢাকা আকাশ, ঘরের সন্ধ্যাপ্রদীপ ধরে একটুখানি আলো।

এই হলো শিল্পীর জীবনের ধারার একটু ইতিহাস। শুধুই উজানভাঁটির খেলা। উজানের সময় সব কিছু সংগ্রহ করে চলতে চলতে ভাঁটার সময়ে ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে দিয়ে যাওয়া। বসন্তে যখন জোয়ার আসে ফুল ফুটিয়ে ভরে দেয় দিকবিদিক, আবার ভাঁটার সময়ে তা ঝরিয়ে দিয়ে যায়। আমারও যাবার সময়ে যা দুধারে ছড়িয়ে দিয়ে গেলুম তোমরা তা থেকে দেখতে পাবে, জানতে পাবে, কত ঘাটে ঠেকেছি, কত পথে চলেছি, কি সংগ্রহ করেছি ও সংগ্রহের শেষে নিজে কি বকশিশ পেয়ে গেছি।

এতকাল চলার পরে বকশিশ পেলুম আমি তিন রঙের তিন ফোঁটা মধু।'

ঋগ্বেদের ঋষি কবি বিশ্বপ্রকৃতিকে আর প্রাণ-প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন খোলা চোখে। কিন্তু তাঁদের সে দেখাকে যখন সূত্রকার ভাষায় তাঁরা প্রকাশ করলেন যেন তাতে রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষার কতো রাখা-ঢাকা। ভারত-পরম্পরায় ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে সৃজনশীল কবি ও শিল্পী সেই বৈদিক ঋষিদের সগোত্র। তাঁদের বাচনে ও লেখনেও আমরা পাই সেই আলো-ছায়ার লুকোচুরি। অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই পরম্পরার বাহক। ভারতশিল্পী নন্দলালের কথা যথাসময়ে প্রকাশ পাবে।

শিল্প বিষয়ে শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সে এই প্রহেলিকা-বিলাসের আমরা সূচনা দেখি ১৯২৫ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে লেখা তাঁর দু-খানি পত্রে। পত্র দু-খানি তিনি লিখেছিলেন শান্তিনিকেতনে তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য আচার্য নন্দলালকে। পত্র দুখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩২ সালের ফাল্গুন সংখ্যার শান্তিনিকেতন-পত্রিকায়। গুরু অবনীন্দ্রনাথের এই পত্রধারার যথাযোগ্য উত্তর দিয়েছিলেন শিষ্য আচার্য নন্দলাল ও প্রশিষ্য রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁদের 'পরিপাটি উত্তর' পেয়ে গুরু অবনীন্দ্রনাথ ওঁদের শিল্পপদ্ধতি সম্পর্কে কিছু উপরন্তু উপহারও পাঠিয়েছিলেন— ছড়ায় ও গদ্যে। নন্দলাল ও রমেন্দ্রনাথের উত্তরগুলি অবনীন্দ্রনাথের সংগ্রহে থাকার কথা। আমরা সেগুলি সন্ধান করে পরে প্রকাশ করব।

আমাদের মনে হয়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মহাশিল্পী এই গুরুশিষ্যের

শিল্পবিষয়ে বাকোবাক্য বা প্রহেলিকা-বিলাস থেকে দূরে থাকতে পারেন-নি। মহাকবি মহাশিল্পীদের এই ভাবান্বয় সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে একটি ছত্রে ভারতশিল্পতত্ত্বের মর্মকথা অপরূপভাবে প্রকাশ করেছেন —

'সাদা কালোর দ্বন্দ্বে যে তাই ছন্দে নানান্ রঙ জাগে।'

আচার্য নন্দলালকে লেখা অবনীন্দ্রনাথের মূল পত্র দু-খানি এই —

শুক্রবার

জোড়াসাঁকো

প্রিয় নন্দলাল!

কবির জন্মদিনে তোমরা যোগ দিয়ে উৎসব করছো সুতরাং নিশ্চয়ই তোমরা রূপদক্ষ এবং রসিকও বটে. আমি এসম্বন্ধে কোনো তর্ক তুলছিনে শুধু আমি কেন যেতে পারলাম না তাই বলি —আজ সকাল থেকে আলোর একটি সাদা পাখি এবং অন্ধকারের একটি কালো পাখি দু-জনে দুটি পালক আমার সামনে ফেলে দিয়ে বল্লে এর মধ্যে কোনটি সাদা কোনটি কালো বিচার করে বলো —ভাবতে ভাবতে রেলের সময় উৎরে গেল প্রশ্নেরও মীমাংসা হলো না, তাই তোমাদের শরণাপন্ন হচ্চি —আমার নাম ডোবে যদি তোমরা কেউ এর সদুত্তর একটি সাদা পালক আর একটি কাল পালকের সঠিক হিসেব না লিখে পাঠাও। দিন-রাত দু-জনে আমাকে মহাসমস্যায় ফেলে তোমাদের ওখানে উৎসব করতে গেছে —আমি এখানে বসে মনের আসনে সাদা কালোর আল্পনা টান্‌চি আর কল্পনায় দেখছি কবির সঙ্গে তোমরা সেই আসনে বসে উৎসব করছো।

রবিকাকাকে আমার প্রণাম দিও বন্ধুজনকে সম্ভাষণ জানিও তোমরা. এবং ছোটরা আমার বাকি যে শুভকামনা নিয়ো। মন গেল উড়ে সেখানে মাথা বসে বসে ভাবছে সাদা-কালো পালকের তত্ত্বকথা। আর থেকে থেকে পাখার বাতাস খাচ্ছে।

[১৯২৫]

তোমারি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২)

রবিবার

জোড়াসাঁকো

প্রিয় নন্দলাল !

তোমার আর রমেনের কাছ থেকে প্রশ্নটির পরিপাটি উত্তর পেয়ে আনন্দিত হলেম। গিরি মাটির রংটি রং এবং রূপ দুয়ের মাঝে বৈরাগীর মতো নির্লিপ্তভাবে বসে থাকে, রূপের পরশ রং-এর আভা তার উপর দিয়ে আসা যাওয়া করে কিন্তু কাবু হয় না বৈরাগী, সাদা কাগজ সাধাসিধে মানুষটি তাকে রং রূপ দুজনেই সহজেই কাবু করে, রংএর সঙ্গে রূপের সঙ্গে সে লিপ্ত হয়ে যেতেই চায় 'রং-এর ধারায় (রূপ) হৃদয় হারায়' এই দেখতে পাই বিশ্বচিত্রে —কিন্তু মানুষের চিত্র সেখানে রূপকে সজাগ করে দিতে রইলো বৈরাগী, ও রং রূপকে রং-এর সমুদ্র রং-এর আবর্ত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে চল্‌ল বৈরাগী নয়ও বটে প্রায় সাদা কাগজ বটে আবার রং বললেই চলে ওকে । তার পরে আর এক কথা গিরিমাটির রং হলো জাৎসাপের মতো ওর একটা আভিজাত্য আছে, অন্য রং তারা আভা রং নয়, তারা হঠাৎ নবাবের মতো বহুরূপী ও ক্ষণিক তাদের প্রকাশ, নটনটির মতো তারা সাজসজ্জা করে যখন আসে তখন বৈরাগী পালাই পালাই করেন বটে মনে হয়, কিন্তু ঘাটি আগলে নিজেকে সমান বরাবর বসেই থাকে ঠিক জায়গায়, রং-এর খেয়াল রূপের লীলায় তিনি বাধা দেন না, এইটেই প্রমাণ করেন যেন তিনি কেউ নন, রূপ রং তারাই সব, রং-এর বাক্সর থেকে তিনি ডেকে বলেন, আমি তৃণাদপি কমজোর আমার চেয়ে রংরাই সব কার্যকরী ওদের নিয়ে খেলাঘর বাঁধ, ওরা কেউ শক্তিমান কেউ রূপবানও, আমার রূপও নেই শক্তিও নেই কিন্তু মাটির মতো আমি স্থির রূপের রং-এর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমাকে জেনো, আমার মধ্যে রং রূপ আছে এবং নেই।

এই প্রশ্নের সদুত্তর দিয়েছ তাই তোমাদের সকলকে আর্ট সম্বন্ধে আমার একটা বচন উপহার পাঠাই—

পুতলী গড়তে চারদিক দেখি
পটটি লিখতে একদিক লেখি

তোমারি

[১৯২৫] শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুঃ—

চিত্র একমুখি—গড়ন চারমুখি, এখন ছবিতেও Perspective ইত্যাদি দিয়ে চার মুখ দেখানো হচ্ছে. আসল কিন্তু সেগুলো ছবি হচ্ছেনা গড়ন হচ্ছে. খাঁটি পট লিখবে তো এক মুখ লিখবে। পারস্য দেশের গালিচা একমুখি পটের নমুনা—বিলাতি গালিচা চতুর্মুখ গড়নের নমুনা।

॥ আচার্য নন্দলালের নির্বাচিত উল্লেখযোগ্য স্কেচ্‌-কর্ম, ১৯২৩ ২৫ ॥

নন্দলালের প্রথম পর্যায়ের ৯ সংখ্যক স্কেচ্‌-বইয়ে ১৯২৩ সালে করা একটি স্কেচ্‌ রয়েছে—তেজুবাবুর বেহালা বাদন। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক তেজশচন্দ্র সেন ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তেজুবাবু বেহালা বাজিয়ে তাঁর অবসর যাপন করতেন। কিন্তু তিনি বাজনা ছেড়ে দিলেন, গুরুদেব বাজাতে নিষেধ করেছিলেন বলে। কিন্তু নন্দলালের সেটা মনঃপূত হয়নি। বন্ধুকে বুঝিয়েও আর বেহালার ছড়ি ধরাতে পারেননি। এতে নন্দলালের ধারণা হলো, তেজুবাবুর বেহালা বাজাবার ধাত ছিল না, সেইজন্যেই ছেড়ে দিলেন। ৮৬ সংখ্যক ছবিটি হচ্ছে- একজন সাঁওতাল মাজী পুতুল নাচ করাচ্ছে।

এই পর্যায়ের ১৯ সংখ্যক স্কেচ্‌-বইয়ে ১৭ সংখ্যক ছবিটি হলো—মকরের মুখ—১৯২৪ সালের 'রূপম্‌' পত্রিকার ২৭ সংখ্যক পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে। রূপমের প্লেটসংখ্যা $\frac{৭০৫}{১২৮৭}$। পরে এই মকরের মুখটি থেকে অনেক সাহায্য নেওয়া হয়েছিল হরিপুরার কংগ্রেস-মণ্ডপ মণ্ডন করবার সময়ে পট আঁকতে গিয়ে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ২ সংখ্যক স্কেচ্‌-বইটিতে মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা হচ্ছে ১০। এই স্কেচ্‌-বইয়ের প্রথম দফার ছবি :—১৯২৪ সালে এ. মিত্র নামে একজন আর্টিস্ট্‌ শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। বাড়ি ছিল তাঁর রাঁচিতে। এখানে এসেছিলেন কলকাতার আর্টস্কুল থেকে পাশ করে। তিনি নিজের হাতের কালি-তুলির অনেক ছবি উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন নন্দলালকে। সে-সব ছবি জীবন-চিত্র থেকে স্কেচ্‌ করা। নন্দলালের মতে, খুব ভাল আর্টিস্ট্‌ ছিলেন তিনি। এই স্কেচ্‌-বইয়ের দ্বিতীয় দফার ছবিগুলি হলো—নন্দলালের

নিজের করা ছবি--বাউলের বিভিন্ন পোজের স্কেচ্।

দ্বিতীয় পর্যায়ের ১ সংখ্যক স্কেচ্-বইয়ের ৯ সংখ্যক স্কেচ্‌টি হচ্ছে—১৯২৪ সালে তাঁর ছাত্র বিনোদবিহারী ছবি আঁকছেন। ১০ সংখ্যক স্কেচটি হচ্ছে গায়িকা সাবিত্রী দেবীর পোর্ট্রেট্। তখন তিনি ছাত্রী ছিলেন কলাভবনের। আর ৮ সংখ্যক স্কেচ্‌টি হচ্ছে নন্দলালের কনিষ্ঠপুত্র গোরা-চাঁদের প্রতিকৃতি।

নন্দলালের ১৪ সংখ্যক ডায়েরীতে দেখা যাচ্ছে: ১৯২৩ সালে তিনি বাৎসায়নের 'কামসূত্র' গ্রন্থ থেকে ঘর সাজানোর যে-সব পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায় তার নোট্ করে রেখেছেন।

১৯২৩ সালে কালীঘাটের শেষ পটো নিবারণচন্দ্র ঘোষের প্রতিকৃতি এঁকেছেন নন্দলাল কালীঘাটের পটোপাড়াতে গিয়ে। একজন সাঁওতাল মাঝী এসে পুতুলনাচ (আগে দেখুন) করাচ্ছে শান্তিনিকেতনে। রঞ্জন মিস্ত্রী—৭ই পৌষের দিকে আসতো। গ্রাম থেকে এসে ঘরামির কাজ আর কাঠের কাজ করতো।

নন্দলাল শান্তিনিকেতনে তখন খড়ের নতুন বাড়িতে আছেন। ১৯২৩ সালে সেই বাড়িতে থাকার সময়ে শ্রীমতী পূর্ণিমা ঠাকুরের পিতা সুহৃৎবাবু সুহৃৎনাথ চৌধুরী নন্দলালকে একটি কাট্রি কুকুর উপহার দিয়েছিলেন। সেই পাহাড়ী কুকুরটিকে ওঁরা পালন করতেন। তারই স্কেচ করেছেন নন্দলাল। শেষে কুকুরটার অসুখ করেছিল—'মেঞ্জ' (Menge) হয়েছিল। তার জন্যে নন্দলাল ওষুধ আনালেন কলকাতা থেকে। কিন্তু অসুখ সারলো না কিছুতেই। কুকুরটা মারা গেল। মরণকালে তার মুখে গঙ্গাজল দিলেন আচার্য নন্দলালের স্ত্রী।

১৯২৭ সালে মেয়েদের বোর্ডিং-এ বাসন-মাজার জায়গাটা করা হয়েছিল একটু নতুন ধরনের।—তার স্কেচ্ করা রয়েছে।

এই সময়ে নন্দলাল নাগকেশর আর চাঁপা ফুলের নক্সা করেন প্রথম। কুসুম ফুলেরও নক্সা করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে ভালো লেগেছিল কুসুম ফুলের নক্সা।

পেতলের আর কাঠের তৈরি কুন্‌কে পাওয়া যায় বীরভূম-অঞ্চলে ধান চাল মাপার জন্যে।—এর গঠনবৈশিষ্ট্যের ডিজাইন এঁকেছেন নন্দলাল।

কাঠের ওপর পেতলের কাজ-করা তাল গাছের ডিজাইন আছে কুন্‌কের গায়ে। কাঠের কুন্‌কেতেও কেবল কাঠের ওপর তালগাছের ডিজাইন খোদাই করা। বীরভূমের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য গ্রামের শিল্পীরা যেন তাদের এই নিত্যব্যবহার্য তৈজসে ফুটিয়ে তুলেছেন।

তামার তৈরি একটি নেপালী কৌটোর গায়ে 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্' লেখা আছে তিব্বতী অক্ষরে। তার ডিজাইনের নক্সা। তবে এই রকম ডিজাইন করা কৌটো দুষ্প্রাপ্য নয়।

শিরীষ ফুলের ডিজাইন। নন্দলালের চোখে তার বৈশিষ্ট্য সেই নতুন ধরা পড়েছে।

আলিপুরের জু তে খুব বড়ো কচ্ছপ ছিল। তার ডিজাইন। এ ছাড়া, নানা জন্তু-জানোয়ার পাখী-টাখীর ছবির স্কেচ্ করা আছে। শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন নিউজিল্যাণ্ড থেকে জেকভশন (১৯৩৩) অধ্যাপনা করতে। তাঁর স্কেচ্-পোর্ট্রেট্। জেকভশন ছিলেন ডিউইর ছাত্র —ডিউই ছিলেন আমেরিকার অধিবাসী।

তাপসীর ছবি —তাপসী ছিলেন তেজুবাবুর ভাগনী।

১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের নোট্‌বই থেকে দেখা যাচ্ছে: নন্দলাল ভালো ভালো স্কেচ্ করে রেখেছেন—কুমীরের, গণ্ডারের মুণ্ডুর। এ-ছাড়া রয়েছে একটি ভালো স্কেচ্ —সুরুল গ্রামের একজন মা ও ছেলে। আর আছে চিতল মাছের স্কেচ্, কুকুর ও কুকুরছানার স্কেচ্, বসন্তকালের কতকগুলি ফুলের স্কেচ্। সেই সময়ে জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপের অসুখ, দেখছেন তাঁকে ডাক্তার হরিচরণ মুখুজ্জে।

[এই ডাক্তার হরিচরণ মুখুজ্জে মশায় দ্বিপুবাবুরও চিকিৎসক ছিলেন। দ্বিপুবাবু তাঁর চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর জুড়ি-গাড়িখানি তাঁকে উপহার দেন।]

১৮ সংখ্যক কড়চায় রয়েছে: পিয়ার্সনের জন্যে একটি এ্যাগেটের (agate) ছুরির নক্সা। —হ্যাভেল সাহেবের ডিজাইন থেকে করা।

২৭ সংখ্যক কড়চা: 'লখনৌ মিউজিক্যাল কন্‌ফারেন্সের সময়ে একটি বাড়িতে আমি, অবনীবাবু আর কে. এল. গোমস্তা (?) থাকতুম—দোতলায়।'

সেই সময়কার কয়েকজন গাইয়ের স্কেচ্।' একটি সুরবাহার যন্ত্র। আলাউদ্দীনের মহি আর ব্যাণ্ডের দলের লোকের ছবি। বাড়ির কাছেই বাদশাহের তহ্খানা। —মাটির নিচে ঘর। বেগমদের থাকবার ঘর। একটি স্নানের হামাম। হামামের নক্সার স্কেচ্। গোমতীর ধারের নক্সা।

৩৫ সংখ্যক কড়চায় আছে : ২৯-১২-১৯২৩। প্রথম স্কেচ্ হলো (১) লাউসেনগড়, ইছাই ঘোষের দেউল (২) ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনুকরণে তৈরি (৩) লাউসেনগড়ের শ্যামারূপা-মন্দিরের মধ্যে ইছাই ঘোষের মূর্তি —আট দশ ইঞ্চি উচুঁ হবে।

॥ আচার্য নন্দলালের অঙ্কিত চিত্রপঞ্জী, ১৯২১-২৫ ॥

জের ১৯২১ : প্রচ্ছদপট, রাসকুঞ্জে গায়ত্রী দেবী, ধূলায় লুণ্ঠিতা অবস্থায় শক্তিদেবীর মূর্ছা, হরিমতী সমাধিমগ্না।

১৯২২ : মাটি-কাটা, শিবিরে কৃষ্ণ ও অর্জুন, মধ্যাহ্নে প্রতীক্ষা, বীণাবাদিনী, প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষা, রবীন্দ্রনাথের কবিতা-চিত্রণ, পেচক, রাজগৃহে বিশ্রামভবন, শান্তিনিকেতনে কুয়ায় ছেলেদের স্নান, শান্তিনিকেতন থেকে গরুর গাড়িতে যাত্রা, বর্ষামঙ্গল, রাজগৃহে, সিলভ্যাঁ লেভিকে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত মানপত্র-চিত্রণ, স্বদেশী কার্টুন।

১৯২৩ : ঝড়ের রাতে, জবাফুল, কাঠিয়াবারের মন্দিরা-নৃত্য, পিয়ার্সনকে প্রদত্ত উপহার, আনমনা, এ্যাণ্ড্রুজের পোর্ট্রেট্, উমার প্রত্যাখ্যান, বেলাশেষে।

১৯২৪ : জলসত্র, পসারিণী, জাপানী খোঁপা, আলোর সমুদ্র, পালতোলা নৌকা, পোয়ে নৃত্য, হাত-পাখাতে আঁকা ছবি, কৃষ্ণচূড়া ফুল, বুদ্ধের আর্তসেবা, সাঁচীর স্তূপ ও সাঁচীর গেট, গুরুদেবের মূর্তি, বীরভূমের তালগাছ আর কোপাই নদী, ভেড়াকাঁধে বুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের দু-টি চিত্র : (ক) একজন মহিলা, (খ) রঘুপতি, জগদানন্দবাবুর 'পাখী' ও 'বাঙ্গলার পাখী'-গ্রন্থের বর্ণনা ও প্রচ্ছদ-চিত্রণ, নিরঞ্জনাতে স্নান করে বুদ্ধ পাহাড়ে উঠছেন।

১৯২৫ : শান্তিনিকেতনের দিগন্ত, গোপিনী, আশ্রমের মর্মপীঠ, আনমনা, উত্তাল

সমুদ্রে ঢেউয়ের তোলপাড়, স্টেন্ কোনোকে প্রদত্ত মালপত্র-চিত্রণ, শিবপূজা, রাতের প্রহরী, অর্জুনের তপস্যা, পর্বতশিখর, হরিণের পাল, কুরুক্ষেত্র, বীণাবাদিনী, পুরানো বাড়ি, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি থেকে দু'টি ছবি— (ক) 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' (খ) 'একটি নমস্কারে প্রভু', দুর্গা, ভেড়া-কাঁধে বুদ্ধ —রাজগৃহে, কৃষ্ণকলি, রেখাচিত্র, প্রচ্ছদপট, রন্ধনরতা গৃহস্থবধূ।

॥ চিত্র-পরিচয়, ১৯২১ ২৫ ॥

জের ১৯২১ : **প্রচ্ছদপট**—হাতে-লেখা 'বিশ্বভারতী-পত্রিকা'র প্রচ্ছদপট—২খানি

রাসকুঞ্জে গায়ত্রী দেবী—সুরুলের কার্তিকচন্দ্র সরকারের 'গায়ত্রী'—নাটক-চিত্রণ (পৃ. ১)।

ধূলায় লুণ্ঠিতা অবস্থায় শক্তিদেবীর মূর্চ্ছা—ঐ, ঐ (পৃ. ৬৫)

হরিমতি সমাধিমগ্না—ঐ, ঐ (পৃ ৮৬)।

এই ছবি তিনটির পরিচয় আগে দেখুন। (সবিতা, শ্রাবণ, ১৩৭৩, পৃষ্ঠা ১১৩-১৪।)

১৯২২ মাটি-কাটা :

শিবিরে কৃষ্ণ ও অর্জুন—ওয়শ। 'এই ছবিটিরও সারথি। আগের পার্থসারথি থেকে আলাদা। পার্থ বসে আছেন, সামনে কৃষ্ণ। ছবিটি এঁকেছিলুম S E. tokes সাহেবের জন্যে। Stokes সাহেব পাঞ্জাবী মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। ওঁদের ইচ্ছাতেই ছবিটি আঁকা। লেভি সাহেব আমার ছবিটি দেখেছিলেন। তাঁর পছন্দ হয়নি। বলেছিলেন —'বড়ো ডেলিকেট্ হয়েছে।'

মধ্যাহ্নে প্রতীক্ষা—ওয়শ।

বীণাবাদিনী—১৭½"×৯½", টীক্ উড্, টেম্পেরা। 'সোসাইটিতে দিয়েছিলুম, সেখানে থেকে শ্রীমতী কিনেছিলেন। শিশুবিভাগে তখন কলাভবনের ক্লাস হতো। তার বারাণ্ডায় বসে এঁকেছি।'

প্রতীক্ষা (Black House)—১৬"×১৩", নেপালী কাগজ, রঙে টাচের কাজ। নিজ-সংগ্রহ। 'শ্রীনিকেতনে একটি অশ্বত্থগাছের ওপর গুরুদেব জাপানী পদ্ধতিতে একটি বাড়ি করিয়েছিলেন, কাসাহারার নির্দেশে বাড়িটি করেছিলেন কোনো সান্। সেখানে গিয়ে গুরুদেব মাঝে মাঝে থাকতেন। সেই ঘরটি দেখে এই ছবিটি আঁকা। প্রশান্ত রায়ের স্ত্রী গীতা রায়কে এর একটা কপি দিয়েছিলুম।' দ্র. সবিতা পৌষ, ১৩৭৩, পৃ ৫৯।

প্রতীক্ষা—১৮"×৮", টেম্পেরা।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা-চিত্রণ— ১০½"×৭", নেপালী মাউন্ট-করা পেপার, টেম্পেরা। গীতাঞ্জলির তিনটি কবিতা Illuminate করা হয়েছে। শান্তিনিকেতন-কলাভবন-ম্যুজিয়মে আছে।

পেচক—৯½×৬", ওয়শলি, টেম্পেরা, কলাভবন-ম্যুজিয়মে আছে।

রাজগৃহে বিশ্রামভবন —টেম্পেরা।

শান্তিনিকেতনে কুয়ায় ছেলেদের স্নান—২৬"×১৬", হাল্কা লালে লাইনের কাজ।

শান্তিনিকেতন থেকে গরুর গাড়িতে যাত্রা—দ্র. (সবিতা অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩, পৃ. ৫৯।) বর্ষামঙ্গল।

রাজগৃহে —টেম্পেরা।

সিলভ্যাঁ লেভিকে রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত মানপত্র-চিত্রণ।

স্বদেশী কার্টুন—পরিচয় আগে দেখুন। (সবিতা কার্ত্তিক, ১৩৭৩, পৃ ৮২।)

১৯২৩ ঃ ঝড়ের রাতে - ১৩½"×৯½", জাপানী কাগজ, ওয়শ। আশ্রমের তিনটি মেয়ে জলঝড়ের মধ্যে পড়ে ভিজতে ভিজতে ছুটে যাচ্ছে। প্রবাসী ১৩৩২-এ ছাপা হয়েছে। —'আমার বড় মেয়ে গৌরীর কাছে আছে।'

জবাফুল—৭¼"×৫½", ওয়শলি, টেম্পেরা। 'একটি মেয়ে পোষা ময়না পাখীকে খাওয়াবার জন্যে প্রজাপতি ধরছে। পরনে তার লাল শাড়ী। তার শাড়ীর রঙ্গে রং মিলিয়ে 'জবাফুল' নাম দিয়েছি। শান্তিনিকেতন-কলাভবন-ম্যুজিয়ামে আছে।'

কাঠিয়াবারের মন্দিরা-নৃত্য—১০½"×৬", কার্টিজ পেপার, ইঙ্কে টাচের কাজ।

নিজ-সংগ্রহ। (দ্র. সবিতা, আশ্বিন, ১৩৭৩ পৃ ১৪১।)

পিয়ার্সনকে প্রদত্ত উপহার—শ্লোকসমেত ছবি। (দ্র. সবিতা, অগ্রহায়ণ, ৭৩, পৃ ৭৮।)

আনমনা—আগে দেখুন।

এ্যাণ্ড্রুজের পোর্ট্রেট—(দ্র. সবিতা, ১৩৭৩ পৃ. ৮৬।)

উমার প্রত্যাখ্যান—আগে দেখুন।

বেলাশেষে—রঙ্গিন ছবি। নদীতে নৌকো ভাসছে। তাতে খোলা-চুলে শুয়ে আছে একটি মেয়ে। পরনে তার সাদা শাড়ী। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে আছে। Modern Review-এ ছাপা হয়েছে ১৯২৩ সালে।

১৯২৪ : জলসত্র—আ ১৪"×১১", কার্টিজ পেপার, ওয়শ। 'ছোট্ট একটি মেয়ে বড় একটা অশ্বত্থ গাছের নিচে বাঁশের তৈরি মাচার ওপর বসে আছে। সামনে আর পিছনে রয়েছে জল-ভরতি কলসী। দুটো বড়ো জালার গলা পর্যন্ত বালি দিয়ে ঢাকা। মেয়েটি বসে রয়েছে। পিপাসার্ত পথিককে জলদান করবে বলে। মাচার ওপর খড়ের ছাউনি। পথিকদের বসার জায়গা রয়েছে। জলপানের সুবিধের জন্যে বাঁশ-ফাটানো চোঙ্ বাঁধা রয়েছে খুঁটিতে। ডাক্তার ডি. পি. ঘোষকে উপহার দিয়েছিলুম।

পসারিণী—ওয়শ।

জাপানী খোঁপা—(দ্র. সবিতা, মাঘ, ১৩৭৩, পৃ. ৭৯-৮০।)

আলোর সমুদ্র—ওয়শ।

পালতোলা নৌকো—(দ্র. সবিতা, মাঘ, ১৩৭৩ পৃ. ৭৬-৭৭।)

পোয়ে নৃত্য—৪২"×২৭", টেম্পেরা। (দ্র. সবিতা, পৌষ, ১৩৭৩, পৃ. ৭১-৭২।)

হাত-পাখাতে আঁকা ছবি—(দ্র. সবিতা, মাঘ, ১৩৭৩ পৃ. ৭৩-৭৪।)

কৃষ্ণচূড়া ফুল—২৪½"×১৩", নেপালী কাগজ, টেম্পেরা, টাচের কাজ। 'একটি মেয়ে বারাণ্ডায় বসে চিঠি পড়ছে। কৃষ্ণচূড়ার গাছ ঘরের ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। বসন্তকালের পরিবেশ। এই ছবিখানি 'বসন্ত' নামেও প্রিন্ট্ হয়ে থাকতে পারে।' (সোসাইটির ক্যাটালোগে এই ছবির তারিখ রয়েছে ১৯২৫)। নিজ-সংগ্রহে আছে।

বুদ্ধের আর্তসেবা—১২"×৮½", লাইনের কাজ।

সাঁচীর স্তূপ ও সাঁচীর গেট—দ্র. (সবিতা ১৩৭৩, মাঘ, পৃ. ৯০।)
শুকদেবের মূর্তি— ঐ ঐ ঐ ।
বীরভূমের তালগাছ আর কোপাই নদী—দ্র (সবিতা পৌষ, ১৩৭৩ পৃ. ৮৯।)
ভেড়াকাঁধে বুদ্ধ—১৯"×১২", কন্‌টিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, ওয়শ।
'রাজগীরে বিম্বিসার যখন যজ্ঞ করেন তাতে বহু ভেড়া উৎসর্গ করা হয়েছিল। সেই ভেড়ার দলের মধ্যে থেকে বুদ্ধদেব একটা খোঁড়া বাচ্ছা ভেড়াকে কাঁধে নিয়ে যজ্ঞস্থানে গেলেন ও ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।' (প্রথম অঙ্কন) দ্র. (সবিতা পৌষ ১৩৭৩ পৃ, ৮৬-৮৭।) বোধহয় নিজ-সংগ্রহে আছে।
রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের দু-টি চিত্র—(ক) একজন মহিলা (খ) রঘুপতি —৮"×৫$\frac{১}{৪}$"। এটা আঁকা ছবি নয়, পাতলা রঙ্গিন কাগজ কেটে কেটে জোড়া। রঘুপতি দাঁড়িয়ে আছেন। কলাভবন-মুাজিয়মে আছে।
জগদানন্দবাবুর 'পাখী' ও 'বাঙ্গলার পাখী' গ্রন্থের বর্ণনা ও প্রচ্ছদ-চিত্রণ—
(দ্র. সবিতা, কার্তিক, ১৩৭৩, পৃ. ৬৯-৭০।)
নিরঞ্জনাতে স্নান করে বুদ্ধ পাহাড়ে উঠছেন।

১৯২৫ ঃ শান্তিনিকেতনের দিগন্ত—৩২"×২৬$\frac{১}{২}$", ওয়শ।
গোপিনী—(রঙ্গিন) 'একটি মেয়ে দুধ বিক্রী করতে যাচ্ছে। ডান হাতে শালুক ফুল। প্রভাতের বাঁকা চাঁদ মেঘে ঢাকা।'
আশ্রমের মর্মপীঠ—৬"×৩$\frac{১}{২}$", টেম্পেরা। নিচু-বাঙ্গালায় দ্বিজেন্দ্রনাথ।
(দ্র. সবিতা, আষাঢ়, ১৩৭৩, পৃ ১১০-১১।)
আনমনা—ওয়শ, আগে দেখুন।
উত্তাল সমুদ্রে ঢেউয়ের তোলপাড়—(দ্র. সবিতা, ফাল্গুন, ১৩৭৩ পৃ, ৭১।)
স্টেন কোনোকে প্রদত্ত মানপত্র-চিত্রণ—
শিবপূজা—ওয়শ।
রাতের প্রহরী—ওয়শ।
অর্জুনের তপস্যা—আ. ১৫"×৭$\frac{১}{২}$", কার্টিজ পেপার, ওয়শ, রঙ্গে টাচের কাজ, 'পাহাড়ে বরফ গলে ঝরে ঝরে পড়ছে। অর্জুন দাঁড়িয়ে তপস্যা

করছেন উর্ধ্ববাহু হয়ে। খুব গোড়ার দিকের টাচের কাজ এটি। অত আগে করেছিলুম। খুব সম্ভব শান্তিনিকেতনে বসে আঁকা। একজন সাহেব কিনেছিলেন ২৫০ টাকা দিয়ে।'

পর্বতশিখর—ওয়শ।

হরিণের পাল—ওয়শ।

কুরুক্ষেত্র—৩০"×২১"/২৯½"×২৭½", কার্টিজ পেপার, টেম্পেরা। 'অর্জুন ঘোড়ার রাশ ধরে আছেন। ছবির ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড্‌টা টক্‌টকে লাল—সন্ধ্যে হয়ে গেলে যেমন হয়। প্রফুল্লনাথ ঠাকুর সংগ্রহে আছে।

বীণাবাদিনী—লাইন ড্রইং।

পুরানো বাড়ি—৫½"×৩½"/৬·৮"×৪·৮"; নেপালী কাগজ, ইঙ্কের কাজ।

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি থেকে দু-টি ছবি—

(ক) **'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য'**—১৪"×৯", টেম্পেরা।

(খ) **'একটি নমস্কারে প্রভু'**—৩·৮"×৯", টেম্পেরা।

দুর্গা—৩·৮"×২·৮"/৩·৮"×২·৮", 'প্লেন সাদা কাগজের ওপর, বাঙ্গলা পদ্ধতিতে বা পটের স্টাইলে আঁকা। নিজ-সংগ্রহ। কার্টিজ পেপার. চাইনীজ ইঙ্কে লাইনের কাজ, আনন্দবাজারে ছাপা হয়। আনন্দবাজারের Original থেকে পরে ম্যাসোনাইট্‌ বোর্ডে চিত্রিত করে (৪৭½"×২৭") কৈলাসনাথ কাট্‌জুকে দেওয়া হয়। ছবিটি এখন গভর্নমেণ্ট প্যালেসে আছে।

ভেড়াকাঁধে বুদ্ধ রাজগৃহে—১১½"×৭" —লাইনের কাজ, (২য় অঙ্কন)।

কৃষ্ণকলি—১৭½"×১২", গোপালপুরে আঁকা। মূল্য ২০০ টাকা। নিজ-সংগ্রহ।

রেখাচিত্র—

প্রচ্ছদপট—ফণীন্দ্রনাথ বসুর 'বিক্রমশীলা' বইয়ের জন্যে আঁকা।

রন্ধনরতা গৃহবধু—অধ্যাপক কার্লো ফরমিকিকে প্রদত্ত উপহার। (দ্র. সবিতা, চৈত্র, ১৩৭৩, পৃ ৬৬-৬৭।)

॥ বিভিন্ন কারুশিল্পিগোষ্ঠীর আগমন ও তাঁদের কাজে উৎসাহদান ॥

'দেশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে কারুশিল্পীদের সমাদর করে ডেকে এনে কাজ করালে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হবে, আর দেশের কারুশিল্প ও চারুশিল্প হাত মিলিয়ে চলতে পারবে, এই বিষয়ে হ্যাভেল সাহেব আর কুমারস্বামী আগেই ভেবেছিলেন। হ্যাভেল সাহেব কলকাতার আর্টস্কুলে যতদিন অধ্যক্ষ ছিলেন, নানাস্থান থেকে কারিগর আনিয়ে স্বদেশী গ্রামীণ শিল্পের ঐতিহ্য রক্ষা করতে ও তাদের ধারা অবলম্বন করাতে চেষ্টা করেছিলেন। এতে করে ফল হলো দুটো। প্রথম হলো গ্রামের কারিগর আসাতে তারা সঙ্গে নিয়ে আসতো তাদের বাপ-ঠাকুরদাদার ধারা। কিন্তু আধুনিক সংস্কৃতির দিক থেকে তারা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শহরে এসে তারা আমাদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে আমাদের সংস্কৃতিও পেতে থাকতো। পরে তারা গ্রামে ফিরে গিয়ে নিজেদের পেশা চালাতো ভালোভাবেই। দ্বিতীয়তঃ হলো, তারা এর ফলে তাদের পৈতৃক কাজ করতো উন্নত ধরনে।

'আমাদের পুরাতন আদর্শের সন্ধান তারা পেতো আমাদের কাছ থেকে, আর আমরাও তাদের বংশগত কারিগরি বিদ্যা পেয়ে যেতুম —এই ছিল আমাদের দুনো লাভের আদর্শ। তাদের কাছে কারিগরি শিখে আমরা তাদের সেই বিদ্যা নানা কাজে ব্যবহার করতুম।

'সেইজন্যে আমার ইচ্ছে ছিল, কোনো কারিগর আমাদের প্রতিষ্ঠানে এলে তার কাছ থেকে প্রথমে কাজ শিখবে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা, তাঁদের পরে শিখবে ছাত্রেরা। তবে আমার মতে, সে বিদ্যা ছাত্রদের শিখতে কোনো বাধ্য-বাধকতা থাকবে না। কিন্তু, শিক্ষকদের শিখতে আমি বাধ্য করতুম। যখন জয়পুরী মিস্ত্রী ফ্রেস্‌কো তৈরির জন্যে শান্তিনিকেতনে এলেন তখন আমাদের এখানকার শিক্ষক-ছাত্র সবাই তাঁর ছাত্র হলো। আমি বললুম, আমার ছাত্রেরা আপনার ছাত্র, আপনি এঁদের শেখান। তিনিও ছাত্রদের মতনই ব্যবহার করতেন শিক্ষকদের সঙ্গে, শাসনও করতেন তাঁদের। —ক্যা কানা হৈ, আঁখ নেহী, দেখ্‌তা নেহী—এই রকম সব বচন তাঁর মুখ থেকে ছুটতো হামেশাই। যখন তিনি চলে যান এখান থেকে, তখন আমি পরিচয় ভাঙতে, তিনি দুঃখ জানালেন। ক্ষমা-টমা চাইলেন।

আরায়েসের কাজ করবার সময়ে এখানকার যে-সব শিক্ষকদের ছাত্র ভেবে তিনি দুর্বাক্য বলেছিলেন, তার জন্যে জনায়ুতি ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

'কলাভবনের শিক্ষকদের আমি শিখতে বাধ্য করতুম, কারণ ওঁরা বরাবর থাকবেন এখানে। সেইজন্যে ওঁদের শেখাটাই একান্ত দরকার। ছেলেমেয়েরা চলে যাবে, সেইজন্যে শেখাটা ওদের তত দরকারী নয়। আমি যতদিন কলাভবনে ছিলুম, ফি বছর কারিগর আনাতুম এক জন-না-একজন। তাদের বেতন দেওয়া হতো, পরে, 'সহজপাঠে'র বিক্রীর টাকার মুনফা থেকে। আমি ছবি এঁকেছিলুম বলে গুরুদেব তাঁর তিন খণ্ড সহজপাঠের রয়েলটি আমাদের কলাভবনে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐ রয়েলটি বাবদ বেশ টাকা আসতো। তাতে একজন কারিগরকে খাইয়ে-দাইয়ে তার মাইনে দিয়ে এখানে রাখা যেতো। পরে কিন্তু, বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ ঐ রয়েলটির টাকাটা কলাভবনে দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। ফলে, সেই থেকে ঐ কারিগর আনার ব্যাপারটাও বন্ধ হয়ে গেল। অথচ, কর্তৃপক্ষ কলাভবনে কারিগর আনার জন্যে আলাদা কোনো ফাণ্ডের ব্যবস্থাও করলেন না। এতে কলাভবনের সমূহ ক্ষতি হলো। শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যাহত হলো।

'একবার একজন মক্ষিকা-পালককে আনিয়েছিলুম দক্ষিণ থেকে। কংগ্রেসে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। আলাপ হয়েছিল বোধহয় কংগ্রেসের ফৈজপুর-অধিবেশনে। তারপরে তিনি এখানে এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। পরে, আমি তাঁকে উৎসাহ দিয়ে এখানে রাখবার ব্যবস্থা করলুম। তাঁর কাছ থেকে মক্ষিকা-পালনের ব্যবস্থা আমাদের এখানে অনেকেই খুব ভালো করে শিখে নিলে। আমাদের পেরুমালও বেশ শিখে নিলেন। এখানে তিনি মৌমাছি-পালনও করতেন। আমিও ঐ বিদ্যে শিখেছিলুম। মক্ষিকাও পুষেছিলুম। আমার হাতখরচের টাকা থাকলে তাঁকে বারেবারে এখানে আনতে পারতুম। শ্রীনিকেতনের শিক্ষকদের ঐ বিদ্যে শেখা হয়নি। যদিও তাঁদের শেখা উচিত ছিল।

'কারুশিল্পী প্রথম এলেন জয়পুর থেকে। জয়পুরী আরায়েসের কাজ করতে জয়পুর থেকে মিস্ত্রী এলেন নরসিংহ লালা। ভালো ফ্রেস্‌কো করার নজর ছিল তাঁর। জয়পুরের ফ্রেস্‌কো নামকরা জিনিস। নরসিংহ লালাকে

শান্তিনিকেতনে আনানো হয়েছিল পর পর দু-বার। তাঁর থাকা খাওয়া বেতন সব মিটে যেতো ঐ 'সহজপাঠে'র টাকা থেকে।

'তিব্বতী শিল্পী আনালুম তিব্বত থেকে। তাঁকে দিয়ে কাজ করালুম তাঁর নিজের ধরনে; তিব্বতী ব্যানার, ভিত্তি-চিত্রের ছবি আঁকলেন তিনি তিব্বতী ধরনে। তিব্বতী শিল্পীর ভিত্তি-চিত্রের নমুনা আছে মেয়েদের ক্রাফ্‌ট্‌স্‌ ডিপার্ট্‌মেণ্টে। ব্যানারও অনেক করেছিলেন তিনি।

"ঢালাই-এর মিস্ত্রী আনালুম বাঁকুড়া থেকে। বাঁকুড়ার মিস্ত্রী ঢালাই-এর কাজে ওস্তাদ। ধান-মাপা কুন্‌কে, পেতলের চাল-মাপা কুন্‌কে, এই সব ঢালাই করলন তিনি। তাঁকে দিয়ে এখানে ঢালাই করার কাজ শেখানো হতো। কলাভবনের মডেলিং ক্লাসে শেখাতেন তিনি। তিনি ঢালাই করতেন খুব সাদাসিধেভাবে, ঘুঁটে সাজিয়ে আগুন করে। নিজের পদ্ধতিতে খুব সহজভাবেই সব কাজ করতেন তিনি। তাঁকে দিয়ে আমি অনেক মূর্তি করিয়ে নিলুম। সে-সব মূর্তি এখনো আছে কলাভবন-ম্যুজিয়মে—লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাম, সিতা এ-সব মূর্তি করা আছে তাঁর। বাঁকুড়ার মিস্ত্রীর সেই ঢালাই-এর পদ্ধতিও আমাদের অনেক শিক্ষক এখানে শিখে নিলেন।

'কারিগর এলো ওড়িষ্যা থেকে। নাম হলো ভুবন মহারাণা। সে শক্ত পাথর কাটতে পারতো না। খড়ি-পাথরে কেটে করতো। মূর্তি তৈরি করতো সে কেটে কেটে। তার সে-কাজও এখানকার অনেক শিক্ষক শিখে নিয়েছিল। ভুবন কারিগরকে আরও একবার আনবার আমার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তখন আমার source বন্ধ হয়ে গেছে।

'চীন থেকে চীনে শিল্পী এলেন। মহিলা শিল্পী। নাম হলো—Yao Yuan Shan। সংক্ষেপে ইয়ান্‌-শান্‌। ইনি কিছুদিন কলাভবনে ছাত্রদের আঁকতে শেখালেন চীনে পদ্ধতি মতে। এই মহিলা-শিল্পীটিকেও রেখেছিলুম মাসিক বৃত্তি দিয়ে। সে-ও ঐ টাকা থেকে।

'দক্ষিণ থেকে ঢালাইয়ের মিস্ত্রী আনা হবে ঠিক্‌-ঠাক্‌ করে ফেলেছিলুম। তিনি মাসিক ২০০৲ টাকা করে বেতন চেয়েছিলেন। তাও আমি দিতে পারতুম। কিন্তু 'সহজপাঠে'র রয়েলটি বন্ধ হওয়ায় সে আর হলো না।

'আরও কিছু শিল্পী রাজপুতানা থেকে, ওড়িষ্যা থেকে আনাবার ব্যবস্থা করেছিলুম। আমাদের আশ্রমে দিয়ে যেত তাদের কাজ। চীনের, জাপানের,

জাভার, আরও অন্য বিভিন্ন প্রাচ্য দেশের সব শিল্পকর্ম আশ্রমে সমাহরণ করে বিশ্বভারতীতে ভারতশিল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপসৃষ্টির কল্পনা ছিল আমার। এতে এখানকার শিক্ষা পেয়ে আমাদের শিক্ষকরা আর ছেলেরা কতো বড়ো হতে পারতো। যাই হোক্, যা করতে পারিনি তার জন্যে চিন্তা করে লাভ নাই। তবে, আমার বাসনা ছিল এই। এবং এইভাবেই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কারিগর আনিয়ে তাদের কাজে উৎসাহ দিয়ে, আমাদের ধারায় তাদের ধারা মিলিয়ে-মিশিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও শক্তিশালী ভারতশিল্পের প্রবাহ বহাতে আমি চেয়েছিলুম বিশ্বভারতীতে—এ-কথাটার রেকর্ড থাকা দরকার।

'হ্যাভেল সাহেব আর্টস্কুলে ফ্রেস্‌কোর জন্যে আনিয়েছিলেন জয়পুরী মিস্ত্রী। কাঠ-খোদাইয়ের কাজের জন্যে দক্ষিণী মিস্ত্রীও আনিয়েছিলেন। তারপরেই বন্ধ করে দেন। দক্ষিণী মিস্ত্রীর তৈরি সে-সময়কার কাঠের মূর্তি —'মঞ্জুশ্রী' আছে এখনও ওখানে। সোসাইটিতে অবনীবাবু আনিয়েছিলেন কাঠের কারিগর ওড়িয়া মিস্ত্রী গিরিধারী মহাপাত্রকে। গিরিধারী অবনীবাবুর বাড়িতেও অনেক কাজ করেছিল।

'আমি চালালুম শান্তিনিকেতনে ঐ আমার গুরুপরম্পরার পদ্ধতিতেই। তবে এখানে এর প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। চারদিক্ থেকে আশ্রমের সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অলঙ্করণের দিক্ থেকেও সে-সব কাজ, সব দেশের লোক এসে দেখে আনন্দিত হতো। সে-সবই এখানে করা হয়েছিল; বিশ্বভারতীর সম্পদ বাড়িয়ে দিয়েছিলুম।

'কলাভবনের ফার্দার ডেভেলপ্‌মেন্ট সম্পর্কে এখানকার কর্তৃপক্ষকে আমি একটা Scheme দিয়েছিলুম। সেটা আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলেন প্রমথ সেনগুপ্ত। কিন্তু, তিনি সেটা আর ফেরত দিলেন না। আমিও তার কপি রাখিনি। তবে সে স্কীমটির কিছু কিছু আমার মনে আছে।

'—আমার প্রথম কথা হলো, দেশ-বিদেশ থেকে বড়ো বড়ো শিল্পী আশ্রমে আনার ব্যবস্থা করা। তাঁরা এলে, এখানকার শিক্ষক আর ছাত্র সকলেরই শিক্ষা হবে, আর আশ্রমের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁরাও পরিচিত হবেন। এতে আমাদের আশ্রমিক শিক্ষার বৈচিত্র্যও বাড়বে। আর আমাদের ঐতিহ্যও শক্তিশালী হবে। প্রত্যেক দেশ থেকে বিখ্যাত শিল্পী, যেমন ইংল্যাণ্ডের মেটিসি, ফ্রান্সের বড়ো মডার্ন আর্টিস্ট পিকাসো —এঁদের সব

এখানে আনানো হোক্। এই রকম চীনের, জাপানের সব বিখ্যাত নাম-করা চিত্রকর, একজন একজন করে আনা হোক্। প্রত্যেক বিভাগের বড়ো শিল্পী আনা হোক্। এখানে তাঁরা শেখাতে আসবেন না, আসবেন নিজের কাজ করতে। আসবেন ভিজিটিং প্রোফেসারের মতো পাঁচ-ছ মাসের মতন। তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আর দেখা-শুনার ব্যবস্থা সব করতে হবে আশ্রম থেকেই। আশ্রমের শিক্ষক আর ছাত্রেরা সবাই মিলে তত্ত্বাবধান করবেন তাঁদের। তাঁদের জন্যে তাঁদের উপযুক্ত comfortable আর well equiped স্বতন্ত্র বাড়ি দিতে হবে। প্রয়োজনের উপযোগী বাড়ি, আসবাবপত্র, বাবুর্চি-টাবুর্চি তাঁদের যা যা দরকার লাগবে, সব দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, তাঁরা এখানে ভারতদর্শনে এসেছেন, আশ্রম থেকে যখন বাইরে দেখতে যাবেন, ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁদের escort করবার জন্যে সঙ্গে লোক দিতে হবে। এখানে গুরুদেব যেমনভাবে ফরেন প্রোফেসরদের এনেছিলেন, বিশ্বভারতীর প্রথম যুগে ইওোলজির বড়ো বড়ো প্রোফেসরদের এনেছিলেন, কলাবিদ্যার চর্চা করবার জন্যে এখানে তেমনি নামজাদা শিল্প-অধ্যাপকদের আনাবার ইচ্ছা ছিল আমার। এর ফলে, আশ্রমের সাংস্কৃতিক উন্নতি তো হতোই ; উপরন্তু, আশ্রমের ঐতিহ্যের সঙ্গে দেশ-বিদেশের ঐতিহ্যের যোগ হতো, হৃদ্যতা বাড়তো, সংগ্রহ বাড়তো। এর জন্যে অবশ্য টাকা provide করতেন বিশ্বভারতী। তবে, সেকালে আমরা এখানে এই আদর্শে কতক কাজ করেছিলুম তো! এখন (১৯৫৫) সরকার আমাদের patron। কাজেই, সরকার আমার এই স্কীম অনায়াসে গ্রাহ্য করতে পারবেন।

'দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষে যে-সব বড়ো বড়ো monument রয়েছে—যেমন, ইলোরা-এলিফ্যাণ্টার মূর্তি, মহাবলীপুরমের মন্দির, নটরাজ-মূর্তি। কণারকের ঘোড়া, হাতী ইত্যাদি নানা শিল্পপীঠের বিশিষ্ট শিল্পবস্তুর cast নিয়ে এসে এখানে সিমেণ্টে ঢালাই করে সমস্ত আশ্রমের ভেতর ছড়িয়ে দিতে হবে। এক-একটির জন্যে স্বতন্ত্র shade করে দিতে হবে। আর কংক্রিটের দরজা থাকবে তার। আশ্রমের এ-মুড়োথেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত রাখা থাকবে সে-সব। মনে হবে যেন, সারা ভারতবর্ষ এককাট্টা করা আছে এখানে। শান্তিনিকেতন দেখলে যেন সমগ্র ভারতবর্ষ দেখা হবে। বিদেশী পর্যটকরা এক জায়গাতেই সব

দেখতে পাবেন।

'তখন দীক্ষিত মশায় ছিলেন আরকিওলজি-বিভাগের কর্তা। তাঁকে পত্র লেখা হলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে জানালেন, তিনি অর্ডার দিয়েছেন, পাটনা ম্যুজিয়ম থেকে যক্ষিণীর মূর্তি, যক্ষমূর্তি-টুর্তির কাস্ট্ শান্তিনিকেতনে এনে রাখবার জন্যে। এক বছরে বা একবারে সব না হোক্, ধীরে ধীরে পরপর এখানে সব এনে সংগ্রহ করে রাখবার ইচ্ছা ছিল আমার। আর তার খরচাও এমন-কিছু বেশি হতো না। অল্প-খরচাতেই বিশ্বভারতী এ-সব নিদর্শন এনে এখানে রাখতে পারতেন। অতি উত্তম হতো এখানকার কর্তৃপক্ষ সে-সব নিদর্শন এখানে আনালে।

'আর আমার স্কীমের তৃতীয় কথা হলো, ঐ কারিগর আনার ব্যাপার। কারিগর আনার কথা বিস্তৃত বলেছি।

'চীনে ভ্রমণের সময় আমরা শিল্পবিষয়ে যে-সব আলোচনা করতুম, এল্‌মহার্স্ট সাহেব সে সমস্ত নোট্ করে রাখতেন। নানা কথা আলোচনা হতো আমাদের। তিনি ভাবতেন, এই তো চীনে যাচ্ছি, বিদেশে গিয়ে ভালো চীনে ছবি চিনে নেবো কি করে? আমার ধারণা, শিল্পের ভেতরকার গুহ্যকথা যে জেনে গেছে, সে সব দেশের শিল্পই চিনে নিতে পারবে। তিনি বললেন, —জানেন তো, চীনেরা ছবি কেমন কপি করে, ঠিক্ অরিজিন্যালের মতন। আমি বললুম, —ওতে লোকের ঠকে যাবার সম্ভাবনা আছে বটে। কিন্তু, নকলেও যদি মৌলিক ছবির গুণ থাকে, সেটা মূল বলে ভুল করে, না-চিনলেও তত দোষের হবে না। —এইভাবেই আমাদের আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল।

'চীনের ও জাপানের crafts দেখে এল্‌মহার্স্ট বললেন, —আমাদের দেশের অর্থাৎ ভারতবর্ষের ক্র্যাফ্‌টস্ সব নষ্ট হয়ে গেছে। সে-সব কি করে বাঁচানো যায়। সে-সব rejuvenate করতে হবে উৎসাহ দিয়ে। মোদ্দা কথাটা হলো এই, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আর্ট আর ক্র্যাফ্‌টসের একটা revolution করতে হবে। শিল্প-বিষয়ে সারা দেশের মানুষের মনকে শিল্পমুখী করে দিতে হবে। দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। একটা হৈ চৈ বাধিয়ে দিয়ে কারুশিল্পীদের প্রতি দেশের লোকের একটা জাগ্রত প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেওয়া দরকার। এলম্‌হার্স্টের এই আইডিয়া শুনে

আমি তাঁকে বললুম, —এটা ভালো যুক্তি, কিন্তু করবে কারা? যে জাত মরে গেছে অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রাণহীন হয়ে গেছে, তাকে বাঁচানো শক্ত। কিন্তু, একটা উপায় হতে পারে, যদি ভারতবর্ষের ওপর থেকে বাইরের চাপ চলে যায়। বিদেশী সদাগররা বিদেশ থেকে আমদানি বিদেশী শিল্পবস্তুর ব্যবসায়ে তাদের পণ্য সস্তায় এ-দেশে ছেড়ে দিতে থাকে। ফলে, এদেশের কারিগরদের তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাঁড়ানো খুব শক্ত। প্রথমতঃ, এতে সস্তার বিদেশী পণ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্বদেশী পণ্যের কাট্‌তি হবে না মোটেই, সে যতই উৎকৃষ্ট হোক্ না। আর সস্তার মাল ব্যবহারে অভ্যস্ত হলে, দেশের লোকের রুচিই বিকৃত হয়ে যাবে। স্বদেশী হাতে-গড়া জিনিস একটু চড়া দাম দিয়ে আর কেউ কিনতেই চাইবে না।

'দ্বিতীয়তঃ, কাট্‌তির অভাবে নিজেদের কাজ পেশা ছেড়ে দিচ্ছে এ-দেশী কারিগরেরা। না খেতে পেয়ে তারা মরতে বসেছে। অনেকেই নিজেদের কারিগরি ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে অর্থাৎ স্বধর্ম ছেড়ে ভয়াবহ পর-ধর্ম অর্থাৎ অন্য কাজ নিচ্ছে। চাষের কাজ, চামড়ার কাজ —এই সব করে কোনোরকমে তারা দিন গুজরান করছে। কি করে তুমি ওদের ঠিক্ করবে? আর কি জানো? আমাদের দিশি কারিগরদের এই দুর্গতির মূলে হচ্ছে ইংরেজ সদাগর। তারাই এদেশের তাঁতীদের হাত কেটে দিত; নীলকরদের উপর অত্যাচার চালাত। আর সেই সব কারিগরের বংশধরেরাই এখন নিজ বৃত্তি ছেড়ে দেওয়ার ফলে আমাদের স্বদেশী কারিগরি লোপ পেয়ে গেছে। কাজেই আমার মতে, বিদেশী শাসনের চাপ প্রথম চলে যাওয়া দরকার এদেশ থেকে। তারপর উৎসাহ দিলে স্বদেশী কারিগরি আবার জেগে উঠতে পারে। এ-ছাড়া, এখন যে কারিগরি নষ্ট হয়ে গেছে তাকে কি করে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে?

'এদেশের এই কারিগরি-বিদ্যা কোথা থেকে এসেছিল? কোথা থেকেও আসেনি। প্রয়োজনের তাগিদে আর সহজ শিল্পবুদ্ধিতে দেশের ভেতর থেকেই জেগে উঠেছিল। দেশগত স্বতন্ত্র সংস্কৃতি তো আছে। আর রয়ে গেছে তার নিজস্ব ঐতিহ্য। কিন্তু ঐতিহ্য প্রাণবন্ত থাকলেও একই কারিগর-বংশে কারিগর না জন্মাতে পারে, কিন্তু দেশের যে কোনো কোণ থেকেই হোক্ আবার পত্তন হবে কারুশিল্পের। এখান থেকেই বেনারসী, বালুচরী,

মসলিন শিল্প বের হতে থাকবে নতুন নতুন রূপে। কারণ, এদেশের আকাশে-বাতাসে মিশিয়ে আছে এ-সবের ঐতিহ্যগত উপাদান। তার থেকে প্রাণ আহরণ করে এই দেশের লোকেরাই সৃষ্টি করতে থাকবে এই সব মনোরম শিল্পবস্তু। হ্যাভেল সাহেব খাদির প্রসঙ্গে একদা বলেছিলেন, বেনারসী আবার হবে, সে খাদি করতে করতেই। এ কথাটার মানে হলো, খাদি তৈরি করে কারিগররা খেয়ে পরে বেঁচে থাকলে তারাই তৈরি করবে বেনারসী।

'তা যাইহোক্, এখন আমাদের পক্ষে সবচেয়ে সোজা ব্যাপার হয়, যদি তোমরা এ-দেশ থেকে চলে যাও। —আমাদের উন্নতির সবচেয়ে সোজা পন্থা হলো, আমাদের দেশ ছেড়ে তোমাদের চলে যাওয়া। আমার মতে, এ-দেশের কারুশিল্পের জন্যে revolution না করে তোমাদের বিরুদ্ধেই revolution করা উচিত। —আমার এই কথা শুনে, এলম্‌হার্স্ট সাহেবের মুখ লাল হয়ে উঠল। এদেশে বিদেশীদের অবস্থান তখন আমরা চাইছি না একদম। কারণ, তখন ইংরেজ আমাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছিল বিভিন্ন দিক্ থেকে। যাইহোক্, দেখ, এই প্রসঙ্গে কিন্তু 'Quit India' তখনই আমি ওঁদের বলেছিলুম। চীনে ভ্রমণের সময়ে এলম্‌হার্স্ট সাহেবের সঙ্গে আমার এই রকম সব discussion হতো।

'এলম্‌হার্স্ট সাহেব হচ্ছেন হৃদয়বান্ ব্যক্তি। তিনি আমাদের দেশের কারুশিল্প ধ্বংসের সব ব্যাপারটা পরে তলিয়ে বুঝেছিলেন। আসল কথাটা ঠিক্ ঠিক্ বুঝতে পারার পরে, আমার সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা আরও জমে উঠল। এলম্‌হার্স্ট সেই সময়ে গুরুদেবকে বলেছিলেন, —নন্দলালের সঙ্গে ভ্রমণই হচ্ছে একটা বিরাট্ এডুকেশন। —শরীরে যেখানটায় ব্যথা আমি ঠিক্ ঠিক্ ধরে দিয়েছিলুম সেই জায়গাটি। আর সেইজন্যেই মহাপ্রাণ ইংরেজ এলম্‌হার্স্ট সাহেবের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা এত জমে উঠেছিল। এই সময়ে আমাকে লেখা তাঁর পত্রখানা দেখো। বিশ্বভারতীর গোড়াপত্তনের সময়ে. শিক্ষাভ্রমণাদি গঠনমূলক তাঁর নানা scheme-এর কথা এই পত্রে দেখতে পাবে।

॥ নন্দলালকে লেখা এলম্‌হার্স্ট্‌'র পত্র ॥

Wood Hole, Massachusetts
July 27, 1924.

Dear Nandalal,

I wonder very much what kind of a journey you had on the way back and you found everything on your return. The more I think of all our adventures the more I feel that it was one of the greatest experiences I ever enjoyed I wonder too how all your plans are working out, and last night some ideas came to me, quite fantastic but possibly suggestive and I thought I would hand them on to you for your own criticism and judgement.

In Kathiawar, I learnt what Gurudev meant by his ideal of 'peripatetic' or wandering university. You have had your own varied experience of pilgrimages and of short tours with your artists, and I, a very limited experience with the Sriniketan staff. What would you say then to a more definitely planned experiment somewhere between November and January this Fall. It need not be more than three weeks, I don't think it should be less, and it could well be five or six, that would be for you to decide. My idea would be that we should plan beforehand more or less definitely the kind of thing we wanted to do, without tying ourselves to a too rigid programme and make very careful and thorough preparations. Without such preparation it often happens that so much time goes in the getting of meals and beds, the building and breaking of camps that there is too little opportunity for the creative side of the evperiments. At the same time we should steer clear of any

tendency to copy the habits of an army on the march. Just as in the sketch of the Siksha-Satra so on such a trip, the more rigid the discipline in matters of food, and livelihood, of washing and cleaning up, the more the time available for absolute freedom in explanation and creative activity.

All my suggestions are tentative, of course, and as I say are open to adjus'ment and need your criticism. I would think that the first trip might be confined to our district, that we should make use of any assistance that can be locally arranged beforehand by friends, that we should have something very definite to give as well as to get, and that we should be just as much concerned with the people and their habits, troubles and entertainment as with the traces of their past. I don't think the party should be too big, and anyhow you will be the best judge of its make up. I suggest however that each member should have a very definite aim in view as we had on our Chinese embassy and that each group at Santiniketan and Sriniketan should have a representative.

Having picked the groups, artists, scholars farmers and scouters, I suggest the learning of a play and songs, —if possible the group should be trained by Gurudev, and every idea that can be extracted from him should be written down. He will have innumerable suggestions to make On the practical end however I suggest mapping out your course and with the help of S and K —finding out people who would simplify camping arrangements by perhaps contributing some hospitality. I believe as a matter of fact that by offering an evening programme

of games, songs, drama, dance and perhaps scout demonstration (fire prevention), and by printing your programme on a small leaf beforehand, village after village would compete for the privilege of acting host, not always to the extent of full hospitality and food, but in some way and if you would invite neighbours to attend and hand you on to me the care of the next village, i e. we have so many well-wishers within a 10 miles radius that we should make use of them in the way, and they can make use of us. This may all seem more formal than you would wish, but on the one hand you sometime and effort for the main task —learning, by making use of sympathetic friends, as you found all through our tour. If we'd had to worry about food, and lodging all the time In China what small allowance would have been even for the real task,

Secondly our concern is partly with the people, their present and their future, partly with their past and to find a friend at the end of the day to open the road and make the path easy is worth much.

This all sounds very prosaic, but just as it was my hope on our trip that through greasing the wheels the whole machine might make more easy progress so I feel that if we once get a practical and inexpensive basis for these wandering tours, their results will fully Justify them. Gurudev has plans that are expensive but that would be worth the expense if we could once prove how much could be done in the simplest possible way. I want of course also to find the practical basis upon which you can realise your own dreams.

In my imagination we carry a minimum of equipement dispensing even with the bullock cart. We either receive invitations,

or give songs and dramas and demostrations and hand the hat round not for money but food. We spend perhaps three days at a village, your artists aketching the people, the hous.s, the temples and hunting out the crafts and sculptures and anything of interest. Others will be busy writing up recordsstudying problems, sanitary social and agricultural or meeting people. But in general travelling from dawn to break-fast, and rest till tea and spend the evening with the villagers, games for boys, then song, discussion, drama —no rigid rules, it must all be a natural process.

We must know the people, their background, their creative capacity, their happinesses and their love for beauty. We can discover these things from their history and their traditions, from relics as well as from themselves I would suggest that all drawings and materials be exhibited at the end at Shantiniketan and a selection at the Calcutta Exhibition too. What fun we used to have drawing and what a stimulating experience it was for me. I have been practising Chainese writing as dis-cipline and as recreation ever since, not yet as a form of spiritual exercise, I am afried that may come.

Well I leave these bricks as they lie. You as the master-mason will select as you wish and discard much or all, but perhaps we night do something of the Kind and find n w modes of expression, of creation and of happiness.

As I say discuss it with Gurudev, only take down his suggestions, for they are like shooting stars passing in and out of our vision, somethings without leaving sufficient and lasting impressing behind. It is not easyl to recapture them once they are gone. I had delightful time with Sano San in Slunioda

and frequented the public bathing house, a great institiution which now that we have water and after your own experience perhaps you are, trying to introduce at Shantiniketan. My voyage and five nights on the train have broken me up, but I am already on the way to full vigour again and hope to be in England before long. I shall get back to Shantiniketan as soon as I can.

Love to all my friends,—I wish I could see you all at work on the spoils of our embassy. What fun it all was.

Yours affectionately
L. K. Elmhirst.

॥ কুমারস্বামী ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শে নন্দলালের ব্যবহারিক শিল্পচিন্তা ॥

'মানুষ আনন্দ পাবার জন্যে এবং জ্ঞান অনুশীলনের জন্যে যত রকম উপায় উদ্ভাবন করেছে, তার মধ্যে ভাষা একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চা চলছে ভাষাকেই বাহন করে। সাহিত্য মানুষকে আনন্দ দেয়, কিন্তু তার প্রকাশের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। তার সেই অভাব পূরণ করছে রূপশিল্প, সংগীত, নৃত্য ও অন্যান্য কলা। সাহিত্যের যেমন একটি নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি আছে তেমনি রূপশিল্প সংগীত নৃত্যেরও আছে। মানুষ ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে, বহির্জগতের সকল বস্তুর তত্ত্ববোধ ও রসবোধ করে এবং শিল্পে তা অপরের কাছে প্রকাশ করে; শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্পের চর্চার দ্বারা মানুষের তত্ত্ববোধ ও রসবোধের উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং শিল্পের প্রকাশভঙ্গি আয়ত্ত হয়। চোখের কাজ যেমন কানের দ্বারা হয় না, তেমনি ছবি গান ও নাচের শিক্ষা কেবল লেখাপড়ার দ্বারা সম্ভব নয়।

'আমাদের শিক্ষাদানের আদর্শ যদি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদান হয়, কলাচর্চার স্থান এবং মান বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে সমান থাকা উচিত। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এদিক দিয়ে এ পর্যন্ত যা ব্যবস্থা হয়েছে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। এর কারণ আমার মনে হয়, আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস, শিল্পচর্চা

একদল পেশাদার শিল্পীরই একচেটিয়া কারবার, সাধারণের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। শিল্প না বোঝার জন্য অনেক শিক্ষিত লোকও অগৌরব বোধ করেন না — আর জনসাধারণের তো কথাই নেই, তারা ফোটো ও ছবির তফাত বোঝে না; জাপানি খোকা-পুতুলকে শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মনে করে অবাক হয়ে থাকে; বিশ্রী-রঙ-করা লাল নীল বেগুনি জার্মান র‍্যাপার দেখতে চোখের পীড়া তো বোধ করেই না বরঞ্চ উপভোগ করেই থাকে; সহজপ্রাপ্য সস্তা মাটির কলসির বদলে প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে টিনের ক্যানেস্তা ব্যবহার করে। এর জন্যে দায়ি দেশের শিক্ষিতসমাজ এবং প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়। আপাতদৃষ্টিতে বিদ্যার ক্ষেত্রে দেশবাসীর সংস্কৃতি যেমন বাড়ছে বলে মনে হয়, রসবোধের দৈন্যও তেমনি ক্রমশ পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। এর প্রতিকারের উপায় তথাকথিত শিক্ষিতসমাজে কলাশিক্ষার প্রচলন ব্যাপকভাবে করা; কারণ, এই শিক্ষিতসমাজই জনসাধারণের আদর্শস্বরূপ।

'সৌন্দর্যবোধের অভাবে মানুষ যে কেবল রসের ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয় তা নয়, মানুষ তার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সৌন্দর্যজ্ঞানের অভাবে যাঁরা বাড়ির উঠানে ও ঘরের মধ্যে জঞ্জাল জড়ো করে রাখেন, নিজের দেহের এবং পরিচ্ছদের ময়লা সাফ করেন না, ঘরের দেয়ালে পথে ঘাটে রেলগাড়িতে পানের পিক ও থুথু ফেলেন, তাঁরা যে কেবল নিজেদেরই স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেন তা নয় —জাতির স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করেন। তাঁদের দ্বারা যেমন সমাজদেহে নানা রোগ সংক্রামিত হয় তেমনি তাঁদের কুৎসিত আচরণের কু-আদর্শও জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

'আমাদের মধ্যে একদল আছেন যাঁরা কলাচর্চা বিলাসী ও ধনী ব্যক্তিরই একমাত্র অধিকার বলে তাকে প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে অবজ্ঞাভরে নির্বাসিত করে রাখতে চান। তাঁরা ভুলে যান যে, সুষমাই শিল্পের প্রাণ, অর্থমূল্যে শিল্পবস্তুর বিচার চলে না। গরিব সাঁওতাল তার মাটির ঘরটি নিকিয়ে মুছে মাটির বাসন ও ছেঁড়া কাঁথা গুছিয়ে রাখে। আবার, কলেজে-পড়া অনেক শিক্ষিত ছেলে প্রাসাদোপম হোস্টেলের বা মেসের ঘরে দামি কাপড়-জামা তৈজসপত্র এলোমেলো ছড়িয়ে জবড়জঙ্গ করে রাখে। এখানে দরিদ্র সাঁওতালের সৌন্দর্যবোধ তার জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত ও প্রাণবস্তু, ধনীসন্তানের সৌন্দর্যবোধ পোশাকি এবং প্রাণহীন। শিল্প-উপাসনার নামে

ক্যালেণ্ডারের মেমসাহেবের ছবি ফ্রেমে বাঁধানো হয়ে শিক্ষিত লোকের ঘরে সত্যকার ভালো ছবির পাশে স্থান পেয়েছে, দেখতে পাই। ছাত্রমহলে দেখি, ছবির ফ্রেম থেকে জামা ঝুলছে—পড়ার টেবিলে চায়ের কাপ, আর্শি, চিরুনি ও কোকোর টিনে কাগজের ফুল সাজানো। প্রসাধনে কাপড়ের উপর বুকখোলা কোট, শাড়ির সঙ্গে মেমসাহেবি ক্ষুরওলা জুতো—এরূপ সর্বত্রই সুষমার অভাব, আমাদের বিত্ত থাক আর না-থাক্, সৌন্দর্যবোধের দৈন্য সূচিত করে।

'আবার আর-একদল লোক আছেন যাঁরা বলেন 'আর্ট করে কি পেট ভরবে।' এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। ভাষাচর্চার যেমন দুটো দিক আছে—একটা আনন্দ ও জ্ঞানের দিক, আর-একটা অর্থলাভের দিক, তেমনি শিল্পচর্চারও দুটো দিক আছে—একটা আনন্দ দেয়, আর-একটা অর্থ দেয়। এই দুটি ভাগের নাম চারুশিল্প ও কারুশিল্প। চারুশিল্পের চর্চা আমাদের দৈনন্দিন দুঃখদ্বন্দ্বে-সংকুচিত মনকে আনন্দলোকে মুক্তি দেয়, আর কারুশিল্প আমাদের নিত্য-প্রয়োজনের জিনিসগুলিতে সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কেবল যে আমাদের জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে তাই নয়, অর্থাগমেরও পথ করে দেয়। কারুশিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক দুর্গতির আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং, প্রয়োজনের ক্ষেত্র থেকে শিল্পকে বাদ দেওয়া জাতির অর্থাগমের দিক দিয়েও অত্যন্ত ক্ষতিকর।

'শিল্পশিক্ষার অভাবে যে আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রা অসুন্দর করে তুলেছে তাই নয়, আমাদের অতীত যুগের রসস্রষ্টাদের সৃষ্ট সম্পদ থেকেও আমাদের বঞ্চিত করেছে। আমাদের চোখ তৈরি হয়নি, তাই দেশের অতীত গৌরবস্বরূপ যে চিত্র ভাস্কর্য ও স্থাপত্য এতদিন আমাদের কাছে অবোধ্য ও অবজ্ঞাত ছিল, বিদেশ থেকে সমঝদার আসবার প্রয়োজন হল সেগুলি আবার আমাদের বুঝিয়ে দিতে। আধুনিক যুগে শিল্পসৃষ্টিও বিদেশের বাজারে যাচাই না হলে আমাদের দেশে আদৃত হয় না, এ আমাদের লজ্জার কথা।

'এর প্রতিকারের সম্বন্ধে এইবার মোটামুটিভাবে আলোচনা করা যাক। শিল্পশিক্ষার গোড়ার কথা হচ্ছে—প্রকৃতিকে এবং ভালো ভালো শিল্পবস্তুকে শ্রদ্ধার সহিত দেখা, সে-সবের সঙ্গ করা এবং সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়েছে এমন লোকের সঙ্গে আলোচনা করে শিল্পকে বুঝতে চেষ্টা করা। বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের কর্তব্য—প্রত্যেক স্কুলে ও কলেজে অন্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-শিক্ষার স্থান রাখা, শিল্পকে পরীক্ষাগ্রহণকালে অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে গণ্য করা এবং প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেদের যাতে পরিচয় ঘটতে পারে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা ও অবকাশ রাখা। অঙ্কনপদ্ধতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বাড়বে; ফলে তারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সত্যদৃষ্টি লাভ করবে। বিদ্যালয়ে কাব্যচর্চার ব্যবস্থা আছে কিন্তু কাব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করলেই কেউ বড়ো ক ব হন না, তেমনি বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার আয়োজন থাকলেই যে সকল ছেলে শিল্পী হবে এবং ভালো সৃষ্টি করতে পারবে, এমন আশা করা অবশ্য ভুল হবে।

'প্রথমত ছেলেদের বিদ্যালয়ে, গ্রন্থাগারে, পড়ার ঘরে এবং বাসগৃহে কিছু কিছু ভালো ছবি মূর্তি এবং অন্যান্য চারু ও কারুশিল্পের নিদর্শন (অভাবে ঐ-সকলের ভালো ফোটো বা প্রতিচ্ছবি) সাজিয়ে রাখতে হবে।

'দ্বিতীয়ত, ভালো ভালো শিল্পনিদর্শনের ছবি ও ইতিহাস-দেওয়া সহজ-বোধ্য ছেলেদের বই উপযুক্ত লোক দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখাতে হবে।

'তৃতীয়ত, ছায়াচিত্রের সাহায্যে মাঝে মাঝে স্বদেশের ও বিদেশের বাছাই-করা ভালো ভালো শিল্পবস্তুর সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

'চতুর্থত, মাঝে মাঝে উপযুক্ত শিক্ষকের সঙ্গে গিয়ে ছেলেরা নিকটস্থ যাদুঘর বা চিত্রশালায় অতীত শিল্পকীর্তির নিদর্শন দেখে আসবে। বিদ্যালয় থেকে ফুটবল ম্যাচ খেলতে যাওয়ার ব্যবস্থা যখন হতে পারে তখন চিত্রশালা বা যাদুঘর দেখে আসাও অসম্ভব হবে না। এ কথা মনে রাখতে হবে—

একটা ভালো শিল্পবস্তু নিজের চোখে দেখলে এবং বুঝলে শিল্পদৃষ্টি যতটা জাগ্রত হয়, একশোটা বক্তৃতা শুনলে তা হয় না। ভালো ছবি, ভালো মূর্তি, ছোটোবেলা থেকে দেখতে দেখতে, কিছু বুঝে কিছু না-বুঝে ছেলেদের চোখ তৈরি হবে, পরে আপনা থেকেই তাদের শিল্পের ভালোমন্দ বিচার করবার শক্তি জন্মাবে এবং ক্রমশই সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হবে।

'পঞ্চমত, প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেদের যোগাসাধন করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করতে হবে। সেই আয়োজনের মধ্যে থাকবে সেই সেই ঋতুর ফুলফলের সংগ্রহ এবং শিল্পে ও কাব্যে সেই সেই ঋতু সম্বন্ধে যে-সমস্ত সুন্দর সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে ছেলেদের যতদূর সম্ভব

পরিচয় ঘটাবার ব্যবস্থা।

'ষষ্ঠত, প্রকৃতিতে যে ঋতু-উৎসব চলছে তার সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। শরতের ধানখেত ও পদ্মবন, বসন্তে পলাশ-শিমূলের মেলা, তারা যাতে নিজের চোখে দেখে আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে শহরবাসী ছেলেদের জন্যে এ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক, গ্রামের ছেলেদের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেই চলবে। এই-সব ঋতু-উৎসবের জন্যে বিশেষভাবে ছুটি দিয়ে বনভোজনের এবং ঋতু-উপযোগী বেশভূষা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে যোগসাধন একবার হলে, প্রকৃতিকে সত্যকার ভালোবাসতে শিখলে, ছেলেদের অন্তরে রসের উৎস আর কখনও শুকোবে না; কারণ, প্রকৃতিই যুগে যুগে শিল্পীকে শিল্পসৃষ্টির উপাদান জুগিয়ে এসেছে।

'শেষ কথা এই যে, বৎসরের কোনো-এক সময়ে বিদ্যালয়ে একটি শিল্প-সৃষ্টির উৎসব করতে হবে। তাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কিছু না কিছু শিল্পবস্তু নিজের হাতে তৈরী করে এনে শ্রদ্ধার সঙ্গে যোগ দেবে—তা সে শিল্পবস্তু যতই সামান্য হোক। ছেলেদের সৃষ্ট শিল্পবস্তুগুলি উৎসবের অর্ঘ্যরূপে সংগৃহীত হয়ে সাজানো থাকবে। নৃত্যগীত শোভাযাত্রা প্রভৃতির দ্বারা উৎসবটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলবার চেষ্টা করা দরকার। উৎসবের নির্দিষ্ট একটা কালনির্ধারণ করা শক্ত, দেশভেদে সেটা বদলাবে। বাঙ্গালাদেশে শরৎকালই প্রশস্ত মনে হয়।

'আমরা যতদূর জানি তাতে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ কলাচর্চাকে উপযুক্ত স্থান দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থায় তিনিও পদে পদে বাধা পেয়েছেন। কলাচর্চার স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে না থাকায় অভিভাবকগণ কলাচর্চাকে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ করেন; ফলে যে-সমস্ত ছেলেদের ছোটোবেলায় নানা কলাবিদ্যার চর্চায় বিশেষ অনুরাগ দেখা গেছে তারাও প্রবেশিকা পরীক্ষার দু-এক বৎসর আগে থেকে কলাচর্চার অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে এবং তাদের শিল্পানুরাগ এই সময় থেকে কমতে কমতে অবশেষে একেবারেই তিরোহিত হয়। এ বিষয়ে আমাদের সকলপ্রকার জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অবহিত হবার সময় এসেছে।

'এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বলতে চাই। যে-সমস্ত সাময়িক পত্রিকার

সম্পাদক অপরিণত হাতের কাঁচা কাজ কোনো বিশেষ ধারার শিল্পের নাম করে বাজারে বার করেন তাঁদের রুচিহীনতার জন্য নিন্দা না করে কেবল এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, ভালো নূতন ছবি না পেলে তাঁরা বরং ভালো পুরাতন ছবি ছাপাবেন কিন্তু বন্ধুত্বের বা আত্মীয়তার খাতিরে লোককে ভ্রান্তপথে চালিয়ে অপরাধী হবেন না। চিত্রনির্বাচনে সমঝদার সৌন্দর্যবোধ-সম্পন্ন লোকের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন হলে নিতে হবে ; কারণ, লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে সাময়িকপত্রসমূহের ভালো বা মন্দ প্রভাব বিস্তার করবার শক্তি সামান্য নয়।

মোটকথা, শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষিতসমাজের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ঔদাসীন্য কমলেই শিল্পচর্চার প্রসার হবে এবং ফলে দেশবাসীর সৌন্দর্যবোধ এবং পর্যবেক্ষণ-শক্তি বাড়বে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।' —(শিল্পকথা, ১৯৩৬)॥

এই সময়ে আচার্য নন্দলালের বহুমুখী প্রেরণায় বিদ্যাভবনের অধ্যাপক ও গবেষক শ্রীহরিদাস মিত্র **'বঙ্গদেশে দারুশিল্প'** (শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩৩১, কার্ত্তিক) সম্পর্কে সন্ধান করে প্রবন্ধ লিখলেন। —**'মানবসভ্যতার হাতের কাজ'**। (শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩৩২, ফাল্গুন) সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করলেন শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ। প্রসঙ্গতঃ শ্রীহরিদাস মিত্র মহাশয়ের প্রবন্ধটি এখানে সংকলন করে দেওয়া হলো।—

'বঙ্গদেশে প্রাচীন দারুশিল্পের অধিক পরিচয় পাওয়া যায় না। কাষ্ঠ-কীটাদি ও অগ্নিদ্বারা সহজেই নষ্ট হয় বলিয়া, এবং জলবায়ুর গুণে বঙ্গদেশে দারুশিল্পের অধিকাংশ নিদর্শনই অন্তর্হিত হইয়াছে। তথাপি সামান্য যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, সেগুলি কেবল যে বিশেষজ্ঞ ও অনুসন্ধিৎসুদিগের পক্ষে মূল্যবান এমন নহে। সাধারণ দর্শকেরাও সেগুলি হইতে আনন্দলাভ করিবেন আশা করা যায়। প্রাচীন ভারতে বাস্তু ও প্রতিমাদি নির্মাণ উভয়বিধ কার্যেই কাষ্ঠের যথেষ্ট ব্যবহার হইত। বিশেষতঃ বনে কাষ্ঠ সহজেই পাওয়া যায় এবং অনায়াসেই স্থানান্তরিত করা সম্ভব। আবার কাষ্ঠখণ্ডকে সহজেই ইচ্ছানুরূপ আকার দেওয়া যায়। ঐ সকল কার্যে কাষ্ঠের ব্যবহার হইবার ইহাই প্রথম ও প্রধান কারণ।

অশোকের রাজধানী পাটলিপুত্র নগর প্রায় সমস্তই কাষ্ঠে নির্মিত ছিল।

পাটলিপুত্র নগরের বিশাল কাঠের বেড়ায় কিছু অবশিষ্ট অংশ পাওয়া গিয়াছে ও কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। সাঁচি, বুদ্ধগয়া ও বারহুত প্রভৃতি স্থানের প্রস্তরময় দ্বার ও বেড়া প্রভৃতি দেখলে স্পষ্টই উহা কাষ্ঠময় তত্তৎ দ্রব্যের অনুকরণে নির্মিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

ব্যবহার ক্ষেত্রে এক্ষণে রাজমিস্ত্রী, কাঠের মিস্ত্রী, পাথরের মিস্ত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পিশ্রেণী দেখা গেলেও পূর্বে এরূপ ভেদ ছিল না জানা যায়। অর্থাৎ একই শিল্পী প্রস্তর, কাষ্ঠ, ধাতু অথবা অন্যান্য বিভিন্ন উপাদান লইয়া বাস্তু বা প্রতিমাদি নির্মাণ করিত। তবে কোনও বিশেষ উপাদান কার্যোপযোগী করিয়া লইতে নানা ক্রম বা পরিপাটি ছিল। যিনি কাষ্ঠাদি চাঁচিয়া কাটিয়া পরিষ্কার করিতেন তাঁহার নাম বর্ধক বা বর্ধকি (এখনও পশ্চিমবঙ্গে 'বাড়ই' নামে পরিচিত)। যিনি মোটা বা সরু খোদাই করিতেন তাঁহার নাম তক্ষক। যিনি দণ্ড ও সূত্রপাত দ্বারা নক্সা 'plan' তৈয়ারি করিতেন এবং মান প্রমাণাদি (proportions) জানিতেন তাঁহার নাম সূত্রধর বা সূত্রকৃৎ। যিনি চিত্র (sculpture ও painting) জানিতেন ও যথাশাস্ত্র গৃহাদির পত্তন ও নির্মাণ করিতেন, তাঁহার নাম স্থপতি বা বিশ্বকর্মা। এক্ষণে 'সূত্রপাত' 'বর্ধকি' প্রভৃতি শব্দের মূল অর্থ আর সাধারণের নিকট একেবারেই পরিচিত নাই। [সূত্রকর বা সূত্রধর (ছুতার) জাতিরই একশ্রেণী ভাস্কর নামে পরিচিত। তাঁহারা আপনাদিগকে বিশ্বকর্মা গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত ও প্রস্তর বা হস্তিদন্তের কাজ করেন। এখনও বর্ধমান জেলায় দাঁইহাট গ্রামের ভাস্করেরা প্রস্তরের কার্যে সবিশেষ পটু। বিশেষতঃ তাঁহারা গৌড়ীয় শিল্পের ধারা এখনও রক্ষা করিতেছেন।] রাঢ়দেশে এখনও সূত্রধরেরা প্রতিমা চিত্র করেন। ইহা এক অতি প্রাচীন শাস্ত্রীয় পদ্ধতি।

বঙ্গদেশে দারুশিল্পের যে সকল প্রাচীনতম ও উৎকৃষ্ট নিদর্শন বর্তমান আছে তৎসমূহের কোন কোনটি কারুকার্যে বা মনোহারিত্বের দিক দিয়া প্রস্তর বা ধাতু শিল্প হইতে কিছুমাত্র ন্যূন নহে।

ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত এবং সোনারংয়ের দেউলে প্রাপ্ত, শাল কাষ্ঠের একটি বিরাট স্তম্ভ বোধিকা (capital) সহস্রাধিক বর্ষের প্রাচীন হইবে। যদিও জীর্ণ তথাপি ইহার কাষ্ঠ এরূপ সারবান, যে ৩।৪ জন লোক, উহা বাঁশ দিয়া ঠেলিয়া সরাইতে পারে কিনা সন্দেহ। লৌহের মত কঠিন ঐ

কাষ্ঠে ছুরি দ্বারাও দাগ পড়ান কষ্ট। গগনপথে উড্ডীয়মান গন্ধর্ব-মিথুন সকল ও লম্বিত মাল্যদাম প্রভৃতি কারুকার্য সমূহের ক্ষীণ শেষ চিহ্ন সকল অতি কষ্টে বুঝা যায়। এতদ্ব্যতীত পদ্ম-পত্র-খচিত রথের পাটাতন বা অন্য কিছুর অংশবিশেষও দুই খণ্ডে পাওয়া গিয়েছে। উড়িষ্যার মন্দিরে 'পাগ' (projection ridges) সমূহে খচিত পদ্মপত্রসমূহও উহার কারুকার্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নহে। এতদ্ব্যতীত একটি বিষ্ণুমূর্তি এবং একটি গরুড়মূর্তি কোনও স্তম্ভের উপরে স্থাপিত ছিল।

রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে কাষ্ঠের একটি ক্ষুদ্র অগ্নিদগ্ধ মনসা মূর্তি রক্ষিত আছে। গঠনপ্রণালী দেখিয়া ও আনুষঙ্গিক প্রমাণ বলে উহাকে ১১।১২শ খৃস্টীয় শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত বলিয়া বোধ হয় এবং হয়ত উহা আততায়ীগণ কর্তৃক দগ্ধ হইয়াছিল। রাজসাহী জেলায় দেওপাড়া গ্রামে বিজয় সেন নির্মিত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের সম্মুখস্থ ৫০ বিঘা বিস্তৃত প্রকাণ্ড পুষ্করিণীতে, কাষ্ঠের ঐ রকম একটি মনসামূর্তি ও বঙ্গদেশীয় প্রস্তরশিল্পের অনেক উৎকৃষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ঐ পুষ্করিণীতে এত লোক নিত্য স্নান করিত যে সিঁড়ির পরিবর্তে গঙ্গার ঘাটের মত, ঘাটে ঢালু করিয়া ইটের সান বাঁধান ছিল। ঐ ঢালু ইটের সান, প্রকাণ্ড গজারি বৃক্ষখণ্ড সকল ঠেস (support) দিয়া রক্ষিত ছিল। সেগুলির কিয়দংশ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরাদি বিজয়ী মোসলমানগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল।) প্রাচীন মন্দিরাদির চৌকাঠ প্রভৃতি প্রস্তরের হইলেও দরজাগুলি প্রধানতঃ কাষ্ঠের ছিল। দরজার পরে ধাতুনির্মিত দুর্ভেদ্য আবরণ বা বড বড কীলক (খিল বা পেরেক) লাগান থাকিত। এখন গৌড় অঞ্চলে, পাঠান আমলের প্রস্তরদ্বারাদির অনুকরণে নির্মিত প্রাচীন কাঠের কাজ দেখা যায়। মালদহ জেলার ভোলাহাট নামক স্থানে কোনও গৃহে একটি অপরূপ কারুকার্য-বিশিষ্ট বিরাট চৌকাট দুয়ার বর্তমান আছে। চৌকাটটি এক হস্তাধিক চওড়া হইবে এবং ঐরূপ সারবান কাষ্ঠ এক্ষণে দুর্লভ। গৌড়ে একখানি অপূর্ব কাষ্ঠের সিংহাসনও রক্ষিত ছিল।

বঙ্গদেশে রথসকল ও সিংহাসন প্রভৃতি সাধারণতঃ কাষ্ঠে এবং কখনও পিত্তলাদি দ্বারা নির্মিত হইত। কাষ্ঠনির্মিত রথসকলের অনুকরণে বঙ্গদেশে বহুচূড় মন্দিরসমূহ নির্মিত হইয়াছে অথবা মন্দিরসকল দেখিয়া কাঠের রথ-

সমূহ প্রস্তুত হইয়াছিল—ইহাও একটি অনুসন্ধেয় বিষয়। ভূকম্প, অগ্নিদাহ ও কীটাদির দৌরাত্ম্যের ফলে ২।৪ শত বর্ষের অধিক প্রাচীন রথাদি রক্ষা পায় নাই। মোগল ও তৎপরবর্তী যুগের কাষ্ঠশিল্পের কিছু উৎকৃষ্ট নিদর্শন দৌলতপুর কলেজের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি-বংশীয় ও উৎকল দেশ হইতে আগত, নল্‌তা ও নল্‌ধা-র ভঞ্জ চৌধুরীদিগের গৃহে একটি অপূর্ব কাঠের সিংহাসনের পায়া পাওয়া গিয়াছে। একটি সিংহ একটি লোলজিহ্ব ভয়ার্ত গজেন্দ্রের মস্তকে আরোহণ করিয়া নখরাঘাত করিতেছে। হস্তীর জড়কল্প দেহ (আসনের) পায়ার খুরার কাজ করিতেছে। এবং ক্রুদ্ধ সিংহের উচ্চোত্থিত দেহোর্ধ্বভাগ (আসনের) পদের স্থান অধিকার করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত জয়দিয়া গ্রামে প্রাপ্ত কাঠের রথের এক কোণের একখানি সম্পূর্ণ ও লম্বা খাড়াই কাঠ রক্ষিত আছে। হাতি উট প্রভৃতি নানা প্রকার পশু. একটির পর আর একটি চড়িয়াছে এবং কোন কোন পশুর পরে আরোহীও আছে। মধ্যে মধ্যে নরদেহের ঋজু. পার্শ্বগত, পরাবর্তিত প্রভৃতি সকল প্রকার (অর) স্থান বিশিষ্ট সুন্দর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিসকল এবং সর্বোপরি. একপৃষ্ঠে কালীমূর্তি ও অপর পৃষ্ঠে দশভুজা দুর্গামূর্তি ক্ষোদিত আছে। ক্ষয়প্রাপ্ত দেবীমূর্তিদ্বয়ের ভাবব্যঞ্জনা এখনও দেখিলে অবাক হইতে হয়। কোণে দুই দিক হইতে দেখিতে হয় বলিয়া, এক একটি পশুমুণ্ড দুই-দুইটি পশুদেহে খাটে, এরূপে তৈয়ারি করা হইয়াছে। দুই দেহে এক মুণ্ডযুক্ত ঐরূপ পশুসমূহ রাঢ়দেশের মন্দিরেও দৃষ্ট হয়। হয়ত রথের হইতেই মন্দিরের এবম্বিধ কারুকার্য সৃষ্ট হইয়া থাকিবে।

রাঢ়দেশে (ও উৎকলে) বহু দারুময় বৈষ্ণব শ্রীমূর্তি বিদ্যমান আছে। অধিকাংশগুলি নিম্বকাষ্ঠে নির্মিত এবং তদুপরি মাটি লেপিয়া চিত্রিত করা। গ্রন্থোক্ত ঐতিহ্য (myth) ও প্রবাদ অনুসারে শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথমূর্তি বিশ্বকর্মা কর্তৃক নিম্বকাষ্ঠে নির্মিত হইয়াছিল। অধিকন্তু ঐ কাষ্ঠ তিক্ততা হেতু সহজে কীটাদি দ্বারা আক্রান্ত হয় না। ইহাই বোধ হয় শ্রীমূর্তি নির্মাণে নিম্বকাষ্ঠ ব্যবহারের কারণ। উৎকলে প্রতাপপুরে ও রাঢ়ে কালনায় শ্রীচৈতন্যদেবের অতি প্রাচীন দারুময়ী মূর্তি আছে। ত্রিবেণীর শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরেরও উৎকৃষ্ট দারুমূর্তি বিদ্যমান আছে। এতদ্ব্যতীত দারুময় প্রাচীন শক্তিমূর্তিও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। দেবী (ভগবতীর) দশবিধ মহামূর্তির একত্র সমাবেশ বঙ্গদেশে

একমাত্র যশোহর চাঁচড়া গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদের নবাব সুজাউদ্দীন ও চাঁচড়ার রাজা শুকদেব রায়ের রাজত্বকালে (১৮শ শতাব্দীর প্রথমে) ঐ দশমহাবিদ্যা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হয়।

বৈষ্ণব-স্মৃতি প্রভৃতিতে কাষ্ঠাদি দ্রব্যভেদে শ্রীমূর্তিনির্মাণের প্রমাণ ও বিভিন্ন প্রকার ফলশ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। দারুময় শ্রীমূর্তিগুলির মধ্যে মধ্যে অঙ্গরাগ করিতে হয়। সাধারণতঃ উহা শাকদ্বীপীয় (আচার্য) ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হয়। (মৃৎ) প্রতিমাদির চিত্রকর্ম সূত্রধর, মালাকর, মাল (বাইতি) জাতীয়েরাও করেন। এতদ্ভিন্ন পটুক (পটুয়া) বলিয়া বাঙ্গালায় ও চিত্রকর বলিয়া উৎকলে এক এক বিশেষ চিত্রশিল্পী শ্রেণী আছেন। কিন্তু মানহীন (disproportionate) চিত্র করিবার অপরাধে উহারা পতিত হইয়াছেন লিখিত আছে।

বঙ্গদেশে দারুময় শ্রীমূর্তি ব্যতীত, পশুবধার্থ যূপকাষ্ঠ (হাঁড়ি কাঠ) ও শ্রাদ্ধের যূপকাষ্ঠ [উভয়েই মূলতঃ হয়ত এক] এবং মালকাঠ ও মাল-খাম এবং রাঢ়দেশে চালাঘরের পাইড়ের হস্তিশুণ্ড ও মকরমুখাদি বিচিত্র কারুকার্যযুক্ত ঠেস (support) নাগদন্ত (peg or bracket) আদি কাষ্ঠের কারু ও চারুশিল্প স্থানে স্থানে অতি মনোরম পরিদৃষ্ট হয়। ত্রিপুরা, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি স্থানে, বিশেষত গোপালগঞ্জ মহকুমার, বাঙ্গালার ও চৌরি প্রভৃতি ঘরনির্মাণ-প্রণালী অতিশয় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। চুলের মত সূক্ষ্মভাবে চাঁচা-বেত এবং অভ্র দিয়া, শিরীষ-দ্বারা মসৃণ ও সুগোল কাষ্ঠ এবং চটার উপর নানা প্রকার বিচিত্র বুনুনি ও বাঁধাই হয়। গোপাল-গঞ্জের গৃহনির্মাণ দেখিবার জিনিস।

বঙ্গদেশে বিচিত্র গলুই (nack) ও দাঁড়যুক্ত ময়ূরপংখী প্রভৃতি অনেক প্রকার নৌকা নির্মিত হইত ও হয়। বড় বড় নৌকা বিচিত্র বর্ণের পাল খাটাইয়া নদীবক্ষ দিয়া যাইতে দেখিলে যেন রাজহংসীচয় স্ফীতবক্ষে সন্তরণ করিয়া চলিতেছে বোধ হয়।

এতদ্ব্যতীত নানা প্রকার বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রও বঙ্গদেশে নির্মিত হইত ও হয়। সারঙ্গ (ময়ূর)এর আকৃতি, ডাঁটিতে খোদাই হইত বলিয়া বাদ্যযন্ত্র বিশেষের নাম সারঙ্গ বা সারিন্দা। এস্রাজাদির ডাঁটিতে অলঙ্কার বা মঙ্গলচিহ্নরূপ ময়ূরের মুখ বা মৎস্যপুচ্ছ প্রভৃতি ক্ষোদিত হয়। এস্রাজ প্রভৃতির হাঁড়িও,

মাঙ্গলা করিকুম্ভা বা কচ্ছপাকৃতি হইতে লওয়া হইয়াছে। কচ্ছপ সাধারণতঃ অশুচি বলিয়া পরিগণিত হইলেও, কূর্ম, পৃথিবী প্রতীক (symbol) স্বরূপ, এবং পৃথ্বী সর্বংসহা ও স্থিরা। গ্রন্থবিশেষে কূর্মের শুভ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বর্ধমান, বীরভূমি বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অতি সুন্দর কারুকার্য ও চিত্রশোভিত পুঁথির পাটা তৈয়ারি হইত।—

॥ বিশ্বভারতীতে বিচিত্র-চরিত্রের শিল্পীদের আগমন ॥

॥ সীডর ব্রুম ॥

'সুইডেনের মেয়ে ইনি। এখানে এলেন যখন বয়েস ছিল বোধ হয় পঁচিশ-তিরিশের ভেতর। উৎসাহী খুব। আর আমার সঙ্গে ভাব হলো খুব। গল্প করতেন দু তিন ঘণ্টা ধরে বসে বসে। তাঁত শেখাতেন তিনি কলাভবনে। আর শেখাতেন Crafts-ও। শেখাতেন সুইডিশ ক্র্যাফ্‌ট্‌স। এখন (১৯৫৫) এখানে যে-তাঁত চলছে সে হলো সীডর ব্রুমের আনা। সে-সময়ে সুইডেন থেকে বই-বাঁধার যন্ত্রপাতি, তাঁত —এ-সব আনিয়েছিলেন তিনি।

'গরীবদের ওপর দয়াও ছিল তাঁর খুব। শান্তিনিকেতনের আশে পাশে গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন; সাহায্য করতেন গ্রামবাসীদের। এখানে শীতকালের যত সব ঘেয়ো কুকুর 'রতন কুঠি'-তে তাঁর ঘরের সামনে জড়ো হতো। আর সীডর ব্রুম খেতে দিতেন তাদের। শুধু খাওয়ানোই নয়, ঘায়ের সেবা করতেন ওষুধপত্র দিয়ে। জিগ্যেস করলে বলতেন,—ওদের দেখাশোনা করার কেউ নাই। তাই আমি ওদের দেখি।

'ভারতবর্ষে এসেছিলেন তিনি সুইডেন থেকে বোটে করে। পথে সমস্ত coast-এই নৌকো তাঁর ধরে ধরে এসেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন মস্তো একজন navigator। সেকালে দিশী জাহাজ যেমন চলতো হাওয়া ধরে, আর স্রোত চিনে চিনে ঠিক তেমনিভাবে বোট বেয়ে এলেন ব্রুম এদেশে। এলেন তিনি এখানে সীলোন ঘুরে, মছলীপট্টম হয়ে; আর যেখানে থামবার থেমে থেমে। স্রোত আর হাওয়া ধরে ধরে coast-এর ধারে ধারে চলতেন। যে-port-এ বোট ভিড়তো, এক মাস, দেড় মাসের খাবার তুলে নিতেন তিনি সেখান থেকে। কম্পাস ছিল কাছে। কম্পাস বাগিয়ে করে নিতেন দিগ্‌-নির্ণয়।

'অসমসাহসী ছিলেন তিনি। ঝড় পেলেন মছলীপট্টমে। তাঁর নৌকো গেল ভেঙ্গে। তখন তিনি ভাঙ্গা তরী ছেড়ে স্থলপথ দিয়ে এসে পৌঁছলেন শান্তিনিকেতনে। গুরুদেব তাঁর কাহিনী সব শুনে বললেন,—'থাকো এখানে।' —এই সব অসমসাহসিকতার উদ্যমে তিনি কাকেও কখনও নিরুৎসাহ করতেন না। ভয় না-পাওয়ার মন্ত্র তিনি শুধু লিখেই রেখে যাননি; বাস্তবক্ষেত্রেও তিনি তা প্রয়োগ করে গেছেন।

'শান্তিনিকেতনে থাকতে থাকতেই তিব্বতে যাবার উৎসাহ হলো সীড-রের। ফর্‌বিড্‌ন সিটি তাঁর দেখাই চাই। ওরা তাঁকে কম্যুনিস্ট্‌ জেনে পাস্‌পোর্ট দিল না। কিন্তু তাতে কি, বললেন তিনি, চলে যাব লুকিয়ে। দিনের বেলায় লুকতেন তিনি পাহাড়ের গুফায়। আর সন্ধ্যা হলেই শুরু করতেন চলা। অন্ধকার রাতে দুর্গম পর্বত অরণ্য ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে চলতেন তিনি – সেই অসমসাহসিনী সীডর ব্রুম। প্রায় পৌঁছে গেছেন। শেষে ধরে ফেললে। একদিন রাত্রে উঠেছেন একটা ডাকবাংলোতে। কষ্ট হয়েছে খুব। রাত্রে বড়ো একটা টেবিলের নিচে মশারি টাঙ্গিয়ে শুয়ে আছেন। এমন সময়ে ধরে ফেললে। ধরে তাঁকে চালান করে দিলে তাঁর দেশে।

॥ হাঙ্গেরীয়ান মা ও মেয়ে: সাস্‌ ব্রুণার ও এলিজাবেথ ব্রুণার, ১৯৩১ ॥

'ভালো আর্টিস্ট্‌ ছিলেন দু-জনেই। দু-জনেই কিছুদিন ছিলেন মহাত্মা-জীর কাছে গিয়ে। আর্ট সম্পর্কে মহাত্মাজী এক সময়ে বলেছিলেন,—'ম্যয় তস্‌বির সমঝতে নহী। তসবির বনানেকো কৈ জরুরৎ নহী। খড়কী খুলনীসে সে যব সুন্দর দৃশ্য দেখাই পড় যাতী হৈ, তব্‌ তস্‌বির খিঁচ্‌নেসে ক্যায়া ফয়দা হোগা।' —মহাত্মার এ কথা শুনে, আমাদের অসিত একবার মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাহলে আমরা কি করবো। —'স্বদেশী কিজিয়ে. Painting কো কোই জরুরত নহী' —বলেছিলেন মহাত্মা।

'সাস্‌ ব্রুণারের সঙ্গে আমি মহাত্মার এই কথা নিয়ে আলোচনা করেছিলুম। মহাত্মার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জায়গায় ওঁরা ট্র্যাভেল করে-ছিলেন। একদিন কথায় কথায় সাস্‌ ব্রুণার মহাত্মাকে বলেছিলেন– মেরীর ছবি, খৃস্টের ছবি, বুদ্ধের মূর্তি খুব সুন্দর হয়েছে, বলেন আপনি। কিন্তু কি

করে বলেন? ওঁদের তো আপনি দেখেননি। আমিও দেখিনি। অথচ, ভাব ধরে বলেন, ছবি ভালো হয়েছে। আর্টের তো এই ভাব নিয়েই কারবার। সাস্ ক্রুণারের এই কথায় মহাত্মা চুপ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে গুরুদেব মহাত্মার ঐ মন্তব্য শুনে হেসেছিলেন। তাঁর কথা হলো — ঋণশোধ। নেচার থেকে যে আনন্দ আমরা পাই সে বিশ্বজনের দরবারে ফিরিয়ে দিতে হবে। কবিরা কবিতা লিখে, আর্টিস্ট ছবি এঁকে সেই ঋণশোধ করেন।

'শান্তিনিকেতনে 'রতন কুঠি'তে থাকতেন মা ও মেয়ে। ছবি আঁকতেন নিজেরাই। জীবনযাত্রাও ছিল তাঁদের নতুন রকমের। তাঁরা ছিলেন Naturalist দলের লোক। কাঁচা জিনিস খেতেন বেশি। গম খেতেন চিবিয়ে। কড়াইও খেতেন চিবিয়ে। আনাজ-পাতিও সিদ্ধ খেতেন না। খাবার সময়ে মাথা ঢাকা দিয়ে রাখতেন কাপড় দিয়ে। অনেক সময়ে থাকতেন আবার বিবস্ত্র হয়ে। শুতেন, 'রতনকুঠি'তে বেড়াতেন উলঙ্গ হয়ে; অবশ্য ভব্যতা বাঁচিয়ে।— কি একটা cult-এর, বোধহয় 'মের'-কাল্টে'র লোক ছিলেন তাঁরা। ওই cult-টা খানিকটা আমাদের তান্ত্রিক cult-এর মতন।

"তাঁরা ইংরেজী ভাষা জানতেন না। দশ-বারোটা ইংরেজী শব্দ জানা ছিল মাত্র। কিন্তু কাজ চালাতেন সেই ক'টা কথা দিয়েই। বাকি কথা সারতেন তাঁরা ছবি এঁকে এঁকে ইসারায়। শান্তিনিকেতনে বাঙ্গালা ভাষা শিখতে লেগেছিলেন। ছবি আঁকাও চলতে লাগলো। বাগান করতেও ভালবাসতেন তাঁরা খুব। 'রতন কুঠি'র বারান্দাতেই বাগান করতে লাগলেন তাঁরা মাটি তুলে তুলে।

"সাস্ ক্রুণার আমাকে একবার বললেন, —তোমাদের ইণ্ডিয়ান রিলিজন সম্পর্কে কিছু বল। আর কিছু বই-পত্রের নাম বল। আমি বললুম, কঠ-উপনিষৎ পড়তে। বইখানা কিনেও দিলুম তাঁদের। এখন (১৯৫৫) মা বোধ হয় মারা গেছেন। মেয়ে দিল্লীতে থাকেন বলে শুনেছি।

॥ পিরিস ॥

'শান্তিনিকেতনে রথীবাবুকে লিখলো একবার একজন সিংহলী আর্টিস্ট্—নাম তার পিরিস। এখানে তার থাকবার আর খাবার ব্যবস্থা হলেই বিনা-বেতনে কাজ করতে চায় সে। বলেছিল, বিলেতের রয়েল কলেজের আর্টিস্ট্ সে। এলো সে এখানে। থাকতো নিচুবাঙ্গালায় বড়ো মা-র বাড়িতে, এখন তুমি যেখানে আছ। [বর্তমান লেখক এই বাড়িতে দীর্ঘ বিশ বৎসর (১৯৪৭-৬৭) বাস করেছেন।]

'মডার্ণ আর্ট নিয়ে তর্ক করতো সে আমার সঙ্গে। আর বলতো,—'কাজ দিন আমাকে।' আমি বললুম, —'তুমি কে ?' সে বলতো, —'রথীবাবু আনিয়েছেন আমাকে।' বললুম, —'শেখাতে দেবো না; নিজে কাজ কর।' কিন্তু, ক্রমাগত বলতো সে, —'আমাকে ছাত্র দাও।' —'আচ্ছা দেবো,' —বললুম তাকে। অবশেষে দিলুম মালাবারী ছাত্র মার্তণ্ডকে। ওকে শেখাতে লাগলো সে। আমাকে Anatomy-র lecture দিত। সিংহসদনের পাশে 'পূর্ব তোরণ'-ঘরে হতো তখন মডেলিং ক্লাস। লেকচারে বলতো বড়ো বড়ো কথা। তার মধ্যে মূর্খতাই ছিল বেশির ভাগ। তার লেকচার শুনে ছাত্র মার্তণ্ড একদিন বললে তাকে —'আমরা জানি ও-সব। এ্যানাটমির ক্লাসে মাস্টার মশায় আমাদের ও-সব করিয়ে দিয়েছেন।' —এতো জাবদা খাতা ছিল তার কাছে। দেখালে মার্তণ্ড তার কাছে নিয়ে গিয়ে। সব দেখে, উত্তরে বললে সে, —'এ যে দেখছি, ডাক্তারের মতো শিখেছ।'

'তখন পিরিস আমাকে বললে, —'আমাকে অন্য ছাত্র দিন। ছাত্রী দিন।' আমি বললুম, —'না, মেয়ে ছাত্র দেবো না তোমাকে।' —'কেন, খেয়ে ফেলবো নাকি ?' আমি হেসে বললুম, —'সীতা মায়ীকে খেয়ে ফেলেছিলে তোমরা। বিশ্বাস কি ?'

'আমার কাছে পাত্তা না পেয়ে, রথীবাবুকে বলালে সে ক্লাস দেবার কথা। রথীবাবু বললেন আমাকে। আমি বললুম, — আগে ও ডিগ্রী দেখাক্, লণ্ডন রয়েল কলেজের।' ডিগ্রী দেখানোর কথা বলাতে, সে বললে, —'ডিগ্রী' ?

সে ইচ্ছে করে নিইনি আমি।' তার সে-কথা শুনে ঘোরতর সন্দেহ হলো আমাদের। 'বোগাস্ লোক ও,' —বললুম রথীবাবুকে। স্থির করা হলো,—হাতের কাজ দিয়ে ওকে যাচাই করা হোক্।

'আচ্ছা, হাতের কাজ দিয়েই ওকে টেস্ট্ করা হবে। সে-সময়ে 'সপ্তপর্ণী বাড়িতে মাটির দেওয়ালের ওপর Sculpture করা হচ্ছে। মাটির ঘরে দেওয়ালের ওপর তখন নানা স্থানের মূর্তি গড়া হচ্ছে। সাঁচীর মূর্তি করতে বললুম তাকে। ফটো দিলুম। 'ভালো লাগছে না গহনা-পরা মূর্তি সব' —বললে সে। আমি বললুম, —'আমাদের ছবির অলংকরণ হচ্ছে সহজাত। কর্ণের কবচের মতন মূর্তি আমাদের অলংকৃত হয়েই জন্মায়। আভরণ নিয়েই জন্মায় সে। আমাদের ছবির আবরণ চাই, আভরণ চাই; নগ্ন করা চলবে না কিছুতেই। গ্রীক আর্টে তা ভালো দেখাতে পারে; কিন্তু ভারতশিল্পে নয়; এখানে গহনা চাই।

'পিরিস মূর্তি তৈরি করতে লাগলো। কিন্তু চেষ্টা করলে কি হবে; মূলেই যে গলদ; শিক্ষা নাই। তাই কিছুতেই adjust আর করতে পারে না। মুখটাতে নাকের অংশ বাঁকা হয়। মহীশূরী ছাত্র ছিল আমাদের রুদ্র হাঞ্জী। আমি বললুম —আমাদের ছাত্র রুদ্র help করবে তোমাকে। ...কাজ চলতে লাগলো। আমি দেখি গিয়ে মাঝে মাঝে। পিরিসকে বললুম, শেখো আগে দু-চার দিন ওদের কাছ থেকে। শেষে কিন্তু প্যানেলটা রুদ্রই সব finish করলে। সপ্তপর্ণী ঘরের দেওয়ালে পিরিসের শুরু-করা আর রুদ্রের শেষ করা মূর্তি আছে এখনও, দেখো। রুদ্র হাঞ্জী পিরিসের আরো মূর্তি ঠিক্ করে দিয়েছিল। রুদ্র আছে এখন (১৯৫৫) গোয়ালিয়রে। পিরিস পরে চলে গেল। পিরিসের সবই bogus।

॥ বোম্বে থেকে এলো একজন ইটালীয়ান আর্টিস্ট্ ॥

'অতি বাজে লোক। হাম্বাগ্ লোক বলে বোঝা গেল ক্রমশঃ। অথচ খুবই আদর পেয়েছিল এখানে। আমরা শিখতে লাগলুম তার কাছে। কথা বলতো খুব বড়ো বড়ো; কিন্তু নিজে করতো না কিছু।

'তখন কলাভবন আমাদের লাইব্রেরীর ওপর তলায়। শাস্ত্রীমশায়ও

বসতেন পাশে। শাস্ত্রীমশায়ের মূর্তি তৈরি করতে আরম্ভ করলেন সেই ইটালীয়ান আর্টিস্ট্। কাদার মূর্তি। নাম-করা আর্টিস্ট্ শুনে শাস্ত্রীমশাই লাইব্রেরীর ওপর তলার বারাণ্ডায় বসে বসে sitting দিতেন ধীরভাবে। বহু লোক আনাগোনা করত শাস্ত্রীমশায়ের কাছে। সেই মূর্তিটি দেখতো সবাই ; কিন্তু বলত, – শাস্ত্রীমশাই বলে চেনা যাচ্ছে না। ক্রমাগত এই মন্তব্য শুনে শুনে শাস্ত্রীমশাই ভেতরে ভেতরে চটে গিয়েছিলেন। একদিন খুবই বিরক্ত হয়ে তিনি আর্টিস্ট্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন; —আমার মূর্তি করছো, তো লোকে চিনতে পারছে না কেন? আর্টিস্ট্ উত্তর দিলে, —ঐ মূর্তির মধ্যে আপনি তো নাই, আপনার character আছে, আপনার spirit আছে ওর মধ্যে ; লোকে চিনতে না পারলে আর কি হবে ; আর সাধারণ লোকে তো বুঝবেও না।—আর্টিস্টে্‌র এই কথা শুনে শাস্ত্রীমশায় তখন ভীষণ চটে গিয়ে ওপরের ছাদের বারান্দা থেকে মূর্তিটাকে তুলে নিচে ফেলে দিলেন ঢুম্ করে।

'তখন আমাদের কলাভবনে ছবি আঁকবার জন্যে মডেল আনার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আর্টিস্ট্ বললে, মূর্তি তৈরি করবার জন্যে আমাকে মডেল এনে দিতে হবে। ভালো দেখে একটি সাঁওতাল ছেলে আনা হলো পয়সা কবুল করে। সে বসে বসে sitting দিতো আর তাকে আমরা তার দিনমজুরি দিতুম। কিছুদিন বাদে আর্টিস্ট বললে, আমার মেয়ে মডেল দরকার। কোথা পাবো, কোথা পাবো, ভাবনা হলো আমাদের। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে, একটি সুরূপা সাঁওতাল মেয়ে পাওয়া গেল। রাজিও হলো সে sitting দিতে। মেয়েটি বেশ ভালোই ছিল দেখতে শুনতে। তার দেহের গড়নও ভালো। যাই হোক্, সে sitting দিতো, আর ইটালীয়ান আর্টিস্ট্ তার মূর্তি আঁকতো। আমরা কলাভবনে গিয়ে পৌঁছবার আগেই ওরা সাত-তাড়াতাড়ি এসে কাজে লেগে যেতো। ···একদিন বোধ হয় কিছু দুর্মতি হয়েছে আর্টিস্টের। সম্ভবতঃ হাত ধরে টেনেছে মেয়েটির। আর বলেছে, গায়ের কাপড় খোল। হয়তো আরও অসম্মানসূচক ব্যাপার কিছু ঘটে থাকবে। কাজের সময়ে কলাভবন খোলা হলে আমরা গিয়ে দেখি না, মেয়েটি কাঁদছে। আমরা যেতেই সে বললে, সাহেব অপমান করেছে, হাত ধরে টানাটানি করেছে।

'গুরুদেব তখন শান্তিনিকেতনে উপস্থিত। তাঁকে গিয়ে ঘটনাটা বললুম। আর বললুম, ওকে ভালো আর্টিস্ট্ বলে এনেছেন, কিন্তু ও আর্টের তো কিছুই জানে না; উপরন্তু, স্বভাবও ওর ভালো নয়। সব শুনে গুরুদেব বললেন, —'ছ-ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে ওকে বিদেয় করে দাও।'

'পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ও sculptor-তো মোটেই নয়; ও হচ্ছে ও-দেশের tomb-stone-cutter। তবে ইটালীর লোক বটে। সেই পিরিসের মতন যাচাই না-করেই গুরুদেব আর রথীবাবু লোক এনে মাঝে মাঝে এইরকম বিপদ ঘটাতেন।

॥ বোহেমিয়ান আর্টিস্ট্ ॥

'সে এখানে এসে Oil-painting করতো। কাঁচের ওপর আর সিল্কের কাপড়ের ওপর জমি তৈরি করে অয়েল-পেন্‌টিং করতে লাগলো। ক্যানভাসের মতন জমি করে oil-এ আঁকতো খুব যত্ন করে ধরে ধরে। এঁকে finish করতো। ছিল এখানে মাস ছ-য়েক। সে যখন কাজ করতো, তার কাজ দেখতো ছেলেরা। এখানে থাকতো সে পুরাতন গেস্ট্ হাউসের ওপরে পশ্চিমের ঘরে। ওখানে থাকতো, শুতো ওখানেই। খেতো কলাভবনের কিচেনে। সে-কিচেন ছিল তখন পুরাতন হাসপাতালে। পাশ-দরজার ডান দিকের ঘরে খাওয়া হতো, সে খেতো সেখানে। আর-একটা ঘরে ছিল kitchen, আর-একটি ঘর ছিল guest-দের জন্যে। রান্নাঘর সবে একটি, হেঁসেল থাকত ওখানেই।

'বোহেমিয়ান আর্টিস্ট্ গেস্টহাউসের ওপর তলায় পশ্চিমের ঘরে শুয়ে থাকতো —সারারাত আলো জ্বালিয়ে। একদিন হয়েছে কি, হ্যারিকেন জ্বলছে আর সে শুয়েছে মশারি ফেলে। সহসা মাঝরাতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে চেয়ে দেখে কি, কে যেন বাইরে দাঁড়িয়ে মশারির ভেতর চেয়ে চেয়ে দেখছে। গুরুদেবের দাড়ির মত দাড়ি, কিন্তু ছোট ছোট। সেই মূর্তিটি মশারির চারদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর নিচু হয়ে হয়ে ওকে দেখছে। তখন সেই আর্টিস্ট কোনো রকমে মশারি তুলে দরজা খুলে এক-ছুটে আমাদের কাছে চলে এলো ডরমিটরিতে। হাঁফাতে হাঁফাতে সে বললে,

ওখানে সে আর শোবে না। আমাকে থাকতে দাও এখানে – এই বলে ঘটনাটা আগাগোড়া বলতে লাগলো কাঁপতে কাঁপতে।

'বোহেমিয়ান আর্টিস্ট্ একখানা ছবি আঁকছিল কাঁচের ওপর। হঠাৎ কাঁচখানা ইজেলের ওপর থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। তখন সেই আর্টিস্ট্ করলে কি, কাঁচগুলো পুটুলিতে করে বেঁধে নিয়ে বোলপুরের পথে গিয়ে এ্যাণ্ড্রুজ-চার্চের ইয়ার্ডে পুঁতে দিয়ে এলো—মানে কবর দিয়ে এলো। আমরা জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে,—ছবি সজীব কিনা, তাই মৃত্যুর পরে তার কবর দেওয়া হলো। —খানিকটা পাগলামি ছিল বৈকি।

'আর ছিল খুব গরীব। সে এখানে এলো যখন, এলো solid tyre-এর চটি পরে। জুতো প্যান্ট যা অল্পস্বল্প ছিল, সে-সব সে যত্ন করে তুলে রেখেছিল। প্যান্ট ইস্তিরি করে তুলে রাখত বাক্সে। আর বোলপুর থেকে দশহাতি ধুতি কিনে এনে, দু-টুকরো করে কেটে পরতো সে লুঙ্গি করে। খোয়াইয়ে ঘুরে বেড়াতো সে solid rubber tyre-এর বাইকে করে। মাথার চুল কামিয়ে ফেলতো। কোথাও কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, বিশেষ করে কোনো order serve করতে গেলে সে তার সেই যত্ন করে তুলে-রাখা জামা-জুতো বের করতো। সে-জামাও কিন্তু আস্ত ছিল না—তার পিঠের দিকটা সেলাই-করা। সেই পিঠ-সেলাই জামা পরেই বের হত সে। Interview কোথাও দিতে গেলে, ঐ জামা পরায় আমরা আপত্তি করলে সে বলতো,—দেখবে তো সামনেটা, পিঠের দিকে সেলাই থাকলেই-বা। দাঁড়াই-তো তার সামনে ; আবার পিঠ ঘুরিয়ে নিই, সে যখন ফেরে।…এইভাবে চলতো তার দিন। তার পরে, এখান থেকে চলে গেল সে কিছু দিন বাদে। গেল দক্ষিণে। [ইনি এসেছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে। তাঁর নাম ছিল নেভ্‌কভস্কি।]

॥ শিল্পী ও কবির যুগ্মসাধনা ॥

১৯২৬ সালে আচার্য নন্দলালের বৃহৎ চিত্রকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের রঙ্গিন চিত্র টেম্পেরায় আঁকা – গুরু অবনীন্দ্রনাথ। এই ছবিটি তিনি আঁকতে শুরু করেছিলেন আগেই। এখন ছবিটি তিনি ফিনিশ করলেন। এ-ছাড়া তাঁর টেম্পেরায় এ-বছরের ছবি হলো কুণাল ও

কাঞ্চনমালা। কাহিনী গ্রহণ করা হয়েছিল বৌদ্ধ জাতক থেকে। টীক্ উডের ওপর মোরগের ছবি আঁকলেন বড়ো করে। টীক্ উডে আর আঁকলেন টেম্পেরায় সপ্তমাতৃকা। এর আইডিয়া নেওয়া হলো ঋগ্বেদ থেকে। ওয়াশে আঁকলেন উত্তরা --মহাভারতের সুপরিচিত কাহিনীর ওপর। ওয়াশে রোমাণ্টিক ছবি আঁকলেন —স্বপ্নের ভুল। আর আঁকলেন তাঁর প্রতিবেশী সাঁওতালদের জীবনচিত্র নিয়ে —সাঁওতালী মা তার ছেলেকে তেল মাখাচ্ছে। লাইনের কাজে আঁকলেন গঙ্গা-যমুনা, সিল্কের ওপর আঁকলেন সঙ্ঘমিত্রা আর শ্রীচৈতন্যদেবের পুঁথি-লিখন। এ-ছবিখানি মস্ত বড়ো। পেনসিল ড্রয়িং-এ আঁকলেন কুনাল ও কাঞ্চনমালার মৌলিক চিত্র। আর আঁকলেন কেন্দুলির মেলা। অর্থাৎ তাঁর এই চিত্রকর্মের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাঁর সর্বত্রগামী মহৎ প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি নন্দলাল, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখদের সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গেলেন শান্তিনিকেতন থেকে লখ্‌নৌ— সেখানে নিখিলভারত সঙ্গীতসম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে। কবি সেখানে ভাষণ দেবেন। নন্দলাল সঙ্গীত-শিল্পের পরিবেশগত মর্মগ্রহণ করবেন। সে-সময়ে লখ্‌নৌ আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ হলেন নন্দলালের অনুজকল্প শিল্পী অসিতকুমার হালদার। ১৯২৫ সালের গোড়ার দিকে তিনি ওখানে অধ্যক্ষ হয়ে গিয়েছেন। এবং তিনি হলেন এই আর্টস্কুলের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ। সদলবলে কবির ওখানে থাকবার ব্যবস্থা হলো ছত্রমঞ্জিলে। ছত্রমঞ্জিল হলো অযোধ্যার নবাবদের একটি প্রাসাদ। এই সময়ে এখানে আচার্য নন্দলাল যে-সব স্কেচ্‌-কর্ম করলেন তার পরিচয় আমরা পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে দিয়েছি। এই সময়ে আচার্য নন্দলালের ভালো চিত্রকর্ম হলো—চন্দন চৌবের পোর্ট্রেট্‌। চন্দন চৌবে ছিলেন দিলীপ রায়ের গুরু—মার্গ-সঙ্গীতের প্রখ্যাত ওস্তাদ।

সঙ্গীতসম্মেলন চলবার সময়ে কবি লখ্‌নৌ-এ খবর পেলেন, ১৮ই জানুয়ারি শান্তিনিকেতনে বড়দাদার মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। 'তার' পাওয়ামাত্র তিনি দলবল নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন।

গুরুদেব শান্তিনিকেতনের মন্দিরে মাঘোৎসব নিষ্পন্ন করলেন যথারীতি। পক্ষান্তরে, এই দিন আশ্রমের একজন বিশিষ্ট কর্মী তাঁর বাড়িতে স্বতন্ত্র মাঘোৎসবের ব্যবস্থা করেন। তিনি ছিলেন উগ্রপন্থী ব্রাহ্ম। কবি তাঁর

বাড়িতে এই স্বতন্ত্র উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁর এইভাবের আয়োজনের মধ্যে সম্প্রদায়িকতা'র উগ্রগন্ধ পেয়ে তাঁকে তিরস্কার করেন (দ্র. র. জ. ৩, পৃ ২৩১)।

এর পরে নন্দলাল রইলেন শান্তিনিকেতন আগলে। কবি গেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সঙ্গে স্বদেশী-বিদেশী নিয়ে মস্ত দল। কবি ওখানকার ভাষণে বললেন, —ভারত চিরদিনই ডাক দিয়েছে সবাইকে, ভারতের বাণী শান্তির বাণী। শান্তির মন্ত্র ভারত দেশ বিদেশে প্রচার করেছে চিরকাল, করবে ভবিষ্যতেও। বিশ্বভারতী ভারতের একটি যজ্ঞশালা। সেখানে দেশ-বিদেশ থেকে অতিথিরা এসেছেন ; বিশ্বভারতী সর্বভারতের সামগ্রী, এর দায়িত্ব সর্বসাধারণের। বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি ভাষণ দিলেন —আর্টের অর্থ সম্পর্কে। আর্ট সম্পর্কে তিনি বললেন, —মানুষ তার প্রাচুর্যের প্রভাবে অভিব্যক্ত করে আপনাকে। যেটুকু তার নিজের পক্ষে অত্যাবশ্যক, মাত্র সেটুকুতে মানুষের আত্মা কখনও তৃপ্ত থাকতে পারে না। সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে অভিব্যক্ত করেই ব্রহ্ম আনন্দ লাভ করে থাকেন। অথচ, সে সৃষ্টি তাঁর পক্ষে অনাবশ্যক। সুতরাং এই সৃষ্টি হলো তাঁর প্রাচুর্যের প্রকাশ। মানুষও তেমনি আনন্দ উপভোগ করে থাকে সৃষ্টি-ক্রিয়ায়। এ-সৃষ্টি তার আতিশয্য বা অমিতব্যয়িতার প্রমাণ —কার্পণ্যের বা দৈন্যের নয়। মানুষ আপনাকে মিলিত করতে চায় পূর্ণরূপে। সেই মিলনে আছে স্বাধীনতার অপূর্ব আনন্দ। তারই সন্ধানে ফেরে সে। আর্ট মানবজীবনের সম্পদকে অভিব্যক্ত করে। আর্টের এই সাধনা, নিজেই সেই সাধনা ফলরূপে প্রকাশ পায়। এই সাধনার ভেতরে রয়েছে সিদ্ধির আনন্দ। আনন্দই সৃষ্টির মূলে ; আর্টিস্টের কাজে ব্যাখ্যাত হয়ে থাকে এই তত্ত্বটি।

কবি তাঁর এই ভাষণে আর্ট ও বিজ্ঞানের মধ্যে কি প্রভেদ, তাও বলেন স্পষ্ট করে। যে-বস্তু বিদ্যমান, বিজ্ঞান তাকে গ্রহণ করে থাকে অপরিসীম আগ্রহের সঙ্গে, কোনো বাছ-বিচার করে না। কিন্তু শিল্পী বাছাই করে বোঝে। এই বাছাই-এর সময় পরিচয় পাওয়া যায় শিল্পীর অদ্ভুত খেয়ালের। এবং তার সঙ্গে মিশে থাকে রুচির প্রশ্ন শিক্ষার প্রশ্ন আর ঐতিহ্যের প্রশ্ন।

এই ভাষণে কবি সঙ্গীত-সম্পর্কেও আলোচনা করেন। কারণ সঙ্গীতও আর্ট। তিনি বলেন বিজ্ঞানে অঙ্কের যে স্থান, আর্টে সঙ্গীতের সেই স্থান।

এ হলো সম্পূর্ণ বস্তুনিরপেক্ষ। সঙ্গীতের যে ঝঙ্কার সে মুক্ত অবাধ — বস্তুবিচারের বাঁধন, চিন্তার বাঁধন সঙ্গীতকে বাঁধতে পারে না। সঙ্গীত আমাদের নিয়ে যায় সকল জিনিসের আত্মার মধ্যে।

কবি ভারতীয় ভাস্কর্যের সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, অপূর্ণতার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্যে অপূর্ণের সংগ্রাম হচ্ছে পাশ্চাত্য আর্টের ধর্ম। পক্ষান্তরে, প্রাচ্য স্বভাবতই অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ। তার প্রেরণা আসে পূর্ণতার দিক থেকে। সেইজন্যে ভারতশিল্পীরা বাইরে থেকে নানা বিচিত্র উপকরণ গ্রহণ করেও আপনার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। কবি বলেন, প্রতিভার অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে, গ্রহণ করবার অসাধারণ ক্ষমতা। তিনি স্পষ্ট করে বললেন, —কোনো রকমে ভারতীয় আর্টের লেবেল-মারা জিনিস মেপে জুখে দেখে শুনে তৈরী করলেই হলো —এই যুক্তি আমাদের শিল্পীরা যেন কোনো ক্রমে মেনে না-নেন।—আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, কবির এই ভারতশিল্প-চিন্তার প্রেক্ষাপটে পুরাপুরি সঞ্চরণ করছেন তাঁর বিশ্বভারতীর আদর্শ ভারতশিল্পী আচার্য নন্দলাল!—

এই সময়ে কবি আগরতলায় গমন করেন। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য কবির বন্ধু ছিলেন। কবি চার দিন ছিলেন আগরতলায়। কবিকে মণিপুরী নৃত্য দেখানোর বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কবি এই নৃত্য দেখে মুগ্ধ হন এবং এই নৃত্য বিশ্বভারতীতে প্রবর্তন করবার জন্যে নবকুমার সিংহ নামে একজন মণিপুরী নৃত্য-শিক্ষককে শান্তিনিকেতনে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করে এলেন। নবকুমার সিংহের শান্তিনিকেতনে আগমন একটি বিশেষ ঘটনা। কারণ, নবকুমার থেকেই (১৯২৬) শান্তিনিকেতনে নৃত্যকলা নতুন রূপ পরিগ্রহ করলো।

কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন চৈত্র মাসের শেষে। বর্ষশেষের আর নববর্ষের (১৩৩৩) উৎসব উদ্‌যাপিত হলো শান্তিনিকেতন-মন্দিরে। এর পর এলো ২৫-এ বৈশাখ। জন্মোৎসবের জন্যে কথা ও কাহিনী'র পূজারিণী কবিতাটির মূকাভিনয়ের আয়োজন চলছে। প্রযোজনা করছেন আচার্য নন্দলাল। দেখেশুনে কবি স্বয়ং সেটির নাট্যরূপ দিতে লাগলেন। এই নাটকের নাম হলো 'নটীর পূজা' —'পূজারিণী'-কাহিনীর ক্ষীণ সূত্র ধরে তৈরি। অহিংসাকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ ও পালনের দুর্লভ উদাহরণ রয়েছে

এই নাটকটিতে।

'নটীর পূজা' কবির জন্মদিনে সন্ধ্যাবেলায় শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণে কোনার্কে প্রথম অভিনীত হলো। 'নটী'র ভূমিকায় নামলেন আচার্য নন্দলালের জ্যেষ্ঠা কন্যা (জন্ম ১৯০৭) শ্রীমতী গৌরী। তাঁর নৃত্যভঙ্গিমায় একটি অপরূপ অপার্থিব সৌন্দর্য ফুটে উঠলো। শান্তিনিকেতনের নৃত্যকলার ইতিহাসে এ হলো একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। এর আগে কলকাতায় 'অরূপরতনে'র মূকাভিনয় হয়েছিল। কিন্তু তখনও সাহস করে নৃত্যছন্দ দেখাবার মতো প্রস্তুতি হয়নি। গৌরী দেবীর নৃত্য দেখবার পরে, কবি নিঃসন্দেহ হলেন, নৃত্যকলায় শান্তিনিকেতনের দেবার মতো কিছু আছে। আচার্য নন্দলালের নির্দেশ ও সহযোগিতায় নবকুমার ঠাকুর এই 'নটীর পূজা'-র নৃত্যকে নবরূপ দান করেছিলেন।

এই বছরে মাঘোৎসবের পরে, কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দ্বিতীয়বার 'নটীর পূজা' অভিনীত হয়েছিল। এবারের এই 'নটীর পূজা' অভিনয় সম্পর্কে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ১৩৪৮ সালে বলেছিলেন, —'রবিকাকা তার কিছুকাল আগে বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন। আমাকে দাদাকে ফিরে এসে আরবী জোব্বা দিলেন। ···নটীর পূজা অভিনয় হলো —নন্দলালের মেয়ে গৌরী নটী সেজেছে। ও যখন নটী হয়ে নাচল সে এক অদ্ভুত নাচ। অমন আর দেখিনি। ড্রপ পড়তেই ভিতরে গেলুম। গৌরীকে বললুম, আজ যে নাচ তুই দেখালি, এই নে বকশিশ। বলে রবিকাকার দেওয়া সেই জোব্বা গা থেকে খুলে দিয়ে দিলুম। ওকে আর কিছু বললুম না —নন্দলালকে বললুম, তোমার মেয়ে আজ আগুন স্পর্শ করেছে, ওকে সাবধানে রেখো।'

১৩৩৩ সালের ১৩ই মাঘের আনন্দবাজার পত্রিকা মন্তব্য করলেন,— 'নটীর পূজা'য় শ্রীমতীর ভূমিকায় বালিকা গৌরীর 'সংযত ভক্তির শুভ্র শুচিতা অভিনয়টিকে এমন মর্মস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছিল যে অনেকেই ভাবাশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই।'

বাঙ্গালা দেশের নৃত্যকলার ইতিহাসে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। কারণ, ভদ্রলোকের মেয়েদের পক্ষে সর্বসাধারণের সমক্ষে নৃত্য এই প্রথম। আধুনিক কালে ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে সঙ্গীত ভদ্রসমাজের নারীকণ্ঠে স্থানলাভ

করেছিল। আর রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে সমাজজীবনে নৃত্যকলা মর্যাদা লাভ করলো তার শিল্পস্বরূপে। বাঙ্গালীর সমাজজীবনে এই ঘটনাটি সুদূরপ্রসারী। যাই হোক্, রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ সফল হয়েছিল নবকুমারের নৃত্যছন্দ নৈপুণ্য আর আচার্য নন্দলালের আলঙ্কারিক শিল্প-প্রতিভার মণিকাঞ্চন যোগে এবং কবিগুরুর এই স্বপ্নসাফল্যের রূপদায়িনী হলেন আচার্য নন্দলালেরই আত্মজা প্রতিভান্বিতা শ্রীমতী গৌরী দেবী।

॥ দেশে-বিদেশে কবির কর্মপ্রবাহ ॥

১৯২৬ খৃস্টাব্দে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২৫-এ বৈশাখ কবির ৬৫তম জন্মদিন। প্রভাতে আম্রকুঞ্জের উৎসবক্ষেত্রে দেশ বিদেশের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমবেত। ভারতশিল্পসম্মত মাঙ্গল্য অনুষ্ঠানের পরে বিদেশী অতিথিগণ একে একে কবিকে সংবর্ধিত করলেন। ফরাসী কন্সাল, ইতালীয় কন্সাল ভাষণ দিলেন। কাজিনস্ সাহেব এই সময়ে কিছুকালের জন্যে আশ্রমে এসেছেন সস্ত্রীক। আইরিশ জাতির পক্ষ হেকে তিনি কবির আয়ুবৃদ্ধি কামনা করলেন। বিশ্বভারতীর চীনা অধ্যাপক ভো লিম্ চীনদেশের পক্ষ থেকে কবিকে উপহার দিলেন। এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। কাঠিয়াবাড় পোরবন্দরের মহারাজা বিশ্বভারতীকে এই শুভদিনে কয়েক হাজার টাকা দান পাঠিয়েছিলেন। ...পঁয়ষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ কবির মনও অদ্ভুত সতেজ। কবির বক্তৃতার অনুলেখন করলেন সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। কবি সংশোধন করে দিলেন। ছাপা হলো প্রবাসীতে (১৩৩৩ আষাঢ়)।

কবি শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত-অধ্যাপক ভীমরাও শাস্ত্রীর 'রাগশ্রেণী' নামে বইয়ের ভূমিকা লিখে দিলেন। এই সময়ে কবি নিজে গান লিখছেন। প্রবাসীতে সেগুলি প্রকাশিত হলো —নাম 'বৈকালী'। তারপরে লিখলেন প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা'-পুস্তিকার সম্পর্কে তাঁর মতামত। অসহযোগ-আন্দোলনে তখন ভাটার টান। স্বরাজ্যদলের কর্মীরা জেলে বা অন্তরীণে আবদ্ধ। গান্ধি'পন্থীরা তখনও চরকা চালাচ্ছেন। মুসলীম লীগ দেশের মধ্যে আপন প্রতিপত্তি কায়েম করছে। লীগের চেষ্টায় প্রজাস্বত্ব-আইনের পরিবর্তনের আন্দোলন শুরু হয়েছে। কারণ, বাঙ্গালাদেশের প্রজা বা রায়তদের

বেশির ভাগই মুসলমান ও হরিজন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনুকরণপ্রিয় রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করলেন। রায়ত বা জোতদারের ও প্রজাস্বত্ব-আইনের স্বরূপ-বিশ্লেষণ করে কবি বললেন, —'পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলে তবেই সে প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।'

শান্তিনিকেতনে জন্মোৎসবের দিন তিনেক পরেই কবি বোম্বাই হয়ে ইতালী রওনা হলেন। ১৯২২ সালের ১৪ই মে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানরূপে গঠিত হবার পর থেকে ১৯২৬ সালের ১৪ই মে পর্যন্ত রথীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বিশ্বভারতীর যুগ্ম কর্মসচিব ছিলেন। কবির সঙ্গে এই উভয় সচিব য়ুরোপ যাত্রা করলেন। তখন বিশ্বভারতীর কর্মসচিব হলেন ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু। কার্লো ফর্মিকি (Carlo Formichi) বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক থাকার সময়ে কবির কাছে তিনি ইতালি-ভ্রমণের প্রস্তাব করায় এই যাত্রা ; এবং এই যাত্রা ইতালীর মুসোলিনী-সরকারের অতিথিরূপে। পোর্ট সৈয়দে কবির সঙ্গে দেখা করলেন শ্রীমতী ফ্রাউম। ইতিপূর্বে তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন। নেপলসে কবির সঙ্গে দেখা করলেন এলম্‌হার্স্ট সাহেব ও আঁদ্রে কার্পেলেস। রোমে কবি The meaning of Art সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন। ফ্লোরেন্সে কবি লিওনর্দ দ্য ভিন্‌চির নামে গঠিত সোসাইটিতে সংবর্ধনা গ্রহণ করলেন। ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে My School সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন। Florencc শব্দের অর্থ 'পুষ্পপুর'। কবি ফ্লোরেন্সের কলা-ঐশ্বর্য উত্তমরূপে দেখলেন। তুরিনে মহিলা-সমিতির সংবর্ধনা বা 'বরণ' গ্রহণ করলেন। Casa del sole (সূর্যঘর) নামে অনাথ-আশ্রমে গেলেন কবি। এ হলো অনেকটা শান্তিনিকেতনের আদিযুগের 'শিক্ষাসত্রে'র মতো।

সুইডেনে ভিলেন্যুভে-তে থাকতেন রম্যাঁ রলাঁ। কবি গেলেন সেখানে। রলাঁর সঙ্গে আলোচনা হলো সাহিত্য, শিল্প সঙ্গীত আর গান্ধীজির অহিংস-আন্দোলন সম্পর্কে। এবারে য়ুরোপে ফর্মিকি ও মুসোলিনীর বিরোধিতা সত্ত্বেও কবি রোমে দার্শনিকপ্রবর ক্রোচের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ক্রোচের সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে ; রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার সঙ্গে কতকগুলি বিষয়ে এর মিল আছে। কবির সঙ্গে পরে মুসোলিনীর মতান্তর হওয়ার ফলে, বিশ্বভারতী থেকে ফর্মিকির ছাত্র

তুচ্চিকে তক্ষুনি চলে যাবার আদেশ এলো।

ভিলেনুভে থেকে ঘুরে ঘুরে এলেন ভিয়েনা। ভিয়েনা থেকে প্যারিস। প্যারিসে কন্-এর ওতুর-দ্য-ম'দ-অতিথি। লেভি দম্পতি, জুল ব্লক কবির সঙ্গে দেখা করলেন। প্যারিস থেকে লণ্ডন। রোদেনস্টাইনদের সঙ্গে দেখা হলো। লণ্ডনে কবির সঙ্গে পরিচয় হলো শিল্পী এপ্‌স্টাইনের। তিনি কবির grand bust মূর্তি তৈরি করলেন। এই মহাশিল্পীর কলারীতি কবিকে আকৃষ্ট করেছিল বিশেষভাবে। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন, কয়েক বৎসর পরে (১৯৫৫) তিনি কবিকে এপ্‌স্টাইন সম্পর্কে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ পাঠ করতে এবং গ্রন্থের বিষয় সম্পর্কে আচার্য নন্দলালের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখেছিলেন (র জ. ৩, পৃ ২৫৭)।

অস্‌লোতে অধ্যাপক স্টেন কোনো এবং ডক্টর ও মিসেস্ মর্গেন-স্টিয়ের্ন প্রমুখ বন্ধুদের অভ্যর্থনা পেলেন কবি। গত বৎসর অধ্যাপক স্টেন কোনো বিশ্বভারতীর অভ্যাগত অধ্যাপকরূপে এসেছিলেন। কবি একদিন নরওয়ের স্থপতি ভাস্কর গুস্তাফ্‌ বিগেলান্ড-এর রচিত বিখ্যাত Fountain of Life বা জীবন-উৎস দেখতে গেলেন। অস্‌লোর শহরতলিতে বিশাল পার্কে তাঁর ভাস্কর্য গত পঁচিশ বছর ধরে তৈরি হচ্ছিল। বার্লিনে অধ্যাপক আইনস্টাইনের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়। বার্লিনে রবীন্দ্রনাথের অস্ত্রোপচার হয়েছিল। আইনস্টাইন চিকিৎসাদির ব্যবস্থায় সাহায্য করেন। ড্রেসডেনে 'ডাকঘর' অভিনয় হলো। বার্লিন থেকে গেলেন প্রাগ। সেখানে উইনটারনিট্‌স আর লেস্‌নীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়। প্রাগে জারমান ও চেক্ ভাষায় 'ডাকঘর' অভিনীত হলো। ভিয়েনায় থাকার সময়ে কবি শান্তিনিকেতন থেকে তেজেশচন্দ্র সেনের লেখা গাছপালা সম্পর্কে কতকগুলি রচনা পেলেন। সেগুলি পড়ে কবি তেজেশচন্দ্রকে লিখলেন, —'তোমার লেখাগুলি শান্তিনিকেতনের গাছপালাগুলির মর্মরধ্বনি করে উঠেছে। তাতেই আমার মন পুলকিত করে দিল।' —এই পত্রখানিই পরে হলো 'বনবাণী'র ভূমিকা। বার্লিনে নতুন ধরনে ছাপা হলো কবির 'লেখন' গ্রন্থ।

প্রত্যাবর্তনের পথে কবি কায়রো ম্যুজিয়ামে প্রাচীন মিশরের মূর্তি, মমি, বিচিত্র শিল্পকলার সম্ভার প্রত্যক্ষ করলেন। সব দেখে কবি লিখলেন, —'এই সব কীর্তি দেখে মনে মনে ভাবি যে, বাইরে মানুষ সাড়ে তিন হাত কিন্তু

ভিতরে সে কত প্রকাণ্ড।' মিশরের রাজা ফুয়াদ শান্তিনিকেতন-গ্রন্থাগারে মূল্যবান্ আরবি গ্রন্থরাজি প্রেরণের ব্যবস্থা করলেন।

সুয়েজ বন্দরে এসে কবি সংবাদ পেলেন, সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু হয়েছে। সন্তোষচন্দ্র ছিলেন কবি-সুহৃৎ শ্রীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ; রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে এণ্ট্রান্স পাশ করে আমেরিকায় যান। ফিরে এসে ১৯১০ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত অনন্যমনা হয়ে কবির ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের সেবা করেছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর বেতন ছিল মাসিক ২০০ টাকা করে। অধ্যাপক, ছাত্র-পরিচালক, ক্রীড়া-ব্যবস্থাপক, অতিথি-পরিচর্যা সমস্ত কাজেই তিনি ছিলেন সকলের সহযোগী। ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৬ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি যুক্ত ছিলেন শ্রীনিকেতনের সঙ্গে। শান্তিনিকেতনে তাঁর বাড়ির নিকটে 'শিক্ষাসত্রে'র প্রথম পত্তন হয়। পরে তা স্থানান্তরিত হয় শ্রীনিকেতনে।

ভারতবর্ষের যত কাছে আসছেন কবি, বিশ্বভারতীর বিচিত্র সমস্যার কথা মনে পড়ছে। কবি লিখছেন, —'শান্তিনিকেতনের আকাশ ও অবকাশে পরিবেষ্টিত আমাদের যে জীবন তার মধ্যে সত্যই একটি সম্পূর্ণ-রূপ আছে, যা কলকাতার সূত্রছিন্ন জীবনে নেই। শান্তিনিকেতনের ভিতর দিয়ে মোটের উপর আমি নিজেকে কী রকম করে প্রকাশ করেছি সেইটের দ্বারাই প্রমাণ হয় শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে কী —মাঝে মাঝে কী রকম নালিশ করেছি, ছটফট করেছি তার দ্বারা নয়। শুধু আমি নই, শান্তিনিকেতনে অনেকেই আপন আপন সাধ্যমতো একটি সুসংগতির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছেন। এটা যে হয়েছে সে কেবল আমার জন্যেই হয়েছে একথা যদি বলি তাহলে অহংকারের মতো শুনতে হবে, কিন্তু মিথ্যা বলা হবে না। আমি নিজের ইচ্ছার দ্বারা বা কর্মপ্রণালীর দ্বারা কাউকে অত্যন্ত আঁট করে বাঁধিনে ; তাতে করে কোনো অসুবিধে হয় না বলিনে —আমি নিজেই তার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছি কিন্তু তবু আমি মোটের উপর এইটে নিয়ে গৌরব করি।...স্বাধীনতা ও কর্মের সামঞ্জস্য-সংঘটিত এই যে ব্যবস্থা এটি আমার একটি সৃষ্টি —আমার নিজের স্বভাব থেকে এর উদ্ভব। আমি যখন বিদায় নেব, যখন থাকবে সংসদ, পরিষদ ও নিয়মাবলী, তখন এ জিনিসটিও থাকবে না। অনেক প্রতিবাদ ও অভিযোগের সঙ্গে লড়াই করে এতদিন একে বাঁচিয়ে রেখেছি —কিন্তু যারা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ তারা

এঁকে বিশ্বাস করে না। এর পরে ইস্কুল মাস্টারের ঝাঁক নিয়ে তারা অতি বিশুদ্ধ জ্যামিতিক নিয়মে চাক বাঁধবে —শান্তিনিকেতনের আকাশ ও প্রান্তর ও শালবীথিকা বিমর্ষ হয়ে তাই দেখবে ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে। তখন তাদের নালিশ কি কোনো কবির কাছে পৌঁছবে?'—(১৫ ডিসেম্বর, ১৯২৬)।

॥ নটীর পূজা ও নটরাজ ॥

সাত মাস য়ুরোপ-সফর শেষ করে কবি দেশে ফিরে দেখেন, শান্তি নাই কোনো দিকে। ১৯২৬ সালের মে থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতে বহু ঘটনা ঘটে গেছে। হিন্দু-মুসলমানে ঐক্যের আভাস নাই। গৌহাটিতে কংগ্রেস অধিবেশন হচ্ছে। সভাপতি শ্রীনিবাস আয়াঙ্গর। নেতারা সবাই সেখানে। ঠিক্ সেই সময়ে দিল্লীতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে একজন মুসলমান যুবক রিভলবার দিয়ে হত্যা করল। আর্যসমাজী পদ্ধতিতে 'শুদ্ধি' আন্দোলনের প্রবর্তক স্বামীজি নিহত হলেন। স্বামীজির হত্যা-সংবাদ ভারতের সর্বত্র রাষ্ট্র হলো।

শান্তিনিকেতনবাসীরা এই সংবাদে মর্মাহত। কারণ, কিছুকাল পূর্বে (১৯২০) স্বামীজি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন এবং সকলের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছিল। তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন ১৩২৭ সালের ১৪ই ভাদ্র সোমবারে। সঙ্গে গুরুকুলের কয়েকজন স্নাতক ছাত্র ছিলেন। কলাভবনে তাঁকে সংবর্ধনা করা হয়েছিল। সে-বিবরণ আগে দেওয়া হয়েছে। বিচিত্র ভূর্জপত্রে দেবনাগরী অক্ষরে-লেখা একখানি অভিনন্দন-পত্র সংবর্ধনার পরে তাঁকে দেওয়া হয়। সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে আশ্রমের বালক-বালিকারা 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকের কিয়দংশ অভিনয় করেছিল। স্বামীজি কেবল একদিন মাত্র আশ্রমে ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সবে য়ুরোপ থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর হত্যার সংবাদ পেয়ে শান্তিনিকেতনের আশপাশের গাঁয়ের বহুলোক সেদিন (২৫-১২ ১৯২৬) আশ্রমে কবিগুরুর কাছে উপদেশ নেবার জন্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। কবি হিন্দুসমাজের আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দৌর্বল্য পরিহার করতে উপদেশ দিলেন। এবং দেশবাসীকে বললেন, শান্তভাবে

সমস্যা-সমাধান সম্বন্ধে চিন্তা করতে।

ইংরেজের কূট-রাজনীতি প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে এই অশান্তিতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। দেশের শিক্ষিত যুব-মনের আশা আকাঙ্ক্ষা স্ফুরণের বা মনোবিকাশের সঙ্গে আনন্দের পথ অবরুদ্ধ। Ordinance বলে শত সহস্র নিরপরাধ যুবক বিনাবিচারে বন্দী। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নীরব থাকতে পারলেন না; একটি 'খোলা চিঠি' দৈনিক কাগজে ছাপতে পাঠালেন দমননীতির প্রতিবাদ করে। সরকারী রোষ থেকে সাহিত্যিক বা লেখকগোষ্ঠীও বাদ যাননি। সরকার থেকে নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকা গ্রন্থাকারে ছেপে প্রত্যেক গ্রন্থাগারে পাঠানো হয়েছিল। আদেশ হলো,—এই তালিকায় মুদ্রিত বই যেন গ্রন্থাগারে রাখা না-হয়। এই সময়ে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাস বাঙ্গালা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। শিল্পীদের 'স্বদেশী কার্টুনের'ও ছিল এই হাল।

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি। তাঁর মনের নানা কোঠায় নানা কাজ চলে। তার এক কোঠায় রাজনীতি, কিন্তু মণিকোঠায় রসের উৎস। তারই প্রকাশ হলো দ্বিতীয়বার 'নটীর পূজা'র অভিনয়ে। মাঘোৎসবের পরে কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অভিনয় হলো ১৯২৭ সালের ২৮, ২৯ ও ৩১-এ জানুয়ারি। কবি স্বয়ং 'উপালি'র ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করলেন। এই একমাত্র পুরুষ-চরিত্র এই সময়ে এই নাটকে সংযুক্ত হলো; গত বছর শান্তিনিকেতনে জন্মোৎসবের সময়ে 'উপালি'র ভূমিকা ছিল না। 'নটীর পূজা'য় আচার্য নন্দলালের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গৌরী দেবীর শ্রীমতীর ভূমিকায় নৃত্যের বিবরণ আমরা আগে দিয়েছি।

নট-নটী সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকারের গবেষণা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা গেল,—

'প্রাচীন ভারতে নটনটীরা ছিল ধনিক ও বণিকের চিত্তবিনোদনের পাত্র-পাত্রী —সমাজে নিম্নস্তরের 'পতিত' তাহারা। সংস্কৃত নাটকে ইহাদের উল্লেখ আছে; কোষকার অমরসিংহ ইহাদের বলিয়াছেন —শৈলালী, শৈলুষ, জায়াজীব, কৃষাশ্বী ও ভরত। দক্ষিণ-ভারতে ভরতমুনি এই নটপর্যায় গড়েন, এবং নটদের ভরতপুত্রক বলা হয়। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র বিখ্যাত। দক্ষিণ ভারতে শিবের নাম নটরাজ, নটেশ্বর। হেমচন্দ্র তাঁদের আখ্যা দিয়েছেন—সর্ববেশী ভরতপুত্রক ধাত্রীপুত্র রঙ্গজীব রঙ্গাবতারক। স্মৃতিকাররা নটনটীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত দিয়েছেন; মনু বলেন, ইহারা ব্রাত্যায়া ক্ষত্রিয়াজ্জাত;

পরাশর মুনিও ইহাদের নীচ বর্ণসঙ্কর পর্যায়ে শ্রেণীত করিয়াছেন।

মুসলমান যুগে নটীনটীদের বৃত্তি যায়, দারিদ্র্যদোষে তাহদের শতগুণও বিনষ্ট হয়; নট লেটুয়া নামে তাহারা উপজাতিভুক্ত হয়। যাহারা মুসলমান হইল, তাহাদের মধ্যে লোটো বা নোটোর গান চলিত থাকিয়া গেল। আমরা ভাষায় নটদের নিকট হইতে নাট্য, নাটক লইলাম —'নাট্যাচার্য' বলিয়া অভিনেতাদের সম্মান দিলাম —কিন্তু নটনটীরা রহিয়া গেল অচ্ছুত,অপাঙ্‌ক্তেয়। আজ রবীন্দ্রনাথ সেই 'নটী'কে গৌরবোজ্জ্বলে সাহিত্য মধ্যে —স্থান দিলেন। প্রসঙ্গত এইখানে একটি কথা বলি যে, গান্ধীজি প্রবর্তিত অসহযোগ- আন্দোলন দ্বারা কর্মক্ষেত্রে ও রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নৃত্যকলা দ্বারা আনন্দক্ষেত্রে নারীর স্থান সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনার একটি ক্ষেত্র আছে।' —(র. জ. ৩,পৃ ২৭০)।

শ্রীনিকেতনের বর্ষিক উৎসব হলো ৬ই ফেব্রুয়ারী। কবি ভাষণ দিলেন গ্রাম-উদ্যোগের কথা বলে। এই সময় কবির দৈনন্দিন জীবন অর্থকৃচ্ছ্রতা, সাংসারিক দুঃখতাপ সহ্য করে মন তাঁর উদ্বিগ্ন। জমিদারি বন্যায় ও অন্যাভাবে পীড়িত, ধনাগমের পথ আপাততঃ রুদ্ধ। কনিষ্ঠা কন্যার পারিবারিক জীবন অসুখী। কবি নিরুপায়, তবুও তাঁর ভিতরের যে মানুষটা দুঃখ পায়, তাকে দূরে বাইরে সরিয়ে রাখার অভ্যাস করছেন। তাঁর এই সাধনা বলে অন্তর্বেদনা অন্তর্হিত হলো মনের গহনে কাব্যের রসনির্ঝর উছলে উঠলো।

'নটীর পূজা'র অভিনয় আর তার নৃত্যলীলা কবির চিত্তে নতুন ভাব-প্রেরণার উদয় ঘটালো। নটীর নৃত্যগীতের সাধনা কবির মনকে নৃত্যের গভীর তত্ত্বলোকে নিয়ে গেল। কবি-মানসে নটী তার লৌকিক সজ্জা ত্যাগ করে মহীয়সী সাধিকা। কবির প্রশ্ন, নটীর পূজার অর্ঘ্য কার উদ্দেশ্যে নিবেদিত, কিসের জন্যে তার সাধনা। 'নটীর পূজা' হলো একটি অবিচ্ছিন্নতার বা abstraction-এর কাছে আত্মাহুতি। নটীর সাধনা পরিপূর্ণ জীবনানন্দের সাধনা নয়। কিন্তু, এই নেতিবাদের শেষ কোথায়। জীবনশিল্পী কবি এই সাধনাকে আনন্দহীন সর্বশূন্যতার প্রতীকের নিকটে নিবেদন করতে পারেন না। পূর্ণ-স্বরূপের ঐশ্বর্যকে সম্ভোগের মহোৎসবে সমর্পণ করে ধর্মে মুক্তি —এই হলো তাঁর জীবনের সাধ্য ও সাধনা। বন্ধনকে স্বীকার করেই কবির মুক্তি। —'তাই কবির পূজা গিয়া পৌঁছিল নটের গুরু নটরাজের সৌন্দর্য-লীলা-নিকেতনের উৎসব বেদীতলে। নটীর পূজার পর নটরাজের ধ্যান আরম্ভ। ইহাই

হইল কবির নবচেতনা, নবতম সাধনা।'

কবি এখন 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'র জন্যে নতুন স্তব রচনা করলেন—

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে।

নটরাজ হলেন দক্ষিণভারতের নৃত্যময় শিবকল্পনা। দক্ষিণ ভারতের শিল্পীরা নটরাজ বা নটেশ্বরের রূপ কল্পনা করেছেন অসংখ্যভাবে। শিবের তাণ্ডবনৃত্যের বর্ণনা নানা লৌকিক কাব্যে সুপরিচিত। কিন্তু, নটরাজের কোনো ভাবময় ব্যাখ্যা বাঙ্গালা-সাহিত্যে আগে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নটরাজ সম্পর্কে যে বিরাট্ কল্পনাকে কাব্যরূপ দান করলেন তার প্রেরণা দক্ষিণী নটরাজের মূর্তি আর দক্ষিণী ভরতনাটাম্ নৃত্য দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বলে রবীন্দ্রজীবনীকারের বিশ্বাস। 'নটীর পূজা'-নৃত্যে মণিপুরী পেলব নৃত্যছন্দ ও নটরাজের মধ্যে ভরতনাট্যমের রুদ্র-শিবের পৌরুষ-নৃত্য মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। মাধুর্যে ও বীর্যে উভয়ে সুন্দর। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের নটরাজের এই মূর্তিকল্পনায় এবং তার ভারতশিল্পসম্মত বাস্তব রূপদানের প্রেক্ষাপটে ইতিপূর্বে নটরাজ-অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত ভারতশিল্পী আচার্য নন্দলালের অবদান এবং কবির সঙ্গে তাঁর একাত্মতা ও সহযোগিতা অস্বীকার করবার উপায় নাই।

এই সময় থেকে আচার্য নন্দলালের ও নৃত্যশিল্পী নবকুমারের প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথের এক শ্রেণীর গান নৃত্যাশ্রয়ী হয় বিশেষভাবে। এবং এই নৃত্য হয় সঙ্গীতাশ্রয়ী। এই দিক্ থেকে কবির নটরাজ রচনা (১৯২৭) বাঙ্গালাদেশে ও সাহিত্যে একটি বিশেষ ঘটনা। কবির দৃষ্টিতে, সকল ঋতু প্রবাহিত ও পুনরাবর্তিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত কবি প্রত্যেক ঋতু সম্পর্কে পৃথক্ পৃথক্ রচনা প্রকাশ করেছেন। বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসবে বিভিন্ন ঋতুর বন্দনা-গান করেছেন। নাটকেও তা রূপলাভ করেছে—শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা, ফাল্গুনীর মধ্যে। কিন্তু, 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'য় কবি সকল ঋতুকে একটি অবিচ্ছিন্ন স্থিতি-গতি ও বন্ধন-মুক্তির পরম্পরায় এক করে মুক্তিতত্ত্বরূপে দেখেছেন। এইসব ঋতু-উৎসবে পাত্র-পাত্রী বা নট-নটীর মধ্যে রয়েছে শিশুতরুর দল। 'ফাল্গুনী'র সময় থেকে কবি গান গেয়েছেন

নানা ফল ফুল নদী গিরির মাধ্যমে। 'বসন্তে' ঋতু-পূজার বিকাশ, এবং 'নটরাজে' তার পূর্ণতা।

১৩৩৩ সালের ৪ঠা চৈত্র (১৮ই মার্চ, ১৯২৭) শান্তিনিকেতনে 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' অভিনীত হয় দোলপূর্ণিমার পরের দিন। নটরাজের অভিনয়ের পরে কবির মন ঋতুরঙ্গশালার নট-নটী বা তরুলতাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। যারা ছিল সমষ্টির মধ্যে নামহীন 'বৃক্ষ', তারা আপন আপন নামের মান পেল নতুন নতুন কবিতায়। 'বনবাণী'র 'বৃক্ষবন্দনা'য় কবি লিখলেন,—

'শ্যামলের সাধনাতে
দীক্ষা ভিক্ষা করে মরু তব পায়ে—'

অতঃপর, বিশেষ তরুর নামে অর্ঘ্য রচিত হতে লাগলো। কুলীন-অকুলীন পুষ্পদের কবি আপন কাব্যডালিতে ভরে তুলতে লাগলেন। এবং তাঁর এই সাধনায় অকুণ্ঠ সহযোগী পেয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথ, নবকুমার ও আচার্য নন্দলালকে।

॥ আচার্য নন্দলালের আলঙ্কারিক শিল্পচিন্তার ভূমিকা ॥

ভারতবর্ষের আলঙ্কারিক শিল্প পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভারতীয় চিত্রে এর স্থান অতি গভীর ও সহজ। প্রাচীন ভারতের পরিচ্ছদের ওপর আঁকা জন্তু-জানোয়ার মিশে থাকে পরিচ্ছদের সঙ্গে। আস্তরণের ওপর বুনানি-রূপে মিশে থাকে তার সঙ্গে। ভারতবর্ষে যেখানে যে ধরনের পাথর মিলেছে শিল্পীরা তাই দিয়েই মূর্তি গড়েছেন পাথরত্ব বজায় রেখে। বাঙ্গালা দেশের মঙ্গলচণ্ডীর ঘটে গোধাসমন্বিত অরণ্য খোদাই-করা, মনসার ঘটে নাগ-নাগিনী রয়েছে আপন পরিবেশে। মঙ্গল-কর্মে গৃহের প্রবেশদ্বারে কলাগাছ, ঘট, আম্রপল্লব, ডাব আর চালগুঁড়ির সঙ্গে আলপনা দেওয়া হয়ে থাকে। এইসব উপকরণের ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে ধর্মীয় যোগ থাকলেও শিল্পদৃষ্টিতে এতে বাঙ্গালীর আলঙ্কারিক মনোবৃত্তির একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ এদেশে এ-সব অতি সহজলভ্য বস্তু। সুতরাং, এদেশের সেকালের শিল্পীরা মঙ্গলঘট সাজাবার জন্যে এইসব জিনিস কাজে লাগিয়েছিলেন উপকরণ হিসাবে। আমাদের পূজা-পার্বণের মধ্যে দিয়ে এই রকম আলঙ্কারিক শিল্পের নিদর্শন আমরা যেমন পেয়ে থাকি, তেমনি অন্য প্রদেশেও

সহজলভ্য উপকরণ দিয়েই উৎসবের আলঙ্কারিক শিল্প রচনা করা হয়ে থাকে। ব্যবহারিক শিল্পে আচার্য নন্দলাল এই একই পথ ধরেছিলেন শান্তিনিকেতনের অভিনয়-উৎসবের রূপ-সজ্জায়। নন্দলালের দৃষ্টিতে তাঁর এ হলো একটি বড়ো রকমের শিল্পসাধনা। এবং তাঁর এই সাধনার সূত্রপাত হলো শান্তিনি-কেতনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই। অবশ্য তাঁর আসার আগেও এই বিষয়ে এখানে যে প্রচেষ্টা চলেছিল সে ক্ষীণকলেবর হলেও তাকে উপেক্ষা করা যায় না। তবে আচার্য নন্দলালের মাধ্যমে এই আলঙ্কারিক ধারা পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল শান্তিনিকেতনে।

১৯২৬ সালে 'নটীর পূজা' আর ১৯৩৬ সালে 'তপতী' নাটক অভিনয় হলো। এতেও দেখা গেল, নন্দলাল একই আদর্শকে ভিত্তি করে রঙ্গমঞ্চ সাজিয়েছিলেন। অবশ্য, এখানে স্থাপত্যকলার যে ইঙ্গিত ফোটানো হয়েছিল তাতে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথের পরিকল্পনা ছিল অনেকখানি। কিন্তু তাঁর সে পরিকল্পনা নন্দলালের মূল-ধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রেখে রচিত হয়েছিল।

এই ধরনের নাটকের সঙ্গে স্বাভাবিক দৃশ্যসজ্জার কথা উঠতে পারে সহজেই, এই মনে করে রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই সতর্ক হয়ে 'তপতী' নাটকের দৃশ্যসজ্জার সম্পর্কে ভূমিকায় সাধারণ দর্শক আর পাঠকদের আর একবার সাবধান করে দিয়েছিলেন। ১৯০২ আর ১৯১৬ সালে এই বিষয়ে তিনি যে মন্তব্য করেন, এই ভূমিকা তারই পুনরুক্তি। কিন্তু এখানে কবির ভাষা আরও দৃঢ় ও স্পষ্ট।—

'এই উপলক্ষে নাট্যমঞ্চের আয়োজনের কথা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলা আবশ্যক। আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধন দৃশ্যপট একদা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষী। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল, দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থানু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিতে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সঙ্কীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে, সেখানে পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেবার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চির-প্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের

ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোন হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষীকে আমি প্রশ্রয় দিইনে। কারণ বাস্তব সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাব সত্যকেও বাধা দেয়।'

এখন বিজলি বাতির যুগে রঙ্গমঞ্চের আলোকসজ্জার নানা উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষ করে য়ুরোপে তার সদ্ব্যবহারও হচ্ছে। শান্তিনিকেতনও সেই পথের সাহায্য নিয়েছে বটে, কিন্তু আলোর বেশি কারিকুরি গ্রহণ করা হয়নি। আলোর ভিতর দিয়ে এখানে মূল রং-গুলির ছন্দোময় বিকীরণই প্রাধান্য লাভ করেছে। আর সে-ব্যবহার করা হয়েছে নাটকীয় রসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। ঘন ঘন রঙ্গের পরিবর্তন ঘটিয়ে নিরর্থক রঙ্গের খেলা দেখানো এর আসল উদ্দেশ্য নয়। এখানেও আলো-ফেলার রীতি সহজ ও সরল। সাধারণতঃ অ্যাম্বার লাল ও নীল এই ক-টি রঙ্গই অভিনয়ের সময়ে ব্যবহার করা হয়। মঞ্চের রঙ্গে আর অভিনেতাদের সাজের রঙ্গে ও আলোর রঙ্গে একটি বর্ণসাম্য ঘটানোই ছিল আচার্য নন্দলালের মনোগত ইচ্ছা। তাঁর এই ইচ্ছাটি ভারতের শিল্পরুচি ও আদর্শজাত একটি খাঁটি জিনিস। এই মঞ্চসজ্জা বিদেশী শিল্পদৃষ্টির ব্যর্থ প্রকাশ বা অনুকরণ —এ-কথা আদৌ ঠিক্ নয়। এ হলো ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত ভারতশিল্পীর একটি বিশেষ সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আর আচার্য নন্দলালের চেষ্টায় আমাদের দেশে এ-যুগের রঙ্গমঞ্চসজ্জায় একটি নবযুগের প্রবর্তন ঘটেছে।

॥ শান্তিনিকেতনে দেওয়াল-চিত্র (Fresco) ॥

'বিচিত্রা'র শেষপর্বে আমি আর আমাদের সুরেন রইলুম কলকাতাতেই। আমি তখন প্রতিমা দেবীকে শেখাচ্ছি। তখনই জগদীশ বোসের বৈঠকখানায় ফ্রেস্কো করার কথা হলো। কথা কইলেন অবনীবাবু আর গুরুদেব। এ-সব কথা আগে বলেছি। আমাদের হাতীবাগানের বাড়িতে ছিল সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি, সে আমারই করা।

'শান্তিনিকেতনে প্রথম ফ্রেস্কো করেছিলেন আমাদের সুরেন। শালবীথিতে ছিল আদিকুটীর। সুরেন আদিকুটীরে একটি ঘরের দেওয়ালে অজন্তার

পদ্ধতিতে মা ও ছেলে ভিক্ষা করছেন বুদ্ধের কাছে, আঁকলেন তিনি রং দিয়ে। ছবি করেছিলেন মাটির দেওয়ালের ওপর। এ হলো ১৯১৮।১৯ সালের কথা। সে ছবি ছিল অনেক দিন।

'শান্তিনিকেতনে প্রথম কলাভবন ছিল 'দ্বারিকে'। দ্বারিকের দোতলার সিঁড়িতে উঠতে পাশের দেওয়ালে কিছু ফ্রেস্কো করলুম আমি। লাইনে করা হলো লাল গেরিমাটি দিয়ে অজন্তার ডিজাইনে। থামে অজন্তার স্টাইলে decorative চিত্রও কিছু করা হলো, ঐ গেরিমাটি দিয়ে। কিন্তু, আমাদের সে-চেষ্টা successful হলো না।

'দ্বারিক' থেকে আমাদের কলাভবন উঠে এলো এখনকার (১৯৫৫) শিশুবিভাগে —'সন্তোষালয়ে'। এই শিশুবিভাগের দেওয়ালের ওপর নানা জন্তু-জানোয়ারের ছবি করা হলো —বিশেষ করে শিশুদের যা ভালো লাগবে। এই ছবির সবই করা হলো রং দিয়ে। তখনকার কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা মিলে এই সব ছবি করলেন। সাবিত্রী করলেন হাঁস-ওড়া। আমাদের গৌরী, যমুনা, সাবিত্রী, গীতা সবাই একসঙ্গে মিলে কাজ করেছে। এখানকার ছবির বেশির ভাগই হলো অজন্তার কপি।

'প্যাট্রিক গেডিস এলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁকে আমাদের অক্ষম ফ্রেস্কোর নমুনা দেখালুম। তিনি বললেন, —রং না-টেকে কয়লা দিয়ে আঁক'। তোমার সেই ছবি যদি একদিন একজন লোকও দ্যাখে তা-হলেই তোমার আঁকা সার্থক হলো জানবে।

'১৯২৪ সালে প্রতিমাদেবী গেলেন ফ্রান্সে। তিনি সেখান থেকে Italian wet process অর্থাৎ দেওয়ালে পলস্তারার বালি ভিজে থাকতে থাকতে তার ওপর ছবি আঁকার পদ্ধতি শিখে এলেন। এই পদ্ধতির ওপর তাঁর অনেক note লেখা ছিল। সেটা তিনি দিলেন আমাদের। সেইমত ফ্রেস্কো এখানেও করা হলো। Italian wet process ফ্রেস্কোর ওপর তাঁর লেখা note আর এই বিষয়ে তারপর থেকে নানা বই পড়ে আমাদের শিক্ষা হতে লাগলো। অর্থাৎ কিনা, শেখা হলো experiment করতে করতে।'

১৯২৭ সালে জয়পুর থেকে এলেন নরসিংলাল। বয়সে প্রবীণ। দেওয়াল-চিত্রের পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ কারুশিল্পী। তখন জয়পুরে তাঁর মতন এই পদ্ধতি কেউ জানতো না। তিনি যখন শান্তিনিকেতনে এলেন, তাঁর কাছ

থেকে এই পদ্ধতি শিখে নেবার জন্যে কলাভবনের শিক্ষক-ছাত্র এমন-কি, আচার্য নন্দলাল পর্যন্ত একান্ত উন্মুখ হয়ে উঠলেন। শান্তিনিকেতন-কলাভবন থেকে নরসিংলালকে কাজে নিয়োগ করা হলো। আচার্য নন্দলাল আর তাঁর কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা কারুশিল্পী নরসিংলালকে তাঁর কাজে সাহায্য করবেন, কথা হলো। গ্রন্থাগারের ওপরতলার সামনের লম্বা দেওয়ালে ছবি আঁকার কাজ শুরু হলো। দেওয়ালের মাপ যার ওপর ছবি হবে, সে হলো প্রায় ২৮০ বর্গফুট। কাজ শেষ হলো প্রায় চার মাসে। খরচ হলো প্রায় পাঁচ-শো টাকা। দু-টি ছবি ছাড়া বাকিগুলো হলো পুরাতন ছবির অনুঅঙ্কন। মৌলিক ছবি দু-টির একটির design করেছিলেন আচার্য নন্দলাল আর অপরটি সুরেন্দ্রনাথ কর। গুরুদেবের লেখা কবিতার এই দেওয়ালে চিত্রলিপি করা হয়েছে।

গ্রন্থাগারের ওপরের বারাণ্ডায় যে যে ছবি করা হলো —পূর্বদিকের দেওয়ালে শাল-বীথিতে রাত্রে বৈতালিক, উত্তর কাঁথে চীনে-আত্মা ড্রাগন, পার্শিয়ান রিক্ত-যৌবনরস, ইজিপশিয়ান বীণাবাদন ছবিগুলি করলেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর। এর পরে অজন্তা-পদ্ধতিতে আর নিজস্ব পদ্ধতিতে শান্তিনিকেতনে বসন্ত-উৎসবের ছবিগুলি করলেন আচার্য নন্দলাল। শান্তিনিকেতনে সেকালের বসন্ত-উৎসবে গুরুদেব, শাস্ত্রী মহাশয়, পিয়ার্সন, দিনুবাবু, গোসাঞীজী প্রমুখ যাঁরা অংশ গ্রহণ করতেন তাঁদের বিশিষ্ট ভূমিকা নন্দলালের সুনিপুণ তুলিকাস্পর্শে রূপায়িত হয়ে রয়েছে প্রত্যেক দরওয়াজার শিরোভূষণ রূপে। বচন লিখে দিয়েছিলেন তখন স্বয়ং গুরুদেব।

'গুরুদেব বচন লিখে লিখে দিতেন, আর আমি সকালে কাজ শুরু করার আগে তাঁর কাছে গিয়ে নিয়ে আসতুম।'—এ খবর দিলেন স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ (৯-৫-১৯৮৭)। গুরুদেব তখন প্রথম এই বচনগুলি লিখলেন, এবং পরে এগুলি একটি কবিতার সূত্রে 'দুয়ার' এই নাম দিয়ে তাঁর 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করলেন (১৩৩৪) কিছু কিছু পাঠান্তর জুড়ে। তখন শাস্ত্রীমশায় বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ। বিদ্যাভবনের গবেষকরা বসতেন এখানে। এই বচনগুলি বিদ্যাভবনে বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গবেষণার ভূমিকাস্বরূপে লেখা হয়েছিল। এবং প্রসঙ্গতঃ চিত্রগুলিও করা হলো প্রাচ্য-শিল্পকলার সমন্বয় করে। এবং আরও দেখানো হলো, শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীতে প্রাচ্যের এবং প্রতীচ্যের

বিদ্যা ও শিল্প একত্র সংহত হয়ে শান্তিনিকেতনে তার 'এক নীড়'-রূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে।'

॥ প্রথম দরজা ॥

হে দুয়ার, তুমি আছ মুক্ত অনুক্ষণ,
রুদ্ধ শুধু অন্ধের নয়ন।
অন্তরে কী আছে তাহা বোঝে না সে, তাই
প্রবেশিতে সংশয় সদাই।

॥ দ্বিতীয় দরজা ॥

হে দুয়ার, নিত্য জাগে রাত্রিদিনমান
সুগম্ভীর তোমার আহ্বান।
সূর্যের উদয়-মাঝে খোল আপনারে,
তারকায় খোল অন্ধকারে।

॥ তৃতীয় দরজা ॥

হে দুয়ার, বীজ হতে অঙ্কুরের দলে
খোল পথ ফুল হতে ফলে।
যুগ হতে যুগান্তর কর' অবারিত,
মৃত্যু হতে পরম অমৃত ॥

॥ চতুর্থ দরজা ॥

হে দুয়ার, জীবলোক তোরণে তোরণে
করে যাত্রা মরণে মরণে।
মুক্তিসাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে
'মাভৈঃ' বাজে বৈরাগ্যনিশীথে ॥

পার্সিয়ান ছবির পরিচয় ॥

(১) শেষ বসন্ত রাত্রে
যৌবন-রস রিক্ত করিনু
বিরহ বেদন পাত্রে ॥

॥ ইজিপশিয়ান ছবির পরিচয় ॥

(২) আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিয়ো হৃদয় দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,
এই সঙ্গীত মুখরিত গগনে
তরঙ্গ রঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে ॥

ছবির কাজ সেরে নরসিংলাল চলে গেলেন। আবার তাঁকে ডাকা হলো ১৯৩৩ সালে। এবারে ছবি আঁকার জন্যে গ্রন্থাগারের নিচের তলার সামনের দেওয়ালটি ঠিক্ করা হলো। দেওয়ালে কি কি ছবি আঁকা হবে, তার সমস্ত design করলেন আচার্য নন্দলাল। ছবির ধারে ধারে অলঙ্করণের কতকগুলি design করলেন শান্তিনিকেতনের পূর্ব-বিভাগের ছাত্রীরা। কলাভবনের শিল্পীরা কাজে সাহায্য করলেন। কাজ চলল চার মাসের কিছু বেশি —১৯৩৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ই জুন পর্যন্ত। রখচ হলো প্রায় ৬৫০ টাকা। এর মধ্যে নরসিংলালকেই দেওয়া হলো ৪৫০ টাকা। বাকি ২০০ টাকা হলো সরঞ্জামি খরচ। ছবি-সংখ্যা হলো ৮, আর করা হয়েছে ২৩০ বর্গফুট জায়গা জুড়ে।

গ্রন্থাগারের নিচের তলায় দেওয়ালের ছবি করা হলো জয়পুরী পদ্ধতিতে—শ্রীচৈতন্যের জন্ম, আদিকুটির ও ফ্রেস্কোর কাজ, 'শাপমোচন' নাটক, সাঁওতাল মেয়ে, রাখাল ও ষাঁড়ের লড়াই, গরু-চরা, খোয়াই ও নদী, কুমারীর প্রদীপ জ্বালানো। প্রত্যেকটি ছবিই প্রকাণ্ড মাপের (বিশদ পরিচয় পরে দেখুন)।

জয়পুরী দেওয়াল-চিত্রের এই পুরাতন পদ্ধতি অল্প যে ক-জন লোক জানতেন তাঁদের বেশির ভাগেরই বাস ছিল জয়পুরে। রাজপুতানা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতের রাজমিস্ত্রীরা এইরকমভাবে দেওয়ালে পলস্তারা

করার পদ্ধতি জানতেন ; কিন্তু, এর ওপর কিভাবে ছবি আঁকতে হয়, তা জানতেন না। তাঁরা রং করা পলস্তারার কাজও জানতেন —সে রঙিন পলস্তারা আয়নার মতো উজ্জ্বল হতো বটে, কিন্তু তাঁদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল ঐ পর্যন্তই।

'১৯২৭ সালের দিকে জয়পুরে এই পদ্ধতি-জানা কারুশিল্পী ছিলেন পঞ্চাশ-ষাট জনের মতো। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এক্সপার্ট্ ছিলেন জনা-পনেরোর মতন। ভারতবর্ষে অন্যান্য কারুশিল্পের মতন এই দেওয়াল-চিত্র-আঁকার পদ্ধতি-শিক্ষা কোনো বিশেষ জাতের মধ্যে একচেটে ছিল না। এই শিল্পীদের মধ্যে অনেকে ছিলেন ব্রাহ্মণ, আবার তেমনি নাপিত, চামার, কুমোর এবং অন্য জাতিও এই কাজ শিখে তাদের জীবিকা উপার্জন করতো।

'বিশ্বভারতীতে এলেন জয়পুরী শিল্পী নরসিংলাল, জাতিতে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। জাতে অতি উঁচু হলেও কি করে তিনি শিল্পকলার চর্চা শুরু করলেন— সে-এক মজার গল্প। তাঁর বয়েস যখন চোদ্দ, তিনি একজন শিল্পীর কাছে কাজ করতেন ; সেই শিল্পী কাজ করতেন এই পদ্ধতিতে। বালক-ভৃত্য নরসিংলালের কাজ ছিল মাত্র তার মনিবের জন্যে সিদ্ধি-ঘোঁটা। মনিবকে কাজ করতে দেখতে দেখতে ভৃত্যের ইচ্ছা হলো, তাঁর শিষ্য হবেন। শিষ্য যখন সারা রাত্রি কাজ করে সকালে বাড়ি ফিরতো, সে প্রতিদিনই, খানিকটা করে চুন চুরি করে আনতো, আর সেই চুন দিয়ে সে ঘরে কাজ করতো তার মনিবের মতো। এই করতে করতে তার গুরুর সেই পদ্ধতি সে সম্পূর্ণ অধিগত করে ফেললে। তারপর ঘরে সে তার বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ঘর থেকে পালিয়ে গেল। সে এলো রেল-স্টেশনে। একটা টিকিট কিনলে ঘর থেকে অনেক দূরের পথের। কিন্তু বালকের সে দূরত্ব ঘর থেকে বেশি দূরে নয়। বিশেষ করে বেশি দূরে যাবার উপায়ও তার ছিল না। সে ট্রেন থেকে নেমে কি করবে ভেবে পেল না। শহরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বেড়াতে বেড়াতে সহসা সে দেখতে পেল, একটা প্রকাণ্ড সৌধ তৈরি হচ্ছে। সেখানে গিয়ে সে নাম লেখালে কুলির খাতায়। একদিন একটি কাজে যখন সব মিস্ত্রী ফেল্ হয়ে গেল, সেই বালক-কুলি অর্থাৎ নরসিংলাল তার কালোয়াতি আর বুদ্ধিমত্তা দেখিয়ে দিলে। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব খুবই খুশি হয়ে তাকে রাজমিস্ত্রী করে নিলেন। ফলে, কিছু পয়সা এলো এবং

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলো। কিন্তু, তখন তার মতি বদলে গেছে। এখন তিনি হলেন একজন ফটোগ্রাফার। জয়পুরে তিনি এই আলোকচিত্র-শিল্পের কাজ চালিয়েছিলেন ত্রিশ বছর ধরে। এর পরে তিনি ধরলেন দেওয়াল-চিত্র আঁকতে। যখন তিনি শান্তিনিকেতনে দ্বিতীয়বার এলেন, তখন তাঁর বয়েস হয়েছিল প্রায় ৬২ বছর। কিন্তু সে-বয়সেও কাজে নিপুণতা ও উদ্যম ছিল তাঁর যুবকের মতনই। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করতে পারতেন কিচ্ছুটি না খেয়ে জল পর্যন্ত না-ছুঁয়ে।

'ব্যয়বহুল আর শ্রমসাধ্য বলে এই শিল্প এখন মৃতকল্প। রাজপুতানার বনেদী জমিদারগণ তাঁদের সৌধ অলঙ্কৃত করাতেন এই সব অভিজ্ঞ কারুশিল্পীদের দিয়ে। কিন্তু বর্তমানে দৃষ্টিভঙ্গির বদল হওয়ায় এই কাজের ওপর আকর্ষণ কমতে কমতে নিঃশেষ হয়ে এসেছে। এখন যাঁরা করান, সে-রকম ধনী ও ভাগ্যবান্ লোকের সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যায়। তবে, রাজপুতানা ছেড়ে এই সব আর্টিস্ট যে বাইরে আসছেন, এটা শুভলক্ষণ। কিছুদিন আগে ক-জন আর্টিস্ট্ বারাণসীতে এসেছিলেন রাজা মোতিচন্দের প্রাসাদে অলঙ্করণের কাজ করবার জন্যে। ১৯০৭-৪ সালের দিকে এঁরা বাঙ্গালাদেশে এসেছিলেন প্রথম। সে-সময়ে হ্যাভেল সাহেব আর অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশমতো তাঁরা সরকারী সৌধ, বিশেষ করে, আর্টস্কুল তাঁদের পদ্ধতিতে ছবি এঁকে সাজিয়েছিলেন। এর কয়েক বছর পরে তাঁদের পুনরায় আনা হয়েছিল এই ধরনের কাজ আরও কিছু করবার জন্যে। কয়েক বছর আগে, তাঁদের একজন বোম্বাই-আর্টস্কুলেও গিয়েছিলেন। অন্য সব প্রতিষ্ঠান তাঁদের ডেকে কাজ করালে শিল্পজগতে তাঁরা মহৎ অবদান রেখে যেতে পারেন। ফলে, সাধারণ জনমানসে চিত্রবিদ্যা সম্পর্কে নতুন প্রেরণা জেগে উঠবে।

'হ্যাভেল সাহেব তাঁর Indian Sculpture and Painting গ্রন্থে দেওয়াল-চিত্রের পদ্ধতি সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু, সে-বিবরণ যথেষ্ট নয়। তাঁর বিবৃত পদ্ধতি ধরে কাজ করা যায় না। এই বিষয়ে ইটালীয়ান আর্টিস্ট্ Cennino-Cennini-র পদ্ধতি বেশি কার্যকর। প্রাচীন ইটালীর প্রখ্যাত শিল্পী Cennino-Cennini তাঁর A Treatise on Painting-গ্রন্থে এই পদ্ধতির যে বর্ণনা দিয়েছেন সেই পদ্ধতিমতে তেরো ও চোদ্দ শতাব্দের ইটালীর শিল্পিগণ ফ্রেস্কো এঁকেছিলেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনা আন্তরিক হলেও তা-থেকে কার্যকর

বিবরণ যথেষ্ট পাওয়া যায় না।

'Fresco' কথাটি এখন খুবই প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু, যে-কোনো দেওয়াল-চিত্রকেই এখন সবাই 'ফ্রেস্কো' বলে থাকে, সেটা ভুল। ফ্রেস্কোতে রঞ্জক বস্তুটি মাত্র জলে মেশানো হয়; কোনো বন্ধনী আস্তর ব্যবহার করা হয় না। আর করা হয় পলস্তারা ভিজে থাকতে থাকতে। জমির এই 'fresh' থাকার অবস্থায় তার ওপর ছবি করা হয় বলে, এই পদ্ধতিকে ইটালীয়ান প্রতিশব্দে বলা হয় 'a fresco' বা 'on the fr sh'। এইভাবে বলতে বলতে এই নামটাই স্থায়ী হয়ে গেছে। Fresco আসলে হলো একজন দেওয়াল-চিত্রীর অনুসৃত একটি পদ্ধতি; কিন্তু, এখন ভুল করে Fresco বলা হচ্ছে, যে-কোনো পদ্ধতিতে দেওয়ালে ছবি আঁকলেই। প্রসঙ্গতঃ ফেস্কো-কর্মের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

॥ দেওয়াল-চিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ॥

সবচেয়ে পুরাতন দেওয়াল-চিত্র আজ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে সে হলো স্পেনের আলতামিরা-পর্বতগুহায়। প্রাগৈতিহাসিক কালে আঁকা এই ছবি। বয়েস প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার বছর। ওতে বন্ধনী-বস্তু বা অস্তর ব্যবহার করা হয়েছে চর্বি। প্রাচীন ইজিপ্টে, ব্যাবিলোনে, মাইশেসীয়ান গ্রীসে, ইজিপ্টের সমস্ত মমিতে আর পপিরাসে ছবি আঁকা হয়েছে টেম্পেরাতে। ইটালীয় সমাধি-স্তম্ভে যে-সব চিত্রকর্ম রয়েছে সে-সমস্ত করা হয়েছে টেম্পেরায়। খাস গ্রীসে দেওয়াল-চিত্র যখন প্রচলিত হলো তখন পলিগ্নোটাস্ (Polygnotus) আর তাঁর সহশিল্পীরা যখন তাঁদের মাস্টার-পীস আঁকতে লাগলেন, তাঁরাও করলেন টেম্পেরায়। আলেকজাণ্ডারের কিছু আগে, আর-একটি পদ্ধতির প্রচলন হলো গালার অস্তর দিয়ে ছবি করা।

রোমান স্থপতি বিক্রবিয়াস (Vitruvius) ষোল খৃস্টপূর্বাব্দে লেখা তাঁর বইয়ে ফ্রেস্কো-পদ্ধতির বিবরণ দিয়েছেন। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনীও Fresco সম্পর্কে উল্লেখ করে গেছেন। এতে পরিষ্কার প্রমাণ হয়, ফ্রেস্কোয় ছবি আঁকার পদ্ধতি রোমানরা নিশ্চয়ই জানতেন। মাউন্ট এ্যাথোসের (Mount Athos) Hand book-এ প্রাচ্যদেশের ফ্রেস্কো-চিত্রপদ্ধতির

পরম্পরা সংকলিত হয়েছে। রোমের নিকটে মাটির তলায় সুড়ঙ্গ-পথের দু-দিকে কবরের গ্যালারীতে ফ্রেস্‌কো করা হয়েছিল। কিন্তু, পরবর্তী কালের খৃস্টান দেওয়াল-চিত্রীরা আল্পস্ পাহাড়ের উত্তর-দক্ষিণে আদি-মধ্য-যুগের চার্চ অলঙ্করণের সময়ে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। শক্ত বলেই বোধহয় এই পদ্ধতি এঁরা নেননি। কিন্তু আবার গ্রহণ করা হয় তেরো-চোদ্দ শতাব্দে। রেনেসাঁ যুগের শিল্পীরা কিছু ঘুরিয়ে পুরাতন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। পার্থক্যটি দেখা যায়, বিত্রুবিয়াস (Vitruvius) আর সেন্নিনো-সেন্নিনির (Cennino-Cennini) বইয়ে ধরা আছে। এই নিবন্ধে ঐ সময়কার শিল্পীদের অবলম্বিত একটি ফ্রেস্‌কো-পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে। তফাতটা হলো, পম্পের ফ্রেস্‌কো খুব সমতল আর মসৃণ। তার ওপরটা বা পিঠটা আয়নার মতো উজ্জ্বল। আর তেরো-চোদ্দ শতাব্দের ফ্রেস্‌কো হচ্ছে তুলনায় অসমান, অমসৃণ। আর এতে যে-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে সে সহজতর। এক-পোঁচ পলস্তারা করার পরেই, ভিজে থাকতে থাকতে এঁরা আঁকতেন তার ওপরে।

টেম্পেরা-পদ্ধতি আদি-মধ্যযুগেও প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে তেলের অস্তর দিয়ে ছবি আঁকাও প্রচলিত হলো। দেওয়াল-চিত্রেও তেল-ব্যবহারের প্রচলন হলো। কিন্তু, আঠারো শতাব্দের শেষদিক থেকে আবার দেওয়াল-চিত্র আঁকা চলতে লাগল। আধুনিক য়ুরোপে এটা একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়ালো। লণ্ডনের পার্লামেন্ট-ভবনে যে-ফ্রেস্‌কো করা হয়েছিল সেগুলি বেশি দিন টেকেনি। য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীরা এখন বহু বছর ধরে এই পুরাতন পদ্ধতিকে উন্নত করার চেষ্টায় আছেন। এবং এখন তাঁরা ফ্রেস্‌কো-আঁকার নতুন আর সহজতর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এখন ফ্রেস্‌কো-ছাড়া দেওয়াল-চিত্র আঁকার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

এবারে ভারতবর্ষের দেওয়াল-চিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলা যাচ্ছে। ঐতিহাসিকরা আজ পর্যন্ত যাঁরা এই নিয়ে আলোচনা করেছেন—বিশেষ করে অজন্তার, বাগের এবং সিগিরিয়া-গুহার দেওয়াল-চিত্র নিয়ে—তাঁরা সবাই একই ভুল করেছেন এই সব দেওয়াল-চিত্রকে 'ফ্রেস্‌কো' বলে। ভারতশিল্পীরা যে-পদ্ধতিতে এই সব ছবি এঁকেছিলেন, সে-পদ্ধতি প্রকৃত ফ্রেস্‌কো-চিত্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এটা ঠিক যে, তাঁরা ভিজে জমির ওপর ছবি আঁকেননি ; ফলে

এই চিত্রকর্মকে কিছুতেই 'ফ্রেস্‌কো' বলা যায় না। তাঁরা পলস্তারা তৈরি করবার জন্যে চুন ব্যবহার করে ছবি আঁকলে সে ফ্রেস্‌কো হয় না। তাঁরা পলস্তারা তৈরি করবার জন্যে চুন ব্যবহার করেছিলেন; চুনের ব্যবহার করে ছবি আঁকলে সে ফ্রেস্‌কো হয় না। ষোল শতাব্দের লেখা শিল্পরত্ন-গ্রন্থে, আর ৬২৫ থেকে ১০০০ খৃস্টাব্দে সঙ্কলিত বিষ্ণুধর্মোত্তরম্‌-গ্রন্থে দেওয়াল-চিত্রের পদ্ধতি বিবৃত হয়েছে। এ থেকে আমরা দেখতে পাই, ভারতশিল্পীরা এই উভয় গ্রন্থের যে কোনো একটি পদ্ধতি, বা অনুরূপ কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। কারণ, বিষ্ণুধর্মোত্তরম্‌ গ্রন্থ হচ্ছে বিভিন্ন গ্রন্থের সঙ্কলন। এবং সেই আকর গ্রন্থগুলি বর্তমানে অপ্রাপ্য। যে বইগুলি হারিয়েছে, তাতে নিশ্চয়ই এই রকম প্রখ্যাত দেওয়াল-চিত্রের পদ্ধতি বিধৃত ছিল। এমন-কি, সেই সকল গ্রন্থের রচনাকালে ভারতবর্ষে প্রচলিতও ছিল। —এই পদ্ধতিকে ফ্রেস্‌কো-পদ্ধতি বলা যায় না; সুতরাং এই সব দেওয়াল-চিত্রকে ফ্রেস্‌কো-চিত্র বলা সঙ্গত নয়। দেওয়াল-চিত্র-অঙ্কনে ভারতশিল্পীদের নিজস্ব পদ্ধতি ছিল, এবং যতদিন না তার বিশিষ্ট প্রতিশব্দ আবিষ্কৃত হচ্ছে, ততদিন এগুলিকে টেম্পেরা-পদ্ধতি বলে বর্ণনা করাই সঙ্গত হবে। গ্রিফিথ সাহেবের মতও ঠিক জানা যায় না; কারণ, তিনি অজন্তা-পদ্ধতিকে আধুনিক জয়পুরী শিল্পীদের অনুসৃত পদ্ধতির সমতুল বলে বর্ণনা করে গেছেন। চিত্রগুলি ভিজে জমিতে করা হলে, এবং কর্নিক দিয়ে পালিশ করা হলে, ঐ দুই গ্রন্থের গ্রন্থকার দু-জন এই রকম অত্যাবশ্যক বিষয়ে তাঁদের পুঁথিতে উল্লেখ করতে ভুলতেন না।

ভারতবর্ষে দেওয়াল-চিত্রের ইতিহাস বিশেষভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ওড়িষ্যার সরগুজা এস্টেটের রামগড় পাহাড়ের যোগিমারা গুহায় যে দেওয়াল চিত্র রয়েছে—সেই হলো ভারতবর্ষের প্রাচীনতম দেওয়াল-চিত্র। এবং সে প্রায় খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দের শিল্পকর্ম। এই চিত্রকর্মের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা শক্ত হলেও, বলা যায়, এখানকার শিল্পীরা এই শিল্পকর্মে আদিম জাতির কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। তবে সে-পদ্ধতি যে ফ্রেস্‌কো-চিত্রের পদ্ধতি নয়, এও ঠিক।

এর পরে যথাক্রমে বলতে গেলে আসে অজন্তার কথা। অজন্তার কথা ঢের বলা হয়েছে; প্রসঙ্গতঃ এইটুকু বলা দরকার যে, সে-পদ্ধতি —টেম্পেরা।

আর ভারতশিল্পীরা এর জন্যে জমি তৈরি করেছিলেন তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে। অজন্তা-চিত্রকর্মের সময়সীমা হচ্ছে ৫০ থেকে ৬৪২ খৃস্টাব্দ।

সিংহলের সিগিরিয়া বা শ্রীগিরির দেওয়াল-চিত্র করা হয়েছিল পঞ্চম শতাব্দের শেষ দিকে। বেল (Bell) সাহেব বিশ্বাস করেছিলেন, শ্রীগিরিতে ছবি আঁকা হয়েছিল শুক্‌নো জমির ওপর টেম্পেরা-পদ্ধতিতে। সে-পদ্ধতি অজন্তা-পদ্ধতি থেকে বিশেষ-কিছু তফাত নয়। এই কারণে আমাদের বিশ্বাস করতে হয় যে, অজন্তার দেওয়াল-চিত্র ফ্রেস্‌কো-চিত্র নয়। সিংহলের শ্রীগিরির এই চিত্র অজন্তার সমকালীন এবং সিংহল ভারতবর্ষের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগে যুক্ত ছিল; সুতরাং উভয় স্থানের চিত্রকর্মের পদ্ধতিতেও মিল থাকা অস্বাভাবিক নয়। শ্রীগিরি ছাড়া অন্য পুরাতন দেওয়াল-চিত্রের নমুনা রয়েছে অনুরাধাপুরে। এবং সে করা হয়েছিল টেম্পেরা-পদ্ধতিতে।

গোয়ালিয়রের বাগগুহার দেওয়াল-চিত্র অজন্তার সর্বশেষ দেওয়াল-চিত্রের আগে করা হয়নি। এ-ও করা টেম্পেরায়। তামানকাড্‌ুয়ার গুহাচিত্রের বয়েস হলো প্রায় সপ্তম শতাব্দ, সে-ও করা টেম্পেরা-পদ্ধতিতে।

ভিন্‌সেণ্ট্‌ এ. স্মিথ্‌ সাহেব বলেন, —এর পরে ভারতশিল্পের ইতিহাসে একটা অন্ধকার যুগ। কিন্তু, এ-কথা বোধহয় যথার্থ নয়। আমরা আগে ভারতীয় যে দু-টি মহাশিল্প-গ্রন্থের উল্লেখ করেছি তার পুঁথিগুলি লেখা হয়েছিল স্মিথ্‌সাহেব যে-যুগকে ভারতশিল্পের অন্ধকারময় যুগ বলেছেন, সেই যুগে। সম্প্রতি মাদ্রাজের কাছে পুড্‌ুকোটা তালুকে সিত্তানভশালে যে চিত্রকর্ম আবিষ্কৃত হয়েছে, সে-হলো অজন্তা-পদ্ধতির প্রায় অনুবৃত্তি। এবং এ-ও করা হয়েছিল টেম্পেরা পদ্ধতিতে। এগুলি হলো কমপক্ষে ৮০০ বছরের পুরানো। সুতরাং এই যুগকে ভারতশিল্পের সুদীর্ঘ ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বলে লেবেল মারা যায় না। যাই হোক্‌, এ-অনুমানও ঠিক হবে যে, এই পদ্ধতি সেই যুগেই উদ্ভূত হয়নি।

মধ্যযুগের অসংখ্য হিন্দু-মন্দিরে দেওয়াল-চিত্র করা হয়েছিল। কিন্তু তার প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নাই। সে-সব ধ্বংস হয়েছিল বর্বর, বিধর্মী বহিরাগতদের রাজ্যকালে। হিন্দুযুগে সবচেয়ে পুরানো যে দেওয়াল-চিত্র পাওয়া গেছে, সে হলো রাজপুতানার বিকানীরের পুরাতন প্রাসাদে। এই চিত্রগুলি ১৭/১৮

শতাব্দের করা। প্রকৃত ফ্রেস্কো-চিত্র কিছু রয়েছে ফতেপুরসিক্রীতে। এর মধ্যে একটি রয়েছে খুবই ভালো অবস্থায়। এর সময় হবে ষোল শতাব্দের শেষের দিকে। অর্থাৎ ফতেপুরসিক্রীর সময়ে।

জে. এল্. কিপ্‌লিং সাহেব বলেন, লাহোরে ওয়াজির খানের মসজিদের দেওয়ালে ফ্রেস্কো-চিত্র আসল 'ফ্রেস্কো'। এ হলো ইটালীয় buono ফ্রেস্কোর অনুসরণ।

রাজপুতানার অনেক স্থানে দেওয়াল-চিত্র রয়েছে। এর অনেকগুলি প্রকৃত ফ্রেস্কো-চিত্র। কিন্তু এদের সময় জানা যায় না। বর্তমান কালেও ওদেশে শিল্পী রয়েছেন, তাঁরা ফ্রেস্কো-চিত্র করে থাকেন। তাঁরা কিন্তু তাঁদের এই ফ্রেস্কো-চিত্রের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন পুরুষপরম্পরায়। কিন্তু তাঁরা কত দিন ধরে এই কাজ করছেন সে-কথা নিশ্চিত জানবার কোনো উপায় আমাদের নাই। যে-সব শিল্পী ফ্রেস্কো-চিত্রের কাজ করছেন, আমাদের মনে হয়, তাঁদের জের আসছে ষোল শতাব্দের আগে থেকে। কারণ ফতেপুরসিক্রীর ফ্রেস্কো-চিত্র একই পদ্ধতিতে করা হয়েছে।

উত্তরভারতে মন্দিরে প্রায় সমস্ত প্রাচীর-চিত্র এবং বাঙ্গালাদেশের বহু গ্রামের চিত্রকর্ম টেম্পেরায় করা। দক্ষিণভারতের তিরুমালাই, কঞ্জিভেরম্, ত্রিবাঙ্কুর, অনেগুণ্ডি এবং অন্যত্র মন্দিরে দেওয়াল-চিত্র খৃস্টীয় শতাব্দের প্রায় প্রারম্ভ থেকেই করা হয়েছিল। খুব সম্ভব, এ-সব কাজই টেম্পেরায়। সিংহলের মহাডামল সয়া, ডমবুল্লা, আলুবিহারি এবং রিদি-বিহারের দেওয়াল-চিত্র করা টেম্পেরায়। কারণ ওখানকার শিল্প পুরুষপরম্পরায় চলে আসছে; শ্রীগিরির চিত্রকর্মও টেম্পেরায় করা।

তিব্বত এবং নেপালের দেওয়াল-চিত্রে খুব মিল আছে। এ বেশি পুরাতন নয়। করা টেম্পেরায়। ফ্রেস্কো-পদ্ধতি ওদেশে জানা ছিল না।

জাপানের হোরিয়ুজি মন্দিরের দেওয়াল-চিত্র অজন্তা-পদ্ধতির অনুসরণে করা। সে-ও টেম্পেরায়। খোটান, চীন, মধ্য-এশিয়ার বিখ্যাত দেওয়াল-চিত্র করা হয়েছিল কাঠ আর পলস্তারার ওপর —টেম্পেরায়।

দেওয়াল-চিত্রের এই যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া হলো, এ-থেকে দেখা যাবে, ফ্রেস্কো-চিত্র-শিল্প-পদ্ধতির প্রয়োগ কম ক্ষেত্রেই হয়েছে। মধ্য-য়ুরোপের কিছু অংশ এবং উত্তরভারতের কিছু অঞ্চল ছাড়া ফ্রেস্কো-পদ্ধতি ছিল

অজ্ঞাত। আশ্চর্য এই, রোমান শিল্পীদের আর জয়পুরী শিল্পীদের অনুসৃত পদ্ধতিতে অদ্ভুত মিল আছে। কিন্তু, বলা শক্ত, কি করে এই মিল হলো। কারণ, এই উভয় দেশের সাংস্কৃতিক মিলনের কোনো নিদর্শন এযাবৎ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ণীত হয়নি। (—Visvabharati News, July 1933 সালে প্রকাশিত জয়ন্ত পারেখের রচনা থেকে অংশতঃ সঙ্কলিত)।

এই বিষয়ে আচার্য নন্দলাল বলেন,—

'জয়পুরী মিস্ত্রীদের আরায়েসের কাজ খুব পুরাতন। এ আমাদের দেশের অর্থাৎ বাঙ্গালাদেশের 'পংকে'র কাজের প্রায় অনুরূপ। দিল্লী-ফোর্টে আর আম্বর-ফোর্টে এই ধরনের কাজ আছে। জয়পুরের এখনকার মিস্ত্রীদের পূর্বপুরুষেরা পুরুষানুক্রমে এই কাজ করে এসেছেন। তার ধারা এখনও চলছে। ইটালীর পম্পেতে পাওয়া গেছে এই ধরনের কাজ। ওদেশের পণ্ডিতেরা বলেন, ভারত থেকে বা পারস্য থেকে গেছে ঐ শিল্পকলা ওদেশে। আমাদের ভরতনাট্যসূত্রে এই কাজের মেটিরিয়েল তৈরির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। ঐরকমভাবে জমি-তৈরি সিংহলে সিগিরিয়া-ফ্রেস্কোতে করা হয়েছে। আর দেখছি, সিংহলে কল্যাণী-মন্দিরে ঐরকম গ্রাউণ্ডে ফ্রেস্কো করা হয়েছে —অজন্তার মতো টেম্পেরায়। কিন্তু, অজন্তার গ্রাউণ্ড মাটি দিয়ে তৈরি। বাগগুহায় দু এক স্থানে বালির ওপর আঁকা আছে বলে অনুমান হয়। ওখানকার ফ্রেস্কোর নির্মাণকাল হলো ১২/১৩ শতাব্দ। কাজেই এ তৈরি ইটালীর পম্পের ঢের আগে —তাতে সন্দেহ নেই। সেণ্ট্রাল-এশিয়া ও খোটানেও পাওয়া গেছে এই ধরনের মাটি-প্রস্তুতি।

'মাটি-প্রস্তুতির নিদর্শন আরও পাওয়া যায়, আমাদের দক্ষিণরাঢ়ে প্রতিমাদি তৈরি থেকে। তুমি দক্ষিণরাঢ়ে উলুটির যে বিবরণ লিখেছ, তাতে মাটি-প্রস্তুতির পদ্ধতি পাওয়া যাওয়াতে আমাদের এই সব অনুমান ও পদ্ধতি সমর্থিত হয়ে গেল। ঐ জের এখনও এদেশে চলছে, এবং জীবিত আছে, জানতে পারলুম। —(দ্র. শিল্পচর্চা (১৩৬৩) পৃ ১৮৪-১৯০)।

'ঐ রকম পাট করা মাটির নিদর্শন আমি খানিক সংগ্রহ করে রেখেছি। রাখা আছে কলাভবন-ম্যুজিয়ামে। সিংহলে কল্যাণী-মন্দিরের যে ছুতার ছেলেটি আমার শিষ্য হলো (১৯৩৪), সে-ই সেখান থেকে খানিক নমুনা-মাটি আমাকে উপহার দিলে। সিংহলী মাটি, নেপালী মাটির বিভিন্ন নমুনা

আনা হয়েছে এখানে। ঐ সব নমুনা দেখে দেখে ছেলেরা তখন সব এক্স-পার্ট্ হতো। যে-কোনো ছেলেমেয়ে এখানের কন্‌ট্যাক্টে আসে, তারা এ-সব শিখে যায়। সব কথা এই বিষয়ে আমি বলেছি আমার শিল্পচর্চা বইয়ে। দিশী রং তৈরির হদিশও ওতে দেওয়া হয়েছে। একটা ছড়াও বানিয়ে দিয়েছি।

'জয়পুরী মিস্ত্রী নরসিংলাল এলো দু-বার। লাইব্রেরীর ওপরে-নিচে আরায়েসের কাজের জন্যে জমি তৈরি করলে দেওয়ালে। তখনই এই বিদ্যে শিখেছিলুম আমরা। আমরা ছাত্র ও শিক্ষকেরা মিলে তাঁর সহকারীরূপে কাজ করেছি। প্রথম বার (১৯১৭) উপরে। আর দ্বিতীয় বারে (১৯৩৩) নিচে কাজ তিনিই করলেন —জয়পুরী আর্টিস্ট্ নরসিংলাল।

১৯২৭ আর ১৯৩৩ সালে জয়পুরী ভিত্তিচিত্র বা আরায়েসের কাজে ওঁদের যে অভিজ্ঞতা হলো সে-সম্পর্কে আচার্য নন্দলাল যে কড়চা রেখেছিলেন, তা থেকে তিনি তাঁর অবসর-গ্রহণের (১৯৫১) পরে যা লিখলেন, সে হলো এই।—

'জোগাড়-যন্ত্র হিসাবে চাই —ওলন, নানা আকারের কর্নিক, জালের চালুনি বা ছাঁকনি, জল ছিটোতে বড়ো কুশের কুঁচি, 'মশলা' বাঁটতে শিল নোড়া চুন রাখতে কয়েকটি মাটির হাঁড়ি, মশলা রাখতে কয়েকটি মাটির গামলা, রঙ রাখতে মাটির বা কলাই-করা ছোট ছোট বাটি, 'খড়ি' নারিকেল (শাঁস যার শুকিয়ে মালার ভেতরে নড়ে) বা নারিকেল তেল, কোণা মাটাম (সেট্ স্কোয়ার), 'ক্যামেল', ও 'স্যাব্‌ল্ হেয়ার'-এর সরু মোটা তুলি, শণের আঁশের তুলি, কেয়া-ডাঁটি বা খেজুর-ডাঁটি (ফলের থোকা ধরেছিল যাতে) থেকে বানানো তুলি, খুদ-হেন শ্বেতপাথরের গুঁড়া (কলিকাতার বাজারে, বড়বাজার-চিৎপুর অঞ্চলে পাওয়া যায়) ও পাথুরে চুন। এর অনেকগুলি ইটালীয় ফ্রেস্‌কোতেও লাগে।

'শ্বেতপাথরের গুঁড়া সরু মোটা চালুনিতে চেলে, মোটা, মিহি, খুব মিহি —এই তিন ভাগ করে ফেলা দরকার। চুনের পাথরগুলি জল দিয়ে জরিয়ে, ফুটিয়ে, ছেঁকে নিতে হবে মোটা সুতোর জালি-কাপড় দিয়ে। দু-জন লোক প্রত্যেকে কাপড়ের দুটি কোণ ধরে, হাত উঁচু-নিচু করে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে ছাঁকবে। হাত লাগালে হাত জরে যাবে, কাঠি লাগালে কাপড় ফেটে যাবে। এই ছাঁকা চুন মাটির হাঁড়িতে প্রচুর জল ঢেলে এবং কিছু দই

জলসহ এই রকম কাগজে আঁকা এবং ফুটো করে চর্বা তৈরি করা —ফ্রেস্‌কো প্রসঙ্গে বলেছি। নিছক চুনের বা রং-মেশানো চুনের প্রলেপগুলি কয়টি লাগানো এবং জমি পালিশ-করা সারা হলে ছবির চর্বাটির কোণে কোণে এবং ধারে ধারে মোম লাগিয়ে দেওয়ালে (সরাসরি ভিজে জমিতে নয়, ধারের শুকনো দেওয়ালে আগে আঠা দিয়ে কাগজের টুকরা এঁটে) টাঙিয়ে নিতে হবে; অন্য লোকে ধরে রাখলেও ভালো হয়। এর পরে খুব মিহি কাঠ-কয়লার গুঁড়ো বা খুব মিহি হাল্কা গেরি রঙের গুঁড়ো মিহি ন্যাকড়ার ঢিলে পুঁটুলিতে বেঁধে চর্বার সছিদ্র রেখা ধরে আস্তে আস্তে থুপতে হবে। কসাটি থুপবার সময় চর্বা কিছুমাত্র সরে না যায়। পুঁটুলির রং ভিজে-ভিজে হয়ে এলে মাঝে মাঝে আগুনের আঁচে একটু সেঁকে নেওয়া যায় বা রোদে শুকোতে দিয়ে ততক্ষণ অন্য পুঁটুলি ব্যবহার করা চলে। মাঝে মাঝে চর্বার একটি কোণ ধরে তুলে দেখা দরকার, জমিতে নক্সার ছাপ পড়ছে কি না।

'রেখাচিত্র কাগজের চর্বা থেকে দেওয়ালে উঠে এলে পর, ছবিতে রং লাগাবার পালা। এই ক-টি রং ব্যবহার করা হয় — কালো রঙের হিসাবে ভুষো, সাদা হিসাবে ছাঁকা চুন, উজ্জ্বল গেরি, কাল্‌চিটে বা মেটুলি-রং গেরি, এলামাটির হলদে আর হরা-পাথরের সবুজ। প্রস্তুত রংগুলি আগে থেকেই বোয়েমের জলে ভিজানো থাকা ভালো। আঁকবার সময়ে রং মধুর মতো গাঢ় হওয়া চাই। বাটিতে রং নিয়ে ছোটো গঁদের টুকরো আঙুল দিয়ে মেড়ে মেড়ে রঙের সঙ্গে মেশাতে হবে। এখন নরম তুলি দিয়ে এই রং ছবিতে লাগাতে হবে। রংটি ঈষৎ গাঢ় হওয়ায় ছবি আঁকার কালে পাশাপাশি লাগানো হলেও একটি রং আর একটি রঙে মিশে যাবে না, আর নক্সাটিও কোনো অংশে গা-ঢাকা দেবে না। রং লাগাবার জন্যে জমি বেশি পালিশ করে নেওয়া না হয়, পূর্বেই বলা হয়েছে, বেশি পালিশের ওপর রং ভালো ধরবে না।

'কালো রঙের লেপ দেওয়া সব থেকে কঠিন। ছবির পটভূমিতে বা কোনো বড়ো অংশে নিছক ভুষোর ব্যবহার না করাই ভালো। সহজে ব্যবহারোপযোগী কালো রং তৈরি করতে হলে মিহি কাঠ-কয়লার গুঁড়ো অল্প পরিমাণে মিশিয়ে পিষে নিলে বড়ো জমিতে লাগাবার সুবিধা হয়। কালো রঙের পটি কর্নিক ধরে পালিশ করার সময় জমিটি এক রকম রাখা

শক্ত হয়; খুব সাবধান না-হলে কালো রং অন্য রঙের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে।

'রং লাগানো হলে ছোটো ছোটো রঙের পটি (block) আর রেখাগুলি ছোটো (দু-সুতো পুরু আর দেড় ইঞ্চি পেট-মোটা) কর্নিক করে হাল্কা হাতে পিটোতে হবে। চওড়া রঙের পটিগুলি ঐ কর্নিকেই পালিশ করা চলবে—এ সময়ে কর্নিকটি জমির ওপর সোজাভাবে না রেখে, বরং যেদিকে কর্নিক যাচ্ছে সে-দিকে ওর ধারটি একটু আল্‌তোভাবে ধরা দরকার। বাম থেকে ডাইনে যেতে ডান ধার একটু আল্‌গাভাবে আর ডাইনে থেকে বাঁয়ে আসতে বাঁ দিক্ একটু আলগাভাবে ধরতে হবে।

'কয়েকটি হুঁশিয়ারির কথা। প্রথমতঃ দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করে অবিচ্ছেদে শেষ করতে হবে; সেজন্যে একবারে যতটুকু করা সম্ভব বলে মনে হবে, ততটুকু কাজই একদিনে হাতে নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, অস্তরের শেষ স্তরটি যদি বেশি ভিজে বা বেশি শুকনো হয়, তার ওপরে রং ভালো ধরবে না; দেওয়াল কতটা ভিজে থাকা দরকার, সে আন্দাজ বহুদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে হয় এবং সেই জ্ঞানই জয়পুরী ভিত্তিচিত্রণ-পদ্ধতিতে কৃতকার্য হওয়ার বিশেষ উপায়। তৃতীয়তঃ, পালিশ করার আগে বা পেটার আগে রং বেশি ভিজে থাকলে পাশের রঙের পটিতে ছড়িয়ে পড়বে, আর বেশি শুকিয়ে গেলে পাপড়ি হয়ে ঝরে যাবে।

'বিপর্যয়ের ভয় থাকলেও জমিটি (যে জমিতে রং ধরানো হবে) বরং ভিজের দিকেই থাকা ভালো। কম ভিজে হলে রং ঠিক ধরবে না, বেশি ভিজে থাকলে পালিশের সময়ে কর্নিকের সঙ্গে জায়গায় জায়গায় খাব্‌লা হয়ে উঠে এসে গর্ত হয়ে যেতে পারে। এমন হলে কর্নিকে করে সেই জায়গাটি পরিষ্কারভাবে তুলে নিতে হবে এবং প্রাথমিক মশলাটি একটু শক্তভাবে তৈরি করে ঐখানে কর্নিক দিয়ে টিপে লাগিয়ে দিতে হবে: তারপর ঠিক পূর্বের ক্রম ধরে পর পর চুন, রং ইত্যাদি লাগিয়ে মেরামত করে নিতে হবে।

'ছবি পেটা ও পালিশ করা শেষ হলে একটু নরম ন্যাকড়া বা তুলো দিয়ে নারকেল-তেল সমস্ত ছবির ওপর লাগিয়ে দিতে হবে। জয়পুরের চিত্রকরদের রীতি কিন্তু অন্যরকম: নারকেল তেল দেওয়ার বদলে খড়োল (শুকনো) নারকেল বেশ করে চিবিয়ে, 'দুধ'টি বেশির ভাগ গলাধঃকরণ করে, ছিবড়েগুলি ফুঁ দিয়ে ছবিময় ছড়িয়ে দেওয়া হয়, আর নরম পরিষ্কার কাপড়

দিয়ে ছিবড়েগুলি ফেলে, মুছে ফেলে, ইচ্ছা হলে পেট-মোটা কর্নিক বা পালিশ পাথরে আর-একবার ঝেড়ে পালিশ করে নেওয়া যায়।

'জয়পুরী আরায়াসের কাজে এক-এক-রঙা পটি (flat colour blocks) আর রেখার কাজ করাই সুবিধা, মিশরীয় পারসীক বা কাংড়া রাজস্থানী ছবির মতো। অজন্তা বাগ বা বিলাতি ছবির অনুকরণে গড়ন (modelling) বা ছায়াসুষমা (shading) দেখানো কঠিন ; সে চেষ্টা না করাই ভালো।

'আমরা জয়পুরের শিল্পীর কাছে এই পদ্ধতি শিখেছি, জয়পুরেই এই পদ্ধতির বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি —তাই একে জয়পুরী বলা হলো। আসলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে, বিশেষ করে রাজস্থানে, বহুবিস্তৃত অঞ্চলে এই ভিত্তিচিত্রণ-পদ্ধতির চল আছে বা ছিল। এর পরম্পরা সম্পর্কে আমার যতটুকু জানা আছে তা হলো এই যে, আরায়াস বা আরায়েস শব্দটি পারসিক, অর্থ 'আয়নার মতো'— হয়তো মুসলমান আমলে প্রচলিত নাম-রূপে এর নতুন করে আমদানি হয়েছে। অতিপ্রাচীন নিদর্শন আছে অম্বর দুর্গে। দিল্লির লাল-কেল্লাতেও আছে। কিন্তু, ছবির জন্যে এরূপ 'জমি' তৈরি করা এ-দেশে নতুন নয়। ভরতনাট্যশাস্ত্রে নাকি এরূপ পদ্ধতির উল্লেখ ও আলোচনা আছে। ত্রিবাঙ্কুর সংস্কৃত-গ্রন্থমালার 'শিল্পরত্নম্'-গ্রন্থে ও অন্যত্র 'সুধালেপবিধানম্' পুঁথিতে এরূপ পদ্ধতির বিশেষ প্রসঙ্গ আছে (Contribution to a Bibliography of Indian Art and Aesthetics : Haridas Mitra)। সিংহলের সিগিরিয়ায় (অতি পুরাতন) আর কল্যাণী-মন্দিরেও এরূপ কাজ দেখেছি। অন্য দিকে, বাঙ্গালাদেশের লুপ্তপ্রায় 'পঙ্কের কাজ' দৃঢ়তা, মসৃণতা ও স্থায়িত্বের দিক দিয়ে আরায়েসের 'জমি'র সঙ্গে তুলনীয়।'

আচার্য নন্দলালের স্কেচ-বুকে (দ্বিতীয় পর্যায়, সংখ্যা ১, পৃ ৩) নরসিংলালের দু-খানা পোর্ট্রেট্ করা আছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ৪ সংখ্যক স্কেচ্-বইয়ের ৮-এর পৃষ্ঠায় নন্দলাল নরসিংলালের আর একটি পোর্ট্রেট্ এঁকেছেন পাগড়ি-ছাড়া চেহারার।

১৯৩২ সালে শ্রীভবনের Reception Room-এর দেওয়ালচিত্র আঁকা হয়েছিল। কাজ আরম্ভ হয়েছিল গরমের ছুটীর আগে। কলাভবনের ছাত্রীরাই আচার্য নন্দলালের নির্দেশক্রমে এই চিত্রকর্মে মুখ্য অংশগ্রহণ করেছিলেন। কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন চিত্রনিভা চৌধুরী, অনুকণা দাশগুপ্তা,

সাবিত্রী গোবিন্দ, গীতা রায়, মণীন্দ্র গুপ্ত, যমুনা বসু, রাণী দে ও নিবেদিতা ঘোষ অন্যতম।

গ্রন্থাগারের নিচের তলার সামনের দেওয়ালে ফ্রেস্কো-চিত্র শেষ হয়ে এসেছিল ১৯৩৩ সালের জুন মাসে। আবহাওয়া এই সময়ে ছিল ভালো। ফলে, ফ্রেস্কোচিত্রের অগ্রগতি হয়েছিল চমৎকার। চিত্রের বিষয় নেওয়া হয়েছিল শান্তিনিকেতন-পরিবেশ আর দৈনন্দিন জীবন থেকে।

এই সময়ে আচার্য নন্দলাল বিশ্বভারতীর বাড়ি ছেড়ে নিজ-বাড়িতে যাবার উদ্যোগ করছেন। শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন-সড়কের ওপর তাঁর নিজস্ব বাড়ি তৈরি হচ্ছে। ১৯৩৩ সালের গরমের ছুটীর আগেই বাড়ি-তৈরি শেষ হয়ে যাবার আশা।

১৯৩৬-৩৭ সালে 'নন্দন'-বাড়ির ম্যুজিয়মের পশ্চিমদিকের হলঘরের দেওয়ালে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা ফ্রেস্কো করেছিলেন বাগগুহার চিত্রকর্মের অনুকরণে। এই সময়ে গুরুদয়াল মল্লিকজী কলাভবনে শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই সময়ে কলাভবনে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫২ জন।

১৯৩৯ সালে বরোদা-সরকার আচার্য নন্দলালকে আমন্ত্রণ করেছেন বরোদা-রাজপ্রাসাদে—কীর্তি-মন্দিরের দেওয়ালে ফ্রেস্কো করবার জন্যে। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি বরোদা গেলেন কলাভবনের উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের নিয়ে, আর অধ্যাপক শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে। এঁরা তাঁকে কাজে সাহায্য করবেন। পূজার ছুটীর পরে আশ্রম খুললে আচার্য নন্দলাল সদলবলে আশ্রমে ফিরবেন নভেম্বরের দিকে।

১৯৪২ সালে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা চীনাভবনের দেওয়াল-চিত্র করলেন। ১৯৪৬ সালের পূজার ছুটীর আগে আচার্য নন্দলাল বরোদা গিয়েছিলেন কীর্তি-মন্দিরের ফ্রেস্কোর প্রসঙ্গে। কীর্তি-মন্দির স্থাপিত হয়েছিল পরলোকগত মহারাজা গেকোয়াড়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে। নন্দলাল দলবল নিয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন ১লা নভেম্বর।

১৯৪৭ সালে কলাভবনে মেয়েদের স্টুডিওর দেওয়ালে ফ্রেস্কোর কাজ আরম্ভ করেছিলেন অমলা বসু আর বাণী মুখার্জী। এঁরা উভয়েই ছিলেন কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্রী। কলাভবনের অধ্যাপিকা শ্রীমতী গৌরী ভঞ্জ

চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে এই কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।

কলাভবনের অধ্যাপক শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৯৪৭ সালে হিন্দী-ভবনের হলওয়াসিয়া-হলে ফ্রেস্কো-চিত্র করছেন। তাঁকে তাঁর কাজে সাহায্য করেছিলেন তাঁর কয়েকজন ছাত্র। অধ্যাপক বিনোদবিহারী হিন্দীভবনে ফ্রেস্কো-চিত্র করে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের দৈনন্দিন জীবনে শিল্পকলার তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক দেখালেন। ভবনের পূর্ব-দেওয়ালে ফ্রেস্কো করলেন কলাভবনের ছাত্র কৃপাল সিং—আচার্য নন্দলালের নির্দেশে। কৃপাল সিং-এর বিষয় ছিল রামায়ণ থেকে নেওয়া—ভরতের পাদুকা-গ্রহণ। অন্য তিনটি দেওয়ালে বিনোদবিহারী ছবি করলেন ভারতীয় মধ্যযুগের সন্তদের জীবন-চিত্র নিয়ে।

'শান্তিনিকেতনে ফ্রেস্কো আঁকার প্রথম প্রচেস্টা হলো দ্বারিকে। তারপরে হলো 'সন্তোষালয়ে' অর্থাৎ শিশু বিভাগের দেওয়ালে। শিশু বিভাগের দেওয়ালে যে-সব ছবি আঁকা হলো সে হচ্ছে এই ঃ—

উত্তর বারান্দা (পূর্ব থেকে পশ্চিম)—(১) নটী নাচছে ওড়না উড়িয়ে (২) শিকারী তীর-ধনুক দিয়ে লক্ষ্যভেদ করছে (৩) পদ্মফুল হাতে একটি মেয়ে (৪) একটি মেয়ে ফুলগাছে জল দিচ্ছে (৫) একটি মেয়ে সামনের উনোন থেকে চিমটে দিয়ে অঙ্গার তুলছে তামাক সাজবার জন্যে। পাশে কল্‌কে নামানো। (৬) মোগল বাদশাহ (?) (৭) দরজায় মশাল হাতে দাঁড়িয়ে একটি বধূ কি দেখছে সভয়ে (৮) একটি মেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কার অপেক্ষায় (৯) আনমনা মহিলা (১০) একটি বুড়োর হাতে লাঠি। তার ওপর বসে রয়েছে একটি পাখী। পাশ থেকে একটি মেয়ে হাত তুলে চাইছে। (১১) মা ছেলেকে কোলে বসিয়ে মাই দিচ্ছে। (১২) একটি মেয়ে গাছের গোড়ায় জল দিচ্ছে। (১৩) চার বধূ একজন হাত বাড়িয়ে কি যেন নিচ্ছে (১৪) একটি বধূ রান্না করছে।

ঘরের ভিতরের পূর্ব দেওয়াল (উত্তর থেকে দক্ষিণ)—(১) বক (২) কপোত (৩) পাখী (৪) নক্সার প্যানেল (৫) তিতির পাখী (৬) পাখী (৭) মাছরাঙ্গা পাখী।

ঘরের ভিতরের উত্তর দেওয়াল (পূর্ব থেকে পশ্চিম)—(১) মহিষ ছুটছে, নাকে তার দড়ি বাঁধা, রাখাল ছুটছে তার সঙ্গে দড়ি ধরে। (২) চিতা বাঘের

হরিণ-শিকার। (৩) বনশূকরের দল, দাঁত রয়েছে লম্বা বাঁকা। (৪) জোড়া গাধা। (৫) বানর জাতীয় জন্তু গাছে উঠছে। (৬) সারস। (৭) দু-টি হরিণ ছুটছে দ্রুতবেগে। (৮) তিনটি পাখী পাখা ঝাপটাচ্ছে। (৯) পদ্মফুলের গোছা, দু-টি ছেলে (১০) মেঘের কোলে একটি মহিলা-আকৃতি। বিকট চেহারা তার। (১১) পদ্মফুলের গোছা, দু-টি ছেলে। (১২) উড়ন্ত চারটি পাখী। (১৩) ষাঁড় (১৪) হনুমান-দম্পতি কোলে বাচ্চা (১৫) গাভী, বাছুর দুধ খাচ্ছে। (১৬) খেঁকশিয়াল (১৭) হাতী (১৮) মাদী মহিষ (১৯) সিংহ।

ঐ ঐ পশ্চিম দেওয়াল (উত্তর থেকে দক্ষিণ)—(১) পাখী (২) চিল (৩) মোরগ (৪) নক্সা (৫) পাখী (৬) পাতিহাঁস (৭) শকুন।

ঐ, ঐ দক্ষিণ দেওয়াল (পূর্ব থেকে পশ্চিম)—(১) খেঁাড়া, (২) অদ্ভুত কুকুর, (৩) ভেড়া, (৪) সিংহ, (৫) উদ্-বিড়ালের মাছ-খাওয়া, (৬) ভালুকের কোলে মানুষ, (৭) দু টি বিড়াল ঝগড়া করছে, (৮) জন্তু, (৯) হাঁসের দল, (১০) বানর জাতীয় জন্তু, (১১) জন্তু, (১২) রোগাপট্‌কা বাঘ, (১৩) বিড়াল, (১৪) পাখী আর খরগোস, (১৫) ছোট হাতী, (১৬) খরগোস, (১৭) জন্তু।

দক্ষিণ দিকের বারান্দার ছবিগুলি এখন (১৯৬৭) অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

'প্রকৃত ফ্রেস্‌কো করলুম মীরা দেবীর বাড়িতে। ওঁর 'মালঞ্চ' বাড়িতে ঢোকবার মুখে দরজার ওপরে ফ্রেস্‌কো করা হয়েছে—হাঁসের পাল যাচ্ছে। ইজিপ্‌সিয়ান ছবি দেখে দেখে সব করলে আমাদের ছাত্র হরিহরণ। তাঁর সহযোগিতা করেছিলেন আমাদের শ্রীরামকিঙ্কর বেজ।

'তারপর দিনুবাবুর 'সুরপুরী'-বাড়ির বৈঠকখানা-ঘরের ওপর-তলায় ছবি করলুম আমি। করা হলো—সাঁওতাল নাচ, 'শ্যামা'-নৃত্যনাট্যের প্যানেল আর কিছু অলঙ্করণ।

'পান্থ-নিবাসের দেওয়ালে ফ্রেস্‌কো করা হয়েছে অনেক। তখন সু-তান নামে একজন ছাত্র এসেছিল কলাভবনে। সুমাত্রার লোক সে করলে সে-ই। কলাভবনের শিক্ষক আমাদের বিনোদবিহারী সু-তানকে সাহায্য করেছিলেন অনেক। এখানে ছবি হলো চারদিকে—হাঁসের ড্রয়িং—রং-এ করা। ড্রয়িং করা লাল রঙে কালোও আছে। পান্থ-নিবাসের বাথরুমের দেওয়ালেও কিছু ছবি করা হলো। তার ড্রয়িং আছে কলাভবনে।

'গেস্ট হাউসের [এখন (১৯৫৫) বিদ্যাভবন] অর্থাৎ 'শান্তিনিকেতন'-বাড়ির' নিচেতলায় প্রথম ফ্রেস্কোর কাজ করলেন বিনোদ। আমাদের কাছেই বিনোদের শিক্ষা হয়েছিল। সেই শেখা বিদ্যে নিয়ে আর সীন্নিনো-সীন্নিনি-র বই দেখে বিনোদ ওখানে ফ্রেস্কোর এক্সপেরিমেন্ট্ চালালেন।

'লাইব্রেরীর পশ্চিমদিকের কুঠরি,—নাম হলো 'গুরুকুল'। তার দেওয়ালে ছবি আঁকলুম আমি। প্রথম আঁকলুম পদ্মফুলের স্ক্রোল্—অজন্তার মতন করে। —নিচের প্যানেলে পদ্ম আঁকলুম আর আঁকা হলো, দু'টি লোক একস্থানে এসে meet করছে। নানা ঋতুর ফুল-ফল করা হলো।—এই ফ্রেস্কোর ভালো ফটো তুলে রেখেছি কলাভবনে। এ হলো mural বা wall-painting – ফ্রেস্কো নয়। করেছিলুম গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে।

'পাশের রান্নাঘর থেকে ফ্যান আনাতুম। কয়লা, খড়ি আর গেড়ি—এই কটাই রং ; এর সঙ্গে এলা মিশিয়ে রং তৈরি করতুম। সন তারিখ লেখা আছে ওতে। তখন আমাকে এই কাজে সাহায্য করেছিলেন বিনোদ, গৌরী —এঁরা সব। আমি ছবি আঁকতুম ভাড়া-বাঁধা তক্তার ওপর বসে বসে। ড্রয়িং করতুম কয়লা দিয়ে। তাতে রং ভরতি করার নির্দেশ দিতুম লিখে লিখে। রং ভরতি করতেন বিনোদ। রং ভরতি করার পরে, আবার আমি লাইন দিতুম, shade দিতুম। কাজ শেষ করেছিলুম ১৩।১৪ দিনে।

'দেওয়ালের একধারে করা হয়েছে নানা রকমের মাছ, পানকৌড়ি, ডাহুক—এই ধরনের যত রকম জলচর জীব আছে তাদের ছবি। কৈ-মাছের ঝাঁকও আছে।

'এই ছবি আঁকার সময়ে রং ফলানোতে খানিক দোষ হয়ে গিয়েছিল। আঠা দেওয়া হয়নি ভালো করে। ফলে দেখি কি, হাত দিলে রং উঠে যায়। আঠাটাও ভালো ছিল না। তার বদলে ভালো ফ্যান দেওয়ায় ভার্নিশের কাজ হয়ে গেল।—রং বসে গেল। বরাবর জলুস রইলো সে রং-এর। অবশ্য প্যাস্টেলের মতন রং-এর বাহার না-থাকলেও তার জলুস আছে এখনও (১৯৫৫)। আর আমার মনে হয়, এই জেল্লা থাকবেও বরাবর।—সাধারণ mural painting-এর রং-এর চেয়েও এই রঙের জেল্লা থাকবে।

'Egg-Tempera করতেন হ্যারিংহাম। হাতে-নাতে কাজ করতে করতে অর্থাৎ রিসার্চ করতে করতে তিনি বই লিখলেন তার ওপর। লিখে গেছেন

বিস্তৃতভাবে। এর করণ কৌশলের বিবরণ তাঁর বই-এ সব লেখা আছে। সেই থেকে বালির দেওয়ালের ওপর এগ্-টেম্পেরাতে আমি অনেক ছবি করেছি। চীনাভবনের হলে এগ্-টেম্পেরায় ছবি করা হয়েছে। শিশু-বিভাগের ডর্মিটরিতে ছবি এগ্-টেম্পেরায় করা হয়নি; ওখানে ব্যবহার করা হয়েছে সিরিশ (glue)। শিশু-বিভাগে আছে নানা জন্তু-জানোয়ারদের ছবির কপি—অজন্তার ধরনে।

'কলাভবনের প্রথম 'নন্দন'-বাড়িতে ম্যুজিয়মে ফ্রেস্কো করা হয়েছে। কলাভবনের হস্টেল-ডর্মিটরিতেও ফ্রেস্কো করা আছে।

'হিন্দীভবনে ফ্রেস্কো করলেন বিনোদ—ইটালীয়ান পদ্ধতিতে সীন্নিনো-সীন্নিনির বই দেখে। তিনি আঁকলেন মধ্যযুগের সাধুসন্তদের জীবনের নানা চিত্র থেকে। কৃপাল সিং করলেন ভরতের পাদুকা-গ্রহণ। করলেন আমার নির্দেশ মতে।

'চা-চক্রের 'দিনান্তিকা' ঘরে ওপরে ও নিচে সাজানো হয়েছে ফ্রেস্কো করে। চা-চক্রের ওপরতলায় চারধারের ফ্রেস্কো অজন্তার আর সেন্ট্রাল এশিয়ার ছবি থেকে নকল করা হয়েছে। তারিখ দেওয়া আছে ওতেই। আর নিচের তলায় ছবি করলুম বনকাটির রথের গায়ে আঁকা ছবির অনুকরণে। সে বদ্দমেনে স্টাইলে বলতে পারো! কারণ, বর্ধমান জেলার বনপাশ থেকে মিস্ত্রীরা এসে ঐ পেতলের রথের সব ছবি খোদাই করেছিল।

'চীনাভবনে 'নটীর পূজা'র প্যানেল করা আছে উপরের তলায়। নিচের তলায় কাজগুলো কিন্তু টেম্পেরা নয়, আর ফ্রেস্কোও নয়। খুব অল্প রং আর অল্প ডিম মিশিয়ে সাদা, গেরি আর এলা—এই তিনটি রং-এ সব ছবি করা হয়েছে। নিচের মাঝের হলে অজন্তার অনুকরণে ছবি করেছি। বুদ্ধটি আমার আঁকা। বুদ্ধের পাশের ছবি সব এঁকেছেন সে-সময়কার কলাভবনের প্রধান ছাত্রছাত্রীরা। বাইরে যে-ছবি উল্টোদিকে রয়েছে, সে-সব ছবির বিষয় নেওয়া হয়েছে পঞ্চতন্ত্র থেকে। এঁকেছেন কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা।

'তখন কলাভবনে একজন বিদেশী ছাত্র ছিল থাইল্যাণ্ডের। নাম তার ফু-আ। তিনি আঁকলেন—ভালুক আর বন্ধুর ছবি। লোকটা পড়ে আছে, আর ভালুকটা তার কানে কানে কথা বলছে। এই ফু-আ আছেন

এখন (১৯৫৫) ইটালীতে। সপ্তপর্ণী-বাড়ির বাইরের দেওয়ালে এক-মাথা চার-হরিণের মূর্তিটিও তাঁর করা।

'ভিত্তিচিত্রে মেয়েদের কাজের সঙ্গে ক্র্যাপ্‌ট্‌স ডিপার্টমেণ্ট ঢোকার পরে, পলস্তারার ওপর লাল রং দিয়ে, তার সঙ্গে সিরিশ-এর অস্তর মিশিয়ে দেওয়াল চিত্র তৈরি করা হলো। এ-ও mural p iinting ; এ-কাজে সাহায্য করেছিলেন যমুনা। কিঙ্করবাবু করতে লাগলেন রিলিফ ওয়ার্ক। সপ্তপর্ণীর বেলায় চলেছিল টীম্‌ ওয়ার্ক।

'শ্রীনিকেতনে ছবি করা হলো কলাভবনের 'নন্দন'-বাড়িতে ছবি করার আগে —১৯২৮ সালে। হলকর্ষণের ছবি করলুম আমি। আমাকে সাহায্য করেছিলেন বিনোদ, মাসোজী, পেরুমাল, বিশ্বরূপ —এঁরা সব।

'বরোদায় কীর্তি-মন্দিরে ফ্রেস্‌কো করলুম ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। আমি আর বিনোদ ফৈজপুর-কংগ্রেস থেকে জায়গা দেখতে গেলুম বরোদায় ১৯৩৮ সালে। ১৯৩৯ সালে আমাদের কাজ আরম্ভ হলো। ১৯৩৯ সালে প্রথম প্যানেল তৈরি করলুম —গঙ্গাবতরণের। ১৯৪০-এ দ্বিতীয় প্যানেল করা হলো মীরাবাঈ-এর জীবনচিত্র। ১৯৪৭-এ হলো তৃতীয় প্যানেল —নটীর পূজা। আর ১৯৪৬ সালে শেষ প্যানেল করলুম —উত্তরা-অভিমন্যু। তখন মাসোজী আমাদের কাজে মাঝে মাঝে আহমেদাবাদ থেকে এসে সাহায্য করতেন। সৈয়দ তখন ছিলেন বরোদায়। আমরা যখন কীর্তি-মন্দিরে কাজ করি তখন তার ওপর সৈয়দ কবিতা লিখেছিলেন।

'জগন্নাথের পট, পুরাতন পুঁথির কাঠের পাটার ওপর ছবি, তিব্বতী পদ্ধতিতে আঁকা টঙ্কা, ওয়াসলীর ওপর মিনিয়েচার ছবি চা-ও কৃত পদ্ধতি, চিকন শিল্পের কাজ, রেশমী কাপড়ের ওপর ছবি —চীনে জাপানী পদ্ধতিতে, সিংহলী ভিত্তিচিত্র, জয়পুরী আরায়েস, আমাদের পঙ্কের কাজ, আর অংশতঃ ইটালীয়ান ফ্রেস্‌কো-পদ্ধতি মিলিয়ে মিশিয়ে আমরা শান্তিনিকেতনে আমাদের ফ্রেস্‌কো পদ্ধতি গড়ে তুলেছি। আমার 'শিল্পচর্চা'-গ্রন্থে এই সব পদ্ধতির কথা বিশদভাবে বলা আছে।

॥ ফ্রেস্কো আঁকার পদ্ধতি —নন্দলালের অভিজ্ঞতা ॥

'দেওয়াল চিত্র, বিশেষ করে ফ্রেস্কো আঁকার জন্যে যে যে সরঞ্জাম দরকার —সে হলো, মোটা সরু তিন-চার রকমের কর্নিক, গজ-পাটা, দু-তিন রকমের উসো, কোণা-মাটাম, বোতল, তুলি রাখার তুলি-দান, নরম লোমের (Camel hair) তুলি —সরু-মোটা কয়েক রকম, মাটির বা চীনেমাটির ছোট তলা-থাবড়া কয়েকটি বাটি, কুশের বা খড়ের কুঁচি, অয়েল পেন্টিং -এর জন্যে হাত-রাখার stick, মিহি-জালের ছাঁকনি, জলের গামলা, ভিজে তোয়ালে একখানা, আর ছেঁড়া কিছু মিহি ন্যাক্ড়া কাপড়।

'বালি আর চুনের পলস্তারা (plaster) ভিজে থাকতে থাকতে তার ওপর যে ছবি আঁকা হয় তার নাম ফ্রেসকো বা ইটালীয় ফ্রেস্কো। আমাদের মধ্যে শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ফ্রান্স থেকে প্রথম শিখে এলেন এই পদ্ধতি —সে-কথা আগেই বলেছি। পরে, আমরাও অনেকবার হাতে-কলমে করে দেখেছি। ফ্রেস্কো কথাটার অভিধানিক মানে হচ্ছে, method of painting in water-colour on fresh plaster অথবা in water-colour laid on wall or ceiling before plaster is dry. —আমাদের ছাত্র জয়ন্ত পারেখ এ কথাটার ব্যাখ্যা তাঁর প্রবন্ধে করেছেন।

'ফ্রেস্কো পদ্ধতিতে ছবি করতে গেলে প্রথমেই নিখুঁত রেখাচিত্র করে নেওয়া দরকার। আর একখানি কাগজে এই রেখাচিত্রের ছাপ বা tracing তুলে নিয়ে সম্পূর্ণ রঙ্গিন ছবি করতে হবে। তার পরে, মূল রেখাচিত্রের রেখা ধরে ধরে ছিদ্র করে 'চর্বা' তৈরি করে রাখতে হবে। ('চর্বা' হলো ঝিল্লি বা membrance বা পাতলা চামড়ার ওপর সছিদ্র রেখাঙ্কন। আমরা মজবুত মোড়ক তৈরি করবার কাগজ ব্যবহার করি।—সে কথা পরে বলবো।) চর্বার ওপরে গুঁড়ো রঙের পুটুলি থুপে থুপে দেওয়ালে ছাপ তুলে নেওয়া যাবে। আর রঙ্গিন আদর্শটি চোখের বা মনের সামনে থাকলে ঐ অনু-অঙ্কিত বা transferred রেখাগুলিকে আশ্রয় করে মনের মতন ছবি খুব শীঘ্র আঁকা যাবে। অবশ্য প্রবীণ বড়ো শিল্পীর রূপকল্পনা করবার ক্ষমতা আর করণ-কৌশলের দক্ষতা থাকে প্রভূত। সেইজন্যে তাঁর পক্ষে রেখাচিত্র বা রঙ্গিন ছবি, কিংবা 'চর্বা' বা 'খাকা'

বিশেষ দরকারি নয়। ('খাকা' হলো নকশার নকল। কাংড়া, রাজপুত, মোগলশিল্পী বা কালীঘাটের পোটোরা কালো, খয়েরি বা ছাই রঙে যে-কোনো নকশার নকল রাখতেন। সেই নকল পুরুষপরম্পরায় শিল্পী কারিগররা আদর্শ হিসাবে ব্যবহার করতেন। এই আদর্শ নকলের নাম হলো 'খাকা')। তবে বড়ো শিল্পীও আঁকবার ছবির রূপ 'অভ্যাস' করে রাখেন। কিংবা, তার short-hand note নিয়ে রাখেন। এর ফলে, দেওয়ালে আঁকা হবার আগেই সে-ছবির ধ্যান বা ধারণা তাঁর মনে দৃঢ় ও সংশয়মুক্ত হয়ে থাকে। —এই ধরনের কাজ খুব দ্রুত শেষ করতে হয়. আর এতে সংশোধন করবার ফাঁক পাওয়া যায় না। এইজন্যে অল্প-অভিজ্ঞ শিল্পীর পক্ষে রেখাচিত্র আর রঙিন আদর্শ বা কার্টুন তৈরি করে কাজে হাত দেওয়াই নিরাপদ ও প্রশস্ত।

'পলস্তারা তৈরি করবার জন্যে বিশেষপ্রকার চুন আর বালির দরকার। ফ্রেস্কোর কাজে নদীর বালি সব চেয়ে উপযোগী। এই বালি কড়্ কড়্ শব্দ করবে হাতে রেখে ঘষলে। সমুদ্রের গোল দানা বালি ফ্রেস্কো-কাজের উপযুক্ত নয়। সে বেশি মিহি। তা-ছাড়া, এই বালির সঙ্গে নুন থাকে বলে ছবির রঙের পক্ষে ক্ষতিকর। এখন, এই কাজের জন্যে নদীর বালি, বিশেষ করে 'মগরার বালি' সরু-ফাঁদির চালুনিতে করে চেলে নিতে হবে। কাঁকর-মাটি বা অন্য কিছু যেন এতে না-মিশে থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

'ফ্রেস্কোর কাজে ঝিনুকের চুন, ঘটিং-চুন, পাথুরে চুন —এর যে-কোনো একটি ব্যবহার করা যায়। ঝিনুকের চুন সব চেয়ে ভালো। ঘটিং-চুন তৈরি হয় ঘটিং পুড়িয়ে। এই চুন জারিয়ে বা slake করে নেওয়ার জন্যে হাঁড়িতে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে। মাঝে মাঝে চুন ঘেঁটে নিতে হবে, আর থিতিয়ে গেলে জলটা বদলে দিতে হবে। চার-পাঁচ দিন বাদে মোটা-ফাঁদির খদ্দরে ছেঁকে নিয়ে মাটির গামলায় রাখতে হবে। সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে চূর্ণ করে ছেঁকে নিতে হবে, আর মাটির জালা বা কাঠের পিপেয় ভরে রাখতে হবে। বাজারে ভালো চুন পাওয়া যায়। আমরা সেই চুনই ব্যবহার করেছি। পাথুরে চুনও ঘটিং-চুনের মতোই জারিয়ে, শুকিয়ে, গুঁড়িয়ে মাটি বা কাঠের পাত্রে ভরে রাখতে হবে।

এখন ঐ গুঁড়ো চুন এক ভাগ, আর পরিষ্কার-করা বালি দু-ভাগ, এই হলো mortar বা 'মশলা'-র উপকরণ। কিছু শ্বেতপাথরের গুঁড়ো এই

সঙ্গে দিতে পারলে ভালো হয়। কলকাতার বাজারে মেলে। এটা মেশাতে হবে বালির ভাগ কমিয়ে, চুনের ভাগ কম করে নয়।

'মশলা মাখবার সময় কুশের কুঁচিতে করে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। বেশি মশলা হলে মিহি ঝাঁঝরিতে জল দিতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে বড়ো কর্নিক বা কোদাল দিয়ে ঠাসতে হবে। সাধারণ রাজমিস্ত্রী দিয়েই এ কাজ করানো ভালো। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, কাজ সংক্ষেপ করবার জন্যে একসঙ্গে বেশি জল ঢালা না হয়, তাহলে কাজ নষ্ট হবে। জল ছিটিয়ে মাখতে মাখতে যথাসময়ে মশলাটা হালুয়ার মতন আঁট-আঁট হয়ে যাবে; মাখনের মতন তলতলে হলে হবে না। আঁট-আঁট হলেই আর জল দেবার দরকার নাই। তৈরি মশলা গরমের সময়ে সাত-আট দিন আর বর্ষা-বাদলের কালে বারো-চোদ্দ দিনের বেশি রাখা চলবে না। রোদ-হাওয়া লাগানো চলবে না। মশলার জন্যে উত্তম ভাগাড বা কুণ্ড তৈরি করে তার ওপরে ছাউনি দিয়ে রাখলে মশলা ভালো থাকবে। সেই ভাগাড় থেকে মশলা নিয়ে কাজ করা যাবে। একটা ফ্রেস্কোর জমি করতে যতটা দরকার ততটা মশলা একেবারে তৈরি করে নেওয়া দরকার।

'তৈরি মশলা দেওয়ালে লাগাবার সময়ে আর জল দেওয়া চলবে না। রাজমিস্ত্রী দিয়েই দেওয়ালে মশলা ধরানো যায়। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, জলের ছিটে দিয়ে মিস্ত্রীরা কাজ না-সারে। মশলা লাগাবার আগে দেওয়ালটা যতটা পারা যায় ভিজিয়ে নিতে হবে। দেওয়ালে যখন আর জল খাবে না তখনই মশলা ধরানো শুরু করতে হবে। পুরাতন দেওয়াল হলে দেওয়াল ভেজা-বার পলস্তারা খসিয়ে, খড়া বা খাঁজ বের করে, নারকেল-কাঠির মুড়ো-ঝাঁটা দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করতে হবে। অর্থাৎ ফ্রেস্কোর জন্যে বিশেষভাবে আগে প্রস্তুত মশলাটা ধরাতে হবে সরাসরি ইঁটের ওপর। প্রথমে কিছু মশলা ধরিয়ে, জল-ছড়া দিয়ে, ইঁটের সঙ্গে উসো দিয়ে বেশ করে ঘষে, তারপরে যদি পলস্তারা ধরানো যায় তবে খুবই ভালো হয়। প্রতিবারই পাত্র থেকে মশলা নেবার সময়ে কর্নিক দিয়ে ঠেসে নিতে হবে। নাড়া না পেলে জল সব তলায় জমে তলার মশলাকে বেশি ভিজে করে দেবে। মশলা-লাগানো কাজটি দেওয়ালের তলায় শুরু করে, ওপরে শেষ করতে হবে। ওপর থেকে শুরু করলে নিচে পর্যন্ত হতে-না-হতে ওপরের চুন-বালি শুকিয়ে যায়, এইভাবে

একই জমিতে কোথাও ভিজে, কোথাও শুকনো হওয়াতে কাজ নষ্ট হয়। নিচে থেকে মশলা ধরালে এই অসুবিধে হয় না। ওপরে সদ্য-লাগানো মশলার জল চুইয়ে শেষপর্যন্ত নিচের মশলাকেও ভিজে ভিজে রাখে।

'নিচে-ওপরে পলস্তারা ধরানো হয়ে গেলে সমস্ত জমিটাকে একবার কাঠের গজ-পাটা দিয়ে সমান করে নিতে হবে। কাজটা রাজমিস্ত্রী দিয়ে করিয়ে নিতে হবে বা শিখে নিতে হবে। সমস্ত জমি সমান হয়ে গেলে, যখন কোথাও উঁচু নিচু থাকবে না, তখন ছোট একটা গজ-পাটার এক প্রান্ত (end) ধরে, বাকি লম্বা অংশটা দিয়ে হাল্কা-হাতে সমস্ত জমিটা বেশ কিছুক্ষণ পিটে যেতে হবে। খুব ভালো করে পেটা চাই ; দেখতে হবে পেটার সময়ে যেন জমির কোনো অংশ বাদ না পড়ে। এই সময়ে জমি বেশ ভিজে-ভিজে হয়ে উঠবে। বেশি ভিজে-ভাবটা একটু কমে এলে, উসো দিয়ে বা পাটা দিয়ে. হাল্কা-হাতে ঠুকে ঠুকে জমিটা সমান করে নিতে হবে, যাতে ওপরে ঝুরঝুরে বালি না-থাকে, আর বেশ চৌরস হয়ে যায়। উসো ঘুরিয়ে চৌরস করা ভালো নয় ; তাতে জমির ওপরে চুন ভেসে উঠবে, বালি-বালি ভাব নষ্ট হবে —সেরূপ বাঞ্ছনীয় নয়। এই সমস্ত কাজের মধ্যে একবারও জল লাগানো চলবে না।

'দেওয়ালে রেখাচিত্র ছকে নেবার জন্যে মূল রেখাচিত্রের প্রত্যেকটি রেখা ধরে ধরে অজস্র ছিদ্র করে নিতে হবে। ফুটো করবার সময়ে কাগজের তলায় ভাঁজ করা পুরু কাপড় বা তুলো-ভরা গদি কিছু একটা রাখলে কাজ ভালো হবে আর তাড়াতাড়ি হবে। ছুঁচ বা পিন সর্বদা খাড়াভাবে ধরে ফুটো করতে হবে ; কাত করে ধরলে রং থুপবার সময়ে ফুটো বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কালচিটে রঙের গুঁড়া দিয়ে থোপা চলবে না। হরা-পাথরের সবুজ বা গেরি ও এলা-মেশানো হাল্কা রঙের গুঁড়ো ব্যবহার করাই ভালো। রঙটি খুব পাতলা ন্যাকড়ার পুঁটুলিতে অল্প ঢিলে করে বাঁধতে হবে, আর প্রস্তুত জমিতে ছিদ্র করা রেখাচিত্র (চর্বা) রেখে তার ওপর থুপে যেতে হবে। এই চর্বা দেওয়াল থেকে সরিয়ে নেবার আগে এক পাশ থেকে উঠিয়ে দেখে নেওয়া উচিত দাগ ঠিকমতো পড়ল কিনা। জমি ঠিক-ঠিক কাজের উপযুক্ত কখন, আর কখন বা নয়, বলে বোঝানো মুশকিল। ব্লটিং বা শুষ-কাগজে রং দিলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে শুষে নেয়, কাজের সময়ে ফেস্কোর জমির অবস্থা

হবে ঠিক তেমনি —রং লাগালেই শুষে নেবে। পরে, একসময় হবে যখন সহজে আর রং নিতে চাইবে না, রং শুষে নিতে একটু দেরি লাগবে। তখন বুঝতে হবে, আর বেশিক্ষণ কাজ চলবে না, তাড়াতাড়ি সারতে হবে। জমি শুকিয়ে আসবার মুখে রং লাগালে রং ওপরেই থেকে যাবে ; স্থায়ী হবে না। জমি তেমনি ভিজে থাকতে রং লাগালে তুলির সঙ্গে বালি উঠে আসবে।

'ফ্রেস্কোতে জৈব উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক রং ব্যবহার করা রীতি নয় ; এলা-মাটি, গেরি-মাটি, হরা-পাথর ও অন্যান্য চিত্রোপযোগী মাটি-পাথর থেকে রং তৈরি করে অথবা সেই সব রং সংগ্রহ করে ব্যবহার করাই ভালো। প্রত্যেক গুঁড়া-রঙের সঙ্গে সমপরিমাণ গুঁড়া-চুন (যা তৈরি করে রাখা গেছে) মিশিয়ে ভালোভাবে মেড়ে বা পিষে নিতে হয়। মেড়ে নেওয়ার পর রং কাপড়ে ছেঁকে নিলে আরও ভালো। সাদা রঙের কাজ নিছক চুন দিয়েই হবে। কার্টুনে অর্থাৎ রঙিন আদর্শে যেমনটি যে রং ব্যবহার করা হয়েছে, সেই অনুযায়ী চুন-মেশানো রং একে একে তৈরি করে, শিশিতে নম্বর লিখে লিখে, ভরে রাখতে হবে। যে-সব বাটিগুলিতে রং গুলে কাজ করা হবে, সেগুলিতে পাল্টা নম্বর লিখে রাখতে হবে। যে-নম্বরের শিশি থেকে রং নেওয়া হবে, সেই নম্বরের বাটিতে গুলে রাখলেই কাজ করার সুবিধা। নইলে, রং জলের মতো পাতলা করে গুলতে হয়, লাগাতেও হয় খুব পাতলা, অথচ, জলে দিলেই এক রঙের সঙ্গে আর এক রঙের তফাত থাকবে না, কাজেই চিনে নেওয়া অসম্ভব হবে।

'দেওয়ালের স্থায়িত্ব বিধান করতে পারলে ছবি বহুকাল স্থায়ী হয়। যে দেওয়ালে ছবি হবে তার নিচে-ওপরে সিমেন্টের দু-টি রক্ষাকবচ, তার পিছনে পৃষ্ঠপোষক আর-একটি দেওয়াল —এ-সব ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আচার্য নন্দলাল স্কেচ্ এঁকে (শিল্পচর্চা, পৃ ৪৪) দেখিয়েছেন, চিত্র অাঁকার উপযোগী দেওয়াল যেমন হবে : দু-টি দেওয়ালের মধ্যে ছয় ইঞ্চি ফাঁক থাকবে। ড্যাম্প্-প্রুফ সিমেন্টের স্তর থাকবে দু-টি দেওয়ালেরই ওপরে ও নিচে। দুই দেওয়ালের দু-টি জোড়, বাইরের দেওয়াল দেড় ইঞ্চি চওড়া হবে, জোড়মুখ থাকবে। ছাদে তিনটি ফোকর থাকবে। পাতলা ফেরো

কংক্রিট দেওয়াল চার ইঞ্চি পুরু হবে। ফোকরগুলির ভিতর-বার দু-দিকই পিতলের ঘন-জালে বন্ধ থাকবে। তাতে পোকামাকড় তার ভেতর ঢুকতে পারবে না।

'হাত খুব পাকা হলে ফ্রেস্কো-জমিতে সরাসরি ছাপ-ছোপ (touch) ও রেখার কাজ খুব ভালো করা যায়। চীনা কালি-তুলিতে যে জাতের কাজ হয় সেই রকম। খাকা বা রঙিন কারটুন কিছুই লাগে না।

'পূর্বে বলা হয়েছে, রং খুব পাতলা করে লাগাতে হবে। একই রং যে জায়গায় দু-বার পড়বে, সেখানে ঘন দেখাবে। এইভাবে বারবার প্রয়োগ করেই রং ঘন করা, বা তার ছায়াসুষমা (shade) বার করা সম্ভব। একই সময়ে রঙের ওপর রং চাপাবে না; একবার রং দিয়ে সে-টি একটু শুকোবার সময় দিতে হবে এবং ততক্ষণ ছবির অন্যত্র কাজ করতে হবে। রং একবার গাঢ় হয়ে পড়লে আর তাকে ফিকে করা যাবে না, সুতরাং হুঁশিয়ার হয়ে, হাতে রেখে কাজ করতে হবে। একেবারে নিখুঁতভাবে আঁকা বা ফিনিশ-করা রঙিন আদর্শের প্রয়োজন আর উপযোগিতাও এইখানেই।

'ছবি আঁকা শেষ হলে সমস্ত জমিটার ওপর দিয়ে একটা বোতল বার কয়েক গড়িয়ে নিলে জমি খুব মসৃণ মোলায়েম হবে। মোলায়েম না-করেই অনেক সময় ভালো দেখায়; যদি সেইরকম রাখার ইচ্ছা হয়, আলাদা কথা। বোতলটি মসৃণ হবে, তার গায়ে উঁচু-করা অক্ষর বা নক্সা থাকবে না। জমি একটু ভিজে থাকতে থাকতেই বোতল গড়িয়ে নিতে হবে, তার ওপর হাতের চাপ সমান থাকবে।

'ফ্রেস্কো সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। তবে কাজের সময়ে সচরাচর যে-সব অসুবিধা ঘটে, সেগুলির উল্লেখ দরকার। প্রথমেই আন্দাজ থাকা দরকার, একদিনে আঁকিয়ের পক্ষে ঠিক কতটা কাজ করা সম্ভব। আমাদের বিবেচনায় একদিনে দুই বর্গফুটের বেশি হাতে নেওয়া ঠিক নয়। এই দুই বর্গফুট দেওয়ালে প্লাস্টার ধরানো থেকে আরম্ভ করে, ছবি এঁকে শেষ করা পর্যন্ত, একজনের তিন চার ঘণ্টা সময় লাগবে। কাজ শুরু করলে তার মধ্যে বিশ্রাম পাওয়া যাবে না। ফ্রেস্কো-আঁকিয়ের এ-ও খেয়াল রাখা দরকার যে, প্লাস্টার গ্রীষ্মে যত তাড়াতাড়ি শুকোবে, বাদলায় তেমন নয়। জানা দরকার, পাতলা প্লাস্টার যত তাড়াতড়ি শুকোবে; পুরু প্লাস্টার তেমন

নয়। চর্বা থেকে ছবির ছকটি দেওয়ালে তোলবার সময়, আর আঁকবার সময়েও একজন আঁকিয়ে সঙ্গীর বিশেষ প্রয়োজন। এ-রকম একজন বিজ্ঞ লোকের সাহায্য পাওয়া গেলে নানাভাবে কাজের সুবিধে হয়।

'বড়ো কাজ হলে একদিনে হবার নয়, কাজেই পূর্বদিনের কাজের সঙ্গে নতুন দিনের কাজ জুড়ে নিতে হয়। এক দিনে যতটা জমি তৈরি করা গেল, তার সীমানায় প্রায় আধ ইঞ্চি পোড়ো জায়গা (blank) রেখে, আঁকার কাজ শেষ করলেই চলবে ; পরদিন ঐ আধ ইঞ্চি কিনার কলম বাড়া করে চেঁছে, তার ওপর নতুন মশলা চাপিয়ে (অর্থাৎ জোড় দিয়ে) নূতন কাজ শুরু করা হবে। কোনো বস্তু বা মূর্তি ধরে সেইদিনেই তা শেষ করা ভালো ; আর বস্তু বা মূর্তিটি কিনারে যদি পড়ে থাকে, তো, তারও পরে আধ ইঞ্চি ফালতু প্লাস্টার ধরিয়ে রাখতে হবে।

'সব শেষে বক্তব্য, ফ্রেস্কো সূক্ষ্ম কাজের উপযোগী মোটেই নয়। ওস্তাদ শিল্পীর পাকা হাতের কাজেরই বিশেষ উপযোগী —যেখানে আঁকা হয় কম, ব্যঞ্জনা থাকে বেশি।

'বলাই বাহুল্য, ফ্রেস্কো ছবিতে চুন বালি মিলেই বাঁধনের কাজ করে ; অন্য কোনো আঠা লাগে না। তবে কেউ বা ফ্রেস্কো-কাজ শুকোবার পরে তার ওপর ডিম-মেশানো রঙে সূক্ষ্ম কাজ করে ছবি সমাধা করেন, অর্থাৎ 'ফিনিশ' করেন।

'মাটির দেওয়ালে ফ্রেস্কো আঁকা চলে এই পদ্ধতিতে।—মাটির দেওয়ালে দক্ষিণরাঢ়ে উলুটি করা হয়ে থাকে। মাটির সঙ্গে উলুখড়, তুঁষ, কুঁড়ো, পাট ও তুলো মিশিয়ে সে-উলুটির বিবরণ বিশদভাবে লিখেছেন শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল। তাঁর প্রবন্ধ আমরা 'শিল্পচর্চা' বই-এ (পৃ ১৮৪-৯০) সংকলন করে দিয়েছি।

'সাধারণ মাটির দেওয়ালে বা উলুটির দেওয়ালে ইটালীর ফ্রেস্কোর জন্যে তৈরি (বালি ও চুন মেশানো) মশলার সিকি ইঞ্চি পুরু একটি প্রলেপ চৌরস করে লাগাতে হবে কর্নিক বা উসো দিয়ে। লাগাবার আগে দেওয়াল ভিজিয়ে নিতে হবে কুশের কুচি দিয়ে জল ছিটিয়ে।

'এই প্রলেপ শুকোবার পরে রং-মেশানো মশলা দিয়ে ছবি করা হয়ে থাকে, ছবি করার জন্যে আগে তৈরি বালি-চুনের মশলার সঙ্গেই পাথুরে বা

মেটে-রং দরকারমতো ভালোমতে মিশিয়ে কয়েকটি এনামেলের বাটিতে ভিজে চট মুড়ে রাখতে হবে; প্রাথমিক চুন-বালির পলস্তারা শুকিয়ে যাবার পরে কুশের কুঁচি দিয়ে জল ছিটিয়ে ভালো করে ভেজাতে হবে। পরে ভোঁতা কর্নিকের মাথায় রঙের বাটি থেকে রং তুলে তুলে কর্নিক দিয়ে দেওয়ালে টিপ দিয়ে দিয়ে ইচ্ছামত ছবি তৈরি করতে হবে। এই রীতিতে মন থেকে সরাসরি দেওয়ালে রচনা করা হয়, পূর্ব-প্রস্তুত নক্সা বা সছিদ্র চর্বার ব্যবহার নেই। কর্নিক দিয়ে টিপে টিপে মাছের আঁশের মতো একটু একটু করে রঙের গায়ে রং ধরাতে হবে; কর্নিক ঘষে রং লাগানো ঠিক হবে না। এই নির্দেশ অনুযায়ী রং লাগানো হলে রঙের চমৎকার জেল্লা হবে। মাটির দেওয়ালে এ-ভাবে ছবি করলে দেওয়ালে উই বা সঁ্যাতা লেগে ছবি নষ্ট হবার ভয় থাকে না। নানা রঙের টিপ নানাভাবে সাজিয়ে রঙের বিচিত্র সংগীতি (harmony) ও কমনীয়তা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে।

'শান্তিনিকেতনে কলাভবন-ছাত্রাবাসের এলাকায় মাটির দেওয়ালে এ-রকম কাজ ১১।১২ বছর হলো করা হয়েছে: সে-ছবি আজও কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি।

॥ অজন্তার ভিত্তিচিত্র ॥

'অজন্তার রীতিতে মাটির অস্তর লাগিয়ে ছবি-আঁকার জমি তৈরি করা চলে ইঁটের দেওয়ালে, পাথরের দেওয়ালে, কাঠের জাফরি বা কঞ্চির ছিটেবেড়ার ওপরে। এই জমি-তৈরির পদ্ধতিটি কুমোরদের প্রতিমা-তৈরির রীতি পর্যবেক্ষণ করে ও অজন্তা-ভিত্তিচিত্রের স্খলিত অস্তর বিশ্লেষণ করে অনুমানের দ্বারা ও পরীক্ষার দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছে। শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এই রীতির মাধ্যমে ছবি এঁকে আমরা এর উপযোগিতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়েছি।

'ইঁটের দেওয়ালে অস্তর লাগাবার পূর্বে, প্লাস্টার খসিয়ে, ইঁটের জোড়-মুখ থেকে চুন-বালি চেঁছে খড়া বার করে নিতে হবে। ঐ খড়ার মুখে ও ইঁটের ওপর শক্ত বুরুশে করে এক-পোঁছ আলকাতরা লাগিয়ে দেবে; ফলে উই ও সঁ্যাতা (damp) লাগবার ভয় থাকবে না। আলকাতরা

শুকোলে বিশেষভাবে প্রস্তুত মশলা ব্যবহার করতে হবে।

'প্রথম-মশলা' তৈরির বিধি হচ্ছে এই।—বিভিন্ন বস্তুর ভাগ মাপের হিসাবে, ওজন হিসাবে নয়। ওজনের উল্লেখ থাকলে আলাদা কথা। উইঢিপির মাটি তিন ভাগ, ঘাস-খেকো গোরুর গোবর এক ভাগ (শুকনো গুঁড়া), চিঁড়ের বা ধানের তুঁষ এক ভাগ —এতে অল্প মেথির জল মেশাতে হবে। মেথি রৌদ্রে শুকিয়ে বা শুকনো-খোলায় ভেজে নিয়ে, আধ-ভাঙ্গা করতে হবে, চা-চামচের এক চামচ এই আধ-ভাঙ্গা মেথি, ন্যাকড়ার পুঁটুলি করে, অল্প-পরিমাণ গরম জলে এক রাত ভিজিয়ে রাখলে 'মেথির জল' তৈরি হবে। মশলায় মেশাবার জন্যে ছটাকখানেক আলকাতরা দরকার। ('প্রথম মশলা' মাখবার সময়ে পুরোনো চালের পচা খড়-কুটি মেশালে উই, ইঁদুর, পোকা-মাকড় লাগবে না। আলকাতরার বদলে ব্যবহার করা চলবে।) এই মশলার পরিমাণ ৬"×৬"×১" ঘন অর্থাৎ আধ ঘনফুট এবং এ-দিয়ে ১'×১' বা এক বর্গফুট জমি আবৃত করা যাবে। (ভাগ ঠিক রেখে প্রয়োজন মতো বেশি মশলাও তৈরি করা যায়; সে ক্ষেত্রে মেথির জল বা আলকাতরা হিসাব মতো বাড়ালেই চলবে।)

উক্ত মশলায় জল মিশিয়ে কাদা করে এক সপ্তাহ পচাতে হবে। পরে, কাদা-কাদা মশলা টিপে টিপে দেওয়ালে লাগাতে হবে। সমান না-করেই রেখে দিতে হবে। এই মশলা এক ইঞ্চি পুরু করে লাগাতে হবে। মশলা লাগাবার দিন চার পরে, যদি ফাটল দেখা যায়, সেই জায়গায় পূর্বের মশলাই আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে বসিয়ে মেরামত করে নিতে হবে। এই অস্তর সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে, কুঁচি দিয়ে অল্প জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে মশলাটি পুনর্বার কর্নিকে করে, বা হাতে করে লাগিয়ে, উসো দিয়ে সমান করে নিতে হবে। পূর্বের অস্তরের অর্ধেক, অর্থাৎ আধ ইঞ্চি পুরু হলেই চলবে।

'দ্বিতীয় মশলা'। প্রথম মশলার সঙ্গে শণের মিহি কুঁচি চট্‌কে চট্‌কে ভালো-রূপ মেশালেই দ্বিতীয় মশলাটি তৈরি হবে; পূর্বতন অস্তরের ওপর কুঁচি করে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে, এই মশলাটি সিকি ইঞ্চি পুরু করে লাগাতে হবে।

দ্বিতীয় মশলায় একটু বেশি জল ঢেলে, ও ঘেঁটে দিয়ে একটু থিতোতে দিলে, একটি পলি পড়বে। এই 'পলি' মোটা কেয়া-ডাঁটির বা নারকেল-

ছোবড়ার তুলি দিয়ে, পূর্বপ্রস্তুত জমির ওপর (অর্থাৎ দ্বিতীয়-প্রকার মশলার অস্তরের ওপর) লাগাতে হবে ; আর প্রলেপটি অল্প ভিজে থাকতে থাকতে কর্নিক দিয়ে মেজে সমান করে নিতে হবে।

'শেষোক্ত জমির ওপর কাঠ-খড়ির সাদা রঙে তেঁতুল-বীজের আঠা বা ডিমের হলদে কুসুম, হিসাবমতো মিশিয়ে উটের লোমের অপেক্ষাকৃত নরম তুলি দিয়ে, একটির পর আর-একটি পাতলা প্রলেপ দিতে হবে। একেবারেই পুরু করে রং লাগানো ভালো নয় ; পর পর তিন-চারটি প্রলেপে প্রয়োজনমতো পুরু করাই ভালো। এই সাদা রঙের অস্তরে রং লাগালে বা রেখা টানলে যদি ধেবড়ে যায় (রং নিজে থেকে ছড়িয়ে যায়), তবে এক কাপ জলে এক চামচ ফটকিরি গুঁড়া মিলিয়ে তারই দু-এক পোঁচ লাগিয়ে দিতে হবে। কোথাও মিহি-কাজ বা রেখার বাহার দেখাবার আবশ্যক হলে প্রস্তুত জমির ওপর পাতলা তেলা-কাগজ রেখে, শাঁখে করে বা পালিশ-পাথরে অল্প মেজে নিতে হবে।

'অজন্তা-পদ্ধতির এই জমির ওপরে রং-এ যে কোনো প্রকারের গঁদ মিশিয়ে বা অন্য উপযুক্ত আটা মিশিয়ে ছবি আঁকা চলবে। এ-কাজের স্থায়িত্ব অন্য সব-রকম ভিত্তিচিত্র থেকে, ফ্রেস্কো থেকে বেশি ; পনেরো শো বছরের পুরানো কাজও ভালো অবস্থাতেই আছে। ঢাকা-বারান্দায় বা ঘরের দেওয়ালে (যে দেওয়াল মজবুত, যার বাহিরের দিকটা জল-বৃষ্টির আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত) করা হলে অনেক দিন টিকবে। অবশ্য, বাঙ্গালার মতো স্যাঁৎসেঁতে বৃষ্টি-বাদলার দেশে বিশেষভাবে তৈরি জোড়া-দেওয়াল আর স্যাঁতা নিবারণের বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন —না-হলে কোন কাজই স্থায়ী হতে পারে না।

॥ সিংহলী ভিত্তিচিত্র ॥

'চৌরস করা পাথর বা ইঁট বা সিমেণ্টের দেওয়ালে, ছাদে, নারকেল-ছোবড়ার তুলি করে প্রথমে একটি অস্তর লাগাতে হয়, তার উপকরণ একভাগ মাটি, আর দু-ভাগ বালি, আর বাঁধন বা আঠা ভাতের ফ্যান। এর ওপর অপেক্ষাকৃত পাতলা একটি স্তর 'কিরিমেটিয়া' বা কেওলিন মাটি , এই মাটির

সঙ্গেও দরকার মতো ভাতের ফ্যান বা তেঁতুল-বীজের আঠা মেশাতে হবে। তার ওপরে ম্যাগ্নেসাইট (magnesite) ফুলখড়ি? এই সঙ্গে পরিমাণ-মতো গঁদ বা তেঁতুল-বীজের আঠা মেশানো চাই) দিয়ে আরো পাতলা একটি প্রলেপ দিয়ে ঘষে মেজে নিলেই সুন্দর সাদা জমি তৈরি হয়ে যাবে।

'অজন্তায়' বাগে যেমন, সিংহলের সিগিরিয়া গুহাতেও তেমনি ছবি আঁকা হয়েছে পাথরের ওপর মাটির জমি তৈরি করে। আনন্দ কুমারস্বামী 'মধ্য-যুগের সিংহলী আর্ট'-গ্রন্থে (A. K. Coomaraswamy, Mediaeval Sinhalese Art, 1908. p. 178) অনুমান করেন যে, এ-ক্ষেত্রে প্রথমেই মাটির (উইমাটির?) একটি স্তর, তার উপর তুঁষ এবং সম্ভবতঃ নারকেল-ছোবড়ার আঁশ-মেশানো কেওলিনের আধ ইঞ্চি পুরু একটি স্তর, সব-শেষে মাখমের মতো মোলায়েম চুনের একটি স্তর লাগানো হয়ে গেলে, কর্নিকে মেজে মসৃণ করা হয়েছে। অতঃপর টেম্পেরা ছবির মতো, জগন্নাথের পটের মতো, গঁদ বা অন্য আঠা-মেশানো রং-এ ছবি আঁকা হয়েছে বা হতে পারে।

'অজন্তা-সিগিরিয়ার অনুরূপ মাটির জমির ছবিতে, ছবি শেষ হলে যে কোনো রকম ভার্ণিশ করা চলে। তা ছাড়া, স্পিরিশের বা তিসির জলের খুব পাতলা দু-এক পোঁচ দিয়ে রাখলে মন্দ হয় না। তিসির জল তৈরির বিষয় 'তিব্বতী টঙ্কা' প্রসঙ্গে বলা যাবে।

॥ নেপালী ভিত্তিচিত্র ॥

'নেপালী-পদ্ধতি নেপালী-শিল্পী ভিখাজির কাছে জেনেছি। মশলার উপকরণ হলো এক ভাগ কালো এঁটেল মাটি, হলদে মাটি এক ভাগ, ঘাস-খেকো গোরুর গোবর (আঁশ বেশি ও হুড়হুড়ানি ভাব কম) এক ভাগ, চিঁড়ের তুঁষ বা গমের ভুষি, বা গাছের ছাল-ছেঁচা (বট, নোনা বা তুঁত গাছ থেকে, নেপালী কাগজ যে-গাছ থেকে হয়, সেই সব চেয়ে ভালো, কারণ, পোকা লাগে না) বা নেপালী কাগজ এক ভাগ, সামান্য মেথির জল —'অজন্তা ভিত্তিচিত্র'-প্রসঙ্গে প্রাথমিক মশলার বিবরণের মধ্যে পদ্ধতি ও পরিমাণের বিষয় বলা হয়েছে। উল্লিখিত দ্রব্যগুলি একসঙ্গে মিশিয়ে জল ঢেলে কাদা-কাদা করে, পা দিয়ে চটকে নিতে হবে, বা উদুখলে কুটে নিতে

হবে। ভালোরকম চটকানো হলে একটা ঠাণ্ডা জায়গায় জড়ো করে, একটা ভিজে চট ঢাকা দিয়ে, তিন-চারদিন রেখে দিতে হবে। যখন মাটি ফেঁপে উঠে একটু দুর্গন্ধ হবে, তখন কার্যোপযোগী হয়েছে বুঝতে হবে।

'ইঁটের দেওয়াল হলে, পুরোনো প্লাস্টার খসিয়ে 'খড়া' বার করে, আর পাথরের দেওয়াল হলে, অল্প বিস্তর ছেনি দিয়ে কেটে, এবড়ো-খেবড়ো করে, দেওয়াল জল দিয়ে ভিজিয়ে, তার ওপর পূর্ব-প্রস্তুত মশলা কর্নিকে করে লাগাতে হবে। সেটি সম্পূর্ণ না-শুকাতে আর-এক পর্দা লাগাতে হবে। এ-ভাবে যতগুলি পর্দা লাগাতে পারা যায়, ততই ভালো। সবশুদ্ধ আধ ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি পর্যন্ত পুরু করা যেতে পারে। পরে, এঁটেল মাটি ও গোবরের খুব মিহি-গুঁড়ো সমান-ভাগে মিশিয়ে, জলে গুলে, কেয়া বা খেজুর ডাঁটির তুলি দিয়ে পাতলা করে প্রলেপ দিতে হবে। (এ-সব মাটির পর্দা বা প্রলেপ সব সময় জমি একটু ভিজে ভিজে থাকতে লাগানো উচিত।) গোবর-মেশানো অস্তর ধরানোর পরে, জমিটা কর্নিকে বেশ করে মেজে নিতে হবে। পরে ভালো মোলায়েম চুন (আরায়েসের কাজের জন্যে যে-ভাবের পাথুরে চুন তৈরি করে নেওয়া হয়, দশ সের চুনে দেড় ছটাক দই মেশে, আর প্রত্যহ জল বদলে এক মাস বা তারও বেশি রাখতে হয়, কোনো সময়ে জল শুকোতে দিতে নেই) কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে, অল্প সিরিশ বা গঁদ মিশিয়ে, অথবা কাঠখড়ির সাদা হিসাব মতো তেঁতুল-বীজের আঠা বা ডিমের কুসুম, বা সিরিশ মিশিয়ে অস্তরের শেষ স্তর হিসাবে লাগিয়ে দিতে হবে। মাটির অস্তরের শেষ প্রলেপে কাঠখড়ির সাদা, আর তেঁতুল-বীজের আঠাই প্রশস্ত। এখন জমি অল্প ভিজে থাকতে থাকতেই একটি পালিশ-পাথরে পালিশ করে নাও। পালিশ-পাথরের অভাবে, শাঁখ দিয়ে, বা মসৃণ কাঁচের বোতল গড়িয়েও কাজ হতে পারে। এই সাদা জমিতে তিব্বতী-নেপালী টঙ্গা বা টেম্পেরা ছবি যেমন হয়, তেমনি করেই রঙে গঁদ, সিরিশ বা ডিম মিশিয়ে কাজ করা যেতে পারে।

॥ রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি ॥

শিল্পাচার্য নন্দলালের সঙ্গে গান্ধীজির যোগাযোগ শান্তিনিকেতন ও

রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে অহিংস নীতি প্রচার করেছিলেন। কেন করলেন, তা জানা দরকার। ১৯১৫ সালের বৈশাখ মাসে মজঃফরপুরে রাজনীতির জন্যে প্রথম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এর কিছুকাল পরেই কলকাতার মানিকতলায় বোমার কারখানা আর বিপ্লবের ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হলো। এর পরেও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড কয়েকটা ঘটে গিয়েছিল।

বাঙ্গালাদেশে একদল যুবক যখন এইভাবে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে আত্মাহুতি দিচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামে একজন গুজরাটী যুবক ব্যারিস্টার প্রবাসী ভারতীয়দের ওপর স্থানীয় গভর্নমেন্টের জুলুম-নীতি প্রতিরোধ করবার জন্যে সত্যাগ্রহ বা Passive resistance আন্দোলন প্রচার করছিলেন। মধ্যযুগে এই নীতির সার্থক প্রয়োগ করেছিলেন গৌড়দেশের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। আধুনিক কালে এই নীতির আবিষ্কারক হলেন রাশিয়ার টলস্টয়, আর প্রথম প্রয়োগ করেন গান্ধীজি। টলস্টয় নীতিরূপে যা প্রচার করেছিলেন, গান্ধীজি জীবনে তা বাস্তবরূপে গ্রহণ করেন (১৯০৬)। রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবনাকে সাহিত্য-রূপ দিলেন —ধনঞ্জয় বৈরাগী তাঁর অহিংস নীতির প্রতীক। তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ফকির —আদর্শ নেতা। মহাত্মা গান্ধী সেই নীতিকে কেবল কথায় নয়, জীবনে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাঁর বাণী হলো ধনঞ্জয় বৈরাগীর বাণী, —'মারেন যদি সেলো ভাই ধন্য হরি।'

দক্ষিণআফ্রিকায় গান্ধীজি-প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের অবস্থা সরজমিনে দেখবার জন্যে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্মি গোপালকৃষ্ণ গোখলে সেখানে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ-সময়ে ভারতের রাজনীতি বা সমাজনীতি সম্পর্কে কোনো মতামত প্রকাশ করেননি। পরবৎসর অর্থাৎ ১৯১৩ সালে এ্যাণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সন সাহেব আফ্রিকা-যাত্রা করবার সংকল্প করলেন। এ্যাণ্ড্রুজ দিল্লি থেকে শান্তিনিকেতনে এসে কবির আশীর্বাদ নিয়ে, আর পিয়ার্সন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ১৯১৩ সালে ২০এ নভেম্বর বোলপুর থেকে যাত্রা করলেন। যাত্রার পূর্বে শান্তিনিকেতন-মন্দিরে বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা ছিল। রবীন্দ্রনাথ আশ্রম-মন্দিরে আচার্যের কাজ করেছিলেন। বিদায়কালে ছাত্রসভাতে পিয়ার্সন বলেছিলেন, —শান্তি-

নিকেতন-আশ্রম থেকে যে-শান্তি আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি, তা দক্ষিণ-আফ্রিকার কাজে আমাদের সাহায্য করবে। রবীন্দ্রনাথ এ্যাণ্ড্রুজকে লিখেছিলেন, —you know our best love was with you, while ycu were fightiug our cause in South Africa along with Mr. Gandhi and others. —গান্ধীজির সম্পর্কে এই হলো কবির প্রথম উক্তি। ১৯১৩ সালের প্রথম দিকে এ্যাণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন দক্ষিণআফ্রিকায় গেলেন সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করবার জন্যে। ইংরেজ-বুয়র শাসকশ্রেণী ভারতীয়দের ওপর বর্ণ-বৈষম্যের জন্যে যে-সব আইন প্রচার করেন, সে-সব অমান্য করবার যে-আন্দোলন গান্ধীজির নেতৃত্বে চলেছিল তারই নাম ইতিহাস-খ্যাত সত্যাগ্রহ বা Passive resistance। সংগ্রামের শেষে ১৯১৪ সালের গোড়ায় গান্ধীজির সঙ্গে সেখানকার নেতা জেনারেল স্মার্টসের একটা রফা নিষ্পত্তি হয়। এর পরে শান্তিরক্ষার আলোচনার জন্যে গান্ধীজি ইংরেজের ঔপনিবেশিক দপ্তরের সচিবের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যে বিলেত-যাত্রা করলেন। আফ্রিকা ছাড়বার আগে তিনি স্থির করলেন যে ইংলণ্ড থেকে তিনি ভারত ঘুরে আফ্রিকায় ফিরবেন। তখন সমস্যা হলো, তাঁর Phoenix-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে। তিনি দেশে না-ফেরা পর্যন্ত এদের কোথায় রাখবেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কোনো বিশেষ পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত করা হতো না। কঠিন কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে ধর্ম ও নীতিশিক্ষা এবং সাধারণ পাঠাভ্যাস আবশ্যিক ছিল। গান্ধীজির পুত্রেরাও এর ছাত্র।

Phoenix বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপক মিলে সংখ্যা প্রায় কুড়ি। ভারতে এসে প্রথমে তাঁরা হরিদ্বার-গুরুকুলে আশ্রয় পেলেন। তারপর এ্যাণ্ড্রুজের মধ্যস্থতায় ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসের শেষে তাঁদের আনা হয় শান্তিনিকেতনে। গান্ধীজির বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পঠন-পাঠন, শিক্ষা-শাসন, আহার বিহার, ধরন-ধারন সবই রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের ছাত্রদের থেকে আলাদা। এবং তাঁরা এখানে থাকেন তাঁদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেই। এতে রবীন্দ্রনাথ কোনো আপত্তি করেননি। গান্ধীজির ছাত্রদের মধ্যে বেশির ভাগ তামিল ও গুজরাটী। অধ্যাপকদের মধ্যে মগনলাল গান্ধী গুজরাটী, কোটাল ছিলেন মারাঠী, আরে রাজঙ্গম ছিলেন তামিল। এই সময়ের কিছু আগে মারাঠী কাকা কালেলকর শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। ভারতের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান

সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার জন্যে তিনি ঘুরছিলেন। শান্তিনিকেতনে ১৯১৪ সালের দিকে তিনি ছাত্রদের পড়াতেন। এই বছরে গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে এলেন। কালেলকার Phoenix ছাত্রদের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। এই বিদ্যার্থীরা আর শিক্ষকগণ আশ্রমে নতুন প্রাণ সঞ্চার করলেন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে গান্ধীজিকে যে-পত্র দেন তা হলো এই। এটা গান্ধীজিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম পত্র :—

Dear Mr Gandhi,

That you could think of my school as the right and the likely place where your phoe ix boys could take shelter when they are in India, has given me real pleaure —aod that pleasure has been greatly enhanced when I saw those dear boys in that place. We all feel that their influence will be of great value to our boys and I hope that they in their turn will gain something which will make their stay in Shantiniketan fruitful. I write this letter to thank you for allowing your boys to become our boys as well and thus form a living link in the Sadhana of both of our lives

Very Sincerely yours

Rabindranath Tagore.

১৯১৫ সালের ৬ই মার্চ শান্তিনিকেতনে গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়েছিল। এর ন-দিন আগে গান্ধীজি পুণা থেকে এখানে এসেছিলেন। ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে গান্ধীজি phoenix বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। ইংলণ্ড থেকে ফেরবার সময়ে বোম্বাইএ পৌঁছে তিনি জানতে পারলেন, তাঁর ছাত্রেরা আর পুত্রগণ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে আশ্রয় পেয়েছে। ১৯২১ সালের ৫ই ফাল্গুন গান্ধীজি ও কস্তুরাবাঈ বোলপুর এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায়। কবির নির্দেশে আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ এই শ্রদ্ধেয় অতিথির যথোচিত সম্মান দেখিয়েছিলেন। বাঙ্গালাদেশের একটি নিভৃত গ্রামপ্রান্তরে শালবীথিতলে গান্ধীজি যে অনাড়ম্বর সহৃদয় অভিনন্দন পেয়েছিলেন

তার কথা তিনি কোনোদিন ভোলেননি : 'The teachers and students overwhelmed me with affection ; th reception was a beautiful combination of simplicity, art and love'.

॥ রবিতীর্থে মহাত্মাজি —অসিতকুমার হালদারের বিবৃতি ॥

'রবিদাদার সাদর আহ্বানে মহাত্মা গান্ধীজি [দ্বিতীয় বার] সপরিবারে দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে এলেন শান্তিনিকেতনে ১৯১৫ সালে। আশ্রমে তখন গ্রীষ্মাবকাশ চলছে। সোৎসাহে অধ্যাপক সন্তোষ মজুমদার সদলবলে গেলেন বোলপুর স্টেশনে গাড়ি নিয়ে তাঁদের আনতে। শালবীথিকার পথের উপর আমি কয়েকটি ছাত্র নিয়ে তোরণ তৈরি করে আলপনা ও ফুল দিয়ে সাজিয়ে তুললুম তাঁদের অভ্যর্থনার স্থান। রবিদাদার সঙ্গে বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী, জগদানন্দ রায়, কালীমোহন ঘোষ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এলেন গান্ধীজিকে আহ্বান করতে। সময়োপযোগী সংস্কৃত শ্লোকে বিধুশেখর মহাত্মাকে স্বাগত সম্ভাষণ নিবেদন করলেন। রবিদা অপূর্ব সুললিত ভাষায় মানপত্র লিখে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন —প্রথমে দু-জনে দু জনাকে আলিঙ্গন করার পরে মহাত্মা রবিদাকে 'গুরুদেব' বলে পা ছুঁতে গেলেন – তিনি দিলেন না ছুঁতে। আমার হাতে তখন তৈরি ছিল 'বন্দিনী মাতা' ছবি একটি —সে টি মহাত্মার হাতে দিয়ে তাঁকে নমস্কার করলুম। জীবনে এই এক পরম সৌভাগ্য ঘটল আমার। ছবিখানি তৎকালীন প্রবাসীতে শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধীর সৌজন্যে প্রকাশিত হয়েছিল।

'আশ্রমের মধ্যে তখন রবিদাদার বাসস্থান 'নতুন বাঙ্গালা' অত্যন্ত সাধাসিধে এবং মনোরম ছিল। অতিথিশালা-গৃহে গান্ধীজি এসে সপরিবারে বাস করলেন। অধ্যাপক সন্তোষ মজুমদার এবং আমার উপর ভার পড়ল অতিথি সেবার। গান্ধীজির আশ্রমিকেরা দক্ষিণ-আফ্রিকায় থাকার কালে যেমনভাবে দৈনিক উপাসনা, ক্ষেত-খামারের কাজ পড়াশুনা করতেন সেই নিয়মেই বজায় রাখলেন তাঁদের। প্রাতে উঠে নিমপাতা-বাঁটা চায়ের বদলে পান করতেন, দুপুরে বাজ্রা ও আটা-মেশানো হাতে-গড়া রুটি, শাক, কলা, চিনাবাদাম ইত্যাদি খেতেন। আর রাত্রেও প্রায় ঐরূপ খাবার ব্যবস্থা ছিল তাঁদের। তাঁর গোষ্ঠির

কারু অসুখ করলে রোদে শোয়ানোর ব্যবস্থা হতো — ফোঁড়া বা হাত-পা কেটে গেলে মাটির প্রলেপ দিয়ে রোদে বসাতেন। Nature cure ছিল মহাত্মার চিকিৎসা। রবিদাকেও দেখি দিনকতক তাঁদের প্রথামতো প্রাতে কাঁচা-নিমপাতার নির্যাস খেতে।

'খাদ্যের সংস্কার নিয়ে আশ্রমে তখন পড়ে গেল সাড়া। অধ্যাপক সন্তোষ মজুমদার আমাকেও টানলেন মহাত্মাজির খাদ্য-সংস্কারে যোগ দিতে। দু-তিন দিন মাত্র মহাত্মাজিদের দলে ভোজনে যোগ দেবার পরে আমার এবং সন্তোষ মজুমদারের যা অবস্থা হয়েছিল তার কথা না-বলাই ভালো।

মহাত্মাজি দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে এসে আশ্রমে বাস করার পরে রবিদাদা গেলেন জাপান হয়ে আমেরিকায় ১৯১৬ সালে। মহাত্মাজির ওপর ভার দিয়ে গেলেন আশ্রমের। গান্ধীজির তখন ঐকান্তিক চিন্তা ছিল, কী উপায়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা যায়। তাই স্বায়ত্তশাসনের জন্যে সবাইকে তৈরি করতে চাইতেন স্বাবলম্বী করে। নিজে তিনি ঘর ঝাঁট দেওয়া, কাপড় কাচা থেকে সব কাজ করতেন, এবং তাঁর পুত্রদের ও ছাত্রদের দ্বারাও সেইরকম করাতেন। রবিদাদা বিদেশ যাত্রা করার পরেই গান্ধীজি তাই উঠে-পড়ে লাগলেন আশ্রম-সংস্কারের কাজে। প্রথমেই একটি সভা আহ্বান করলেন অধ্যাপক, কর্তৃপক্ষদের সংস্কার-বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্যে।

'আশ্রমে তখন চাকর কেবল রান্নাঘরের জন্যেই ছিল, ছাত্রাবাসে ছাত্রদের ছিল স্বাবলম্বী হয়ে নিজের কাজ নিজে করার নিয়ম। প্রতি ছাত্রাবাসে পঞ্চায়েতীর 'ইলেকশন' হতো এবং তাতে যিনি 'কাপ্তান' নির্বাচিত হতেন, তাঁর কথা ছাত্রদের সবাইকে শুনতে হতো; নইলে, ছাত্রাবাসের অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়ে — কিংবা এক পঙ্‌ক্তিতে খাবার ঘরে বসতে না-দিয়ে বা অন্য কোনো প্রকারে অপদস্থ করে তিনি সাজা দিতেন।

'মহাত্মাজির সংস্কারে রান্নাঘরের চাকরদের ছাড়ানো হলো খাদ্য-বিভাগ থেকে। খাদ্যবিভাগ, স্বাস্থ্যবিভাগ এবং পূর্তবিভাগের কাজের বিশেষ বিশেষ অধ্যাপকের অধীনে ছাত্রদের ওপর ভার দিয়ে ভাগ করা হলো।

'আমার ওপর ভার পড়ল রান্নাঘরের তরকারি কোটার তদারকের। অধ্যাপক সুধাকান্ত রায়চৌধুরী হলেন রান্নার ব্যাপারে কর্তাকর্তা। তাঁর একটু ভোজনবিলাসী বলে ঝোঁক ছিল, তাই তিনি রাঁধবার ভার নিলেন। ছেলেদের

নিয়ে বঁটিতে তরকারি কুটতুম —আমার মামী (প্রতিমা দেবী) মাসী (মীরা দেবী) বড়মামী (হেমলতা দেবী) বৌঠান (কমলা দেবী) এসে যোগ দিতেন। ঝোলের আলু, ঝালের আলু, আর চচ্চড়ির আলু কোটার তফাৎ কী? —শাকের সঙ্গে পটল চলে কিনা ইত্যাদি —সূপকারী-বিদ্যার অনেক তথ্য রান্নাঘরের আওতায় এসে প্রথম জানতে পারলুম। যদিও আজ পর্যন্ত রান্না-করা আমার দ্বারা আর হলো না।

'তারপর অন্যদিকে স্বাস্থ্য-বিভাগে বন্ধুবর উইলি পিয়াস'ন ব্যস্ত রইলেন নোংরা নালা ছাত্রদের দিয়ে এবং নিজের হাতেও পরিষ্কার করা নিয়ে; ল্যাট্রিন ভেঙে ফেলার অপ্রিয় কাজও তাঁকে করতে হলো। গান্ধিজির নিয়মে শৌচখানার কোনো প্রয়োজন নেই। বেড়ালেরা যেমন বিষ্ঠা মাটি চাপা দেয়, সেইটি ছিল তাঁর আদর্শ, তিনি আমাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন। জমিতে Night soil পড়লে জমি উর্বরা হয়, এই ছিল তাঁর বিচার। তাঁর প্রবর্তিত প্রথামতো মাঠে প্রথমে গভীর নালা কাটতে হতো এবং প্রত্যেককে প্রত্যেক দিন প্রাতে বা সন্ধ্যায় ব্যবহারের পরে মাটি পায়ে করে নালায় ফেলে ভরিয়ে দিতে হতো। মাসের পর মাস ধরে এই নালা ভরে গেলে অন্য জমিতে আবার অনুরূপ নালা কেটে, শৌচখানার কাজ চালাতে হতো। সমস্ত মাঠ নালায় ভরে গেলে কিছুকাল ফেলে রেখে, তার ওপর লাঙল চালিয়ে চিনাবাদাম কপি ইত্যাদি তরিতরকারি লাগাতে হবে। তাতে জমি উর্বরা হওয়ায় ভালো ফল হবে। সর্বাধ্যক্ষ তখন ছিলেন অধ্যাপক জগদানন্দ রায় মহাশয়। এই বিষয়টি নিয়ে মতভেদ ঘটল তাঁর গান্ধীজির সঙ্গে। তিনি তখন রবিদাদার ফেরার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন।

'আশ্রমে গান্ধীজির সংস্কার ক্ষণস্থায়ী হলো। মোট কথা, মহাত্মাজির চরকাকাটা, অত্যন্ত আদিমভাবে জীবনযাত্রার আদর্শ রবিদাদার আশ্রমে কেউই গ্রহণ করতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথের ছিল জন্মগত সাধনা সাত্ত্বিক সৌকুমার্যের, সেখানে আদিম-ভাবের কোনো স্থান ছিল না —ছিল প্রগতি-পন্থা।

॥ অনুবৃত্তি ॥

প্রথমবার আশ্রমে দু-দিন থাকতে থাকতেই গান্ধীজি সংবাদ পেলেন, গোখলের মৃত্যু হয়েছে (ফেব্রুয়ারি ১৯, ১৯১৪)। গোখলেকে গান্ধীজি ভক্তি করতেন গুরুর মতো। শান্তিনিকেতনে আসবার আগে গান্ধীজি তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা করে এসেছিলেন। ১৯১৫ সালের ৬ই মার্চ গান্ধীজি আবার বোলপুরে এলেন। আশ্রম ঘুরে দেখে চারদিকের অপরিচ্ছন্নতা তাঁর চোখে পড়লো। পাচক ভৃত্যের সেবা পেয়ে ছাত্রদের আত্মশক্তি-প্রয়োগ-চেষ্টার অভাব ঘটছে দেখে গান্ধীজি ব্যথিত হলেন। গান্ধীজি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: 'আমার স্বভাব অনুযায়ী আমি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকদের সহিত মিলিয়া গিয়াছিলাম। আমি তাঁহাদের সহিত আত্মনির্ভরতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। বেতনভোগী পাচকের পরিবর্তে যদি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকেরা নিজেরাই রান্না করেন তবে ভালো হয়। উহাতে পাকশালার স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষকদিগের হাতে আসে, বিদ্যার্থীরা স্বাবলম্বী হয় এবং নিজহাতে পাক করিবার ব্যবহারিক শিক্ষাও লাভ করে। এই সকল কথা আমি শিক্ষকদিগকে জানাইলাম। দুই একজন শিক্ষক মাথা নাড়িলেন। কাহারও কাহারও এই পরীক্ষা ভালো মনে হইল। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে জানাইলে তিনি বলিলেন, শিক্ষকেরা যদি অনুকূল হন তবে এ পরীক্ষা তাঁহার নিজের খুব ভালো লাগিবে। তিনি বিদ্যার্থীদিগকে বলিলেন, 'ইহাতেই স্বরাজের চাবি রহিয়াছে।' —(গান্ধীজির আত্মকথা, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ ২২২)।

গান্ধীজির কথা ও কাজ বুঝতে এবং গ্রহণ করতে আশ্রমবাসীদের বেশির ভাগেরই এক মুহূর্ত বিলম্ব হয়নি। অথচ, এই স্বাবলম্বন-শক্তি অধ্যাপকগণের মধ্যে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে কবি এতাবৎকাল চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু, কোনো ফল হয়নি। এই চেষ্টাকে আশ্রমবাসীরা কোনো দিন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে জীবনধর্মের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেননি। অথচ তা আজ উত্তেজনার মুহূর্তে নতুনত্বের মোহে অভাবিতের প্রত্যাশায় সহসা সকলে অনুমোদন ও গ্রহণ করে ফেললেন। এর হেতু হলো এই কর্মাদর্শ কবির ছিল বাণীমাত্র। কিন্তু গান্ধীজির জীবনে তাঁরা দেখতে পেলেন এই কর্মরূপের বাস্তব মূর্তি। তাই এই দুর্বার আকর্ষণ। কিন্তু এই স্বাবলম্বন-নীতি আধুনিক সভ্য জীবনে অনুসরণ করা সম্ভব কিনা সে-চিন্তার সময় তখন কারো ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ তখন আছেন সুরুলের কুঠিতে। তাঁর সঙ্গে আশ্রম-সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করে এবং তাঁর অনুমোদন পেয়ে তবে গান্ধীজি আশ্রমবাসীদের এই কাজে লাগিয়ে দিলেন।

শান্তিনিকেতনের রান্নাঘরে ও খাবার ঘরে তখন জাতি-বিচার মেনে চলা হতো। কবির সঙ্গে আলোচনায় এ-কথা ওঠে। গান্ধীজি বললেন, তাঁর মতে আশ্রমে সবাই থাকবেন সমানভাবে। আহারে-বিহারে অশনে-ব্যসনে কোনোরকম পার্থক্য থাকা উচিত নয়। তখন ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা পৃথক পঙ্‌ক্তিতে খেতে বসতো। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এ-বিষয়ে ছাত্রদের কিছু বলতেন না। ছাত্রেরা নিজেদের অভিভাবকদের নির্দেশমতে জাতি-পাঁতি মেনে চলতো। গান্ধীজি বললেন, এ-ভাবে পৃথক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন আশ্রমধর্মবিরুদ্ধ। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, তিনি কোনোদিন ছাত্রদের ধর্ম বা সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে বল প্রয়োগ করেননি। জোর করে এটা মানাতে চাইলে আপাতদৃষ্টিতে তারা নিয়মপালন করবে নিশ্চয়ই কিন্তু, তাদের অন্তরে এটা গাঁথা যাবে না। যে-জিনিস অন্তর থেকে গৃহীত না হয়, সেটা বাইরের চাপে স্থায়ী ফলপ্রদ হয় না। সেইজন্যে তিনি বার থেকে নৈতিক চাপ দিতে চান না। বলা বাহুল্য গান্ধীজি কবির এই অভিমত গ্রহণ করেননি। পরে গান্ধীজি প্রতিষ্ঠিত সত্যাগ্রহ-আশ্রমে এই নৈতিকতা কি চেহারা নিয়েছিল, সে-কথা আমাদের আলোচনার বাইরের।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন পেয়ে, ছাত্রেরা ১৯১৫ সালের ১০ই মার্চ (২৬-এ ফাল্গুন, ১৩২১) স্বেচ্ছাব্রতী হয়ে আশ্রমের সব রকম কাজ করবার দায় গ্রহণ করলেন—রান্না করা, জল তোলা, বাসন মাজা, ঝাঁট দেওয়া, এমন-কি, মেথরের কাজ পর্যন্ত। অধ্যাপকদের মধ্যে সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, এ্যাণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন, নেপালচন্দ্র রায় অসিতকুমার হালদার অক্ষয়কুমার রায়, প্রমদারঞ্জন ঘোষ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই সেদিন এই কাজে সহযোগিতা করেছিলেন। সহযোগিতা করেননি এমন লোকও ছিলেন। ১০ই মার্চ তারিখটি সেই থেকে এখনও শান্তিনিকেতনে 'গান্ধীদিবস' বলে পালন করা হয়। এখানে আসার পর থেকে আচার্য নন্দলাল এই দিবসের মুখ্য পরিচালকরূপে নেতৃত্ব করতে থাকেন। ১০ই মার্চ সকাল থেকে পাচক, চাকর, মেথরদের ছুটি দিয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকেরা সকল রকম কাজ নিজেদের মধ্যে

ভাগাভাগি করে নিয়ে মহোৎসব করেন। শান্তিনিকেতনে স্বাবলম্বন-নীতি প্রবর্তনের পরদিন (১১ই মার্চ, ১৯১৫) গান্ধীজি রেঙ্গুনে গেলেন। কুড়ি দিন পরে ফিরে এসে তাঁর Phoenix বিদ্যালয়ের ছাত্র ও কর্মীদের নিয়ে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দেখতে গেলেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে গান্ধীজির বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্বন্ধ ছিল প্রায় চার মাস।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা দরকার, ১৯১৪ সালের ১লা মে তারিখে শান্তিনিকেতনে নন্দলালের সংবর্ধনা হয়। নভেম্বর মাসে গান্ধীজির Phoenix বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা শান্তিনিকেতনে আসেন। ১৯১৪ সালের ২০এ মার্চ শান্তিনিকেতন দেখতে আসেন লর্ড কারমাইকেল ও তাঁর স্ত্রী। লর্ড কারমাইকেল বঙ্গদেশের প্রথম গভর্নর। ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে বঙ্গচ্ছেদ রদ হয়ে গেলে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ জোড়া লাগে। তবে বিহার ও ওড়িষ্যাকে পৃথক করে একটা নতুন প্রদেশ গড়া হয়। এই নতুন প্রদেশের প্রথম গভর্নর হলেন বীরভূম-রাইপুরের লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। আর বঙ্গদেশের গভর্নর হন লর্ড কারমাইকেল। ১৯১৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতার লাটপ্রাসাদের দরবারে রবীন্দ্রনাথ এঁর হাত দিয়েই নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কারমাইকেল ভারতীয় আর্ট ও শিল্পের একজন বড়ো পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

১৯১৭ সালে কলকাতায় জোড়াসাঁকার 'বিচিত্রা' হলে 'ডাকঘর' নাটিকার অভিনয়ের আয়োজন হয়। অভিনয়ের ব্যবস্থায় নাটকের মহড়ায় রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে আলোচনায় নানা পরিকল্পনা গড়তে ও ভাঙতে কবির মহা আনন্দ। তাঁর এই কাজে প্রধান সহায়ক হলেন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও অসিতকুমার। বিচিত্রার দোতলায় অভিনয় হয় তু-দিন ধরে। একদিন বিচিত্রার সদস্যদের জন্যে আর একদিন বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে। শেষদিন দর্শকদের মধ্যে ছিলেন এ্যানি বেশান্ত, লোকমান্য তিলক, মদনমোহন মালব্য আর গান্ধীজি।

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে অভিনয়ের সময়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় মহাশয়ের ওপর ভার ছিল গান্ধীজি ও মিসেস বেশান্ত কিছু প্রশ্ন করলে তার উত্তর দেওয়া। মালব্যজী অভিনয় দেখতে দেখতে ভাববিগলিত হয়েছিলেন। তাঁর চক্ষু সজল হয়েছিল। তিলক নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মতন —দৃষ্টি অভিনয়মঞ্চের ওপর স্থিরনিবদ্ধ। মিসেস বেশান্ত অভিনয় দেখেছিলেন অতীব

আগ্রহের সঙ্গে। আর গান্ধীজি অভিনয় দেখেছিলেন মনোযোগসহকারে। —তিনি কোনো কথা বলেননি।

গুরুদেব আশ্রমের ছাত্রদের শিক্ষাদানে ব্যস্ত। কবির পক্ষে বিদ্যালয়ে একটানা কাজে লেগে থাকা তখন খুব কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এ-কাজ থেকে মুক্তি পাবার আশায় কবির মন উদ্‌গ্রীব। ঠিক এই সময়ে গান্ধীজি কবিকে আহ্‌মেদাবাদে গুজরাটি-সাহিত্য-সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানালেন। ১৯২০ সালের ইস্টারের ছুটিতে গুজরাটি-সাহিত্য-সম্মেলনে কবি সভাপতিত্ব করলেন।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে গান্ধীজি কলকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশনের পরে শান্তিনিকেতনে বিশ্রাম করতে আসেন। কবি তখন বিদেশে বিশ্বমৈত্রী প্রচারে ব্যস্ত। গান্ধীজি আশ্রমে এসেছেন শুনে মৌলানা সৌকত আলী শান্তিনিকেতনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। বিধুশেখর ভট্টাচার্য সৌকত আলীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে খাবারের ব্যবস্থা করলেন। এ-ঘটনা আশ্রমে এই প্রথম। এর আগে পর্যন্ত সবাই জাতি-রক্ষার ভয়ে আলাদা আলাদা সারিতে বসে খাবার খেতো। এমন-কি জনৈক মুসলিম ছাত্রকে আশ্রমে ভরতি করলে, তার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কোথায় হবে, এই নিয়ে বেশ হৈ চৈ চলেছিল।

গুরুদেব দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে শান্তিনিকেতনে অনুপস্থিত ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন বুয়েনাস এয়ারিসে, ফ্রান্স আর ইতালি সফরে (২৫-এ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫)। সারা দেশে তখন গান্ধীজি মতিলাল নেহরু আর চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ কংগ্রেসকর্মীরা চরকা কাটা আর খদ্দর-পরা নীতি চালু করেছেন। ১৩৩১ সালের ৫ই ফাল্গুন কবি ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, ৯০খানা চরকা তকলি। বিধুশেখর শাস্ত্রী, নন্দলাল বসু প্রমুখ আশ্রমকর্মীরা স্বদেশী পোশাক প্রস্তুত করতে ব্যস্ত। কবি কিন্তু কোনো মন্তব্য করেননি।

অসহযোগ-আন্দোলনের সময়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে দেশের মুক্তিদাতা বলে অভিনন্দিত করেন। গান্ধীজি দ্বিজেন্দ্রনাথকে 'বড়োদাদা' বলে ডাকতেন কবির সূত্র ধরে।

॥ জ্যেষ্ঠা কন্যা গৌরীদেবীর বিবাহ, ১৯২৭ ॥

বাণীপুরের বসু-পরিবার বনেদী কুলীন কায়স্থ। ব্রাহ্ম-পরিবেশে নন্দলালের প্রতিভার বিকাশ। কিন্তু ধর্মে তিনি হিন্দু। মেয়ের বয়স হয়েছে কুড়ি। প্রতিভাশালিনী কন্যা। রবীন্দ্রনাথের ও পিতা নন্দলালের মণিকাঞ্চনযোগে শান্তিনিকেতনে 'নটীর পূজা' অভিনয়ে, নৃত্যপটীয়সী 'নটী'র নাচ দেখিয়ে, কলারসিক সমাজে তথা বাঙ্গালীসমাজে যুগান্তর আনার তিনি সূত্রপাত করেছেন। তাঁর খ্যাতি তখন বিদগ্ধ মহলে মুখে মুখে ফিরছে। সংবাদপত্রগুলিও মুখরিত।

নন্দলালের জেঠতুতো ভাই হলেন বাণীপুর-নিবাসী জীবনকৃষ্ণ বসু। তিনি এক উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান আনলেন। পাত্রের তিনি খুড়তুতো ভগ্নীপতি। পাত্রের কাকা হলেন বাগবাজারের আশুতোষ ভঞ্জচৌধুরী। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতে নাম করেছিলেন সেকালে। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ পাত্রের কাকীমা জীবনকৃষ্ণ বাবুকে উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করতে বললেন। জীবনবাবু তাঁর 'নতুনদা' নন্দলালের বড়ো মেয়েটির সন্ধান দিলেন। মেয়ে থাকে শান্তিনিকেতনে। ছবি আঁকায় হাত ভালো। নাচেও নাম করেছে।

আশুতোষ ভঞ্জচৌধুরীর বাগবাজারের বাড়িতে থেকে পাত্র কলকাতায় পড়াশুনা করেন। জন্ম হলো নলতা গ্রামে ১৯০৫ সালে। গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা করে ১৯২১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছেন। আই. এস্-সি, বি. এস্-সি পড়েছেন স্কটীশচার্চ কলেজে। ১৯২৫ সালে বি. এস্-সি পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে এম্.-এ ক্লাসে ভরতি হয়েছেন। সঙ্গে ল-কোর্সও নেওয়া হয়েছে। ১৯২৮ সালে ল-ফাইন্যাল দিলেন তিনি ১৯২৭ সালে বিবাহের পরে।

পাত্রের পিতা হলেন কিশোরীমোহন ভঞ্জচৌধুরী। জমিদার লোক— প্রতাপাদিত্যের বংশধর। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার বর্ধিষ্ণু নলতা গ্রামে বাড়ি। জমিদারবংশের সন্তান হলেও মেজাজে তিনি জমিদার ছিলেন না। কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্টস্কুলে হ্যাভেল সাহেবের ছাত্র ছিলেন তিনি।

নন্দলালের সতীর্থ।

গৌরীদেবীর বিবাহের কথাবার্তা চলছে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন কলকাতায় 'নটীর পূজা' অভিনয়ের পরে বিবাহ হবে। ওঁদের অপেক্ষা করতে হলো সেজন্যে। এর মধ্যে গুরুদেব গৌরীদেবীর মাকে ডেকে বললেন, —'মেয়েটাকে ছাড়তে চাই না। ছেলেটিকে দেখবো আমি, 'নটীর পূজা' অভিনয়ের পরে। মেয়েটিকে আমাদের এখানেই বিয়ে দিয়ে রাখতে চাই।' তখন কিন্তু বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। কলকাতায় 'নটীর পূজা' অভিনয় হলো ওঁদের পাকা-দেখার পরে।

নন্দলাল একদিন প্রথম গেলেন পাত্র দেখতে বাগবাজারের আশুতোষবাবুর বাড়ি। যথারীতি কথাবার্তার পরে তিনি বললেন, —'আমি কন্যাদায়গ্রস্ত, আপনারা দয়া করে মেয়েটিকে নিন। আমি দরিদ্র মাস্টার লোক, দেনা-পাওনা দয়া করে কম করতে হবে।' পাত্র দেখলেন; পাত্রের নাম শ্রীসন্তোষকুমার ভঞ্জচৌধুরী। এর পরে কিছুদিনের মধ্যেই পাত্র গেলেন মেয়ে দেখতে নন্দলালদের রাজাবাগানের বাড়িতে। কথা কইলেন পাত্রের ভাবী দিদিশাশুড়ী। ভাবী শ্বশুরের সঙ্গেও পাত্রের চাক্ষুষ পরিচয় হলো ঐ সময়ে। এর আগে মাসিক পত্রে প্রকাশিত তাঁর ছবির সংগ্রহে সন্তোষচন্দ্রের এ্যালবাম ভরে গেছে।

'নটীর পূজা' কলকাতায় অভিনীত হবে। গুরুদেব নন্দলালকে জিজ্ঞেস করলেন, —'কি, তোমার মেয়ে কলকাতায় স্টেজে যাবে, তোমার আপত্তি আছে কি?' নন্দলাল উত্তর দিলেন, —'মেয়ের ব্যাপার তো, তার মাকে জিজ্ঞাসা করুন।' মাকে ডাকলেন। মা বললেন, —'আপনি যখন নাচাবেন তখন আমার অমত থাকতে পারে না।' উত্তর শুনে গুরুদেব বললেন,—'বেশ তো, তোমার সব দায়িত্ব আমার উপর দিচ্ছো। আচ্ছা, আমি দেখবো। আমি নিজে 'উপালি' সেজে স্টেজে ঢুকবো। তা-হলে আর কেউ কিছু বলতে পারবে না।'—তার উপরে কলকাতায় স্টেজে পালির ভূমিকায় কবিকে দেখা গেল। শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনয়ে এ ভূমিকা ছিল না।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'নটীর পূজা' অভিনয় হলো ১৩৩৩ সালের ১৪ই, ১৫ই ও ১৭ই মাঘ। কবি তাঁর 'নটীর পূজা' নাটকের প্রথম ছাপা গ্রন্থখানি গৌরীদেবীকে উপহার দিলেন ২৩-এ মাঘ ওঁদের বিবাহ-বাসরে।

বইখানি নন্দলালের চিত্রশোভিত আর শ্রীমতী প্রতিমা দেবী বেনারসী চেলি দিয়ে বইখানি বাঁধিয়ে দিলেন। কবি স্বহস্তে এই গ্রন্থখানিতে আশীর্বাদ লিখে দিলেন—

কবির আশীর্বাদ

নটরাজ নৃত্য করে নিত্য নব সৌন্দর্যের নাটে,
বসন্তে পুষ্পের রঙ্গে, শস্যের তরঙ্গে মাঠে মাঠে।
তাঁহারি অমৃত নৃত্য, হে গৌরী, তোমার অঙ্গে মনে,
চিত্তের মাধুর্য তব, ধ্যানে তব, তোমার লিখনে॥

২৩ শে মাঘ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩৩৩

—এ-ছাড়া দিলেন 'নটীর পূজা' নাটকের মূল হস্তলিপিখানি। কিন্তু কবি গৌরীদেবীর কাছে হস্তলিপিখানি পুনরায় ফেরত চাইলেন। তখন গৌরীদেবীর ভয় করছে, 'মন ধুক্‌ধুক্ করছে' যদি কবি ওটি নিয়ে আর না দেন। শেষে, মায়ের সাহস পেয়ে তিনি গেলেন কবির কাছে। কবি ওঁকে দেখে বললেন, —'তুই তো ভারী বোকা মেয়ে। দে, বইটা আমাকে। কিছু লিখে দি। নইলে দেওয়ার সাক্ষী কে থাকবে। লোকে বলবে, অপরের দ্রব্য তুমি অপহরণ করেছ।'

সকৌতুকে কবি এই কথাগুলি বলে খাতাখানি নিয়ে তামার থালায় যে কবিতাটি লিখে খোদাই করে দিয়েছিলেন, সেইটিই আবার লিখে দিলেন। কবির 'নটীর পূজা'র এই মূল হস্তলিপিখানি হলো ৩৫ পৃষ্ঠার, সাইজ হলো ১১"×৯", রুল টানা আলগা কাগজের পৃষ্ঠা। কাটাকুটিতে চিত্রও করা রয়েছে অনেক। তামার থালায় যে উপহারটি দিলেন সেটি অপূর্ব। তাম্রপাত্রে রুপোর পদ্মের ওপরে আশীর্বচন খোদাই করিয়ে দিলেন। এই উপহার দেওয়ার তারিখও হলো ওদের বিয়ের দিন, —২৩ মাঘ ১৩৩৩। পাঠান্তর-সমেত রচনাটি এই,—

ওঁ

কল্যাণীয়া গৌরীকে

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ—

নটরাজ নৃত্য করে নিত্য নব সুন্দরের নাটে,
বসন্তের পুষ্পরঙ্গে, শস্যের তরঙ্গে মাঠে মাঠে।

তাঁহারি অমৃত নৃত্য, হে গৌরী, তোমার অঙ্গে মনে,
চিত্তের মাধুর্য তব, ধ্যানে তব, তোমার লিখনে ॥

শুভবিবাহ উপলক্ষে নন্দলালের কন্যাকে অবনীবাবু দামী উপহার দিলেন। তিনি দিলেন ভারী একগাছা সোনার হার। আর নিজের আঁকা ছবি দিলেন —'বার্ধক্যের ভাবনা'। বিবাহের পরে নবদম্পতি আচার্য অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে গেলেন —জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। ওঁরা প্রণাম করার পরে, অবনীবাবু ঘরের দেওয়ালে খাটানো একটি ছবির দিকে দেখিয়ে বললেন, —'কে, চিনতে পার? তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেম।' —এই বলে তিনি দেওয়াল থেকে ছবিখানি নামিয়ে এনে শ্রীমতী গৌরীর হাতে দিলেন। ওঁরা অবাক হয়ে দেখলেন, সে হলো গৌরীদেবীরই পোর্ট্রেট্।

ওঁদের বিবাহের সময়ে নন্দলাল তন্ময় হয়ে ছবি আঁকছেন। সে প্রকাণ্ড ছবি এবং পরে হলো বহুবিখ্যাত ছবি —'প্রতীক্ষা'। পেন্‌সিল-স্কেচের ছবি যে এত সুন্দর হতে পারে তা আগে কল্পনা করা যায়নি। বিয়ের সময়ে উপহার দিলেন —'ঝড়'। এ ছবির বিবরণ আমরা আগে দিয়েছি। সুরেন্দ্রনাথ ঐ সময়ে ছবি উপহার দেননি; আত্মীয়-ব্যবহার করেছিলেন। নন্দলালের সতীর্থ-গোষ্ঠী সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শৈলেন দে, ক্ষিতীন মজুমদার প্রমুখ সকলে এক-একখানি নিজেদের আঁকা ছবি দিয়েছিলেন। মুকুল দে-ও তাঁর আঁকা ছবি দিয়েছিলেন। আচার্য নন্দলালের জ্যেষ্ঠা কন্যা গৌরীদেবীর বিবাহ নন্দলালের কলকাতায় রাজাবাগানের বাড়িতে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়ে গেল ১৯২৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি শ্রীপঞ্চমী —সরস্বতী পূজার দিনে।

গৌরী-মার স্কুলে আর সিস্টার নিবেদিতার স্কুলে পড়েছিলেন তিনি। বাবা যখন দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতনে এলেন, তাঁর সঙ্গে প্রথম এসেছিলেন এখানে। উত্তর-বিভাগে সিক্‌সথ্ ক্লাসে ভরতি হলেন। থার্ড ক্লাসে উঠে কলাভবনে যোগ দিলেন। পড়াতেন জগদানন্দবাবু, তেজুবাবু, ধীমুদা, নরেন নন্দী, প্রমথ বিশী, শশধরবাবু, নেপালবাবু, প্রমদাবাবু, হরিচরণবাবু —এঁরা সব। ভীমরাও শাস্ত্রী সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি শেখাতেন। দিনুবাবু শেখাতেন গান। নাচ শেখা শুরু হলো নবকুমারের ক্লাসে। বৈকালে ক্লাস হতো খেলার সময়ে।

১৯২২ সালের শেষ দিকে কলাভবনে ভরতি হলেন তিনি পনেরো বছর বয়সে। বনকাটি, লাউসেন-গড় থেকে শুরু করে বাবার সঙ্গে কলাভবনের দলে

বীরভূমের সব জায়গায় শিক্ষা-ভ্রমণে গিয়েছিলেন তিনি। ফ্রেস্কোয় পিতাকে সাহায্য করেছেন 'দ্বারিকে', 'সন্তোষালয়ে' আর 'গুরুকুলে'।

॥ শান্তিনিকেতনের কথা ॥

১৯২৭ সালের শুভ শ্রীপঞ্চমীর দিনে আচার্য নন্দলালের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গৌরীদেবীর শুভবিবাহ নিষ্পন্ন হলো কলকাতায় হাতিবাগানের বাড়িতে। এই বিষয়ে বিশদ বিবরণ পূর্ব পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে শান্তিনিকেতনের শান্তিময় অবিচ্ছিন্ন জীবন-প্রবাহ সহসা থেমে যাবার যো হলো। অর্থাভাবে কবির আশ্রমে প্রায় অচলাবস্থা। বলা বাহুল্য, কবির মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এই সময়ে রাজপুতানার দেশীয় রাজ্য ভরতপুরের মহারাজা কিষণ সিংহ কবিকে অনুরোধ জানালেন হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হবার জন্যে। দারুণ গ্রীষ্মে কবি রওনা হলেন। এই সময়কার বিশ্বভারতী সম্পর্কে কবির মনের কথা তাঁর একখানি পত্রে প্রকাশ পেয়েছে: 'আজ (১৪ চৈত্র ১৩৩৩) রাত্রে এগারোটার গাড়ীতে আমি ভরতপুর রওনা হচ্ছি।...বিশ্বভারতীর দাবী, দয়ামায়া নেই। অথচ বিশ্বভারতী জিনিসটা যে কোন্ শূন্যে আছে তার চিহ্নও দেখতে পাচ্ছিনে। যে মানুষদের নিয়ে কাজ করছি তাদের নিষ্ঠার মধ্যে নেই—তাদের স্বপ্নের মধ্যেও আছে কিনা সন্দেহ। বস্তুত বিশ্বভারতীর মর্মকথাটা কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দানা বাঁধবার মতো পদার্থ নয়—এখন ওটা নানা দেশে নানা লোকের হৃদয়ের মধ্যে কাজ করছে। লোকে যে সহায়তা করছে না তার কারণ এর মধ্যে তারা সত্যের মূর্তি দেখতে পাচ্ছে না।...এখন সত্য উপলব্ধির আনন্দ আমাদের কাছ থেকে দূরে, অথচ তার উপকরণের দীনতা প্রতিদিনই আমাদের পীড়ন করছে। দুঃখের ভার প্রায় একলা আমারই মাথায়'।

ভরতপুরে বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে কবির অর্থকৃচ্ছ্রতার সুরাহা হলো না। ভরতপুর থেকে কবি এলেন আগ্রা। সেখানে আওয়াগড়ের মহারাজার অতিথি হলেন। আওয়াগড়ের মহারাজা ছিলেন কবির অকৃত্রিম সুহৃৎ। বিশ্বভারতীতে তিনি বহু হাজার টাকা দান করেন নিঃশর্তভাবে। শান্তিনিকেতনে তাঁর তৈরি অট্টালিকাটিও তিনি বিশ্বভারতীকে দান করেছিলেন। এই আওয়াগড়-প্যালেসে এখন থাকেন বিশ্বভারতীর উপাচার্যগণ। আগ্রা থেকে কবি গেলেনজয়পুর। জয়পুর

থেকে আহমেদাবাদ। আহমেদাবাদে কবি উঠলেন গিয়ে তাঁর গুণগ্রাহী ও সুহৃৎ অম্বালাল সরাভাইয়ের বাড়ি। অম্বালালের গৃহিণী সরলা সরাভাই শান্তিনিকেতনের আদর্শে তাঁর নিজের বাড়িতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে বাড়ির ছেলেমেয়েদের সেখানে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমেদাবাদ থেকে কবি বোলপুরে ফিরলেন চৈত্রমাসের শেষ দিকে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে যথাসময়ে বর্ষশেষ ও নববর্ষ (১৩৩৪) উদ্‌যাপন করলেন। কিন্তু আর্থিক অনটন কবিকে পীড়া দিয়েই চলেছে। এই সময়ে 'বিচিত্রা' নামে একটি মাসিকপত্র বের করবার উদ্‌যোগ চলছিল। 'অভাবের' এবং 'লোভের' তাড়নায় কবি তাঁদের 'ফাঁদে' ধরা দিলেন। এই সময়ে কবির যেমন অর্থকষ্ট বিশ্বভারতীরও 'তদবস্থা'। এই সময়ে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও কর্মীরা স্বেচ্ছায় তাঁদের সে-যুগে স্বল্পতম বেতনেরও শতকরা দশ টাকা কমিয়ে নিলেন। শান্তিনিকেতনে পুরাতন বিদ্যালয় বা পাঠভবন চলছিল। নতুন কলেজ বা শিক্ষাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৬ সালে। খরচ কমাবার জন্যে আর কর্ম-পরিচালনার সুবিধার আশা করে পাঠভবন আর শিক্ষাভবন এক করে শিক্ষা-বিভাগ রূপে গড়া হলো।—(Annual Report 1927, p.21)। গরমের ছুটীর সময়ে বিদ্যালয় বন্ধ হলে কবি গেলেন কলকাতা।

॥ আচার্য নন্দলালের তারকেশ্বর-ভ্রমণ, ১৯২৭ ॥

কলকাতায় জ্যেষ্ঠা কন্যার শুভবিবাহ সম্পন্ন করে নন্দলাল এলেন শান্তিনিকেতনে। এই সময়ে শিল্পীর মনে নটীর পূজার সফলতার রেশ। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে তিনি নটীর পূজার প্রমাণ ছবি (৬৩"×৩৪") আঁকতে শুরু করলেন। আঁকলেন ওয়াশ টেম্পেরায়। এ ছাড়া ১৯২৭ সালে তাঁর প্রধান চিত্রকর্ম হলো টেম্পেরায় আঁকা সবুজ তারা। কালিতে টাচের কাজ হলো পাইন গাছ আর রূপালী কাগজে একটু রং দিয়ে আঁকলেন বুদ্ধ—শালগাছের আড়ালে। লাইনে আঁকলেন শ্রীচৈতন্য। পেনসিলে আঁকলেন তাঁর বিখ্যাত ছবি প্রত্যাবর্তন —সাঁওতাল দম্পতির। এ-ছবিটি নটীর পূজার চেয়েও বড়। সাইজ হলো ৮১"×৪৭½"। সাঁওতাল দম্পতির প্রত্যাবর্তনের এই আলেখ্যটি আচার্য নন্দলাল উপহার দিয়েছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী

গৌরীদেবীর শুভবিবাহ উপলক্ষে। সে-কথা আমরা আগে বলেছি।

বাণীপুরে থাকতে নন্দলালের একবার কঠিন আমাশয় হয়েছিল। রোগের প্রকোপে তিনি কঙ্কালসার হয়ে প্রায় মরণাপন্ন। ডাক্তার বদ্যিতে উপশম হলো না। পিসিমা মানত করলেন তারকেশ্বরের তারকনাথকে। কাশীতে তাঁর পিসিমা তখনও জীবিত। তিনি নন্দলালকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর মানতের কথা। সেটা শোধ করা উচিত। নন্দলাল মনস্থ করলেন, এই (১৯২৭) গরমের বন্ধে তারকেশ্বর ঘুরে আসা যাক। তাতে দু-টো কাজ হবে। হরিপাল-জেজুরে গিয়ে তাঁর পূর্বপুরুষের ভিটে দেখা যাবে আর তারকেশ্বরে বাবা তারকনাথের মানত শোধও করা হবে। নতুন দেশ দেখা তো উপরি লাভ। তিনি বেরিয়ে পড়লেন শান্তিনিকেতন থেকে সপরিবারে শেওড়াফুলি হয়ে তারকেশ্বরের পথে। তারকেশ্বর দেখার সময়ে শিল্পী নন্দলালের তাঁর পিতৃপুরুষের জন্মভূমির আশপাশের দ্রষ্টব্য গ্রামগুলিও ঘুরে ঘুরে দেখে নেবার ইচ্ছে হলো।

বসু রামানন্দ ঠাকুরের পাট কুলীনগ্রামে গেলেন নন্দলাল। কুলীনগ্রাম একটি বিখ্যাত বৈষ্ণব শ্রীপাট। কুলীনগ্রামের পরম বৈষ্ণব বসুবংশের খ্যাতি বৈষ্ণব সাহিত্যে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কুলীনগ্রামের বসুবংশ আচার্য নন্দলালদের সঘর। এঁরাও দশরথ বসুর বংশ। দশরথ বসু থেকে তেরো পুরুষ নিচে কুলীন-গ্রামের মালাধর বসু। ইনি ভাগবতের দশম-একাদশ স্কন্ধ অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছিলেন —শ্রীকৃষ্ণবিজয়। শ্রীকৃষ্ণবিজয় হলো প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার আদিকাব্য। ১৪৭৩ থেকে ১৪৮০ খৃস্টাব্দের মধ্যে এই কাব্য লেখা হয়েছিল। কবি মালাধর গৌড়েশ্বর সামস্-উদ্-দীন ইউসুফ শাহের কাছ থেকে উপাধি পেয়েছিলেন 'গুণরাজ খাঁ'। কুলীনগ্রামের এই বসুবংশকে শ্রীচৈতন্যদেব অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন আর প্রাণের সমান ভালবাসতেন। গুণরাজ খাঁয়ের ছেলে লক্ষ্মীকান্ত, সত্যরাজ খাঁ। তাঁর ছেলে বসু রামানন্দ ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ সহচর। কুলীনগ্রামবাসীদের সংকীর্তনের দল ছিল একটি। পুরীতে জগন্নাথদেবের রথের আগে আগে শ্রীচৈতন্যদেব যখন নৃত্য করেন সেই সময়ে এই কুলীনগ্রামের কীর্তনসমাজও সেই নৃত্যগীতে অংশ নিয়েছিলেন। একবার জগন্নাথ দেবের উল্টোরথের সময়ে একটি পট্টডোরী বা রজ্জু ছিঁড়ে যায়। শ্রীচৈতন্যদেব ঐ পট্টডোরীর টুকরোটি নিয়ে রামানন্দ বসুর হাতে দিয়ে তাঁকে সেই পট্টডোরীর

'যজমান' হতে আদেশ দিয়ে বলেছিলেন, প্রতি বৎসর তাঁকে 'ডোরী' তৈরি করে আনতে হবে। সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত কুলীনগ্রামের বসুবংশ রথের সময়ে জগন্নাথদেবের পট্টডোরী জুগিয়ে আসছেন। আজও কুলীনগ্রাম থেকে পট্টডোরী না পৌঁছলে পুরীতে জগন্নাথদেবের রথ টানা হয় না।

যবন হরিদাস বা পরমভক্ত ব্রহ্ম-হরিদাস ঠাকুর কুলীনগ্রামে বাস করেছিলেন বহুদিন। কুলীনগ্রামের দক্ষিণদিকে একটি নির্জনস্থানে হরিদাস ঠাকুর সাধন-ভজন করেছিলেন। এখন এর নাম হয়ে আছে হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ি। এই পাটবাড়ির মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে গৌরাঙ্গদেবের আর হরিদাস ঠাকুরের। যে কেলিকদম্বতলায় হরিদাস ঠাকুর বসতেন সে-গাছ আজও রয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব পুরী যাবার পথে কুলীনগ্রাম এসেছিলেন। প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে গৌরাঙ্গদেবের আগমন স্মরণ করে আর মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষ করে এখানে মেলা আর মহোৎসব হয়।

শিল্পী নন্দলাল কুলীনগ্রামের প্রাচীন কীর্তিগুলি মনোযোগসহকারে দেখে নিলেন। এখানে রয়েছে শৃগালমুখী শিবানী দেবীর, গোপেশ্বর মহাদেবের, মদন-গোপালজীউ আর গোপীনাথের মন্দির। এটি সমধিক প্রসিদ্ধ। আদ্যাশক্তি শিবানী দেবীর মূর্তিটি পাথরের। মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল ১০৪১ খৃস্টাব্দে। শিবানী মন্দিরের পাশ দিয়ে একটি মরা নদীর সোঁতা রয়েছে—নাম ছিল জুলকুলা বা কংস নদী। গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি কুলীনগ্রামের বিখ্যাত গোপালদীঘির নৈঋতে। মন্দিরটি ১৬৬৬ শকাব্দে চৈতন্যপুর গ্রামের নারায়ণ দাস সংস্কার করিয়ে দিয়েছিলেন।

চৈতন্যপুরে কুলীনগ্রামের বসুবংশের বাড়ি ছিল। চৈতন্যদেবের নাম থেকেই এই নাম হয়ে থাকবে। এই গাঁয়ের চারদিকে গড় ছিল। লোকে বলে—'রামানন্দ ঠাকুরের গড়বাড়ি'। গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের অলিন্দে কষ্টিপাথরের একটি বৃষ আছে। বৃষটি প্রায় দেড় হাত লম্বা আর এক হাত উঁচু। সত্যরাজ খাঁ নিজ শিলামূর্তি আর এই বৃষটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বৃষটির কারুকার্য অতি সুন্দর। শিবচতুর্দশীতে গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের কাছে একটি বিরাট মেলা বসে।

কুলীনগ্রাম পূর্বে শক্তি-উপাসনার কেন্দ্র ছিল। শিবানীদেবীর মন্দির

দেখে এ-কথা মনে করা স্বাভাবিক। মালাধর, লক্ষ্মীকান্ত, রামানন্দ— কুলীনগ্রামের গৌরব। এঁদেরই কৃতিত্বে কুলীনগ্রাম তীর্থস্থল। বসু রামানন্দকে শ্রীচৈতন্যদেব ডাকতেন 'সখা' বলে।

মদনগোপাল, রঘুনাথ, কৃষ্ণরায়, গোপীনাথ, গোবিন্দ, জগন্নাথ, ভুবনেশ্বরী দেবদেবীর মন্দির বসুবংশের কীর্তি। রথ ও দোলযাত্রা উপলক্ষে মদনগোপাল গোপীনাথ আর জগন্নাথমন্দিরে সমারোহ আর যাত্রীসমাগম হয়ে থাকে। কাছেই জোগ্রামে একটি খুব উঁচু শিখরযুক্ত শিবমন্দির আছে। শিবের নাম জলেশ্বর। একটি বিশাল ভগ্নস্তূপের উপরে জৈনপদ্ধতিতে নির্মিত এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল সম্ভবতঃ দশম শতাব্দ। জোগ্রামে বর্ধমান মহাবীরের আর্হৎলাভের স্মৃতি রয়েছে বলে এখনকার পণ্ডিতেরা মনে করেন। শিল্পী নন্দলাল কুলীনগ্রামের কীর্তিসমূহের প্রত্নাবশেষ পর্যবেক্ষণ করে তারকেশ্বরের পথে রওনা হলেন।

পথে পড়লো সিঙ্গুর আর হরিপাল। এই অঞ্চলেই তাঁর পিসিমায়েদের বাড়ি ছিল। সিঙ্গুর হলো তারকেশ্বর শাখা-লাইনের শেওড়াফুলি আর কামারকুণ্ডু জংশন ছাড়িয়ে নালিকুল স্টেশনের পরে। সিঙ্গুর হাওড়া থেকে ২১ মাইল। সিঙ্গুরের প্রাচীন নাম সিংহপুর।

অনেকের ধারণা, এই হলো সিংহবাহুর রাজধানী। সিঙ্গুরের কাছাকাছি অনেকগুলি উঁচু ঢিপি আর জাঙ্গাল রয়েছে। এ-সব খুঁড়ে দেখলে এখানকার বর্মরাজগণের ইতিহাস পাওয়া যাবে; সিঙ্গুরের বসুমল্লিকদের সঙ্গে জেজুরের বসুপরিবারের দূরসম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল।

হরিপাল॥ তারকেশ্বর শাখা-লাইনে কামারকুণ্ডু আর তারকেশ্বরের মাঝামাঝি স্টেশন হলো হরিপাল। হাওড়া থেকে ২৮ মাইল দূরে। হরিপাল একটি প্রাচীন স্থান। এর পুরানো নাম হলো—সিম্পল। 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামে পুরানো সংস্কৃত গ্রন্থে এই স্থানের বর্ণনা রয়েছে। রাজা কুল-পালের দুই ছেলে—হরিপাল আর অহিপাল। হরিপাল সিংহপুর বা সিঙ্গুরের পশ্চিমদিকে হাটবাজার পত্তন করিয়ে আর দীঘি সরোবর কাটিয়ে একটি মহাগ্রাম স্থাপন করেন। এবং গ্রামটির নিজের নামে নাম রাখেন—হরিপাল। রাজা হরিপালের কন্যা কানড়ার বীরত্বকাহিনী ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর মধ্যে স্থান পেয়েছে। তার বিবরণ আমরা আগে দিয়েছি।

তারকেশ্বর ॥ তারকেশ্বর হলো হাওড়া থেকে ৩৬মাইল দূরে —বায়ুকোণে। বাঙ্গালাদেশের একমাত্র চন্দ্রনাথ ছাড়া তারকেশ্বরের মতন বিখ্যাত শৈবতীর্থ আর নাই। তারকেশ্বরের পুরাতন নাম হলো — 'তাড়েশ্বর'। ওড়িয়া ভাষায় 'তাড়'শব্দের মানে হলো তাল। অর্থাৎ তালগাছপ্রমাণ প্রোথিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গ —তাড়েশ্বর। শুদ্ধ সংস্কৃতে —তারকেশ্বর। তারকেশ্বরের তারকনাথ শিব স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বলে প্রসিদ্ধ। এখন যেখানে মন্দির করা হয়েছে, আগে ওখানটা ছিল জঙ্গলে ঢাকা আর তার চারদিকে ছিল নিচু জলার জঙ্গল। বেশির ভাগ ছিল নল আর খাগড়ায় ভরতি। তার মধ্যে উঁচু ডাঙ্গাটির নাম ছিল —'সিংহল দ্বীপ'। এই দ্বীপেরই জঙ্গলে বিরাজ করছিলেন পাথরের স্বয়ম্ভুলিঙ্গ তারকনাথ বা আদ্যিকালের —'তাড়পিশাচ'। গাঁয়ের রাখাল ছেলেরা এই শিবলিঙ্গটিকে সাধারণ পাথর ভেবে তার ওপর ধান কুটতো মনের আনন্দে। ফলে, শিবলিঙ্গের মাথায় উদূখলের গড়ের খোপর [ছিয়াপাড়ি'] হয়ে গেল। সে-গর্ত বাবা তারকনাথের মাথায় দেখা যায় আজও।

স্থানীয় বর্ধিষ্ণু গোয়ালা ছিলেন মুকুন্দ ঘোষ। একদিন তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর একটি দুধালো গাই বনের ভেতরে একটা পাথরের ওপর দুধ ঢালছে। সেদিন রাত্রে বাবা তারকনাথ স্বপ্নে দেখা দিয়ে মুকুন্দ ঘোষের কাছে আত্মপরিচয় দিলেন। আর আদেশ করলেন মুকুন্দ ঘোষ যেন সন্ন্যাসী হয়ে তাঁর সেবায় নিযুক্ত হন। সেই মুকুন্দ ঘোষ থেকেই বাবা তারকনাথের প্রথম প্রকাশ আর মুকুন্দ ঘোষই হলেন তাঁর প্রথম সেবক। তারকনাথের মন্দিরের পাশে মুকুন্দ ঘোষের সমাধি রয়েছে আজও। তীর্থযাত্রীরা বাবা তারকনাথের পূজো দিয়ে মুকুন্দ ঘোষের সমাধিতেও পূজো দিয়ে থাকেন।

হুগলী জেলার বাহিরগড়ের ক্ষত্রিয় রাজা ভারামল্ল বা বরাহমল্ল মুকুন্দ ঘোষের আবিষ্কার-করা তারকনাথের মন্দির তৈরি করিয়ে দেন। জৈন রাজা ভারা-মল্ল সংসার ত্যাগ করে তারকনাথের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আর তাঁর পূজোর জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন সন্ন্যাসী মোহান্তকে। তারকেশ্বরের কাছাকাছি ভারামলপুর গাঁ আজও এই রাজার নামের স্মৃতি বহন করছে। ভারামল্লের পরে, বর্ধমানের রাজাও স্বপ্নে আদেশ পেয়ে বাবা তারকনাথের জন্যে একটি মন্দির তৈরি করিয়ে দেন। আর দেব-সেবার জন্যে বহু ভূসম্পত্তি

দান করেন। এই রকম দানের ফলে বাবা তারকনাথের ভূসম্পত্তি হয় অনেক। মুকুন্দ ঘোষের পরে, দশনামী-সম্প্রদায়ের 'গিরি' উপাধিধারী সন্ন্যাসীরা তারকেশ্বরের মোহান্তের পদ পেয়েছিলেন। নানা অনাচারের জন্যে পরে পশ্চিমা এই মোহান্তসম্প্রদায়কে অপসারিত করা হয়। ১৯৪০ সালের দিকে দণ্ডাস্বামী জগন্নাথ আশ্রম মহারাজ নামে একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসীকে মোহান্তের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

তারকনাথের মন্দিরের পাশে 'দুধ পুকুর' নামে একটি পুকুর আছে। [সম্প্রতি (১৯৮৩) এই পুকুর থেকে বেলে পাথরে তৈরি অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলি পালযুগের নির্মাণ বলে মনে হয়।] এই পুকুরে স্নান করে যাত্রীরা তারকনাথকে দর্শন ও পূজা করে থাকেন। কাছেই আর-একটি মন্দিরে রয়েছেন দেবী দশভূজা। মন্দিরের সামনে নাট-মন্দির। নাট-মন্দিরে মনস্কামনা পূর্ণ আর রোগমুক্তির আশা করে বহু নরনারী ধর্না দিয়ে থাকেন। তারকেশ্বরে প্রতিদিন বহু যাত্রীর সমাগম হয়ে থাকে। তবে সবচেয়ে বেশি জনসমাগম হয় শিবরাত্রি আর চৈত্রসংক্রান্তির সময়ে। তারকেশ্বর একটি জংশন স্টেশন। এখান থেকে সে-সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রেলপথের ছোট গাড়িতে করে হুগলী জেলার দশঘরা, ধনেখালি, মগরা হয়ে গঙ্গাতীরে ত্রিবেণী পর্যন্ত যাওয়া যেত। দশঘরা থেকে আর একটি শাখা-লাইন বর্ধমান জেলার চকদীঘি ও জামালপুর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

তারকেশ্বর-তীর্থে অনেক অনাচার ছিল, এখন সে-সব নাই বললেই হয়। এখন এ-টি একটি আদর্শ তীর্থস্থান। বাঁধানো রাস্তা, নলকূপের জল, বিজলী আলো ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকায় যাত্রীদের আর কোন-রকম অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। এখানে একটি ধর্মশালা আর পাণ্ডাদের পরিচালিত বহু যাত্রীনিবাস আছে।

নন্দলাল তারকেশ্বরে গিয়ে উঠেছিলেন ধর্মশালায়। ওখানে কাজ ছিল মানত শোধের ব্যাপারে। দুধ পুকুরে স্নান করে মানত-শোধের উপচার নিয়ে ঢুকতে যাচ্ছেন মন্দিরে, গায়ে ছিল ফতুয়া জামা। পাণ্ডারা গায়ে জামা দেখে হাঁ হাঁ করে এলেন। পাণ্ডারা বললেন, দেবতার কাছে দো-ছুট চলবে না, আসতে হবে এক-ছুটে। অর্থাৎ জামা খুলে স্রেফ ধুতি পরে

আসতে হবে। পাণ্ডাদের এই কথা শুনে নন্দলালের জেদ চেপে গেল। তিনি বললেন, —'জামা খুলতে হয় তো, কাপড়ও খুলে ফেলবো'। তখন পাণ্ডারা বেগতিক দেখে জামা-সমেত নন্দলালকে মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তাঁর মানত-শোধ সমাপ্ত হলো।

পূজার কাজ সেরে শিল্পী নন্দলাল শৈবতীর্থের আশপাশ দেখতে লাগলেন ঘুরে ঘুরে। স্কেচ করলেন অনেক। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে —খড়ের ঘরের দাওয়ায় বাঁশের সিঁড়ি। ঐ ঘরে গাজন-চড়কে সন্ন্যাসীদের ভরের সময়ে বাণফোঁড়া হয়ে থাকে। তিনি স্কেচ করলেন বাঁশের সিঁড়ি বা মই আর ভরের অবস্থায় বাণফোঁড়ার দৃশ্য। নন্দলাল তারকেশ্বর গিয়েছিলেন ১৯২৭ সালের (১৩৩৩) চৈত্রসংক্রান্তির সময়ে। (দ্রষ্টব্য স্কেচবুক, প্রথম পর্যায়, সংখ্যা ৬, স্কেচ-সংখ্যা ৪৫)।

॥ কবির কর্মপ্রবাহ, ১৯২৭ ॥

চন্দননগরে মতিলাল রায় প্রবর্তক-সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছেন। অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে প্রতি বৎসর সেখানে উৎসব হয়। এ বছর ঐ উৎসবে সভাপতিত্ব করবার জন্যে, আর ১৩৩০ সাল থেকে প্রবর্তিত জাতীয় মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবার জন্যে কবি চন্দননগরে গিয়েছিলেন। কবি সেখানে সংঘের মন্দির দেখলেন। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কেবল ওঁ-কার। এ-ছাড়া, চন্দননগরে কবি দানবীর হরিহর শেঠের প্রতিষ্ঠিত 'কৃষ্ণভামিনী বালিকা বিদ্যালয়' পরিদর্শন করেন। নিত্যগোপাল-স্মৃতিমন্দির নামে পাবলিক হলে আর গ্রন্থাগারে জনসাধারণের পক্ষ থেকে কবির সংবর্ধনা হলো। মেয়র নারায়ণচন্দ্র দে বিশ্বভারতীর জন্যে কবিকে এক হাজার টাকা দান করলেন।

চন্দননগর থেকে কবি কলকাতায় ফিরে, গেলেন শিলঙ-এ। অম্বালাল সরাভাই এবারে শিলঙ-এ কবির বসবাসের জন্যে ব্যবস্থা করেছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাহাঙ্গীর ভকিল প্রমুখ কেউ কেউ শিলঙ পাহাড়ে গিয়েছিলেন। শিলঙ-এ বসে কবি 'যোগাযোগ' উপন্যাস লেখা শুরু করলেন। উপন্যাস ছাড়া গুটিকয়েক কবিতাও লিখলেন —'নূতন', 'শুকসারী,' 'সুসময়' আর 'দেবদারু'। এই সময়ে আচার্য নন্দলাল কবিকে চিত্রলিপি পাঠিয়েছিলেন। আচার্য নন্দলালের 'শুকসারী' আর 'দেবদারু' আঁকা পত্র পেয়ে কবি তার উত্তরে

এই কাব্যলিপি দু-টি রচনা করলেন। নন্দলালের উদ্দেশে লেখা কবিতার ভূমিকায় একস্থানে কবি লিখলেন, —'মহাকালের চরণপাতে হিমালয়ের প্রতিদিন ক্ষয় হচ্ছে, কিন্তু দেবদারুর মধ্যে যে প্রাণ, নব নব তরুদেহের মধ্য দিয়ে যুগে যুগে এগিয়ে চলবে।' 'দেবদারু' কবিতাটি 'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।

শিলঙ-এ থাকার সময়ে কবির ইচ্ছা হলো, দ্বীপময় ভারত —যবদ্বীপ, মালয়, বালী, সিয়াম ইত্যাদি দেখতে যাবার। ১৯২৬ সালে য়ুরোপ-ভ্রমণের সময়ে বিশিষ্ট ওলন্দাজ ও জাভানীরা কবিকে এই সব দ্বীপের প্রাকৃত শোভা আর ঐতিহাসিক স্থাপত্যকীর্তি দেখে আসবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। য়ুরোপ থেকে ফিরে মালয় উপদ্বীপ থেকেও কবি আমন্ত্রণ-পত্র পান। পাথেয় জোগালেন ঘনশ্যামদাস বিড়লা আর নারায়ণদাস বিজোরিয়া। দ্বীপময় ভারতে যাবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবি লিখছেন, —'সেখান থেকে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এবং এ-সম্বন্ধে গবেষণার স্থায়ী ব্যবস্থা করা ছাড়া আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্যই নেই। আমি নিজে বোধ করি অতি অল্প দিনই থাকব এবং যদি সাধ্যে কুলোয় তবে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্যে রেখে দিয়ে আসব। কাজটাকে আমি গুরুতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করি, এবং এ-ও জানি আমার দ্বারা কাজটা সহজসাধ্যও হতে পারে। জাভা গভর্নমেণ্ট আমাকে নিমন্ত্রণ করেন নি। সেখান থেকে যাঁদের উৎসাহ পেয়েছি তাঁরা পুরাতত্ত্ববিৎ —আমাদের দেশের পণ্ডিতদের সহযোগিতা পেয়ে তাঁদের সন্ধানকার্যের সুবিধা হতে পারবে। —এ-চিঠি কবি লিখেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ১৯২৭ সালের ২৮-এ মে। ঘনশ্যামদাস বিড়লা কবির পাথেয় বাবদ অর্থ সাহায্য করলেন বালীদ্বীপে হিন্দুধর্ম এবং জাভাদ্বীপে বৌদ্ধ স্থাপত্যভাস্কর্যের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। চীন থেকে ফেরার পরে কবির সহযাত্রী ডক্টর কালিদাস নাগ কলকাতায় Greater India Society স্থাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই 'বৃহত্তর ভারত পরিষদের' প্রথম সভাপতি।

দ্বীপময় ভারতে যাত্রার আগে বৃহত্তর-ভারত-পরিষদ থেকে কবিকে বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হয়। আচার্য যদুনাথ সরকার ছিলেন এই সভার

সভাপতি। কবি এই সময়ে লেখা তাঁর একখানি পত্রে বলছেন, —'ভারতবর্ষের বিদ্যা একদিন ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছিল।…বাইরের লোক তাকে স্বীকার করেছে। তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, মালয়দ্বীপ সকলে ভারতবর্ষ জ্ঞানধর্ম বিস্তার করেছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক সত্যসম্বন্ধের পথ দিয়ে। ভারতবর্ষের সেই সর্বত্র প্রবেশের ইতিহাসের চিহ্ন দেখবার জন্যে আজ আমরা তীর্থযাত্রা করেছি। সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা প্রচার করেনি। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্যকে সকল দিকে উদ্‌বোধিত করেছিল, স্থাপত্যে ভাস্কর্যে চিত্রে সংগীতে সাহিত্যে ; তারই চিহ্ন মরুভূমি অরণ্যে পর্বতে দ্বীপে দ্বীপান্তরের দুর্গম স্থানে দুঃসাধ্য কল্পনায়। …এ জরাজীর্ণ কৃশপ্রাণ বৃদ্ধের বাণী নয়, এর মধ্যে পরিপূর্ণ প্রাণ বীর্যবান যৌবনের প্রভাব।'

কলকাতা থেকে কবি রেলপথে মাদ্রাজ যাত্রা করলেন ১২ই জুলাই। এবারে কবির দল বেশ ভারী। শান্তিনিকেতনের কলাভবনের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর, তরুণশিল্পী অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক আর্যনায়কম্ এর আগেই মালয় গেছেন। কবি যাবেন জাভা, বালী, সেইজন্যে আগে গেছেন বাকে সাহেব সস্ত্রীক। বাকে ছিলেন ডাচ্। ভারতীয় সঙ্গীত নিয়ে গবেষণা করবার জন্যে তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছেন। কবির এই ভ্রমণবৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন আচার্য সুনীতিকুমার তাঁর 'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থে। কবির 'যাত্রী' গ্রন্থেও অনেক খবর আছে।

১৪ই জুলাই মাদ্রাজ থেকে জলপথে ওঁরা রওনা হলেন সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুর পৌঁছলেন ২০-এ জুলাই। সিঙ্গাপুরে সাতদিন কাটলো। ২৬-এ জুলাই সদলে কবি যাত্রা করলেন মালাক্কা। মালাক্কা থেকে কুআলা-লুম্পুর। এখান থেকে গেলেন ইপোঃ। তারপর তাইপিন ; সেখান থেকে পিনাঙ্। সেখান থেকে আট মাইল দূরে তাঞ্জঙ-বুঙাঃতে রইলেন কবির সঙ্গীরা। মালয় ভ্রমণ শেষ হলো ১৬ই অগাস্ট। মালয় থেকে ওঁরা চললেন ইন্দোনেশিয়ায় —বালী ও জাভা দ্বীপে। ভারতের সঙ্গে এদেশের সংস্কৃতির ছিন্ন যোগসূত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় কবির মন কল্পনায় রঙিন। সুমাত্রা জাভা দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে একদা একটি বিরাট হিন্দুরাজ্য ছিল —নাম ছিল —'শ্রীবিজয়'। সেই পুরানো ইতিহাস শুনে কবির মনে যে ভাবোদয় হলো তা তিনি কবিতায় প্রকাশ করলেন। জাভা দ্বীপের বন্দরে

নেমে কবি ও তাঁর সঙ্গীরা গেলেন বাতাবিয়া বা বর্তমান জাকার্তায়। কবি ও তাঁর সঙ্গীরা উঠলেন একটি হোটেলে। বাতাবিয়া থেকে ওঁরা বন্দরে ফিরে বালীদ্বীপ-গামী জাহাজে উঠলেন। পূর্ব-জাভার বিশিষ্ট শিল্পকেন্দ্র ও বন্দর সুরবায়ায় এলেন। ২৬-এ অগাস্ট তাঁরা বালীদ্বীপের বন্দর বুলেলঙ-এ এলেন। বালী হচ্ছে ভারতের বাইরে একমাত্র দেশ যেখানে হিন্দুধর্ম এখনো জীবন্ত। অধিবাসীদের শতকরা নব্বই জন হিন্দু। বালীদ্বীপে কবির গন্তব্য হলো বাঙ্‌লি নামে একটি স্থান। (রবীন্দ্রজীবনীকার অনুমান করেন, পূর্বদ্বীপাবলীর বাঙ্‌লি বা বঙ্‌গ শব্দের সঙ্গে আমাদের বঙ্গদেশের নামের যোগ আছে। বঙ্গ শব্দের একটি মানে হলো রাং বা tin।) কবি বাঙ্‌লিতে গিয়ে সেখানকার রাজবাড়িতে একটি শ্রাদ্ধোৎসব দেখলেন। শ্রাদ্ধোৎসবের যাত্রাভিনয় দেখলেন। সে-যাত্রাভিনয় বাঙ্গালাদেশের যাত্রাভিনয়ের মতন। বালীদ্বীপের রাজার [কারেম আসেম] প্রাসাদে গেলেন। কারেম আসেমের রাজা ওঁদের জন্যে বালীদ্বীপের নৃত্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বালী ও জাভার নৃত্যকলা কবি দেখলেন খুব আগ্রহের সঙ্গে। নৃত্যসহযোগে অভিনয় বালী-নৃত্যের বৈশিষ্ট্য। কবি লিখেছেন, —'এ দেশে উৎসবের প্রধান অংশ নাচ।···এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে।···এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায় তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখেছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলায়-ফেরায়, যুদ্ধ-বিগ্রহে, ভালোবাসার প্রকাশে, এমন-কি ভাঁড়ামিতে, সমস্তটাই নাচ। সেই নাচের ভাষা যারা ঠিকমতো জানে তারা বোধ হয় গল্পের ধারাটা ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারে।··রাজবাড়িতে আমরা নাচ দেখছিলুম।··এই নাচ-অভিনয়ের বিষয়টা হচ্ছে শাল্ব-সত্যবতীর আখ্যান। এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা-বর্ননাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে।···এদের নাচের মধ্যে শুধু ছন্দ থাকলে তাতে আখ্যান বর্ননা চলে না, সংকেতও আছে, এই দুইয়ের যোগে এদের নাচ। এই নাচে রসনা বন্ধ করে এরা সমস্ত দেহ দিয়ে কথা কইছে ইঙ্গিতে এবং ভঙ্গী সংগীতে।'

কারেম আসেম থেকে ওঁরা এলেন গিয়াঙা। রাজবাড়ির অতিথি। রাত্রে কবির জন্যে রাজা মুখোশ-পরা অভিনয় দেখানোর ব্যবস্থা করেন। মুখোশ-নৃত্য

ও অভিনয়ের রীতি আসামে, ওড়িষ্যার সরাইখেলে, বাঙ্গালাদেশের পুরুলিয়া অঞ্চলে আছে। আবার চীন-জাপানেও আছে। জাভা-বালীদ্বীপেও রয়েছে।… এখান থেকে ওঁরা গেলেন বাদুঙ। বাদুঙের কাছে উবুদ নামে একস্থানে আর-একটি শ্রাদ্ধোৎসব দেখলেন এঁরা। এখানকার নৃত্যরতা মেয়েদের শোভাযাত্রা দেখে শিল্পী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হলেন। কবিও এই শোভাযাত্রা দেখলেন। বালীদ্বীপের নৃত্যনাট্য ও নৃত্যপরা মেয়েদের শোভাযাত্রা পরবর্তী কালে শান্তিনিকেতনের নৃত্য উৎসবাদিতে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল।

বাদুঙ থেকে এলেন ওঁরা মুণ্ডুক। ওখান থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর ফিরলেন বুলেলঙ বন্দরে। ওখান থেকে জাহাজে করে যাত্রা করলেন জাভা। ৯ই সেপ্টেম্বর জাভার বন্দর সুরবায়া পৌঁছলেন। থাকবার ব্যবস্থা হলো 'মংকুগসরো' উপাধিধারী এক রাজার বাড়িতে। এই সময়ে এখানকার চিনি ভারতবর্ষের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য ছিল। কবি তিন দিন এখানে ছিলেন। ওখান থেকে তাঁর সঙ্গীরা গেলেন কাছেই মজপাহত নামে একটি পুরানো স্থান দেখতে। রাত্রে কবি স্থানীয় কলাভবনে আর্ট সম্পর্কে ভাষণ দিলেন। ১২ই সেপ্টেম্বর সুরবায়া ছেড়ে ওঁরা গেলেন শূরকর্তা। রাজবাড়ির অতিথি হলেন। রাজাদের উপাধি—মংকুনগরো। এখানে কবি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন জাভানী নৃত্য আর ছায়া-অভিনয় দেখে। অধিক রাত্রি পর্যন্ত কবি এই নৃত্য দেখলেন। জাভানী মেয়েদের নাচ দেখে কবি লিখলেন,—'এমনতরো বাহুল্যবর্জিত সুপরিচ্ছন্নতার সামঞ্জস্য আমি কখনও দেখিনি।…জাপানে ও জাভাতে যে নাচ দেখলুম তার সৌন্দর্য যেমন, তার শালীনতাও তেমনি নিখুঁত।' শূরকর্তার রাজপ্রাসাদে কবি-সংবর্ধনা উপলক্ষে যে নৃত্য হলো, তাতে রাজকন্যারাও যোগদান করেন। একদিন রাজার ভাই একলা নাচলেন। তিনি ঘটোৎকচের ভূমিকায় নাচলেন—নাচের বিষয় হলো প্রিয়তমা ভার্গবীকে স্মরণ করে বিরহীর ঔৎসুক্য।

১৮ই সেপ্টেম্বর ওঁরা শূরকর্তা ছেড়ে চললেন—যোগকর্তা। পথে প্রাম্বানাজ। বোরোবুদুরের মতন এই স্থানটি হিন্দুসভ্যতার এক উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। এখানকার ভাঙ্গা মন্দিরগুলি দেখবার জন্যে ওঁরা নামলেন। কবি বলছেন,—'জায়গাটা ভুবনেশ্বরের মতো মন্দিরের ভগ্নস্তূপে পরিকীর্ণ। ভাঙ্গা পাথরগুলি জোড়া দিয়ে দিয়ে ওলন্দাজ গবর্নমেন্ট মন্দিরগুলিকে তার সাবেক মূর্তিতে গড়ে তুলছেন।' যোগকর্তায় পাকু আলম উপাধিধারী রাজবাড়ির অতিথি। এখানে প্রধান

ব্যক্তি সুলতান। সুলতানের মন্ত্রী তাঁর নিজের বাড়ির আর সুলতানের বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিয়ে রামায়ণের জটায়ুবধের অভিনয় দেখালেন। এখানে শান্তিনিকেতনের আদর্শে সূর্যলিঙের বিদ্যালয় দেখলেন ওঁরা।

যোগকর্তায় তিন দিন থেকে ওঁরা গেলেন বোরোবুদুর স্তূপ দেখতে। দু-জন ওলন্দাজ পণ্ডিত ভালো করে ব্যাখ্যা করবার জন্যে সঙ্গে ছিলেন। বোরোবুদুর দেখে ফেরবার পথে চললেন বাতাবিয়া বা জাকার্তা। পথে বাণ্ডুঙ। এখানে তিন দিন কাটলো। এখান থেকে বাতাবিয়া ফিরে ৩০-এ সেপ্টেম্বর জাভাদ্বীপ ছেড়ে সিঙ্গাপুর হয়ে সিয়াম চললেন।

সিঙ্গাপুর থেকে পিনাঙ্ যাত্রা করলেন। ৫ই অক্টোবর পিনাঙ্ পৌঁছলেন। পিনাঙ্ থেকে সমুদ্রের খাড়ি পার হয়ে ওয়েলেসলি শহরের স্টেশন থেকে সিয়াম রাজকীয় রেলপথে ওঁরা ৮ই অক্টোবর সিয়ামের রাজধানী ব্যাংকক পৌঁছলেন। এখানে প্রিন্স দামনোগ রাজানুভবের বাড়িতে তাঁর বিখ্যাত আর্টসংগ্রহ দেখলেন। ১৫ই অক্টোবর ব্যাংকক ত্যাগ করে ওঁরা ভারত অভিমুখে যাত্রা করলেন। ২৭-এ কলকাতায় ফিরে এলেন। আচার্য নন্দলাল তখন শান্তিনিকেতনে। এদেশে তখন সাহিত্যে শিল্পে দর্শনে সর্বত্রই কালবদলের মাতাল হাওয়া উদ্বেলিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালীদ্বীপ ও শ্যামদেশে (থাই-ভূমি) ভ্রমণ করে এসে আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার 'ভ্রমণের বিবরণ' 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩৪ সালের ভাদ্র মাস থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাস পর্যন্ত। পরে, সুনীতিকুমার ১৩৬৭সালে এই রচনাগুলি গ্রন্থাকারে 'দ্বীপময় ভারত' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথের কৃত একাধিক স্কেচ্ এবং অসংখ্য আলোকচিত্র রয়েছে। গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেছেন তিনি আচার্য নন্দলালকে। তাঁর উৎসর্গপত্রের পাঠে শিল্পাচার্যের রেখা-সম্পাতে ভাষাচার্যের শিল্প-মূল্যায়নের স্বাক্ষর রয়েছে।—

॥ ওঁ নমঃ শিবায় নম উমায়ৈ ॥
॥ ওঁ নমো বিষ্ণবে নমঃ শ্রিয়ৈ ॥

ভারতের জীবনের ও ভারতের দেব-কল্পনার অন্তর্নিহিত
সত্যশিব ও সুন্দরের অভিনব শিল্পের প্রকাশ
রূপে রেখায় বর্ণে যিনি করিয়াছেন,
নিজ গুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথে

স্বীয় এবং শিষ্যগণের কৃতির দ্বারা
ভারতের লুপ্তপ্রায় শিল্পধারার পুনরুজ্জীবন করিয়া
বিশ্বমানব-সভায় ভারতের সংস্কৃতির আসন
যিনি পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,
সাহিত্যে 'বাক্-পতি' কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ
শিল্পে যাঁহার স্থান,
মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে অন্যতম প্রধান শিল্পনেতা
সেই বিশ্বন্ধর ও যুগন্ধর সিদ্ধশিল্পী
'রূপ পতি' শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু
মহাশয়ের করকমলে
এই গ্রন্থ
স্বীয় শ্রদ্ধা প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার ক্ষুদ্র নিদর্শন স্বরূপ
গ্রন্থকার কর্তৃক সাদরে সমর্পিত হইল।
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
'সুধর্মা ; বালিগঞ্জ, কলকাতা, ভাদ্র সংক্রান্তি, পূর্ণিমা ১৩৪৭॥

১৩৪৪ সালের ১০ই কার্তিক কবি সদলে দেশে ফিরলেন। সামনে বিশ্ব-ভারতীর সমস্যা। অর্থসমস্যা আর আভ্যন্তরীণ পরিচালন-সমস্যা। কবি দেশে ফিরলেন ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে। গত বৎসর বসন্তোৎসবের দিনে শান্তিনিকেতনে নটরাজের আহ্বান-গীতিকা নৃত্যচ্ছন্দে অভিনীত হয়েছিল। দ্বীপময় ভারত ঘুরে এসে কবি সেটিকে বদলিয়ে, কেটে ছেঁটে, নতুন গান সংযোগ করে 'ঋতুরঙ্গ' নাম দিয়ে কলকাতার স্টেজে অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। অভিনয় হলো ১৯২৭ সালের ৮ই ডিসেম্বর। ঋতুরঙ্গের অভিনয়ে নৃত্যকলার বৈশিষ্ট্য ছিল। বালী ও জাভা দ্বীপের নৃত্যকলা কবি খুঁটিয়ে দেখে এসে-ছিলেন, এই অভিনয়ে তার প্রভাব সুস্পষ্ট। পূর্বদ্বীপের নৃত্য দেখে কবি শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে বিশদ বিবরণ দিয়ে ও আলোচনা করে চিঠি লিখতেন। শান্তিনিকেতনে মেয়েদের নৃত্যশিক্ষা দেবার জন্যে মণিপুরী ও দক্ষিণী নৃত্যশিক্ষক নিযুক্ত থাকলেও কবিগুরুর গানের ভাব ভাষা ও সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নৃত্য-ভঙ্গিকে রূপদানের শক্তি তাদের তেমন ছিল না। এই ব্যাপারে পরিচালনা করতেন প্রতিমা দেবী। শ্রীমতী প্রতিমা দেবী এই বিষয়ে বলেন, —

'ঋতুরঙ্গের কিছু পূর্বে গুরুদেব জাভা যাত্রা করেছিলেন। জাভানী নৃত্যের নানাবিধ ছবি এবং নৃত্যসাহিত্য তাঁর সঙ্গে দেশে এসেছিল, আর এসেছিল সেখানকার কলানৈপুণ্যের প্ররোচনা। সেই সূত্রে আমাদের ছেলেমেয়েদের জাভানী নৃত্যপদ্ধতি আয়ত্ত করবার সুযোগ হয়েছিল। সেইজন্যে ঋতুরঙ্গের নাট্যসংযোজনা এবং সাজসজ্জার মধ্যে জাভানী আভাস বর্তমান ছিল এবং সুরেনবাবুর রচিত স্টেজের মধ্যেও জাভানী স্থাপত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।'

এই অভিনয়ে নটরাজের ভূমিকায় নেমেছিলেন শান্তিনিকেতন-কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র বাসুদেব মেনন। বাসুদেব গত বছর দোলপূর্ণিমার উৎসবে নটরাজের ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর নাচ দেখে অবনীবাবু বললেন,— বাসুদেব ব্রোঞ্জের মূর্তিটি যেন, ব্রোঞ্জের নটরাজ জীবন্ত হয়ে স্টেজে নেচে গেল।

শান্তিনিকেতনে পৌষ-উৎসব সমাপ্ত হলো। কলাভবনের অধ্যক্ষ আচার্য নন্দলালের এবার পরিকল্পনা পাহাড়পুর ঘুরে আসার। এই বিষয়ে শ্রীহরিদাস মিত্রের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছিল। ওখানকার টপোগ্রাফি জেনেছিলেন। হরিদাসবাবু পাহাড়পুরে খননকার্যের অধ্যক্ষ কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত মহাশয়ের মাধ্যমে এঁদের দেখাবার সমস্ত ব্যবস্থা করেন। উভয়ের কথা উভয়ের কাছেই তিনি অনেক বলেছিলেন। নন্দলাল, সুরেন্দ্রনাথ এবং কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পাহাড়পুর রওনা হলেন।

॥ পাহাড়পুর-ভ্রমণ, ১৯২৭ ২৮ ॥

কলকাতা-শিলিগুড়ি লাইনে কলকাতা থেকে ১৯০ মাইল দূরে বগুড়া জেলার জামালগঞ্জ স্টেশন। জামালগঞ্জ থেকে তিন মাইল পশ্চিমে রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর। পাহাড়পুর বাঙ্গালাদেশের অতীত গৌরবের এক প্রধান নিদর্শন। স্টেশন থেকে লোকালবোর্ডের কাঁচা রাস্তা। যেতে হয় গরুর গাড়িতে কিংবা হেঁটে। নন্দলাল হেঁটে যাওয়ারই পক্ষপাতী, গেলেন হেঁটেই। ওঁরা যখন ওখানে যান তখন সেই সবে ভারতসরকারের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পূর্বচক্রের অধ্যক্ষ দীক্ষিতসাহেব বরেন্দ্র-সমিতির আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এখানে আশি ফুট উঁচু প্রকাণ্ড একটি ইঁটের

স্তূপের আশেপাশে খননকার্য চালাচ্ছেন। এটি একটি বৌদ্ধবিহার। পাহাড়পুর নামটি হালফিলের। খনন করবার আগে এখানকার জঙ্গলে ঢাকা বিরাট স্তূপটি পাহাড়ের মতো দেখাতে বলে জায়গাটির নাম হয় পাহাড়পুর। এখানকার পুরানো নাম হলো—সোমপুর। এখানকার ভগ্নস্তূপের মধ্যে থেকে একটি মুদ্রা 'seal' পাওয়া গেছে। তাতে লেখা আছে—'সোমপুর ধর্মশালা বিহার'। পাহাড়পুরের কাছাকাছি একটি গাঁয়ের নাম রয়েছে—'ওমপুর'। মহাস্থানগড় বা প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন থেকে বায়ুকোণে ৩০মাইল দূরে ছিল এই বিরাট বিহার বা সঙ্ঘারাম। প্রাচীন কোটিবর্ষ থেকে অগ্নিকোণে এর দূরত্ব হলো ৩০মাইল। পণ্ডিতেরা অনুমান করে থাকেন, নগরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে শান্তি ও নির্জনতার মধ্যে ভিক্ষুগণ যাতে ধর্ম-সাধনায় মগ্ন থাকতে পারেন সেইজন্যে এই জায়গায় এই মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পালবংশের রাজা ধর্মপাল এই মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পাহাড়পুরের প্রধান স্তূপটির মন্দির বা মহাবিহারটির গঠনরীতি খুবই আশ্চর্য। ভারতের স্থাপত্যশিল্পে এই নিদর্শন নতুন। ভারতে এই রকম পদ্ধতি অন্যস্থানে দেখা যায় না। কিন্তু, ব্রহ্মদেশে, কাম্বোডিয়াতে, জাভাদ্বীপে যে-সব বিরাট মন্দির রয়েছে, তাতে কিন্তু এই পাহাড়পুরের আদর্শই গ্রহণ করা হয়েছে বলে স্থির বিশ্বাস হয়। জাভাদ্বীপের বোরোবুদুর, প্রাম্বানম্, কিংবা কাম্বোডিয়ার অঙ্কুরভাট ইত্যাদি পৃথিবীবিখ্যাত মন্দিরগুলির গঠন-রীতির সঙ্গে পাহাড়পুরের সোমপুর-মহাবিহারের গঠনরীতির সাদৃশ্য থেকে স্পষ্টই প্রমাণ হয়, পূর্বএশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতাবিস্তারে বাঙ্গালাদেশের দান অনেকখানি। আচার্য নন্দলাল এবং সুরেন্দ্রনাথ পাহাড়পুরের স্তূপ দেখে তুলনামূলক আলোচনা করতে লাগলেন। সুরেন্দ্রনাথ সবে দ্বীপময় ভারত থেকে ঘুরে এসেছেন।

পালরাজত্বের প্রথম যুগে দ্বীপময় ভারতের সঙ্গে পূর্বভারতের ঘনিষ্ঠতার কথা একটি তাম্রশাসন থেকে জানা গেছে। তাম্রশাসনটি পাওয়া গেছে নালন্দায়। কেউ কেউ অনুমান করেন, পাহাড়পুরে মহাবিহার প্রতিষ্ঠার আগে ওখানে বা ধারে কাছে চতুর্মুখ জৈনমন্দির ছিল এবং অংশতঃ তারই আদর্শে এখানে পরে বৌদ্ধ বিহার তৈরি হয়েছিল। পাহাড়পুরের সঙ্গে জৈনদের সম্পর্ক ছিল, তার প্রমাণ এই স্তূপ খোঁড়বার সময়ে ভালভাবেই পাওয়া গেছে। যাই হোক

চতুর্মুখ জৈন-মন্দিরের সঙ্গে এই বিহারটির প্রাথমিক আকৃতিগত কিছু সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু, এর তিনটি তল আর প্রতি তলে প্রদক্ষিণ-পথ ইত্যাদি নানা বিষয়ে এর মৌলিকত্ব ও বিশেষত্ব রয়েছে।

প্রধান মন্দির বা বিহারটি ঘিরে পাহাড়পুরের বিরাট সমচতুর্ভুজ সঙ্ঘারাম। এর প্রত্যেকটি ভুজ বাইরে ৮২২ফুট করে লম্বা। বৌদ্ধভিক্ষুদের জন্যে এত বড়ো সঙ্ঘারাম ভারতবর্ষে আর কোথাও তৈরি হয়নি। এতে সারি সারি চারটি ভুজে ১৮৯টি কুঠুরি আর ঢোকবার মুখে একটি বড়ো দালান। কুঠুরিগুলির সামনে ৮।৯ ফুট লম্বা একটা বারাণ্ডা ঘুরে গেছে। এই কুঠুরিগুলির মধ্যে ৯২টিতে উঁচু পূজার বেদী রয়েছে। একটি মহাবিহারের কাছে সঙ্ঘারামের মধ্যে আলাদা আলাদা এতোগুলি পূজাস্থান থাকবার উদ্দেশ্য কি জানা যায় না।

সঙ্ঘারামের পূর্বদিকে এবং এর বাইরের প্রাচীর থেকে প্রায় ১০০ফুট দূরে ছোট্ট একটি স্তূপ ছিল। নাম ছিল তার সত্যপীরের ভিটা। সেই স্তূপটি খুঁড়ে একটি মন্দির পাওয়া গেছে। সে-মন্দিরে ছিল তারামূর্তি। এর সঙ্গে পরে একটি লোককথা জুড়ে যাওয়ায় এর নাম হয়েছিল সত্যপীরের পীঠ। গল্পটি হলো এই, এখানকার রাজা ছিলেন মহীদলন। তাঁর কন্যা সন্ধ্যাবতীর পুত্র হলেন সত্যপীর। সত্যপীর ছিলেন একজন বিশিষ্ট ধার্মিক আর সাধু ব্যক্তি। একবার এখানে ভীষণ বন্যা হয়েছিল। তাতে নাকি সত্যপীর ভেসে গিয়েছিলেন। সঙ্ঘারামের বাইরের প্রাচীর থেকে ১৬০ফুট অগ্নিকোণে একটি পুরাতন স্নানঘাট পাওয়া গিয়েছে। লোকে বলে, রাজকন্যা সন্ধ্যাবতী এই ঘাটে প্রতিদিন স্নান করতেন। লোকবিশ্বাসে, সত্যপীরকে কেন যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে অন্য কথা।

পাহাড়পুরে পালযুগের আগেকার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। যাইহোক পণ্ডিতেরা বলেন, এই মহাবিহার সঙ্ঘারাম ইত্যাদি পালযুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল —অষ্টম শতাব্দে। পাহাড়পুর মহাবিহারের পাদমূলে চারদিকে পাথরের গায়ে ৬৩টি মূর্তি উৎকীর্ণ করা রয়েছে। মূর্তিগুলি অপূর্ব। পূর্বভারতে এর তুলনা নেই। পালযুগের বিস্ময়কর ভাস্কর্যশিল্পের সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায় এই সব মূর্তিতে। পালযুগের প্রসিদ্ধ ভাস্কর ধীমান ও বীতপাল এর পরে নবম শতাব্দের লোক। বিংশ শতাব্দে আচার্য নন্দলাল

ও সুরেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে এই প্রাচীন শিল্পকলা প্রত্যক্ষ করে আত্মস্থ করে নিলেন। শান্তিনিকেতনে ফেরার পরে পাহাড়পুরের এই সকল মূর্তির প্রেরণায় তাঁরা যে টেরাকোটা কাস্ট্ তৈরি করলেন, তার নিদর্শন তাঁদের প্রিয় কলাভবনে, সন্তোষালয়ের স্নানের কূয়ার তিন পাশে ভিত্তিচিত্রে শোভা পাচ্ছে।

পাহাড়পুরে কয়েকটি খোদাই-করা পাথরের থাম পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটি হলো রাজা মহেন্দ্রপালের সময়কার। তিব্বতী সাহিত্য থেকে জানা যায়, নয় থেকে বারো শতাব্দ পর্যন্ত এই সোমপুর মহাবিহার তিব্বতীদের একটি বিশিষ্ট তীর্থস্থান ছিল। অতীশ দীপঙ্করের তিব্বতী জীবনচরিতে লেখা আছে, তিনি বহু বছর সোমপুরবিহারে বাস করেছিলেন। অতীশ দীপঙ্করের গুরু ছিলেন সোমপুর-বিহারের মহাস্থবির রত্নাকর শান্তি। সোমপুর-বিহারে কয়েকজন ভিক্ষু দান করেছিলেন। সে-কথা নালন্দা ও বুদ্ধগয়া থেকে পাওয়া খোদাই-করা লিপি থেকে জানা গেছে।

সেকালে এই বিহারের পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে যেতো। এখনো নদী-তীরের ঘাট আর ঘাটের লাগাও ভাঙ্গা-মন্দিরের অবশেষ দেখা গেল। নদীর পশ্চিমতীরে চারদিকে উঁচু দেওয়াল-দেওয়া গড়ের মাঝখানে মূল অধিষ্ঠানটি রয়েছে। উত্তরের দেওয়ালের মাঝখানে রয়েছে প্রধান প্রবেশদ্বার। এই প্রবেশ-পথের ঠিক সামনে গড়ের মাঝখানে প্রধান অধিষ্ঠানের প্রকাণ্ড সিঁড়ি। ঐ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় দোতলায়। এই তলায় একটি প্রদক্ষিণ-পথ রয়েছে। পথের চারধারে নক্সা-করা টালিতে (plaques) মানুষ, নানা রকম জীব-জন্তুর ছবি, পঞ্চতন্ত্র আর হিতোপদেশের গল্প উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বানর-কীলক-কথা, সিংহ-শশক-কথা, শবর-শবরী নৃত্য, সঙ্গীতা-পহৃতচিত্ত মাতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর কিছু উপরে একটি থামে শিলা-লিপি পাওয়া গেছে। তা থেকে জানা যাচ্ছে, কনৌজের গুর্জর-প্রতীহার-বংশের রাজা মহেন্দ্রপালদেবের সময়ে এই মন্দিরের কিছু অংশের সংস্কার করা হয়। পাহাড়পুরে আর একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। তাতে লেখা আছে, ১৫৯ গোপ্তাব্দে অর্থাৎ গুপ্তবংশের সম্রাট বুধগুপ্তের সময়ে এখানে একটি জৈন মন্দির ছিল। পাহাড়পুরের মন্দিরের ভিত খোঁড়বার সময়ে পাথরে তৈরি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে অনেক। তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জুনভঙ্গ, ধেনুকাসুরবধ, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি,

গিরিগোবর্ধনধারণ, চানূরমুষ্টিকবধ ইত্যাদি কৃষ্ণলীলার মূর্তিগুলি অতি আশ্চর্য। এ-ছাড়া রামায়ণের বালীবধ, বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধ, মহাভারতের সুভদ্রাহরণ, শিবের বিষপান, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির মূর্তি মন্দিরের প্রাচীরে ও পাদমূলে শোভা পাচ্ছে। এ-ছাড়া মাছ, হাতি, শঙ্খ, ময়ূর, গোধিকা, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতির অপূর্ব কারুকার্যযুক্ত প্যানেল পাওয়া গেছে। এখানে রাধাকৃষ্ণের যে অনুপম মূর্তিটি পাওয়া গেছে এই হলো প্রাচীনতম যুগলমূর্তি। আচার্য নন্দলাল এই যুগলমূর্তিটিকে নানাভাবে তাঁর আঁকা রাধাকৃষ্ণ-চিত্রের রেখায় রূপায়িত করেছেন। এখানকার 'শিবের বিষপান' তাঁর 'শিবের বিষপান' ছবিটির প্রেক্ষাপট হয়েছে।

হিন্দুশাস্ত্রের মতে বাড়ি, মন্দির ইত্যাদির প্রবেশদ্বার উত্তরমুখী হওয়া শুভ। পাহাড়পুরের মন্দিরের প্রবেশদ্বারও উত্তরমুখী। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির তৈরি টেরাকোটাতে যে সব জীবজন্তুর মূর্তি রয়েছে সেগুলি হলো —মাছ, শুশুক, কুমীর, নানারকম সাপ, শাঁখ, ঝিনুক, এই সব। এবং এইসব প্রাণী বাঙ্গালাদেশের এবং বাঙ্গালীর চিরপরিচিত। এ থেকে প্রমাণ হয়, পাহাড়পুরের বিহার মন্দিরাদি সবই বাঙ্গালী স্থপতি আর ভাস্করের কীর্তি।

পাহাড়পুর গিয়ে ওঁরা তাঁবু ফেলেছিলেন মূল বিহারের গেটের কাছে ধানক্ষেতের ধারে। ওঁদের দলটিও ছিল ভারী। আচার্য নন্দলালের সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সুধীরা দেবী, গুরুদেবের কন্যা শ্রীমতী মীরা দেবী, নেপালবাবু, সুরেনবাবু, লাল সাহেব, পুত্র বিশ্বরূপ, কলাভবনের ছাত্রী ইন্দুসুধা, অনুকণা প্রভৃতি। দীক্ষিত সাহেব মেয়েদের জন্যে অতি সহৃদয় ব্যবহার করেছিলেন নিজের বাথরুম ছেড়ে দিয়ে। ৭ই পৌষের পরে ডিসেম্বরের শেষদিকে (১৯২৭) ওঁরা রওনা হয়েছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে। পাহাড়পুরে ওঁরা গিয়ে খুব শীত পেলেন —কনকনে শীত। ওখানে সব দেখতে দেখতে ওঁদের ৭।৮ দিন দেরি হয়ে গেল। ১৯২৮সালের জানুয়ারির প্রথম দিকে পাহাড়পুরের বিবরণ দিয়ে আচার্য নন্দলাল পাখা-ওয়ালা মুরগী এঁকে পত্র পাঠিয়েছিলেন খুব খুশি হয়ে শন্তিনিকেতনে শ্রীহরিদাস মিত্র মহাশয়কে। পাহাড়পুর থেকে ওঁরা পতিসর হয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এখানে সকলে তাঁদের এই বিলম্বে অধৈর্য হয়ে

উঠেছিলেন। স্বয়ং গুরুদেব উদ্‌গ্রীব, দিনেন্দ্রনাথ অধৈর্য হয়ে হরিদাস বাবুর কাছে সন্ধান নিচ্ছেন ঘন ঘন। —'কোথায় ওঁদের পাঠালেন, মশায়?'

পাহাড়পুর থেকে ওঁরা পতিসর রওনা হলেন। আত্রাই নদী দিয়ে প্রায় দেড় দিন যেতে হলো নৌকো করে। এই নৌকো-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা খুবই অদ্ভুত। আত্রাই স্টেশনে সন্ধ্যার দিকে ওঁরা যখন ট্রেন থেকে নামলেন তখন 'মামাবাবু' অর্থাৎ নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় ঘোড়া ছুটিয়ে স্টেশনে এসেছেন ওঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে। ওঁরা রওনা হলেন নৌকোয়। সারি সারি তিনখানা নৌকো চললো ভেসে। পরের দিন ওঁরা পতিসরের ঘাটে যখন গিয়ে পৌঁছলেন তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। আত্রাই নদী দিয়ে যাবার সময়ে মাঝরাতে একটি গ্রামে এক বর্ধিষ্ণু বাড়িতে ওঁদের আদর-আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনা খুবই ভাল লেগেছিল। রাত্রে একটু বিশ্রাম করে আবার নৌকো ছাড়া হয়েছিল ভোর রাতে। আত্রাই নদী আঁকা-বাঁকা। যেখানে বাঁক ঘুরছে, মামাবাবু ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানেই এসে হাজির। আর ঠাকুরবাবুদের জমিদারিতে গাঁয়ের মাতব্বর প্রজারা ভেট আনতে লাগলেন দফায় দফায় থরে থরে। নৌকো বোঝাই হয়ে গেল!

পতিসরে কাছারিবাড়ির সামনে প্রকাণ্ড ঘাটে ওঁদের নৌকো ভিড়লো। সঙ্গে ছিলেন জমিদারকন্যা মীরা দেবী। এঁরাও গেছেন সব মাননীয় অতিথি। বিশেষ করে সঙ্গে মীরা দেবী। বোধহয় সেইজন্যেই সম্মানের জন্যেই পর পর ৯টি তোপ দাগা হলো। আহার বিশ্রামাদির পরে গ্রাম ঘুরতে বেরুলেন। পাবনা জেলার গ্রাম। নৌকো করে বেড়াতেন। গ্রামগুলি টিলার ওপর। বাকি নিচু জলা জমি। ওঁরা কেউ কেউ ছিলেন বোটে —গুরুদেবের বোটে। আর কেউ কেউ এবং বিশেষ করে মেয়েরা ছিলেন কাছারিবাড়িতে। হাতিতে চড়া হলো একদিন। হাতি চড়ে গ্রাম ঘোরা হলো। নন্দলাল খুবই উৎফুল্ল। খাবার দাবার এলাহি। চার-পাঁচদিন কাটলো এখানে। নন্দলাল অনেক স্কেচ্‌ করলেন এখানকার।

পতিসরের পালা শেষ করে আচার্য নন্দলাল দলবল নিয়ে শান্তিনিকেতন রওনা হলেন। নৈহাটী হয়ে, বর্ধমান হয়ে ওঁরা ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে।

২৪সংখ্যক ডায়েরি থেকে জানা যাচ্ছে, এই সময়ে শান্তিনিকেতনে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ লাঠিখেলা শিখছেন। এতে লাঠিখেলার প্যাঁচ-পোঁচ লেখা আছে।

পুলিন দাসের শিষ্য এসেছিল একজন। তিনি শেখাতেন।

৯সংখ্যক স্কেচবুক থেকে দেখছি, পতিসরে (১৯২৮) গ্রামের লোকের ছবির স্কেচ্ করা আছে। ১৯২৮সালে ঐ সময়ে পতিসর হয়ে ওঁরা কালী গ্রামেও গিয়েছিলেন। এই স্কেচ্‌বুকে স্কেচ্ রয়েছে —ইন্দুসুধা স্কেচ্ করছেন। পতিসর কালীগ্রাম ঘোরা হলো। সান্তাহার, সান্তাহারের পথে সাজাদপুর (স্কেচ্‌সংখ্যা ৭৭)। ওখানে পোকন মাঝীর ছবি করা রয়েছে।

৭সংখ্যক স্কেচ্‌বইয়েও পতিসরের, তারকেশ্বরের স্কেচ্ রয়েছে কতকগুলি। তারমধ্যে পতিসর গ্রাম আর আত্রাইনদীতে ওঁদের যাত্রাপথ বিশেষভাবে আঁকা রয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের ১৮সংখ্যক স্কেচ্‌বইএ এই সময়কার (১৯২৭) আত্রাই শিলাইদহের স্কেচ্ রয়েছে। একটি স্কেচ্ হলো, মাকড়সার জালে সকালে শিশিরবিন্দু পড়ে গহনার মতো দেখাচ্ছে। মাথার গহনা। মাথায় জালের গহনায় মুক্তা ঝোলানো যেন।

১৯২৮সালের গোড়ার দিকেই আচার্য নন্দলাল পাহাড়পুর, পতিসর ভ্রমণ সেরে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন দলবল নিয়ে। ১৯২৮সালে তাঁর বিখ্যাত ছবি কয়েকটি আঁকলেন। ওয়শে আঁকলেন 'নেপালী ভাস্কর'। আঁকলেন 'ঝড়' —তিনটি মেয়ে ঝড়ে পড়েছে, সাইজ ২৪½"×১৩"। আঁকলেন 'বৃহন্নলা'। সি. এফ. এ্যাণ্ড্রুজের প্রতিকৃতি (১০½"×১৪¾") আঁকলেন। আঁকলেন — 'গোপিনী'। শ্রীনিকেতনে 'হলকর্ষণ উৎসবে'র দেওয়ালচিত্র করা হলো এই বছরে। টেম্পেরাতে আঁকলেন 'বরযাত্রা' (৬½"×৪½")। রঙে টাচের কাজ হলো 'কৃষ্ণচূড়া ফুল' (২৪¼"×১৩½")। লাইন ড্রয়িং-এ আঁকলেন 'ভেড়া বাঁধে বুদ্ধ' তৃতীয় পর্যায়ে; এই ছবিটির সাইজ ১৩"×৭½"। লাইনে আর করলেন শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসবের দেওয়াল-চিত্রের কার্টুন। কাঠখোদাই করে আঁকলেন বৃক্ষরোপণ উৎসবের শোভাযাত্রা (১২"×৫½")।

॥ আশ্রমসংবাদ ॥

১৯২৮সালের ৬ই জানুয়ারি কবি ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে। নন্দলালদের ফিরতে আরও দু-তিন দিন দেরি হলো। ৬ই তারিখে বিকেলে স্পেশাল ট্রেনে শান্তিনিকেতন দেখতে এলেন নিখিল-ভারত-বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সদস্যেরা। জ্ঞানীগুনীদের আতিথ্য নিযুক্ত করবার জন্যে কবি ফিরে এলেন তাড়াতাড়ি। এর দু-একদিন পরেই শান্তিনিকেতনে এলেন বিশ্ব-বিখ্যাত গায়িকা ক্লারা বাট্ (Dame Clara Butt)।

বিশ্বভারতীর শিক্ষাধারায় বহু রকম সমস্যা। অসুবিধে দূর করবার জন্যে নানাপ্রকারে চেষ্টা চলছে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কবি নিজে বিদ্যালয়ের কাজকর্ম দেখতে শুরু করলেন। সমস্ত কাজ দেখবার সম্পূর্ণ ভার আর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সেপ্টেম্বর মাস থেকে। কিন্তু নানা কারণে তাঁর পক্ষে এ কাজ সুসম্পন্ন করা অসম্ভব।

আশ্রমে আবার বসন্তকাল ঘুরে এলো। কবির হৃদয় সাড়া দিল ঋতুরাজের আহ্বানে। এবারকার বসন্ত-উৎসবে কবির ইচ্ছা হলো আশ্রমের তরুণ কবিরা নিজেদের রচনা পাঠ করবেন। তরুণ কবিদের মধ্যে তখন ছিলেন নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, সুকুমার সরকার। কবি নিজে তাঁদের কবিতা আবৃত্তি করলেন। সন্ধ্যায় 'ফাল্গুনী' নাটক অভিনীত হলো আম্র-কুঞ্জে। কবি নিজে অন্ধ-বাউলের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। ফাল্গুনী নাটকের জন্যে মণ্ডপসজ্জায় আর অলঙ্করণে আচার্য নন্দলাল কলাভবনের সহকর্মীদের নিয়ে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে রমণীয় রূপদান করলেন। মঞ্চের রঙে, অভিনেতাদের সাজের রঙে আর আলোর রঙে বর্ণসাম্য ঘটিয়ে এবারেও ভারতশিল্পীর শিল্পসৃষ্টি আর এক ধাপ এগিয়ে গেল।

এই সময়ের কিছু আগে লর্ড সিংহের মৃত্যু হয়েছে। বিশ্বভারতীর জন্যে তিনি একবার এককালীন দশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। সেই টাকায় শান্তিনিকেতনে সুরেন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় একটি বাড়ি তৈরি হলো। কবি তার নাম রাখলেন —'সিংহসদন'। শান্তিনিকেতনের পূর্বদিকের মাঠের যখন জমি দখল করা হয় তখন লর্ড সিংহের সাহায্য না পেলে বিশ্বভারতীর পক্ষে সে দখল নেওয়া সম্ভবপর হতো না।

বর্ষশেষের (১৩৩৪) দিন সন্ধ্যায় কবি ভাষণ দিলেন মন্দিরে; নববর্ষের দিন সকালেও কবি ভাষণ দিলেন মন্দিরে। তারা যে গরমের বন্ধ হলো। ২৫-এ বৈশাখ কলকাতার বিচিত্রা ভবনে কবির জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হলো মহাসমারোহে। এই উপলক্ষে তুলাদান হয়েছিল। অর্থাৎ কবির সঙ্গে ওজনের মাপে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত নানা গ্রন্থ বিভিন্ন পাবলিক লাইব্রেরী এবং প্রতিষ্ঠানে দান করবার জন্যে উৎসর্গ করা হলো।

॥ যমুনালাল বাজাজ—মহাত্মার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের সূত্র ॥

'গান্ধীজি আমার নামটা কোনো সূত্রে শুনেছিলেন। শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের কাছে থাকি তাও জানতেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ যমুনালাল বাজাজের মন্দির নিয়ে।

'যমুনালাল ছিলেন শেঠী জাতে। বিরাট সম্পত্তি। ওয়ার্ধা'র বাজারে বাজাজের একটি বিষ্ণুমন্দির ছিল। তার আর্কিটেকচার, তার প্লান সমস্ত আমাদের কলকাতার পরেশনাথ মন্দিরের মতন। পোর্সিলেনের টালি বসানো দেওয়ালে। একেবারে মারোয়াড়ী প্যাটার্নে তৈরি। জওহরলালজী একবার একজন বিদেশীকে নিয়ে মন্দির দেখাতে গিয়ে ভারী লজ্জিত হয়েছিলেন। তখন থেকেই দিশী আর্কিটেক্টদের দেখিয়ে ওটা সংশোধন করার কথা হয়। মহাত্মার কাছে জওহরলাল অভিযোগ করেছিলেন,—মন্দিরটা দেখাতে পারা যায় না কোনো বিদেশী দর্শককে। এতো বিশ্রী স্টাইলে তৈরি করানো। সব শুনে মহাত্মা বললেন,—আচ্ছা। তখন মহাত্মা লিখে পাঠালেন আমাকে। মহাত্মার ডাকে যমুনালালের মন্দির সংশোধন করা যাবে কিনা দেখতে গেলুম। আমি ওয়ার্ধা গেলুম শান্তিনিকেতন থেকে। আমার সঙ্গে গেল গোবর্ধন পাঞ্চাল। গোবর্ধন গুজরাটী ছেলে, আমাদের কলাভবনের ছাত্র।

'যখন সেবাগাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলুম শুনলুম যে মহাত্মা বেড়াতে বেরিয়েছেন। তখন মহাত্মার একজন ভক্ত খুব বড় পণ্ডিতের কুষ্ঠ হয়েছিল। সেবাগাঁ থেকে তিনি তাঁকে রেখেছিলেন খানিক দূরে একটি কুটীরে। আর তাঁর চিকিৎসা করছিলেন মহাত্মা নিজে। শুধু চিকিৎসা নয়,

তাঁর সেবা ও পথ্যের ব্যবস্থাও করেছিলেন নিজে। তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে গেছেন মহাত্মা। খানিক অপেক্ষার পরে মহাদেব বললেন, —চলুন খানিক এগিয়ে যাই। খানিক যেতেই দেখি মহাত্মা ফিরে আসছেন, সঙ্গে বহুলোক চলছে।

'মহাত্মার সঙ্গে দেখা হতে আমাকে বললেন, —'নন্দবাবু, জাকে দেখিয়ে, মন্দিরমে কই সংস্কার কর্‌নে শক্‌তা —আচ্ছা।' গিয়ে দেখলুম মন্দির। সংস্কার করা অসম্ভব। আগাগোড়া বদলাতে হবে —বললুম মহাত্মাকে। আমার কথা শুনে মহাত্মা বললেন, —'কুচ্‌ ফ্রেস্‌কো -ট্রেস্‌কো বনা দিজীয়ে।' আমি বললুম, —না, ওতে ফ্রেস্‌কো হবে না। ভেঙ্গে করিয়ে দিন। ওঁর তো টাকা আছে বিস্তর। ফ্রেস্‌কো করে কোনো লাভ হবে না। ওতে ফ্রেস্‌কো করলে কেমন হবে জানেন? আমাদের দরবেশ ফকীররা যেমন হরেক রকমের 'তাপ্পী' অর্থাৎ তালি লাগানো আলখাল্লা পরে থাকে সূতির বা সিল্কের, সেইরকম হবে। তা সিল্কের তালি-লাগানো মন্দিরে কাজ কি? তাতে মন্দিরের উন্নতি হবেনা কিছু। সেই সময়ে আমার আবার মেজাজ কমিউনিস্ট গোছের। মন্দির-টন্দিরের প্রয়োজনই বা কি —এই রকম মনের ভাব।

'যাই হোক, মহাত্মা বললেন, —'তব্‌ ডিজাইন করিয়ে।' আমি বললুম কি হবে এখন আর মন্দির করে। মহাত্মা বললেন, —না, না, তা ঠিক নয়। তোমার বলা ভুল হচ্ছে। মন্দিরটা হলো জাতীয় প্রয়োজন। যে জাত সত্যের দর্শন করতে চায়, তার জন্যে মন্দির অপরিহার্য। দেবতার আইডিয়াটাই একটা দেহ ধরে মন্দির হয়ে রয়েছে। সাধারণভাবে ওটা 'জঙ্গম'। —বললেন মহাত্মা। সাধারণভাবে যা চলছে সে হলো 'জঙ্গম', আর সত্য হলো 'শাশ্বত'। এদেশে যুগে যুগে মন্দির তৈরি হয়েছে আর ভবিষ্যতেও মন্দির তৈরি হবে। তৈরি হবে সেই ছাঁচে সত্যকে তারা যে রূপে দর্শন করবে।

'আলোচনার পরে আমি আর গোবর্ধন মহাত্মাকে প্রণাম করলুম। মহাত্মা জিজ্ঞেস করলেন, —এই ছেলেটি কে? আমি বললুম, —ছেলেটি গুজরাটী। শুনেই মহাত্মা বললেন, —উন্‌কো ভেরি এ্যাটমস্‌ফিয়ার

চেঞ্জ্ হো গয়া হৈ। বিলকুল বঙ্গালীকা ঢঙ্গ্ লগ্‌তা হৈ।' মহাত্মা বাঙ্গালীর মতন দেখছেন ওকে। ওর ছিল মাথায় বড়ো বড়ো চুল। শ্লেষটা বুঝে আমি বললুম, —বড়ো বড়ো চুল শান্তিনিকেতনের সৃষ্টি নয়। আসলে ও ঢঙটা হচ্ছে বোম্বের; কিন্তু, দোষটা হয় আমাদের। বললুম আমি খুব জোরের সঙ্গেই। তখন মহাত্মা শশব্যস্ত হয়ে বললেন, —নহী নহী নন্দবাবু, আপকী শিকায়েত নহী কর্‌তেঁ হৈঁ। —বললেন দু-তিনবার ধরে।

'আসতে আসতে মহাত্মা গুরুদেবের কথা জিজ্ঞেস করলেন। গুরুদেবকে প্রণাম জানালেন আর বললেন, —'উন্‌কো প্রণাম শ্রদ্ধা হর্‌বখত্ ঠিক্ হৈ।' —গুরুদেব নিজেকে আগে কবি বলবেন, —পরে আর কিছু। আগে পোয়েট্, তারপর তিনি আর তার যা। মহাত্মা কবি রবীন্দ্রনাথকে সবকালের হয়ে সেই প্রণামই সেদিন নিবেদন করলেন।

মন্দির দেখে বললুম, —ওর সংস্কার হবে না। আর একটা মন্দির করা হোক্। করা হোক্ ভারতমাতার মন্দির নতুন আইডিয়ায়। আলোচনার পরে মহাত্মাকে আমি বললুম, —আপনি মন্দিরটা দেখতে চলুন না। মহাত্মা অবাক হয়ে বললেন, —আমি কি করে যাব? আমি যদি যাই, আমার পিছনে দু শো লোক চলবে। ইস্‌সে মৈঁ ঘব্‌ড়া জাতা হুঁ। আমি বললুম, —চলুন, তবে রাত্রে যাই। মহাত্মা বললেন, —ক্যা ছিপ্‌তো ক্যা জাতা। —যাই হোক, মহাত্মার যাওয়া হলো না। কিন্তু, আমার আবার কোনো রকমে কাজ উদ্ধার করা ভালো লাগে না।

'সেবাগাঁয়ে দেখলুম, মহাদেবের সঙ্গে মহাত্মার কোনো কথা নিয়ে তর্ক হচ্ছে। কি যেন একটা পয়েন্ট নিয়ে তর্ক হচ্ছে। মহাদেব বলছেন, —আপনি বলেছেন, —আর মহাত্মা বলছেন, —না, আমি কখনো বলিনি। খুব রেগে গেছেন মহাত্মা, কিন্তু মহাদেব জোর দিয়ে বলছেন, —আমি জানি, আমি লিখেছি। আমি দেখলুম, মহাত্মার সেই চটা। কিন্তু, ওঁদের চটে যাওয়া অত সহজ নয়। কিন্তু মহাদেব বারে বারে জোর দিয়ে 'আমার লেখা আছে' বলাতে অবশেষে, মহাত্মা বুঝতে পেরে হাসলেন; আর বললেন, —হাঁ হাঁ ঠিক্ হৈ। —আরও দু-বার দেখেছি মহাত্মার বিরক্তি; সে যথাসময়ে বলবো।

'গান্ধীজি আমাকে একবার চেপে ধরেছিলেন, পুরীর মন্দিরে ছবি সব প্রকাশ্যভাবে কেন থাকবে, ওগুলো থাকা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া কি না। যমুনালাল বাজাজ অনেক টাকা খরচ করে সব বালিকাম করে দিতে মহাত্মাকে রাজি করিয়েছিলেন। এই নিয়ে দেশে খুব আন্দোলনও হয়েছিল তখন।

'সেই সময়ে যমুনালাল প্রভৃত টাকা খরচ করে মন্দিরে মন্দিরে যত সব বন্ধকাম মূর্তি আছে, সে সব নষ্ট করবার উদ্যোগ করছেন। ট্যাগুন বলেছিলেন,—মন্দিরে মন্দিরে এই রকম যত মূর্তি আছে সব ভেঙ্গে ফেলা হোক। কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। মহাত্মা রাজী এবং যমুনালাল এই কর্মে টাকা দিতে প্রস্তুত। তখন আমি বললুম,—আপনারা ভাঙ্গতে পারেন, কিন্তু গড়তে পারেন না। অবনীবাবু, উড্রফ্‌সাহেব ভয়ানক চটে গিয়েছিলেন এতে। এঁদের বিরুদ্ধে ওঁদের লেখা তখন নানা পত্র-পত্রিকায় বার করা হলো।

'সেবাগ্রামে আশ্রমের বারান্দায় বসলুম আমি, যমুনালাল আর গফ্‌ফর খান। এই সময়ে সেই বিষয়ে কথা হতে লাগলো। যমুনালাল বললেন,—এই রকম সব মূর্তি দেখলে লোকের মরাল্‌ খারাপ হয়। আমি ওঁকে বোঝাতে লাগলুম,—এ কখনো হতে পারে না—তফাৎ কেবল দৃষ্টিভঙ্গিতে। জীবনে কাম মোক্ষেরই ধাপমাত্র। ধর্ম অর্থ কামের পরে চতুর্থ বর্গে মোক্ষ। সন্তান-জন্মানো কখনো অশ্লীল নয়। বাপ মা আত্মীয় স্বজনে সবাই জানে, ছেলে কি করে হয়। সামাজিকতার আবরণে একে আড়াল করে রাখা হয় মাত্র। কিন্তু শিল্পে এ-সব বাধা চলবে না। বিশেষত এ যখন হয়ে ওঠে শিল্পকর্ম তখন সে আগুন, পূজামন্দিরে তার স্থান। তাকে ছোঁবার জো নাই। নবজাত শিশুর মতো সে নূতন সৃষ্টি। সকল নাগালের বাইরে।

'দোষটা যখন শিল্পে উৎরোয়, তখন শিল্পসৃষ্টিতে সে অমৃতত্ব পায়। শিল্পীর জগতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দোষগুণ কিছুই বাদ পড়বে না। মানুষে এবং সমাজে যা ঘটেছে সবই হলো শিল্পীর বিষয়বস্তু।

'গফ্‌ফর খাঁ আমার সাইড্‌ নিলেন। বললেন উনি যমুনালালকে,—ছেলে আছে আপনার? তার আবার বিয়ে দেবেন কেন? তার

আবার ছেলে হবে। আমার ছেলে আছে। ছেলের বিয়ে দেব কিনা। আপনি বিয়ে করেছেন, কত ছেলে হয়েছে আপনার? সে সব যদি অশ্লীল না-হয়ে থাকে, ও-সকল মূর্তিও অশ্লীল নয়। আর আপনারও ছেলে আছে, আমারও ছেলে আছে, —বললেন গফ্‌ফর খাঁ।

'এই সময়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর কথা আমার মনে পড়ল। কার যেন ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে, তিনি বিয়ের বিরুদ্ধে সার্‌মন্‌ দিচ্ছিলেন। তখন কে একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, —আপনি মশায় কবার সহবাস করেছেন? কটি ছেলে হয়েছে? ··কতবার অশ্লীলতা করেছেন আপনি, ইত্যাদি। আর তা যদি করে থাকেন, তবে অপরের ছেলের বিয়ে দিতে আপত্তি কেন?

'ওয়ার্ধা থেকে কিছু দূরে যমুনালাল বাড়ি করেছেন। আমাকে বললেন, —আমি বাড়ি করেছি —আপনাদের যখন ইচ্ছা, এসে থাকতে পারেন। স্যানিটোরিয়ামের মতো সে বাড়ি। আমি বললুম, —দরকার হলে জানাব।

॥ মহাদেব দেশাই ॥

'মহাত্মার কাছেই ওঁকে আমি প্রথম দেখি, সে কথা বলেছি। হরিপুরা কংগ্রেসে মহাত্মার কাছে যখন আমি টিথলে ছিলুম, তখন মহাদেব দেশাই-য়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। মহাত্মার বাণী সব লিখতেন তিনি। মহাত্মা যা বলতেন, মহাদেব তাই রেকর্ড করতেন। আমাদের এখানে সন্তোষ মজুমদার এমনিভাবেই এই কাজ করেছিলেন —গুরুদেবের বচন-সংগ্রহ। সে-সব নষ্ট হয়ে গেছে।

'মহাদেবের সঙ্গে টিথলেই বিশেষ আলাপ হলো আমার। সহসা তাঁর ইচ্ছা হলো, ছবি আঁকা শিখবেন। আমি শেখাতে আরম্ভ করলুম। শেখাতে গিয়ে দেখিনা, তিনি কেবল পোর্ট্রেট আঁকতে চান। আমি বলি, আগে আর্টের মর্মটা বুঝুন —খালি তো পোর্ট্রেট করলে চলবেনা। আট-দশ দিন চেষ্টা করার পরে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ছেড়ে দিলেন।

'তখন টিথলে মহাত্মার সেক্রেটারী ছিলেন দু-জন। —প্যারেলাল আর

মহাদেব। প্যারেলাল মহাত্মার খাওয়া-দাওয়া —এই সব প্রাইভেট বিষয়ের তদ্বির করতেন। আর মহাদেব থাকতেন মহাত্মার কাগজপত্র —লেখা-পড়ার ব্যাপার নিয়ে।

'মহাদেব অভিযোগ করতেন আমার কাছে মহাত্মার বিরুদ্ধে। একদিন বললেন, —আমার ছেলের এডুকেশন হলো না। মহাত্মা দিতে চান না ইংলিশ এডুকেশন। আমার ছেলেটার হলো না কিছু মহাত্মার হুইমসের জন্যে। এ এক ধরনের বিগট্রি। ফলে, মহদেব খুশি ছিলেন না মহাত্মার ওপর। ভালো লেখাপড়াই শিখলে না মহাদেবের ছেলে মহাত্মার জন্যে।

'তখন সেবাগ্রামে থাকতো মহাদেবের ছেলে। সেখানে আমাদের মালতীর মেয়েও থাকতো। ভাব হয়ে বিয়ে হলো দু-জনের। এতে ওঁরা ভয় পেয়ে সহশিক্ষা ভেঙ্গে দিলেন। শান্তিনিকেতনে আমরা কিন্তু ভাঙ্গিনি। যাইহোক্, শান্তিনিকেতনে এসে ওরা আমার সঙ্গে দেখা করেছিল —মহাদেবের ছেলে আর পুত্রবধূ।

'আমেরিকান ভ্রমণকারী একজন ঐ সময়ে এসে উঠলেন মহাদেবের ওখানে। যমুনালাল বাজাজের মন্দির দেখতে গিয়ে আমি তখন ওয়ার্ধার আশ্রমে আছি। পাদরী ভ্রমণকারী এসে মহাদেবকে ধরলেন, মহাত্মার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। একসঙ্গে আমি, মহাদেব আর সেই পাদরী সাহেব গেলুম টমটমে চড়ে। —

'I want to search out somewhere for Him, —বললেন পাদরী মহাত্মাকে। মহাত্মার রিলিজন কি, ভারতীয় রিলিজনের রূপ কেমন হবে —এই সব আলোচনা হলো ওঁদের। মহাত্মার সঙ্গে কথা কয়েই, পাদরী ভারত ছেড়ে চলে যাবার প্রোগ্রাম করেছেন।

'মহাদেব দেশাই বাঙ্গলা খুব ভালো জানতেন। প্যারেলালও বাঙ্গলা জানতেন ভালো। মহাদেবকে বাঙ্গলায় আমি বললুম, —ওটা বোগাস লোক। মহাত্মার সঙ্গে প্রোগ্রাম মাফিক সাক্ষাৎ সেরেই বোম্বে থেকে ও চলে যাবে একেবারে এখনই। শুধু মহাত্মাকে বিরক্ত করতে এসেছে। মহাত্মা অসুস্থ বলে ওকে ভাগিয়ে দেওয়া হলো।

'তখন মীরাবেনের ও আর একটি ছেলের টায়ফয়েড্ হয়েছে। মহাত্মা তাদের চিকিৎসা করছেন —নিজ হাতে ঘড়ি ধরে। ছেলেটি সব আদেশ

পালন করছে। মহাত্মা নিজেই রোগীদের স্পঞ্জ্ করে দিতেন, নিজেই ড্রস্ দিতেন।

'আমি গেছি দেখে মহাত্মা আমাকে ইশারা করে ডাকলেন। গিয়ে তাঁর কাছে বসলুম। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করলেন, আস্তে আস্তে কথা বলতে।

'মহাদেব ওঁকে বললেন,—একজন ক্লার্জিম্যান এসেছে। সে আপনার কাছে কিছু জানতে চায়। কী জানতে চায়, জিগ্যেস করলেন মহাত্মা। —ভারতবর্ষের বর্তমান ধর্ম কি, ভবিষ্যৎ ধর্ম কি হবে, এই সব ও জানতে চায়,—বললেন মহাদেব। শুনে, মহাত্মা বললেন,—বলে দাও যে দেখা হবে না।—এ-কথা বলেও, কি মনে করে যেন বের হলেন মহাত্মা।

'ছেয়ের নিচে দাঁড়িয়ে আছে বেচারা। মহাত্মা বেরলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—কি দরকার আপনার। 'দর্শন'? - সে তো হলো। এবারে যান। ...আমার রিলিজন কিছুই নাই। ঐ যে ঘরে দেখছেন—রোগী শোয়ানো—ওদের সেবাই আমার ধর্ম। ফিউচার রিলিজিন কি হবে, জানিনা ও-সব। · চটে গেলেন মহাত্মা। ফোটোও তুলতে দিলেন না। অটোগ্রাফও হলো না। বললেন,– ঘরের ছবি তুলুন। সে-বেচারা চলে গেল মুখ চুন করে।

॥ মণিবেন ॥

'টিথলে দেখা তাঁর সঙ্গে। খুব বিদুষী মেয়ে। প্যাটেলের মেয়ে। জহরলালের ইন্দিরা যেমন তেমনি। প্যাটেলের সঙ্গে মণিবেন ঠিক যেন সেক্রেটারী ছিলেন সত্যিকার।

'আমি চা খাই জানতেন সকলে। মহাত্মা বললেন,—প্যাটেল চা খায়, মহাদেব খায়, তার সঙ্গে তুমিও খাবে। না-খেলে চলবে কেন। রোজ সকালে গিয়ে বসতুম আমি ওঁদের সঙ্গে, পাওরুটি মাখন আর চা খেতে। সার্ভ করতেন মণিবেন।

'একদিন হয়েছে কি, মাখন ফুরিয়ে গেছে। মাখন নাই। ঠিক হলো, কলা দিয়ে খাব। ওখানে যা ঘটতো সব খবর মহাত্মার কাছে গিয়ে পৌঁছতো। খবর গেল,—'মাখন খান না নন্দবাবু'। মাখন খাও না,– জিজ্ঞাসা করলেন মহাত্মা আমাকে। আমি বললুম,—মাখন খাই,

তবে আজ ছিল না। —'কেন ছিল না ?' আমি বলবো মণিবেনকে।—মাখন না থাকাতে সেদিন প্যাটেল মণিবেনকে খুব বকলেন।

'আর একদিন হলো কি, প্যাটেল মহাত্মা সব বসে আছেন। ওঁদের কি যেন বিশেষ কথাবার্তা হচ্ছে। তখন চা-খাবার সময়। ওঁরা কথায় ব্যস্ত দেখে আমি চা না খেয়েই চলে যাচ্ছি। সেদিনও প্যাটেল মণিবেনকে খুব বকলেন, ওঁরা না খেলেও আমাকে চা দেওয়া হয়নি বলে।

'আমি ওখানে থাকতে থাকতেই অম্বালাল সরাভাই-এর বড়মেয়ে মৃদুলা এলেন। এসে ঐ বাড়িতেই উঠলেন প্রথমে। সঙ্গে তিন চারটে ট্রাঙ্ক-সুটকেস। কাপড়-চোপড়ে ভরতি সেগুলো ; অথচ 'সত্যাগ্রহী' তিনি। সকালে বিকালে কাপড় ছাড়ে অর্থাৎ বদলায়, এতো কাপড়। বাহুল্যের ঠাটটা ছাড়তে পারেননি আর কি।

'আট-দশ দিন যাবার পর মহাত্মাকে আমি বললুম, —আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। এই কথাতেই তিনি বুঝতে পারলেন। সেখানে কংগ্রেসের অফিস বসেছে, ত্রিশ-চল্লিশ জন স্টেনো সমান তালে ঘটা-ঘট শব্দ করে চলেছে দিনরাত। হৈ হৈ কাণ্ড। মহাত্মা বললেন, —কেন, এই গোলমাল পছন্দ হচ্ছে না, সেইজন্যে বোধকরি মন চঞ্চল হচ্ছে। নির্জন বাড়ি দিচ্ছি আপনাকে। খাবার দাবারের ব্যবস্থা থাকবে এখানে, আর থাকবেন সেই নির্জন বাড়িতে গিয়ে। গেলুম সেখানে। সেটা খুব ভালো বাড়ি, প্যাটেলের বাড়ি। টিথলের বাড়ি। কিন্তু ওখানে গিয়ে হিতে বিপরীত হলো। সেখানে আবার ম্যালেরিয়ার আড্ডা। এই পরিবর্তনে আবার অসুবিধেও হলো। সেখানে আবার সাপের ভয়ও খুব ; তবুও রইলুম সেখানে।

'মণিবেন আমার খাবার দাবার টিফিন সব দেখে যেতেন। আম, সে প্রচুর আম, আমার ঘরে রেখে যেতেন।

'ভোরে মন্দিরের প্রার্থনার ঘণ্টা বাজত। যেতুম প্রার্থনা-সভায় যোগ দিতে। প্রার্থনা সেরে মহাত্মার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতুম নিয়মিত।

'মনে পড়ে, সুরতের কাছে বুলসর। সমুদ্রের ধারে বেড়াতুম আমরা। অচেনা জায়গাতে গেছি, আগে কিছুই ধারণা ছিল না। একদিন জুতো খুলে দূরে দূরে বেড়াচ্ছি। পরে জুতোর কাছে এসে দেখি কি, মহাত্মাজী

তাঁর লাঠি দিয়ে জুতো আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'হিয়ার ইজ ইয়োর শূ'। কত ক্ষুদ্র জিনিস উনি লক্ষ্য রাখতেন। খুঁজতে হতো অনেক জুতোর মধ্যে, সেই অসুবিধা পাছে ঘটে তাই আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। জুতো-জোড়াটা পাওয়া গেল বটে, তবে আমার ভারি লজ্জা হলো এতে। সেই থেকে বহুদিন জুতো পরা ছেড়ে দিয়েছিলুম।

'মহাত্মা মন্দিরে যেতেন। মহাত্মার পাশে পাশে গফ্‌ফর খাঁ থাকতেন। উপাসনায় যাবার আগে গফ্‌ফর খাঁ বারান্দায় নমাজ পড়ে নিতেন। তারপর উপাসনায় জয়েন করতে যেতেন। উপাসনা-মন্দিরে কোরাণ পড়তেন গফ্‌ফর খাঁ। খৃস্টান কেউ এলে, তিনি আবার সারমন দিতেন। বিকেলে উপাসনার পর তুলসী-রামায়ণ পড়া হতো। কীর্তন হতো। মণিবেনও গাইতেন। আরও সবাই গাইতেন।

॥ অম্বালাল সরাভাই ॥

'বাড়িতে উনি আর্টস্কুল করবেন, নিজেদের মেয়েদের শেখানোর জন্যে। আমাদের কলাভবনের ছাত্রী লীলা ও গীরার বাবা উনি। মাসোজী গিয়ে বছরখানেক রইলেন ওঁর ওখানে। আরও তিন চারজন গেল এখান থেকে। লীলার স্কুল চলছে এখনও (১৯৫৫)। আমাদের পূর্ণেন্দু ওখানকার টিচার।

'আমি ওখানে যখন গেলুম, মাসোজী যা যা শিখিয়েছিলেন, লীলা, গীরা সে-সব এনে দেখালে। ওরা বললে,—ক্রিটিসাইজ্‌ করুন। মাসোজী যদিও আমার ছাত্র, ওঁর করা ছবিগুলো কিন্তু আমার ভালো লাগল না।

'আমি এখানে চলে আসার পরে, অম্বালাল লিখে পাঠালেন গুরুদেবকে নন্দলালজীকে আমরা চাই কিছুদিন। পাঁচ-ছ-শো টাকা বেতন দেবো। গুরুদেব আমার মত জানতে চাইলেন। বললুম গুরুদেবকে,—আমি কি করতে যাব। তখন গুরুদেব লিখলেন, উনি যেতে চান না। নন্দলালজী টাকাও বেশি চান না।

'তখন গীরা এখানে এলেন কলাভবনে শিখবেন বলে। গীরা এখানে এসে কিছুদিন ছিলেন; কিন্তু বড়লোকের মেয়ে, শিখবেন কেন। চলে গেলেন।

'একবার ৭ই পৌষের মেলাতে এসেছে ওরা এখানে। আমি মেলা থেকে ফিরছি, পথে দেখা। আমার চোস্ত পোষাক ছিল না। ছেঁড়া জুতো, জামাও যেমন-তেমন। রাস্তায় দেখা হতেই ওরা প্রণাম করলে—লীলা আর গীরা। গীরা আমাকে দেখে মুখ বেঁকালে। আমার মনে হলো, যেন তার ঘৃণা বোধ হলো। পরস্পর অপছন্দ হলো আর-কি। এই রকম ঘটনা মাসোজীর বেলাতেও হয়েছিল। ইজের জামা পরনে, আর মাথায় কাপড় বাঁধা তখন আমার, রোদের জন্যে। মাসোজী এখানে এসে, প্রথমে অসিতের সঙ্গে কথা বললে; আশ্চর্য, ও জানতে পারলে এক মাস বাদে যে, অধ্যক্ষ অসিত নয়—আমি।

'মাসোজী জাতে মারাঠি। আমার মনে হয়,—মিলিটারি জাতের আর্ট হয় না। মারাঠী আর পাঞ্জাবীরা ভালো আর্টিস্ট হয় না। গুজরাটীরা ব্যবসাদার জাত। ওদেরও আর্ট হয় না। তবে, ওদের মেয়েরা ললিত কলায় ভালো। আমার যে অভিজ্ঞতা তাতে দেখেছি, আর্টিস্টের ধাত হলো বাঙ্গালীদের, মালাবারী আর মাদ্রাজীদের। পাঞ্জাবী হিন্দুর চেয়ে পাঞ্জাবী মুসলমানরা সহজে আর্টিস্ট হয়। সে ওদের পুরাতন ঐতিহ্য থেকে।

'অম্বালাল সরাভাই-এর সঙ্গে পরে আমার ছবি কেনার ব্যাপারে অনেকবার যোগাযোগ হয়েছিল, সে-কথা পরে বলবো।

॥ বিশ্বভারতী-সংবাদ ॥

১৯২৮ সালের ১২ই মে কবি য়ুরোপ-যাত্রার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজের পথে রওনা হলেন। ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি হিবার্ট লেকচার দেবেন। এবারকার গরমের বন্ধে নন্দলাল রইলেন শান্তিনিকেতনেই। বার্ষিক ভ্রমণ এ বছর বন্ধ রইল। শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ-উৎসবের যে-আদর্শ চিত্রের প্যানেল তৈরি হবে তার কার্টুন আঁকায় ব্যস্ত। কাঠখোদাই করে আঁকছেন বৃক্ষরোপণ উৎসবের শোভাযাত্রা।

অসুস্থতার জন্যে এই সময়ে কবির য়ুরোপ যাওয়া হলো না। হিবার্ট লেকচার দিলেন তিনি ১৯৩০ সালে। এবারে দক্ষিণভারত আর সিংহলে দু-মাস কাটিয়ে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। তখন গরমের ছুটীর পরে আশ্রম-বিদ্যালয় খুলছে। বর্ষা নেমেছে। কবি আপন পরিবেশে পৌঁছে

পরিতৃপ্ত। শরীর অসুস্থ। বিশ্বভারতীর আর্থিক ও পরিচালন-সমস্যা। রথীন্দ্রনাথ সপরিবারে য়ুরোপে। কবির মনে হচ্ছে, বিশ্বভারতীকে আগাগোড়া নতুন করে গড়তে হবে। সেপ্টেম্বর মাস থেকে কবির উপর বিশ্বভারতীর সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।

কবির মনে পরিবর্তন হচ্ছে। ক্লান্তি দূর হলো। বর্ষামঙ্গলের সময় এলো। বর্ষামঙ্গলের সঙ্গে বৃক্ষরোপণ উৎসবের ভাবনা মনে জাগলো। এই সময়ে কবির কাব্যে বৃক্ষের রহস্যকথা নানাভাবে মূর্ত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ জীবন-শিল্পী। তিনি অন্তরে যা অনুভব করেন, ব্যবহারিক জীবনে তার বিকাশ দেখতে না পেলে তাঁর আনন্দ পরিপূর্ণ হয় না। সেইজন্যে বর্ষামঙ্গল আনন্দ উৎসবের ব্যবহারিক রূপ প্রকাশ হলো বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে।

কবি রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। বাঙ্গালাদেশের এই অঞ্চলে গাছপালা কম থাকার ফলে এখানে বৃষ্টিপাত কম হয় —এ-কথা তিনি জানতেন ভালভাবেই। রাঢ়অঞ্চলের মাটিতে স্থানেস্থানে প্রচুর লৌহমল ছিল বলে একদা এদিকে বনবাদাড় কেটে সাফ করা হয়েছিল। সেইজন্যে কবির একান্ত ইচ্ছা এই বৃক্ষরোপণ উৎসব করে গ্রামে গ্রামে বনভূমির পত্তন করা। ফলে, এ-অঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত হবে আর চাষ-আবাদের সঙ্কট থাকবে না।

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব হলো ১৪ই জুলাই। 'সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে এল। [বিধুশেখর] শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃতে শ্লোক আওড়ালেন' —আর কবি তাঁর ছয়টি কবিতা পাঠ করলেন। এই ছ-টি কবিতার পাঁচটি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম —এই পঞ্চভূতের উদ্দেশ্যে লেখা। আর ষষ্ঠটি হলো মাঙ্গলিক।

সভাস্থলে পঞ্চভূত মূর্তিমান হয়ে বসলেন। প্রত্যেকের বেশ বিশেষ ভূতের প্রতীকব্যঞ্জক। আচার্য নন্দলাল আর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ এঁদের সাজিয়ে দিয়েছিলেন। এই পঞ্চভূত সেজেছিলেন ক্ষিতি ও অপ যথাক্রমে কলাভবনের ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ বিশী, সুধীর খাস্তগীর, তেজ সেজেছিলেন শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মরুৎ হলেন মনমোহন ঘোষ, আর ব্যোম পাঠভবনের শিক্ষক অনাথনাথ বসু। বৃক্ষবাহক ছিলেন আর্যনায়কম্ আর বিনায়ক মাসোজী।

এ-বছরে বৃক্ষরোপণ করা হলো গৌরপ্রাঙ্গণে। পোঁতা হয়েছিল একটি বকুল গাছ। সে গাছটি এখন (১৯৬৭) মহীরুহ।

গৌরপ্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ সারা হলে সভা হলো সিংহসদনে। কবি তাঁর লেখা 'বলাই' গল্পটি পড়ে শোনালেন। এই গল্পে বলাইয়ের বৃক্ষপ্রীতির সঙ্গে কবির বাল্যজীবনের উদ্ভিদপ্রীতির সাদৃশ্য বোঝালেন।

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের পরের দিন ১৫ই জুলাই শ্রীনিকেতনে হলো হলকর্ষণ উৎসব। —'ইহার উদ্দেশ্য গ্রাম ও গ্রামবাসীদের সহিত বিচ্ছিন্ন ভদ্রজনতার সংযোগ স্থাপন। আমাদের আধুনিক জীবনে চিরাচরিত আচার-নিবদ্ধ ধর্মানুষ্ঠানাদির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ কালান্তরে ম্লান হইয়া আসিয়াছে। অথচ আচার-অনুষ্ঠানে, উৎসব আমোদ-প্রমোদ সমাজজীবনে না থাকিলে মানুষ শুষ্ক হইয়া যায়। এ কথা সুবিদিত যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-সমাজের আনুষ্ঠানিক সংস্কারাবদ্ধ ধর্মকর্মে বিশ্বাসহীন; অথচ আধুনিক ভারতীয়দের জীবনে নূতনভাবে অসাম্প্রদায়িক উৎসব অনুষ্ঠান প্রবর্তনের প্রয়োজন; ঋতু উৎসব এই শ্রেণীর অনুষ্ঠান। সাধারণ মানুষ ও কৃষিজীবীর দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ করিবার জন্য এই বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ উৎসব পরিকল্পিত হইল। হলকর্ষণ এদেশে বহুকাল নিন্দনীয় —ইহা শূদ্রের কর্ম; অথচ রামায়ণে আছে জনকরাজা হল্ চালনাকালে সীতাকে পাইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের অহল্যা উদ্ধার কৃষিপ্রশস্তি। শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা বলরামের এক নাম হলধর। রবীন্দ্রনাথ গ্রাম-উদ্যোগ কর্মে নামিয়া কৃষকদের 'চাষা' নামের প্রতি ভদ্রদের যে উন্নাসিকতা আছে তাহা দূর করিবার জন্য হলকর্ষণ বা সীতাযজ্ঞে সর্বশ্রেণীর লোককে আহ্বান করিলেন।

পণ্ডিত বিধুশেখর হলকর্ষণ-উৎসবে প্রাচীন সংস্কৃত হইতে কৃষি-প্রশস্তি পাঠ এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং হল চালনা করিলেন। নন্দলাল বাবুর পরিচালনায় সভামণ্ডপ নূতনভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়াছিল। গ্রামের বিবিধ সামগ্রী, নানা শস্য প্রভৃতি দিয়া যে আলিপনা অঙ্কিত হয় সেই ধারা এখনো চলিতেছে। এই দিনটিকে চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে নন্দলাল বসু শ্রীনিকেতনে একটি প্রাচীরগাত্রে হলকর্ষণ উৎসবের ফ্রেস্কো রচনা করিয়া দিলেন। উন্মুক্তস্থানে প্রাচীরগাত্রে বৃহৎ পটভূমে এইরূপ চিত্রাঙ্কন শিল্পের ইতিহাসে অভিনব ঘটনা। প্রাচীনকালে ভারতীয়দের (ও অন্যান্য জাতিরও) শিল্প মানসের প্রকাশক্ষেত্র

ছিল মন্দিরগাত্র বা গুহাভ্যন্তর। এই সব শিল্পশোভার নিদর্শনগুলি সাধারণ লোকের চক্ষে পড়িত। কালে এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি হিমালয়ের বৌদ্ধ-মন্দিরের মধ্যে সীমিত হইল —ইহা এখনো সেখানে জীবন্ত। ...জাপান-ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ যে-সব পত্র লেখেন, তাহার মধ্যে আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে ভারতে বৃহৎ পটভূমে চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজন। এতদিনে নন্দলাল তাহা সফল করিলেন। ইতিপূর্বে শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে প্রাচীরচিত্র (ফ্রেস্কো) অঙ্কিত হইয়াছিল; তবে উহা অট্টালিকার বিভূষণরূপে প্রযুক্ত হয়। এইবারকার উন্মুক্তস্থানে সম্পাদিত প্রাচীরচিত্রে জনতার দৃষ্টি গেল; এইজন্যেই ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"

॥ ডাক্তার হ্যারি টিম্বার্স, ১৯২৮ ॥

'এই সময়ে ডাক্তার টিম্বার্স এলেন শ্রীনিকেতনে। ইনি রকফেলার ফাউণ্ডেশনের টাকাতে আসেন এদেশে। কোয়েকার-সম্প্রদায়ের লোক ইনি। এসেছিলেন ম্যালেরিয়া আর কুষ্ঠরোগের ইন্‌ভেস্‌টিগেশনের জন্যে। রাশিয়াতে অনেক কাজ করে এসেছিলেন তিনি। গুরুদেব খুব আদর করে ও'কে আনলেন এখানে। এখানে এসে গ্রামে তিনি কর্মকেন্দ্র খুললেন। বিনুরীতে ডিস্‌পেনসারি খুললেন, করলেন মাটীর বাড়ি। ওষুধপত্র নিয়ে থাকতেন তিনি সেখানে। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করতে করতে ম্যালেরিয়া ধরলো তাঁকেই। এদেশ থেকে ফিরে গিয়ে আমেরিকায় মারা গেলেন শেষটায়।

'তখন শ্রীনিকেতনের ডিরেক্টার ডক্টর আলী। এলম্‌হার্স্ট ওঁকে আনেন। এলম্‌হার্স্ট ডক্টর অ'লীকে শ্রীনিকেতনের ডিরেক্টর করে আনলেন। বিলিতী স্কীম চালাবার ইচ্ছা। ডেয়ারি ইত্যাদির চার্জ নিলেন তিনি। টিম্বার্সকেও প্রথম আনেন এলম্‌হার্স্ট। আলী তাঁর বাড়িতে টিম্বার্সকে ডাকলেন। গোপাল ঘোষ ওখানে ডেয়ারির চার্জ নিলেন। অক্ষয় রায় তখন ওখানে।

'গোপাল ঘোষের স্ত্রী খুব ছেলেমানুষ। কাঁকড়াবিছে কামড়ালো

তাকে। ছুটোছুটি ব্যাপার। টিম্বার্স মরফিন ইনজেকশনের সরঞ্জাম নিয়ে তৈরি। আলী বললেন, থামো থামো; ইনজেকশন দিতে হবে না, আমি এখনই ভালো করে দিচ্ছি। বলে, ফার্সী একজোড়া সঙ্কেত-অক্ষর লিখে তাঁর গুরুর মুখ স্মরণ করলেন। পরে জুতো এক পাটি নিয়ে সেই অক্ষরের ওপর মেরে দিলেন। আর সেই জায়গার ধুলো নিয়ে বিছে-খাওয়ার ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিতেই ঘোষের স্ত্রী হেসে উঠে চলে গেল। ডাক্তার টিম্বার্স বললেন,—'ড্যাম্ ইণ্ডিয়ান্স।' যাইহোক সারালেন তো।

'হায়দরাবাদে এক ফকিরের কাছে আলী এই মন্ত্র শিখেছিলেন। প্রক্রিয়াটি আলী আমাকেও শিখিয়ে দিলেন। বারণ নাই কাকেও শেখাতে। নিজে দেখে তবে আলী বিশ্বাস করেছিলেন। হায়দরাবাদে একটি ডাকবাংলোতে আছেন তিনি; রাত্রে গরুর গাড়ির বড়ো বলদটাকে কামড়িয়েছে বিছেতে। যন্ত্রণায় অস্থির হচ্ছে বলদটা। ফকির ছিল একজন গাছতলায় বসে। সে-ই ঐ মন্ত্রপাঠ করে বলদটাকে সারালে। তখন আলী তাঁকে ধরলেন, শেখাতে হবে। শিখিয়ে দিলেন। গুরুর চেহারা মনে করতে হবে পরম্পরায়।

'অভিনয় হলে টিম্বার্স সাজতেন। একবার অভিনয় হবে, আমি টিম্বার্সকে বেশ করে সাজিয়ে দিলুম। কি নাটক মনে নাই, আমি সাজালুম ওঁকে। আমি সাজাই একটু অদ্ভুতভাবে কিনা। মাথায় পাগ দিতে হবে। জামা নিয়েই স্টিচ্ করে দিলুম। 'মায়ার খেলা' নাটকেও তিনি কি-যেন পার্ট নিয়েছিলেন। খুব আমুদে লোক ছিলেন তিনি। তবে যে-রোগের চিকিৎসার জন্যে এলেন এদেশে, শেষে এই ম্যালেরিয়াতেই মারা গেলেন তিনি দেশে ফিরে গিয়ে।

১৯২৮সালে শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল আর বৃক্ষরোপণ এবং শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব সমাধা করে কবি জুলাই-এর শেষ দিকে কলকাতা গেলেন, শরীরের চিকিৎসার জন্যে। কলাভবন চলছে পূর্ণ উদ্যমে। নন্দলাল তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে চিত্রবিদ্যা-চর্চায় ব্যস্ত।

কবি কলকাতায়। সস্ত্রীক অধ্যাপক লেভিসাহেব জাপান থেকে ফ্রান্সে ফেরার পথে কবির সঙ্গে দেখা করলেন। ১৯২০-২১ সালে ওঁরা যখন

প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন তখন কবির প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ছিল অনন্য-সাধারণ। শান্তিনিকেতনে কবিকে প্রথম দেখে I see you, I see you বলে কবির দিকে ছুটে যাবার সময়ে তাঁর মাথার টুপি উড়ে গিয়েছিল। এ-হেন লেডিসাহেবের মনে শান্তিনিকেতনের বিরুদ্ধে বিষ ঢেলেছিলেন সেকালের কয়েকজন য়ুরোপ-ফেরতা ভারতীয় ছাত্র। এই কানভাঙানিতে কবির মনও বিরূপ হয়েছিল। কবির এই বিরূপতার কথা লেডিসাহেবের কানে যায়। ফলে তিনিও মর্মাহত হন। এবারে তার মীমাংসা হলো। লেডিদম্পতি ৯ই.১০ই অগাস্ট দু-দিনের জন্যে শান্তিনিকেতন ঘুরে গেলেন। আশ্রমে তাঁদের পরিচর্যার সকল ব্যবস্থা কবিই করে দিলেন।

কবি এই সময়ে মুকুলচন্দ্র দে-র আমন্ত্রণে তাঁর সরকারী কোয়ার্টার্সে গিয়ে উঠলেন। মুকুলচন্দ্র তখন সরকারী আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ। বিচিত্রায় মুকুলচন্দ্র ছাত্রছাত্রীদের এচিং-এ ছবি করা শেখাতেন। ১৯২০-২৭ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইংল্যাণ্ডে। দেশে ফেরার পরে তিনি গভর্নমেণ্ট আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন ১৯২৮ সালের ১১ই জুলাই। ইনি হলেন গভর্নমেণ্ট আর্ট-স্কুলের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ।

মুকুলচন্দ্রের বাসায় প্রায় তিন সপ্তাহ কাটিয়ে জোড়াসাঁকো হয়ে সেপ্টেম্বরের গোড়ায় কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। এই সময়ে কবির বয়স ৬৭, আচার্য নন্দলালের বয়স ৪৭। এই সময়ে বিশ্বভারতীর পুনর্গঠনের জন্যে একটি কমিটি বসেছিল কিন্তু কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভবপর হয়নি। সেপ্টেম্বর মাস থেকে কবি নিজে বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করলেন। পূজার ছুটীর আগে পর্যন্ত কবি মহাউৎসাহে আশ্রমের অধ্যাপকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখলেন স্কুল-কলেজের কাজকর্ম তদারক করলেন, ছাত্রদের সভাসমিতি জলসায় উপস্থিত হলেন। ছুটির আগে তাঁর 'গুরু' নাটকটি ছাত্রশিক্ষকে মিলে অভিনয় করালেন, অভিনয়ে উপস্থিত থেকে সকলের আনন্দবর্ধন করলেন।

॥ রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন 'খেলা'র আদর্শ সঙ্গী ॥

এই সময়ে কবির মন আর্টের নূতন একটি পথে নিবিষ্ট হলো। —সে হলো চিত্রাঙ্কন। কবির এই ছবি-আঁকা সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার মন্তব্য করেছেন (র. জী. ৩, পৃ. ৩৩০), 'ইহা কবির profession-ও নহে, vocation-ও নহে —নিতান্ত আনন্দময় hobby'। —রবীন্দ্রজীবনীকার ঠিকই বলেছেন, ছবি আঁকা কবির পেশা নয়, জীবিকাও নয়; নেশামাত্র; এবং আনন্দময় নেশা। কিন্তু কবিকে এই নেশায় পেয়ে বসেছিল যাঁর মহান্ চিত্রসৃষ্টির জীবন্ত আদর্শ, তিনিও কিন্তু চিত্রাঙ্কনকে পেশা বা জীবিকা বলে গ্রহণ করেননি। তাঁর প্রাণের স্বতঃ-উৎসারিত চিত্রকর্মের অপার্থিব মোহে মুগ্ধ হয়েই মনে হয়, কবি চিত্রাঙ্কনের পথে ধাবিত হয়েছিলেন। এবং অচিরেই কবির লেখনীতে আমরা আমাদের মন্তব্যের সমর্থন পেয়ে যাব। চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ ব্যক্তিটির উদ্দেশ্যে দু-বছর পরে কবি যা লিখলেন তা হচ্ছে এই, —

'তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নব-বালক —জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তার ভাষায় ডোবা,—
মুক্তচোখে বিশ্বশোভা
দেখাও তারে, ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে ॥'

যাইহোক্, আচার্য নন্দলালের প্রতি এই কবি-প্রশস্তির প্রসঙ্গ যথা-সময়ে আলোচনা করা যাবে।

এই সময়ের অনুভূতি সম্পর্কে কবি যা লিখেছেন সে এই,—

'রেখার মায়াজালে আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে। অকালে অপরিচিতার প্রতি পক্ষপাতে কবিতা একেবারে পাড়া ছেড়ে চলে গেল। কোনোকালে যে কবিতা লিখতুম সে কথা ভুলে গেছি। এই ব্যাপারটা মনকে এত করে যে আকর্ষণ করছে তার প্রধান কারণ এর অভাবনীয়তা। কবিতার বিষয়টা অস্পষ্টভাবেও গোড়াতেই মাথায় আসে, তার পরে—কাব্যের ঝরণা কলমের মুখে তট রচনা করে, ছন্দ প্রবাহিত হতে থাকে।

আমি যে সব ছবি আঁকার চেষ্টা করি তাতে ঠিক তার উল্টো প্রণালী—রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে. তারপরে যতই আকার ধারণ করে ততই সেটা পোঁছতে থাকে মাথায়। এই রূপসৃষ্টির বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে। আমি যদি পাকা আর্টিস্ট হতুম তা হলে গোড়াতেই সংকল্প করে ছবি আঁকতুম, মনের জিনিস বাইরে খাড়া হত —তাতেও আনন্দ আছে। কিন্তু নিজের বহির্বর্তী রচনায় মনকে যখন আবিষ্ট করে তখন তাতে আরো যেন নেশা।'

কয়েকদিন পরেও প্রায় এই কথাই লিখেছেন রাণী দেবীকে, 'রেখায় আমায় পেয়ে বসেছে। তার হাত ছাড়াতে পারছিনে। কেবলই তার পরিচয় পাচ্ছি নতুন নতুন ভঙ্গির মধ্য দিয়ে। তার রহস্যের অন্ত নেই।··· ছবিতে যে আনন্দ সে হচ্ছে সুপরিমিতির আনন্দ, রেখার সংযমে সুনির্দিষ্টকে সুস্পষ্ট করে দেখি —মন বলে ওঠে, নিশ্চিত দেখতে পেলুম।'

কবি আশ্রম-বিদ্যালয়ের ভার নিয়ে দেখাশুনা করছেন সেপ্টেম্বর মাস থেকে। ছবি আঁকছেন আপন মনে। নন্দলালকে ডাকছেন ঘন ঘন। রং ও রেখার ভাবনায় কবি ও শিল্পী একাত্ম হয়ে উঠছেন। শান্তিনিকেতন তীর্থ এই সময়ে এক মহাকবি ও এক মহাশিল্পীর ভাবসম্মিলনে সত্যই তীর্থ-মাহাত্ম্য লাভ করছে।

॥ রাজমহল-ভ্রমণ, ১৯২৮ ॥

এবারকার পূজার ছুটির সময়ে আচার্য নন্দলাল দলবল নিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে বেরিয়ে পড়লেন রাজমহলের উদ্দেশ্যে। শান্তিনিকেতন থেকে সোজা পথ বোলপুরে, লুপ লাইনের গাড়িতে চেপে কোপাই আমোদপুর সাঁইথিয়া মল্লারপুর রামপুরহাট নলহাটী মুরারই রাজগাঁ পাকুড়; পাকুড়ের পরে এই লাইন বারহারয়া তিনপাহাড় সকড়িগলি ভাগলপুর জামালপুর হয়ে মেন্ লাইনের কিউলে গিয়ে মিশেছে। এই শাখার তিনপাহাড় জংশন থেকে আর একটি ছোট শাখা-লাইন গেছে গঙ্গাতীরের রাজমহলে।

রাজমহল এককালে ছিল বাঙ্গালার রাজধানী। এর আগের নাম ছিল —আক্‌মহল। আরও অনেক বছর, এমন কি সাড়ে তিনহাজার বছরের

আগের ইতিহাস এখন জোড়া হচ্ছে। মাল্‌তোভাষী বুনো দ্রাবিড়দের এখানে কতদিন থেকে বাস সে-ও গবেষণা করে বের করা হয়েছে। সুপ্রাচীন মিশরীয় অভিযানের নিদর্শন কেউ কেউ অনুমান করছেন, এখানে রয়েছে 'ডোমিনিকো' পাহাড় এলাকায়। গয়ার ধামী ব্রাহ্মণদের পূর্বনিবাস ছিল এখানে। তাঁদেরই পড়শীরা এখানে ডোমিনিকো আপলে থাকতেন গত শতাব্দের গোড়া পর্যন্ত।

ষোল শতাব্দের শেষভাগে ওড়িষ্যা জয় করে ফেরবার সময়ে মানসিংহ ১৫৯২ খৃস্টাব্দে রাজমহলে বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। ১৬৪৯ খৃস্টাব্দের দিকে এখানে ছিলেন বাঙ্গালার শাসনকর্তা শাহ সুজা। তাঁর আমলে বাঙ্গালাদেশের 'পরম কল্যাণে আছিল ত সব প্রজা।' পরে বাঙ্গালার রাজধানী রাজমহল থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকায়। সুজার সময় থেকেই শহর রাজমহলের পতনের দশা। পিতা শাহজাহান বাদশাকে একখানি পত্র লিখে সুজা জানিয়েছিলেন, রাজমহলের ধ্বংসাবশেষ পরিবেশের মধ্যে তাঁর শরীর টিকছে না।' ছেলে-পিলেদেরও শরীর ভাল যাচ্ছিল না।

বর্তমানে রাজমহল একটি নগণ্য পল্লীর মতন। তবে গাঁয়ের পশ্চিমদিকে প্রায় চার মাইলব্যাপী পুরানো রাজধানীর ধ্বংসস্তূপ জঙ্গলের মধ্যে ঢাকা রয়েছে। এখনো ওখানে রয়েছে জুম্মা মসজিদ, শাহ সুজা আর মীরকাশিমের প্রাসাদ, ফুলবাড়ি ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ। এ সব হলো রাজমহলের পূর্ব-গৌরবের স্মৃতি। রাজমহল থেকে ছ-মাইল দক্ষিণপূর্বে হলো উধুয়ানালা। এখানেই মীরকাশিমের সেনাবাহিনী ইংরেজদের হাতে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল ১৭৬৩ খৃস্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর। তারপর থেকেই ইংরেজদের আধিপত্য শুরু হয়।

এবারে রাজমহলে থেকে অনেক স্কেচ্ করলেন আচার্য নন্দলাল। তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের ২৩সংখ্যক স্কেচ্‌বইয়ে রাজমহলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের স্কেচ্ রয়েছে। ১০সংখ্যক স্কেচ্‌টি হচ্ছে মানসিংহের দালান—সেই দালান থেকে মসজিদ দেখা যাচ্ছে। নন্দলাল বলেন, এই মসজিদটির পাশে একটি পুরাতন হিন্দু শিবমন্দির ছিল। মানসিংহ সেই শিবমন্দিরটির জীর্ণ সংস্কার করিয়েছিলেন। তিনি সেখানে নাকি পুজোও দিতে যেতেন। নন্দলাল যখন দেখেছিলেন তখন সে-মন্দিরটি গঙ্গার দিকে কাত হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থে নন্দলাল নানা মাছের ছবি এঁকেছিলেন। ১নং স্কেচ্-বইয়ে তার অনেক নিদর্শন রয়েছে। ১৯২৮ সালে রাজমহলে তিনি কিনেছিলেন রিটেমাছ। তার ছবি এঁকেছেন। এ-মাছের ভয়ানক তেল। এই স্কেচ্বইয়ের ৫২সংখ্যক পৃষ্ঠায় ছবি রয়েছে সেই তেল-ভরা মাছের।

একদিন ওঁদের ওখানে রিটেমাছ খাবার শখ হলো। কিনে এনে রান্না হলো। কিন্তু বাসনে-কোসনে আঁশটে গন্ধ। নন্দলাল সে-মাছ খেতে পারলেন না, কিন্তু তার ছবি আঁকলেন যত্ন করে। তবে নন্দলাল না-পারুন, অনেকেই খেলেন সে-মাছ পছন্দ করে। রিটেমাছের কাঁটাগুলো অনেকদিন ধরে তিনি রেখে দিয়েছিলেন কাজে লাগাবেন বলে।

এই সঙ্গে নন্দলাল নানা মাছের স্কেচ্ করেছেন। টাটকিনে মাছ, যাত্রাপুঁটি, পুঁটি গোথ্ম, তিনকাঁটা, ট্যাংরা, কটকটে। কটকটে মাছ পেট ফুলিয়ে ডাকে কটকট করে। সেজন্যে এর নাম হলো পেটফুলো কটকটে। এ-ছাড়া এঁকেছেন কৈ মাছ, গল্দা চিংড়ি।

রাজমহলে গিয়ে ওঁরা উঠেছিলেন গঙ্গাতীরের মানসিংহের ভাঙ্গা দালানে। তখন দালানের ছিল না কিছু, মাত্র থাম আর খানিক শেড্। মার্বেল আর কষ্টিপাথরে তৈরি সে দালানের বর্তমান রূপান্তর হয়ে গেছে অনেক।

১৯২৮সালে পূজার ছুটিতে শান্তিনিকেতনে এলেন চীনের সেই অধ্যাপক, কবি ও শিল্পীর পুরানো বন্ধু ৎসু-সী-মো। য়ুরোপ থেকে দেশে ফেরার পথে ভারতের মাটিতে পা দিয়ে তিনি কবি ও শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন। শান্তিনিকেতনে ৎসু-সী-মো-কে বিশেষ অভ্যর্থনা করা হলো।

পুজোর বন্ধে কবি একটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। এই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষণীয় বিষয়রূপে প্রবর্তিত হওয়া উচিত কিনা এই নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলছে। সরকারী শিক্ষাবিভাগ কবির মতামত চেয়েছিল। কবি বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলবার পক্ষে অধ্যাপক ভাতখণ্ডের নাম প্রস্তাব করেন। আর বলেন, সেকালের বাঙ্গালাদেশে শ্রেষ্ঠ গায়ক হলেন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙ্গালাদেশ কবির উপদেশ গ্রহণ করেনি। করেছিল লক্ষ্ণৌ।

পুজোর ছুটির পরে রথীন্দ্রনাথেরা য়ুরোপ সফর শেষ করে ফিরলেন।

সাহিত্য ও আর্টসৃষ্টির সঙ্গে বিদ্যালয়ের কাজ যুক্ত হওয়ায় কবি এই কাজের মধ্যে মনের মুক্তি লাভ করেছেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের মধ্যে থেকে থেকে পরিবর্তন চলছে। পুরাতন যাচ্ছে নূতন আসছে। বিশ্বভারতীতে শিক্ষাভবন বা কলেজ শুরু হয়েছে ১৯২৬সালে। এর মধ্যে ১৯২৭সালের জুলাই মাসে শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ ও ইংরাজীর অধ্যাপক জাহাঙ্গীর ভকিল চলে গেলেন। তাঁর স্থলে অধ্যক্ষ হলেন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমসুন্দর বসু। সেই সময়ে কিছুকাল স্কুল কলেজ এক-অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে আনা হয়। প্রেমসুন্দরবাবু ১৯২৮সালের ডিসেম্বরে য়ুরোপ চলে গেলেন। তখন অধ্যক্ষ হলেন নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলী। শ্রীনিকেতনের অধ্যক্ষ হয়েছেন রথীন্দ্রনাথ য়ুরোপ থেকে ফিরে আসার পরে। শ্রীনিকেতনে ডক্টর হ্যারি টিম্বার্সে'র কথা আমরা আগে বলেছি।

॥ প্রেমসুন্দর বসু, ১৯২৮ ॥

'ইনি ভাগলপুর থেকে আসেন। ধর্মে ব্রাহ্ম। অবিবাহিত ছিলেন। এখানে এলেন যখন, তখন বয়স হয়েছিল। খুব ভালো লোক ছিলেন। ছেলেদের ভালোবাসতেন খুব। তখন সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন প্রমদাবাবু। প্রমদাবাবুর সঙ্গে খিটিমিটি হতো রুটিনের ব্যাপার নিয়ে। লাইব্রেরীর সামনে দু-জনের ভীষণ ঝগড়া হচ্ছে, এমন দেখা গেছে। খুব চেঁচামেচি চলছে। ইনি বলেন, মিথ্যেকথা, —উনি বললেন, না, আপনি বলছেন মিথ্যা কথা, —এই সব। ছোটদের সামনে বড়োদের এইরকম গোলমাল খুব বেখাপ্পা হতো। আমরা দোতলার ওপরের কলাভবন থেকে ওঁদের চীৎকার শুনতে পেতুম। এই বছরেই আমরা কলাভবনের 'নন্দন' বাড়িতে এলুম।

'প্রভাতবাবুর বাড়িতে উনি একবার ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করলেন। তখন আশ্রমে অনেক খাঁটি ব্রাহ্ম রয়েছেন। সেই দেখে প্রভাতবাবু ব্রাহ্ম-সমাজের অনুকরণে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করে, সারমন্ দিতে আরম্ভ করলেন। সেখানে সব ব্রাহ্মরা গিয়ে বসে উপাসনা করতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সব কৃত্য ওখানে সবই করা হতো। প্রেমসুন্দরবাবু

একবার নিমন্ত্রিত হয়ে ওখানে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, রীতিমতো ব্রাহ্মসমাজ বসে গেছে। উনি তখন কলেজের অধ্যক্ষ। উনি বললেন, —না, এ-সব চলবে না। গুরুদেবকে বললেন গিয়ে। গুরুদেব প্রভাতবাবুকে ধমকালেন।

'প্রেমসুন্দরবাবুকে নেমন্তন্ন করাতেই প্রভাতবাবুর ব্রাহ্মসমাজ বন্ধ হয়ে গেল। প্রেমসুন্দরবাবু নিমন্ত্রণে যেতেই প্রভাতবাবুর ব্রাহ্মসমাজ ভেস্তে গেল।

শান্তিনিকেতনে এই সময়ে দেখতে এলেন ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইন ১৯২৮সালের ১৭ই ডিসেম্বর। বাঙ্গালার লাটসাহেবরা প্রায় সবাই এখানে এসেছেন। কিন্তু এখানে বড়লাটের আগমন এই প্রথম ও এই শেষ। বোলপুরের মতন একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে বড়লাটের আগমন একটি অভাবিত ঘটনা। তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে বহুদিন থেকে আয়োজন চলেছিল। এতদিন আশ্রমে গভর্নরগণ এসেছেন কিন্তু আশ্রমের ভেতরে পুলিশের ওপর কখনও কোনো ভার দেওয়া হয়নি। কিন্তু এবারে রাজনৈতিক অশান্তির কথা ভেবে কবি সে-দায়িত্ব নিতে সাহস পেলেন না। তিনি পুলিশের ওপর শাসনভার ছেড়ে দিলেন। আশ্রমের কর্মীদের সনাক্ত হবার জন্যে গেরুয়া আলখেল্লা পরতে হলো। এর পরেই এলো পৌষ উৎসব। কবি সে-উৎসব নিষ্পন্ন করলেন যথানিয়মে। মাঘোৎসবের পরে কবি গেলেন কলকাতা। একাধিক্রমে এবারে কবি সাড়ে তিন মাস ছিলেন শান্তিনিকেতনে। কারণ ক-দিন পরেই শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব, ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৯। শ্রীনিকেতনের উৎসবের পরে কবি কানাডা যাত্রা করলেন। কানাডা, জাপান সফর শেষ করে কবি জুলাই মাসের প্রথমে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন।

এদিকে আচার্য নন্দলাল সপরিবারে এবং ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। এবারে সঙ্গে ছিলেন মীরাদেবী, সুরেন্দ্রনাথ ও ছাত্র হরিহরণ। পাংখাবাড়িতে আছে রামকৃষ্ণ আশ্রম। তখন আশ্রম ছিল খালি। মিশনের মহারাজদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওঁরা পাংখাবাড়িতে আশ্রমে থেকে কার্সিয়াং দেখতে লাগলেন। গরমের ছুটিতে ওঁরা ওখানে

কাটালেন এক মাসের ওপর।

॥ কার্সিয়াং ভ্রমণ, ১৯২৯ ॥

সাহেবগঞ্জ দিয়ে গিয়ে নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে পূর্ণিয়া কিষণগঞ্জ তিস্তালিয়া শিলিগুড়ি হয়ে সে প্রায় পনেরো দিনের ঘুর-পথের যাত্রা এখন আর নাই। ১৮৮১ সালে দার্জিলিং পর্যন্ত রেলপথ বসে গেছে। ওঁরা গেলেন শিলিগুড়ি স্টেশন ছেড়ে পূবদিকে, তিস্তা-উপত্যকার লাইন ছেড়ে মহানদী-সেতু পার হয়ে পঞ্চনই জংশন দিয়ে। দার্জিলিং-এর উঁচু শিখরে ওঠার ছোট ট্রেনে চেপে এঁকেবেঁকে পাহাড়ের গা দিয়ে ঘুরে ঘুরে নানা কৌশলে ক্রমে ওপরে ওঠার এই ভ্রমণ ওঁদের খুবই ভালো লাগল। কিষণগঞ্জ-শাখাপথের বাগডোগরা, হাতিঘিষা নকশালবাড়ি স্টেশন শিলিগুড়ি থেকে কিছু কিছু দূরে দূরে তরাই-এর জঙ্গলের মধ্যে।

কিষণগঞ্জ-শাখা ছেড়ে দার্জিলিং-এর দিকে পঞ্চনই জংশনের পরের স্টেশন হলো শিলিগুডি, শিলিগুড়ি থেকে সাত মাইল দূরের সুক্না। এই পর্যন্ত রেললাইন গেছে প্রায় সমতলভূমির ওপর দিয়ে। রাস্তার দু-দিকে চা-বাগান। সুক্না থেকে তরাই-এর জঙ্গল আর পাহাড়ের চড়াই-এর শুরু। এর পর থেকে বনভূমির শোভা অদ্ভুত। যতদূর চোখ যায় কেবল গাছের সারি। শিল্পী নন্দলালের মন সহজেই এই শোভায় আকৃষ্ট হলো। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রেলপথ ক্রমেই ওপরে উঠছে। এই স্থানটি হলো বিশাল হিমালয়ের সিঙ্গলীলা পর্বতশ্রেণীর একটি উধ্বর্গামী বাহু। এই পর্বতশ্রেণীটি একদিকে নেপাল অন্যদিকে সিকিম আর দার্জিলিং জেলার সীমা নির্দিষ্ট করে উঠতে উঠতে কাব্রু, জন্নু আর কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তুঙ্গশিখরে গিয়ে শেষ হয়েছে।

শিলিগুড়ি থেকে কিছুদূর থেকেই লুপের সাহায্যে রেলপথ ওপরে উঠে গেছে চক্রাকারে। পাহাড় ঘুরে রেলপথ দিয়ে যেতে দেরি হয় বলে লুপ বা চক্র তৈরি করে গাড়িকে সহজে ওপরে ওঠানো হয়। রংটং স্টেশন পার হয়ে দু-নম্বর লুপ দিয়ে রেলপথ ওপরে উঠেছে। তিন নম্বর চক্র পার হয়ে শিলিগুড়ি থেকে ষোল মাইল দূরে চুনাভাটি ছাড়িয়ে কার্সিয়াং-এর কাছে মহলদীরাম পর্বতের কুঁজের মতন শিখর সিটং পাহাড় চোখে পড়ল।

এবার সহজে পাহাড়ে ওঠবার প্রথম রিভার্স। এর সাহায্যে ট্রেন প্রথমে সামনে এগিয়ে আবার পিছু হঠে আবার সামনে চলে, পরপর উঁচু পথ ধরে ওপরের দিকে উঠতে থাকে। প্রথম রিভার্স-এর পরেই শিলিগুড়ি থেকে কুড়ি মাইল দূরের তিনধারিয়া স্টেশনে এলেন। তিনধারিয়া ছেড়ে দু-নম্বর রিভার্স, চার নম্বর চক্র আর তিন নম্বর রিভার্স পেরিয়ে শিলিগুড়ি থেকে ২৪মাইল দূরের গয়াবাড়ি স্টেশন। গয়াবাড়ির পরেই চার নম্বর বা শেষ রিভার্স। এখানকার পাথর দেখবার জিনিস। এই পাথরের নাম হলো 'সিকিম নাইস্'। এখানেই প্রসিদ্ধ পাগলাঝোরা। এখানে গাড়ি থামল জল নেবার জন্যে। এই পাগলাঝোরার ওপর সত্যেন দত্ত কবিতা লিখেছিলেন। পাগলাঝোরাকে শৃঙ্খলিত করা তিনি পছন্দ করেননি।

পাগলাঝোরা ছাড়িয়ে শিলিগুড়ি থেকে ২৮মাইল দূরে মহানদী স্টেশন। সামনেই মহলদীরাম পর্বত থেকে মহানদী বা মহানন্দার উৎপত্তি।

মহানদী ছেড়ে একটি কাটিং পার হলে দূরে সমতলক্ষেত্রের অপরূপ দৃশ্য। পূব থেকে পশ্চিমে পর পর তিস্তা, মহানদী আর বালাসন এই তিনটি নদীকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেল। এর পরেই ট্রেন গিধর পাহাড়ের মধ্যে একটি কাটিং পার হলেই সহসা সামনে সম্পূর্ণ নতুন দৃশ্যপট। যতদূর চোখ যায় ধাপের পর ধাপ পাহাড়ের সারি নীল কুয়াসায় মিশে গেছে। আর এদেরই নিচে তরাই-এর ঘন জঙ্গলে অসংখ্য পার্বত্যনদী আর ঝরণায় রোদ পড়ে রুপোর মতন ঝকমক করছে। এর পরেই কার্সিয়াং স্টেশন।

কার্সিয়াং হলো শিলিগুড়ি থেকে বত্রিশ মাইল, কলকাতা থেকে ৩৫০ মাইল আর দার্জিলিং থেকে কুড়ি মাইল। কার্সিয়াং বড়ো স্টেশন। দার্জিলিং জেলার মহকুমা সদর। দার্জিলিং-এর মতন বড়ো সহর না হলেও সমৃদ্ধিশালী বটে।

হিমালয়ের বরফঢাকা পর্বতচূড়ার মধ্যে ঘুম পাহাড়ের ওপর দিয়ে জেগে থাকতে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাব্রু আর জন্নুর শিখরগুলিমাত্র। এখান থেকে বরফঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য দেখে আচার্য নন্দলাল প্রথম পরিকল্পনা করলেন দেবতাত্মা কাঞ্চনজঙ্ঘা নামে তাঁর ছবি-আঁকার।

কার্সিয়াং থেকে একটি প্রধান দ্রষ্টব্য হলো দক্ষিণদিকে বাঙ্গালাদেশের বিস্তীর্ণ সমতলভূমির দৃশ্য। এখান থেকে পাহাড় যেন হঠাৎ নিচে নেমে

গেছে। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রথমে দেখা যায় তিস্তা নদী। তারপর বাঁ থেকে ডান দিকে পর পর মহানদী বালাসন আর নেপাল-সীমায় মেচী নদী আর বুনো হাতীর আড্ডা মোরুং জঙ্গল। এখান থেকে তরাই-এর জঙ্গল দেখে বোঝা যায়, মাঝে মাঝে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ আবাদ করা হয়েছে। এখানে-সেখানে চা-বাগানের কারখানার টিনের চাল চোখে পড়ে। ঘন সবুজ ফিকে সবুজ —এই রকম সবুজ রঙের পার্থক্যের জন্যে এতদূর থেকেও চা-এর চাষ, ধান বা পাটের চাষ সহজেই ধরা যায়।

কার্সিয়াং দার্জিলিং-এর মতন উঁচু নয় আর ওখানকার মতন এখানে বেশি শীতও নয়। কিন্তু দার্জিলিং-এর চেয়ে এখানে বৃষ্টি হয় বেশি। কার্সিয়াং-এর চারদিকে পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য চা-বাগান। এখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমের সমতলভূমিতে নেমে যাবার একটি পাকা রাস্তা, শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাবার পাকা রাস্তা কার্সিয়াং সহরের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এই রাস্তার ওপরেই কার্সিয়াং-এর প্রধান বাজার। একটি সামান্য গ্রাম থেকে পর পর গড়ে উঠেছে কার্সিয়াং সহর। পথ ঘাট পরম রমণীয়। পাঙ্খাবাড়ি রোড, কাট্ রোড, ডাউহিল রোড রাস্তাগুলি খুবই সুন্দর। ইগেল্‌স্ ক্র্যাগ্ নামে একটি পাহাড়। তার উপর চড়ে একদিকে বিস্তৃত সমতলভূমি, অপর দিকে তুষারকিরীটমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গশ্রেণী। সঙ্গীদের নিয়ে আচার্য নন্দলাল এ-সব দৃশ্য দেখে মনে মনে তাঁর অনেক বিখ্যাত ছবির প্রেক্ষাপট এঁকে নিলেন।

স্টেশনেই পাওয়া যায় ঘোড়া আর ডাণ্ডি। ফলে,এ-অঞ্চলে চলাফেরার সুবিধা।

নন্দলালের ডায়েরি আর স্কেচবুকে কার্সিয়াং-ভ্রমণের তথ্য রয়েছে। বিশেষ করে তাঁর ২৩সংখ্যার কড়চাতে এই প্রসঙ্গে অনেক সংবাদ মিলবে। কার্সিয়াং-এ তিনি আবার গিয়েছিলেন। সে-কথা যথাসময়ে বলা হবে।

॥ সমালোচকের চোখে ভারতশিল্প সাধনার অগ্রগতি ॥

'অবনী-অসিত-নন্দলালকে কেন্দ্র করিয়া বাংলাদেশে যে শিল্পিগোষ্ঠীটি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ভারতীয় চিত্রসাধনার যে নবোদ্বোধন যুগের সূত্রপাত

হইয়াছিল, তাহা আজ সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই শিল্পি-গোষ্ঠী ও তাঁহাদের নূতন পদ্ধতি বহু বাধা বহু সংগ্রাম অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে সমগ্র দেশকে জয় করিয়াছে. দেশের শিল্পচর্চা ও শিল্পসাধনার একটি নূতন ধারার, একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করিয়াছে। এই শিল্পিগোষ্ঠীর শিক্ষা ও দীক্ষা লইয়া বাংলাদেশের তরুণ শিল্পীদল সিংহলে, অন্ধ্রদেশে, মাদ্রাজে, জয়পুরে, বরোদায়, গুজরাটে, লাহোরে, লক্ষ্ণৌয়ে যাঁহারা যেখানে গিয়াছেন বাঙ্গলার নবোদ্বোধিত ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতি সেইখানেই তার জয়পতাকা উড়াইয়াছে। তাহারই ফলে আজ দেশের সর্বত্র জাতীয় শিল্প-সাধনার এক নূতন রূপ দেখা যাইতেছে, নূতন বাণী শুনা যাইতেছে এবং সর্বত্র ইহার মর্যাদার দাবি স্বীকৃত হইতেছে। আমাদের সদ্যপুষ্পিত জাতীয় জীবনের মূলে কি বাংলার এই নবোদ্বোধিত শিল্পপদ্ধতি ও তাহার সাধন অলক্ষ্যে প্রাণরসের সঞ্চার করে নাই —জাতীয় জীবনকে কি মহত্তর মর্যাদা দান করে নাই ?

পঁচিশ বৎসর আগে অবনীন্দ্রনাথ যখন প্রথম প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া জাতীয় শিল্পসাধনার ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবার সুকঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করেন, তখন বাংলার একটি প্রতিভার দুর্বার শক্তি এমন করিয়া জয়যুক্ত হইবে, কে তাহা ভাবিয়াছিল ? তারপর দেখিতে দেখিতে নন্দলাল, অসিতকুমার, মুকুলচন্দ্র, সমরেন্দ্রনাথ একে একে সকলে আসিয়া সেই প্রতিভার কাছে দীক্ষা লইলেন, ধীরে ধীরে রূপসাধনার এক নূতন পথ খুলিয়া গেল ; বহু সাধনা বহু তপস্যার পর গুরুর সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যেরাও প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন, দেশ ও বিদেশ তাঁহাদের প্রতিভা স্বীকার করিল। কলিকাতায় অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যকলাসমিতি ও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত কলা-ভবনকে কেন্দ্র করিয়া এই নবোদ্বোধিত শিল্পসাধনা নূতন প্রাণে নূতন উৎসাহে দীপ্তি লাভ করিল। অবনীন্দ্রনাথের যোগ্যতম শিষ্য নন্দলাল শান্তিনিকেতন-কলাভবনের ভার লইলেন, অসিতকুমার গেলেন লক্ষ্ণৌ সরকারী কলাভবনের অধ্যক্ষ হইয়া, সমরেন্দ্র গেলেন লাহোরে শিল্পাধ্যক্ষ হইয়া, মুকুলচন্দ্র গেলেন জাপানে চীনে য়ুরোপে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে ; আজ তিনিও ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের কর্ণধার হইয়া

বসিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরা এইভাবেই বাংলায় নবোদ্বোধিত শিল্পের বাণী বাঙ্গলার বাহিরে বহন করিয়া লইয়া গেলেন।

কিন্তু এই জয়স্রোত এইখানেই বন্ধ হইয়া যায় নাই। দেখিতে দেখিতে শান্তিনিকেতনে যে নবীনতর শিল্পিদল গড়িয়া উঠিল তাঁহারাই আর এক নবীনতর জয়যাত্রার সূচনা করিলেন। অবনীন্দ্রনাথের নিকট ইঁহাদের মন্ত্র-দীক্ষা হইলেও সাক্ষাৎভাবে ইঁহারা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন নন্দলালের পদপ্রান্তে। সেই স্বল্পভাষী নিরহঙ্কার ঋষিপ্রতিম শিল্পাচার্যের নিকট ইঁহারা কর্মে ও জীবনে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহাকে তাঁহারা কখনও ব্যর্থ হইতে দেন নাই। যে পথ সহজ, যে পথে অর্থ ও খ্যাতি সহজে আসে, যে পথ লোভসঙ্কুল, ইঁহাদের গুরু সে-পথে চলিতে ইঁহাদিগকে শেখান নাই। এই শিল্পিদলের অনেকেই তাঁহাদের গুরুর মত দারিদ্র্যব্রতী; অর্থ ও খ্যাতির লোভ ইঁহাদিগকে মাঝে মাঝে বিচলিত করিলেও কখনও কখনও ইঁহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। নন্দলাল ও শান্তিনিকেতন-কলাভবনের দীক্ষা ও আশীর্বাদ লইয়া যাঁহারা বাংলার বাহিরে এই নূতন শিল্পসাধনার বাণী প্রচার করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা সংখ্যায় খুব বেশি না হইলেও এবং সুপ্রচুর প্রতিষ্ঠা গৌরবের অধিকারী না হইলেও যেখানে যিনি গিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার ব্রত তিনি সার্থক করিয়া আসিয়াছেন, এবং নূতন কর্মক্ষেত্রে দুর্জয় প্রতিভার সাহায্যে নূতন শিল্পসাধনার ধারাটিকে সুমহান্ গৌরবে প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছেন। শিল্পসাধনা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে যে বৃহত্তর বাংলার সৃষ্টি হইয়াছে, কলিকাতা ও শান্তিনিকেতনের এই শিল্পিগোষ্ঠী রহিয়াছে তাহার মূলে। শান্তিনিকেতন-কলাভবন হইতে যাঁহারা এই বৃহত্তর বাংলা সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রমেন্দ্রনাথ, মণীন্দ্রভূষণ ও অর্ধেন্দুপ্রসাদের নাম সহজে করা যাইতে পারে। রমেন্দ্রনাথ গিয়াছিলেন মছলিপট্টমে অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার অধ্যক্ষ হইয়া, মণীন্দ্রভূষণ গিয়াছিলেন সিংহলের সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পকেন্দ্রে; আর অর্ধেন্দুপ্রসাদ গিয়াছিলেন মাদ্রাজে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়া; ইঁহারা সকলেই আজ দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন; রমেন্দ্রনাথ কলিকাতা সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে একদল শিল্পী গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় আছেন; মণীন্দ্রভূষণ

রমেন্দ্রনাথকে সেই কাজে সাহায্য করিতেছেন; কিন্তু অর্ধেন্দুপ্রসাদ কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত না থাকিয়াও দেশে যাহাতে এই নবোদ্বোধিত শিল্পসাধনার প্রচার হইতে পারে, সাধারণের শিল্পবোধ যাহাতে জাগ্রত হয়, জাতীয় শিল্প যাহাতে জাতীয় জীবনের একটি সত্য অভিব্যক্তির রূপ ধারণ করিতে পারে, তাহার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহাদের ছাড়াও নন্দলালের শিষ্যদের অনেকেই দেশের নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ প্রতিষ্ঠাও লাভ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণের নাম করা যাইতে পারে; দেশে ও বিদেশে তাঁহার শিল্পসাধনার আদর হইয়াছে, সম্প্রতি বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউসের পরিচিত্রণের জন্য যে যে চারিজন বাঙালী শিল্পী নিযুক্ত হইয়াছেন, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁহাদের একজন। ইঁহাদের সকলের মধ্যে অর্ধেন্দুপ্রসাদের শিল্পসাধনার একটা বিশেষ স্থান ও মূল্য আছে। তিনি অত্যন্ত নীরব ও শান্তধর্মী কর্মী এবং সহজলভ্য খ্যাতি হইতে নিজেকে সর্বদাই ভয়ে ভয়ে দূরে রাখিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার যে পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাঁহার চিত্রনিদর্শনের মধ্যে যে শিল্পিমন এবং কলাকৌশলের নিপুণতা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাঁহার সলজ্জ গোপনতাকে অতিক্রম করিয়াছে, তাঁহার শিল্পপ্রতিভা অনাদৃত হয় নাই, সসম্ভ্রমে দেশ তাহা স্বীকার করিয়াছে।

বাল্যে ও কৈশোরে পিতার সহিত অর্ধেন্দুপ্রসাদকে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র, বিশেষ করিয়া নদীমাতৃক নিম্নবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের এবং পার্বত্যসমাজের অনেক স্থানেই ঘুরিতে হয়। বাঙ্গলাদেশের ঐশ্বর্যময়ী প্রকৃতি সেই সময় তাঁহার কবি ও শিল্পিমন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল; উদার আকাশের নীচে প্রবাহিত বিশাল পদ্মা সারি সারি পালতোলা নৌকা, ঘনবর্ষার পঙ্কিল জলের আবর্ত, কাশগুচ্ছালঙ্কৃত নির্জন তীরের হেমন্তকুহেলী-বিলীন ধান্যক্ষেত্র, শ্যামায়মান বাঙ্গলার বনানী ও বর্ষাস্নাত পার্বত্যভূমি কিশোর শিল্পিমনের উপর অপূর্ব মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিল। পাঠ্যাবস্থাতেই নানা-রঙের মাটি, পাতা ও ফুলের দ্বারা রঙীন চিত্রে তাঁহার হাত অভ্যস্ত হইয়াছিল, পরে সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে নিজের শিল্পবোধ অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ক্রমে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহা ছাড়া,

সমগ্র বাল্য ও কৈশোর তাঁহার কাটিয়াছে পূর্ববাংলার যাত্রা ও বাউল কবিগান ও কথকতার রস গ্রহণে। আমাদের দেশের সাধনা ও সংস্কৃতি এইভাবেই ক্রমশঃ তাঁহার চিত্তে ও মনে সঞ্চারিত হয় এবং তাঁহার শিল্পিমন তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠে। কোনো সজ্ঞান চেষ্টায় জাতীয় মন ও সংস্কৃতি তাঁহার শিল্পের মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই; ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি তাঁহার অনুরাগ এবং তাঁহার ভাবধারার সহিত আত্মীয়তাবোধ তাঁহার মনের মধ্যে আপনা হইতেই জাগিয়াছিল, যে-সাধনা ও সংস্কৃতির মধ্যে তিনি মানুষ হইয়াছেন তাহাই তাঁহাকে শিল্পসাধনার এই বিশেষ পথে প্রবর্তিত করিয়াছিল।

অর্ধেন্দুপ্রসাদ প্রথম কলিকাতার সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং নিজের কর্মকুশলতায় অল্পকালের মধ্যে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। পরে শান্তিনিকেতনে যখন কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অর্ধেন্দুবাবু অন্যতম প্রথম শিক্ষার্থীরূপে সেখানে প্রবেশ করেন। চিরাচরিত শিল্পপদ্ধতি ছাড়িয়া নূতন সাধনায় যাত্রার পথে তাঁহাকে কম বাধা অতিক্রম করিতে হয় নাই; শুধু রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের উৎসাহ ও পোষকতায় এবং নিজের আন্তরিক ইচ্ছা ও অনুরাগের বলেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। সুদীর্ঘ ছয় বৎসরকাল নন্দলালের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অর্ধেন্দুপ্রসাদ উড়িষ্যায়, দাক্ষিণাত্যে এবং ভারতবর্ষের শিল্প-সাধনার তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া অধিকতর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তাহার পর তিনি মাদ্রাজে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়া যান, কিন্তু নিজের কর্মপদ্ধতির সহিত কর্তৃপক্ষের মতানৈক্য হওয়ায় কাজ ছাড়িয়া দেশে ফিরিয়া আসেন, তবুও নিজের স্বাধীন মত ও পদ্ধতি বিসর্জন দিতে সম্মত হন নাই।

অর্ধেন্দুবাবুর ছবির মধ্যে ভাব, রং ও রেখার বিন্যাস, এবং অঙ্কন-পদ্ধতির একটা অপূর্ব সামঞ্জস্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার শিল্পি-চিত্ত বিশেষ করিয়া ভাবধর্মী, তাঁহার কল্পনার ঐশ্বর্য প্রচুর, তাই বলিয়া কলা-কৌশলের নিপুণতাও কম নয়। চিত্তবিশেষের ভাবব্যঞ্জনার জন্য যে-রকম কলাকৌশলের নূতনত্বের প্রয়াস যখন যেমন প্রয়োজন হয়, তিনি তখন তাহাই অবলম্বন করেন; এবং এই রকম অবস্থায় নানারকম নূতনত্বের প্রয়াসও করিয়া থাকেন, কোনো বাঁধাধরা নিয়ম তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে

না। এ বিষয়ে তাঁহার সাহস অপূর্ব। দুঃখের বিষয় তাঁহার অঙ্কিত অনেক প্রসিদ্ধ ছবি দেশের বাহিরে য়ুরোপ আমেরিকার নানা স্থানে চলিয়া গিয়াছে; মূল চিত্রের প্রতিলিপিও আর নাই. দেশে কোথাও তাহা প্রকাশিতও হয় নাই। বহুপূর্বে অঙ্কিত কোনো কোনো ছবির সঙ্গে বাংলাদেশের শিল্প-রসিকেরা হয়ত পরিচিত; প্রবাসীতেও অনেকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। পরিচিত ও প্রকাশিত ছবির মধ্যে তৈমুরলঙ, চীনসম্রাট, নববধূ, সাথী, ফুলমেলা প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

কিছুকাল যাবত অর্ধেন্দুবাবু কলিকাতাকেই তাঁহার শিল্পসাধনার কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রে যাহাতে একটা শিল্পবোধ জাগ্রত হইয়া উঠে, ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা যাহাতে জাতীয় শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠে, সেদিকে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা আছে। তাঁহার পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ সত্যই প্রশংসনীয়। শুধু চিত্রাঙ্কনে নয়, মৃণ্ময় ও ধাতু-শিল্পে, লাক্ষার কাজে, কাঠ-খোদাই কাজে, বর্তিকশিল্পে, গৃহসজ্জায় ও অলঙ্কার এবং বসনভূষণেব পরিকল্পনায়ও তাঁহার কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। অর্ধেন্দুপ্রসাদ যুবক; বিপুল তাঁহার শক্তি, অপূর্ব তাঁহার উৎসাহ, যদিও তিনি একটু নীরবধর্মী। বাংলাদেশের শিল্পপ্রচেষ্টায় তাঁহার মত উদ্যমশীল, শক্তিসম্পন্ন, ভাবসমৃদ্ধ নির্লোভ যুবকেরই প্রয়োজন। বিদেশের বিচিত্র শিল্পসাধনার কেন্দ্র হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার একটা আগ্রহ তাঁহার বহুদিন হইতেই আছে। সে-সুযোগ যদি তাঁহার কখনও আসে তবে তাঁহার সমৃদ্ধ শিল্পসাধনা সমৃদ্ধতর হইবে; ইহাই আমাদের একান্ত বিশ্বাস। নিজের গোপনতা হইতে নিজেকে যদি তিনি সজোরে মুক্ত করিয়া লইতে পারেন, তবে তাঁহার সাধনা জয়যুক্ত হইবে; দেশের কলালক্ষ্মীর প্রসাদ তিনি লাভ করিবেন, ইহা ধ্রুব।—(প্রবাসী ১৩৩৮, ফাল্গুন)।

॥ আশ্রম-সংবাদ, ১৯২৮ ॥

ইণ্ডিয়ান্ সায়েন্স কংগ্রেসের সদস্যগণ স্পেশ্যাল ট্রেনযোগে ১৯২৮ সালের ৬ই জানুয়ারি শান্তিনিকেতন ভ্রমণে এলেন। Mr. H. E. Stapelton এবং

Dr. J. N. Mukherjee ছিলেন এই কংগ্রেসের স্থানীয় সম্পাদক। তাঁদের উদ্যোগে শান্তিনিকেতন-ভ্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এঁদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। এ্যাণ্ড্রুজসাহেব বোলপুর স্টেশনে সদস্যগণকে অভ্যর্থনা করে শ্রীনিকেতনে নিয়ে যান। তাঁরা সকলেই খুব আনন্দ উপভোগ করেন। শ্রীনিকেতনের তাঁতশিল্প, রেশমশিল্প, মুরগীপালন-বিভাগ দেখিয়ে কৃষিবিভাগের কর্মীরা বিভাগীয় উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি বেশ ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তাঁরা বাঁধগড়া-পল্লীসংস্কার-কেন্দ্র পরিদর্শনে এলেন। দেখলেন, একদল ব্রতীবালক জঙ্গল আর খাল-ডোবা পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। কালীমোহন ঘোষ ব্রতীবালকদের উৎসাহ ও উদ্যমের কথা তাঁদের বুঝিয়ে বলেছিলেন। বৈকালে সদস্যেরা শান্তিনিকেতনে এলেন। গ্রন্থাগার এবং উপরতলার কলাভবন সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হলো। আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে তাঁদের চা-পান করানো হয়। চা-পান শেষ হলে 'সিংহসদনে' একটি সাধারণ সভা হলো। এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব এবং রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দিয়েছিলেন। সভা শেষ হলে অতিথিদের নিয়ে আসা হলো কবির আবাস উত্তরায়ণে। কবি এখানে নিজের কয়েকটি বাঙ্গালা আর ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। গানও হলো। রাত্রি ১০টার সময়ে সদস্যেরা কবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বোলপুরের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। দলবল নিয়ে নন্দলাল সেদিনও পাহাড়পুর থেকে ফেরেননি। তাঁর অনুপস্থিতিতে সেদিন আশ্রমের বিদগ্ধ কর্তৃপক্ষের অনেকেই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

১৯২৮সালের জানুয়ারি মাসে প্রাগ্ থেকে Prof. Vinko Lesni এলেন visiting professor হয়ে। তিনি ভালো বাঙ্গালা শিখে 'লিপিকা' চেক্ ভাষায় অনুবাদ করেন। কবির সংক্ষিপ্ত জীবনীও লিখেছিলেন চেক্ ভাষায়। ১৫ই এপ্রিল সংসদের মিটিং-এ তাঁকে বিশ্বভারতীর সদস্য করার জন্যে সুপারিশ করা হয়। গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে তিনি আশ্রম থেকে বিদায় নেন। গুরুদেব বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে তাঁকে বিশ্বভারতীর সীল-মারা সোনার একটি আংটি উপহার দেন। প্রতিভাষণে লেস্নি বলেছিলেন,—তাঁর যথাসাধ্য তিনি বিশ্বভারতীর জন্যে করবেন। অধ্যাপক লেস্নি সম্পর্কে নন্দলালের কথা আগে বলা হয়েছে।

বসন্তোৎসব —১৩৩৩ সালের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হলো। আশ্রমবাসিগণ প্রভাতে বাসন্তী রঙের বসন ও উত্তরীয়ে ভূষিত হয়ে আম্রকুঞ্জে সমবেত হয়েছিলেন। আম্রকুঞ্জের বেদীটি আলপনা আর ফুল-মালা দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়। মুকুল-ধরা আমের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল নানা রঙের রেশমী উত্তরীয়। সারিবদ্ধ হয়ে আশ্রমকন্যাগণ গান গাইতে গাইতে এলেন —পুষ্পপাত্র, মঙ্গলঘট, ধূপদানি বহন করে। কেউ করেছিলেন শঙ্খধ্বনি, তাঁরা এলেন আশ্রম পরিক্রমা করে। গুরুদেব নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করলেন। আশ্রমবাসী তরুণ কবিদের কবিতা সেবারে আবৃত্তি করলেন কবিগুরু স্বয়ং। সেদিনের তরুণ কবিদের মধ্যে নিশিকান্ত রায়চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। সন্ধ্যায় 'ফাল্গুনী' নাটক মঞ্চস্থ হলো। কবি স্বয়ং 'অন্ধ বাউলে'র ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

১৯২৮সালের ১৪ই জুলাই বৃক্ষরোপণ-উৎসব হলো গৌরপ্রাঙ্গণে। উত্তরায়ণে প্রতিমাদেবীর টবে ছিল একটি বকুল গাছ। সেই টবের গাছটিকেই এবারে প্রাঙ্গণে রোপণ করা হলো। নৃত্যপরা ও সঙ্গীতরতা আশ্রমকন্যাগণ রঙীন পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে সারিবদ্ধভাবে উৎসবমণ্ডপের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁদের হাতে ছিল প্রদীপ, পুষ্পপাত্র, ধূপদানি। শঙ্খধ্বনিও করা হচ্ছিল। দু-টি তরুণ —আর্যনায়কম্ আর মাসোজী ছিলেন বৃক্ষ-বাহক। এঁদের ছিল শুভ্র উত্তরীয়। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বৈদিক মন্ত্রপাঠ করলেন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম-এর প্রসঙ্গে কবির লেখা কবিতা পাঠ করলেন স্বয়ং কবি। সভায় পঞ্চভূত মূর্তিমান্ হয়েছিল। পঞ্চভূত সেজেছিলেন —ক্ষিতি —সত্যেন্দ্রনাথ বিশি (কলাভবনের ছাত্র), অপ্— সুধীর খাস্তগীর (ঐ), তেজ —প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ), মরুৎ —মনোমোহন ঘোষ (বিদ্যাভবনের গবেষক ছাত্র), ব্যোম —অনাথনাথ বসু (পাঠভবনের শিক্ষক)। এঁদের রূপসজ্জা করেন নন্দলাল আর সুরেন্দ্রনাথ।

পরদিন ১৫ই জুলাই শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব হলো। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং হল-চালনা করেছিলেন। কৃষি বিষয়ে বৈদিকমন্ত্র পাঠ করেন বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়। উৎসবে সভামণ্ডপ সাজানো হয়েছিল গ্রামের নানা সব্‌জী আর শস্যসম্ভার দিয়ে। মণ্ডপে সরষে, মুসুর ডাল, তিল ইত্যাদি নানা রঙের শস্যের আলপনা সকলের মনে বিস্ময় জাগিয়েছিল। এ সবই হলো আচার্য

নন্দলাল আর শ্রীসুরেন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার বাস্তব রূপকারিতা। হলকর্ষণের জন্যে নির্দিষ্ট স্থানটিও আলপনামণ্ডিত করা হয়। হালের বলদ আর লাঙ্গলটিকে সাজানো হলো ফুলমালা দিয়ে। ফার্মের কর্মীরা নতুন কাপড় পরে আর নতুন গামছা মাথায় বেঁধে উৎসবসজ্জায় সেজে চাষের যন্ত্রপাতি নিয়ে এলো শোভাযাত্রা করে। সমবেত সঙ্গীতের পরিবেশে গুরুদেব স্বয়ং স্বহস্তে হল-চালনা করলেন জনক রাজার মতন। একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণও দিলেন। এই উৎসবটিকে স্মরণীয় করবার জন্যে নন্দলাল এখানকার উন্মুক্ত প্রাচীরে যে দেওয়ালচিত্র করলেন তার বিবরণ আগে দেওয়া হয়েছে।

পূজার ছুটি এসে গেল। ১৮ই অক্টোবর শারদোৎসবে শিক্ষক-ছাত্র মিলে 'গুরু' নাটকটির অভিনয় করা হলো। আকাশে ছিল পূর্ণচন্দ্র। আসর বেশ জমে উঠেছিল। একক-গানের সুরে আর সমবেত ঐক্যতানে সকলে মোহিত হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য নন্দলাল ও তাঁর কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের মণ্ডপসজ্জায় এই অনুষ্ঠান অপরূপ হয়ে উঠেছিল।

১৯২৮সালের পূজার বন্ধে শান্তিনিকেতনে এলেন চীনা অধ্যাপক ৎসু-সী-মো। ইনি ছিলেন ১৯২৪সালে চীনভ্রমণের সময়ে রবীন্দ্রনাথ-নন্দলালদের সঙ্গী ও দোভাষী। শান্তিনিকেতনে আচার্য নন্দলাল তাঁর পুরাতন বন্ধুকে পেয়ে খুব খুশি হলেন।

এর মধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সত্তরতম জন্মদিন পালিত হবে। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নন্দলালের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দশ বছরেরও বেশি। শিল্পীর গুণে বিজ্ঞানী মুগ্ধ। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা, নন্দলাল তাঁর এই জন্মোৎসব-সভায় উপস্থিত থাকেন। জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে নন্দলালকে তাঁর ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে লিখলেন—

'কল্যাণীয়েষু—

নন্দলাল, তুমি জগদীশের অভিনন্দনসভায় উপস্থিত থাক এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া জগদীশ আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। তোমার জন্য প্রবেশ পত্রিকা রথীর নিকট আছে।—ইতি ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫'।

১৯২৮সালের ১৭ই ডিসেম্বর ভারতের বড়লাট ও ভাইসরয় লর্ড আর-উইন্ শান্তিনিকেতন দেখতে এলেন। বঙ্গদেশের গভর্নরগণ প্রায় সবাই এখানে এসেছিলেন। কিন্তু, বৃটিশ আমলের বড়লাটের শান্তিনিকেতন সফর এই প্রথম

ও শেষ। বোলপুরের মতন একটি ছোট্টপল্লীতে এ ঘটনা অভাবনীয়। বহুদিন ধরে তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন চলেছিল। আশ্রমে কোনো গুভর্ন'র এলে, আশ্রমের ভিতরে শৃঙ্খলারক্ষার ভার পুলিসের ওপর আগে কখনও ছেড়ে দেওয়া হয়নি। কিন্তু, এবার দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করে রবীন্দ্রনাথ পুলিসবিভাগের ওপর এই ভার দিয়েছিলেন। আশ্রমের কর্মীদের সনাক্ত হবার জন্যে অধ্যাপকদের মধ্যে কয়েকজন লাল আর গেরুয়া রঙের বকু পরিধান করেছিলেন। এই আনুষ্ঠানিক পরিচ্ছদের পরিকল্পনা স্বয়ং কবির ও নন্দলালের।

কলাভবন (School of Art and Music)। —১৯২৮ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, পরিচালক নন্দলালের পরিচালনায় এই বিভাগের দ্রুত প্রসার ঘটেছে। ভাস্কর্যশিল্পের রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছিল এই বছর থেকে। বেশকিছু ছাত্রছাত্রী যোগ দিয়েছেন মূর্তিগঠন বিভাগে। এই বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্যে কলাভবন Miss Lisa Vont Pott-এর কাছে কৃতজ্ঞ। অস্ট্রীয়ান মহিলাশিল্পী লিজা ভন্ পট শান্তিনিকেতনে সর্ব-প্রথম য়ুরোপীয় প্রথায় মাটির মূর্তি গড়ে তার ছাঁচ নিতে শেখান প্লাস্-টার অব্ প্যারিস্ দিয়ে। কলাভবনে তাঁর প্রথম ছাত্র হলেন শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী ও শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে আরও কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী এই ক্লাসে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কুমারী লিজার ফরমাস মতো নন্দলাল কয়েকটি ঘুরণ চৌকি তৈরি করিয়ে দিলেন একবুক-সমান উঁচু করে। পূর্বতোরণ-ঘরের দোতলায় মডেলিং ক্লাস প্রথম পত্তন হয়। লিজা চলে যাওয়ার পরে, মাদাম মিলার্ড্ নামে এক ইংরেজ মহিলা এই মডেলিং ক্লাসের ভার নিয়েছিলেন। এই বিষয়ে তৎকালীন কলাভবনের ছাত্র শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ বিবরণ এইরূপ :—

'সুধীর, কিঙ্কর, বনবিহারী, সত্যেন প্রভৃতি ছাড়া মেয়েরাও কয়েকজন যোগ দিয়েছিলেন সে ক্লাসে, মাস্টারমশাই নিজেও যোগ দিতেন সুবিধা পেলেই। তারপর একজন অস্ট্রিয়ান পুরুষ শিক্ষক এসে ক-দিনেই নিজের অযোগ্যতার পরিচয় দিয়ে চলে গেলে মাস্টারমশাই নিজে মডেলিং ক্লাসের ভার নেন। প্রথম দিকে আমরা শ্মশান থেকে মড়ার মাথা তুলে এনেছি,

অস্থিসংস্থান বোঝার জন্যে ; গ্রে-র অ্যানাটমি কাজে লাগিয়েছি, পুকুর থেকে মাটি তুলে এনেছি নিজেরা। পরে মাস্টারমশাই তারে-গাঁথা কঙ্কাল এবং ভাস্কর্যবিষয়ক অনেক বই কিনে দিয়েছিলেন। প্রতিকৃতি এবং কাল্পনিক মূর্তি কিভাবে চারদিকে থেকে দেখতে হয়, কোন দিক থেকে যাতে রচনাটি অসুন্দর না দেখায় তার জন্যে কিভাবে তাকে ছাঁটতে বা বাড়াতে হয় সে সব যখন শেখাতেন, তখন মনেই হতো না, তিনি আসলে চিত্রকর, অতি শৈশবে ছাড়া, মূর্তি গড়া তাঁর কোনদিন অভ্যাস ছিল না। 'নটীর পূজা'র ছোট্ট মূর্তিটীতে তাঁর সে যুগের স্মৃতি ধরা আছে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কিঙ্কর আজ ভাস্কর হিসাবে ভারতে এবং বহির্ভারতে খ্যাতিলাভ করেছেন, সুধীর খাস্তগীরও দেশবিখ্যাত হয়েছেন।

ক্লাসে ব্যবহৃত বিরাট ঘুরণ-চৌকি ছুটির সময়ে বাড়ি নিয়ে যেতে না পারায় ছাত্রদের পাছে কাজ বন্ধ থাকে সেইজন্যে মাস্টারমশাই দু খানা এক-হাত চৌকো খুরো-দেওয়া কাঠের পাটার মধ্যে, গোল খাঁজ কেটে, কয়েকটা লোহার গুলি সাজিয়ে, একরকম মজার ঘুরণ-চৌকি করে দিয়েছিলেন। সেগুলি ট্রাঙ্কের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যেত, টেবিলে বা মাটিতে রেখে তার উপর দু-ফুট উঁচু আবক্ষ প্রতিমূর্তি বা কাল্পনিক রচনা করা চলত। মালসায় তুষের আগুন করে ছোট মূর্তি সহজে পুড়িয়ে নেওয়ার পদ্ধতি তিনি লিজা ফন পটকে শিখিয়েছিলেন, আবার ছাঁচ-ঢালাই-এর কাজ তাঁর কাছে শিখেছিলেন। শিখতে লজ্জা এবং শেখাতে কার্পণ্য তাঁর কোন দিন দেখিনি। বলতেন, 'অনুশীলন চিরদিন রেখে যাবে, যেখানে যে অবস্থায় থাকো, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ যেমন সন্ধ্যাহ্নিক না করে জল খান না, তেমনি কিছু না কিছু এঁকে দিন আরম্ভ করবে, কিছু না কিছু শিখবে প্রতিদিন। যেদিন শিল্পীর শেখার আগ্রহ যাবে, বুঝবে সেদিন তার মৃত্যু হয়েছে। আমি যেদিন শেখা বন্ধ করব, সেদিন আমার আর শেখাবার অধিকার থাকবে না।'

বিনোদবাবুর গাছপালা জন্তু-জানোয়ারের স্টাডি, রমেনবাবুর লিথো, উড্‌কাট্ প্রভৃতি নানাদিকে আগ্রহ, ধীরেনদার নিখুঁত ফিনিশিং প্রভৃতি দেখতে বলতেন ; বলতেন, 'আমি ওদের কাছে অনেক শিখি।' রামকিঙ্কর বাস্তবানুগ রীতির ছবি এবং মূর্তিতে অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, পরে

তিনি যখন য়ুরোপীয় ধাঁচের 'অতি প্রাকৃত' রীতি ধরলেন তখন মাস্টার মশাই দুঃখ পেয়েছিলেন, তবু বলেছিলেন, 'ওর মতো ভাস্কর আজ ভারতবর্ষে নেই। ছাত্রদের সঙ্গে মতবিরোধ হতো মাঝে মাঝে, সামনে তাদের বকতেন, আবার আড়ালে প্রশংসা করতেন।'

॥ চিত্র-প্রদর্শনী ॥

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের প্রদর্শনীতে শান্তিনিকেতন থেকে ছবি পাঠানো হয় প্রায় প্রতি বছরেই। কলকাতায় স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের কলাভবনে গুরু ও শিষ্যবর্গের আঁকা ছবি নির্বাচন করে সোসাইটির প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দিতেন। ১৯২৬-২৭সনে যে-সমস্ত ছবি টাঙ্গানো হয়েছিল তার মধ্যে নন্দলালের আঁকা মাতৃমূর্তির ছবিগুলির প্যানেল শিল্পরসিকবর্গের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। নন্দলালের সহজাত চিত্রপ্রতিভার প্রকাশ প্রসঙ্গে জনৈক শিল্পসমালোচকের মন্তব্য—চিত্রকর যে-যুগেই আবির্ভূত হন না কেন, তাঁহার হাতের কাজে কতকগুলি ধরাবাঁধা 'ফর্ম' থাকেই, সেগুলি তিনি কাজে লাগাইতে বাধ্য। নন্দবাবুর ওপরেও নানারূপ পূর্বতন 'ফর্মে'র প্রভাব আছে। প্রথম জীবনে তাঁহার চিত্রে অজন্তার ছায়া ছিল এখন হয়ত পটের প্রভাব আছে। কিন্তু এই অনুচিকীর্ষাই তাঁহার চিত্রকলার সবটুকু নয়। প্রচলিত ধারাকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নূতন জীবন ও নূতন রূপ দিতে পারাই প্রতিভাসাপেক্ষ। নন্দবাবুর এই প্রতিভা আছে, ইহা সকলেই অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিবে। —('বঙ্গশ্রী' প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪০)।

১৯২৮সালে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ছাত্রদের একটি প্রদর্শনী। কলাভবনের দু-জন দক্ষিণী-ছাত্র ভি. আর. চিত্রা এবং পি. হরিহরণ একটি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এই প্রদর্শনীর ফলে দক্ষিণভারতে শান্তিনিকেতন-কলাভবনের যথেষ্ট সুনাম প্রচার হয়।

শান্তিনিকেতনে পৌষ-উৎসব যথাবিধি নিষ্পন্ন হলো। মাঘোৎসবের পরে কবি কলকাতা গেলেন। নন্দলাল কলাভবনের নতুন বাড়িতে যাবার

উদ্যোগ করছেন। গ্রন্থাগারের ওপরতলায় এতদিন কলাভবনের ক্লাস চলছিল। কলাভবনের নতুনবাড়ি তৈরির জন্যে ১৯২৭সালের ডিসেম্বর মাসে ত্রিশ হাজার টাকা অনুমোদন হয়েছিল। ১৯২৮সালে বাড়ি তৈরির কাজ দ্রুত চলছে। ১৯২৯সালের প্রথম দিকেই সে-বাড়ি তৈরি শেষ হবে। কলাভবনের ক্রমবর্ধমান আর্ট-মিউজিয়ামের সংগ্রহ রাখবার জন্যে যথেষ্ট জায়গা মিলবে এ-বাড়িতে। কলাভবন নতুন বাড়িতে গেলে, গ্রন্থাগারের দোতলাটি ব্যবহারের জন্যে পাবেন গ্রন্থাগার আর বিদ্যাভবন। কলাভবনের এই নতুন বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা হয়েছিল ১৯২৩ সাল থেকে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ভারতশিল্পী নন্দলালের পরিচালিত বিশ্বভারতী-কলাভবনের নব-নির্মিত অট্টালিকার দ্বারোদ্‌ঘাটন-উৎসব উপলক্ষে নন্দলাল ও তাঁর শিল্পপ্রতিভার আদর্শ-বৈশিষ্ট্যকে অভিনন্দন জানিয়ে ১৯১৪সালের পরে, এই দ্বিতীয় সংবর্ধন-বাণী রচনা করলেন :

হে সুন্দর, খোলো তব নন্দনের দ্বার,
মর্ত্যের নয়নে আনো মূর্তি অমরার।
অরূপ করুক লীলা রূপের লেখায়,
দেখাও চিত্তের নৃত্য রেখায় রেখায়॥

রবীন্দ্রনাথ নবপ্রতিষ্ঠিত এই কলাভবন-বাড়ির নাম দিলেন —'নন্দন'। নন্দলালের নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, তাঁর শিল্প-সুষমা সৃষ্টির এই নামটি সার্থক। এবং কোন্ আদর্শের পথে নন্দলালের তুলিকা পরিচালিত হচ্ছে বা হবে সে-কথাও কবি তাঁর এই অপূর্ব কবিতাটির মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন।

এই সময়ে কলাভবনের নিজস্ব বাড়ি ছাড়া, আরও তৈরি হলো মেয়েদের হস্‌টেল 'শ্রীসদন' আর পিয়ার্সনসাহেবের নামে হাসপাতাল-বাড়ি। কলাভবন এতদিন স্থান থেকে স্থানান্তরে বসে এসেছে; অবশেষে কলাভবন আপন বাড়ি পেল।

১৯২৯সালে মাঘোৎসবে জোড়াসাঁকোয় নাচগানের অনুষ্ঠান করা হলো। অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হলো 'সুন্দর'। এই 'সুন্দর' ১৯২৫সালে অনুষ্ঠিত 'সুন্দরে'র থেকে আলাদা। এবারকার সুন্দরের কবি পরিকল্পনা করেছিলেন শান্তিনিকেতনে বসে। তিনি মাঘোৎসব উদ্‌যাপন করলেন

আশ্রমের মন্দিরে।

১৯২৯সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব হলো। রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দিলেন সমবায়নীতির সার্থকতা বিষয়ে। শ্রীনিকেতনের উৎসব সাঙ্গ করে কবি কানাডা যাত্রা করলেন ২৬-এ ফেব্রুয়ারি।

॥ তপতী অভিনয় ॥

১৯২৯সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কানাডা ও জাপান ভ্রমণের সময়ে কবি কয়েকদিন বোম্বাই-এ অম্বালালের অতিথি হয়েছিলেন। মার্চে চীনে পৌঁছে শাংহাই-এ দু-একদিন ছিলেন সু-সী-মো-র বাড়িতে। টোকিও গিয়ে উঠেছিলেন ইম্‌পিরিয়ল হোটেলে। কবি এই তৃতীয়বার জাপানে এলেন। দ্বিতীয়বার এসেছিলেন ১৯২৪সালে। তখন সঙ্গে ছিলেন নন্দলাল।

কানাডা ও জাপান সফর শেষে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন জুলাই মাসের প্রথম দিকে। শান্তিনিকেতনে তখন ঘোর বর্ষা নেমেছে। এমন বাদলে কবির মনে 'সুরের মেঘ' ঘনিয়ে আসে ; কিন্তু এবারে আষাঢ়ের আহ্বানে তাঁর অন্তর সাড়া দেয়নি। কবি লিখেছেন, —'হয়তো ছবি আঁকতে যদি বসি তাহলে কলম সরবে কিন্তু কাব্যভাবনার স্পর্শে তাকে চঞ্চল করতে পারছে না'। কবি নিঃসঙ্গ বোধ করছেন। ছবি আঁকা চলছে, কিন্তু কবিতা লেখা বন্ধ। কিছুকাল ধরে এই নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হয়েছে তাঁর ছবি —'অদৃশ্য অজ্ঞাত অভাবিত রূপের আবির্ভাবে সময় নীরন্ধ্র হয়ে ওঠে। নন্দলালের সঙ্গে তখন তাঁর সমমর্মিতা।

এই সময়ে কবি হাত দিলেন 'তপতী' রচনায়। কিছুদিন আগে কলকাতায় 'রাজা ও রাণী' নাটিকা অভিনয় করবার আয়োজন করেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি সেটাকে সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করে অভিনয়-যোগ্য করবার চেষ্টা করেছিলেন। তার নাম দিয়েছিলেন 'ভৈরবের বলি'। কিন্তু সে নাটক তাঁর পছন্দ হয়নি। নতুন করে লিখলেন। শেষ হলো ২২-শ্রাবণ ১৩৩৬ (১৯২৯)। 'রাজারাণী' ছিল কাব্য-নাট্য, 'তপতী' লিখলেন গদ্যে। 'তপতী' নাটকের মধ্যে বিক্রম মীনকেতন-মদনের উৎসব করছেন।

তপতী-পর্বে উত্তরায়ণের 'উদয়ন' অট্টালিকার ওপর পুষ্পধনুর প্রতীক 'মীনকেতন' ওড়ানো হয়েছিল। —এ খবর দিয়েছেন রবীন্দ্রজীবনীকার (র. জী. ৩ পৃ. ৩৫৮)।

শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে বৃক্ষরোপণ আর হলকর্ষণ উৎসব সেরে (১৯২৯) কবি গেলেন কলকাতা। তপতী নাটকের খসড়া বন্ধুমহলে পড়ে শোনালেন। কারণ শীঘ্রই তার অভিনয়ের আয়োজন করতে হবে। কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে রবীন্দ্রপরিষদের ভাষণ দেবার পরে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। তপতী অভিনয়ের ব্যবস্থা করবার জন্যে নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন। নাটকের মহড়া শুরু হলো। কবির বয়স তখন সাতষট্টি। তিনি 'বিক্রমে'র ভূমিকা গ্রহণ করলেন। কবি ও শিল্পীর সহযোগে নাটকের মহড়া চলছে দিনের পর দিন।

কলকাতায় 'তপতী'র দল যাবার আগে উত্তরায়ণে একদিন অভিনয় হলো বিনা সাজে। তারপরে, জোড়াসাঁকোয় অভিনয় হলো চারদিন ধরে — ১৯২৯সালের ২৬, ২৭. ২৯ সেপ্টেম্বর আর ১লা অক্টোবর। এবারকার অভিনয়ে নাট্যমঞ্চ-পরিকল্পনায় বিশেষত্ব হলো, এতে দৃশ্যপটের কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। এ-কাজ করা হয়েছিল আলো নিয়ন্ত্রণ করে। এ-কথা আমরা আগে বলেছি। তপতীর অভিনয় আর মঞ্চপরিকল্পনা কলকাতার নাট্যজগতে একটি নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই মঞ্চ-কল্পনার মূলে ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ আর নন্দলাল। এবং প্রযোজক হলেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর।

'পূর্বে, ম্যাডান থিয়েটারে শারদোৎসব অভিনয়ের সময়ে আমি সীনের (scene) বদলে বিভিন্ন রঙের কাপড়ের wings আর border-এর প্রবর্তন করলুম। রঙের grade ও depth পাবার জন্যে বিভিন্ন রঙের বিন্যাস করে stage সাজিয়েছিলুম। সেই সময়ে দর্শকদের মধ্যে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। তিনি বললেন, —'এটা একটা নতুন প্রবর্তন করেছো হে'। তারপর থেকে এই রীতিতে stage-তৈরি চলে আসছে।'—এই উক্তি স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথের (২১ | ১১ | ১৯৬৭)।

নন্দলালের প্রথম পর্যায়ের ৫সংখ্যক স্কেচ্ বুকে তিনি এই '

নাটক অভিনয়ের নানারকম স্কেচ্ করে রেখেছেন। তাঁর কথায়: 'তপতী' নাটক যখন হয় সেই নাটক থেকে নানারকম স্কেচ্। অমিতা ঠাকুর 'তপতী' সাজেন। গুরুদেব 'রাজা' সেজেছিলেন। এতে অনেকেরই character আছে। Jump হলো বিভিন্ন চরিত্র (১) অনাথ বসু (২) আরিয়াম (৩) মাসোজী (৪) গোঁসাইজী (৫) কালীমোহন ঘোষ (৬) অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭) কনকেন্দ্রনাথ ঠাকুর (গগনবাবুর বড়ো ছেলে)। অমিতার (রাণী) এচিং করি একটি —তপতীর রোলে। তপতীর ছবি থেকে একটি বড়ো ছবি করবো বলে নক্সাকারি আরম্ভ করি কাপড়ের ওপর। তার ওপর হঠাৎ দোয়াতের কালি পড়ে গেল। তারপর, আর উৎসাহ করে করতে পারিনি'। —এ ছাড়া রয়েছে 'সাবিত্রীদেবী গাইয়ে তাঁর পোট্রেট — তখন তিনি কলাভবনে ছাত্রী ছিলেন'। (দ্বিতীয় পর্যায়, স্কেচ্‌বুক ১, পৃ, ১০)। দ্বিতীয় পর্যায়ের স্কেচ্‌বই (সংখ্যা ৪) এর ৬সংখ্যক পৃষ্ঠায় রয়েছে 'তপতী'তে রাজা সাজবার জন্যে গুরুদেবের ও নিজের কল্পনা অনুযায়ী মাস্ক্ (mask)। এইরকম একখানা অরিজিন্যাল ছবি গুরুদেবের আঁকা থেকে এই মাস্ক্-স্কেচ্। এই দেখেই মাস্ক্ তৈরি করা হয়েছিল।' ৮সংখ্যক স্কেচ্-বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় রয়েছে 'গুরুদেবের পোট্রেট্ (১৯৩১) 'তপতী'র রিহার্সেলের সময় উত্তরায়ণে করা।' নন্দলালের ১৯২৮-২৯ সালের ২১-সংখ্যক ডায়েরিতে কয়েকটি মানুষের মুখ আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, life থেকে detailed বা খুঁটিনাটি (বিস্তৃত বা ভারী নয়) নক্সা করা রয়েছে।

কলকাতায় 'তপতী' অভিনয় সেরে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। এই সময়ে বরোদার মহারাজা শাহজী রাও গায়কোয়ার রবীন্দ্রনাথকে বরোদা গিয়ে বক্তৃতা করার আমন্ত্রণ জানালেন। বরোদার মহারাজা এই সময়ে বছরে ছ-হাজার টাকা করে বিশ্বভারতীকে দান করছেন। বিশ্বভারতীর খাতিরে কবি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

॥ তাকাগাকি, ১৯২৯ ॥

পুজোর ছুটিতে শান্তিনিকেতনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। জাপান থেকে একজন জুজুৎসু-বীর এলেন, নাম হলো নোকুজো তাকাগাকি।

কানাডা থেকে ফেরবার সময়ে কবি জাপানে থামেন। সেই সময়ে সেখানকার জুজুৎসু, জুডো কসরৎ আর কুচকাওয়াজ দেখেছিলেন। এর আগে শান্তিনিকেতনে ১৯০৫সালে কবি জুজুৎসুর কসরত দেখেছিলেন। জাপানী শিল্পী সানো সান্ তখন আশ্রমে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে কারুশিল্পী আর জুজুৎসু-বীর। কবি তাঁর 'কাণ্ড-কারখানা' দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সে স্মৃতি কবির মনে উজ্জ্বল হয়েছিল। সেইজন্যে এবারে তিনি তাকাগাকি সান্‌কে শান্তিনিকেতনে আনার ব্যবস্থা করে এলেন। কবির ইচ্ছে ছিল বাঙ্গালী ছেলে, বিশেষভাবে বাঙ্গালী মেয়েরা আত্মরক্ষার এই বিদ্যাটি আয়ত্ত করে নেয়। কারণ, এই সময়ে অবিভক্ত বাঙ্গালাদেশে দুর্বৃত্তদের হাতে নারী-নির্যাতন ছিল নিত্যঘটনা। সুতরাং এই সহজ অস্ত্রটি তাদের আয়ত্ত করা আবশ্যিক। পূজার ছুটির পরে বিদ্যালয় খুললে ছাত্র-ছাত্রীরা যুযোর প্যাঁচ শিখতে শুরু করলেন মহোৎসাহে। কবি সে-সব দেখতে আসেন প্রায়ই। নন্দলালের উৎসাহ সর্বাধিক। তাঁর ছেলেমেয়েরাই হলেন প্রথম ছাত্রছাত্রী।

নোকুজো তাকাগাকি পূর্বে ছিলেন বৃটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানী স্টেট্ স্কলার। ভারতে আসার আগে তিনি ছিলেন নিপ্পন বিশ্ববিদ্যালয়ের যু-যুৎসু শিক্ষক, আর ছিলেন জাপানী পার্লামেন্টের সদস্য। তিনি যুযুৎসু-পদ্ধতির প্রশিক্ষিত ডাক্তার এবং জাপানে সরকারী শিক্ষণকেন্দ্র কোদোকোয়ানের উপদেষ্টা সমিতির উপদেষ্টা। সে সময়ে জাপানে তাঁর মতো উপযুক্ত লোক প্রায় ছিল না। তাকাগাকি বিশ্বভারতীতে ১৯২৯ সালে নভেম্বর মাসে এসেই ক্লাস আরম্ভ করে দিলেন।

যুযোর জন্যে একটি টিনের ঘর (পূর্বতন মালখানা) নির্দিষ্ট করা হলো। তাকাগাকি সে ঘর নাকচ করলেন। তখন সিংহসদনে গদি পেতে যুযো শুরু হলো। কবির ইচ্ছায়, আশ্রমের ও আশ্রমের বাইরের কয়েকজন ছেলেমেয়ে শিখতে লাগলেন। চলেছিল দু-বৎসর। দ্বিতীয় বছরে কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে All Asia Educational Conference-এ গিয়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা যুযুৎসুর প্যাঁচ্ দেখিয়ে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছিলেন। এই শরীর-চর্চার উদ্যোগে বিশ্বভারতীর খরচ হলো প্রায় চৌদ্দ হাজার টাকা। কিন্তু, কবির এই বিরাট আয়োজন সফল

হলো না।

এই বিষয়ে আচার্য নন্দলাল বলেন,—

'তাকাগাকি একজন জাপানী নামকরা যুধো প্লেয়ার। শান্তিনিকেতনে এসে উঠলেন তিনি ক্লাবহাউসে, শিমুলগাছের তলায় টিনের বাড়িতে। এখানকার চীনাভবনের কাছে পশ্চিম দিকে। পরে ছিলেন এখনকার (১৯৫৫) সুধীর রায়ের ঘরে। কুস্তি শেখাতেন সিংহসদনে। সেখানেই ব্যবস্থা করা হলো।

'গুরুদেব বললেন, মেয়েদের বেশি দরকার যুধো শেখা। তাকাগাকিকে বলতেই তিনি মেয়েদের শেখাতে রাজি হলেন। এদিকে শিখিয়ে মেয়ে পাওয়া যায় না। কে শিখবে? কে শিখবে? শেষে আমাদের যমুনা, নিবেদিতা, কলাভবনের ছাত্রী গীতা, অমিতা এরা সব যুধো শিখতে লাগলো। তাতে এখানে অনেকে নানাভাবে খুব আপত্তি করতে লাগলেন। বড়ো বড়ো মেয়েরা শেখে পুরুষের, বিশেষ করে পরপুরুষের কাছে। অভিযোগ শুনে গুরুদেব বললেন, 'তাতে কি হয়েছে। শাস্ত্রে নিয়ম আছে, আর গুরু হচ্ছেন বাপের মতন।'

'সব মেয়ে যাঁরা শিখতে লাগলেন, তাঁরা সবাই হিন্দুঘরের মেয়ে। একদিন গুরুদেব আমাকে বললেন,—'হ্যাঁ হে, যারা কুস্তি শিখছে তারা সবাই হিন্দুঘরের মেয়ে; ব্রাহ্ম কেউ আসে না কেন বলো দেখি। হিন্দু গেরস্ত ঘরের মেয়েরা এ-সব শিখলে খুবই কর্মঠ হবে। ব্রাহ্ম মেয়েরা cultured হচ্ছে কিন্তু অকর্মণ্য হয়ে পড়ছে। দরকার পড়লে হিন্দুঘরের মেয়েরা কোমরে আঁচল বেঁধে একলা একশো লোক খাইয়ে দিতে পারে। ব্রাহ্ম মেয়েরা সেক্ষেত্রে অসহায় হয়ে পড়ে'।—এ-সব কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।—গুরুদেব খুব বিরক্ত হয়েছিলেন এই সব গোঁড়ামির আপত্তিতে। আমাদের গৌরী যখন প্রথম স্টেজে ওঠে, তখনও অনেকে খুব আপত্তি জানিয়েছিলেন।

'তাকাগাকি দু-বছর ছিলেন এখানে। তাঁর এদেশী কি একটা নাম দিলেন যেন গুরুদেব, মনে নাই। থাকতেন তিনি এখনকার (১৯৫৫) পোস্টঅফিসের উত্তরদিকে সুধীর রায়ের খড়ের বাড়িতে। যুধো খেলা চলতো সিংহসদনে। বিশেষ ছাত্র ছিল তাঁর অফিসের কর্মী মনোমোহন

ঘোষ। কলকাতা থেকে জাপানী কুস্তিগিররা আসতো শান্তিনিকেতনে ফাইট্ (fight) দেখাতে। আমাদের এখানকার শিখিয়ে ছেলেমেয়েদেরও কুস্তির পরীক্ষা হতো।

'জাপানে তাকাগাকির এক ছেলে ফু-এ-ও ছিলেন যুধো প্লেয়ার। তাকাগাকিকে জাপান থেকে রাসবিহারী বোস বন্দোবস্ত করে পাঠিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে, গুরুদেবের অনুরোধে। কিন্তু গুরুদেবের এই মহৎ উদ্যোগ নারীজাতির আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে, না আশ্রমবাসী না দেশবাসী কেউ-ই গ্রহণ করে টিকিয়ে রাখলেন না।...দু-বছর পরে তাকাগাকি আফগানীস্থানে যুযুৎসু শিক্ষক হয়ে চলে গেলেন।'

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের এই উদ্যোগ আদৌ 'ভুল ভ্রান্তি' ঘটিত ব্যাপার নয়; 'তাঁর মহৎ স্বভাবের আনুষঙ্গিক ফল'। এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর সে সময়ের সহকারী কর্মসচিব কিশোরীমোহন সাঁতরাকে তাঁর এক আপত্তির উত্তরে কবি তাঁর অন্তরের ক্ষোভটি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সাঁতরা মহাশয় খরচার কথা তুলেছিলেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ শ্লেষের সুরে বলেছিলেন, —'তোমরা একটা ভাল কাজ করেছ; বিশ্বভারতীর তহবিল রক্ষা করেছ। আমার দ্বারা সে কাজ হতো না; আমার হাতে বিশ্বভারতীর তহবিল শূন্য হয়ে উঠতো, তবে তোমাদের বলি, আমি তো এখানে ব্যবসা করছি না; যদি মুদিখানার মালিকের ন্যায় হিসাব করে সব কাজ করতুম তবে এখানে যেটুকু কাজ হয়েছে তা-ও হতো না।' (তুলনীয় আ-দে-র-শা, পৃ ১১০)। বিশ্বকবির মনটি যে হিন্দু-অহিন্দু নির্বিশেষে সকল সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির উর্ধ্বে ছিল, তাঁর এই মর্মপীড়া তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

॥ সহজপাঠ চিত্রণ, ১৯২৯ ॥

এই সময়ে কবি ছবি আঁকছেন তন্ময় হয়ে। নন্দলালের ডাক পড়ে ঘনঘন। কৌতূহল নিয়ে নন্দলালও যান কবির কাছে। এই অবস্থায় কবি শিশুদের জন্যে 'সহজপাঠ' তিনখণ্ড লেখার ও প্রকাশ করার কথা মনে রেখেছেন। সহজপাঠের কতকগুলি রচনা অনেককাল আগের খসড়া করা।

এই খসড়া দেখে নন্দলাল ছবি এঁকেছিলেন অনেকগুলি। ছবিগুলি তাড়াতাড়ি পাবার জন্যে ১৯২৯সালে পূজার বন্ধের আগে রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে তাগিদপত্র দিয়ে লিখেছিলেন—

'[১৯২৯]

কল্যাণীয়েষু

নন্দলাল, প্রশান্ত অনেকবার আমাকে জানিয়েছে যে, সব ছবিগুলি পায়নি বলে সহজপাঠের ব্লক তৈরি সমাধা হলো না —সাম্‌নে পুজোর ছুটি। ইতিমধ্যে শিশুদের জন্যে প্রথম বাংলা পাঠ্য বই আরো একখানা Longman-রা প্রকাশ করেছে। অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। সহজপাঠের দ্বিতীয় খণ্ডের ছবি যদি দীর্ঘকাল দেরি হয় তা হলে এ বই প্রকাশের উপযোগিতা ও উৎসাহ চলে যাবে —এবং এর নকল বেরোতে আরম্ভ হলে ক্ষতি হবে। ইতি বুধবার

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

ছবিগুলির ব্লক করানো হলো। কিন্তু, ব্লকগুলি এর পরেও নানা কারণে আটক ছিল কর্তৃপক্ষের কাছে।

'সহজপাঠ' প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৭সালের বৈশাখ মাসে। আর তৃতীয়ভাগ প্রকাশিত হলো ১৩৪৭সালে। রবীন্দ্রনাথের এই তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে পাঁচখানি ছবি ছাড়া, বাকি সমস্ত ছবি আঁকা আচার্য নন্দলালের। অপরের এই পাঁচখানি ছবি হলো তৃতীয়ভাগের (১) 'শহুরে ইন্দুঁর ও গেঁয়ো ইন্দুঁর' শিশুবিভাগের ছেলেদের করা একটি উড্‌ব্লক, (২) 'মেঘমালা' গল্পের 'মেঘমালা' শিশুবিভাগের ছেলেদের করা একটি লিনোকাট্; (৩) 'পথহারা' কবিতার উড্‌কাট্ অপরের, (৪) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রবন্ধের 'ছাতিমতলার বেদী' কোনো চীনা শিল্পীর আঁকা, (৫) 'গান' কবিতার 'কেয়াপাতার নৌকো' অপরের আঁকা।

'গুরুদেব আঁকতে বললেন। বললেন, —সহজপাঠের ওপর ছবি এঁকে দাও। তখন প্রথম ভাগটা লেখা হয়েছে। আমি লিনোকাট্ করে রথী-বাবুকে print-গুলো দেখালুম। রথীবাবু দেখে ফেরত পাঠালেন। ফেরত পাঠালেন, —'বাবামশায় বললেন, ঠিক্ হয়নি', —এই কথা বলে। তখন

অবনীবাবু এখানে আছেন। কলাভবনে একটা এগ্‌জিবিশন হচ্ছিল। সেই এগ্‌জিবিশনে টাঙিয়ে দিলুম। অবনীবাবু দেখলেন। দেখে তাঁর কথা হলো গুরুদেবের সঙ্গে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ওঁদের মতামত। অবনীবাবু বললেন —'এ ঠিক হয়েছে।' আমি বললুম, —রথীবাবুর পছন্দ হয়নি। শুনে তিনি জোর দিয়ে বললেন, —'এই তো ঠিক হয়েছে।' তখন তাঁর অনুমোদন পেতে তবে ব্লক ছাপা আরম্ভ হলো।

প্রথমভাগ সহজপাঠের ২০পৃষ্ঠার ছবিটি সুন্দরবনের আইডিয়া নিয়ে করেছি। 'ছড়ার ছবি'র ছবির কথা পরে বলবো।

'প্রভাতবাবু লিখেছেন, —সহজপাঠের ছবিগুলি নন্দলাল বসু ও কলা-ভবনের অন্য শিল্পীদের আঁকা। সেইজন্যে এই গ্রন্থের উপস্বত্বের একটা অংশ কলাভবনে দেওয়া হয়। —(র. জী. ৩, পৃ ৩৬২)। —এ কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। এর কারণ আগে কিছু বলা হয়েছে, 'কারু-সঙ্ঘে'র প্রসঙ্গে বিস্তৃত বলবো।

॥ হাসে গাওয়া ॥

এক জাপানী ভদ্রলোক হাসে গাওয়া। তিনি শান্তিনিকেতনে এসে কলাভবনে আচার্য নন্দলালের তথাকথিত ছাত্র হয়েছিলেন, বোধহয় ১৯২৬ সালে। তাঁর প্রসঙ্গে নন্দলালের কথা —

'হাসে গাওয়া এলেন জাপান থেকে। ভরতি হলেন কলাভবনে। আমার কাছে শিখবেন। আমি দু-চার দিন চেষ্টা করলুম বোঝাবার জন্যে। কিন্তু তিনি থাকতেন অন্যমনস্ক। কলাভবন-লাইব্রেরীর ছোট্ট একটি ঘরে সীট্‌ নিলেন।

'ক্লাসে আমি চেষ্টা করতুম বোঝাবার ; কিন্তু তিনি বসে থাকতেন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। বরাবর বোধহয় রইলেন এখানে। বই-টই দেখতেন, আর চুপচাপ বসে থাকতেন।

'শেষ দিকে তিনি থাকতেন মুনীশ্বরের বাড়ির সামনে। বিনোদ-টিনোদও থাকতো ঐ বাড়িতে। ভালো ফটোগ্রাফার ছিলেন হাসে গাওয়া।

'একবার গ্রীষ্মের সময়ে কৈলাস যাবেন বলে ঠিক করলেন। সঙ্গে নিলেন

মাসোজীকে। কৈলাস যাবেন বরাবর পায়ে হেঁটে। হিমালয় পাহাড়ে গেলেন দু-জনে, দর্শন করে ফিরলেন। অনেক ফটো তুলে এনেছিলেন। সেই সব ফটো নিয়ে plan, map —এই সব করতে লাগলেন। আমার সন্দেহ হলো; Strategic কিছু ছিল। সেইজন্যেই সঙ্গী হিসেবে তিনি সরল প্রকৃতির মাসোজীকে পছন্দ করেছিলেন। উপরন্তু, মাসোজীর ছিল শক্ত শরীর; আর তিনি পোক্ত ছিলেন দুঃসাহসিক অভিযান-টভিযানে।

,সই ফটো-টটো দিয়ে বই ছাপালেন হাসে গাওয়া নিজের খরচে। কিন্তু আশ্চর্য, সেই বই-এর কপি আমাকে তিনি উপহার দিলেন না। যেন স্বার্থসিদ্ধি করতে পারলেই, আর কিছু মানা অনাবশ্যক। আইডিয়াল-টাইডিয়াল বোগাস্, বাজে যেন। মানতো না, বা পরোয়া করতো না ও-সবের।

'সামুরাইদের সময়ে জাপান ক্ষাত্র বীরত্ব দেখালে খুব। য়ুরোপে যেমন ছিল নাইট্, জাপানে তেমনি সামুরাই-রা। খুব বীরত্ব দেখাতো। ক্ষাত্র তেজকে মান্য করতো শক্তি দেখাবার জন্যে। কিন্তু আইডিয়ালের জন্যে কিছু করতো না। বীরত্ব দেখানোই ছিল উদ্দেশ্য। সামুরাইদের স্পিরিট্ দেখা গেল চীনের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে পর্যন্ত। চীনে-তরবারি দিয়ে চীনেদেরই কেটে গৌরব বোধ করতো।—এ-সব শুনে আমাদের ঘৃণা হতো। নিষ্ঠুর জাত। কিন্তু, কোনো জাত বেড়ে ওঠে তার বীরত্ব ও মনুষ্যত্ব একত্র হলে তবে। ওদের মনুষ্যত্ব গেল, রইল কেবল বীরত্ব।—এই সব কারণেই ওকাকুরা সে-সময়ে স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তখনকার upstart জাপানীদের ঠিকপথে চালাবার নির্দেশ দেবার জন্যে। যদি আদর্শটা খানিকটা উন্নত হয়।

'গুরুদেব শেষবারে জাপানে গিয়ে ন্যাশানালিটির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলেন। ন্যাশানালিটি হচ্ছে স্বার্থপরতা।—জাপানে এই কথা বলাতে ওঁকে অপমান করতে চেয়েছিল; স্টেশনে আসেনি হোমরা-চোমরাদের কেউ অভ্যর্থনা করতে। গুরুদেব বলেছিলেন,—তোমরা হচ্ছো য়ুরোপীয়ান স্কুলের স্কুল-বয়। তোমাদের ঐতিহ্য তোমরা বুঝতে পারছ না। সায়েন্সকে তোমরা ইউটিলাইজ করো। সায়েন্স যেন তোমাদের ইউটিলাইজ না করে।

'হাসে গাওয়া কৈলাস থেকে ফিরে এলেন যখন, তখন আমার 'সঙ্ঘমিত্রা'র ছবি আঁকা হয়েছে। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ছবি আছে শুনে দেখতে চাইলেন। আমি বললুম,—দেখাবো ও-বাড়িতে। ছবিটা খুব ভালো হয়েছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম,—তিনি ছবিটা জাপান থেকে কাকিমনোর ঢঙ্গা করে আমাকে পাঠাতে পারেন কিনা। আমার কথায় তিনি রাজী হলেন। বললেন,—'ঠিক করে পাটাবো।' ঠিক করে মাউন্ট করিয়ে, জাপানী জাহাজের ক্যাপ্‌টেনের মারফত পাঠিয়ে দিলেন। কলকাতা থেকে নিয়ে এলুম, সংবাদ পাবার পরে। পরে আমার সেই ছবিখানা শ্রীমতী ঠাকুর ফ্রেমসমেত কিনে নিলেন। তখন আমার টাকার অভাব। তাই বেচতে হলো।

'হাসে গাওয়া কলকাতা যাচ্ছেন। দিনুবাবুর ড্রাইভারকে তাঁর জন্যে একটা ট্যাক্সি ডাকতে বললেন। কিন্তু বলা সত্ত্বেও ট্যাক্সি ঠিক সময়ে আসেনি। রাগে হাসে গাওয়া দিনুবাবুর ওখানে গিয়ে তাঁর সোফারকে লাথি মেরেছিলেন। আর দিনুবাবুর গাড়ি নিয়ে তাঁকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে বাধ্য করেছিলেন। —হরিহরণ খবরটা দিলে আমাকে। আমি সব শুনে বললুম, —আমি উপস্থিত থাকলে আমি তাঁকে লাথি মারতুম। কালো চামড়া বলে সাদা চামড়ার এই অবজ্ঞা।

'সেই থেকে আমার বিতৃষ্ণা ধরে গেল সে-সময়কার জাপানী স্পিরিটের ওপর। তখন আমার মনে পড়লো ওকাকুরার কথা। —জাপান এখন upstart জাত। সমরবাবু ওকাকুরাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এদেশে জাপানী এলে কি রকম হয়। ওকাকুরা বলেছিলেন, —'চীন এলে বরং ভালো, তবু জাপান নয়।'

'ওকাকুরা ছিলেন ঋষিতুল্য লোক। সুতরাং, জাপানের গুণও আছে অনেক। ওরা জানে জীবনযাত্রা কিভাবে সুন্দর করতে হয়। সহ্যগুণ ওদের অদ্ভুত। এমনিই আরও অনেক গুণ আছে। আর ওরা যে কাজটা করবে, সেটা নিখুঁতভাবে করে থাকে।

'হাসে গাওয়া শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় কি যেন একটা জিনিস পার্শেল করে পাঠাবেন। পরিপাটি করে সুতো বেঁধে প্যাক্ করলেন; সুন্দর করে প্যাক করে, পোস্ট অফিসে পাঠাতে গিয়ে দেখলেন, ডাক

চলে গেছে। তা ডাক ফেল হোক; আরম্ভ-করা কাজ সুন্দর করে শেষ করলেন বলে মনে তাঁর সে কী তৃপ্তি।

॥ হরি অন্ধ ॥

'কার্তিকবাবুর বাগানের উত্তর দিকে যে সাঁওতালগ্রাম বালিপাড়া —সেই গাঁয়ের বাসিন্দা ছিল হরি অন্ধ। তার মা ছিল বেঁচে। তখন (১৯২৬) আমার কাছে আসতো সে প্রায়ই। হরি অন্ধ মন্দিরে উপাসনায় হাজির থাকতো প্রায় প্রত্যেক বুধবারে। মন্দিরে যে-ধরনের উপাসনা হতো আর গুরুদেব যে ভাষণ দিতেন, সে-সব শুনে শুনে সে সাঁওতালী ভাষায় একটা ছড়া বেঁধেছিল। সেইটে সে প্রায়ই গেয়ে শোনাতো।

'হরি অন্ধ আসতো আমার কাছে আর মল্লিকজীর কাছে। মল্লিকজী ঘনঘন সাহায্যও করতো তাকে। ছেলেরা যে-ই থাকতো আমাদের কলা-ভবনে, সে-ই ওকে খুব সাহায্য করতো। ওরা ওর এঁটো ধুতো, ওর নোংরা ধুতো। মেয়েরাও সঙ্গগুণে এই রকম সেবা করতে শিখেছিল।

'আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরা সকলেই সেবাপরায়ণ ছিল তখন। সেবা করবার দরকার পড়লেই কলাভবনে তখন বলে পাঠাতেন হাঁসপাতালের ডাক্তারেরা। এরা গিয়ে উপস্থিত হতো। আশ্রমের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এরা সেবা করতো দরকার পড়ামাত্র। সেবার একটা spirit তখন grow করেছিল।

'সাঁওতালদের মধ্যে তখন বিশেষ করে আসতো হরি অন্ধ। হরি অন্ধ ভালো বাঁশীও বাজাতো। খুব ভালো ভদ্র হয়েছিল সে। তার মা বেঁচেছিল অন্ধ হরির মৃত্যুর পরেও। তাকে সাহায্য করা হতো কলাভবন থেকে। আশ্রমের ইস্কুলের ছেলেরা পড়াতে যেত তখন সাঁওতাল গ্রামে, মেয়েরাও যেত। ইস্কুল হতো রাত্রে।

'হরি অন্ধকে দেখে আমি আমার 'কুণাল-কাঞ্চনমালা'র ছবিটা আঁকি। একদিন ও এসে যেমনভাবে দাঁড়িয়েছিল সেটা দেখে, অন্ধের দাঁড়াবার পোজ্‌টা আমি মনের মধ্যে গেঁথে নিলুম। ওর দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে আমার মনে হলো, 'কুণাল' হয়তো ঐভাবেই ছিল। সে 'কুণাল' ছবিটি আছে এখন চিনু ভাইয়ের কাছে। তিনি কিনেছিলেন। কুণালের স্ত্রী

কাঞ্চনমালা কুণালের পাশে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে রয়েছে। বৌদ্ধ হয়ে গেছল কিনা ওরা। রাজপুত্র কুণাল ভিক্ষা চাইছে রাজপ্রাসাদে এসে। পিতা অশোকের প্রাসাদ-স্তম্ভে অনুশাসন লেখা রয়েছে সামনেই। —এই ছবিটা আমি এঁকেছিলুম ঐ সাঁওতাল হরি অন্ধের দাঁড়াবার pose দেখে। ওদের গাঁয়ের পাশ দিয়ে গেলে ধক্ করে এখনও মনে পড়ে আমার, সেই হরি অন্ধের কথা।

॥ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও শিক্ষাসত্র কথা ॥

সন্তোষচন্দ্র ছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম ছাত্রদের অন্যতম। সন্তোষচন্দ্রের পিতা শ্রীশচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়সী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। শ্রীশচন্দ্রের বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার ন-পাড়া গ্রামে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি বলরামদাসের বংশধর ছিলেন তিনি। তিনি স্বয়ং কথাসাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথের সহযোগে তিনি 'পদরত্নাবলী' সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশ করে-ছিলেন (খৃ. ১৮৮৫)। গ্রাম-জীবনের উজ্জ্বল প্রকাশ, শিশুমনের প্রতি দরদ, ঘটনার নাটকীয়তা ও বর্ণনার বাহুল্য শ্রীশচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার বিশিষ্ট গুণ। ফলে, রবীন্দ্র-মানসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগাযোগ।

বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পুত্রবৎ স্নেহের পাত্র। কবি অনেক বিষয়ে সন্তোষচন্দ্রের ওপর নির্ভর করতেন। সন্তোষচন্দ্রও কবিকে পিতার মতো ভক্তি করতেন। তিনি গভীর আগ্রহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি কথা টুকে রাখতেন। গুরুদেবের মন্দিরের ভাষণ তিনি সঙ্গে সঙ্গে নোট করতেন। সে নোট জমেছিল দু-তিন ট্রাঙ্ক হবে। কিন্তু, তার অনেক উই-এ নষ্ট করে দিলে।

সন্তোষচন্দ্র আর রথীন্দ্রনাথ ১৯০২ সাল থেকে শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করে ১৯০৪ সালে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯০৬ সালে রথীবাবুর সঙ্গে সন্তোষবাবু আমেরিকা যান। আমেরিকায় ইলিয়নয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উভয়েই কৃষি ও গোপালন বিদ্যায় স্নাতক হন। কবির ইচ্ছা, ওঁরা এদেশে ফিরে এসে গ্রামসেবা ও সংস্কারের ব্রত গ্রহণ করবেন। সন্তোষচন্দ্রের পিতা শ্রীশচন্দ্র ১৯০৮ সালে দুমকায় মারা যান। ১৯১০ সালে সন্তোষচন্দ্র স্বদেশে

ফিরে আসেন।

কবির ইচ্ছায়, সন্তোষচন্দ্র শান্তিনিকেতনে থেকে গোশালা স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য হলো, আশ্রমবালকদের দুগ্ধ-সমস্যা দূর করা। কবি সন্তোষচন্দ্রকে আশ্রমের মধ্যেই গোশালা স্থাপনে উৎসাহিত করলেন। উত্তরভারত থেকে ভালো জাতের গাভী আনানো হলো। সঙ্গে এলো উত্তরপ্রদেশের গোয়ালা। শান্তিনিকেতন-মন্দিরের উত্তর দিকে রাস্তার ওপারে বিরাট গোয়াল তৈরি হলো। সন্তোষচন্দ্র তাঁর কলেজী বিদ্যা নিয়ে গোশালার কাজ আরম্ভ করলেন। ফাইল, ফর্ম, ছক তৈরি করা হলো। গরুর খাদ্য, গুণাগুণ, দুধের পরিমাণ রেকর্ড করা হলো।

আশ্রমে তিনি ছাত্রদের Mass drill শেখাতেন। Fire drillও শেখাতেন। আমেরিকায় শেখা Yellও শেখাতেন ছাত্রদের।

সন্তোষচন্দ্র হলেন আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পড়ান ইংরেজী। এ-ছাড়া, তাঁর প্রধান কাজ ছিল আশ্রমের অতিথি-সৎকার। তাঁর অতিথি-সেবা ছিল আন্তরিক ও অনন্য। কবিগুরুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল অচলা।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের নেতৃত্বে আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ তাঁর ডাঙ্গা জমি চৌবস করে মজুরি বাবদ নব্বই টাকা উপায় করেছিল। শমীন্দ্রকুটীরের কাছে ডোবা ভরতি করেও ছাত্রেরা মজুরি পেয়েছিল। ঐ টাকা পূর্ববঙ্গে পাঠানো হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে, পূর্ববঙ্গের পাটচাষীদের আর্থিক দুরবস্থা দূর করবার জন্যে।

আশ্রমবিদ্যালয়ের গোশালা কালে অচল হয়ে পড়লো। সন্তোষচন্দ্র প্রায় একশো বিঘা ডাঙ্গা জমি শান্তিনিকেতন আশ্রম-এলাকার পূর্বমাঠ, সুপুরের জমিদারের কাছ থেকে স্বল্প জমায় কবুলিয়ত বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন।

সেইখানে একটি ছোট খড়ের চাল-দেওয়া মাটির বাড়ি তৈরি করলেন। নিজের জমিতে চাষবাসের আয়োজনও করলেন। কিন্তু এখানকার জমি অনুর্বর, এখানে ফসল ফলানো শক্ত। তাঁর জোত থেকে আশানুরূপ আয় হতো না।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত, প্রভাতকুমার গুপ্ত, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সেন, ক্ষিতীশচন্দ্র রায় প্রমুখ অনেকে মন্দিরে কবির ভাষণ টুকে রাখতেন। সেগুলি কবি দেখে, ঠিক করে পরে ছাপতে

দিতেন।

রথীন্দ্রনাথের বিবাহের পরে নববধূ প্রতিমাদেবী ও আশ্রমবালিকারা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করেছিলেন। এই অভিনয় হয়েছিল 'শান্তিনিকেতন'-বাড়ির দোতলায়। তখন আশ্রমে পর্দাপ্রথা প্রচলিত থাকায় এই অভিনয় আশ্রমের ছাত্রেরা ও পুরুষেরা দেখতে পায়নি। পৌষউৎসবের মেলায় ঘুরতে বা বাজি পোড়ানো দেখতে পেতোনা মেয়েরা। সন্তোষচন্দ্র আমেরিকা থেকে ফেরার পরে পর্দাপ্রথা শিথিল করে মেয়েদের বাজি-পোড়ানো দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সন্তোষচন্দ্র সেকালে ছেলেদের জন্যে পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন—'হজরত মহম্মদের জীবনী'। ১৯১৫ সালের ৬ই মার্চ গান্ধীজি দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতনে আসেন। গান্ধীজির উপদেশে, রবীন্দ্রনাথের অনুমতি পেয়ে, ছাত্রেরা স্বেচ্ছাব্রতী হয়ে আশ্রমের সব রকম কাজ করবার দায় গ্রহণ করেছিলেন। অধ্যাপকদের মধ্যে সন্তোষচন্দ্র, নেপালচন্দ্র, অসিতকুমার প্রমুখ তরুণদলের উৎসাহ ছিল বেশি।

১৯১৮সালে ছাত্রপরিচালনায় নিযুক্ত হন সন্তোষচন্দ্র। রবীন্দ্রভক্ত সন্তোষচন্দ্র পরম নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতি যথাযথ অনুসরণ করবার চেষ্টা করতেন। পরে তিনি শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপরিচালক হয়েছিলেন। শিক্ষাপরিচালকের কাজ ছিল আশ্রমের অধ্যক্ষের অধীনে শিক্ষাবিষয়ে সকল কাজ করা।

১৯১৯ সালে জুলাই মাসের দিকে বিশ্বভারতীর প্রথম কর্মকর্তাদের সদস্য-তালিকায় ছিলেন সন্তোষচন্দ্র। আশ্রমিক-সংঘের প্রতিনিধিরূপে ১৯১৬ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত যাঁরা শান্তিনিকেতন-সমিতিতে নির্বাচিত হয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে সন্তোষচন্দ্র নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯১৭ সালে।

আশ্রমের পূর্বমাঠে তখন ছিল মাত্র একখানি ঘর সন্তোষচন্দ্রের একটি মাঠকোঠা বাড়ি আর তাঁর শতাধিক বিঘা ডাঙ্গা জমি। সন্তোষচন্দ্রের দুই ভগ্নী রমা (বা নুটু) ও রেখা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রী। ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দিয়ে বিশ্বভারতীতে জ্ঞানালোচনার জন্যে এঁরা যোগ দিয়েছিলেন।

১৯২৬সালে পূজার ছুটিতে সন্তোষচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তিনি ষোল বছর ধরে শান্তিনিকেতনে একই বেতনে (মাসিক ২০০ টাকা) কাজ করেছিলেন।

সন্তোষচন্দ্রের মৃত্যুর পরে শান্তিনিকেতনে তাঁর জমি বিশ্বভারতীর এক্তিয়ারে আসে। বিশ্বভারতী পূর্বদিকের মাঠ সরকারী-সাহায্যে দখল করেন। সেই সময়ে সন্তোষচন্দ্রের নিজবাস্তু আর কয়েক বিঘা জমি ছাড়া সব এলো বিশ্বভারতীর মধ্যে। এই ব্যাপারে খুব মন-টানাটানি হয়েছিল।

শিক্ষাসত্র ও লোকশিক্ষা-সংসদ শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাসত্র শ্রীনিকেতনের সঙ্গে মুখ্যতঃ যুক্ত হলেও এর আরম্ভ হয় শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ হাত-হাতিয়ারি শিক্ষা বা টেক্‌নিক্যাল-শিক্ষা সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করতেন না; অথবা তিনি সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলাকেই একান্তভাবে শিক্ষণীয় মনে করতেন; সাধারণের এই ধারণা একান্ত ভ্রান্ত। কবি ব্রহ্মচর্যাশ্রম-পর্বের মধ্যে হাতের কাজ শেখাবার আয়োজন করেছিলেন বারে বারে। জাপানী মিস্ত্রী, দিশী ছুতার, শিক্ষিত কারুকর অনেক আনাগোনা করেছেন। কিন্তু, নিয়মিতভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় অনেক পরে। শান্তিনিকেতনে কবির এই পরিকল্পনা তেমনভাবে রূপ গ্রহণ করেনি; কারণ সাধারণ ভদ্র মধ্যবিত্ত বা হঠাৎ-ধনীদের আয়েশী ছেলেরা এই সব হাতের কাজ পছন্দ করতো না।

কবির মনে কর্ম বা শ্রমকেন্দ্রিক বিদ্যায়তনের স্বপ্ন বহুদিনের। তার রূপদান করবার জন্যে এলম্‌হার্স্টের সঙ্গে পরামর্শ করে, এবং সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়ে, শান্তিনিকেতনের পূর্বমাঠে সন্তোষচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা-সত্রের পত্তন হয়। কবি জানতেন, এই বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিতে আসবে গ্রামের ছেলেরাই। তাঁর বিশ্বাস, এখানেই Project Education বা পরিপূর্ণ শিক্ষার বনেদ হবে; এবং শীঘ্রই 'the village School will be the real School' হয়ে উঠবে। কবির এই ভাবনা ১৯৩২ সালের। গান্ধীজীর প্রবর্তিত Basic Education পরিকল্পনার অনেক আগের। রবীন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্য নিয়েই শিক্ষাসত্র স্থাপন করেন। পরে শিক্ষাসত্র শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয় ও কালে তা সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

এই বিষয়ে নন্দলালের কথা:—

'এলমহার্স্ট' সাহেব এসে শ্রীনিকেতনের কাজের পত্তন করেন। তিনি গুরুদেবের কাছে সন্তোষবাবুকে চেয়ে নিলেন। সন্তোষচন্দ্র শ্রীনিকেতনের কাজে যোগ দিলেন। গুরুদেব যখন তাঁর শিক্ষার আদর্শকে বিনা-বাধায়

রূপ দেবার জন্যে শিক্ষাসত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন সন্তোষচন্দ্রের ওপরে শিক্ষাসত্রের ভার দেওয়া হলো। গুরুদেব স্থির করেছিলেন, শিক্ষাসত্রে এমন সব ছেলে নেবেন, যাদের কাছ থেকে বেশি কিছু নেওয়া হবে না। এবং তাদের অভিভাবকদের তরফ থেকেও পরীক্ষা-পাশ করানোর দাবি উঠবে না। তিনি ভাবলেন, এইরূপেই তাঁর শিক্ষার আদর্শ সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত করা যাবে। এ-কাজে সন্তোষচন্দ্রের মতন রবীন্দ্রভক্ত শিক্ষকই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। সন্তোষচন্দ্র উৎসাহের সঙ্গে শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের নিয়ে কাজ করতে লাগলেন। সেই কাজ করতে করতেই বিয়াল্লিশ বছর বয়সে ১৯২৬ সালে তিনি মারা গেলেন।

'সন্তোষ মজুমদার ডেয়ারি করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। রথীন্দ্রনাথের বন্ধু সন্তোষচন্দ্র। তিনিই প্রাণ ঢেলে শিক্ষাসত্রের গোড়াপত্তন করলেন। কমিউনিটি প্রোজেক্ট-এ এখন যা সকলেই চাইছেন, গুরুদেব আগেই তা স্টার্ট করে গেছেন সন্তোষ মজুমদারকে নিয়ে। হাতের কাজের সব শিক্ষা বা ডাইরেক্ট মেথডে শেখানো, এখানেই এই শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনেই প্রথম আরম্ভ হয়েছিল।

'শিক্ষাসত্রে গ্রামের ছেলেদের জন্যে শিক্ষার রুটিন শান্তিনিকেতন-আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছেলেদের রুটিনের মতো হবে না। এগজামিনেশনের জন্যে পড়াবার দরকার নাই। তাদের দিতে হবে হাতে কলমে পূর্ণ-শিক্ষা। আশ্রম-বিদ্যালয়ের ওপর-ক্লাস-এগজামিনের রুটিন অনুমোদন করেছিলেন আশুবাবু। তাঁদের সিলেবাস-মতোই আমাদের পড়াতে হবে। আশুবাবু সিলেবাস চেঞ্জ্ করতে সম্মত হননি। কিন্তু, গুরুদেব ভেবেছিলেন, আমাদের সিলেবাস আমাদেরই থাকবে। সেইজন্যেই শিক্ষাসত্রের পত্তন করা। গুরুদেব আর এলম্‌হার্স্ট মিলে শিক্ষা-সত্রের ডিটেল্ড্ সিলেবাস তৈরি করলেন। সিলেবাস হলো, এমন করে শেখানো হবে যাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেরা গ্রামে ফিরে গিয়ে চাষবাস করতে পারে; কাজকর্মও করতে পারে। অথচ নিজের পেশা তাদের ছাড়তে হবে না। ছেলে ভালো হলে শিক্ষাসত্রেই কাজ পাবে। শিক্ষাসত্র থেকে যারা বের হবে তাদিকে আশ্রম থেকে জমি দেওয়া হবে। তাতে তারা চাষ-আবাদ পোলট্রি-টোলট্রি করবে, তা থেকে একটা গেরস্থ-ঘরের দরকার মিটবে।

'১৯২৪সালে শান্তিনিকেতনে ছ-টি ছেলেকে নিয়ে শিক্ষাসত্র আরম্ভ হয়েছিল। বালকদের রান্না-বান্না, বাগান-করা, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার রাখা, সন্তোষচন্দ্র তাদের শেখাতেন নিজ-হাতে করে। তা ছাড়া গীতিনাট্য, কলাচর্চা, ব্যায়ামও শেখাতেন তাদের। ১৯২৭সালে শিক্ষাসত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো শ্রীনিকেতনে, সন্তোষচন্দ্রের ১৯২৬সালে মৃত্যুর পরে। চাষ, গোপালন ইত্যাদির সুবিধা হবে বলে। একসঙ্গে হবে। ডবল করা নিষ্প্রয়োজন। উপরন্তু চিন্তা করা হলো, শান্তিনিকেতনে ধনী ও মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেদের মাঝে থেকে শিক্ষাসত্রের দরিদ্র ছাত্রেরা কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ হয়ে উঠবে। ভুলে যাবে তারা নিজেদের কাজ নিজে করতে। গুরুদেব চেয়েছিলেন, শিক্ষাসত্রের ছাত্রেরা স্বাবলম্বী হবে। তবে ছাত্রদের উপার্জিত অর্থে কোনো প্রতিষ্ঠান চলবে, সে চিন্তা কবি কোনোদিনই করেননি। তিনি চেয়েছিলেন, ছাত্রদের মধ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তারা শিক্ষাসত্রে শিক্ষা পাবার পরে নিজেরাই বেছে নেবে। এই বিষয়ে গুরুদেব আর এলম্‌হার্স্টের তৈরি-করা শিক্ষাসত্রের বুলেটিন দেখলেই সব বুঝতে পারবে।

'শান্তিনিকেতনে শিক্ষাসত্র স্টার্ট হবার বছর দেড় পরে সন্তোষচন্দ্র কলকাতায় মারা গেলেন টায়ফয়েডে। ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক সন্তোষ-চন্দ্রের শ্বশুর ছিলেন। এই ইন্দুমাধব মল্লিক হলেন ইক্‌মিক্ কুকারের উদ্ভাবক। তাঁর কলকাতার বাড়িতে গিয়ে মারা গেলেন সন্তোষচন্দ্র। সন্তোষচন্দ্রের মৃত্যুতে শিক্ষাসত্র কানা হয়ে গেল।

'এলম্‌হার্স্ট লণ্ডন থেকে আমাকে টেলিগ্রাম করলেন,—তুমি শিক্ষা-সত্রের ভার নাও। — You must take the charge of sikshasatra। কিন্তু আমার বিদ্যে নাই, তবে influence আছে। আমি answer দিলুম। বললুম, — কলাভবন আর শিক্ষাসত্র একসঙ্গে চালাবো কি করে। —এ হলো বোধহয় ১৯২৬ সালের কথা। ইন্দুসুধা ছাত্রী ছিলেন কলাভবনের। আমার তরফ থেকে তিনি নিলেন চার্জ। অনেক help করলেন আমাকে। শ্রীনিকেতনে ছেলেদের থাকার বাড়ি হলো। শেষে ধরা পড়ল সে বিপ্লবীদলের সঙ্গে যোগ থাকায়। বোধহয় কলকাতার

এক বোমা কেসে। হিজলি জেলে পাঠানো হলো তাকে। এখন (১৯৫৫) সে কমিউনিস্ট। তারপরে শিক্ষাসত্রের ভার নিলেন আমার তরফ থেকে আমাদের মাসোজী। কিন্তু, অথরিটির সঙ্গে তার খিটিমিটি বাধলো। হিসাব-নিকাশ করতে হতো দিন রাত। ও হিসেবী লোক নয়। আমি শিক্ষাসত্রের কাজ ছাড়লুম। মাসোজী আবার কলাভবনে জয়েন করলেন। এ-সব ঘটনার চিঠি আছে, দেখো।

'অনেক পরে চারুবাবু কর্তা হলেন শ্রীনিকেতনের। তিনি বললেন,— আমরা এতোদিন এখানে ছেলেদের না পড়িয়ে পণ্ডিত করেছি; এবার পড়িয়ে পণ্ডিত করা যাক্। তাঁর আমলে নিয়ম হলো গ্রামের ছেলে চাই, এবং উপযুক্ত হলে ম্যাট্রিক দেওয়ানো অন্তরায় হবে না। কিন্তু সেই হলো হিন্ড্রেন্স্।

'এখন (১৯৫৫) চার্জে আছেন সমীরণ। উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষাসত্র থেকে গ্রামের গরীব চাষী গৃহস্থের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। চারুবাবু বললেন,— গ্রামের লোক এ-সব চায় না। অর্থাৎ তিনি নিজে এ-সব সাপোর্ট করতেন না। একটা সহশিক্ষার প্রাইমারী বিভাগও তিনি এর সঙ্গে জুড়ে দিলেন। কিন্তু, শিক্ষাসত্রে গ্রামোন্নয়নের যে-কিছু activity সবই ঐ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রে। চাষ-আবাদ থেকে শুরু করে, পুকুরে মাছ-জন্মানো, মাছ ধরবার জাল তৈরি, গরু রাখা, পোলট্রি করা, ইত্যাদি একজন গেরস্থের সংসারে সারা বছরে যা দরকার লাগে, সবই করা হতো ওখানে। গ্রামের জমিদার-বাড়ির মেয়েরাও মেঝেনদের মতন ধান ঝাড়তে কুণ্ঠা বোধ করতো না। কিন্তু, দেশ সে-শিক্ষা নিতে পেলে না; কারণ অথরিটি অবহেলা করলেন। বাগচী মহাশয়ের সময়ে শান্তিনিকেতন-পাঠভবনের সিলেবাস শিক্ষাসত্রে চাপিয়ে দেওয়া হলো। ফলে, তার প্রাণ যেটুকু ধুক্‌ধুক্ করছিল তা-ও থেমে গেল। চাষার ছেলে ছকেবাঁধা শিক্ষা পেয়ে বাবু হয়ে যাচ্ছে। চাষবাস হচ্ছে নমো নমো করে, আর চেয়ার-টেবিলে বসে, কাজ করার জন্যে গুরুদেবের মূল আদর্শ ফেঁসে গেল। ব্যয়বাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে দুরবস্থাও বাড়তে লাগলো। আমাদের আশ্রমের ছেলেরা 'হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ' হতে পারলো না। দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ করে নিতে লাগলো। উভয়ের মিল না-হওয়ায় জীবনের ছন্দ ভেঙ্গে গেল।

॥ কালীমোহন ঘোষ, ১৯১৯-৪০ ॥

কালীমোহন ঘোষ মহাশয় ত্রিপুরা চাঁদপুরের লোক। দেশের কাজ, বিশেষ করে, গ্রামের কাজ করতে তাঁর উৎসাহ ছিল খুব। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের জমিদারিতে পল্লীসংগঠনের কাজের পত্তন করেছিলেন। সেই সময়ে কালীমোহন ঘোষ ছিলেন কবির অন্যতম সহকর্মী। কিন্তু শিলাইদহে জন-উন্নয়নের কাজ বেশি দিন চলেনি। প্রধান হেতু, পুলিশী সন্দেহ। কালীমোহনবাবু শান্তিনিকেতনে শিক্ষক হয়ে আসেন ১৯০৮সালে। পরে তিনি রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনের গ্রামসেবা আর সমাজসংস্কার-বিভাগের প্রধান চরিত্ররূপে সুখ্যাত হন।

১৯১১সালে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-বিদ্যালয় পরিচালন-ব্যবস্থায় কিছু বদল হয়। বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে। দু-টি নতুন ঘর তৈরি হয়েছে—'বীথিকা' আর 'বাগানবাড়ি'। 'বীথিকা' ছিল শালবীথির দক্ষিণে, আর 'বাগান বাড়ি' তৈরি হয় মন্দির-সংলগ্ন পুকুরপাড়ে। 'বাগানবাড়ি'র ছাত্রেরা খুব ভালো বাগান করতে পারতো। 'বাগান' নামে একখানা হাতেলেখা পত্রিকা বের করা হতো এখান থেকে। বাগানবাড়ির ছাত্রদের দীর্ঘকাল ধরে দেখাশোনা করতেন কালীমোহনবাবু। শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত পত্র-পত্রিকাতে এই বিষয়ে অনেক খবর পাওয়া যাবে।

সেকালের শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সেবাপরায়ণতা ছিল অসাধারণ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে পূর্ববঙ্গের পাট-চাষীদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। শান্তিনিকেতন থেকে পিয়ার্সন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে কালীমোহন বাবু পূর্ববঙ্গে গিয়ে চাষীদের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে আসেন। শান্তিনিকেতনে ফিরে, ছাত্রদের সম্মতিতে, বাহুল্য খাদ্য বর্জন করে তার মূল্য বাবদ সঞ্চিত টাকা পূর্ববঙ্গের দুর্গতদের সাহায্যের জন্যে পাঠানো হয়।

১৯১২সালে বঙ্গসরকারের এক গোপন ইস্তাহারে বলা হয়েছিল, সরকারী সন্দেহভাজন কালীমোহনবাবুকে শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় করা হোক্। তাঁকে বিলাতে অধ্যয়নের জন্যে পাঠিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা হয়। শিশুশিক্ষা-বিধি পড়বার জন্যে তিনি ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। বিলাতে ভাস্কর

রোদেনস্টাইন এই সময়ে তাঁকে মডেল করে তাঁর মূর্তি গড়েছিলেন।

১৯১৫সালের ৬ই মার্চ গান্ধীজি দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতনে আসেন। এই সময়ে গান্ধীজি শান্তিনিকেতন-আশ্রমের বিদ্যার্থীদের 'স্বরাজ্যের চাবি'র সন্ধানে স্বেচ্ছাব্রতী শ্রমদানী হবার পরামর্শ দিলেন। কবির অনুমতি পেয়ে ছাত্রেরা স্বেচ্ছাব্রতী হয়ে আশ্রমের সবরকম কাজ নিজের হাতে করবার দায় গ্রহণ করলে। এই কাজে আদর্শবাদী অধ্যাপকগণের উৎসাহ ছিল বেশি। কিন্তু; বাস্তবের সঙ্গে প্রত্যক্ষবোধসম্পন্ন কয়েকজন অধ্যাপক এই উৎসাহে অংশ গ্রহণ করেননি। এঁদের মধ্যে কালীমোহন ছিলেন অন্যতম।

কালীমোহনবাবু স্বদেশীযুগের আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন। ১৯২০ ২১ সালে শ্রীনিকেতনে অসহযোগ-আন্দোলনের গঠনমূলক কাজ করবার জন্যে কলকাতা থেকে নেপালচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে একদল অসহযোগী ছাত্র এসেছিলেন। এই সময়ে কালীমোহনবাবু আশ্রম থেকে সরে গিয়ে এই নূতন আন্দোলনের নানা কাজে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩০সালে তিনি দ্বিতীয়বার বিলেত গিয়েছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব য়ুরোপে পল্লী-সংগঠনের কাজকর্ম দেখবার জন্যে। এই সময়ে তিনি বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনেক ঘোরাঘুরি করেছিলেন।

কালীমোহনবাবু সম্পর্কে নন্দলাল বললেন :—

'কালীমোহনবাবু গুরুদেবের শিলাইদহের জমিদারিতে কাজ করতেন। তিনি সেখানে থেকে গ্রামের কাজ করতেন গুরুদেবের সঙ্গে। গুরুদেবকে সাহায্য করতেন গ্রামের কাজে। খুব যোগ্য লোক ছিলেন। গুরুদেবই পরে তাঁকে এনেছিলেন শান্তিনিকেতনে।

'আমি এসে যখন তাঁকে দেখলুম (১৯১৯) —পাতলা চেহারা আর খুব উৎসাহী (emotional)। মাথায় মাদ্রাজীদের মতন চুল। তার চারদিক কামিয়ে মাঝখানে ঝুঁটি। আমার অদ্ভুত লাগতো তাঁর অতো আবেগপ্রবণ চেহারা দেখে। আর দেখতুম, সবরকম কাজে তাঁর হাত আছে।

'গ্রামের কাজ করতে দেখেছি তাঁকে শ্রীনিকেতনে। গুরুদেব যখন শ্রীনিকেতনের কাজ আরম্ভ করলেন, কালীমোহনবাবু সেই গ্রামের কাজে যোগ দিলেন। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায়, গ্রামের ঝগড়া গ্রামে মেটানোর

প্রবর্তন করলেন কালীমোহনবাবু। স্বরাজী পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় গ্রামের কাজ গুরুদেব প্রথম আরম্ভ করেন শিলাইদহে। আর এইসব কাজই আমরা এখন (১৯৩৫) চাইছি।

'যাই হোক্, গুরুদেবের শ্রীনিকেতনে গ্রামের কাজের গোড়া পত্তন হলো কালীমোহনবাবুকে নিয়ে। পরে এলম্‌হার্স্ট এলেন, আরও অনেকে এলেন। এলম্‌হার্স্ট আসার পরেও কালীমোহনবাবু গ্রামের কাজে সাহায্য করতেন, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এই কাজই করে গেছেন। গ্রামে গ্রামে তিনি নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। এখন সারা দেশে এই বিষয়ে নানা চিন্তা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র-টেন্দ্র ইত্যাদি নানা রকম কর্মোদ্যোগ চলছে।

'গ্রামের শিল্পবস্তু —কাঁথা, পাখা ইত্যাদি —এই ধরনের সব জিনিস এনে কালীমোহনবাবু কলাভবনের ম্যুজিয়মে এগজিবিশনে দিতেন। আমাদের কলাভবন-ম্যুজিয়মের গোড়াপত্তনেও তাঁর দান ছিল অসামান্য। হাতেলেখা বাঙ্গালা-সংস্কৃত নানা পুঁথিও তিনি সংগ্রহ করে লাইব্রেরীতে দিতেন। কালীমোহনবাবু ছিলেন গুরুদেবের হাতের তৈরি লোক।

'একবার এখানে আমাদের ইউনিয়নবোর্ডের ট্যাক্স বেড়ে গেল। ট্যাক্স বাড়ানো নিয়ে খানিক বেশ গোলমাল হয়েছিল। গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কালী-মোহনবাবুর ছিল যোগাযোগ। বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর আলাপ। আমাদের ধারণা হলো, গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁর এই যোগাযোগের ফলেই এটা ঘটেছে। মনে করলুম, এতে তাঁর হাত আছে।

'আমাদের চা-চক্রে বসে একদিন এই সম্পর্কে আলোচনা করছিলুম। আমাদের এই আলোচনার খবরটা অফিসের কর্মী গোবিন্দ চৌধুরী গিয়ে তাঁর কানে তুলে দিলে। কালীমোহনবাবু ক্রুদ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চা-চক্রে এসে আমাদের চ্যালেঞ্জ করলেন। তখন চক্রে বসে মল্লিকজী আর আমি শিষ্ট কথা কইছিলুম। আমি ঠিক লক্ষ্য করিনি। শেষ পর্যন্ত কথাটা গিয়ে গুরুদেবের কানে উঠলো।

'পরদিন গুরুদেব আমার বাড়িতে এসে হাজির। —'কি হে, তুমি কালীমোহনকে কি বলেছো? ভয়ানক আঘাত লেগেছে ওঁর'। গুরুদেবের এই কথা শুনে খানিক কায়েতী বুদ্ধি খেলে গেল আমার মাথায়। আমি বললুম, —চা-চক্রে আমাদের বাক্‌স্বাধীনতা আছে। চক্রে বসে হামেশাই

আমরা রাজা-উজীর মেরে থাকি। কাজেই চা-চক্রের কথা চা-চক্রেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। তবে, এতে যদি ওঁর রাগ হয়ে থাকে, আমাকে বললেই তো আমি ক্ষমা চেয়ে নিতুম। আমার কথা শুনে গুরুদেব হাসলেন একটু। বললেন, —'কালীমোহন খুব শ্রদ্ধা করেন তোমাকে।' আমি বললুম,— আমিও খুব ভালোবাসি ওঁকে। আমার কথা শুনে গুরুদেব খুশি হয়ে চলে গেলেন।

'শ্রীনিকেতনে গ্রামে কাজ করলেও কালীমোহনবাবু শান্তিনিকেতনে মাটির বাড়ি তৈরি করে এখানেই থাকতেন। গ্রামের লোকের মতন তিনি মাটির বাড়িই পছন্দ করতেন, গ্রামের মানুষদের আরও কাছে আসবার জন্যে। মাটির বাড়িতে উই, আগুন এ-সবের নানা ভয় থাকা সত্ত্বেও মাটির বাড়িতে থেকেই তিনি আনন্দ পেতেন। দেশে তাঁর বিবাহ হয়েছিল আগেই। ছেলেপুলে তাঁর হলো সব এখানেই —বোধহয় বড়ো ছেলে ছাড়া। কালী-মোহনবাবুর বাবা খুব ভালো গাইয়ে ছিলেন। সেদিক থেকে তাঁর ছেলেদের টেস্ট্ খুব। ঠাকুরদাদার গুণ নাতিরা পেল। ক্রমশঃ তাঁর বড়ো ছেলে শান্তিময় বড়ো হয়ে সঙ্গীতভবনে ক্লাস নিতে আরম্ভ করলেন। কালীমোহন বাবুর শালী সুকুমারী দেবীর কথা পরে বলছি।

'কালীমোহনবাবু গ্রামের কাজ করতে করতেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ব্লাডপ্রেসার দেখা দিল। অবসর গ্রহণ করলেন। কিন্তু গুরুদেব শেষ পর্যন্ত কালীমোহনবাবুকে ছাড়তে চাইলেন না। তখন গুরুদেব আশ্রমের ইতিহাস লেখার ভার দিলেন কালীমোহনবাবুর ওপর। ইতিহাস লেখার প্রথম উদ্যোগে তথ্যসংগ্রহ করে গোড়াপত্তন করলেন কালীমোহনবাবু। গুরুদেবের জমিদারি থেকে যে-সব তথ্য নিয়ে এসেছিলেন তা থেকেই শুরু করলেন ইতিহাস লেখা। কালীমোহনবাবু স্বদেশী-অন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। বক্তৃতাও করতেন খুব ভালো। গ্রামের মানুষকে তিনি অনায়াসে কাছে টানতে পারতেন। তাঁর নিজের মনটিও ছিল খুব সরল। তাঁকে না পেলে গুরুদেবের পল্লীউন্নয়নের পরিকল্পনা এতো কম সময়ে সার্থক হতে পারতো না।

'কালীমোহনবাবুর কিড্‌নিতে স্টোন্ হয়েছিল। ওষুধ হিসেবে গাঁদাল পাতা খেতেন খুব। তিনি চলতেন খুব ধীরে ধীরে।

'কালীমোহনবাবুর মৃত্যুশয্যায় (১৯৪০) আমি উপস্থিত ছিলুম। সেদিন হঠাৎ খুব ঝড় হচ্ছে। শান্তি ছুটে এলো, —'বাবা কেমন করছেন, খুব নিশ্বাস পড়ছে ঘনঘন —মুখ দিয়ে।' আমি এলুম তাড়াতাড়ি, মাথায় জল দিতে বললুম। গায়ের জামা কেটে ফেলতে বললুম কাঁচি দিয়ে। আমি নাড়ী ধরে বসে আছি। তাঁর স্ত্রী মনোরমা বসে পায়ের কাছে। ডাক্তার আসতে না-আসতেই সব শেষ।

॥ কলাভবন ও নন্দলাল ॥

কলাভবনের অধ্যক্ষ আচার্য নন্দলাল (১৯২৩)। সুরেন্দ্রনাথ অধ্যাপক। নবগঠিত বিশ্বভারতীর এই আচার্য, অধ্যাপকের বিভাগ তৈরি করেছিলেন স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথ —১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে। কলাভবনে ১৯২৪ সালে ছিল ১৪জন ছাত্রছাত্রী। তার মধ্যে ছাত্র ৮জন, ছাত্রী ৬জন। অসিতকুমার হালদার ঐ সময়ে কলাভবন ছেড়ে গেলেন। তিনি হলেন তখন লক্ষ্ণৌ আর্ট-ম্যুজিয়মের অধ্যক্ষ। ঐ বছরে কলাভবন থেকে পাঁচটি প্রদর্শনী বাইরে পাঠানো হয়েছিল। —কলকাতায় দু-বার, মাদ্রাজে, রাজ-মহেন্দ্রীতে আর কাশীতে একবার করে। এ-ছাড়া প্রদর্শনী আশ্রমেও ক-বার হলো। কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রেরা মোট ৭০খানি মৌলিক ছবি এঁকেছিলেন। ছাত্রেরা লিথোগ্রাফী করে তাঁদের কতকগুলি ছবি প্রকাশ করেছিলেন।

কারুশিল্পবিভাগের ছাত্রীরা অলংকরণ কাজ করছেন। কাঠের কাজ, মাটির কাজ করছেন। বছরের (১৯২৩) প্রথম দিকে আঁদ্রে কার্পেলেস্ এই বিভাগে অনেক সাহায্য করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ আশ্রমে এলেন ১৯২২ সালে। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ-বর্ধন করলেন বহুল-পরিমাণে। কারুশিল্প-বিভাগের প্রদর্শনী হলো। এই কাজ খুবই প্রশংসা অর্জন করলো।

অসিতকুমার আশ্রম ছেড়ে গেলেন, অন্যত্র বেশি বেতন পেলেন। নন্দলাল তখন (১৯২৪) মাত্র ১৫০ টাকা বেতন পান। সে-বেতনও একসঙ্গে পেতেন না। ৫।১০ টাকা করে পেতেন দফায় দফায়। কিন্তু প্রতিজ্ঞা, ইংরেজ-সরকারের চাকুরি করবেন না। লোভনীয় চাকুরির প্রস্তাব অন্যত্র

থেকেও এসেছিল। কিন্তু প্রতিদিনের অভাব, সাংসারিক দুঃখকষ্ট অগ্রাহ্য করে নন্দলাল রইলেন শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে গুরুদেব ভারতবর্ষের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে যে শুভপ্রচেষ্টার শুরু করেছিলেন তাতে অংশ গ্রহণ করতে হবে, উপযুক্ত ছাত্রদল গড়ে তাঁকে সাহায্য করতে হবে, এই ছিল তাঁর দিন-রাত্রির চিন্তা। এই আদর্শের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত সুখদুঃখ ছিল তুচ্ছ। অপ্রমত্তচিত্তে এই কঠিন ব্রতের রূপায়ণ তিনি করেছিলেন দিনের পর দিন। চিত্রশিল্পকে আপন অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে তাকে ঘরে ঘরে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। ভবিষ্যৎ ভারতে সুরুচি ও সৌন্দর্যের ধারা লোকসমাজের মধ্যে প্রবাহিত করে দিতে হবে। জাপানীদের মতো সুন্দরের পূজারী হয়ে, আমাদের জাতীয় কল্পনা চিত্রশিল্পের আলোকে উদ্ভাসিত করে দিতে হবে। —এই ছিল নন্দলালের জীবনের একটা মহৎ উদ্দেশ্য। তাঁর ছাত্রছাত্রীদেরও এইভাবেই তিনি উদ্বুদ্ধ করতেন।

॥ নন্দলালকে লেখা দিনেন্দ্রনাথের পত্র, ১৯২৭ ॥

১৯২৭সালের গরমের সময়ে দিনেন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলং পাহাড়ে গিয়ে রইলেন। সেখান থেকে শান্তিনিকেতনে ফেরবার প্রাক্‌কালে আশ্রম-বান্ধবদের স্মরণ করতে গিয়ে, প্রথমেই তাঁর অন্তরঙ্গ নন্দলালের কথা মনে পড়েছে। দিনেন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন কবি। নন্দলালকে স্মরণ করে পত্রকাব্য লিখে পাঠালেন:—

শিলং

৩১-৫-২৭

আদিপর্ব

মোর মানসের পটে ছবি আঁকি বটে,
সে যে স্বপনের সাথী;
তব তুলির লিখন সে চিরন্তন
আমি খেলা-ঘর পাতি।
মোর গোপন বিহার সন্ধান তার
আমি ছাড়া কেবা জানে।

তুমি আলোকের কূলে তারে ধর তুলে
নিখিল বিশ্বপানে।

অন্তপর্ব

মেঘলোকে পাঠাইনু মানসের দূত।
শ্যামল পরশে রসি সজল মরুৎ
প্রবাসবেদনা বহি' যাবে খরসান
সমব্যথী তোমা কাছে। প্রাণ আন্‌চান,
তহবিল শূন্য, মন উদাস বিভল,
কোথা সেই ধূ-ধূ প্রান্তর সমতল!
ভূতভাবনের যত কিম্ভূতের দল
পাইনের ফাঁকে ফাঁকে হাসে খল্‌খল্‌।
শিরোপরি প্রাবৃটের ঘন কোলাহল
পাদতলে খাড়া পথ বিষম পিছল।
মন বলে —আর কেন, চল্‌ ঘরে চল্‌।
শীতল হয়েছে ধরা, নেমেছে বাদল।

॥ সুকুমারী দেবী ॥

'কালীমোহনবাবুর শালী ছিলেন সুকুমারী দেবী। আমাদের শান্তির মাসী। তিনি কলাভবনে আমার ছাত্রী ছিলেন। সুকুমারী দেবীর নিপুণ কারিগরিতে কলাভবনের মণ্ডনশিল্পের অনুশীলন চলতে লাগল। আজ (১৯৫৫) যা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হয়েছে, তার গোড়ায় ছিল তাঁরই উৎসাহ। সুকুমারী দেবী কোনো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করেননি। তবে, গ্রাম্য শিক্ষা তাঁর যা ছিল, তাই আমাদের পক্ষে তখন যথেষ্ট মনে হয়েছিল। কলাভবনে ছাত্রী হয়ে প্রথম আমার কাছেই তাঁর চিত্রবিদ্যার হাতেখড়ি হলো। ক্রমশঃ তাঁকে কলাভবনের decoration-বিভাগে ভরতি করে নিলুম। তখন যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল কলাভবনে। আমার কাজের ওপর গুরুদেব কোনো কথা বলতেন না।

'সুকুমারী দেবীর কাছে আমাদের গৌরী, যমুনা, গীতা, চিত্রনিভা সবাই মণ্ডনশিল্প শিখতে যথেষ্ট সাহায্য পেত। তাঁর একক কাজেও গৌরীরা সাহায্য করতেন।

'শ্রীভবনে থাকতেন তিনি ছাত্রী হিসাবে। শ্রীভবনে থাকতে তাঁর অসুবিধা হতে লাগলো। তিনি ওখানে থাকা পছন্দ করলেন না। কলাভবন-হস্টেলে আমাদের ঘর ছিল। তাঁকে একটা ঘর দিলুম আমরা, তিনি বয়স্কা মহিলা ছিলেন সেই ভরসায়। তাঁকে সবাই 'মাসীমা' বলে ডাকতো। কলাভবনে তাঁর থাকার ফলে, আমাদেরও সাহায্য হতো খুব। তিনি রাঁধতেও জানতেন ভালোরকম। সুক্ত, পায়েস—এই সব রেঁধে খাওয়াতেন।

[১৯০৮সালে শান্তিনিকেতনে প্রথম বর্ষা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন বেদাদি গ্রন্থ থেকে বর্ষার উপযোগী শ্লোক, স্তোত্র সংগ্রহ করে ছাত্রদের দিয়ে আবৃত্তি করান, আর উৎসব স্তোত্রে পর্জন্য দেবতার বেদী রচিত হয়েছিল বৈদিক রীতিতে।]

'শান্তিনিকেতনে আলপনার সূত্রপাত করেছিলেন ক্ষিতিমোহনবাবু। সে-কথা আগে বলা হয়েছে। সেকালে বৈদিক স্থণ্ডিলের design-এ পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে আলপনা দেওয়া হতো। এই বিষয়ে ক্ষিতিমোহনবাবুর শিষ্য ছিলেন মণি গুপ্ত। সে-আলপনার অনেক ব্যাখ্যাও করতেন ক্ষিতিবাবু। আমি আশ্রমে আসার পরে আলপনা দিতে লাগলুম তাঁরই অনুসরণে।

'আমার আসার কিছু পরে (১৯১৪) এখানে এলেন সুকুমারী দেবী। তিনি এলেন পূর্ববঙ্গের কোনো গ্রাম থেকে, তাঁর গ্রাম্য শিক্ষা আর সহজাত প্রেরণা নিয়ে। আমাদের তখনকার কলাভবনের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বিষয়রূপে আলপনা শুরু করার তিনিই হলেন গুরু। কলাভবনে আমার ছাত্রী তিনি। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের ভেতর সূচের কাজ, আলপনা ইত্যাদি decoration-এর কাজ তিনিই চালালেন প্রথম। এখন (১৯৫৫) গৌরী, যমুনা তাঁর স্থান নিয়েছে। গৌরী, যমুনা, তাঁরই ছাত্রী। আমরাও তাঁকে বিশেষ উৎসাহিত করতুম। দোলের সময়ে গৌরপ্রাঙ্গণে আলপনা দেওয়া হতো। সরস্বতী-পূজার সময়ে আমরা বড়ো মণ্ডপ করে আলপনা দিয়ে সাজাতুম। পদ্মফুল-টুলের ডিজাইন করা হতো। সাজাবার জন্যে ফুল আনা হতো

বাঁধ থেকে, বা, আশপাশের গ্রাম থেকে।

'সুকুমারী দেবী অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। স্বামীর সম্পত্তি যা ছিল, তাঁর ভাইয়েরা সে-সব আত্মসাৎ করেছিল। হাওলাত বা কোনো রকম আর্থিক সাহায্য তিনি তাদের কাছে বহুবার চেয়েও পাননি। সবই জ্ঞাতিরা আত্মসাৎ করে নিয়েছিল।

'শেষদিকে তাঁর কঠিন অসুখ করলো। গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হলো। তাঁর ড্রপ্‌সি — উদরী হলো। এখানকার ডাক্তারেরা হাল ছাড়লেন। কলকাতায় যাবার যখন স্থির, এখান থেকে যাবার সময়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন। বললেন, —'বারো বছর রইলুম এখানে, এখানেই মরবো ইচ্ছা ছিল। তা আর হলো না।' ১৯২৬ সালে তিনি কলকাতায় মারা গেলেন।

॥ রতন ॥

'রতন হচ্ছে ভুবনডাঙ্গার ডোম —বীরভূমের আদিবাসী 'বীরবংশী'। খুব ভালো গাইয়ে। বাঁশিও বাজায় খুব ভালো। আমাদের ছবি আঁকায়, এগজিবিশন সাজানোয় প্রভৃত সাহায্য করে সে। বাঙ্গালা ও ইংরেজী কিছু পড়েছে। গুরুদেবের বইও অনেক পড়েছে। ইংরেজীটা আর একটু শিখলে ভালো চাকরি পেতো। তবে, এ-দেশের লোক সহসা বাইরে যেতে চায় না বাপুতি ভিঁটে ছেড়ে। রতন বাইরে যেতে চাইলে তার ভালো চাকরি হতো।

'প্রথম দিকে সে ছিল একজন বয়। রেখেছিল আমাদের বিনোদ। রতন থাকতো চাকরের মতন, কিন্তু শিখতো ছাত্রের মতন।

'এখনও (১৯৫৫) কাজ করছে এখানে। কলাভবনে ডর্‌মেটরি দেখা-শোনা করে। আমি সঙ্গীতভবনে অনুরোধ করেছিলুম, ওকে নেবার জন্যে। ছাত্র হয়ে শিখবে বলে। কিন্তু চাকর বলে ঘৃণা করে ওকে নিলেন না। শেখালেন না। ফলে, একটি সহজাত সঙ্গীতপ্রতিভা বিকশিত হলো না। কিন্তু, গান শুনে শুনে সে শিখে নিয়েছে অনেক। পেশার দোষে তার প্রতিভা কল্‌কে পেলে না।

'ওর আসল নাম হলো 'নন্দ'। আমার নামের সঙ্গে মিল বলে তখন সবাই ওকে 'ডাকতে লাগলো রতন' বলে। সেই থেকে 'নন্দদুলাল' হয়ে গেল 'রতন'।

॥ কারুসংঘ ॥

শান্তিনিকেতনে কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আচার্য নন্দলাল একটি শিল্পী-উপনিবেশ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই আপন উপনিবেশে শিল্পীরা বসে আপন ইচ্ছামতো ছবি আঁকবেন। আর তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কারুশিল্পের অনুষ্ঠান করে নিজেদের জীবিকা অর্জনের সুযোগ পাবেন। বিভিন্ন কারুশিল্পের ওপর বই প্রকাশ করা হবে এই প্রতিষ্ঠান থেকে।

১৯২৯সালের শেষ দিকে আচার্য নন্দলালের মনে পরিকল্পনা দানা বেঁধেছিল। কলাভবনের পাঠ শেষ করে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা দু-এক-শো টাকার চাকরির চেষ্টায় দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে, এটা তাঁর পছন্দ নয়। এক জায়গায় একটা শিল্পী-উপনিবেশ স্থাপন করে সবাই একসঙ্গে থাকবে, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কারুশিল্পী দেওয়ালচিত্র, পুস্তক-প্রসাধন ইত্যাদি কমার্শিয়াল কাজ করে স্বাধীনভাবে প্রত্যেকে কিছু কিছু অর্থ-উপার্জন করবে, এবং বাকি সময়ে নিজের মনে ছবি আঁকবে। বিক্রী-কাজের আয়ের একটা অংশ, কমিশন হিসেবে সংঘের ভাণ্ডারে থাকবে। সেই সঞ্চিত তহবিল থেকে প্রয়োজনে তারা বিনা সুদে টাকা ধার নিতে পারবে। সেই টাকা থেকে প্রতিমাসে কারুশিল্পের বই কিছু কিছু ছাপানো হবে। বড়ো কোনো দেওয়ালচিত্রের ফরমাশ পেলে দল বেঁধে সবাই গিয়ে কাজ করবে। শিল্পীদের পরস্পরের সহায়তায় শিল্পধারাকে উন্নত করবে। এবং এই ভাবে শান্তিনিকেতনে একটা স্থায়ী শিল্পতীর্থ গড়ে উঠবে।

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে কারুসংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল এই :—
Some of the older students have organised a guild called 'Karu Sangha' with the objcet of supplying to the general public various artistic works such as Designing., Fresco-

painting, Terra-cotta, Embroidary, Batik etc. and also for publishing art works. It is hoped that the Karu Sangha will enable us to keep some of the older students actively connected with Kala-Bhavana. (V. B. Quarterly, Annual Report, 1930)।

১৯৩০সালে আচার্য নন্দলালের এই কল্পনাকে রূপ দেবার ভার পড়লো ছাত্র শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর। কারুসংঘের প্রথম সম্পাদক হলেন প্রভাতমোহন। কারুসংঘের জন্যে জমি কেনা হলো। ইন্দুসুধা ঘোষের লেখা সূচের কাজের ওপর 'সীবনী' বই প্রকাশ করা হলো। অবনীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে নন্দলালের ছাত্রধারার কয়েকজন মুখ্য শিল্পী সোৎসাহে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। প্রভাতমোহনের পরে, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত কারুসংঘের সম্পাদক হলেন। বছর তিনেক পরে কারুসংঘ বন্ধ হয়ে গেল। কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লী ইত্যাদি নানা স্থান থেকে কাজের অর্ডার সংগ্রহ করা হতো। কাজ তৈরি হলে, অর্ডারদাতার নিকট পাঠাবার ব্যবস্থা করা হতো।

সদস্যদের মধ্যে পাঁচজন শিল্পী পাঁচ-শো টাকা দিয়ে পাঁচ বিঘা জমি কিনেছিলেন। বেশ কয়েকজন শিল্পী সাময়িকভাবে অর্থচিন্তা থেকে মুক্তি পেয়ে এই সময়ে মহা-উৎসাহে সংঘের কাজে লাগলেন।

এ-বিষয়ে নন্দলাল বলেন :—

'শান্তিনিকেতন-আশ্রমে আর্টিস্টদের জন্যে একটি সোসাইটি স্থাপন করার ইচ্ছা আমার বহুদিনের। সেই ইচ্ছারই ফলে পত্তন করা হলো কারুসংঘের। আমাদের সুরেনের বিবাহের আগের এই ঘটনা। আমি নিয়মাবলীর খসড়া তৈরি করে ফেললুম। —সুরেন, মণিগুপ্ত, মাসোজী, বিনোদবিহারী, প্রভাতমোহন, স্বদেশী-করে জেল-ফেরতা ইন্দুসুধা হলেন এই সংঘের সদস্য। নিয়মাবলী মোটামুটি তৈরি হয়ে গেল। সেক্রেটারীকে বেতন দিতে হবে। প্রভাতমোহন হলেন কারুসংঘের প্রথম সেক্রেটারী, আর মাসোজী হলেন প্রথম হিসাবরক্ষক। প্রভাতমোহন স্বদেশী-কাজে অন্যত্র চলে গেলে, কারুসংঘের সেক্রেটারী হলেন মণিগুপ্ত।

'জমি কেনা হলো। আমার এখনকার (১৯৫৫) বাড়ির সামনের প্লট আমি কিনলুম। আমার স্ত্রীর এখনকার (১৯৫৫) বাড়ি থেকে সোজা

পশ্চিমে, সন্তোষ মিত্রের বাড়ি বাদে, ওধার পর্যন্ত জমি কেনা হলো। জমি কেনা পড়লো এক-শো থেকে দেড়-শো টাকার মধ্যে বিঘে। মাসোজী আর প্রভাতমোহনও জমি নিলেন। মাঝে বাদ রইলেন সন্তোষ মিত্র। ওঁর জমি উনি সংঘের জন্যে ছাড়লেন না। প্রভাতমোহন জমি কেনার সময়ে নিজেও টাকা দিলেন কিছু।

'বই-ইলাস্ট্রেশনের অর্ডার নেওয়া হবে, কমার্শিয়াল আর্ট ইনট্রডিউস করানো হবে, প্রেসের বই-এর মলাট-টলাটের ডিজাইনের অর্ডার দেওয়া হবে —এই সব কার্যসূচী নিলুম আমরা। দু-জায়গা থেকে অর্ডারও এলো। প্রথম এলো সারনাথ থেকে। বৌদ্ধবিহার মূলগন্ধকুটির কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। ওখানে স্কাল্পচার করতে হবে। রামকিঙ্কর সে-কাজ করবেন, আর ফ্রেস্কো করবো আমরা। ফ্রেস্কোর অর্ডার পেয়ে আমি সে করবো অন্য আর্টিস্টদের নিয়ে। ফ্রেস্কোর অর্ডার পেয়ে আমি কার্টুন তৈরি করে ফেললুম। কিন্তু, ফ্রেস্কোর কাজ আমাদের শেষ পর্যন্ত সারনাথে গিয়ে করা হলো না।

[শান্তিনিকেতন থেকে সারনাথে মূলগন্ধকুটি-বিহারে নন্দলালের ফ্রেস্কো করতে যাওয়ার কথা ছিল। এ সংবাদ রামানন্দবাবু প্রবাসীতে প্রচার করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফ্রেস্কো করতে নন্দলালের যাওয়া হয়নি। একজন জাপানী আর্টিস্ট্ তাঁর স্ত্রীর সূত্রে ওখানে ফ্রেস্কো আঁকার কাজ পেয়েছিলেন। ফ্রেস্কোর কাজ করার সময়ে সেই জাপানী শিল্পী শান্তিনিকেতনে নন্দলালের কাছে আসতেন। এসে নানা উপদেশ নিতেন। আর সেই উপদেশ মতো ওখানে গিয়ে দেওয়াল-চিত্র আঁকতেন। নন্দলাল নানা রকম টেক্‌নিক্ তাঁকে দেখাতেন। ফ্রেস্কোর ডিজাইন-আঁকা সে-সব 'টাইল' রাখা ছিল শান্তিনিকেতন-কলাভবনে।

সারনাথের ছবি আঁকা প্রসঙ্গে কারুসংঘের প্রথম সম্পাদক শ্রীপ্রভাত-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :—'সারনাথের মূলগন্ধকুটি বিহারে বুদ্ধজীবনের ছবি আঁকবার জন্যে এক সময়ে তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ হয়েছিল, ভগবান বুদ্ধকে বারবার স্বপ্নে দেখেছিলেন তিনি। আমাকে তাঁর দূত হয়ে যেতে হয়েছিল কর্তৃপক্ষের কাছে। আইনগত বাধার জন্যে কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, ভারতবর্ষের শিল্পজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাঁদের মূঢ়তায়।' শান্তিনি-

কেতন-কলাভবন থেকে অবসর নেবার পরে, বেলুড় মঠে ভিত্তিচিত্র আঁকবার ইচ্ছা ছিল নন্দলালের। কিন্তু তাঁর সে মনোবাঞ্ছা নানা কারণে পূর্ণ হয়নি।

'আমাদের কারুসংঘের নিয়ম করা হয়েছিল, ফ্রেস্কোর মূল ডিজাইন যে করবে, টাকাটা তারই হাতে আসবে। সেই টাকা থেকে কতক অংশ কারুসংঘের তহবিলে থাকবে। মূল আর্টিস্ট্ পাবেন ৩৫ পার্সেন্ট। অর্ডারের সঙ্গে যদি কেউ উপকরণ, বা কাজের জিনিসপত্র পাঠিয়ে দেন, তা হলে, তৈরি জিনিসের মোট মূল্য থেকে, পাঠানো-জিনিসপত্রের দামটা বাদ যাবে। এইসব ছিল আমাদের নিয়ম-কানুন।

'কমিশন-কাটারও নিয়ম করা হয়েছিল। বড়ো কোনো কাজ করে যদি কেউ বেশি উপার্জন করে, কমিশন কাটা হবে সেই মোটা অঙ্ক থেকে। কমিশনের টাকা সংঘের সাধারণ তহবিলে জমা পড়বে। সেই জমা টাকা থেকে কলাভবনের দুস্থ ছেলেদের ঢের সাহায্য করা হয়েছিল।

'কারও অবস্থা সত্যি খারাপ তার খাবার পয়সা নাই, এমন দেখলে, তাকে অগ্রিম টাকা দেওয়া হতো। তবে, থোক টাকা বেশি কাকেও দিতুম না। কারুসংঘের তহবিল থেকে টাকা ধারও নিত অনেক ছাত্রছাত্রী। তাদের কাজ করিয়ে সেই টাকাটা শোধ করে নেওয়া হতো। এই ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে উৎকর্ষ দেখাবার জন্যে talented কাজও করতো। এতে আমাদের দু তত্ত্ব লাভ হতো। ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক উপকার হতো, আবার উৎকর্ষ দেখাতে গিয়ে তাদের প্রতিভারও স্ফুরণ হতো।

'১৯৩১সালে গুরুদেবের জয়ন্তী-উৎসব হলো। হীরকজয়ন্তী হবে। তাতে কলকাতার টাউন হলে আমাদের ছবির প্রদর্শনী যাবে শান্তিনিকেতন-কলাভবন থেকে। আমাদের কারুসংঘের পক্ষ থেকেও কারুকর্মের প্রদর্শনী পাঠাবার উদ্যোগ করলুম আমি। কিন্তু আমার সেই উদ্যোগই কারুসংঘের 'কাল' হলো। বিশ্বভারতীর তখনকার কর্মসচিব বললেন, —'এটা কি ? এ-সব প্রাইভেট কারুকর্মের প্রদর্শনী হতে পারেনা।' শেষ পর্যন্ত আমাদের 'প্রাইভেট' কাজের প্রদর্শনী হলো না।

'আমাদের কাজ বাদ পড়াতে আমার মনে ভয়ানক ধাক্কা লাগলো। আমি ভাবলুম,—কারুসংঘ চালিয়ে self-supported হলে আমি কলাভবনের কাজ ছেড়ে দেবো। কলাভবনে বেতনভুক কর্মীর মতনই কাজ শিখে

যাবো।—আমার এই অভিমানের কথাটা গুরুদেবের কানে গিয়ে পৌঁছলো। গুরুদেব কিন্তু সব শুনে আমাদের কারুসংঘের কাজটাকেই খুবই support করলেন।

'গুরুদেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। গুরুদেবের দরবারে তখন নেপালবাবু উপস্থিত। গুরুদেব সব শুনে উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন,—তোমাদের কারুসংঘের জন্যে আমি জমি কিনে দেবো। তোমরা সংসারী হবে, এ-তো অতি সুখের কথা।'

'কিন্তু, তখনকার কর্মসচিব মশাইয়ের এতে ঘোর আপত্তি হলো। তিনি বলে উঠলেন,—না, এ হতেই পারেনা। এতে ওরা জমিদার হয়ে বসবে। কাজ আর করবে না। জমি কে দেখবে। চাকরিতে এনেছি ওদের, নিজেদের ঘর-দোর দেখতে রাখিনি। যেমন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে জন্মেছে, সেই মতোই ওদের থাকতে হবে।—এ-কথা শুনে, প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লাগলো আমার মনে। গুরুদেবের কথা কাটা গেল।

'তখন (১৯৩১) আমাদের সুরেনের বিয়ে। আমি কলাভবনে আছি। উত্তরায়ণ থেকে নোটিশ এলো। Clause দিয়ে দিয়ে লেখা সে-নোটিশ। তার প্রধান কথা হলো, extra work করতে হবে। কলাভবন নিয়ে মগ্ন আছি। ছেলেমেয়েদের চিন্তায় দিনরাত্রি ফুরসৎ পাইনা। তার ওপর আবার কলকারখানার শ্রমিকের মতন 'extra work'!

'যাইহোক্ সব বুঝলুম। ভাবলুম, আর কেন, সব ভেঙ্গে দাও। ভেঙ্গে দেওয়া হলো আমার শিল্পী-উপনিবেশের পরিকল্পনা। কারুসংঘের মৃত্যু হলো। হতাশ হয়ে ছেড়ে দিলুম সব। দুঃস্থ ছেলেদের দু-তত্ত্বের উপকার আর করা হলো না।

'১৯৩৪সালে বিহারে ভূমিকম্প হলো। ওখানে সব বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে আমি একটা কাজের অর্ডার পেয়েছিলুম। তার ডিজাইন করে আমার উপার্জন হয়েছিল এক-শো টাকা। ঐ টাকাটা আমি ঐ ত্রাণখাতে দান করে দিলুম। প্রভাতমোহনও দিলেন কিছু।

'আমরা এই সময়ে লিনোকাট করেছিলুম অনেক। আমাদের বিশ্বরূপ জাপান থেকে জাপানী উড্‌কাটের কাজ ভালো করে শিখে এসেছিলেন। উডকাট্ করে ছবির ব্লকও আমরা অনেক ছাপিয়েছিলুম।—এ-সব হলো

১৯৩৫-৩৬ সালের কথা।

[সেই থেকে কারুসংঘ চলছিল ক্ষীণধারায়। ১৯৫১ সালে সুরেন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতাকালে এতে পুনরায় প্রাণসঞ্চার করা হয়। সম্প্রতি নন্দলালের কয়েকজন উৎসাহী ছাত্রছাত্রী মিলে এর পুনরুজ্জীবনে মন দিয়েছেন।]

'কলাভবনের হস্টেলে নিজেদের কিচেন ছিল। সেই কিচেনে কলাভবনের ছেলেমেয়েরা খেতো। রাঁধনী রেখে আলাদা রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর কারণ হলো জেনারেল কিচেনে ছেলেমেয়েরা যে-পরিমাণ টাকা দিত, তার উপযুক্ত খাবার তারা পেতো না। কলাভবন-কিচেনের কাছাকাছি কিচেন-গার্ডেনও করা হলো। কলাবাগানও তৈরি করা হলো। কিচেন-গার্ডেনে আনাজপাতি বেশ হতে লাগলো। বেগুন হলো, কুমড়ো হলো। রান্না হতো কিচেন-গার্ডেনের এই সব আনাজপাতি। রান্নায় সাহায্য করতো কলাভবনের মেয়েরা পালা করে।

'মাসীমা সুকুমারী দেবী ছিলেন তখন। সেই সময়ে তিনি থাকতেন শ্রীভবনে। আমি তাঁকে কলাভবনে চলে আসতে বললুম। তিনি চলে এলেন। কলা-ভবনের কাছেই একটি ছোট্ট কুটীরে থাকতেন তিনি। কিচেনের তদারকি আর কিচেন গার্ডেন রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তিনিই।

'দেশে তখন দুর্ভিক্ষ চলছে। কলাভবনের গরীব ছাত্রছাত্রীরা কলা-ভবনের কিচেনে খেতে লাগলো। গাঁয়ের ছেলে কারো ধান-জমি থাকলে তারা ধান বা চাল তৈরি করে নিয়ে আসতো। এখানেও ধান সিদ্ধ করে চাল করিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ধান-চাল রাখার জন্যে স্টোরও তৈরি করা হলো।

'কলাভবনের শিক্ষকদের নেমন্তন্ন করা হতো সপ্তাহে একদিন করে। তাঁরা খেয়ে কলাভবন-কিচেনের খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করবেন, আর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজনের ফলে, তাঁদের হৃদ্য সম্পর্কও বাড়বে, এই ছিল আমার আশা। শিক্ষাভবনের অধ্যাপক গুরুদয়াল মল্লিকজী কলা-ভবন-কিচেনে খেতেন নিয়মিত। কলাভবনের পিওন রতনও খেতো ঐ কিচেনে। কিচেনের শক্ত কাজগুলি সে হাসিমুখে করে দিতো।

'কিন্তু, আমার এই পাটও শেষ হয়ে গেল। নিজের বিষে নিজে মরলুম

আমরা। কলাভবন-কিচেনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, আর আহারের বহর দেখে, বড়-লোকের ছেলেরাও ঢুকতে লাগলো। কিন্তু, তারা আবার এখানে এক-পঙ্‌ক্তিতে বসে মুরগি খেতে চায়। ক্রমেক্রমে আরও অনাবশ্যক element এসে জুটতে লাগলো। কিন্তু, এ-সব অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকলো, বিশেষ করে যেখানে পঙ্‌ক্তি-ভোজনের ব্যবস্থা।

'ক্রমে বানের জল ঢুকে ঘরের জল দূষিত করে দিলে। শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে গেল সব। রাঁধুনির অভাব হলো। তখন পালা করে ছেলেমেয়েরাই রান্নার কাজ চালাতে লাগলো। কিন্তু আইন-কানুন কড়াকড়ি করতেই কিচেন গেল। আমাদের উদ্যমেরও ইতি হলো। এখানে এই সময়ে মাসী-মারও হলো কঠিন অসুখ। তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি মারা গেলেন।

॥ প্ল্যান্‌চেট্‌ প্রসঙ্গ ॥

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থায় বিলেতে কিছুদিন ডক্টর স্কটের বাড়িতে ছিলেন অতিথি হয়ে। সেই সময়ে ডক্টর স্কটের মেয়েদের নিয়ে কবি এক একদিন সন্ধ্যাবেলায় 'টেবিল চালাতে' বসতেন। ওঁরা একটি টিপাই-এ হাত লাগিয়ে থাকতেন, আর সেই টিপাইটা ঘরময় উন্মত্তের মতো দাপাদাপি করে বেড়াতো। ক্রমে এমন হলো, ওঁরা যাতে হাত দিতেন, তাই নড়তে থাকতো। কিন্তু মিসেস্ স্কট্ এই শয়তানের খেলা বৈধ বলে মনে করতেন না।

এডিসন সাহেবের সদ্য-আবিষ্কৃত প্লান্‌চেটের আসরে জোড়াসাঁকোতেও যুবক কবির উৎসাহ একবার জমে উঠেছিল। আবার শেষ বয়সে, শান্তি-নিকেতনে বেশ কিছুদিন কবি Sp rit-writing নিয়ে মগ্ন হয়েছিলেন —সে ১৯২৯সালের দিকে। পূজার ছুটির আগে কবির ইচ্ছা হলো, 'রক্ত করবী' অভিনয় করাবার। কিন্তু সে সম্ভব হলো না। পূজার ছুটিতে কবি রইলেন শান্তিনিকেতনেই। তাঁর কাছে বেড়াতে এলেন বুলা ওরফে উমা সেন। ইনি স্বর্গত মোহিত সেনের কন্যা। উমাদেবীর মধ্যে অতিপ্রাকৃত মিডিয়ামের শক্তি দেখা দিয়েছিল। এই ব্যাপারে কবিরও কৌতূহল খুব। পূজার অবকাশে উমা দেবীর মাধ্যমে কবি অতিপ্রাকৃত লোকের সঙ্গে যোগাযোগে

মন দিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় লণ্ডনে এবং যৌবনে জোড়াসাঁকোয় প্ল্যান্‌চেট নিয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে আবার সেই কৌতূহল তাঁকে পেয়ে বসলো। মিডিয়ামের মাধ্যমে পরলোকগত ব্যক্তির আত্মা প্রকাশ করে, দৃষ্টিগোচর না-হয়ে, লিখে আত্মপরিচয় দেয়, এবং যা করণীয় তা জানিয়ে থাকে —কবি এ-সব বিশ্বাস করতেন।

মৃত্যুর পরে নিরবচ্ছিন্ন জীবনধারায় তাঁর ছিল একান্ত বিশ্বাস। মৃত্যুর পরে মানবাত্মার অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসবান্ ছিলেন বলেই প্ল্যান্‌চেটের মিডিয়ামের সাহায্যে আশ্চর্য উক্তিসমূহ শোনবার কৌতূহল ছিল তাঁর সারা জীবনে। এই বিষয়ে কবি নানা লোককে লেখা তাঁর চিঠিপত্রে অনেক কথা লিখেছেন। কবি স্বয়ং যুক্তিবাদী হলেও এই অপ্রাকৃত ব্যাপারগুলি যে বিস্ময়কর, তা তিনি স্বীকার করেছেন। তবে, এর মধ্যে সত্য কতখানি, সে-বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত করেননি। যাই হোক্, প্রমাণ না-থাকলেও, বিশ্বাসবশে, এই হেঁয়ালির খেলায় মহামনীষী রবীন্দ্রনাথ একদা নিমগ্ন হয়েছিলেন। কবির কথায় :—'পৃথিবীতে কত কিছু তুমি জানো না তাই বলেই সে-সব নেই? কতটুকু জানো? জানাটা এতটুকু, না-জানাটাই অসীম —সেই এতটুকুর উপর নির্ভর করে চোখ বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। আর তা-ছাড়া এত লোক দল বেঁধে ক্রমাগত মিছে কথা বলে, এ আমি মনে করতে পারিনে। তবে অনেক গোলমাল হয় বৈকি। কিন্তু যে বিষয়ে প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত। যে-কোনো এক দিকে ঝুঁকে পড়াই গোঁড়ামি।'

মহাশিল্পী আচার্য নন্দলাল আবাল্য অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাসী। তাঁর একাধিক বিখ্যাত ছবির আত্মপ্রকাশের মূলে অতি-প্রাকৃতের ছায়া কাজ করেছে বহুলপরিমাণে। তিনিও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের এই প্ল্যান্‌চেটের আসরে একজন মুখ্য পারিষদ।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, নন্দলাল সাধারণ বিশ্বাসী হিন্দুর মতো জন্মান্তরবাদ, গুরুবাদ, ঈশ্বরবাদ, মন্ত্রশক্তি, স্থানমাহাত্ম্য, সাধকদের অলৌকিক শক্তি, ফলিত জ্যোতিষাদিতে বিশ্বাস করতেন। অর্থাৎ প্রাচীনপন্থীদের তথাকথিত অনেক 'দুর্বলতা' ছিল তাঁর। কিন্তু, এ সব ছিল তাঁর দেশপ্রেমের অঙ্গ। এর জন্যে তিনি কোনদিন লজ্জা পাননি। বলতেন, —'দেখা জিনিসকে

অবিশ্বাস করা সম্ভব নয়।'

প্ল্যান্‌চেট্‌ প্রসঙ্গে নন্দলাল বলেন : —

'গুরুদেবের একবার খেয়াল হয়েছিল ঐ সবে। বুলা —মোহিত সেনের মেয়ে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁকে মিডিয়াম করে, গুরুদেব প্ল্যান্‌চেটে মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা কইতেন। একদিন গুরুদেবের পরলোকগত পুত্র শমীন্দ্রনাথের আত্মা এলো। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, —'শমী! তুই ওখানে কি করিস? শমীর লিখিত উত্তর হলো, —'আমি বাগান করি।' আশ্রম-বিদ্যালয়ে বালক শমীন্দ্রনাথের বাগান করার খুব ঝোঁক ছিল বলে শুনেছিলাম। উত্তরটা মিলে গেল। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, —'শমী তোর সঙ্গে কবে দেখা হবে রে?' —বাবার এ প্রশ্নের উত্তরে লেখা হলো, —'আমি চললুম।' ব্যথিত হয়ে কবি বললেন, —'শমী বড় দুষ্টু।'

'একদিন সন্তোষ মজুমদারকে ডাকলেন। সন্তোষের কথাবার্তায় জানা গেল, সন্তোষ পরলোকে গিয়ে গাছের প্রাণ নিয়ে কারবার করেন। গাছের প্রাণের আধ্যাত্মিকতা ব্যাখ্যা করে থাকেন।

'জোড়াসাঁকোয় থাকতে কবি প্ল্যান্‌চেট-চর্চা করেছিলেন একবার। আমি তখন অবনীবাবুর বাড়িতে কাজ করি। একদিন গুরুদেবের ইচ্ছা হলো প্ল্যান্‌চেটে তাঁর স্ত্রীকে ডাকবেন। আর একদিন প্ল্যান্‌চেটে একটি মহিলা ধরা দিলে। কবি তার পরিচয় জানতে চাইলেন। মহিলাটি বললে, —আপনি চিনবেন না। আমি জোড়াসাঁকোর বাড়ির গলির মোড়ে থাকি। 'কাকে চেনো', জিজ্ঞাসা করে, পরপর নাম বলায়, আমার নাম আসতেই মহিলাটি বললে,—'ও, নন্দলাল, এঁকে চিনি।' মহিলার কথা শুনে, গুরুদেব আমাকে বললেন,—'কি হে, চেনাশুনা নাকি? বলছে যে ছেলেবেলায় ও তোমাকে চিনতো।' আমি বললুম,—'খানিকটা সত্যি, খানিকটা মেলানো।' গুরুদেব বললেন,—'ছেড়ে দাও ও সব।'

'শান্তিনিকেতনে আমি প্ল্যান্‌চেট্‌-চর্চা করেছিলুম বেশ কিছুদিন। কলাভবনের ছাত্রী (১৯৪০) নীলিমা বড়ুয়া হয়েছিল self-medium। —এ হলো ১৯৪১ সালে গুরুদেবের মৃত্যুর পরের কথা। প্ল্যান্‌চেট্‌ ধরে হঠাৎ একদিন দুপুর বেলায় খাবার আগে জানতে পারা গেল, অমিয় চক্রবর্তীর ভাই অজিত চক্রবর্ত্তী মারা গেছেন। তিনি সুইসাইড্‌ করেছিলেন। এখানে

খবরটা এলো অনেক পরে।

'গুরুদেবকে ডাকা হয়েছিল একদিন। তাঁর মারা যাবার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছিল। তিনি বললেন,—'সে কারণ জানবার দরকার নেই।'

'আমি গুরুদেবকে ডাকতে চেয়েছিলুম একদিন। মিডিয়াম হলো নীলিমা। গুরুদেবের কথা, লেখায় যা ধরা গেল সে এই—গুরুদেব বললেন, —'বুঝতে পেরেছি, কলাভবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। আমি বললুম,— 'কলাভবনের এলোমেলো অবস্থা। কি করে ঠিক করবো।' গুরুদেব বললেন,—'চিন্তা করো। চিন্তা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা করলেই উপায় উদ্ভাবন হবে। অন্য পথে এর সংশোধন হবে না। অপরের কথা শুনবে না। যা ভেবে স্থির করবে, তাই অনুসরণ করবে।' জীবিত অবস্থায় গুরুদেব বলতেন,—'চিন্তা করলে, বিচার করলে, অনেক জিনিস মনে আপনি প্রকাশ পায়। তোমার ভেতরে যা আছে গভীরভাবে চিন্তা করলে সেটা ফুটে উঠবে।' মহিমবাবুও এই একই কথা বলতেন। ঠাকুর বলতেন,—পাকা নাচিয়ের বেতালে পা পড়ে না।

'আর একদিন। মিডিয়াম নীলিমা। আমি ডাকলুম গগেনকে। তখন গুরুদেব জীবিত। গগেন আমার সঙ্গেই দেখা করতে চাইলেন। গৃহস্থালির আর আমার নিজের ব্যবস্থা কি করা যায়, সে-সম্পর্কে কথা হলো।

'সেই সময়ে কিঙ্কর বুদ্ধমূর্তি করছেন। কলাভবনের একজন ছাত্র ছিল রবি। রবি ছিল কিঙ্করের সহকারী। ওঁরা আমার বাড়িতে শুতে আসতেন রাত্রি বারোটা-একটায়। কিঙ্কররা আসবেন, আমি শুয়ে আছি বারাণ্ডায় আধো-ঘুম অবস্থায়। হঠাৎ গলার আওয়াজ পেলুম,—'নন্দ, ঘুমিয়েছো? তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি'। —দেখলুম, দূরে অনেক গাছের সারি। অন্ধকারে গাছগুলো লাগছে ধোঁয়ার মতন। সেই গাছের সারির ভেতর কেউ যেন টর্চের আলো ফেলেছে। গোল একটা জ্যোতির্মণ্ডল দেখা যাচ্ছে। সেই জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে গগেন শুয়ে আছেন কাত হয়ে কুঁকড়ি মেরে। তখনও রোগা শরীর। আমি দেখছি। সহসা একটা গম্ভীর শব্দ করে গগেন বললেন,—'No accommodation'। তার পরেই সব অদৃশ্য হলো। —আমি এর আগের বা পরের কোনো ঘটনাই জানতুম না। গগেন ছিলেন খুব অভিজ্ঞ চৌকস সংসারী লোক। কিন্তু, আমার সমস্যা সমাধানের জন্যে তাঁর

নাগাল পাওয়া গেল না।

'আবার একদিন ডাকলুম আমার হিতৈষী গণেনকে। তিনি বললেন, —'আবার ডাকছো ?' আমি জিজ্ঞাসা করলুম—'কলাভবনের কি করবো, বলো।' তিনি বললেন,—'যেমন ভাবছো, তাই করো-না। যা করতে ইচ্ছা করছো, তাই ঠিক হবে। যা করতে চাও তাই করো। এর-ওর কথা শুনো না। ভুল চিন্তা তুমি করতে পারবে না।'

'তখন আমাদের বিনোদের ম্যালেরিয়া হয়েছে। গণেনকে জিজ্ঞাসা করলুম, —'বিনোদের অসুখের কি করা যায়।' গণেন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, —'আমি কি জানি ? আমি কি কব্‌রেজ, না ডাক্তার ? ডাক্তার কব্‌রেজ দেখাও।'

'শেষে গণেন মিডিয়াম নীলিমাকে ধমকালেন। —'তুমি আমাদের ডাকো, এ-সব ভালো নয়। আমরা হলুম অন্য জগতের লোক। আমরা মৃত, তোমরা জীবিত। এতে তোমাদের অমঙ্গল হবে।'

'প্ল্যান্‌চেট্‌-প্রসঙ্গে এখানে শিল্প-সম্পর্কে একটা গভীর কথা বলে রাখি। আমার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। —প্ল্যান্‌চেটে মিডিয়াম যেমন অপরের ইচ্ছায় কাজ করে, আমি তেমনি অনেক সময়ে না-জেনে ছবি আঁকি। একবার আমার চিন্তা হলো, কোনো-কিছু দেখা না-থাকলে, কিংবা সে-বিষয়ে চিন্তা না-থাকলে, কি করে ছবি হতে পারে। দ্রষ্টা মহাপুরুষ লোক যাঁরা তাঁদের হয়তো তা সম্ভব হয়। কিন্তু, আমার ? —ক-দিন ধরেই এই রকম ভাবনা ভাবছি। এমন সময় হঠাৎ ছোট্ট একখানা বই এলো আমার হাতে। বইখানা হলো বাউল-সঙ্গীতের। বোধ হয়, বামাক্ষ্যাপার না-কার লেখা গানের সংগ্রহ। নির্মল বসুর সংগ্রহ, না লেখা, তাঁরই পাঠানো কিনা, মনে নাই।

'সেই বইখানা পড়তে লাগলুম মনোযোগ দিয়ে। হঠাৎ তার এক জায়গায় একটা কলি পাওয়া গেল, —'কোথা থেকে পেলি রে ক্ষ্যাপা বিনা ধানের খই। কেমন করে পেলি, কেমন করে পেলি রে ক্ষ্যাপা, বিনা দুধের দই॥' —কলি দুটো পড়ে তখন আমার মনে হলো, এ-কথাটা তো ঠিকই বলা হয়েছে। গুরুদেবেরও তো এর ব্যতিক্রম ঘটেনি ছবি আঁকার প্রেরণা পাওয়ায়। কারণ, শূন্য-সূত্রে কোনো কাজ অর্থাৎ কারণ ছাড়া কাজ

হতে পারেনা। গুরুদেবের ছবি আঁকার মূলে কোনো অদৃশ্য কারণ আছেই, তা না হলে, তাঁর এ-ভাবে ছবি-আঁকা হতেই পারতো না। তবে আমার মনে হয়, অদৃশ্য কারণটা তিনি না-জেনেই, তাঁর অবচেতন মন থেকে ক্রমাগত ছবি এঁকে চলেছেন। —আমার মনে এই ধারণা স্থির হয়ে বসে গেল, —বিনা কারণে সৃষ্টিকার্য হতে পারে না। 'বিনা ধানের খই' বা 'বিনা দুধের দই' —পাওয়ার খবর বীরভূমের বাউলরা বোধহয় পেয়েছিলেন।

'ছবি-আঁকার ব্যাপারে তিনটি জিনিস প্রধান —Texture, Nature আর Calligraphy। গুরুদেবের ছবিতে Texture-টাই important। তার আদল নেওয়া হয়েছে ভাঙ্গা কাঁচ-টাচ ইত্যাদি অনাবশ্যক জিনিস থেকে।

'Nature-এ রূপের লিপি-অঙ্কন হয়ে থাকে। গুরুদেবের ছবির প্রধান অঙ্গ হলো, প্রকৃতির সেই রূপের লিপি অতি সহজেই পড়ে ফেলা।

'আর আঙ্গিকের জন্ম হয়েছে Calligraphy থেকে। তাঁর ছবি আঁকার মধ্যে আঙ্গিকটাও হচ্ছে একটা অন্যতম অঙ্গ। তালের আঁশ, তালমাড়ির রং, কখন যেন দেখে রেখেছেন। আর সেই দেখাটা তাঁর তুলির ডগায় বের হয়ে এসেছে যেন অজ্ঞাতসারেই। প্ল্যান্‌চেটের মিডিয়ামের মতন তাঁর অজ্ঞাতসারেই সেই রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। গণ্ডারের নাকের খড়্গ দেখে রেখেছেন, তারই gesture ছবিতে ফুটে উঠেছে। যখন আমি 'নটীর পূজা' ছবি আঁকছিলুম তখন ঠিক এইরকমভাবেই আমার মন কাজ করেছিল। সে-কাজে রেখার টানে আমার মন আর তুলি এক হয়ে গিয়েছিল। বরোদায় যখন ফ্রেস্কোর কাজ করেছিলুম, তখনও এই রকম যেন আমার অসাড়েই তুলি চালিয়ে গেছি।

'নটীর পূজার ছবিতে লাইন টানতে টানতে লাইন আর মন এক হয়ে গেছে। একশা হয়ে গেছে। তখন যে-লাইন টানা হচ্ছে, সেটা লাইন কি মন, বলা শক্ত। মনটাকেই যেন লাইনে ঢালাই করা হচ্ছে। মনটাকে রেখার ওপর যেন গলিয়ে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। —সোনা গলিয়ে ছাঁচে ফেলার মতন। গুরুদেবের সেই গানের কলিটা তখন খুব মনে পড়তো, —নীরবে থাকিস সখী, নীরবে থাকিস …।

'বরোদায় যখন ফ্রেস্কো করা হলো তখন লড়াই চলছে —দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ। সেই সময়ে কিন্তু এক পয়সারও রং তুলি কিনিনি, কিছু

জাপানী তুলি ছিল আমার কাছে। তাই দিয়েই কাজ সারা হলো। জাপানী তুলি না-থাকলেও দেশী তুলি দিয়ে কাজ চালানো যেতো। পরের ভরসায় থাকতে হতো না। স্বাবলম্বী হওয়ার এই গুণ। আমার 'শিল্প চর্চা'-বই-এ এই তুলির কথা আমি ভালো করে বলেছি।

'আর্টে একতা থাকবে ভাবের দিক থেকে। আর তারতম্য থাকবে বিশেষের দিক থেকে। আর্টে রূপের দিক থেকে কোনমতে একাকার হতে পারে না। সে হতে পারে ভাবের দিক থেকে। রূপের দিক থেকে একাকার হলে শিল্প অর্থহীন হয়ে যাবে। ছবি হবে রস ও অনুভূতির দিক থেকে। আইডিয়া থাকবে ব্যাকগ্রাউণ্ডে। ছবি হয়ে যাবে স্রেফ আইডিয়া থেকে অনেক বড়ো।

'আবার রূপের দিক থেকে ছবি একাকার হতে পারে; কিন্তু সত্যের ও তথ্যের দিক থেকে একাকার হবে না। আবার তথ্যের দিক থেকে একাকার হবে না; কিন্তু সত্যের দিক থেকে হবে। শিল্পে দুটোই থাকবে —তথ্য ও সত্য। এই বিষয়ে গুরুদেবের লেখা 'সাহিত্যের পথে' বইখানি ভালো করে পড়ে দেখো।

॥ মরিস ॥

'বোম্বাই থেকে এসেছিলেন হিরাজিভাই পেস্তোনজি মরিসওয়ালা। বোম্বাইয়ের বাসিন্দা। জাতিতে পারসী। লম্বা, রোগা, ফরসা চেহারা। মাথার ছিট্ ছিল একটু, সরল-প্রকৃতির মানুষ। বিশ্বভারতীর আদিপর্বে (১৯১৯) এসেছিলেন তিনি। পড়াতেন ইংরেজি আর ফরাসী। বহুদিন ছিলেন তিনি শান্তিনিকেতনে। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল শোচনীয় অবস্থায়।

'বাঙ্গালা শেখবার তাঁর আগ্রহ ছিল খুব। সে-কাহিনী সেকালের ছাত্র শ্রীপ্রমথনাথ বিশী খুব ভালো করে বর্ণনা করেছেন।

'শাস্ত্রী মশাইকে 'বেটা ভূত' বলেছিলেন। 'সুজিতবাবু শিখিয়েছেন'— বলেছিলেন। এটা নাকি আদরের কথা। 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় গুরুদেব লিখেছেন।

'বিলেত বেড়াতে যাচ্ছিলেন। জাহাজ থেকে missing হলেন। কাপ্তেন

বললেন, —সুইসাইড করেছেন। বোধহয় বিশ্বভারতীর ব্যাপার নিয়ে মেলান্‌কলি থাকতেন সব সময়ে। নিউরটিক ছিলেন। সবাই সহজে মনে করলেন, সুইসাইড করেছেন।

॥ পল রিশার ॥

'মরিসের কিছু আগে পল্‌ রিশার নামে একজন ফরাসী ভাবুক শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এসে কিছুদিন বাস করেন। আশ্রমে বড়োবাবু দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অনেক আলোচনা হতো। তিনিও শান্তিনিকেতন-আশ্রমে ফরাসী ভাষার ক্লাস নিতেন। এঁরই স্ত্রী হলেন পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ-আশ্রমের The mother। তাঁর নাম ছিল মীরা রিশার। পলের স্ত্রী মীরা রইলেন পণ্ডিচেরীতে। তাঁর জাপানী ড্রেসে ফটো আছে। Sento-সাধনা করতেন ওঁরা জাপানে। পরে, ওঁরা অরবিন্দের সঙ্গে যুক্ত হলেন। পল্‌ পণ্ডিচেরী থেকে চলে গেলেন, স্ত্রী রইলেন 'শক্তি' হিসেবে। পল্‌ ভারতবর্ষেই রইলেন। ওখান থেকে অন্য আশ্রমে গিয়ে রইলেন।

'দেশে অরবিন্দের তান্ত্রিক গুরু ছিলেন। তখন মদ্য মাংস চলতো। পরে, অরবিন্দ তান্ত্রিক সাধনা ছেড়ে দিলেন। Mother মীরা এসে ও-সব ছাড়ালেন। নতুন ধর্মের প্রবর্তন হলো।

॥ ওয়াং-এর গুরু একজন চীনা আর্টিস্ট ॥

'মিস্ Yao-wan-shan-এর গুরু শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। পাগল অবস্থা থেকে তিনি আর্টিস্ট হয়েছিলেন। যখন তিনি পাগল হয়ে গেলেন, চীনে ডাক্তার বলেছিলেন, ওঁকে একটা ঘরে বন্ধ করে ছবির বই দিয়ে রাখতে। সেই সব বই দেখতে দেখতে পাগলামি সেরে গিয়ে আর্টের প্রেরণা তাঁর মনে জেগে উঠলো। এবং পরে, তিনি একজন ভালো artist হলেন।

'শান্তিনিকেতনে এসে আমাকে তাঁর আঁকা ছবি উপহার দিলেন।

ক্রিসানথিমামের ছবি —ফুল ফুটছে। আমি দিলুম, এখানকার গ্রামের দৃশ্য। —ধানক্ষেতের ছবি দিলুম। তিনি এখানে দু একদিন মাত্র ছিলেন। কলকাতায় সোসাইটিতে তাঁর ছবির exhibition করলেন। ক্যাটালোগ দেখলেই তাঁর ছবির বিবরণ জানতে পারবে।

'আরও একজন চীনা artist এসেছিলেন এখানে। তাঁর কাছে, পরে আমাদের কলাভবনের ছাত্রী জয়া-টয়া শিখতে গেছলো। সেই artist-টির সঙ্গে এখানে আমার অনেক আলোচনা হয়েছিল। Interesting অনেক কথা তাঁর সঙ্গে হয়েছিল আমার।

॥ নারায়ণ কাশীনাথ দেবল ॥

আশ্রম-বিদ্যালয়ের আদিপর্বে মারাঠী-বর্মী ছাত্র দেবল এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। তিনি এসেছিলেন আর্ট-চর্চার জন্যে। ১৯১০ সালে তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। তারপরে, কলকাতায় বছর দুই কলেজে পড়ে বিলাতে যান। সেখানে ভাস্কর্য-কলা অভ্যাস করে কৃতী হন। বিচিত্রা-পর্বে জোড়াসাঁকোয় ছিলেন। সে-কথা আগে বলা হয়েছে।

শান্তিনিকেতনে এসে নিচু বাঙ্গালা-অঞ্চলে একটি মাটির ঘরে থাকতেন। সেখানে নিজের পরিকল্পনায় তিনি মূর্তি তৈরি করেন, পছন্দ না-হলে সে-মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন। আপন মনে কাজ করেন। ১৯১৬ সালে কবি আমেরিকায় বসে তাঁর কথা ভেবে পত্র লিখেছিলেন।—'দেবলের কথা আমার সর্বদাই মনে হয়—তার কি রকম চলছে কে জানে। এখানকার Polish Sculptor যদি ভারতবর্ষে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে দেবলের খুব উপকার হবে।'

১৯১৬-২০ সাল পর্যন্ত আশ্রমিক-সংঘের প্রতিনিধিদের মধ্যে দেবল ১৯১৮ সালে শান্তিনিকেতন-সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে দেবল আশ্রম ছেড়ে যান। তারপরে তিনি কি করছেন, কেউ জানে না।

শান্তিনিকেতনে অস্ট্রিয়ান্ স্কাল্‌টার মিস লিজা ফন পট (Liza Phan Pat) এবং তারপরে, ইংরাজ মহিলা-ভাস্কর মাদাম মিলার্ড্‌ (Milleward) মূর্তি গড়ার কাজ শেখাতে আসার (১৯২৫) আগে,

দেবলই এখানে এই কাজের সর্বপ্রথম পত্তন করেছিলেন। মাদাম মিলার্ড্ ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী Bundel-এর ছাত্রী। Bundel ছিলেন রেঁাদা (Rodan)র শিষ্য। শান্তিনিকেতনে শ্রীরামকিঙ্কর বেজ এঁদেরই উত্তরাধিকার লাভ করে বর্তমানে খ্যাতনামা হয়েছেন।

সন্তোষ মিত্র, অমিয়কুমার ও দেবল আগে থেকেই এখানে ছিলেন। ১৯১৭সালে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর শান্তিনিকেতনে এলেন। এখানে চিত্রবিদ্যা-শিক্ষা জোরদার হলো। সে-প্রসঙ্গে পূর্বে বলা হয়েছে।

॥ নন্দলালের প্রধান চিত্রকর্ম, ১৯২৯ ॥

১৯২৯সালে আচার্য নন্দলালের প্রধান চিত্রকর্ম হলো 'যোগমূর্তি কাঞ্চন-জঙ্ঘা' আর 'গুরুপল্লী'। এই ছবি দু-টি আঁকলেন তিনি ওয়শে। তিনি গত বছর কার্সিয়াং-ভ্রমণে গিয়ে তাঁর কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবির পরিকল্পনা করেছিলেন। শান্তিনিকেতন-আশ্রমের দক্ষিণপ্রান্তে সেকালের শিক্ষকদের বসবাসের জন্যে খড়ের চালের মাটির বাড়িগুলি সবে তৈরি হয়েছে। প্রাচীনকালের পরম্পরায় গুরুদের আবাস ; গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এই পাড়ার নাম দিলেন তাই —'গুরুপল্লী'।

টেম্পেরায় নন্দলাল ছবি আঁকলেন 'শাল' ও 'বনপুলক' গাছ। কাঠের ওপর এগ্-টেম্পেরায় আঁকলেন 'নয়নতারা ফুল' আর 'বাতায়ন'। এই বছরে রঙে টাচের কাজ হলো 'লোকগাথা' (১২"×৭), আর 'খেলা'। কালিতে টাচের কাজ করলেন — 'কার্সিয়াং থেকে পর্বতের দৃশ্যাবলী'। এই দৃশ্যাবলীর সিরিজে হলো বারোখানি ছবি। লাইন-ড্রয়িং-এ করলেন 'নটীর পূজা' আর 'চতুষ্পাঠীতে চৈতন্যদেবের অধ্যাপনা' (৮′ × ৫½′)। এ-ছাড়া, উড্‌কাটে রঙিন ছবি আঁকলেন 'গাছের আড়ালে একটি মেয়ে'।

॥ সমকালের ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মীদের চোখে শিল্পশিক্ষক নন্দলাল, ১৯২১-৩১ ॥

কলাভবনে আচার্য নন্দলালের শিক্ষণপদ্ধতি ছিল একেবারে নতুন ধরনের। খুব কম কথায় অতি সহজভাবে শিল্প-বিষয়ে বোঝাতেন তিনি; বড়ো বড়ো বক্তৃতা দিয়ে বক্তব্য বিশদ করার চেষ্টা করতেন না। জটিল বিষয় ইঙ্গিতে প্রকাশ করবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। এ-বিষয়ে তিনি পূর্বগামী কোনো কোনো বিশিষ্ট ধর্মগুরুর, বিশেষ করে তাঁর 'শ্রীশ্রীঠাকুরের' সমধর্মী। তিনি ছাত্রছাত্রীদের কখনও বকতেন না, বা তিরস্কার করতেন না। তবে, কারোর অন্যায় দেখলে সহসা গম্ভীর হয়ে যেতেন; এবং তাঁর সেই গাম্ভীর্যই ছাত্রছাত্রীদের কাছে চরম শাস্তি বলে মনে হতো।

নন্দলাল সুন্দরের পূজারী। তিনি অসুন্দর বা অপরিচ্ছন্ন একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। ছাত্রছাত্রীদের কাজের ঘর ঠিকমতো ঝরঝরে তকতকে আছে কিনা, তিনি সে-বিষয়ে শ্যেনদৃষ্টি রাখতেন। এই বিষয়ে তাঁর নীতি ছিল 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়।' তিনি শেখাবার জন্যে নিজের হাতে ঝাঁটা ধরতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। তাঁর নিজের স্টুডিওটি থাকতো একটি দেবমন্দিরের মতো সুরভিত ও পরিচ্ছন্ন। নন্দলালের ছবি-আঁকার স্টুডিও আসবাবের কথা পরে বলা হবে। আসবাব-বিন্যাসে তাঁর প্রতিভার গৃহিণীপনা ছিল। তাঁর এক্তিয়ারে কোনো অগোছানো বস্তু চোখে পড়তো না। তিনি বলতেন, চারদিক এলোমেলো হয়ে থাকলে, মনটাও এলোমেলো হয়ে যায়। সেই এলোমেলোর মধ্যে কোনো সুন্দর জিনিসের ধারণা করা শক্ত।

এই সময়ের জনৈকা ছাত্রী নন্দলালের নিরাসক্ত বা আপনভোলা শিল্পী-মনটীকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন,—'ছাত্রছাত্রীদের প্রতি মাস্টার মশাইয়ের এত খেয়াল থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের সম্বন্ধে ছিলেন একেবারে আপনভোলা। আমাদের ছবি দেখাবার সময়ে মধ্যে মধ্যে ভারি মজা হতো। তিনি আমাদের ছবি দেখিয়ে চলে যাবার পরে, আমাদের কারো না কারো পেনসিল হারাতো। তখন ছুটে গিয়ে দেখতাম সেই পেনসিলটি তাঁর হাতে

স্থান পেয়েছে। ছবি দেখাতে দেখাতে সেটা তাঁর হাতেই থেকে যেত, সে-কথা তাঁর মনেই থাকতো না। শীতের দিনে আমাদের ছবি দেখাবার সময়ে আরো মজা হতো। ছবি দেখাবার সময়ে তাঁর গায়ের চাদরটি খুলে আমাদের জানালায় রাখতেন, কিন্তু যাবার সময়ে ভুল করে দিব্যি কোনো ছাত্রীর চাদর গায়ে দিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়তেন, তখন মেয়েদের ভারি বিপদ হতো, তারা চাইতেও পারে না, শেষে তাঁর চাদর ফিরিয়ে দিতে তাঁর ভুল ভাঙতো।'

ছাত্রছাত্রীদের তিনি স্নেহ করতেন অপরিমিত। কোনো শিল্পশিক্ষার্থীকে তিনি কখনও নিরাশ করতেন না। শিল্প বিষয়ে একেবারে আনাড়ীকে তিনি সুনুড়ী করে ছাড়তেন। এই বিষয়ে কলাভবনের অধ্যাপকদের মধ্যে আচার্য নন্দলাল ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর উৎসাহ বাণী শুনে নিরাশ ছাত্র-ছাত্রীদের মন উৎসাহে ভরে উঠতো। তাঁরা পূর্ণ-উদ্যমে কাজে লেগে পড়তেন। আচার্যের মনের জোর ছাত্রছাত্রীর মনে জোর জাগিয়ে যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করতো। কলাভুবনে ছিল পাঁচ বছরের কোর্স বা পাঠ্যক্রম।

আচার্য নন্দলালের চিত্র শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। তিনি ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবির ওপর পারতপক্ষে কখনো হাত দিতেননা। ছবি আঁকার নিয়ম-কানুন অন্য একটি খাতায় এঁকে দেখিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন,—'কারও ছবির ওপর দেখাতে গেলে, তার নিজস্ব জিনিসটি হারিয়ে যায়। এ-ছাড়া, তিনি ছবি-আঁকা শেখাতে গিয়ে নানা গল্পের অবতারণা করতেন। সেইসব গল্প শুনে ছাত্রছাত্রীরা ছবি-আঁকায় যথোপযুক্ত প্রেরণা পেতেন। এই বিষয়ে বিশেষভাবে তাঁর সারস পক্ষীর নৃত্য' গল্পটি কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিতে পারলে, মানুষ তার আরাধ্য বস্তু লাভ করতে পারে, এবং কতখানি একাগ্র হলে মানুষ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে—শিক্ষার সেই বীজমন্ত্রটি নন্দলাল পেয়েছিলেন তাঁর আচার্য অবনীন্দ্র-নাথের কাছে, মহিমবাবুর কাছে আর নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের কাছে। তাঁদের কথা আগে বলা হয়েছে। এই বিষয়ে ছাত্রজীবনে তাঁর অভ্যস্ত বিদ্যাই তিনি প্রয়োগ করতেন তাঁর কলাভবনের কর্মক্ষেত্রে।

আচার্য নন্দলাল বলতেন,—'হাজার সৈন্যের মধ্যে সেনাপতি হয়ে থাকেন একজন মাত্রই। সেই রকম হাজার হাজার পাশ-করা ছাপ-মারা শিল্পীর

মধ্যে প্রকৃত শিল্পী বের হয় হয়তো একজনই ।'

কলাভবনে ছাত্রছাত্রীদের শেখাবার সময়ে, গাছপালা স্টাডি করবার জন্যে তিনি তাদের নিয়ে যেতেন গাছের কাছে, ফুলের কাছে। কিন্তু, গাছের ডালপাতা কেউ ভাঙলে, বা ছিঁড়লে, তিনি ব্যথা পেতেন। বলতেন, —ওরাও তো 'প্রাণী'। সামান্য তৃণকেও তিনি তুচ্ছ মনে করতেন না। প্রকৃতির অন্তরালে তার যে বিচিত্র রূপ লুকিয়ে থাকে সেই দিকে চোখ খুলে দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। কলাভবনে ছাত্রীদের স্টুডিওর জানলার ধারে ফুলের বাগান করবার জন্যে উৎসাহিত করেছিলেন নন্দলাল। ফুলের গাছ বা বড়ো গাছের নামের লটারি করে, যার ভাগ্যে যা উঠতো, সেই ফুলের বা গাছের বাগান করা হতো।

এই সময়ে কলাভবনে ছাত্রছাত্রীদের কোনো পরীক্ষা নেওয়ার বিধান ছিল না। একবার শিল্পাচার্য স্থির করেছিলেন, পরীক্ষা নেওয়া হবে। কিন্তু, তাতে ছেলেমেয়েদের ভীতিজনক কষ্টকর ব্যাপার দেখে, তিনি পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা স্থগিত করে দেন। শান্তিনিকেতন-কলাভবনে ভারতীয় ও অভারতীয় নানা ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রী নানা দিগ্‌দেশ থেকে এসে থাকেন। কিন্তু, নন্দলালের শিক্ষণ-পদ্ধতির গুণে ভাষার সমস্যা কখনই দেখা দেয়নি। উপরন্তু, হিন্দী ভাষা তিনি জানতেন প্রায় তাঁর মাতৃভাষার মতনই। এটা খুবই কার্যকর হতো।

কলাভবনের পিক্‌নিক্ ও শিক্ষাভ্রমণ হতো নিয়মিত। এর ফলে, গুরুশিষ্যের নিকট-সান্নিধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে উঠতো। শিক্ষক হতেন সখা। ফলে, কঠিন শিক্ষা ও সাধনাকে সহজ করে তুলতো। বিদেশে গিয়ে ছেলেমেয়েদের অসুখ-বিসুখের আশঙ্কায় হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স হাতে নিয়ে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে খোঁজ নিতেন তিনি।

আচার্যের সঙ্গে বেড়াতে বের হয়ে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা স্কেচ্ করতেন। বেড়াতে বেড়াতে এ যেন ছিল তাদের চলন্ত ক্লাস। ঐ সময়ে স্বয়ং নন্দলাল যে-সব স্কেচ্ করতেন, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তিনি সে-সব বিলিয়ে দিতেন। বিদেশে বিভুঁয়ে স্নেহপরায়ণতায় ছাত্রছাত্রীদের তিনি একাধারে ছিলেন পিতা ও মাতা দুই-ই। কোথাও কলেরা-বসন্তের মতন ছোঁয়াচে রোগ হলেও তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হতেন।

তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছেলেরা আর্ত ও পীড়িতের সেবায় আত্মনিয়োগ করতো সহজভাবে।

নাটক অভিনয়ের সময়ে তিনি মণ্ডপের সব কাজ সেরে, ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে স্টেজের বাইরে উইংসের একপাশে দেওয়াল-ঘেঁষে দাঁড়াতেন। ছেলে-মেয়েরা স্কেচ্ করতো, তিনিও করতেন। তখন মনে হতো, ঠিক্ যেন স্কেচের ক্লাস চলছে।

আমাদের আলোচ্য পর্বে একদিকে রবীন্দ্রনাথ নিত্যনূতন গান রচনা করছেন, ছবি আঁকছেন। অপর দিকে নন্দলাল তাঁর নিত্যনূতন শিল্প রচনা করে চলেছেন। এইরকম আশ্চর্য মণিকাঞ্চনযোগের আদর্শ প্রত্যক্ষ করে নন্দলালের ছাত্রছাত্রীরা সমস্ত কাজে যেন দৈবী প্রেরণা লাভ করতেন। সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনের উৎসবে কলাভবন থেকে ওরা আলপনা দিতেন ও ফুল সাজাতেন। এই সময়ে লাইব্রেরী-বারাণ্ডায় জয়পুরী ফ্রেস্কোর কার্টুন, শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ ছবির ফ্রেস্কো, নটীর পূজা, মহাত্মাজীর লবণ-আইনভঙ্গের প্রখ্যাত ছবিগুলি আঁকা হয়েছিল।

আলোচ্য পর্বে (১৯২৫-২৯) কলাভবন ছিল বর্তমান (১৯৫৫) লাইব্রেরীর উপর তলায়। আচার্য নন্দলাল কলাভবনের কর্ণধার। বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ। গায়ে স্বদেশী সিল্কের মেরজাই আর পরনে খাদির ধুতি। কলাভবনে তাঁর নিজের কাজের জায়গায় বসে ছাত্রছাত্রীদের কাজ দেখাশোনা করেন, আর নির্দেশ দেন। শিক্ষকরূপে তিনি কোনো শিল্পার্থীর স্বাধীন চিন্তায় কখনও বাধার সৃষ্টি করতেন না। যেটা যার অভিরুচি, উৎসাহ দিতেন সেই দিকেই, শিক্ষার্থীর আপন পথে তার নিজস্ব ভাবনাকে জাগিয়ে তুলে, তার দোষগুণ গলদ অথবা স্বাদ কোথায় কি পরিমাণ, তা বুঝিয়ে দিতেন। এই সময়ে শিক্ষক-ছাত্রের তর্ক-বিতর্ক হতো; আবার বন্ধুত্বের অন্তরঙ্গ ব্যবহারও মিলত পরক্ষণেই। এই শিক্ষণ-পদ্ধতিতে সেয়ানা ছাত্রছাত্রীগণ কখনও কখনও ঠকেও শিক্ষালাভ করতেন। ছাত্রদের প্রদর্শনীর জন্যে ছবি-নির্বাচনে সন্দেহ ও সমস্যায় পড়লে, এই বিষয়ে তাঁর সুপ্রীমকোর্ট ছিল গুরু অবনীন্দ্রনাথের অনুমোদন। ভারতীয় পদ্ধতি ছাড়া, বিদেশী Cubism, Abstraction ইত্যাদি পদ্ধতি ছাত্রদের রচনায় প্রকাশ পেলে, সমালোচনার

পরে, সে-সব মেনে নেওয়ার মতন ঔদার্যের অভাব ঘটতো না তাঁর মনে।

এই সময়ে নন্দলালের পরিকল্পিত রবীন্দ্র-নাটকের সমস্ত মঞ্চ ও সাজ-সজ্জার অনন্য আঙ্গিক তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মনে বিশিষ্ট সৌন্দর্যবোধের বেদনা জাগিয়ে তুলতো। মণ্ডন-শিল্পের স্বদেশী অনন্য ধারা গ্রামে বা শহরে যা এতোদিন অবহেলিত হয়ে আসছিল, আচার্য নন্দলাল সে-সব সযত্নে জাগিয়ে তুলতেন। তাঁর ছাত্রছাত্রীরা আজও তাঁর প্রদর্শিত সেই আদর্শেরই অনুবর্তন করে চলেছেন। বাঙ্গালাদেশের অবহেলিত ও লুপ্তপ্রায় গ্রাম্য-শিল্পের পুরাতন নিদর্শনসমূহ সংগ্রহ করে, শান্তিনিকেতন-কলাভবনের ম্যুজিয়ম ভরতি করতে লাগলেন। গ্রামের শিল্পকলার ঐতিহ্যবাহক শিল্পীদের প্রতি নন্দলালের প্রগাঢ় স্নেহ-মমতার কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

স্বভাবশিল্পী নন্দলাল তাঁর সৌন্দর্য-সাধনার মধ্যে দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন অভাবনীয়রূপে। সকল লোকই আকৃষ্ট হতো তাঁর সুষমা-সৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী তাঁর উপর নির্ভর করতেন আন্ত-রিকভাবে। তাঁর হাতে গুরুদায়িত্ব দিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতেন এবং স্বস্তি পেতেন। গান্ধীজী কংগ্রেস-প্রদর্শনীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন নন্দলালের ওপর তিনবার। সে-প্রসঙ্গে যথাসময়ে আলোচনা করা হবে। বিশ্বভারতীতে আচার্য নন্দলালের প্রতিষ্ঠা স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের পরেই, অথবা সমান্তরাল। শিল্পশিক্ষার্থী, ভারতীয় অভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের ভারতশিল্প-শিক্ষণের ভার সম্পূর্ণ ন্যস্ত ছিল নন্দলালের উপরে। তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করে চলেছেন যথাযথভাবে। বর্তমানে স্বদেশে-বিদেশে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা প্রধানতঃ তাঁরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে চলেছেন। আচার্য নন্দলাল বিশ্ব-কর্মার বরপুত্র; তাঁর কাজে সত্য ও সুন্দরের জ্যোতি সম্যক্‌রূপে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠছিল।

আচার্য নন্দলাল এখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নিত্যালাপী সখা, সহকর্মী ও শিষ্য। অবনীন্দ্রনাথের কাছে কলকাতায় তাঁর উৎকৃষ্টতম শিক্ষাদীক্ষা লাভ হয়েছে। বিশ্বভারতীতে আসন গ্রহণ করবার পরে, তাঁর চিন্ময়ভুবন ক্রমশঃ সমৃদ্ধতর হয়ে উঠছে। শান্তিনিকেতনে সমাগত দেশী-বিদেশী বিভিন্ন মনীষীর সাহচর্যে তিনি শিল্প ব্যতিরিক্ত, এমন-সব বিষয়ের

প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন, ভারতশিল্প-রচনার বুনিয়াদ স্থাপনে যা অপরিহার্য। যেমন ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা। এই ধারায় রাজা-মহারাজের উত্থান-পতন, হিন্দুধর্মের বিবর্তন, মহাভারতের মর্ম, বৌদ্ধজাতক কাহিনীর বিবরণ, মধ্যযুগের ভক্তি-সাধনার মর্মকথা —এই মূল স্তম্ভচতুষ্টয় নন্দলালকে মোহিত করেছে। এবং বলা বাহুল্য, এর ওপরেই ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস বিধৃত। তাঁর এই গভীর ইতিহাস-চেতনা তাঁর পূর্ব ও পরবর্তী চিত্র-কর্মেও সগৌরবে স্থানলাভ করেছে। সে-প্রসঙ্গ পরে (১৯৩৭-৪২) আলোচিত হবে।

চিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে রসসৃষ্টি করবার পূর্ণশিক্ষা নন্দলাল লাভ করেছিলেন গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। সেই রসকাব্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে কিভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে, সে-টি তিনি প্রত্যক্ষ করলেন শান্তিনিকেতনে এসে দিনের পর দিন। রসের প্রকাশের জন্যে কলাকর্ম প্রয়োগের অধিকার সম্পর্কে তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন হলেন শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর সাহচর্যে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃত আলঙ্কারিক বা নন্দনতত্ত্বজ্ঞ। তিনি রসবিচারে নিজেকে কেবল সাহিত্য, সঙ্গীত, বা নাট্যরসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। স্টেলা ক্রামরীশের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে দিনের পর দিন তিনি রস-সম্পর্কে সূক্ষ্ম তত্ত্বালোচনা করেছিলেন। টলস্টয়, অলঙ্কারশাস্ত্র, বেটোফনের নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে গভীর আলোচনা হতো। সেকালের বিশ্বভারতীর সাহিত্যসভায় এ-সব আলোচনা হতো, এবং সেই সভায় নন্দলাল নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন নীরব শ্রোতা স্বরূপে। এই বিষয়ে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন বিশ্বভারতীর তৎকালীন ছাত্র সৈয়দ মুজতবা আলী, : 'সে-সময় নন্দলালের চিন্তা-কুটিল ললাটের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট বোঝা যেত আর্ট সম্বন্ধে তাঁর যা ধারণা, অভিজ্ঞতা, তাঁর যা আদর্শ সে গুলোর সঙ্গে তিনি এ-সব আলোচনার মূল সিদ্ধান্ত, মীমাংসাহীন জল্পনা-কল্পনা সব-কিছু মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছেন।'

নন্দলাল সুন্দরের পরিপূর্ণ আনন্দরূপের ধ্যানের বীজমন্ত্র গ্রহণ করে-ছিলেন কবিগুরুর কাছ থেকে। কিন্তু আচার্য নন্দলালের শ্রেষ্ঠ বিকাশে সে-বীজ নিশ্চিহ্ন হয়ে মহীরুহরূপে পত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

কবি রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে ছবি এঁকে আপন সৃজনীশক্তি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু, শিল্পী নন্দলাল কবিতা লিখে আপন শিল্পশক্তি প্রকাশ করেননি। এই দিক থেকে শান্তিনিকেতনে গুরু রবীন্দ্রনাথের উপর শিষ্য নন্দলালের প্রভাব কেউ কেউ অস্বীকার করেছেন।

নন্দলাল তাঁর হাওড়া-বাণীপুরের বাড়ি থেকে কলকাতায় বসুবিজ্ঞান-মন্দিরে দেওয়াল-চিত্র আঁকবার জন্যে যাতায়াত করেছিলেন (১৯১৭)। সেই সময়ে নন্দলাল বাড়িতে বসে কালীঘাটের পটের ছবি এঁকে অতি অল্পমূল্যে মুদির দোকানে বেচতে দিয়েছিলেন। তাঁর গরীব প্রতিবেশীরা যাতে স্বল্পমূল্যে সেইসব পটের ছবি কিনে তাদের ঘর সাজাতে পারে, —এই ছিল উদ্দেশ্য।—সে-কথা আগে বলা হয়েছে। পরবর্তী কালে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় (১৯২৬—২৯) পথের ধারে গাছ-তলায় বসে, তিনি এই রকম রঙ্গিন কার্ড এঁকে সস্তায় বিক্রি করতেন। উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র জনসাধারণকে শিল্পবোধে উদ্বুদ্ধ করা। লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের মণ্ডপ মণ্ডন করবার সময়ে যামিনী রায়ের আঁকা বড়োবড়ো পট দিয়ে নন্দলাল বাইরের দেওয়াল সাজিয়েছিলেন। হরিপুরের মণ্ডপে গ্রামের লোককে আনন্দ দেবার জন্যে অনেক রঙ্গিন পট নিজে এঁকেছিলেন।

ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্যকে তিনি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করতেন। আর বর্তমানকে তার সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। ভালোবাসার স্পর্শ লাগলে যে-কোনো বস্তু ছবি-আঁকার বিষয় হতে পারে —এই ছিল তাঁর মূল কথা। যে-কোনো শিল্পী এ-দেশের চিত্র বা ভাস্কর্য সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলে তিনি দুঃখ পেতেন। তিনি বলতেন,—'অতীত হলো আমাদের পায়ের তলার মাটি, দেশের অতীতকে যে জানলো না, সে দাঁড়াবে কোথায়? ভবিষ্যৎকে গড়বে কিসের ওপর?' পক্ষান্তরে, অজন্তা, মোগল, রাজপুত বা কোনো পুরাতন পদ্ধতির ছবির 'কপি' করাটা কেউ পরমার্থ জ্ঞান করে থাকলে, তিনি তাতে বেশ বিরক্ত হতেন। আর্টিস্ট নকলনবিস হবে, সে তিনি একেবারে পছন্দ করতেন না। আর্টিস্ট্ তাঁর চিত্রাঙ্কনের বিষয় আহরণ করবে প্রত্যক্ষ বিশ্বপ্রকৃতি থেকে—এই ছিল তাঁর অভিমত। ভারতশিল্পের আশ্চর্য সম্পদ সর্বপ্রথম বুঝে নিয়ে, আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হয়ে, বাইরের বিষয় বিচার করে, গ্রহণ করতে তিনি ছাত্রছাত্রীদের

পরামর্শ দিতেন। এই সময়কার তাঁর জনৈক ছাত্র লিখেছেন, —'আর্টস্কুলে তিনি 'পার্সপেক্টিভ শিখেছিলেন, শান্তিনিকেতনে যখন মডেলিং ক্লাস আরম্ভ হয় তখন নিজে ছাত্রদের সঙ্গে বসে স্কেচ্ করেছিলেন, কিন্তু ছবি যখন আঁকতেন তখন তাতে তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং ভারতীয়ত্ব একই সঙ্গে প্রকাশ পেতো। ভারতীয় অলঙ্করণশিল্প —আলপনা, ছুঁচের কাজ, গৃহ এবং দেহ প্রসাধনে মাস্টারমশাই ও তাঁর ছাত্রছাত্রীদের দান অসামান্য।'

সহকর্মী সুরেন্দ্রনাথ বলেন, —পারিবারিক জীবনে আত্মীয়, বন্ধু, আশ্রিতদের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা, সহানুভূতি, সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ, আপদে-বিপদে, রোগে-শোকে সাহায্য, সেবা ছিল তাঁর অতুলনীয়। আচার্য নন্দলালের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাঁর এই মানবিকতা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। কেউ অসুস্থ হলে তিনি উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাতেন। তাদের যথাযথ সেবাপথ্য, আত্মীয়-স্নেহ-প্রদানের জন্যে তাঁর চেষ্টা ছিল অফুরন্ত। শিষ্যবর্গের প্রতি তাঁর মমতা ছিল অবর্ণনীয়। তাদের সকলের জন্যে তাঁর চিত্ত থাকতো অতন্দ্র। নন্দলালের গুরুভক্তি ছিল পৌরাণিক পর্যায়ের। আপন গুরুর প্রতি তাঁর সেই ব্যক্তিগত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা তিনি আপন শিষ্যবর্গের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে, দেখতে ভালোবাসতেন।

আচার্যের অন্তরের গোপন প্রকোষ্ঠে তাঁর ধ্যানের ধনের আসন ছিল দৃঢ়বিন্যস্ত। প্রকৃতিকে মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করে তার অন্তরের রূপ ও রসের সন্ধান পেয়েছিলেন নন্দলাল। সেইজন্যেই তাঁর সৃষ্টিতে অভাবনীয় বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ। বিভিন্ন ঋতুতে সকালে সন্ধ্যায়, গভীর রাত্রির অন্ধকারে একাকী নির্জনে বসে থাকতেন তিনি — বোবা প্রকৃতির অন্তরের বাণী শোনার আশায়। তিনি বলতেন,—শিক্ষক ছাত্রকে পথের সন্ধান দিতে পারেন মাত্র, তার বেশি আর কিছু নয়। সত্যিকার শিল্প-শিক্ষা পেতে গেলে যেতে হবে প্রকৃতির পাঠশালায়। শিল্পী সফল হতে পারেন একমাত্র আপন ঐকান্তিক চেষ্টা ও সাধনার ফলে। নন্দলাল তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রায়ই যেতেন শান্তিনিকেতনের আশপাশের গাঁয়ে। উদ্দেশ্য হলো, গ্রামের চলমান গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটানো। তা-ছাড়া তাঁর গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল, বাঙ্গালার গ্রামীণ জীবনধারার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে, তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মনের মধ্যে সমতাবোধ জাগানো, আর

আদর্শ সরল জীবনের সঙ্গে সরাসরি যোগ ঘটানো।

নন্দলাল নিজে সাধারণ সরল জীবন যাপন করতেন। বেশভূষায় সাধারণের সঙ্গে তাঁর কোনো পার্থক্য ছিল না। তাঁর দর্শনার্থী কেউ কেউ তাঁকে দেখতে এসে হতাশ হতেন। কিন্তু আলাপ পরিচয় হলে, এই নিরাড়ম্বর মানুষটির গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁরা অবশেষে লজ্জিত হতেন।

নন্দলালের শিল্পশিক্ষণ-পদ্ধতি একমাত্র ক্লাসের মধ্যে আবদ্ধ থাকতো না। শিক্ষক-ছাত্র সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করার পদ্ধতি (guild) তিনি প্রবর্তন করেন। একজোটে কাজ করার ফলে, নানা রকম আলোচনায় এবং ভাব-বিনিময়ের ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে নানা কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যেতো। ত-ছাড়া, পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জানার সুযোগ ঘটতো; ফলে, পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে উঠতো। নন্দলালের গহন মনের গভীর স্নেহের পরিচয় তাঁর ছাত্রছাত্রীরা দৈনন্দিন জীবনে পেয়েছেন প্রচুর। তার স্মৃতি তাঁদের মনে রয়েছে অক্ষয় হয়ে।

নন্দলালের জীবনে রামকৃষ্ণ-মিশন, অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুপ্রকটিত। তাঁর দীর্ঘ জীবনে সেই সম্পদ প্রভূত পাথেয়ের যোগান দিয়েছে। নন্দলাল তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছে থেকে জ্ঞান, প্রেম ও শিল্পবোধের যে-দীপশিখা লাভ করেছিলেন সেই আলোকে তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পথ আলোকিত করেছিলেন।

ত‌াঁর আঁকা অসংখ্য চিত্রের বিষয় এবং প্রকাশের জন্যে তিনি বিভিন্ন আঙ্গিক ব্যবহার করতেন। তবে তাঁর শিল্প-সাধনা কেবলমাত্র চিত্রকর্মেই আবদ্ধ ছিল না। কাঠ, মাটি, লিথো, লিনোকাট্‌ পাথরে তাঁর শিল্প-সাধনা রূপ পরিগ্রহ করেছে। মণ্ডনশিল্পে ও কারুশিল্পে তাঁর শিল্প-সাধনা অপরূপ রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। শিল্পসৃষ্টির বাঁধা সড়কে তিনি চলেননি। পথের ধারে প্রতি পদে তিনি কুড়িয়ে পেয়েছেন নতুনকে, এবং সেই নতুন তাঁর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কন-পদ্ধতি তিনি যথাযথ গ্রহণ করেননি, তিনি ছবি এঁকেছেন আপন পদ্ধতিতে নতুন ধারায়। তাঁর আঁকা অসংখ্য স্কেচ রয়েছে। তার মূল্য তাঁর আঁকা চিত্র থেকে কম নয়। বৈচিত্র্যে এবং প্রকাশভঙ্গিতে স্কেচগুলি কেবল জীবন্ত

মাত্র নয়, সেগুলির অঙ্কনপদ্ধতিও নবতর। বস্তুর সত্যরূপ তাঁর অসংখ্য স্কেচের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রয়েছে। এই স্কেচগুলি বহির্জগতের কেবল প্রতিলিপি মাত্র নয়; আপন জীবনের প্রীতির রসে একান্ত আপনভাবে চিত্রিত।

সেকালের শান্তিনিকেতনের আশ্রম-পরিবেশে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যথাযথভাবে। শান্তিনিকেতনে দিগন্তবিস্তৃত আকাশ, উদার প্রান্তর, প্রতিবেশী আদিবাসী সাঁওতালদের সহজ সরল জীবন তাঁকে প্রেরণা অজস্র ধারে। সেইসঙ্গে আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক আশীর্বাদ তাঁকে শক্তিদান করেছিল। আশ্রমে যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁর নিরহঙ্কার ব্যবহার ও প্রীতিলাভের সৌভাগ্য তাঁদের হয়েছে।

॥ সমকালীন ছাত্রের দৃষ্টিতে নন্দলালের শিল্পচিন্তা, ১৯২০ ৩০ ॥

নন্দলালের শিল্পপ্রতিভার সৃষ্টি-ক্ষমতা যেন অফুরন্ত। তাঁর সৃষ্টিতে বৈচিত্র্যের সীমা নাই। উপকরণ, আঙ্গিক এবং উপলব্ধি—এই তিনের সংযোগে তাঁর প্রতিভা নানাপথে প্রবাহিত হয়েছে প্রায় আমরণ। তাঁর বিচিত্র শিল্পসৃষ্টির অন্তরালে ছিল ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভাব। নন্দলাল প্রথম জীবনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যসম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এই প্রভাবের ফলেই তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার দানকে জীবনে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। এই জ্ঞানের প্রকাশ রয়েছে তাঁর আঁকা দেবদেবীর ও পৌরাণিক বিষয় নিয়ে আঁকা চিত্রধারায়। নন্দলাল অতিমানবীয় শক্তিকে এযাবৎ প্রতীকের আশ্রয়ে প্রকাশ করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনে আসার পরে তিনি নতুন পথে যাত্রা শুরু করেন। এই বিষয়ে নন্দলালের অন্যতম ছাত্র শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর গুরুর উক্তি উদ্ধার করেছেন এইভাবে,—'আমরা দেখছি প্রকৃতি নিস্তব্ধ ও স্থির, কিন্তু এইসব গাছ মাটি সবই জীবন্ত। গাছ বেড়ে চলেছে মাটি থেকে, ঘাস গজিয়ে উঠছে—মরে যাচ্ছে, কিছুই প্রাণহীন নয়—সবই জ্যান্ত। যখন এই প্রকৃতিকে জীবন্ত করে দেখতে পারবে তখনই তোমার শিল্পসাধনা সার্থক।' —বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মধ্যেই তাঁর শিল্পসৃষ্টির শক্তি অন্তর্নিহিত ছিল। প্রকৃতির বর্ণাঢ্য রূপের চেয়ে, তার বৈচিত্র্য ও গতি প্রদর্শন এবং স্থপতিসুলভ

নির্মাণ-কৌশল হলো নন্দলালের শিল্পরচনার বৈশিষ্ট্য। এইজন্যে তাঁর তুলিতে বর্ণের চেয়ে রেখার শক্তি বেশি। আচার্য নন্দলালের শিল্পিজীবনের নতুন উপলব্ধি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে। পরবর্তী কালের রচনাবৈচিত্র্য উজ্জ্বল হলেও, আগের রচনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

দূর-প্রাচ্যের শিল্পপরম্পরা থেকে তিনি তুলিচালনার কৌশল অনেকাংশে আয়ত্ত করেছিলেন। ভারতীয় শিল্পপরম্পরা থেকে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করলেন রেখাত্মক গুণ। চীন জাপান ও ভারতের রেখারীতির মধ্যে যোগাযোগের পথ যুক্ত করলেন আচার্য নন্দলাল। ভারতীয় শিল্পের পরম্পরা থেকে তিনি গ্রহণ করলেন বর্ণবৈভব। রূপের আদর্শ ও চিত্র-নির্মাণকৌশলের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাঁর ভারতীয় পরম্পরা ও ব্যক্তিগত প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের অপূর্ব যোগাযোগ। নন্দলালের রচনায় এই সমন্বয়ের দক্ষতা অনুভব করা তাঁর শিল্পরূপের সাক্ষাৎ পরিচয় ছাড়া সম্ভবপর নয়।

জীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আচার্য নন্দলালের শিল্পরূপের আকার, রেখা ও বর্ণের ঘনসন্নিবেশ দেখা যায়। তাঁর রচনাতে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁর পরিণত রচনায় অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। দৃশ্যচিত্রের পরম্পরা ভারতশিল্পে নাই। প্রকৃতি এখানে মাত্র চিত্রের, বা উৎকীর্ণ ফলকের প্রেক্ষাপটরূপে গৃহীত হয়েছে। প্রকৃতিকে ধ্যানের ধনরূপে চিন্তা করে দেখবার প্রয়াস পেয়েছিলেন বৌদ্ধ কবি ও শিল্পিগণ। বৌদ্ধশিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সঙ্গীতের প্রভাব নন্দলালের উপর পড়েছিল যথেষ্টভাবে। কিন্তু এই প্রভাব তাঁর সহজাত আধ্যাত্মিক শক্তিকে ভ্রান্তপথে নিয়ে যায়নি। পুরুষ ও প্রকৃতির সাধনমার্গে শিল্পী নন্দলাল ছিলেন আস্থাবান। ফলে, তাঁর শিল্পী-মন বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন উপলব্ধির পথে। নন্দলালের রচনাতে কোনো প্রভাবই বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি সকল প্রভাবের মধ্যে দিয়ে একই উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হবার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

॥ সমকালের ছাত্রের বর্ণনায় শিল্পশিক্ষক নন্দলাল ॥

বিশ্বভারতী পত্তন হবার সময়ে কলাভবনের শিক্ষক ছিলেন অসিতকুমার, সুরেন্দ্রনাথ আর নন্দলাল। জলরঙে ওয়াশের ছবি আঁকানো হতো বেশি। টেম্পেরার ছবিও করানো হতো কিছু কিছু। আঁদ্রে কার্পেলেস আসার পরে, তেলরঙের ছবি-আঁকা শেখানো হয়েছিল কোনো কোনো ছাত্রকে। কলাভবনে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তখন কম। ছবি আঁকা হতো মাটিতে মাদুর পেতে বসে ডেক্সের ওপরে ছবি রেখে। এক-একটা জানালার ধারে এক-একজনের বসবার আসন ছিল। ডানদিকে থাকতো জলের গামলা, ঘষা-কাঁচের প্যালেট্, রঙের বাক্স আর তুলি রাখবার জন্যে ঘটি বা গেলাস। আচার্য নন্দলাল বসতেন ছাত্রদের কিছু আগে ঘরের শেষপ্রান্তে। তিনি নিয়মিত সেখানে বসে নিজে ছবি আঁকতেন, মাঝে মাঝে উঠে ছাত্রছাত্রী-দের কাজের তদারক করতেন, কখনো-বা তাদের নিয়ে মাঠে বা গ্রামে স্কেচ্ করতে যেতেন। সাধারণতঃ সকালে ছাত্রদের মন থেকে ইচ্ছামতো ছবি আঁকতে বলা হতো। বিকেলে পুরাতন ছবির নকল করানো হতো। দুপুরে, সন্ধ্যায় এবং ছুটির দিনে প্রকৃতি থেকে গাছপালা, মানুষ, পশুপক্ষী ইত্যাদি স্কেচ্ করানো হতো।

প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডারে শিল্পীরা যুগ যুগ ধরে গড়ন শিখছে, রং শিখছে, প্রেরণা পাচ্ছে। চোখে দেখে সব সময়ে কোনো আদর্শ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা হয়না। সেইজন্যেই স্কেচ্ বা খসড়া করার দরকার প্রাকৃতিক আদর্শের সামনে দাঁড়িয়ে। তার ফলে, শিক্ষার্থীর হাত তৈরি হয়; চোখ তৈরি হয়; এবং সেইসঙ্গে অতীতের শিল্পীরা কে কি-ভাবে প্রাকৃতিক রূপকে রঙে রেখায় ধরে রেখে গেছেন, তার বিভিন্ন পদ্ধতি নিজে নকল করে জানলে শিল্পীর নিজের রেখা ও বর্ণ-প্রয়োগ নৈপুণ্য, বস্তুবিন্যাস-নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায় এবং সাহস বাড়ে। পক্ষান্তরে, সেইসঙ্গে নিজের মানস-কল্পনাকে ছবিতে রূপ দিয়ে সৃষ্টিধর্মী ছবি আঁকতে পারলে, শিল্পীর মন সরল থাকে। আনন্দ দিয়ে এবং আনন্দ পেয়ে আত্মবিশ্বাস জন্মায়। একটা দিকের শিক্ষা শেষ করে, আর একটা ধরা, আচার্য নন্দলালের

অভিমত ছিল না। শিল্পের প্রত্যেকটি ধারার চর্চা একই সঙ্গে সমানে চালানো উচিত। একঘেয়ে স্কেচ্ করতে করতে, বা পুরানো ছবির নকল করতে করতে শিক্ষার্থীর মন শুকিয়ে যায়। রং-রেখার জোর যতই বাড়ুক না-কেন ছবির প্রাণ থাকে না। ছবিতে ভাবের আনাগোনা কমে যায়। শিক্ষক নন্দলাল বলতেন,— 'আনন্দই যদি না পেলে, তবে ছবি এঁকে কি হলো? পাটের ব্যবসা করলে তো বেশি রোজগার হতো'।

'আর্ট প্রকৃতির দর্পণ' — এই বলে ইংরেজিতে একটা বচন আছে; বহু শ্রেষ্ঠ কলাবিদের মতো নন্দলাল সে-কথা মানতেন না। প্রকৃতির অবিকল নকল করায় যতই বাহাদুরি থাক, তাতে শিল্পীর মন ভরে না। নন্দলাল বলতেন, — 'একই মানুষের প্রতিকৃতি পাঁচজনে আঁকলে দেখবে কিছু-না-কিছু তফাত আছে। সেটা-যে সব সময়ে শক্তির অভাবের জন্যে হয় তা নয়, একই মানুষকে পাঁচজন পাঁচভাবে দেখে। একটি সুন্দরী মেয়ে কারো মা, কারো বোন, কারো স্ত্রী, কারো মনিব। তাকে দেখে এক-একজনের মনের ভাব এক-একরকম হবে। তার বাপ তার ছবি আঁকলে তাতে বাৎসল্য রস মিশবে, তার ছেলে তার ছবি আঁকলে তাতে ভক্তিরস মিশবে, তার অধীনস্থ বা কৃপাপ্রার্থী তার ছবি আঁকলে তাতে কিছুটা মিথ্যা স্তুতি মিশবে। একই পাহাড়ে কেউ দেখে তার রং, কেউ দেখে তার গড়ন, কেউ দেখে সব মিলিয়ে তার মহিমা। প্রাকৃতিক রূপের যে দিকটা যাকে আকৃষ্ট করে, সে সেইটেই ছবিতে ফোটাতে চেষ্টা করে থাকে। এমনিভাবে বাইরের রূপে যখন মানুষের মনের ভক্তি ভালোবাসা ভয় ইত্যাদির প্রলেপ পড়ে, তখনই সে হয় ছবি। ছবিতে প্রকৃতির মাছি-মারা নকল থাকা ঠিক নয়, সেইজন্যেই স্কেচ্ দেখতে বারণ করি আঁকবার সময়। যেটুকু তোমার মনে ছাপ দিয়েছে সেটুকু স্পষ্ট হলেই যথেষ্ট।' চীনের কালো বাঘের পুরানো ছবি দেখিয়ে বোঝালেন, —'দেখো, বাইরের গড়নটুকু বজায় রেখে শুধু কালি মাখিয়ে দিয়েছে সর্বাঙ্গে, কেবল চোখ দুটো জ্বলছে তার মধ্যে। বাঘের ভয়ঙ্করত্ব ফোটানোই ছিল শিল্পীর উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। শুধু দেখাতে জানলেই হবে না, বাদ দিতেও জানতে হবে; না-হলে ছবি হবে না, ফটোগ্রাফ হয়ে যাবে।' ভালো ছবি দেখতে দেখতে

কিভাবে চোখ তৈরি হয়, তিনি ছাত্রদের বোঝাতেন। বলতেন, —'ছবি আঁকতে ইচ্ছা করবে না যখন, তখন ভালো ছবি দেখবে। এ-ও শিক্ষার অঙ্গ'

ছাত্রদের মধ্যে অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রনাথ দেববর্মণ, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, বিনায়ক মাসোজী এবং বীরভদ্র রাও চিত্রা আগে থেকে ছিলেন কলাভবনে। হরিহরণ, কানু দেশাই, বিষ্ণুপদ, সোভাগমল গেহ্‌লোট, সুকুমার দেউস্কর, সুধীর খাস্তগীর, রামকিঙ্কর বেইজ, বনবিহারী, সত্যেন্দ্রনাথ বিশী, হীরেন্দ্র, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপতি বসু, বামন রাও মাধবন, মণি রায়চৌধুরী, নিশিকান্ত, বঙ্কুবাবু, কেশব রাও রাজু, গোষ্ঠবাবু, মনীষী, ইন্দু রক্ষিত, প্রভাস, শিশির প্রভৃতি পরে পরে এসেছিলেন। মেয়েদের মধ্যে কলাভবনের মাসীমা সুকুমারী দেবী, শ্রীমতী হাতী সিং, গৌরী ও যমুনা আগে থেকেই ছিলেন। কিরণবালা সেন মাঝে মাঝে আসতেন; ইন্দুসুধা, অনুকণা, মন্দাকিনী, গীতা, চিত্রনিভা, মণিকা, রাণী দে প্রভৃতি এই সময়ে যোগ দিয়েছিলেন। কলাভবন, শিক্ষাভবন এবং সংগীতভবনের ছাত্রেরা একসঙ্গেই প্রাককুটিরে, তোরণঘরে এবং আশপাশে দু-একটা ঘরে ছড়িয়ে থাকতেন। কেহ কেউ একই সময়ে শিক্ষাভবন এবং কলাভবনের ছাত্র ছিলেন। মণিগুপ্ত, সুধীর, সুকুমার, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো কয়েকজন সে-রকম ছিলেন। নন্দলাল স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, এ-দিকের ক্লাস না-থাকলেই ওদিকে ক্লাস করতে যেতেন এঁরা।

মুক্ত জীবজন্তুকে বন্দী করে ছবি আঁকতে চাইলে, বা ডাল-সমেত একরাশ ফুলপাতা ভেঙে এনে ঘর সাজালে শিক্ষক নন্দলাল বিরক্ত হতেন খুব। গৃহসজ্জায় অল্প দু-চারটি ফুলপাতা মাটির বা ধাতুর পাত্রে রাখা তিনি পছন্দ করতেন। শান্তিনিকেতন এবং রবীন্দ্র-প্রভাবিত আধুনিক ভাবুকের বিদগ্ধ মহলে বিভিন্ন রঙের কয়েকখানা কাপড় টাঙিয়ে রঙ্গমঞ্চ সাজাবার এবং বেদী, আলপনা, মালা, ফুলপাতা, প্রদীপ, ধূপধুনো দিয়ে সভামঞ্চ সাজাবার পদ্ধতি এখন বেশ প্রচলিত হয়েছে। এর প্রায় সবটাই নন্দলালের উদ্ভাবিত। বাটিকের কাজ ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছিল ইন্দোনেশিয়ায়। কলাভবনের

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথের সহযোগে রবীন্দ্রনাথ আবার সে-পদ্ধতি স্বদেশে ফিরিয়ে এনেছিলেন। নন্দলাল ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা 'বর্তিকা' বা মোমের সাহায্যে কাপড় চিত্রিত করবার এই শিল্পকে নবজীবন দান করলেন। এই সঙ্গে গঁদের আঠার সাহায্যে চামড়ার জিনিস চিত্রিত করবার পদ্ধতিরও প্রচলন করলেন। আলপনা, সূচের কাজ ইত্যাদি মণ্ডনশিল্পের পুনরুজ্জীবনে, খড়, বাঁশ পাটি, চাটাই ইত্যাদি সস্তায় স্বদেশীভাবে শৌখিন গৃহসজ্জা এবং তোরণ ও বিপনি নির্মাণেও নন্দলাল এবং তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ হলেন পথিকৃৎ। জাপানীদের ফুল সাজানোর ঐতিহ্য পৃথিবীবিখ্যাত। বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জাপানী শ্যালিকা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তিনি কিছুদিন কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের ফুল সাজানো শিখিয়েছিলেন। আচার্য নন্দলাল ছিলেন তাঁর ছাত্রদলের একজন।

প্রতি বছর অন্ততঃ একবার করে নন্দলাল কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের দল নিয়ে শিক্ষাভ্রমণে বেরতেন। রাজগীর-নালন্দা গেছেন বহুবার। এই বিষয়ে এই সময়ের ছাত্র শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দোপাধ্যায় বলেন,—সঙ্গে তাঁবু থাকত, বনে পাহাড়ে মন্দিরে ঘাটে ছবি আঁকার ক্লাস চলত, সেইসঙ্গে হাসি তামাসা, কাঠ-কাটা, জল-বওয়া, বাজার-করা সবই চলত। তাঁর সঙ্গে আমরা ঝড়বৃষ্টির সময়ে গাছের ডালে আশ্রয় নিয়েছি। শীতের দিনে খোয়াই-এ তাঁবু ফেলে শীত উপভোগ করেছি, শিলাবৃষ্টির দিনে শিল কুড়িয়েছি, পথের ধারে তাঁর চাদরে ঢাকা মুড়ি সবাই মিলে বেগুনি দিয়ে খেয়েছি। তিনি সকলের সঙ্গে সমানে হাঁটতেন, সমানে খাটতেন, সকলের সুখদুঃখের ভাগ নিতেন। প্রচণ্ড রৌদ্রে কি করে কান ঢেকে ভিজে গামছা মাথায় বাঁধলে আরাম পাওয়া যায়, পায়ে ব্যথা হলে কি করে তেল মাখিয়ে লণ্ঠনে সেঁক দিতে হয়, নিসিন্দে পাতা পুড়িয়ে কি করে মশা তাড়াতে হয়, কাঠির ডগায় কাপড়ের টুকরো পেরেক দিয়ে এঁটে কি করে ঝাড়ন তৈরি করতে হয়, তালপাতা কেটে কি করে পাখা করতে হয়—এই রকম অনেক কাজের জিনিস তিনি ছাত্রদের হাতেকলমে শেখাতেন সুবিধা পেলেই। বেলের খোলা, নারকেলমালা, লাউয়ের খোলা প্রভৃতি দিয়ে সুন্দর জলপাত্র করতেন বহু যত্নে, আবার এক কথায় দান করে দিতেন।

ছেলেদের কল্যাণ ছিল তাঁর দিনরাত্রের চিন্তা। সাধারণ রান্নাঘরে

খরচ বেশি পড়ে বলে তিনি কলাভবনের আলাদা রান্নাঘর ছেলেদের পরিচালনায় করতে দিয়েছিলেন। পরলোকগত সতীর্থের স্ত্রী পুত্রকে এবং প্রাক্তন কোনো কোনো ছাত্রকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতে দেখেছি, নিজের অত্যন্ত অর্থাভাবের মধ্যে ধার নিতেও দেখেছি, দিতেও দেখেছি।'

॥ ১৯৩০ সালে শান্তিনিকেতনে কবি ও শিল্পীর কর্মক্রম ॥

১৯২৯ সালের শেষদিকে শান্তিনিকেতনেই কবির দিন কাটে। এই সময়ে তিনি 'সহজ পাঠ' লেখা আরম্ভ করবার সঙ্কল্প করছেন। সহজপাঠের কাজ হচ্ছে। ৭ই পৌষ এলো। কবির মন শান্ত।

আচার্য নন্দলাল বলেন,—

'৭ই পৌষে আমাদের কলাভবনের জাঁকিয়ে Exhibition হতো। ছবি বিক্রি হতো। কমিশনে lump sum টাকা উঠতো। দেড়-শো-দু-শো টাকা দিয়ে আমাদের বার্ষিক টুরের জন্যে তিনখানা tent কিনে ফেললুম। টাকা তো পাওয়া গেল, কিন্তু আমাদের post card বেরিয়ে গেছে অনেক। সে-সময়ে বেচ্চুভাই টাউকো কিনে নিলেন অনেকগুলো। Middle man এলেই এ-সব বন্ধ হয়ে যায়।

'ছবি-বিক্রির টাকা আমাদের জমা হতো। বিশেষ করে জমা করতুম, টুরে যাওয়া হবে বলে। দু-জনের টাকা নাই হয়তো। তাদের ঋণ দেওয়া হতো তিন পার্সেন্ট সুদে। তবে, ঐ সুদী-কারবারের বুদ্ধি আসতেই এই উদ্যোগ বন্ধ হয়ে গেল। কখনও অর্থরিটী, কখনও ছেলেদের তরফ থেকে বাধা এলো। আঘাতে আঘাতে এ-কাজ বন্ধ হলো।

'এই সময়ে নতুন policy একটা নিশিকান্তের মাথায় এলো। গাছের তলায় বসে, রাস্তায় বসে ছবি বেচবো আমরা। রাস্তায় দোকান করা হলো। আমি বললুম, গলায় ছবির স্কেচ্ সাজিয়ে বেচতে লেগে যাও। ছেলেরা তাই করতে লাগলো। আমিও এতে খুব interest পেতে লাগলুম। কিন্তু, আমাদের এই humour-টা কেউ বুঝলো না। শেষ পর্যন্ত ৭ই পৌষের মেলায় post-card-এ স্কেচ্ করে বিক্রি করা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

১৯৩০সালের ১০ই জানুয়ারি কবি বরোদা-যাত্রা করলেন। সঙ্গে গেলেন ধীরেন্দ্রমোহন সেন আর অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। ধীরেন্দ্রমোহন পাঁচ বছর ইংলণ্ডে থেকে 'ডক্টর' হয়ে সবে দেশে ফিরলেন। অমিয়চন্দ্র কবির সেক্রেটারী। কবি বরোদায় বক্তৃতা দিলেন ২৭-এ জানুয়ারি। এই সময়ে আহমদাবাদে গিয়ে কবি উঠেছিলেন অম্বালাল সরাভাইদের বাড়িতে। বরোদায় কবির বক্তৃতার বিষয় ছিল —Man the Aritst। এই বক্তৃতায় বরোদারাজ সায়াজীরাও গায়কোবাড় সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কীর্তি-মন্দিরে শান্তিনিকেতনের শিল্পাচার্য নন্দলালদের দিয়ে ফ্রেস্কো করানোর পরিকল্পনা তখন থেকেই তাঁর মনে জেগেছিল। ভারতবর্ষের মহান্ ঐতিহ্যের প্রতীক তিনি কীর্তিমন্দিরে ভারতশিল্পীদের দিয়ে শিল্পকর্মে ধরে রাখার কল্পনা করেছিলেন।

কবি জানেন, সাহিত্যে ও শিল্পকলায় কোনো মান (standard) স্থায়ী হয় না। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের আসনও সরে সরে যায়। কিন্তু সাহিত্যে ও শিল্পে স্থায়িবস্তু নিশ্চয়ই কিছু আছে; অন্যথায়, প্রাচীন ঐতিহ্যের অনেক কিছুই লুপ্ত বা বিনষ্ট হয়ে যেত। কবির ভাষায়,. —'স্থায়ী প্রতিষ্ঠা স্থির থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত কালের মহলে ঠাই বদলের আদেশ আসে; তখন এই নূতনে ও পুরাতনে সংঘাত ঘটে। পুরাতন তার জীর্ণতা ত্যাগ করিয়া আঙিনা ছাড়িতে চায় না সহজে; আবার নূতনকালের প্রয়োজনটা যে কী সেটাও যথাযথভাবে সাব্যস্ত হইতে সময় লাগে। কারণ নূতন কালের মানরক্ষা করে চললেই যে কালের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করা হয় একথা বলা যায় না।'

রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন, —'নানা পুঞ্জীভূত কারণে য়ুরোপে সাহিত্য শিল্প ও কলায় ঠিক সেই রকম ভূমিকম্প দেখা দিয়াছে, যেমন দেখা দিয়াছে তাহার রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে। সর্বত্রই অধৈর্যের লক্ষণ। 'যেখানে বিদ্রোহী চিত্ত সব কিছু উলটপালট করবার জন্য কোমর বাঁধল, গানেতে ছবিতে দেখা দিল তাণ্ডবলীলা। কী চাই সেটা স্থির হল না, কেবল হাওয়ায় একটা রব উঠল 'আর ভালো লাগছে না। যা হবে হোক্ আর কিছুই একটা ঘটা চাই।' এইটা হইতেছে ভিকটোরিয়া যুগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া পর্ব'। এমন সময় আসিল প্রথম মহাযুদ্ধ। 'সম্পদের

জয়তোরণ তলার উপর তলা গেঁথে ইন্দ্রলোকের দিকে চূড়া তুলেছিল, সেই ঔদ্ধত্য ধরণীর ভারাকর্ষণ সইতে পারল না, এক মুহূর্তে হল ভূমিসাৎ।' সভ্যতার এই ভয়ঙ্কর রূপ অকস্মাৎ দেখিতে পাইয়া জীবনের কোন কিছুরই স্থায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা একেবারে শিথিল হইয়া গেল যৌবনের'। —(র. জী, ৩ পৃ ৩৬৭)। —আর এরই ফলে সমাজে, সাহিত্য-কলারচনায় অবাধে নানা প্রকারের অনাসৃষ্টির সূত্রপাত।

পশ্চিমভারত সফর সেরে ফেব্রুয়ারির গোড়ায় শান্তিনিকেতনে কবি এলেন। শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসবে এলমহার্স্ট এসেছেন সপরিবারে। এলমহার্স্টের স্ত্রী একজন আমেরিকান ধনী বিধবা। ১৯২২সাল থেকে তিনি শ্রীনিকেতন চালাবার জন্যে প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দান করছেন। এই মহিলার পূর্বনাম ছিল মিসেস্ ডোরোথি স্টেট। এঁদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে ক-দিন খুবই আনন্দ উৎসব চললো। আচার্য নন্দলালের সঙ্গে এলমহার্স্টের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেল।

বরোদা থেকে ফেরবার একমাসের মধ্যেই কবি ইউরোপ যাত্রা করলেন। যাত্রার আগে 'ঋতুরঙ্গ' অভিনয় অভ্যাস করালেন মেয়েদের। কবির ভাষায়, —'ওরা অঙ্গভঙ্গিমার লতানে রেখা দিয়ে গানের সুরের ওপর নক্শা কাটতে থাকে।' এদিকে আশ্রম ছাড়ার আগে পিছুটানও অনেক। বিশ্বভারতী দরিদ্র। তবু কবির সঙ্গে যাচ্ছেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, পালিতা কন্যা নন্দিনী। এই সময়কার শান্তিনিকেতনের ভার দিলেন প্রমদারঞ্জন ঘোষের উপর। প্রমদাবাবু সত্যনিষ্ঠ ও বিবেকী কর্মী। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনও ঘটলো অনেক।

এই বছর (১৯৩০) ২০ই ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনে বাঙ্গালাদেশের সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। বহু সদস্য উপস্থিত হয়েছিলেন। বাঙ্গালাদেশের গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসন শ্রীনিকেতনে এসে সমবায়সমিতির সভা উদ্বোধন করেছিলেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন এলমহার্স্ট সাহেব।

১৩৩৬সালের শ্রাবণ মাসে 'সীতাযজ্ঞ' নামে শ্রীনিকেতনে একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল। তাতে পৌরোহিত্য করেছিলেন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী। আচার্য নন্দলাল এই অনুষ্ঠানের দেওয়াল-চিত্র করেছিলেন শ্রীনিকেতনে, সে-কথা

আগে বলা হয়েছে। শাস্ত্রী মহাশয় মন্ত্রপাঠ করছেন এ-দৃশ্য দেখানো হয়েছে দ্বিতীয় চিত্রে। চিত্রের বামদিকে দেখা যাবে, তিনি মন্ত্রপাঠ করছেন; আর তাঁর ডানদিকে হল-স্পর্শ করে আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে এলমহার্স্ট সাহেব। আচার্য নন্দলাল হলকর্ষণ পর্বের আদি-অধিদেবতা স্বরূপে বৃষের যে মূর্তি এঁকেছেন সে তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি। সাঁওতাল মেয়েরা ফলমূলের উপচার নিবেদন করছে। আর বাইতি ঢাকীরা এই উৎসবে তাদের পালক-বাঁধা ঢাক বাজাচ্ছে। —শ্রীনিকেতন-উৎসব-প্রাঙ্গণের অন্যতম ভিত্তিগাত্রে ১৩৩৬ সালের মাঘ মাসে (১৯৩০ সালের ২৪ এ জানুয়ারি) আচার্য নন্দলাল সমগ্র ভিত্তিচিত্রের অঙ্কনকার্য সমাধা করেন।

॥ আশ্রমে সমাজকর্মে নন্দলাল ॥

॥ অস্পৃশ্যতা বর্জন ॥

'আমাদের কলাভবনে আলাদা কিচেন করা হয়েছিল। সে-কথা আগে বলেছি। এই কিচেনে একজন মেথর নিযুক্ত করলুম রাঁধবে বলে। নাম তার ফেকু। ফেকু রাঁধনি নিযুক্ত তো হলো, কিন্তু, সে কিছুতেই রাঁধতে চায় না। তারই আপত্তি প্রবল। সে বললে,—'ঐ কাজটি করতে পারব নাই বাবু। অনেক বারাম্মন টারাম্মন আছেন এখানে। তাঁরা খাবেন আমার হাতে। আমার এ হাত যে পায়খানা পরিষ্কার করে থাকে। আমি ফেকুকে যত উৎসাহ দিই, সে ততই মুষড়ে পড়ে। শেষে স্থির হলো, সে রাঁধবে। কিন্তু, ভাত, তরকারি চড়িয়ে দিতে হবে আমাদের, নামিয়েও নিতে হবে। পরিবেশন করতেও ফেকু রাজি হলো না। কিন্তু, রাঁধতে শুরু করার পরে ধীরে ধীরে উভয় পক্ষেই সব সয়ে গেল।

'গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা-বর্জনের আন্দোলন চলছে। তার ঢেউ শান্তিনিকেতনেও এসে পৌঁছলো। সিংহসদনে আমাদের untouchable movement-এর সভা হলো। শুধু সভা নয়, demonstration-ও দেওয়া হলো। সিংহসদনের stage-এর ওপরে আশ্রমের কর্তাব্যক্তিরা —শাস্ত্রী মশায়, নেপালবাবু, গোঁসাইজী, আমি —এই রকম সবাই বসলুম। স্টেজের সামনে আমাদের মাননীয় অতিথিদের বসানো হলো। এই মাননীয় অতিথিরা

হলেন অস্পৃশ্য —ভুবনডাঙ্গার ডোম, হাড়ি, মুচি, চামার এরা সব। এদের নতুন কাপড় পরানো হলো, নতুন চাদর কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো, ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দেওয়া হলো। আর প্রত্যেকের কপালে দেওয়া হলো চন্দনের ফোঁটা। তাদের সসম্মানে এসে বসানো হলো, আমাদের কাছাকাছি। উৎসবে অস্পৃশ্যতা-বর্জনের গান গাওয়া হলো —'সব' খর্বতারে দহে'। সামনে তাদের রাখা হলো শরবতের গ্লাস। সেই শরবতের গ্লাস তারা একে একে এসে, আমাদের হাতে হাতে তুলে দেবে।

'প্রথমে ওরা শরবতের গ্লাস এনে তুলে দিলে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের হাতে। শাস্ত্রী মশাই শরবতের গ্লাস ওদের হাত থেকে নিয়ে পাশে নামিয়ে রাখলেন। খেলেন না। বললেন, —'গ্রহণ করলুম'। শাস্ত্রী মশাই অস্পৃশ্যদের হাত থেকে পানীয় গ্রহণ করেছেন —খবরের কাগজে হেড্ লাইন দিয়ে এ খবরটা প্রচার হয়ে গেল।

'এই সময়ে একটা মজার ঘটনা হয়েছিল, বলি। —এই দিন অস্পৃশ্যতা-বর্জনের সভা করবার জন্যে আমরা সবাই সিংহসদনের গেট দিয়ে ঢুকছি। শাস্ত্রী মশাই আগেই ঢুকে গেছেন। কিন্তু, আমাদের গোঁসাইজী ঢুকতে ইতস্তত করছেন। সনাতনী ঢুকেছেন; কিন্তু, বৈষ্ণবের মনে দ্বিধা। গোঁসাইজীর দ্বিধা দেখে, পিছন থেকে আমি ঠেলা দিয়ে বললুম, —'ঢুকুন মশাই'।

'আমাদের এই আন্দোলন শান্তিনিকেতনের আশপাশের গ্রামেগ্রামেও চালাতে লাগলুম। গোয়ালপাড়ায়-টোয়ালপাড়ায় আমাদের সব ভলেনটিয়ার যেতে লাগল।

'ওদিকে গোয়ালপাড়ায় গাঁয়ের পণ্ডিতদের মিটিং বসলো। সেই মিটিং-এ গাঁয়ের পণ্ডিতেরা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধতে লাগলেন। সেই সভায় শান্তিনিকেতন থেকে অনেকে গেলেন তাঁদের বোঝাবার জন্যে। ফলে হলো কি, কেউ দলে এলেন, কেউ এলেন না। যাই হোক্, আমাদের খুবই উৎসাহ চলেছিল ঐ সময়ে।

'একদিন ক্ষিতিবাবুর সঙ্গে আমার এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে তাঁকে আমাদের কাজের সাফল্যের বিবরণ দিচ্ছিলুম। আমার কথা শুনে ক্ষিতিবাবু মৃদু হেসে বললেন, —'এ-কি আর হলো মশায়,

এ যে মাছকে স্নান করানো হলো। আমরা অনেক আগে থেকেই এ-সব ছেড়েছি।' তাঁর সত্যধর্মে জাতিবিচার নাই।

'আর একটি ঘটনা। আশ্রমে আমাদের জেনারেল কিচেনে অস্পৃশ্যেরা প্রথম যখন খেতে আরম্ভ করলো, তখন মুসলমান ও স্পৃশ্য হিন্দুর ছেলেরা অস্পৃশ্যদের সঙ্গে বসে খেতে চাইলে না। Strike করেছিল। কিন্তু দেখ, ধীরে ধীরে সব সয়ে গেছে। এই নিয়ে গুরুদেবকে প্রথমটায় বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। হৈ চৈ কাণ্ড। এই সময়ে শাস্ত্রী মশাইকে নিয়ে দুটো ঘটনা হলো। শাস্ত্রী মশাই গুরুদেবকে গিয়ে ধরলেন, —'না, একঘরে বসে খাওয়া চলবে না'। গুরুদেব বলেছিলেন, —'তাতে কি হয়েছে মশায়। বেশ, আপনার যখন আপত্তি, পাশের ঘরে ওদের খাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে'। শাস্ত্রী মশাই বলেছিলেন, – 'না, এক কিচেনে অর্থাৎ এক আচ্ছাদনের নিচে বসে খাওয়া চলবে না'। শাস্ত্রী মশায়ের এই কথা শুনে গুরুদেব দুঃখ করতে লাগলেন। গুরুদেব বলেছিলেন, —'ওদের খাওয়ার জন্যে নতুন সব বাসনপত্র এনে দেওয়া হবে'। কিন্তু, গুরুদেবের এতো অনুরোধেও তখন শাস্ত্রী মশাই-এর মন ভেজেনি। কিন্তু আজ (১৯৫৫) দেখ, এটা আর একটা সমস্যাই নয়। ধীরে ধীরে কেমন সব সয়ে গেছে। যাই হোক, আমাদের অস্পৃশ্যতাবর্জন শান্তিনিকেতনে বহু আগেই করা হয়েছে। আর সে-আন্দোলন আমরাই প্রথম এখানে করেছি।

'আর হলো Co-operative movement। সে তখন ভারতবর্ষে কোথাও হয়নি। প্রথম আরম্ভ করা হলো শান্তিনিকেতনে। এটা আমাদের বোধহয় সবচেয়ে বড়ো প্রচেষ্টা। এখন (১৯৫৫) অবশ্য অনেক জায়গাতেই Co-operative-এর কথা শোনা যাচ্ছে, আর হচ্ছেও, কিন্তু, এখানে ভেঙ্গে গেছে (১৯৫৫)।

'আমাদের শান্তিনিকেতনের সদস্যদের Co-operative সহ্য হলো না। তবে আমাদের যাইহোক্ আমাদের সে-আন্দোলন শান্তিনিকেতনে শুরু হয়ে, ক্রমে ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই গড়ে উঠেছে। পৃথিবীতে সাম্যবাদী দেশগুলিতে এর অস্তিত্ব খুব জোরদার। খুব ভালোভাবেই চলছে। আজ (১৯৫৫) মনে হয়, আশ্চর্য সে-সব আন্দোলন নিয়ে আশ্রমের তখনকার দিনগুলি আমাদের কি-রকম ঘোরে কেটেছিল। খেলোয়াড়ের মনোভাব

থাকলে Co-operative বাঁচতে পারে না। এই মনোভাবের মায়ার বশেই এটা এখান থেকে উঠে যাচ্ছে।

॥ বিবিধ-চর্যা ॥

'আশ্রম-পরিষ্কার, পাড়া-পরিষ্কার, রাস্তা-পরিষ্কার করা হতো। এখনকারের 'শান্তি-ডে' আমরা অনেক আগে থেকেই শুরু করে দিয়েছিলুম। সে-সময়ে আশ্রম পরিষ্কারের জন্যে ছেলেমেয়েদের ঝুড়ি ঝাঁটা নিয়ে নিজেদের বাড়ির কাছাকাছি এলাকা সাফ করতে হতো অমাবস্যা-পূর্ণিমায়। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় তখন সাধারণভাবে আশ্রম-বিদ্যালয়ে ছুটি থাকত।' অনেক সময়ে শিল্পশিক্ষক নন্দলাল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে থাকতেন, আর হাতে-কলমে সম্মার্জনের কাজ শেখাতেন। বিশেষ করে, শান্তি-পূর্ণাহে এবং পৌষমেলার আগে আশ্রম পরিষ্কারের কাজে নন্দলাল হতেন স্বেচ্ছাসেবকদের দলপতি। মাথায় গামছা বেঁধে, ঝুড়ি কোদাল নিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কার করার কাজে তাঁর মতন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারতেন না ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই।

আচার্য নন্দলালের পোশাকে কোনো পারিপাট্য ছিলনা। খদ্দরের একটা পাঞ্জাবি, পায়জামা বা ধুতিই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু, পরিচ্ছন্নতার এবং সুরুচির দিকে তাঁর নজর ছিল খুব কড়া। ছাত্রদের শোবার ঘরে খাটের ওপরে বিছানা মশারি, আলনায় কাপড়-জামা, টেবিলে বই-খাতা, তুলি-কাগজ ইত্যাদি এলোমেলোভাবে পড়ে থাকলে তিনি বিরক্ত হতেন খুব। অনেক সময়ে নিজের হাতে ঝাঁটা ধরে ঘর পরিষ্কার করে ঘরের আসবাবপত্র গুছিয়ে দিয়ে যেতেন। আর্টিস্ট হতে গেলে অগোছালো, বা উচ্ছৃঙ্খল হতে হবে, এই ধারণা যে ভ্রান্ত, নন্দলাল আপন আদর্শ সামনে রেখে সেই ভুল ধারণা দূর করে দিতেন। সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে যোগ দিয়ে ওঁর ছাত্র শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের কাজ করতে গিয়েছিলেন। সেইসময়ে গুরু নন্দলাল তাঁকে বিশেষ করে উপদেশ দিয়েছিলেন, —'গ্রামকে সুন্দর করবে নিজে আদর্শ

দেখিয়ে। কুঁড়েঘর নিকিয়ে-চুকিয়ে আলপনা দিয়ে রাখলে বা পিছনে একটু ফল-ফুলের বাগান করে, রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার করে গ্রামের লোককে দেখাবে কি করে নিখরচায় গ্রামের শোভা বাড়ানো যায়। শুধু স্বাধীনতা আনলেই হবে না, লক্ষ্মীছাড়া দেশে লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়ে আনার ভার তোমাদের।'

'একবার কথা উঠেছিল, ছেলেরা খরচ দিয়ে থাকে এখানে। তারা ঘরদোর পরিষ্কার করবে কেন। চাকরবাকরে করবে। বড়লোকের ছেলেরা বললে, —করবো না। আশ্রমের একশ্রেণীর ছাত্রদের এবং কারো কারো ক্ষেত্রে গার্জেনদের একবগ্‌গা মনোভাবের ফলে গুরুদেবের আদর্শ হজম করা শক্ত হলো।

'তখন আশ্রমে ছুটি থাকত অমাবস্যা-পূর্ণিমায়। ছেলেদের মধ্যে কোনো অপরাধ ঘটলে তার জন্যে বিচারসভা বসতো। সে-সভার আয়োজন ছেলেরাই করতো। বিশিষ্ট ছাত্র সে-সভায় থাকতো চার-পাঁচ জন, আর টিচার থাকতেন একজন। কিন্তু মামলা decide না হলে অধ্যক্ষ যে অভিমত দিতেন সবাই তাকে মেনে নিতো। সে-সময়ে দারুণ দারুণ বিচারসভা বসেছে অনেক। এইভাবেই সে-কালের আশ্রম-সমাজে বড়ো বড়ো সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। —কিন্তু, ক্রমে এদিকে অথরিটির নজর পড়লো। তাঁদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। ফলে, কোর্টের বদলে একেবারে হাইকোর্টের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠলো।

॥ আশ্রমে আনন্দের হাট ॥

॥ বসন্তোৎসব ॥

'আশ্রমে বিশেষ দোল-উৎসব আমরা করলুম একবার। দোলের পার্টি যাবে কলাভবন থেকে উত্তরায়ণে। তাতে, শোভাযাত্রা বের করা হবে সাজিয়ে গুজিয়ে। যাবে সবাই সং সেজে। আমাদের বিশ্বনাথ মুখার্জী 'বাঙ্গাল' সাজলেন। তেজুবাবু সাজলেন সেলাই বুরুশ নিয়ে মুচি। গৌরবাবু সাজলেন Police Inspector। পুলিশের পোশাক বেল্ট, টুপি

সব আনিয়ে নিলুম বোলপুর থেকে। চৌকিদার সাজলো দু-জন। তাদের ড্রেসও আনানো হলো। আমার ছাত্র শান্তি বোস (এখন ১৯৫৫, সে বেনারসে থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে টিচার হয়ে আছে) কলাভবন থেকে পালকিতে চড়ে বসলো বর সেজে। আর দু-জন ছাত্র পালকির দু-পাশে চলতে লাগলো পাখা আর ডাবা-টাবা নিয়ে।

'মাঝ-রাস্তায় একটা ঝগড়া বেধে গেল। false ঝগড়া। ঝগড়াটা হলো একজন ফকির আর একজন বাউল সাধুর সঙ্গে। বাউল সেজেছিল আমাদের শিশির ঘোষ। আর ফকির সেজেছিল ফকিরি টুপি পরে আমাদের ছাত্র হাসান। শোভাযাত্রা চলতে চলতেই লেগে গেল তুল-কালাম ঝগড়া। ভয়ানক ঝগড়া, রীতিমতো ঝগড়া। একেবারে খেউর জমে গেল। বোম ফুট্‌লো, বন্দুক ছোঁড়া হলো। প্রোসেশ্‌ন্‌ চলতে লাগলো। রাস্তার মোড় পর্যন্ত এসে বরযাত্রীর শোভাযাত্রা থেমে গেল।

'কন্যেকর্তা হলেন রথীবাবু; বরযাত্রীদলে ছিলুম আমি। কনে সাজলো 'সু-তান' নামে একজন জাভানী ছাত্র। 'আলুদা' হলেন শাশুড়ী —কনের মা। শাশুড়ী 'আলুদা' বর-বরণ করলেন হাতে তাবিজ পরে। বরকর্তা সেজেছিলেন জগদানন্দবাবু। গলায় তাঁর গরদের চাদর-ঝোলানো।

'কনের বাড়িতে গিয়ে বরযাত্রীদের শরবত খাওয়া হলো। খাতির পাওয়া যাচ্ছে খুবই। ভেতরের হলে বরযাত্রীদের পার্টি বসলো। কন্যেকর্তা রথীবাবু বরযাত্রীদের আপ্যায়িত করতে লাগলেন খালি গায়ে। সামান্য ছুতো নিয়ে বরকর্তা জগদানন্দবাবু নাটকের ভঙ্গিতে রেগে গেলেন, —'বর' নিয়ে চলে যাবো —বললেন মহাক্রোধে। তাঁকে ঠাণ্ডা করতে কন্যেকর্তা রথীবাবু বারেবারে মাফ চাইতে লাগলেন।

'ভোজন সেদিন হলো প্রভূত। লুচি, পোলাও-টোলাও সব ঠিক্ ঠিক্, খাওয়া হলো সত্যিকারের বিয়েবাড়ির মতন। চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় খাওয়া হলো।

'বিবাহ-সভায় 'বাঙ্গাল' বিশ্বনাথ আসরে বসে রইলো উবু হয়ে। জুতো-জামা পরে, আসরে গিয়ে 'বাঙ্গাল' বসে আছে উবু হয়ে। চেয়ারে বসতে সে জানেই না।

'এইভাবে সেদিন খুব অভিনয় করা হলো। প্রত্যেক বছর দোলের

সময়ে সং বের করবার ইচ্ছা ছিল আমার। কলকাতার জন্মাষ্টমীর সঙের মতন করবো ভেবেছিলুম। হাতি করলুম কাগজের, ঘোড়ার ছবি তৈরি করলুম। সঙের plan-এর স্কেচ্ করা আছে অনেক। (দ্র স্কেচ্-বই-সংখ্যা দ্বিতীয় পর্যায়, সংখ্যা ৩, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯)। হোলিতে সং বের করবার 'মতলবে' তার উপায় ও খসড়া। বড়ো বড়ো সং বের করবার জন্যে এইসব খসড়া। এর একপ্রস্থ কলাভবনে রাখা আছে। —আমার মনে হয়েছিল, এই রকম আনন্দ-উৎসবের ফলে, শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের সঙ্গে আশেপাশের গ্রামের মৈত্রীযোগ ঘটবে।

॥ শান্তিনিকেতনের গোঁসাইজী —শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী ॥

'১৯২০ সাল থেকে আমি বরাবর ওঁকে দেখছি এখানে এসে। খুব আমুদে সরস লোক। ইস্কুলে বাঙ্গালা সংস্কৃত এইসব পড়াতেন। পরে, উপর-ক্লাসেও পড়াতেন। ছেলেদের অভিনয় টভিনয় হলে রিহার্সাল দিয়ে তৈরি করে দিতেন গোঁসাইজী। ছেলেমেয়েরা সকলেই গোঁসাইজীকে অন্তর থেকে ভালোবাসতো। ছবি-টবির বিষয়ে ওঁর খুবই অনুরাগ। ওঁর ইচ্ছে ছিল, বড়ো ছেলে বীরুকে কলাভবনে দেবেন। সে-ছেলে অকালে মারা গেল। তা-বলে আনন্দের কমতি হয়নি গোঁসাইজীর।

'সংস্কৃতবিদ্যা সম্পর্কে গোঁসাইজীর যে শিক্ষা সে কারুর চেয়ে কম নয়। বৈষ্ণবশাস্ত্রও খুব ভালো জানেন। আবার স্বয়ং উনি বৈষ্ণববংশের। রাধিকানাথ গোঁসাই-এর ছেলে উনি। রাধিকানাথ গোঁসাই পরমহংসদেবের সঙ্গে দেখা করতেন। শান্তিপুরের অদ্বৈতপ্রভুর বংশ ওঁরা। রাধিকা গোঁসাইয়ের কথা 'শ্রীশ্রীকথামৃতে' আছে। পরমহংসদেব ওঁদের বংশ-পরিচয় শুনে তাঁকে প্রণাম করেছিলেন। রাধিকা গোঁসাই বলেছিলেন, —'আমি অধম, আমাকে কেন প্রণাম', তার উত্তরে পরমহংসদেব বলেছিলেন, —না হে, তুমি বড়োবংশের লোক। নারু আমের বংশ নারুই হয়ে থাকে।'

'বৈষ্ণবসাহিত্য, তন্ত্র আর সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ লোক গোঁসাইজী। অথচ পাণ্ডিত্যে টেক্কা দেয় অনেকেই —বিশেষ করে ওঁর কাছ থেকে যারা সংগ্রহ করে। সে স্বীকার করে না। তবে, তিনি নিজে

এ-সব বিষয়ে কিছু মনে করেন না।

'পালি-শাস্ত্রে, বৌদ্ধ-শাস্ত্রে ভালো ব্যুৎপত্তি আছে ওঁর। তন্ত্রশাস্ত্রেও গভীর জ্ঞান আছে। পালিভাষা আগেই জানতেন। ইংরেজিও শিখেছেন। বাজনা নাচ গান এ-সবেও পোক্ত। আগে তিনি ক্ল্যারিওনেট বাজাতেন।

'এখানে একবার 'হৈ হৈ সঙ্ঘে'র অভিনয় হয়। গৌরবাবু, গোঁসাইজী, আমি—সবাই সেজেছিলুম। আমি ওস্তাদ সেজেছিলুম। গোঁসাইজী চাপকান পরে লক্ষ্ণৌ-এর পোশাক করে নেচেছিলেন। তাতে গুরুদেব গান বেঁধে দিলেন, —'ওরে ভাই গাইয়ে'। যেখানে আছে 'হাতে হাত ধরি ধরি' সেই কলিটি গেয়ে গেয়ে নেচেছিলুম সকলে একসঙ্গে। রথীবাবুও নেচেছিলেন। আমাদের সেই অভিনয় গুরুদেব দেখতে এসেছিলেন। গুরুদেব গোঁসাইজীর নাচ দেখে বলেছিলেন, —'ওহে গোঁসাই, তোমার নাচেরও বিদ্যে আছে দেখি।' 'না, না, ও কিছু নয়' — বলেন গোঁসাইজী সবিনয়ে।

আমাদের আর্টে রস সম্পর্কে কিছু জানার দরকার হলে গোঁসাইজীর কাছেই জেনে নিতুম। উনি পণ্ডিত সব শাস্ত্রেই। অথচ অনেক জানার জন্যে কোনো গোঁড়ামি নাই।

'একবার টাইফয়েড হয়েছিল ওঁর। বৈষ্ণব হয়েও অসুখের সময়ে মাছ মাংস খেতে আরম্ভ করলেন। তাতে কোন বাধা হলো না। ওঁদের বংশে কিন্তু এটা খুব দোষের।

'গোঁসাইজী একবার শান্তিনিকেতন থেকে বৃন্দাবন যাচ্ছেন। উনি বেশ বদলাতেন প্রায়ই। এখনও করেন। স্ত্রী আছেন সঙ্গে। বাবরি চুল। মেরজাই আর ওয়েস্ট্‌কোট পরেছেন। লক্ষ্ণৌ-এর পোশাক। এই বেশে স্ত্রীকে নিয়ে চলেছেন। একটা স্টেশনে, নবাবীতবৎ বলে সন্দেহ হয়েছে পুলিশের। মুসলমানে বাঙ্গালী হিন্দু মেয়ে ফুসলে নিয়ে যাচ্ছে। পথে বরাবর ওঁদের অনুসরণ করেছে পুলিশে। শেষে, বৃন্দাবনে 'আমাদের লোক হে' বলে, ওঁর আত্মীয়েরা ওঁদের উদ্ধার করলেন পুলিশের কবল থেকে।

'এখানেও গোঁসাইজী নানারকম ড্রেস করতেন। লক্ষ্ণৌ-এর পোশাক পরতেন। দাড়ি চোমরাতেন। আবার কখনো রাশিয়ান দাড়ি করতেন।

ফ্রেঞ্চ্‌কাট করতেন, এইসব। আমরা সাজেশন দিতুম। গোঁফ কামিয়ে দাড়ি রাখতেও প্রস্তুত ছিলেন গোঁসাইজী।

'আর্টের ওপর খুব অনুরাগ ওঁর। ছেলেকে দিলেন কলাভবনে। বীরুর ভালো ছবি করা আছে কলাভবনে। বীরেশ্বর সহসা মারা গেল। সে-ছেলে অকালে মারা যাওয়াতে সংসারে গোঁসাইজী অনাসক্ত হয়ে পড়লেন। সংসারে অনাসক্ত হয়েও আবার বিয়ে করলেন। সে স্ত্রী মারা যেতে আবার বিয়ে করেন। এখন (১৯৫৫) আছে দু-টি মেয়ে।

'আমাদের বৈকালের চা-চক্র জমিয়ে রাখতেন উনি। ওঁর একার নানা গল্পে, কথায়, হাসিতে, ঠাট্টায় আমাদের চায়ের আসর জমজমাট হয়ে উঠতো।

'পালি শিখতে গেলেন সিংহলে। সে-সম্বন্ধে আমাকে চিঠিপত্র অনেক লিখেছিলেন। নিজের চেহারার কার্টুন এঁকে পাঠিয়েছিলেন। ভালোই এঁকেছেন। সিলোনে যখন নেমেছেন; অভ্যর্থনা হচ্ছে। আলখেল্লা, জোব্বা পরে সমস্ত রিক্স জুড়ে বসে আছেন। লোকের মনে প্রশ্ন,—'বাঁশ কোথা গো পথিক ?' —ছবি আঁকা ওঁর রাখা আছে কলাভবনে।

'কলকাতার কালী বা চার্লি বাগচী ওঁর শেষপক্ষের শ্যালক। অন্নদা বাগচীর নাতি তিনি। আর্টস্কুলের অন্নদা বাগচীরা ছিলেন ঘোর শাক্ত। চোরবাগানে আর্টস্টুডিয়ো ছিল তাঁর। বড়ো আর্টিস্ট্‌ ছিলেন তিনি। আমি গোঁসাইজীকে তাঁর ছবি চেয়েছিলুম। দিতে পারেননি। অন্নদা বাগচীর ছেলেরা —যতীন বাগচী-টাকচী এলেই আমার সঙ্গে দেখা করতো। যতীন বাগচী কালীমোহনবাবুর বন্ধু ছিলেন। অনেক চেষ্টা করেছিলুম, তার মারফত অন্নদা বাগচীর হাতের ছবি সংগ্রহ করতে। পারিনি। চোরবাগান আর্ট-স্টুডিয়োর কালী, সরস্বতী, দুর্গা এইসব বহুবর্ণ দেবতাদের ছবি তখন বের হয়েছিল। সেইসব ছবির লিথো ডিজাইন্‌ অন্নদা বাগচী করে দিতেন। ওঁরই সে-সব কল্পনা সে-যুগের।

'শান্তিনিকেতনে গোঁসাইজী মহা-উৎসাহে খোল বাজাতেন। বিদ্যা-

ভবনে (১৯৫৫) আমার করা ফ্রেস্কো আছে, —'ফাল্গুনী'-তে গোঁসাইজী নৃত্য করছেন। এখানের যত অধ্যাপককে বয়ঃজ্যেষ্ঠ হলে, গোঁসাইজী ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেন। নিরহঙ্কারী লোক। নিজের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অহঙ্কার নাই। হামবড়া পণ্ডিতেরা ওঁকে চিনতে পারেন না। গুরুদেব যখন যা দরকার পড়তো জানবার, বলতেন, —'গোঁসাইজী তো অথরিটি। সংস্কৃতশাস্ত্রে বৌদ্ধশাস্ত্রে অথরিটি।' —এই সব বিষয়ে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করতেন গোঁসাইজীকে। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যের ওপর লেখা গোঁসাইজীর বই আছে। কিন্তু উনি শুধু পণ্ডিত নন; বড়ো রসিকও। যা পাণ্ডিত্য ওঁর তার গোড়ায় প্রচুর আছে রসবোধ। তাই গোঁসাইজীর পাণ্ডিত্য মধুর হয়েছে। 'বর্নচোরা আম' উনি, অপর প্রায় সব সাধারণ পণ্ডিতের মতো 'সিঁদুরে আম' নন।

॥ আনন্দের হাট, পুনরাবৃত্তি ॥

॥ দু-টি ডাকাতির কাহিনী ॥ আর একটি মজা ॥
(প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রের বর্ণিত আর দুটি ঘটনা)

॥ বিশীকে সাপে-কাটার কাহিনী ॥

'১৯২২-২৩ সালের কথা। গোয়ালপাড়ার রাস্তার ধারে হাসপাতাল। মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। দোচালা মতো বাড়িটির নাম 'গৈরিক'। নতুন হাসপাতাল রাস্তার ও-পিঠে হবার পরে, গৈরিকের নাম হলো 'পুরানো হাসপাতাল'। কাকজ্যোৎস্না রাত। সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে। প্রমথ বিশী তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র। ছোট্ট-খাট্ট চেহারা। হঠাৎ একদিন কি মতলব করে দিনুবাবু, অক্ষয়বাবু, সুরেন আর গৌরবাবু মিলে বিশীকে হাসপাতালে তুলে নিয়ে গেল!

'বিশীকে ওঁরা বললেন, —'তুকে সাপে খেয়েছে'। —নন্দবাবুকে খবর দে। Laxin দিয়ে চিকিৎসা হোক। আমাকে খবর দিলে। আমি হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে পৌঁছলুম। গিয়ে দেখি, ভাঙ্গা লণ্ঠন, দম কমানো।

দেখেই কেমন যেন আমার সন্দেহ হলো। সন্দেহবশে, খানিক নার্ভাস হয়ে আমি রোগীর মুখ দেখতে চাইলুম। এদিকে লোক বসে আছে ডাক্তার ডাকতে যাবে বলে। আমি ওদের বললুম, — সাপে কোথা কামড়েছে, দেখবো আগে। মনেমনে ভাবলুম, দেখে বাঁধন দেবো আচ্ছা করে। কে যেন পায়ের দিকটা দেখিয়ে দিলে। পায়ের খানিকটা ওপরে কষে একটা বাঁধন দিলুম। বিশাকে বললুম, মুখ দেখবো, জিব দেখবো। সব দেখে বললুম, মাথা খারাপ নাকি, এ সাপে-কাটা রোগী হতেই পারেনা।

'নেপালবাবুকে ডাকা হলো। তিনি ছিলেন আপনভোলা লোক। চিন্তিত মুখে হাসপাতালে এসে সাপে-কাটা রোগীর দিকে তাকিয়ে, ঘরের ভেতর দু-তিন বার পায়চারি করে চলে গেলেন।

'জগদানন্দবাবুকে এবারে ডাকা যাক, এই মতলব আঁটলেন সবাই। জগদানন্দবাবু খবর শুনে বললেন, —'সাপে কামড়েছে তো আমাকে ডাকা কেন। এক কাজ কর, real সাপে যদি কামড়েছে দেখ, তা-হলে কাঁঠাল-ডাল লাগাব পিঠে।'

'ক্ষিতিবাবুকে খবর দেওয়া হলো। তিনি হাসপাতালে এলেন না। বিশার চরিত্র তিনি জানতেন ভালোভাবেই। খবর শুনে বললেন, —'কোথায় দংশেছে দেখ আগে।'

—'এইভাবে সেবারে রাখালের গরুর পালে বাঘ-পড়ার কাহিনী শেষ হলো।

॥ মালদই আম-ডাকাতির কাহিনী ॥

দিনুবাবুর প্রসঙ্গে একটি ডাকাতির কাহিনী মনে পড়ছে। সে বোধ হয় ১৯২৬-২৭ সালের কথা। জগদানন্দবাবু আম খেতে খুব ভালোবাসতেন। তিনি নিজের জন্ম-তারিখ ঠিক করতেন, কতবার আম খেয়েছেন সেই হিসেব করে করে।

'জগদানন্দবাবু কৃষ্ণনগরের বাড়ি থেকে শান্তিনিকেতনে ফেরবার সময়ে কলকাতা থেকে মালদই আম কিনে আনছেন একবার। আমাদের এখানে যুক্তি আঁটা হলো, একটু মজা করা যাক। দিনুবাবু, গৌরবাবু, অক্ষয়বাবু ও

আরো সবাই ডাকাত সাজলেন। ডাকাত সেজে ভুবনডাঙ্গার মাঠে রাস্তার পাশে শরঝোপে লুকিয়ে রইলেন আম লুট করবেন বলে। ওঁরা সবাই ডাকাত সেজেগুজে অপেক্ষা করতে লাগলেন ভুবনডাঙ্গার ফাঁকা রাস্তার পাশে। জগদানন্দবাবুর গরুর গাড়ি আসছে। স্বয়ং তিনিও বসে আছেন টপ্পরের মধ্যে। তাঁর গাড়ি হাঁকিয়ে গাড়োয়ান যে আসছে সে নিজেই আবার লেঠেল দলের একজন। জাতিতে মুসলমান। গাড়ি যথাস্থানে এসে পৌঁছতেই হৈ হৈ রৈ রৈ করে ডাকাতদল গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, আমের বস্তা ধরে টানাটানি শুরু করলে। ব্যাপার দেখে জগদানন্দবাবু ভয়ে তাকে হাঁক দিয়ে বললেন,—কিরে, আমার এই বিপদের সময়ে চুপ করে থাকবি তুই'। কিন্তু বাবুর এই হাঁক-ডাকেও তার কোনো সাড়া মিললো না। জগদানন্দবাবুর আমের বস্তা লুট হয়ে গেল।

'কিন্তু রাত্রে সব ব্যাপারটা গোলমাল হয়ে ফাঁস হয়ে গেল। চুবড়ি চুই আম আনা হয়েছে দিনুবাবুর বাড়িতে। রাত্রে আমাদের মহাভোজ। নিমন্ত্রণ করা হয়েছে জগদানন্দবাবুকেও। জগদানন্দবাবু আমের চোকলায় কামড় দিয়ে বলছেন,—'ভারী সুন্দর আম তো হে' তাঁর এই তারিফ শোনা-মাত্র হেসে উঠলো সবাই একসঙ্গে। জগদানন্দবাবুকে অবাক করে দিয়ে দিনুবাবু বললেন, —'আসুন আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে খাই আনন্দ করে'।

॥ বেতনের টাকা চুরির কাহিনী ॥

'আর একটা ঘটনা। শান্তিনিকেতনে মাস্টারদের মাইনে দেবার জন্যে একবার বেতনের টাকা আনা হচ্ছে। আনছেন কালীমোহনবাবু। আসছেন রাত্রে। নোট সব তাড়া বেঁধে কোমরে গুঁজেছেন, কাছায় বেঁধে আনছেন অতি সন্তর্পণে। আমরা দিনক্ষণ জানতুম। ডাকাতের সাজ সেজে আমরা ক-জন ভুবনডাঙ্গার মাঠে হাজির। এই দলে রথীবাবু ছিলেন, আমিও ছিলুম। দিনুবাবু হলেন পাণ্ডা। সর্দার ডাকাত দিনুবাবু কালীমোহনবাবুকে দেখামাত্র শুরু করে দিলেন পশ্চিমে পচাল। তাঁর সেই মেঠো হিন্দী

বুলির তোড়ে কালীমোহনবাবু হকচকিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে রথীবাবু দৌড়ে গিয়ে জাপটে ধরলেন কালীমোহনবাবুকে। জাপটে ধরেই হাঁক দিলেন,—'রুপেয়া নিকালো'। উল্টো ধার থেকে ডাকাত দিনুবাবু হাঁসফাঁস করতে করতে এসে কালীমোহনবাবুর একটা হাত ধরে ধমকে বললেন,—'কাছা খোলো'।

'কালীমোহনবাবুর অবস্থা তখন সাংঘাতিক। হন্তদন্ত হয়ে বলছেন,—'পুলিশে খবর দাও, পুলিশে খবর দাও, লুঠ হয়েছে'। মব (mob), মব (mob), মব, আমাকে ঘিরে ফেলেছে। গাঁয়ের লোকও জুটে গেছে দু-চারজন এই হৈ চৈ শুনে। তাদের কেউ কেউ বোধহয় আমাদের চিনতে পেরেছিল। বলতে লাগলো, ব্যস্ত হবেননা। কিন্তু তখন কালীমোহন-বাবুর মনের অবস্থা ব্যস্ত না-হবার মতন নয়।

'এই ডাকাতের দলে আমিও ছিলুম। আমার ছিল শুধু গা। মালকোছা-মারা, মাথায় ফেটি-বাঁধা, হাতে মোটা খেঁটে লাঠি। আমার গায়ের রং দেখছো তো, মার্কা-মারা। আমার খালি গায়ের সেই রং-এর বাহার দেখে অবশেষে সব বুঝে ফেললেন কালীমোহনবাবু।—এই রকম সব প্রাণখোলা রসিকতা তখন শান্তিনিকেতনে আকছার করতুম আমরা।

'ডাকাতির মজা অনেকবার করা হয়েছে। বিপদও হয়েছিল একবার। অজকালুর কথায় সে পরে বলবো।

॥ আরও মজা ॥

'খুচরো ব্যাপারও অনেক আছে। ভীমরাও শাস্ত্রীকে নিয়েও অনেক মজা করা হয়েছে। একটা মুরগিকে তার পেটটা টিপলেই সে ডাকতো কোঁ কোঁ করে। ভীমরাও শাস্ত্রীর মশারির ভেতর সেই মুরগিটাকে মেকাপ্ করে লুকিয়ে রেখে দিলাম একবার। ঘুমের ঘোরে শাস্ত্রীর বিশাল একখানা হাত সেই মুরগিটার পেটের ওপর পড়ে চাপ দিতেই মুরগিটা কোঁ কোঁ করে ডেকে উঠলো। ফলে, শাস্ত্রীর ঘুম গেল ছুটে। তিনি তড়াক করে জেগে উঠে বসলেন। নিরামিষাশী ভীমরাও-এর মশারির ভেতর রামপাখিটা শুয়ে আছে দেখে তাঁর সে কী গর্জন।

'শান্তিনিকেতনের একজন পুরাতন কর্মী। ধর্মে কঠোর ব্রাহ্ম। হিন্দুয়ানিকে আগাপাস্তালা নস্যাৎ করে থাকেন। তাঁর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হলেন। সহসা তাঁদের গুরুপল্লীর বাড়িতে আবির্ভাব হলো জটাজুটধারী এক হিন্দু সন্ন্যাসীর। কিন্তু আশ্চর্য, সে হিন্দুসন্ন্যাসীর তখন সে কী আদর, কী আপ্যায়ন, কী বিশ্বাস, কী ভক্তি, কী আশীর্বাদ মাথার ধুম। এ-সব আমার চোখে-দেখা ঘটনা।

॥ মানুষ নন্দলালের মহত্ত্বের দু-টি ঘটনা ॥

এই প্রসঙ্গে আচার্য নন্দলালের প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রের বর্ণিত দু-টি ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। এই দু-টি ঘটনায় মানুষ নন্দলালের পরিচয়টি সুস্পষ্ট ধরা পড়বে। শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন (বি. ভা. প. ন. লা. ব. সংখ্যা ১৩৭৩, পৃ ৭১-৭২)।—

'আমি শান্তিনিকেতনে যোগ দেবার কয়েকদিন পরে এক বুধবারে মন্দিরে উপাসনা চলছে, গুরুদেব স্বয়ং ভাষণ দিচ্ছেন, এমন সময়ে বিপদসূচক পাঁচ-পাঁচটা ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ হলো। আমরা উঠব কি উঠব না, ইতস্ততঃ করছি, মাস্টারমশাই সবার আগে লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে গেলেন, তখন পিছন পিছন আমরা সকলেই মন্দির খালি করে বেরিয়ে পড়লুম। ছাত্রছাত্রীরা যে যার ঘর থেকে বালতি কলসী নিয়ে ছুটলো। ভুবনডাঙ্গা গ্রামে যে কুটিরে আগুন লেগেছিল, তালপুকুর থেকে এবং দু-টো কুয়া থেকে সেখান পর্যন্ত চারহাত অন্তর সারি দিয়ে ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে হাতে হাতে জল চালান দিতে লাগল সেখানে। শিক্ষকেরা আগুনের অগ্রগতি রোধ করবার জন্যে কাছাকাছি অন্য চালে ভিজে কাঁথা কম্বল চাপা দিচ্ছিলেন। কেউ চালে উঠে জল ঢালছিলেন। মুগ্ধবিস্ময়ে দেখলুম, দরিদ্র কৃষকের জ্বলন্ত কুটির-শীর্ষে অগ্নিশিখা পরিবৃত মাস্টারমশাই কখনো বাঁশ পিটিয়ে কখনো কাটারি চালিয়ে জ্বলন্ত চাল ধ্বসিয়ে দিচ্ছেন, কখনো-বা বালতি বালতি জল ঢেলে আগুন নিভাচ্ছেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিভল। আমাদের নিজেদের বীরত্বে আমরা নিজেরাই মুগ্ধ, আলোচনা আর ফুরোয় না। মাস্টারমশাইকে কিন্তু একবারও সেদিনের ব্যাপারের উল্লেখ করতে শুনিনি।

'আর একদিনের কথা মনে পড়ে। সেদিনও বুধবার। বিধুশেখর শাস্ত্রী মশাই মন্দিরে ভাষণ দিচ্ছেন, ছোটো ছেলেদের গানের পরে প্রথামত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের একজন মন্দিরের বাইরে কাঁঠালগাছে যে বিরাট মৌমাছির চাকটা ছিল, তাতে ঢিল মেরেছে। আমরা হঠাৎ তার আর্তচীৎকারে চমকে উঠে দেখি, ছেলেটা মাটিতে পড়ে ধড়ফড় করছে, আর কাঁঠালগাছ থেকে মৌমাছির ঝাঁক একটা কালো স্রোতের মতো নেমে আসছে তার উপরে। সেদিনেও মাস্টারমশাই সবার আগে ছুটে বেরিয়ে গেলেন, ক্রোধোন্মত্ত মৌমাছির ঝাঁকের মধ্যে ঢুকে মৌমাছিপরিবৃত সেই শিশুটিকে পাঁজাকোলা করে বুকের কাছে তুলে নিয়ে ছুটলেন আশ্রয়ের সন্ধানে অতিথিশালার দিকে। আমরা অনেকে তাঁকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু একমাত্র অধ্যাপক আর্যনায়কম্ ছাড়া আর কারো সাধ্য হলো না, সহস্র সহস্র মৌমাছির ব্যূহ ভেদ করে তাদের কাছে যাবার; কেবল দূর থেকে দেখলুম, তাঁর সাদা পাঞ্জাবি চোখের সামনে মৌমাছির আবরণে কালো 'কোটে' রূপান্তরিত হলো। সেদিন অনেক গুণজ্ঞানী মধুপদংশন জ্বালায় উন্মত্তবৎ নৃত্য করেছেন, জীবন্ত বুলেটগুলির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আশ্রম প্রদক্ষিণ করছেন ঊর্ধ্বশ্বাসে। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে আমরা অতিথিশালার পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে দেখি, অচৈতন্য ছেলেটাকে একটা গদিচাপা দিয়ে রেখে মাস্টারমশাই এবং আরিয়ামদা পরস্পরকে ঝাঁটা দিয়ে পেটাচ্ছেন মৌমাছি মুক্ত করবার জন্যে। ক্রমে মৌমাছিকুল নিঃশেষ হলো, মাস্টার-মশাইএর মাথা জামা কাপড় সর্বাঙ্গ থেকে খুঁটে খুঁটে একঠোঙা মৌরির মতো পাহাড়ী মৌমাছির হুল আমরা উদ্ধার করলুম। খবর পেয়ে সুধীরাবৌদি ছুটে এলেন, স্বামীর কাণ্ডজ্ঞানহীনতার জন্যে খুব বকলেন। মাস্টারমশাইএর তখন জ্বর এসেছে, মৃদুস্বরে শুধু বললেন, 'আমি না তুলে আনলে ছেলেটা যে ঐখানে মারা যেত।' তাঁর শৈশবে মুঙ্গেরজেলার খড়্গপুরে তিনি একজন অশ্বারোহীকে ঘোড়াশুদ্ধ মৌমাছির কামড়ে মারা যেতে দেখেছিলেন ছটফট করে। অবোধ শিশুকে ঐভাবে মরতে দেওয়া চলবে না, এই কথাটাই তাঁর তখন মনে ছিল, তিনি যে নিজে মৃত্যুমুখে যাচ্ছেন সে-বিষয়ে খেয়াল ছিল না। যাইহোক, ক-দিন প্রবল জ্বরভোগের পরে সবাই সামলে উঠলেন। মৌমাছি-প্রসঙ্গের আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল। বহুবৎসর পরে রাতে

কষ্ট পাচ্ছেন শুনে বলেছিলুম,—'মৌমাছির কামড়টা এই সময়ে খেলে উপকার হতো।' খুব হেসেছিলেন।

॥ সমকালীন স্বদেশী আন্দোলনে নন্দলাল ॥

বাঙ্গালাদেশের বিপ্লববাদীদের অনেকের সঙ্গেই আচার্য নন্দলালবসুর যোগাযোগ ছিল। অনেকদিন থেকেই। তার কিছু কিছু আভাস পূর্বে দেওয়া হয়েছে। শান্তিনিকেতন-আশ্রম থেকে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু অক্ষয়কুমার রায়, তাঁর ছাত্র শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কেউ কেউ এই সময়ে অহিংস আন্দোলনে যোগ দিতে আশ্রমের বাইরে গিয়েছিলেন। প্রভাত-মোহন এই বিষয়ে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা এইভাবে প্রকাশ করেছেন। —'পথে বেরোবার সময়ে তিনি আমাকে একটা আংটা-দেওয়া পিতলের ঘটি দিয়েছিলেন, কুয়া থেকে জল তুলে খাবার সুবিধা হবে বলে। পরে নিজের হাতে-কাটা সুতোর কাপড় বুনিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তকলি রাখবার জন্যে একটি চামড়ার থলি তৈরি করে দিয়েছিলেন। মহিষবাথানে রাজ-বিদ্রোহ প্রচারের কাজে সাহায্যের জন্যে তিনি আমাকে কয়েকটি সাংঘাতিক প্রাচীরচিত্র এঁকে দিয়েছিলেন, সেগুলি 'লিনোকাটে' ছেপে আমরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিলুম। 'মড়ার মাথায় গাঁথা বেদীর উপর স্ত্রী পুরুষ শিশু মিলে জাতীয় পতাকা তুলছে,' এই ছিল একটি ছবির বিষয়-বস্তু, সেটির প্রতিলিপি আমি পাটনায় পাঁচিলে আঁটা দেখেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে আসল ছবিগুলি যাঁদের রাখতে দিয়েছিলুম, সেই বন্ধুরা পুলিশের ভয়ে সেগুলি পুড়িয়ে ফেলেছেন, ছবিগুলির কোন চিহ্ন কোথাও নেই। সতীশবাবুর সাইক্লোস্টাইলে ছাপা 'সত্যাগ্রহ সংবাদ' পত্রিকার আমি ছিলুম প্রধান মুদ্রা-কর, সে-সময়ে কলেজ-স্কোয়ারের সামনে আইন অমান্য পরিষদে'র অফিসে আমার এবং বন্ধু অক্ষয়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে মাস্টারমশাই প্রায় প্রতি-দিন একবার সেখানে আসতেন। তাঁর বিখ্যাত 'ডাণ্ডিমার্চের' ছবিটি সেই সময়ে আমিই প্রথম সাইক্লোস্টাইলে ছেপে বার করি। পরে অবশ্য তার কিছু কিছু রূপান্তর ঘটিয়েছেন তিনি। উইন সর নিউটনের বদেশী রং আমরা আগে বেশিরভাগ ছবিতে ব্যবহার করতুম, ঐ সময় থেকে কালা-

ভবনে দেশী পাথরমাটির রং ব্যবহার প্রবর্তন হয়। মাস্টারমশাই-এর 'পাণ্ডবদের পাশাখেলা' প্রভৃতি অনেক ছবি, নিজেদের তৈরি দেশী রঙে আঁকা ছবি যে কত সুন্দর হতে পারে তার উদাহরণ।" (ঐ, পৃ, ৭৩)।

এই সময়ে নন্দলাল কলকাতায় কংগ্রেস-অফিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত ছিলেন। ওখানে যেতেন তিনি নিয়মিত। নানা প্ল্যান দিতেন, কার্টুন আঁকতেন। কার্টুনের প্রসঙ্গ পরে বলা হবে। নন্দলালের আঁকা এই সময়কার স্বদেশী কার্টুনগুলি সমকালের রাষ্ট্রপতির, বিশেষ করে ভারতে ইংরাজ-শাসনের অমানবিক দিক্‌গুলি তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ করতো কিন্তু তাঁর গুরু অবনীবাবু এ-সব পছন্দ করতেন না। গুরুর কাছে হাতে হাতে ধরা পড়বার আতঙ্কও ছিল তাঁর দস্তুরমতো। এই বিষয়ে কৌতুক-কর একটি আলেখ্য সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'দক্ষিণের বারান্দা' গ্রন্থে।

গান্ধীজি ডাণ্ডিতে নুন তৈরি করতে গিয়ে সারা দেশটাকে আইন-অমান্য-আন্দোলনের পথে টেনে নিলেন। দেশের বহু তরুণপ্রাণ তখন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। তরুণের স্বপ্নে অসংখ্য প্রবীণও সে-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাঙ্গালাদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অফিস ছিল কলেজ-স্কোয়ারে। সেই অফিসটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল বেআইনি নুন তৈরি করবার স্বয়ংসেবকদের একটা ঘাঁটি।

'দক্ষিণের বারান্দা' গ্রন্থের লেখক অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমোহন-লাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর নিজের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, —'হঠাৎ দেখি নন্দ-দা। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর একটা গোপন যোগাযোগ ছিল জানতুম। কিন্তু নন্দ দাকে এ-রকম নিষিদ্ধ জায়গায় একেবারে চোখের সামনে দেখে ফেলব ভাবিনি। মজা হল এই যে, আমি নন্দ দার কাছে ধরা পড়ে গেলুম, না, তিনিই আমার কাছে ধরা পড়ে গেলেন ঠিক বোঝা গেল না। দাদামশায়কে নন্দ-দা ভয় করতেন। আর দাদামশায় ভয় করতেন এই সব কংগ্রেসী আন্দোলনকে, ধর-পাকড়, পুলিশ, আদালত, জেল, গুলি, বন্দুককে। দাদামশার কাছে নন্দ-দা বালক, আর এইসব ভয়ানক বিপদের মুখে এগিয়ে যাওয়া মানে অবোধ শিশু। নন্দ-দা ভাবলেন মোহনলাল বাড়ি গিয়ে বাবামশায়কে যদি বলে দেয়, তা-হলেই চিত্তির। আর আমি ভাবছি, নন্দ-দা যদি দাদামশার কানে কথা তোলেন তাহলে তো এখনি অসবেন

ধরে নিয়ে যেতে।

কিন্তু দু-জনেই অপরাধী। কাজেই কেমন করে জানিনা, একটা নিবাক রফা হয়ে গেল। 'এই যে, কী?' তাই তো, না বলে দু-জনে অতি দ্রুত দু-ঘরে সরে পড়লুম! নন্দ-দা কি জন্যে সেখানে এসেছিলেন আমি আজও জানিনা। আমি যে কি করতে এসেছি নন্দ-দাও জানতে চাইলেন না। চোখে পড়ল শুধু নন্দ-দা নন, শান্তিনিকেতনের প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও মোটা খদ্দর গায়ে এ-ঘরে ও-ঘরে ঘোরা-ফেরা করছেন। তাঁরও কি উদ্দেশ্য জানবার আগ্রহ না দেখিয়ে আমি নিজের কাজে মন দিলুম। এর কিছুদিন পরেই কংগ্রেস আপিস পুলিস এসে বন্ধ করে দেয়।'—(দ. বা. পৃ ৬৩-৬৪)।

১৯৩০সালে নন্দলালের চিত্রকর্ম খুব কম। মাত্র তিনখানি সুখ্যাত চিত্র তিনি এই বছরে আঁকলেন। টেম্পেরাতে আঁকলেন 'ডাণ্ডিমার্চ', আয়তন সাড়ে পনর×পৌনে দশ ইঞ্চি। আর আঁকলেন মহাত্মা গান্ধীর 'ডাণ্ডিমার্চ'।

১৯৩০সালে রাসবিহারী বসুর কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে নন্দলালের। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। ১৯২৯সালে জাপানে রাসবিহারী বসু নন্দলালকে বলেছিলেন, শান্তিনিকেতন-কলাভবন থেকে জাপানে নিয়মিত ছাত্র পাঠাবার জন্যে। এই বছরে নন্দলাল তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীবিশ্বরূপকে আর ছাত্র হরিহরণকে জাপানে পাঠিয়ে দিলেন। শ্রীবিশ্বরূপ জাপানে গেলেন তিন বছরের জন্যে। জাপানে বিচিত্র শিল্পধারার বিষয়ে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য নিয়ে। জাপানের চারুশিল্প ও কারুশিল্প সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগলেন তিনি জাপানে গিয়ে। বিশ্বরূপ বিশেষজ্ঞ হলেন বিশেষ করে কাঠখোদাই (wood engraving)-এর কাজে। ১৯৩০সালের সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া-ভ্রমণ করছেন। মস্কোতে থাকার সময়ে রাশিয়া থেকে সেখানকার চিন্তা ও কর্মধারা সম্পর্কে কবি এদেশে পত্র লিখতে লাগলেন। এই পত্রধারার মধ্যে শান্তিনিকেতন-আশ্রমে বিশিষ্ট কর্মীদের উদ্দেশ্যেও অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন কবি। শান্তিনিকেতনে রথীন্দ্রনাথকে, সুরেন্দ্রনাথ করকে, কালীমোহন ঘোষকে ও আচার্য নন্দলালকে লেখা চিঠি রয়েছে। প্রসঙ্গত 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থের নবম পত্রখানি উদ্ধার করে দেওয়া গেল। একই বিষয় নিয়ে যে পত্রগুলি কলাভবনের অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথকে লেখা হয়েছিল সেগুলি ঐ বই-এ ৭, ১০, ১১ এবং ১২ সংখ্যক পত্ররূপে

ছাপা হয়েছে। নন্দলালকে লেখা নবম পত্রখানির পূর্ণ বয়ান এই,—

[১২৯০]

ওঁ

D 'Bremen'

কল্যাণীয়েষু,

নন্দলাল, আমাদের দেশে পলিটিক্‌স্‌কে যারা নিছক পালোয়ানি বলে জানে সবরকম ললিতকলাকে তারা পৌরুষের বিরোধী বলে ধরে রেখেছে। এ সম্বন্ধে সুরেনকে আমি আগেই লিখেছি। রাশিয়ার জার ছিল একদিন দশাননের মতো সম্রাট, তার সাম্রাজ্য পৃথিবীর অনেকখানিকেই অজগর সাপের মতো গিলে ফেলেছিল, ল্যাজের পাকে যাকে সে জড়িয়েছে তার হাড়গোড় দিয়েচে পিষে। প্রায় বছর তেরো হলো এরই প্রতাপের সঙ্গে বিপ্লবীদের ঝুটোপুটি বেধে গিয়েছিল। সম্রাট যখন গুষ্টিসুদ্ধ গেল সরে তখনো তার সাঙ্গপাঙ্গরা দাপিয়ে বেড়াতে লাগল—তাদের অস্ত্র এবং উৎসাহ জোগালে অপর সাম্রাজ্যভোগীরা। বুঝতে পারছ ব্যাপারখানা সহজ ছিল না। একদা যারা ছিল সম্রাটের উপগ্রহ ধনীর দল, চাষীদের পরে যাদের ছিল অসীম প্রভুত্ব, তাদের সর্বনাশ বেধে গেল। লুটপাট কাড়াকাড়ি চলল, তাদের বহুমূল্য ভোগের সামগ্রী ছারখার করবার জন্যে প্রজারা হন্যে হয়ে উঠেছে। এত বড়ো উচ্ছৃঙ্খল উৎপাতের সময়ে বিপ্লবী নেতাদের কাছ থেকে কড়া হুকুম এসেছে—আর্ট সামগ্রীকে কোনোমতে যেন নষ্ট হতে দেওয়া না হয়। ধনীদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ থেকে ছাত্রেরা অধ্যাপকেরা অর্ধ অভুক্ত শীতাক্লিষ্ট অবস্থায় দল বেঁধে যা কিছু রক্ষাযোগ্য জিনিস সমস্ত উদ্ধার করে য়ুনিভার্সিটির ম্যুজিয়মে সংগ্রহ করতে লাগল।

মনে আছে আমরা যখন চীনে গিয়েছিলুম কী দেখেছিলুম। য়ুরোপের সাম্রাজ্যভোগীরা পিকিনের বসন্তপ্রাসাদকে কিরকম ধূলিসাৎ করে দিয়েছে বহুযুগের অমূল্য শিল্পসামগ্রী কিরকম লুটেপুটে ছিঁড়ে ভেঙে দিয়েছে, উড়িয়ে পুড়িয়ে। তেমন সব জিনিস জগতে আর কোনোদিন তৈরি হতেই পারবে না। সোভিয়েটরা ব্যক্তিগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত করছে, কিন্তু যে ঐশ্বর্যে সমস্ত মানুষের চিরদিনের অধিকার—বর্বরের মতো তাকে নষ্ট হতে দেয়নি। এতদিন যারা পরের ভোগের জন্যে জমি চাষ করে এসেছে এরা

তাদের যে কেবল জমির স্বত্ব দিয়েছে তা না, জ্ঞানের জন্যে আনন্দের জন্যে মানবজীবনে যা কিছু মূল্যবান সমস্ত তাদের দিতে চেয়েছে। শুধু পেটের ভাত পশুর পক্ষে যথেষ্ট মানুষের পক্ষে নয় একথা তারা বুঝেছিল এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের পক্ষে পালোয়ানীর চেয়ে আর্টের অনুশীলন অনেক বড়ো একথা তারা স্বীকার করেছে।

এদের বিপ্লবের সময়ে উপর তলার অনেক জিনিস নীচে তলিয়ে গেছে এ কথা সত্য কিন্তু টিঁকে রয়েছে এবং ভরে উঠেছে ম্যুজিয়ম, থিয়েটর, লাইব্রেরী, সঙ্গীতশালা। আমাদের দেশের মতোই একদা এদের গুণীর গুণপণা প্রধানত ধর্মমন্দিরেই প্রকাশ পেত। মোহন্তেরা নিজের স্থূল রুচি নিয়ে তার উপরে যেমন খুশি হাত চালিয়েছে। আধুনিক শিক্ষিত ভক্তবাবুরা পুরীর মন্দিরকে যেমন চুনকাম করতে সংকুচিত হয়নি তেমনি এখানকার মন্দিরের কর্তারা আপন সংস্কার অনুসারে সংস্কৃত করে প্রাচীন কীর্তিকে অবাধে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে—তার ঐতিহাসিক মূল্য যে সর্বজনের সর্বকালের পক্ষে এ কথা তারা মনে করেনি. এমন কি পুরানো পুজোর পাত্রগুলিকে নূতন করে ঢালাই করেছে। আমাদের দেশেও মঠে মন্দিরে অনেক জিনিস আছে ইতিহাসের পক্ষে যা মূল্যবান। কিন্তু কারো তা ব্যবহার করবার জো নাই—মোহন্তেরাও অতলস্পর্শ মোহে মগ্ন, সেগুলিকে ব্যবহার করবার মতো বুদ্ধি ও বিদ্যার ধার ধারে না। ক্ষিতিবাবুর কাছে শোনা যায় প্রাচীন অনেক পুঁথি মঠে মঠে আটক পড়ে আছে, দৈত্যপুরীতে রাজকন্যার মতো উদ্ধার করবার উপায় নেই।

বিপ্লবীরা ধর্মমন্দিরের সম্পত্তির বেড়া ভেঙে দিয়ে সমস্তকেই সাধারণের সম্পত্তি করে দিয়েছে। যেগুলি পূজার সামগ্রী সেগুলি রেখে বাকি সমস্ত জমা করা হচ্ছে ম্যুজিয়মে। এক দিকে যখন আত্মবিপ্লব চলছে, যখন চারদিকে টাইফয়িডের প্রবল প্রকোপ, রেলের পথ সব উৎখাত, সেই সময়ে বৈজ্ঞানিক সন্ধানীর দল গিয়েছে প্রত্যন্ত প্রদেশ সমস্ত হাৎড়িয়ে পুরাকালীন শিল্পসামগ্রী উদ্ধার করবার জন্যে। কত পুঁথি, কত ছবি, কত খোদকারির কাজ সংগ্রহ হলো তার সীমা নেই।

এ তো গেল ধনীগৃহে ধর্মমন্দিরে যা-কিছু পাওয়া গেছে তারই কথা।

দেশের সাধারণ চাষীদের কর্মিকদের কৃত শিল্পসামগ্রী পূর্বতন কালে যা অবজ্ঞাভাজন ছিল, তার মূল্য নিরূপণ করবার দিকেও দৃষ্টি পড়ছে। শুধু ছবি নয়, লোকসাহিত্য লোকসংগীত প্রভৃতি নিয়েও প্রবল বেগে কাজ চলছে।

এই তো গেল সংগ্রহ, তার পরে এইসমস্ত সংগ্রহ নিয়ে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা। ইতিপূর্বেই সুরেনকে তার বিবরণ লিখেছি।

এত কথা যে লিখছি তার কারণ এই, দেশের লোককে আমি জানাতে চাই, আজ কেবলমাত্র দশ বছরের আগেকার রাশিয়ার জনসাধারণ আমাদের বর্তমান জনসাধারণের সমতুল্যই ছিল ; সোভিয়েট শাসনে এই জাতীয় লোককেই শিক্ষার দ্বারা মানুষ করে তোলবার আদর্শ কতখানি উচ্চ। এর মধ্যে বিজ্ঞান সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা সমস্তই আছে—অর্থাৎ, আমাদের দেশের ভদ্রনামধারীদের জন্যে শিক্ষার যে আয়োজন তার চেয়ে অনেক গুণেই সম্পূর্ণতর। কাগজে পড়লুম সম্প্রতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন উপলক্ষে হুকুম পাস হয়েছে প্রজাদের কানমূলে শিক্ষাকর আদায় করা, এবং আদায়ের ভার পড়েছে জমিদারের পরে। অর্থাৎ যারা অমনিতেই আধমরা হয়ে রয়েছে শিক্ষার ছুতো করে তাদেরই মার বাড়িয়ে দেওয়া। শিক্ষাকর চাই বই-কি, নইলে খরচ জোগাবে কিসে? কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্যে যে কর, কেন দেশের সবাই মিলে সে কর দেবে না? সিভিল সার্ভিস আছে, মিলিটারি সার্ভিস আছে, গভর্নর, ভাইসরয় ও তাঁদের সদস্যবর্গ আছেন, কেন তাদের পরিপূর্ণ পকেটে হাত দেবার জো নেই? তাঁরা কি এই চাষীদের অন্নের ভাগ থেকেই বেতন নিয়ে ও পেনসেন্ নিয়ে অবশেষে দেশে গিয়ে ভোগ করেন না? পাটকলের যে-সব বড়ো বড়ো বিলাতি মহাজন পাটের চাষীর রক্ত নিয়ে মোটা মুনাফার সৃষ্টি করে দেশে রওনা করে, সেই মৃতপ্রায় চাষীদের শিক্ষা দেবার জন্যে তাদের কোনোই দায়িত্ব নেই? যে সব মিনিষ্টার শিক্ষা-আইন পাশ নিয়ে ভরা পেটে উৎসাহ প্রকাশ করেন তাঁদের উৎসাহের কানাকড়ি মূল্যও কি তাদের নিজের তহবিল থেকে আদায় দিতে হবে না? একেই বলে শিক্ষার জন্যে দরদ? আমি তো একজন জমিদার, আমার প্রজাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে কিছু দিয়েও থাকি ; আরো দ্বিগুণ তিনগুণ যদি দিতে হয় তো তাও দিতে রাজি আছি কিন্তু এই কথাটা

প্রতিদিন ওদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার হবে যে, আমি তাদের আপন লোক, তাদের শিক্ষায় আমারই মঙ্গল—এবং আমিই তাদের দিচ্ছি, দিচ্ছে না এই রাজাশাসকদের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্নশ্রেণীর একজনও একপয়সাও। সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণের উন্নতি বিধানের চাপ খুবই বেশি; সেজন্যে আহারে বিহারে লোকে কষ্ট পাচ্ছে কম নয়, কিন্তু এই কষ্টের ভাগ উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সকলেই নিয়েছে। তেমন কষ্টকে তো কষ্ট বলব না, সে যে তপস্যা। প্রাথমিক শিক্ষার নামে কণামাত্র শিক্ষা চালিয়ে ভারত গবর্নমেন্ট এতদিন পরে দুশো বছরের কলঙ্কমোচন করতে চান, অথচ তার দাম দেবে তারাই যারা দান দিতে সকলের চেয়ে অক্ষম—গবর্নমেন্টের পোষ্যবর্গলালিত বহুবাশীবাহন যারা তারা নয়, তারা আছে গৌরব ভোগ করবার জন্যে।

আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনো মতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতমতল থেকে আজ কেবলমাত্র দশবৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতির জন্যেও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে? দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে? মানুষকে যারা কেবলি ফাঁকি দেয় দেবতা কি তাদের কোনোখানে আছে?

অনেক কথা বলার আছে। এরকম তথ্যসংগ্রহ করে লেখা আমার অভ্যস্ত নয়, কিন্তু না-লেখা আমার অন্যায় হবে বলে লিখতে বসেছি। রাশিয়ার শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে লিখবো বলে আমার সংকল্প আছে। কতবার মনে হয়েছে, আর কোথাও নয়, রাশিয়ায় এসে একবার তোমাদের সব দেখে যাওয়া উচিত। ভারতবর্ষ থেকে অনেক চর সেখানে যায়, বিপ্লবপন্থীরাও আনাগোনা করে; কিন্তু আমার মনে হয় কিছুর জন্যে নয়, কেবল শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার।

যাক, আমার নিজের খবর দিতে উৎসাহ পাইনে। আমি যে আর্টিস্ট এই অভিমান মনে প্রবল হবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত বাইরে খ্যাতি পেয়েছি, অন্তরে পৌঁছয় না। কেবলই মনে হয় দৈবগুণে

পেয়েছি, নিজগুণে নয়।

ভাসছি এখন মাঝ-সমুদ্রে। পারে গিয়ে কপালে কী আছে জানি নে। শরীর ক্লান্ত, মন অনিচ্ছুক। শূন্য ভিক্ষাপাত্রের মতো ভারী জিনিস জগতে আর কিছুই নেই, সেটা জগন্নাথকে শেষ নিবেদন করে দিয়ে কবে আমি ছুটি পাব? ইতি ৫ অক্টোবর ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ কবির কর্মধারা ও চিত্র-প্রদর্শনী ॥

১৯৩০ সালের ২রা মার্চ রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতন য়ুরোপ যাত্রা করলেন। কবি এখন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। তুলিতে-কালিতে রেখায়-রঙে মন তাঁর মগ্ন। প্যারিসে পোঁছে তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন, —'ধরাতলে যে রবিঠাকুর বিগত শতাব্দীর ২৫শে বৈশাখ অবতীর্ণ হয়েচেন তাঁর কবিত্ব সম্প্রতি আচ্ছন্ন — তিনি এখন চিত্রকর রূপে প্রকাশমান।'

য়ুরোপের মনীষিগণ রবীন্দ্রনাথকে এতদিন কবি সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ বলে জানতেন। কিন্তু, এবারে তাঁরা কবির চিত্রকর রূপের নতুন পরিচয় পেলেন। ফ্রান্সে পৌছবার একমাস পরে প্যারিসে Gallery Pigalle-তে কবির প্রথম চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হলো ২রা মে। সেখানে দেখানো হলো ১২৫ খানি ছবি। আঁদ্রে কার্পেলেস, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, কঁতেস দ নোআলিস বিশেষভাবে এই উদ্যোগ করেছিলেন। পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে প্যারিস আর্টের সমঝদার এবং আর্টিস্টদের প্রধান কেন্দ্র। ফ্রান্সের দরবারে কবির ছবির জন্যে 'শিরোপা' মিলল। প্যারিসে কবির ছবি আঁকা চলেছিল নিয়মিত।

এর মধ্যে ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে অনেক পরিবর্তন ঘটলো। গান্ধীজীর আইনঅমান্য আন্দোলন, শোলাপুরের হাঙ্গামা, চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা, গান্ধীজি ও অন্য কংগ্রেস নেতাদের কারাবরণ ইত্যাদি বহু ঘটনা ঘটলো। শোলাপুরে 'গান্ধী-টুপি' পরার জন্যে পুলিশী নির্যাতন চলেছিল। কবি এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন।

১৯-এ মে অক্সফোর্ডের ম্যানচেস্টার কলেজে কবি প্রথম হিবার্ট লেকচার দিলেন। তাঁর ভাষণের বিষয় হলো The Religion of Man। রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীর ব্রাহ্ম বা কোনো সম্প্রদায়গত ধর্মবিশ্বাসের শিকলে অবদ্ধ থাকা সম্ভব ছিল না। এই ভাষণে কবি হিন্দুশাস্ত্র, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, মধ্যযুগের সাধুসন্তদের বাণী, বাঙ্গালা দেশের আউল-বাউল সাঁই ফকিরের গান উদ্ধার করে তাঁর উদার মানবধর্মের মর্মকথা প্রকাশ করলেন অতি আশ্চর্যভাবে। মানুষের ধর্ম ব্যাখ্যানে কবির যে ধর্মভূমিকা সে ভারতীয় উপনিষদকেন্দ্রিক। হিন্দুধর্মের সর্বজনগ্রাহ্য মহান ভাবসমুদয়কেই তিনি বিশ্বধর্মের আসন দান করলেন। তাঁর ভাষণ মূলতঃ হিন্দু পটভূমির উপর রচিত। তাতে বিশ্বমানবের ধর্মসমস্যার সমাধান রয়েছে। সেইজন্যে কবির ধর্মের নাম Religion of Man বা মানুষের ধর্ম।

বার্মিংহাম উড্‌ব্রুকে কবির চিত্রপ্রদর্শনী হলো ২রা জুন। ৪ঠা জুন ইণ্ডিয়া হাউসের ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে বক্তৃতা করলেন ডকটর বাকে।

কবির চিত্রপ্রদর্শনী উন্মোচন করা হলো। কবি বললেন, অল্পকাল হলো তিনি ছবি আঁকার মধ্যে একটা আনন্দ অনুভব করছেন, কিন্তু তিনি এর গুণাগুণ জানেন না। ফ্রান্সের জনাকয়েক গুণীর ভরসায় তিনি প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি দেখিয়েছিলেন। শিশুকাল থেকে তাঁর পরিচয় শব্দের সঙ্গে, রেখার সঙ্গে নয়। প্রদর্শনীর আগে সেইজন্যে তিনি মাইকেল স্যাড্‌লার ও ম্যুরহেড্‌-বোন্‌কে ডেকে তাঁর ছবি দেখান। কবি মনে করছেন, তাঁর ছবিগুলোর কপাল ভালো। ১৬ই জুলাই গ্যালারি মোলার-এ পুনরায় কবির চিত্রপ্রদর্শনী হলো। বার্লিনের ন্যাশান্যাল গ্যালারি কবির পাঁচখানি ছবি নিলেন। আমেরিকা-ভ্রমণকালেও কবির ছবি আঁকা চলছে। নিউ-ইয়র্কে কবির চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছে। নিউইয়র্কে থেকে কবি শান্তিনিকেতনের কথা ভাবছেন। তিনি বহুবার ভেবেছেন, বিশ্বভারতীকে মেয়েদের বিশ্ব-বিদ্যালয় করবেন। ১৯৩১সালের ৩১এ জানুয়ারি কবি দেশে ফিরলেন।

॥ বিদেশে রবীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রদর্শনী ॥

১৯৩০ সালে য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রদর্শিত কবির চিত্রাবলী দেখে পাশ্চাত্য দেশের বিদগ্ধজনেরা বুঝতে পারলেন, কবি রবীন্দ্রনাথ একজন চিত্রশিল্পীও বটেন। কবিও অনুভব করলেন, তাঁর খেয়াল খুশির সৃষ্টিকে কেউ তাচ্ছিল্য করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির কোনো প্রদর্শনী তাঁর স্বদেশে কিন্তু তখনও হয়নি। কবির অন্তরঙ্গ কয়েকজন ছাড়া তাঁর শিল্পী-সত্তার পরিচয় কেউ জানতেন না। পাশ্চাত্য দেশেই তাঁর চিত্র-প্রদর্শনী হয় প্রথম।

কবির ছবি আঁকার ইতিহাস খুব পুরাতন নয়। এর আরম্ভ মোটা-মুটি ১৯২৬ সাল থেকে। তবে কবির পুরাতন চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে তিনি মাঝে মাঝে ছবি আঁকতেন। ১৯২৬ সাল থেকে ছবি-আঁকা কবিকে নেশার মতো পেয়ে বসে। বারো-তেরো বছরের মধ্যে তিনি প্রায় তিন হাজারের ওপর ছবি আঁকেন। এই বিষয়ে আচার্য নন্দলাল লিখেছেন, —'প্রায় দশ বারো বছরের মধ্যেই যে সব ছবি তিনি এঁকেছেন, তার সংখ্যা গত পঞ্চাশ বৎসরে বাংলাদেশে সমস্ত নাম করা চিত্রশিল্পীরা মিলে যত ছবি এঁকেছেন—তার চেয়ে বেশি। তাঁর বহুসংখ্যক ছবির মধ্যে ১৫০০-এর বেশি ছবি রবীন্দ্রসদনে আছে।' —রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম সম্পর্কে আচার্য নন্দলালের আলোচনা স্বতন্ত্র পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমরা যথাসময়ে সেই সমস্ত আলোচনা সংকলন করে দেবো।

যাই হোক, সকল শ্রেণীর সমালোচক স্বীকার করেছেন, রবীন্দ্রনাথের ছবির মধ্যে দেখবার ভাববার ও বোঝবার আছে অনেক কিছু। নন্দলালের এই বিষয়ে প্রকীর্ণ কিছু কিছু মন্তব্য আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট শিল্পশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষালাভ করেননি। তবে জোড়া-সাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের যে-পরিবেশে তাঁর বাল্য কৈশোর যৌবনের কাল অতিক্রান্ত হয়েছে তাতে কবির মনে শিল্পসৃষ্টির বিশিষ্ট চিন্তার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল সে স্বীকার করতেই হয়। বলেন্দ্রনাথ ছিলেন শিল্পদর্শনের সুখ্যাত প্রবক্তা। তাঁর গভীর শিল্পবোধ অবনীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট প্রভাবিত

করেছিল, সে-কথা আমরা আগে বলেছি। তাছাড়া, তিন ভাই গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্রের প্রত্যক্ষ আদর্শ কবির সামনে তো ছিল বরাবরই। কবি-প্রতিভার জারক রসে পারিপার্শ্বিক সমূহ শিল্পরস প্রায় নিঃশেষে সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয় শিল্পকর্মে কাজে লাগিয়েছেন। উপরন্তু, তাঁর অবচেতন মনের নানা ভাবনা, নানারূপ কল্পনা তাঁর অবচেতন ছবির মধ্যে দিয়ে পাহাড়ী নির্ঝরের মতো সাবলীল গতিতে প্রবাহিত হয়ে এসে পৃথিবীর শিল্পক্ষেত্রে আপন বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলতঃ, রবীন্দ্রনাথ 'পেশাদার' শিল্পী না-হয়েও মহান্ শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। বলা বাহুল্য, মহান্ শিল্পীদের বোধ হয় মাত্র জীবিকা-অর্জনের জন্যে শিল্প-কর্মকে পেশাদারি বৃত্তিরূপে গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়নি। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীকে প্রত্যক্ষ বলে. কেউ উপেক্ষা করেনা ; তবে এ-সম্পর্কে এখনো যথোচিত আলোচনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

॥ রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনের ভূমিকা ॥

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনের বা 'চিত্তির-বিচিত্তি'র শুরু হয়েছিল তাঁর নিজের লেখার কাটাকুটির ফলে। লেখার মধ্যে যে অংশ তাঁর অপছন্দ হতো সেটাকে তিনি এমন করে কাটতেন যে তার ভেতর থেকে মূল হরফ যেন কেউ উদ্ধার করতে না পারে। এই রকন কাটাকুটি করতে করতে অক্ষর বা শব্দের ওপর একটা রূপ দাঁড় করবার ইচ্ছা হয় অনেকেরই। আমরা পুরাতন একাধিক বাঙ্গালা পুঁথিতেও লিপিকরদের এই রকম প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করেছি। কবি রবীন্দ্রনাথ এই প্রাচীন পরম্পরারই জের টেনেছেন। আমাদের মনে হয়, এই প্রচেষ্টা শিল্পী-মনের 'শিশু'-ভাব থেকে 'অন্যমনস্ক' হয়ে কলমের আঁচড়ে আঁচড়ে বিচিত্র রূপ সৃষ্টির ঘটনা নয়। এ প্রয়াস স্বেচ্ছাকৃত। কবি রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে যৌবনে ছবি আঁকতেন। তার নিদর্শন আছে পুরানো কাগজপত্রে। রবীন্দ্র-জীবনীকারের মতে, 'সেগুলি মামুলি পদ্ধতিতে অঙ্কিত —কিছুটা দেখা, কিছুটা স্মরণ করা বিষয়।' তিনি আরও বলেন, —'কিন্তু কবির এবারকার ছবি আঁকার পদ্ধতি গড়িয়া উঠে তাঁহার লেখা-কাটাকুটি হইতে। সাধারণতঃ ছবি আঁকা হয় দুই ভাব হইতে —বাহিরের কোনো দৃশ্য মনের মধ্যে রং ধরায়, শিল্পী রূপ দান করে ; অথবা মনের মধ্যে যে সব ভাবনা আবুলিত,

তাহা শিল্পী রূপ দেন—চিত্রে ভাস্কর্যে এমন কি স্থাপত্যে। কিন্তু যাহাকে আমরা অপরের ভাবনা হইতে উদ্ভূত বলিতেছি, তাহারাও হয়তো বাহিরের কোনো সুদূরকালের অভিঘাত সঞ্জাত বিষয়—প্রচ্ছন্ন ছিল অবচেতনর তলে—শিল্পী যখন সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন তখন সেইসব অবচেতন-গুহাশায়িত রূপগুলি মূর্ত হইয়া উঠে। মোটামুটিভাবে বলা হয় যে, এক শ্রেণীর আর্টের সৃষ্টি দৃশ্যমান জগৎ হইতে (Objective); আর এক শ্রেণীর জন্ম হয় মনের গহনে, অদৃশ্য লীলাক্ষেত্রে (Subjective)।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবির উৎপত্তি এই দুই ধারার বাহিরে। তাঁহার লেখার উপর কাটাকুটি করিতে করিতে একটা রূপ গড়িয়া উঠে—সে ছবি আঁকার কোনো উদ্দেশ্য বা purpose নাই, অর্থাৎ একটা কিছু গড়িবার সংকল্প লইয়া তাহার পত্তন হয় নাই—অথবা চেতনমনের কাছে কোনো সংকল্পই অজ্ঞাত। রেখার টানে তুলির লেপনে রঙের বিস্তারে রূপ হইতে রূপান্তরে চলে তাঁহার চিত্র—তারপর এমন একটা স্থানে আসিয়া সে দাঁড়ায়, যখন তাহাকে আর নূতন রেখা বা রঙের দ্বারা স্পর্শ করা যায় না—সে যেন গানের সঙ্গে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া শিল্পীর মানসনয়নে প্রাণবন্ত হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছবির ইতিহাস এই; তবে ইহা ছাড়াও তিনি বহু রকমের পরীক্ষা করিয়াছেন—কখনো কোনো বিলাতী ছবি দেখিয়া, কখনো কোনো মানুষের মুখ দেখিয়া, কখনো কোনো ফুল বা গাছ দেখিয়া—নিজের টেকনিকে রূপায়িত করিয়াছেন। কবি তাঁহার চিত্র সম্বন্ধে এক পত্রে লিখিতেছেন, 'আমাদের দেশের সঙ্গে আমার চিত্র-ভারতীর সম্বন্ধ নেই বলে মনে হয়। কবিতা যখন লিখি তখন বাংলার বাণীর সঙ্গে তার ভাবের যোগ আপনি জেগে ওঠে। ছবি যখন আঁকি তখন রেখা বলো রং বলো কোনো বিশেষ প্রদেশের পরিচয় নিয়ে আসে না। অতএব এ জিনিসটা যারা পছন্দ করে তাদেরই। আমি বাঙালি বলে এটা আপন হতেই বাঙালির জিনিস নয়। এইজন্যে স্বতঃই এই ছবিগুলিকে পশ্চিমের হাতে দান করেছি। আমার দেশের লোক বোধ হয় একটা জিনিস জানতে পেরেছে যে আমি কোনো বিশেষ জাতের মানুষ নই।'—

(র, জ ৩, পৃ ৩৯৩)।

॥ শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় কবির কর্মক্রম ॥

১৯৩১সালের ৩১-এ জানুয়ারি কবি দেশে ফিরলেন। য়ুরোপ আমেরিকায় উত্তেজনার মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করে এসে এখন কবিচিত্ত 'গীত সুধার তরে' পিপাসিত'। বসন্তকাল এসে গেল। সামনে দোলপূর্ণিমা। সুন্দরের পূজায় নূতন নৈবেদ্য অর্ঘ্য দিতে হবে। ২০-এ ফাল্গুন (১৯৩১) দোলপূর্ণিমার দিনে শান্তিনিকেতনে 'নবীন' নাটকের অভিনয় হলো। এর আগে এই ধরনের ঋতুনাট্য লেখা ও অভিনয় হয়েছে। 'বসন্ত' 'শেষবর্ষণ' 'সুন্দর' ইত্যাদি গীতিনাট্যে রাজা, সভাকবি প্রভৃতির সংলাপের মধ্যে কবি গান ও ঋতু-উৎসবের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন। কিন্তু 'নবীন' গীতি-গুচ্ছে সে-ধরনের পাত্রপাত্রী নাই। কবি নিজে রঙ্গমঞ্চের একপাশে বসে কবিতা আবৃত্তি ও গানের ব্যাখ্যা করছেন আর বালিকারা গান ও নৃত্য করছে।—এ হলো এক অননুকরণীয় অনুষ্ঠান।

শান্তিনিকেতনে 'নবীন' উৎসব শেষ হবার পরে স্থির হলো কলকাতায় এর অভিনয় করা হবে। এই সময়ে আরও স্থির হলো, নবীন অভিনয়ের আগে কলকাতার একই রঙ্গমঞ্চে জুজুৎসুর ক্রীড়া প্রদর্শনী হবে।—এই জুজুৎসু-প্রদর্শনীর ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহযোগী হলেন আচার্য নন্দলাল। ঐকান্তিক উৎসাহে বাড়ির ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে গত দু-বছর ধরে তাকাগাকির জুজুৎসুর আখড়া তিনিই টিকিয়ে রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী হয়ে শক্তি ও সুন্দরের মিলনাদর্শে তাঁর ছিল অবিচল নিষ্ঠা। 'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে, আরেক হাতে হার' —কবির এই পঙ্‌ক্তি শিল্পীর মনে গুঞ্জরিত হচ্ছে, বিশেষ করে এই স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে। তাকাগাকির প্রয়োজনায় শান্তিনিকেতনে এই সময়ে একদিকে শক্তির সাধনা, অপর দিকে নন্দলালের সুন্দরের প্রসাধন। ফলে, কবির 'কৃপাণ' ও 'হার'-এর বাণী প্রত্যক্ষ রূপ নিয়ে চলেছে তখন আশ্রম-বিদ্যালয়ে। শান্তিনিকেতনের ছোট্ট পরিবেশে এই রকম মহৎ উদ্যোগ বৃহত্তর সমাজে প্রদর্শিত না হলে এই ত্রয়ীর মনে স্বস্তি মিলছে না। সেইজন্যেই এবারকার কলকাতায়

'নবীন'-উৎসবের সঙ্গে এই প্রদর্শনীর আয়োজন। রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন, —'কবি জানিতেন সৌন্দর্যই শক্তির ভূষণ, সংযমই প্রেমের সম্পদ —তাই এইবার কলিকাতার উৎসবক্ষেত্রে জুজুৎসু ক্রীড়া ও নবীনের নৃত্যগীতের যুগপৎ আয়োজন হইল — দুইটি অনুষ্ঠান যেন পরস্পরের পরিপূরক, সমগ্র জীবনের প্রতীক।' —(র, জ, ৩, পৃ ৩৯৮)।

কলকাতার নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে ১৯৩১ সালের ১৬ই মার্চ জুজুৎসু-ক্রীড়া ও কসরতের প্রদর্শনী হলো। অধ্যাপক তাকাগাকি ও শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা জুজুৎসু ও জুডোর অপরূপ কৌশল দেখালেন। মুদ্রিত প্রোগ্রামে এই অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ রয়েছে। (দ্রষ্টব্য Programme of Jiu jitsu demonstration by Santiniketan boys and girls — New Empire Theatre 6 P. M. 16th March 1931 (5 pages). Printed by Jagadananda Ray at the Santiniketan Press.)

কলকাতার অনুষ্ঠান শুরু হলো —'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।' এই গানটি গাওয়ার পরে ক্রীড়-প্রদর্শনী শুরু হলো। কিন্তু দর্শকের ভিড় হয়নি। কবির বিশেষ আশা ছিল বাঙালী ছেলেমেয়েরা আত্মরক্ষা ও দুর্বৃত্তদমনের এই জাপানী কৌশল আয়ত্ত করবার জন্যে উৎসাহ দেখাবে। তাকাগাকি এক বৎসরের বেশি সময় শান্তিনিকেতনে আছেন। কিন্তু তাঁর বিদ্যা ও কৌশল বাইরের কেউ গ্রহণ করতে এলো না। বিজ্ঞাপন দিয়ে দুটি ঘোষণা করেও সাড়া পাওয়া যায়নি। কবি ভেবেছিলেন, কলকাতায় জুজুৎসুর প্যাঁচ দেখে যুবকেরা আকৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু নাকি সেদিন কোনো মার্কিন ফিল্মস্টার আসছিলেন বলে সমস্ত ভিড় সেখানে ছুটেছিল। যাই হোক, জুজুৎসু দেখবার জন্যে ভিড় হলো না। কিন্তু 'নবীন' অভিনয়ের চারদিনই জনতার অভাব হয়নি।

২১-এ মার্চ নবীনের চতুর্থ দিনের অভিনয় শেষ হলো। এর পরে ছাত্রছাত্রীরা শান্তিনিকেতনে ফিরে এলো। কলকাতায় এই উভয় অনুষ্ঠানে কবির সঙ্গে আচার্য নন্দলালও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। বর্ষশেষ (১৩৩৭) হবার আগেই কবিও শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। মন্দিরে বর্ষশেষ ও নববর্ষে উপাসনা পরিচালনা

করলেন কবি। কিছুদিন আগে কলকাতার আদিব্রাহ্মসমাজমন্দিরে উপাসনা করবার জন্যে ইন্দিরাদেবী কবিকে অনুরোধপত্র দিয়েছিলেন। উত্তরে কবি যা লিখলেন, সে আপাতঅপ্রাসঙ্গিক হলেও কবি-চরিত্র অচিরে বোঝবার জন্যে তাঁর উক্তি উদ্ধার করা গেল, —'একটা পরিবারের কোমরের সঙ্গে টাকার শৃঙ্খলে বাঁধা আদিব্রাহ্মসমাজ একটা প্রকাণ্ড বিড়ম্বনা। ⋯ কেবল শিকলটা ঝম্‌ঝম্‌ করবে। প্রথা জিনিসটা যেখানে সত্যকে বিদ্রূপ করে সেখানে সেই প্রথার মতো লজ্জাজনক ব্যাপার আর কিছু নেই। শান্তি-নিকেতনের ১১ই মাঘের উৎসব করতে আমার একটুও সংকোচ বোধ হয় না কিন্তু আমাদের বাড়িতে অর্থহীন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর আমাকে বড় লজ্জা দেয়।' —সব রকমের আচার-অনুষ্ঠানমূলক প্রতিষ্ঠানের এবং কৃত্যের প্রতি কবি ঐ সময়ে বীতশ্রদ্ধ। লৌকিক হিন্দুধর্ম সম্পর্কেও একই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে আর একখানি পত্রে। আচারনিষ্ঠ কোনো হিন্দু মহিলাকে কবি লিখছেন, —'নির্বিকার নিরঞ্জনের অবমাননা হচ্ছে বলে আমি ঠাকুরঘরের থেকে দূরে থাকি একথা সত্য নয় —মানুষ লাঞ্ছিত হচ্ছে বলেই আমরা নালিশ করি। যে সেবা যে-ভক্তি মানুষের মধ্যে সত্য করে তোলবার সাধনাই হচ্ছে ধর্মসাধনা তাকে আমরা খেলার মধ্যে ফাঁকি দিয়ে মেটাবার চেষ্টায় প্রভূত অপচয় ঘটাচ্ছি। এইজন্যেই আমাদের দেশে ধার্মিকতার দ্বারা মানব অত্যন্ত অবজ্ঞাত।' অর্থাৎ ব্রাহ্ম অথবা হিন্দুসমাজের অর্থহীন আচারনিষ্ঠ গোঁড়া ধার্মিকতার পক্ষপাতী নন কবি। মানবিকতাবোধ তাঁর কাছে সবার উপরে'।

এই বছরে কবির সত্তর বছর বয়স পূর্ণ হলো, জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন চলেছে। শান্তিনিকেতনে ২৫-এ বৈশাখ (১৩৩৮) কবির সত্তর বৎসর-পূর্তি উৎসব সম্পন্ন হলো। আচার্য নন্দলাল এই বছর পঞ্চাশে পা দিলেন। তাঁরও জন্মদিন পালন করবার কথা কবির মনে জেগেছে।

কবির এই জন্মদিনে 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশিত হলো। এই গ্রন্থখানি কবি উৎসর্গ করলেন কলাভবনের অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করকে। ঐ দিনেই সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবাহ হলো রমা বা 'খুকু'র।

॥ শান্তিনিকেতন-আশ্রমে হিন্দুমতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথের বিবাহ, ১৯৩১ ॥

এই বিষয়ে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বলেন (১৬-১২-১৯৬৬), – 'গুরুদেবের বন্ধু ছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। তাঁর পুত্র হলেন দু-জন। আর কন্যা পাঁচজন। আমার বিয়ের সময়ে তিন কন্যা জীবিত ছিলেন। আমার বড় শ্যালক সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু হয়েছিল ১৯২৬সালে। আমার বিধবা শাশুড়ী-ঠাকুরণ তাঁর ছোট দুই মেয়ের বিবাহ দিয়েছিলেন স্বজাতি বৈদ্যবংশে। শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত আর শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ গুপ্ত হলেন আমার ন' আর ছোট ভায়রা। তাঁর তৃতীয় কন্যা হলেন রমা বা রাণী। ওরা বৈদ্য, আমরা কায়স্থ। পরস্পরের অনুরাগবশতঃ আমাদের বিবাহ হয়। কিন্তু সেকালে বৈদ্যের সঙ্গে কায়স্থের বিবাহ সমাজে চল হয়নি। সেজন্যে রমার কায়স্থ-প্রীতিতে তাঁর মা অত্যন্ত মনঃকষ্টে ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর ভয় হলো সমাজে নিগৃহীত হবার। কিন্তু, গুরুদেব আমাদের এই অনুরাগ ও বিবাহে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। এবং রমার মাকে যুক্তি দেখিয়ে তিনি বহু পত্র লিখেছিলেন। সে পত্রাবলীর অনুসন্ধান ও মুদ্রণ আবশ্যক। শান্তিনিকেতনে শাস্ত্রী মহাশয় আর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী মহাশয়দের আপত্তি হলো। কিন্তু, গুরুদেব অসবর্ণ বিবাহ বিশেষ যুক্তি দেখিয়ে সমর্থন করলেন। নন্দদা'—আচার্য নন্দলালের এই বিবাহে পূর্ণ সম্মতি ছিল। তিনি উদ্যোগ করতে লাগলেন। তবে আসল ঘটকালি করেছিলেন গুরুদেব স্বয়ং।

'১৩৩৮সালের ২৫-এ বৈশাখ (১৯৩৮) কবির জন্মদিনে আমাদের বিবাহের দিন স্থির হলো। কবি সবে রাশিয়া থেকে ফিরেছেন। আমাকে ও নন্দদাকে মুখ্যতঃ লেখা পত্রধারাই তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'। এই বইটি ঐদিনে তিনি আমাকে 'আশীর্বাদ' করে উৎসর্গ করলেন, বোধহয় শ্রেণীহীন অসবর্ণ বিয়ের এই দিনটিকে স্মরণীয় করবার জন্যে।'—সদ্য-রাশিয়া-ফেরত কবির পক্ষে শ্রীসুরেন্দ্রনাথকে 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থ উৎসর্গের এই উপহার তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার।

'কলাভবন-বাড়ি 'নন্দনে'র পশ্চিম দিকে মাটির বাড়িগুলি হলো কলা-

ভুবন-হস্টেল। 'নন্দন' থেকে পশ্চিমে কুয়োর দিকে যেতে বাঁ-হাতি লম্বা-মতন খড়ে-ছাওয়া মাটির বাড়িটিতে বিয়ের আসর করা হলো। সব ব্যবস্থা গুরুদেব করলেন। আমি তখন থাকতুম 'সন্তোষকুটির কিংবা 'মোহিত-কুটিরে'। নতুনদা থাকতেন গুরুপল্লীতে 'দাদার বাড়ি'তে। নতুনদার গুরুপল্লীর বাড়ি থেকেই আমি বিবাহ করতে এলুম। বেশি বয়সে বিবাহ। জাঁক কিছু হয়নি। গুরুদেব নতুনদার বাড়িতে তাঁর মোটর পাঠিয়ে দিলেন। বৌদি তখন অসুস্থ ছিলেন। সেই অবস্থায় একা তিনিই বরযাত্রী হয়ে এক-মোটরে এসে আমাকে বিবাহসভায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

'বিবাহে হিন্দু আচার সবই মানা হলো। রেজিস্টার্ড বিয়ে তো নয়। সেইজন্যে শাশুড়ী ঠাকরুণের ইচ্ছা পূরণ করে যাবতীয় 'পৌত্তলিক' অনুষ্ঠানই করা হয়েছিল। গুরুদেব আমাদের সুজিতকে পুরোহিত ঠিক করলেন। গোয়ালপাড়া থেকে শালগ্রাম-শিলা আনা হলো।

'গুরুদেব বধূকে একটি কাঁকণ, সোনার কণ্ঠহার আর একখানি শাড়ী উপহার দিলেন। আর দিলেন তাঁর সদ্য-প্রকাশিত বই 'গীতবিতান' স্বাক্ষর করে। দিনুবাবু দিলেন গানের খাতা—কবিতা লিখে। নতুনদা দিলেন ছবি উপহার।

'আমার নামের সঙ্গে মিল করে গুরুদেব 'রমা'কে করলেন 'সুষমা'। 'পরিশেষ' গ্রন্থে এই কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবিতাটি পড়লে আপনারা বুঝতে পারবেন, আমাদের এই বিবাহ ব্যাপারে তাঁর অন্তরের কী গভীর দরদ ও সমর্থন রয়েছে। কবিতাটি হলো এই,—

পরিণয়

সুষমা ও সুরেন্দ্রনাথ কর-এর বিবাহ উপলক্ষ্যে :—

ছিল চিত্রকল্পনায়, এতকাল ছিল গানে গানে,
সেই অপরূপ এল রূপ ধরি তোমাদের প্রাণে।
আনন্দের দিব্যমূর্তি সে-যে,
দীপ্ত বীরতেজে
উত্তরিয়া বিঘ্ন যত দূর করি ভীতি
তোমাদের প্রাঙ্গণেতে হাঁক দিল, 'এসেছি অতিথি।'
জ্বালোগো মঙ্গলদীপ, করো অর্ঘ্য দান

তনু মনপ্রাণ।
ওযে সুরভবনের রমার কমলবনবাসী,
মর্ত্যে নেমে বাজাইল সাহানায় নন্দনের বাঁশি।
ধরার ধূলির পরে
মিশাইল কী আদরে
পারিজাতরেণু।
মানবগৃহের দৈন্যে অমরাবতীর কল্পধেনু
অলক্ষ্য অমৃতরস দান করে
অন্তরে অন্তরে।
এল প্রেম চিরন্তন, দিল দোঁহে আনি
রবিকরদীপ্ত আশীর্বাণী।
২৫ বৈশাখ ১৩৩৮
[শান্তিনিকেতন]

'পর্বতপ্রমাণ সাম্প্রদায়িক বিঘ্ন এবং অন্তহীন সামাজিক 'ভীতি' অতিক্রম করে গুরুদেব নিরাপদে আমাদের জীবনকে সহজ করে দিলেন। আজ এই পরিণত বয়সে তাঁর মহত্ত্বের কথা স্মরণ করে আমার চোখ জলে ভরে আসে।

'যতক্ষণ বিবাহের অনুষ্ঠান চল্‌ল গুরুদেব প্রায় শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন কন্যাকর্তা হিসাবে। আমাদের সবাইকে তিনি সাহস দিতে লাগলেন বরাবর। বিবাহ-কৃত্য শেষ হলো। পরদিন প্রতিমাদেবী উত্তরায়ণে নেমন্তন্ন করে বৌভাত খাওয়ালেন। আশ্রমে জলের অভাবে তখন ১লা বৈশাখ ছুটি হয়ে যেত। ২৫-এ বৈশাখ সেইজন্যে লোকও বেশি ছিল না।

'রমাকে গুরুদেবের দেওয়া সেই আশীর্বাদী কণ্ঠহার আমি এখন আমার পুত্রবধূকে দান করেছি। রাশিয়া থেকে আমাকে লেখা গুরুদেবের মূল চিঠিগুলি রামানন্দবাবু আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে প্রবাসীতে ছেপে আমাকে ফেরত দিলেন। দিনুবাবুর গানের খাতাখানি দিল্লীতে মাইক্রোফিল্ম্‌ করা হয়েছে। আর আমাদের পুলিনও কিছু কিছু নিয়েছিলেন।

'কলাভবনে এখন যেখানে ক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌ ডিপার্ট্‌মেন্ট্‌ ঐ ঘরে আমাদের সংসার পাতা হলো। রান্নাঘর, খাবার ঘর, শোবার ঘর, বসার ঘর, নুটুর

গানের ঘর সব ঐখানেই। মেয়েরা গান শিখতে আসতো নুটুর কাছে। সাবিত্রী, গীতা —ওরা সব আসতো গান শিখতে। আমাদের বিবাহ-অনুষ্ঠানেও ওরা সব উদ্যোগ আয়োজনের কাজ করেছিল। রমা তখন আশ্রম-বিদ্যালয়ে গান শেখাতেন। গানে তাঁর খুব নাম হয়েছিল। পরে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সুমিতের আর কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সুকীর্তির জন্ম হলো। —ওদের নামকরণ করেছিলেন গুরুদেব। সামান্য ক-বছর গৃহস্থালি করার পরে রমার মৃত্যু হলো অসুখে ভুগে।

'—এই হলো আমার হিন্দুমতে বিবাহের আর গৃহস্থালির প্রকৃত বিবরণ। (রবীন্দ্রজীবনীকার) প্রভাতবাবু বিদ্বেষবশতঃ দিনকে রাত বানিয়ে ছেড়েছেন তাঁর বই-এ আমাদের বিবাহের বিবরণ দিতে গিয়ে। আমি নিজে তাঁর বিবরণের মৌলিক প্রতিবাদ করছি (১৪-১২-১৯৬৬)।

॥ এই বিবাহের পুরোহিত শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি, ১৩৭১ ॥

পরমতের প্রতি শ্রদ্ধা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সন্তান রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। তাই বিশ্বভারতীর প্রত্যেক কর্মী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য পূর্ণভাবে উপভোগ করেন। এ পৃথিবীর অন্যত্র দুর্লভ।

পরমতসহিষ্ণু রবীন্দ্রনাথের বিশাল, কোমল, প্রেমপূর্ণ-হৃদয়ের পরিচয়-স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করি :—

রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বিধবা-পত্নী সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বাস করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শান্তিনিকেতনের আদর্শ শিক্ষক সন্তোষ চন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর তিনটি ভগ্নী অবিবাহিতা। প্রথম রমা (নুটু) সুললিতকণ্ঠী, রবীন্দ্রসঙ্গীতে পারদর্শী, রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় ছাত্রী।

রমা তখন সঙ্গীতভবনের শিক্ষয়িত্রী হয়েছেন। তাঁরই উদ্যোগে তাঁর কনিষ্ঠা দুই ভগিনীর বিবাহ হলো। তারপর নিজের বিবাহ। বিবাহ স্বজাতির মধ্যে নয় —তাই তাঁর মাতা অত্যন্ত ব্যথিতা। তথাপি তিনি কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবেন না। কন্যাকে তিনি সুখী দেখতে চান। তবে তাঁর একমাত্র ইচ্ছা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পৌরোহিত্যে, হিন্দুমতে কন্যার

বিবাহ হোক্।

জাতিভেদ প্রথার ঘোর বিরোধী রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু পুরোহিত পাওয়া গেল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুপত্নী 'নুটুর মার' ইচ্ছা পূরণ করতে না পেরে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন —একথা আশ্রমের সর্বত্র আলোচিত হচ্ছিল। আমি তখন (১৯৩১) বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের (গবেষণা বিভাগের) ছাত্র। বন্ধুদের মধ্যে নেহাত পরিহাস ছলে বলেছিলাম —'ভারি তো এক কাজ! এতো আমিই সেরে দিতে পারি।' কথাটা কেমন করে রবীন্দ্রনাথের কানে যায়। তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। উত্তরায়ণের (উদয়ন গৃহে) উপর তলায় শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রাতরাশে বসেছেন।

আমি যেতেই বল্লেন —'তোকে নুটুর বিয়ে দিতে হবে।'

আমি স্তম্ভিত। নুটু আমার দিদির বয়সী। যাঁর সঙ্গে বিবাহ, তিনি আমার অধ্যাপক, তাঁদের বিবাহে, আমার মত অর্বাচীন পৌরোহিত্য করবে এওকি সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত গম্ভীর। ব্যথিত স্বরে বলে চললেন 'নুটুর মা জীবনে অনেক দুঃখই পেয়েছেন। শেষ বয়সে আবার এমন এক আঘাত পেলেন। তাঁর মানসিক অবস্থা আম বেশ অনুভব করতে পারছি। আমি অনেক চেষ্টা করলুম, ব্রাহ্মণ পুরোহিত পাওয়া গেল না। তুই এই কাজ কর। তোর ভাল হবে।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় বললেন —'নুটু তোর সঙ্গে পড়েচে। তোর বন্ধু। তাকে সাহায্য করবি নে।'

তাঁর কথায় আমিও ব্যথিত হলাম —'কিন্তু আমি কি পারবো? কখনো যে একাজ করিনি।'

তিনি বল্লেন —'তার জন্যে ভাবিস্‌নে। ক্ষিতিমোহনবাবু সব ঠিক করে দেবেন।'

শুভদিনে, শুভলগ্নে (২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮ সাল), শালগ্রাম শিলা সাক্ষী রেখে, হোম করে' হিন্দুমতে, হিন্দু পদ্ধতিতে, যথারীতি রমার বিবাহ হলো। জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী রবীন্দ্রনাথ,

সেই বিবাহবাসরে শ্রদ্ধাভরে উপবিষ্ট ছিলেন। দীর্ঘপদ্ধতির শেষের দিকে, রাত্রি অধিক হওয়ায়, পুরোহিতের অনুমতি দিয়ে তিনি গৃহে ফিরে যান।' —(সন্তুয়, শ্রাবণ-আশ্বিন, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৭১, পৃ ১৩-১৪)।

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় আরও বলেন, —'বিয়ের পরদিন সকালে আমি গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। দেখি, তিনি গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখামাত্র গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠলেন, —'দ্যাখ্, কাল ওরা হেসেছিল। বিয়ের মতন এতো বড়ো একটা অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য ওরা বুঝলেনা। আমি যদি নন্দিতার বিয়ে দি, এই বর্বরের জায়গায় কিছুতেই দেবো না'।

॥ এই ঘটনা উপলক্ষে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি ॥

রবীন্দ্রজীবনীর তৃতীয় খণ্ডে (১৩৬৮) পৃ ৪০১-২ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ঘটনার বর্ণনা এইভাবে করেছেন। —'কবির এই জন্মদিনে (২৫-এ বৈশাখ, ১৩৩৮) 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ করকে উৎসর্গিত হয়। ঐ দিন সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় রমা বা নুটুর সহিত। রমা—সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ভগ্নী, আশৈশব আশ্রমে লালিত; তারপর দিনেন্দ্রনাথ ও ভীমরাও হসুরকারের নিকট সংগীতশিক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ে সংগীতশিক্ষিকার কার্যে নিযুক্ত। সুরেন্দ্রনাথ কায়স্থ, রমা বৈদ্য—সুতরাং বিবাহ অসবর্ণ এবং তখনকার আইন ও সনাতন হিন্দুদের মতে অবৈধ। এই তর্কটা তোলেন কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ এই জাতভাঙা বিবাহকে কীভাবে দেখিতেন, তাহা অধ্যাপক অধিকারীকে লিখিত পত্র হইতে জানিতে পারি। বিবাহের কয়েকদিন পূর্বে (২০ বৈশাখ ১৩৩৮) কবি লিখলেন, 'সুরেন মানুষ হিসাবে অধিকাংশ সৎকুলীনের চেয়ে বুদ্ধিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন, তথাপি নুটুকে তার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও অনুরাগ সংযত করতেই হবে অর্থাৎ বিনা কারণে নিজের ও সুরেনের ধর্মসঙ্গত ইচ্ছাকেই অপমানিত করতে হবে এটা হিন্দু সমাজসম্মত তা মানি, কিন্তু শ্রেয়স্কর তা কিছুতেই মানিনে। সামাজিক অসতীত্ব ও স্বাভাবিক অসতীত্বের

মধ্যে প্রভেদ আছে—নুট্‌ সমাজ নির্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করার দ্বারা মনে মনে অশুচি হলেও সমাজ সেই নিষ্ঠুর বীভৎসতাকে প্রশ্রয় দেয়—এটা একটা তথ্যমাত্র, কিন্তু এটাকে শ্রেয় বলব কি করে? সংস্কারের দোহাই দাও, সামাজিক অসুবিধার দোহাই দাও তার কোন উত্তর নেই, কিন্তু শ্রেয়ের দোহাই দিলে কেমন করে মেনে নেব? অত্যাচারের অস্ত্র সমাজের হাতে, বিধাতৃবিহিত মানবধর্মকে অন্যায় নিপীড়ন করবার শক্তি আছে সমাজের, অক্ষমতাবশত সমাজের অযৌক্তিক অস্বাস্থ্যকর বিধান মেনে নিতে পারি, কিন্তু সমাজ-কর্তৃক অনুমোদিত মূঢ়তা ও অধর্মকে শ্রেয় বলে মানতে পারব না।'

যে বিবাহকে কবি এভাবে সমর্থন করিলেন, সেই বিবাহ যখন নন্দলাল বসু প্রমুখ আশ্রমমুখ্যরা কলাভবন-গৃহে অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন—তখন তিনি বিরক্ত হইয়া বাধা দান করিলেন। তিনি বলিয়া পাঠান বিশ্ব-ভারতীর পাবলিক ঘরগুলিতে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান হইতে পারেনা।

বিবাহ হিন্দুমতে শালগ্রামশিলাদি আনিয়া নিষ্পন্ন হইতেছিল বলিয়া এই নিষেধ জারি করেন। বিবাহ অন্যস্থানে হইল।'

—শান্তিনিকেতনে শ্রীসুরেন্দ্রনাথের হিন্দুমতে বিবাহ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার যা লিখেছেন সে উদ্ধার করা হলো। এইসঙ্গে স্বয়ং পাত্রবর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের এবং অনুষ্ঠানের পুরোহিত শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৌখিক ও লিখিত মন্তব্যও সংকলন করে দেওয়া গেল। রবীন্দ্রজীবনীর মতো ঐতিহাসিক গ্রন্থে প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিকের সত্যনিষ্ঠাই প্রত্যাশিত। ধর্মান্ধতার ঘূর্ণিপাকে সত্য ঘোলা হয়ে নির্ভেজাল মিথ্যার কুয়াশা পাঠকের চোখকে অনাবশ্যক আবিল করলে, সে দুঃখের কথা। রবীন্দ্রনাথের সর্বত্রগামী সহানুভূতি ও সৌন্দর্যবোধের ঔদার্যকে এইভাবে ধর্মবিশ্বাসের মরচে-ধরা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরে রবীন্দ্রজীবনীকার সম্ভবতঃ আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকবেন, কিন্তু এই অতথ্য পরিবেশন করে তিনি মহাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের যথাযথ সীমানা নির্ণয়ে যে অনাবশ্যক 'নিষেধ জারি' করে রেখেছেন, অবিলম্বে তা রদ হওয়া দরকার। কারণ, কালবিলম্বে এইরূপ অসংবদ্ধ ও অসত্য বিবৃতি সত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে।—

অভ্যাসমতো আচার্য নন্দলাল কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ১৯৩০ সালে ৭ই পৌষ-এর পরে শিক্ষাভ্রমণে গেলেন রাজগীরে নালন্দায়। ১৯৩১

সালেও গরমের ছুটিতে গিয়েছিলেন রাজগীরে। বিহার তাঁর জন্মভূমি। রাজগীর-নালন্দায় তাঁর প্রাণের টান।

এর আগে ১৯৩০ সালে কাশীতে তাঁর পিসিমার মৃত্যু হলো। নন্দলাল মৃত্যুশয্যায় মাতৃসমা পিসিমাকে দেখতে পাননি। রামকৃষ্ণ-মিশনের মহারাজরা পিসিমার শেষকৃত্য করেছিলেন। নন্দলাল এই সময়ে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন কলাভবনের ছাত্র হীরেন ঘোষকে। সে-বিবরণ আমরা বিশদভাবে পূর্বে দিয়েছি।

১৯৩০ সালে শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বই বাঁধাবার জন্যে নন্দলাল বাটিকের ডিজাইন করলেন ৫৩ খানা। কবির 'সহজ পাঠ' গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ নন্দলালের চিত্রভূষিত হয়ে প্রকাশিত হলো। এই গ্রন্থের উপস্বত্ব দেওয়া হলো কলাভবনে। উপস্বত্বের এই টাকা নন্দলাল ব্যয় করতে লাগলেন গ্রাম থেকে কারুশিল্পী আনার জন্যে।

১৯৩১সালে নন্দলালের বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হলো। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে তাঁকে আশীর্বাদ জানালেন। বৈশাখ মাসে শ্রীসুরেন্দ্রনাথের বিবাহ হলো। এই বছরেই আচার্য নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাঁচী দেখতে গেলেন। সে-বিবরণ যথাসময় দেওয়া হবে।

॥ আচার্য নন্দলালের অঙ্কিত চিত্রপঞ্জী, ১৯২৬-৩০ ॥

১৯২৬ : উত্তরা, স্বপ্নের ভুল, সাঁওতাল মা তার ছেলেকে তেল মাখাচ্ছে, গুরু অবনীন্দ্রনাথ, কুণাল ও কাঞ্চনমালা, মোরগ, সপ্তমাতৃকা, গঙ্গা যমুনা, সঙ্ঘমিত্রা, শ্রীচৈতন্যের পুঁথিলিখন, কুণাল ও কাঞ্চনমালা, কেন্দুলির মেলা

১৯২৭ : নটীর পূজা, সবুজ তারা, পাইন গাছ, শালগাছের আড়ালে বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, প্রত্যাবর্তন (সাঁওতাল দম্পতির)

১৯২৮ : নেপালী ভাস্কর, ঝড়ে (তিনটি মেয়ে), বৃহন্নলা, দীনবন্ধু এ্যাণ্ড্রুজের প্রতিকৃতি, গোপিনী, শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব, কনের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা, কৃষ্ণচূড়া ফুল, ভেড়াকাঁধে বুদ্ধ (তৃতীয় অঙ্কন), শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসবের দেওয়ালচিত্রের খসড়া, বৃক্ষরোপণ উৎসবের

শোভাযাত্রা

১৯২৯ : যোগমূর্তি কাঞ্চনজঙ্ঘা, গুরুপল্লী, শাল ও বনপুলক গাছ, নয়নতারা ফুল, জানালা, লোকগাথা, খেলা, কার্সিয়াং-এর পার্বত্য দৃশ্যের দ্বাদশ চিত্র, নটীর পূজা, শ্রীচৈতন্যের ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা, গাছের আড়ালে মেয়ে

১৯৩০ : ডাণ্ডিমার্চ, কুরুপাণ্ডবের পাশাখেলা, ডাণ্ডিমার্চ।

॥ চিত্র-পরিচয় ॥

১৯২৬ : **উত্তরা**—ওয়শ।

স্বপ্নের ভুল—৯"×৮", কার্টিজ পেপার, ওয়শ।

সাঁওতাল মা তার ছেলেকে তেল মাখাচ্ছে, ওয়শ।

গুরু অবনীন্দ্রনাথ—১২"×৭¾", টেম্পেরা (আগে দেখুন)।

কুণাল ও কাঞ্চনমালা—১৩"×৮", সাদা কাগজ, পেন্সিলে আঁকা কার্টুন, নিজসংগ্রহ। অন্ধ কুণাল একটি কীর্তিস্তম্ভের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে তাঁর স্ত্রী কাঞ্চনমালা বসে আছেন। সামনে শহর দেখা যাচ্ছে পাটলিপুত্র। উৎসব হচ্ছে বুদ্ধপূর্ণিমায়। দীপমালা জ্বালা রয়েছে শহরে। এই ছবিটি রং-এ করা হয়েছে। চীনুভাই (আহমেদাবাদ) কিনেছেন। তাঁর কাছে ছবিখানি আছে।

সাঁওতাল হরি অন্ধের আভাসে করা (আগে দেখুন)।

মোরগ—১৭½"×৯½", টেম্পেরা, কাঠের ওপর। চিত্রাধিকারী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। লাল ঝুঁটিওলা লেগহর্ণ মোরগ, ছাই রঙের ব্যাকগ্রাউণ্ড।

সপ্তমাতৃকা—কাঠের ওপর, টেম্পেরা। বাঁ-দিক থেকে ১। হরিণ ২। ঘোড়া ৩। বেড়াল ৪। মানুষ ৫। কুকুর ৬। হাতি ৭। গরু।

গঙ্গাযমুনা—৩২"×১৩", রেখাঙ্কন, কালিতুলির কাজ, কার্টিজ পেপার। মূল্য ২৫০ টাকা। নিজসংগ্রহ। দেবীমূর্তি।

সঙ্ঘমিত্রা—৬৮½"×২৮½", সিল্কের ওপর, গেরির রেখাঙ্কন। কস্তুরবা কিনেছিলেন। হাসেগাওয়ার মাধ্যমে জাপান থেকে জাপানী পদ্ধতিতে (মাকিমনো) বাঁধানো হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্যের পুঁথিলিখন—৩৩"×২১", রেখাঙ্কন, ওয়শলি, নিজসংগ্রহ। একটি মেয়ে সিল্কের ওপর সূচের কাজ করবেন বলে এঁকেছিলুম। প্রথমে কার্টিজ পেপারের ওপর করা হয়। ক্ষিতিবাবু একখানা বই লিখেছিলেন, তার মলাটে ছবিটি ছাপা হয়েছে।

কুণাল ও কাঞ্চনমালা—১৩"×৮", পেন্সিল ড্রয়িং (আগে দেখুন)।

কেন্দুলির মেলা—১৫"×১০", সাদা কাগজ, পেন্সিল ড্রয়িং-এ কার্টুন, নিজসংগ্রহে আছে। কেন্দুলির মেলাতে বটগাছের নিচে বাউলেরা শুয়ে আছে। মাঝখান দিয়ে পথ। প্রদীপ জ্বেলে কেউ খাচ্ছে; কেউ গান করছে। বাজারের দৃশ্য।

মূল ছবিটা চেট্টি মুদালিয়র কিনেছেন। সেটা কালিতুলির কাজ, কার্টিজ পেপারের ওপর। পাতলা রং-এ (ইংক) আঁকা।

১৯২৭ : **নটীর পূজা**—৬৩"×৩৪". ওয়শ, টেম্পেরা, 'মাউন্‌টেড্ খদ্দর, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর কিনেছেন। গুরুদেবের 'নটীর পূজা' বই-এর আইডিয়া থেকে করা। গৌরী নেচেছিল।'

সবুজ তারা—টেম্পেরা।

পাইন গাছ—কালিতে টাচের কাজ।

শালগাছের আড়ালে বুদ্ধ—রুপালী কাগজে কিছু রং দিয়ে করা। টেম্পেরা। ছবিটি এলম্‌হার্স্ট সাহেবকে উপহার দিয়েছিলুম।

শ্রীচৈতন্য—লাইন ড্রয়িং।

প্রত্যাবর্তন (সাঁওতাল দম্পতির) ৮১"×৪৭½", পেন্সিল ড্রয়িং, কার্টিজ পেপার। 'প্রশান্ত মহলানবিশ কিনেছেন। গৌরীর বিয়ের সময়ে আঁকা হয়েছিল। প্রশান্তবাবু কেনার পরে, তিনি ছবিটির পাশে গুরুদেবকে দিয়ে পরিচায়ক কবিতা লিখিয়ে নিয়েছিলেন।'

১৯২৮ : **নেপালী ভাস্কর**—ওয়শ।

ঝড়ে (তিনটি মেয়ে)—২৪½"×১৩", ওয়শ, মাউন্টেড ওয়াশলির ওপর জাপানী কাগজ। চিত্রাধিকারিণী গৌরী ভঞ্জ। আশ্রমের ক-টি মেয়ে জলঝড়ের মধ্যে ভিজছে।

বৃহন্নলা—আ ৪২"×২৪", টেম্পেরা, মাউন্টেড্ নেপালী পেপার, টেম্পেরা। শ্রীমতী ঠাকুর কিনেছেন। বিরাটরাজার বাড়িতে

রাজকন্যা উত্তরাকে বৃহন্নলা নাচ দেখাচ্ছেন।

দীনবন্ধু এ্যাণ্ড্রুজের প্রতিকৃতি —২০½"×১৫¾", ওয়শ, কার্টিজ পেপার, কলাভবন-ম্যুজিয়মে আছে। 'এ্যাণ্ড্রুজের ক্রীশ্চান বন্ধু রুদ্র এলাহাবাদে থাকতেন। তিনি এ্যাণ্ড্রুজকে তাঁর একখানা পোর্ট্রেট চান। উনি আমাকে ও অসিতকে করতে বললেন। রুদ্র ৫০০ টাকা দেবেন বলেছিলেন। শেষে এ্যাণ্ড্রুজ আমার করা পোর্ট্রেটখানাই পছন্দ করে ৫০০ টাকা দিয়েছিলেন। তবে ছবিটা নেননি।'

গোপিনী —ওয়শ।

গোয়ালিনী (?) —১১½"×৮", ওয়শ, কার্টিজ পেপার, ওয়াটার কালার। 'কালিদাস নাগের স্ত্রী শান্তা নাগের কাছে আছে। মাথায় কলসী নিয়ে যাচ্ছে। রাঁচিতে বেড়াতে গিয়ে ঐরকম গোয়ালিনী দেখেছিলুম দুধ নিয়ে যাচ্ছে'।

শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব —শ্রীনিকেতনে ফ্রেস্কো (আগে দেখুন)।

কনের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা —৬½" × ৪½", টেম্পেরা, 'আমার ছাত্র রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিবাহে উপহার দিয়েছিলুম'।

কৃষ্ণচূড়া ফুল —২৪½" × ১৩½" রঙে টাচের কাজ, মূল্য ২০০ টাকা। নিজসংগ্রহ। 'সোসাইটির ক্যাটালগে (১৯২৫) আর কলকাতার exhibition-এর লিস্টে তারিখ নিয়ে গোলযোগ আছে।'

ভেড়া কাঁধে বুদ্ধ (তৃতীয় অঙ্কন) —১৩"×৭½", গেরির লাইনে আঁকা। কলাভবন-ম্যুজিয়ম। ১৯"×১২", নেপালী পেপার, লাইনে করা, নিজসংগ্রহে আছে। 'রাজগীরে বিম্বিসারের যজ্ঞে ভেড়ার দলের মধ্যে একটা খোঁড়া বাচ্চাভেড়াকে কাঁধে নিয়ে বুদ্ধ যজ্ঞে গেলেন ও ফিরিয়ে নিয়ে এলেন'।

শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ-উৎসবের দেওয়াল-চিত্রের খসড়া —
(আগে দেখুন)।

বৃক্ষরোপণ উৎসবের শোভাযাত্রা —১২"×৪½", কাঠ-খোদাই-এর কাজ।

১৯২৯ : **যোগমূর্তি কাঞ্চনজঙ্ঘা** —১২"×৬", পাতলা সাধারণ কাগজ, ওয়শ,
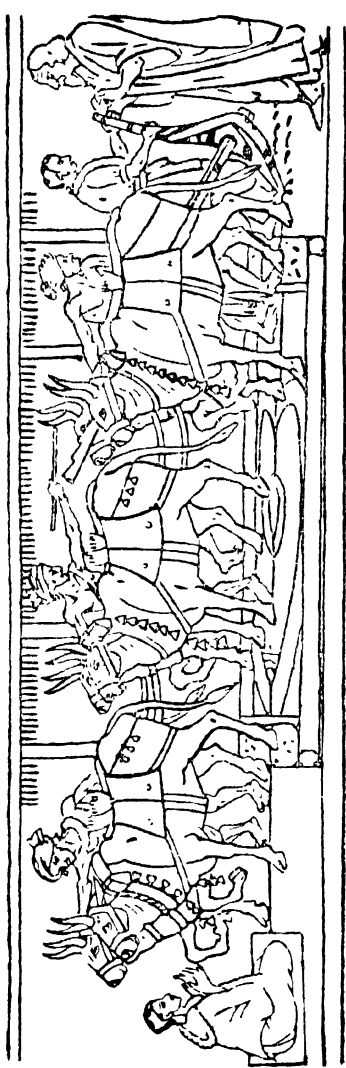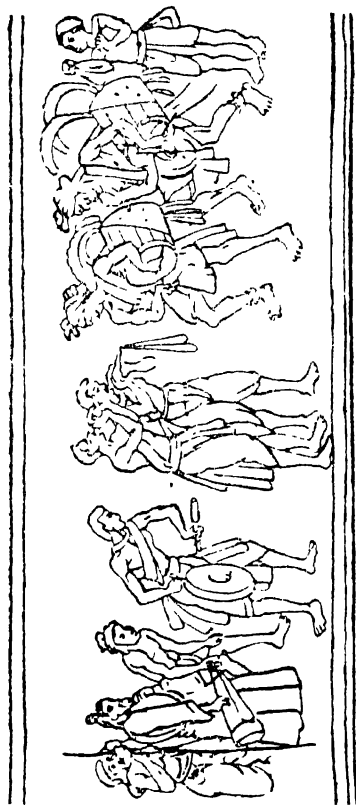
'চিত্রাধিকারী হলেন রামকৃষ্ণ-মিশনের স্বামী নির্বেদানন্দজী। যোগমূর্তি গিরীশ। কার্সিয়ং-এ গিয়ে এঁকেছিলুম।'

গুরুপল্লী—ওয়শ, 'চেট্টি মুদালিয়র কিনেছিলেন। বাড়িগুলিতে খড়ের চাল ও পাশে বাঁশের ঝাড়'।

শাল ও বনপুলক গাছ—টেম্পেরা।

নয়নতারা ফুল—কাঠের ওপর, এগ্ টেম্পেরা।

জানালা—কাঠের ওপর, এগ্ টেম্পেরা।

লোকগাথা—১২"×৭", রং-এ টাচের কাজ।

খেলা—'রং-এ টাচের কাজ। নেপালী পেপার, লাইনে তুলিকালির কাজ। জামগাছে উঠে ছেলেরা খেলা করছে। পি. হরিহরণের সংগ্রহে আছে'।

কার্সিয়ং-এর পার্বত্যদৃশ্যের দ্বাদশ চিত্র—কালিতুলিতে টাচের কাজ। নেপালী কাগজ। নিজসংগ্রহ।

নটীর পূজা—৭"×৫½", লাইন ড্রয়িং, পাতলা ওয়াটম্যান কাগজের ওপর, লাল গেরিতে লাইনে আঁকা। কমলা চট্টোপাধ্যায় কিনে-ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের ন্যায়-অধ্যাপনা—৮"×৫½", লাইন ড্রয়িং, মূল্য ১০০ টাকা।

গাছের আড়ালে মেয়ে—কাঠখোদাই, রঙ্গিন। রথীন্দ্রনাথের সংগ্রহে আছে।

১৯৩০ **: ডাণ্ডিমার্চ :** ১৫½"×৯¾", টেম্পেরা।

কুরুপাণ্ডবের পাশাখেলা—১৪"×৯" বা ১০", টেম্পেরা, কাঠের ওপর। 'চিত্রাধিকারী হলেন মিস্টার খণ্ডেলওয়ালা। পাশা খেলছে। একদিকে যে দানগুলো জিতেছে সেগুলো রাখা আছে আর অন্যদিক থেকে পাশা নিয়ে আসছে। পাঁচভাই রেগে বসে আছে। শকুনির চেহারাটা আফগানিস্থানের লোকদের মতন'।

ডাণ্ডিমার্চ—লিনোকাট্ ব্ল্যাক এ্যাণ্ড হোয়াইট প্রিণ্ট। লবণ আইন-অমান্য-আন্দোলনের সময়ে আঁকা। 'এই অরিজিন্যাল থেকে কলাভবনে 'নন্দন'-বাড়ির দেওয়ালে স্টাক-ওয়ার্ক করা হয়েছে।'—

॥ পঞ্চাশে পরিবেশ ॥

১৯৩১ সালে শিল্পাচার্য নন্দলালের বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হলো। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে তাঁকে 'আশীর্বাদ' জানালেন —এ হলো পঞ্চাশ বছরের কিশোর-গুণী অর্থাৎ নিত্যকিশোর শিল্পীকে সত্তর বছর বয়সের প্রবীণ যুবা অর্থাৎ নিত্যযুবক কবির আশীর্বাদ; বিধাতার সমধর্মী শিল্পস্রষ্টা নন্দলালের প্রতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্বতঃ-উৎসারিত প্রশস্তি। স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আদর্শ ভারতশিল্পী নন্দলালের শিল্পপথের পথিক-শিষ্য —এ-কথা তিনি অকপটেই প্রকাশ করলেন। রবীন্দ্রনাথ কয়েক বছর আগে থেকে ছবি আঁকতে শুরু করেছেন।

এই বছরে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের বিবাহ হলো শান্তিনিকেতনে স্বর্গত সন্তোষ মজুমদারের ভগ্নী সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষা রমার সঙ্গে। এ-বিবাহের উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং কবি আর আশ্রমমুখ্য নন্দলাল। নন্দলাল হিন্দু-মতে এঁদের বিবাহ দিলেন শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ছাত্রাবাসে। —এ-কথা আগে বলা হয়েছে।

ইতিমধ্যে নন্দলালের সতীর্থগোষ্ঠী ও ছাত্রধারা ভারতবর্ষের নানাস্থানে ও ভারতের বাইরে গিয়ে ভারতশিল্পচর্চার কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। নন্দলালের ও তাঁর প্রতিভান্বিত ছাত্রগণের সুখ্যাতিতে দেশ-বিদেশ মুখরিত। নন্দলালের চারিত্রিক দৃঢ়তা পর্বতের ন্যায় কঠিন, আবার স্নেহ-প্রীতিতে তিনি কুসুমের মতো কোমল। তিনি ভারতের জাতীয় চরিত্র এবং ভারতশিল্প-বিচারে দেশী-বিদেশী কারোর বিন্দুমাত্র কটাক্ষ সহ্য করতে পারতেন না। শান্তিনিকেতনে সার্বজনীন সমাজ-কর্মে তিনি ছিলেন মুখ্যপরিচালক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ভাষায় মানুষ নন্দলালের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এই বছরে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়ে 'সাঁচী' দেখে এলেন। উষাগ্রামে গেলেন মিশনারিদের স্কুলে। শান্তিনিকেতন-কলাভবনের একটি ছাত্রকে সঙ্গীত-শিক্ষকরূপে পেয়ে ওঁরা খৃস্টান করায় ক্ষোভ হয়েছিল খুব। 'নটীর পূজা'র ড্রয়িং করলেন থিয়েটার (প্রথম রজনী ২৮। ২। ১৯৩১) থেকে। পূর্বে এ-সব প্রসঙ্গেরও কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৩১ সালের ২৫-এ বৈশাখ কবির জন্মদিনে সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ হলো। জন্মোৎসবের পরেই কবির পারস্য যাবার কথা। কিন্তু শারীরিক কারণে যাত্রা স্থগিত হলো। কবি গেলেন দার্জিলিং। দার্জিলিংএ নজরুল ইসলাম, মন্মথ রায়, শিল্পী অখিল নিয়োগী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও নানা আলোচনা করেন। মাসখানেক দার্জিলিংএ কাটিয়ে জুলাই মাসের গোড়াতে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। বিশ্বভারতীর নানা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের পর খুলছে। তিনি শান্তিনিকেতনেই রইলেন। শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে বর্ষা নামছে। কিন্তু কবির মন ক্লান্ত। দেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক বীভৎসতর। কবি নৃত্য-গীত উৎসবাদির মধ্যে নিমগ্ন থেকে দেশের সমস্যাকে পাশ কাটাতে পারলেন না। তিনি লেখনী ধারণ করলেন।

এই পর্বে শত শত বাঙ্গালী যুবক মেদিনীপুরের হিজলি জেলে, রাজস্থানের মরুদুর্গ দেউলীতে ও আলিপুর ডুআর্সের বক্সাদুর্গে অন্তরীণাবদ্ধ। কংগ্রেস পুনরায় সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

সাইমন কমিশনের আবির্ভাবের পর থেকে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত হলো। বিলাতে ভারতের সকল দল দিয়ে গোলটেবিল বৈঠকের ঘোষণা করা হলো। কংগ্রেস এই বৈঠকে ভারতের ডোমিনিয়ম স্টেটাস-সম্মত সংবিধান প্রবর্তনের কথা আলোচনা করতে চেয়েছিল।

১৯২৯সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসলো। সভাপতি যুবক জওহরলাল নেহরু। কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেস-সদস্যগণ স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন। স্থির হলো, ১৯৩০ সালের ২৬-এ জানুয়ারি দেশের সর্বত্র স্বাধীনতা-সংকল্প পাঠ করা হবে। ১৯৩০সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সবরমতীতে কংগ্রেসের কার্যকর সভায় গান্ধীজীর পরিকল্পিত আইন-অমান্য সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার দিনটিকে স্মরণ করে এপ্রিল মাসের গোড়ায় গান্ধীজী সবরমতী-আশ্রম থেকে লবণ-আইন ভঙ্গ করবার জন্যে এক-দল নৈষ্ঠিক সত্যাগ্রহীকে সঙ্গে নিয়ে বোম্বাই প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্তী

স্থানে দণ্ডীর দিকে যাত্রা করলেন। ৬ই এপ্রিল গান্ধীজী লবণ আইন ভঙ্গ করলেন। ভারতের নানাস্থানে আইন অমান্য আন্দোলন চলছে। ১৯৩০সালের ১৮ই এপ্রিল পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম শহরে বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করলেন। ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধলো। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে বড়লাট পর পর ছ-টি অর্ডিন্যান্স পাশ করলেন। লবণ-সত্যাগ্রহের ফলে, ১৯৩০-৩১ সালের দশ মাসের মধ্যে ভারতের প্রায় নব্বই হাজার নরনারী কারারুদ্ধ হলেন। গান্ধী আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হলো ১৯৩১ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মুসলমান-সমস্যা সমাধানে পথনির্দেশ করলেন। কবির মন দেশের আত্মঘাতী রাজনীতি দেখে খুবই উদ্বিগ্ন। ১৯৩১সালের সারা গ্রীষ্ম দার্জিলিং-এ কাটিয়ে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। মন ভারাক্রান্ত। দেশের রাজনৈতিক ঘটনা-বলীর দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। রবীন্দ্রনাথের ও নন্দলালের স্পর্শচেতন মন এতে সাড়া না-দিয়ে পারে না। কিন্তু তাঁর প্রত্যক্ষ দায় বিশ্বভারতী।

বিশ্বভারতী কবির প্রত্যক্ষ দায়, প্রতিদিনের কণ্টকশয্যা। তার সব রকমের আর্থিক দায়িত্ব তাঁর একলার। অর্থ সংগ্রহ তাঁকেই করতে হয়। যাঁরা ব্যয় করেন তাঁরা এখানকার আয়ের কথা ভাবেন না। বিশ্বভারতীর চিরদারিদ্র্য কিছুতেই ঘোচেনা। যেভাবেই হোক্, নেচে গেয়ে, বক্তৃতা করে, নাটক মঞ্চস্থ করে, রাজদ্বারে বা ধনীর ঘরে ধরনা দিয়ে টাকা তাঁকে আনতেই হবে।

অর্থের সন্ধানে কবি এবার গেলেন ভূপাল-নবাব-দরবারে। এই সময়ে (১৯৩১) শ্রীনিকেতনে এসেছেন ডক্টর হাসেম আলী কৃষিশাস্ত্রী হয়ে। এলম্‌হার্স্ট সাহেব এঁকে বিলেত থেকে শ্রীনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন গবেষণার জন্যে। ডক্টর আলী নিজাম হায়দরাবাদের লোক। ডক্টর আলীর বিশ্বাস ছিল, ভূপালের মুসলমান নবাব হয়দরাবাদের নিজামের দৃষ্টান্তে তাঁর মতোই উদার হাতে বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থ খয়রাত করবেন।

দার্জিলিং থেকে শান্তিনিকেতনে ফেরবার ক-দিনের মধ্যে কবি কলকাতা হয়ে ডক্টর আলীর সঙ্গে ভূপাল যাত্রা করলেন। সঙ্গে গেলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল। ভূপাল থেকে কবি সাঁচীর স্তূপ দেখতে গেলেন। সাঁচী

ভুপাল থেকে ২৬মাইল দূরে। ১৯৩১সালের ২২এ জুলাই কবি লক্ষ্ণৌএ অসিত হালদারকে লিখলেন,—'এখানে সাঁচীর কীর্তি দেখে খুবই খুশি হয়েছি। নন্দলাল আমার সঙ্গী হয়ে এসে দেখে গেল...'।

ভারতবর্ষের এই শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধকীর্তি দীর্ঘদিন ধরেই ভারতশিল্পী নন্দলালের অন্তর অধিকার করেছিল। এবার এতদিনে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তাঁর এই সাঁচীতীর্থ প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ ঘটলো। বিশ্বকবি ও ভারতশিল্পী একত্র হয়ে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন পরম্পরাগত এই সাঁচী-স্থাপত্যের রূপ ও রস ধ্যানস্থ হয়ে আত্মস্থ করে নিয়ে এলেন। শান্তিনিকেতনে সুরেন্দ্রনাথ সাঁচী-তোরণের অনুসরণে সুখ্যাত 'ঘণ্টাতলা' আগেই নির্মাণ করেছিলেন। দেশে-বিদেশে করা বহু চিত্রকার্যে নন্দলালের হাত দিয়ে সাঁচীর রূপরেখা আত্মপ্রকাশ করেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে শিল্পময় সাঁচী সম্পর্কে বিশদ বলা প্রয়োজন।

সাঁচী ॥

ভীলসা আর ভুপালের মধ্যে সেণ্ট্রাল রেলপথের মেন লাইনের ওপর সাঁচীগ্রাম। বৌদ্ধতীর্থ সাঁচী। সাঁচীর মহাস্তূপের খোদাইকরা তোরণ তার বিশাল গোল-গম্বুজ সুবিখ্যাত। এই বৌদ্ধস্তূপের স্থানীয় নাম ভীলসা-চূড়া। ভীলসার পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হলো সাঁচী। সাঁচীস্তূপ ভুপাল-স্টেটের দেওয়ানগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত।

খৃস্টপূর্ব তিন শতকে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে সাঁচীস্তূপের প্রতিষ্ঠা। এর ইতিহাস ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের উত্থান-পতনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আজ তেইশ শ বছর ধরে।

বর্তমান ভীলসার কাছেই ছিল কালিদাসের মেঘদূতের প্রসিদ্ধ বিদিশা। পূর্বমালবের রাজধানী ছিল বেতয়া আর বেসনদীর সঙ্গমস্থলে। বৌদ্ধ-ধর্মের গৌরবযুগে বিদিশা ছিল বৌদ্ধদের বিশিষ্ট কেন্দ্র।

সাঁচী বৌদ্ধধর্মের বিশিষ্ট কেন্দ্র হলেও স্বয়ং বুদ্ধ এখানে কখনো পদার্পণ করেননি। অন্ততঃ বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কাশীয়ার মতন সাঁচী বুদ্ধ-জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। বৌদ্ধ সাহিত্যেও এর কোনো উল্লেখ নাই।

ফা হিয়েন (চতুর্থ শতাব্দ) কিংবা হুয়েনৎ সাঙ্ (সপ্তম শতাব্দ) সাঁচীর উল্লেখ করেননি। তথাপি সাঁচীর স্তূপ বৌদ্ধ-স্থাপত্যের একমাত্র সুসম্পূর্ণ ও সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।

সাঁচীর পুরানো নাম ছিল ককনভ বা ককনয়। পরে নাম বদলে হলো ককনদ—বোট। তারপর হলো ভোট-শ্রী পর্বত। সিংহলী মহাবংশ মতে, অশোক যখন উজ্জয়িনীর সম্রাট ছিলেন তিনি বিদিশার এক বণিক্-কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর দুই পুত্র—উজ্জেনীয় আর মহেন্দ্র। কন্যার নাম সংঘমিত্রা। মহাবংশের আর একস্থানে উল্লেখ আছে, অশোকের মহিষী (তিষ্যরক্ষিতা) সাচতে একটি বিশাল বিহার নির্মাণ করিয়ে স্বয়ং সেখানে বাস করেছিলেন। এই বিহারটি হলো বিদিশার কাছে চেট্টিয়-গিরিতে। সম্ভবতঃ এই সময়ে সাঁচর নাম ছিল চেট্টিযগিরি। সম্রাট অশোক সাঁচীতে লিপিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অশোকের সময়ে সাঁচী বৌদ্ধধর্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল এতে কোনো সন্দেহ নাই।

মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের পরে মগধের সিংহাসনে বসলেন শুঙ্গেরা। বৌদ্ধ না হলেও সাঁচীতে তাঁদের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বেশির ভাগ কীর্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয় স্তূপ এবং তৃতীয় স্তূপের তোরণ ছাড়া, মূল স্তূপটি এই সময়ে নির্মিত হয়। মহাস্তূপটি মূলতঃ ছোট ইটের খাঁজ বের করে তৈরি। মহাস্তূপের বর্তমান পরিধির বিস্তৃতি এবং পাথরের ঢাকনি এই সময়েই হয়েছিল। মহাস্তূপের নিচের তলার রেলিং দিয়ে জোড়া ছোট ছোট পিল্লাশ্রেণী আর এখানকার নির্দিষ্ট ২৫সংখ্যক স্তম্ভটিও এই সময়ে তৈরি হয়েছিল।

এইসব প্রত্নবস্তুগুলির স্থাপত্যশৈলী অতি উচ্চস্তরের। জন মার্শালের মতে, অলঙ্করণ-কলার অভাবনীয় ধারণায় এর আগাগোড়া মণ্ডিত হয়ে আছে। ভারতশিল্পের এই হলো আসল ঐতিহ্য। ভারতশিল্প-পরম্পরার উত্তরাধিকারের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই স্মৃতি-সৌধগুলির আদ্যোপান্তে পরিস্ফুট হয়ে আছে। শুঙ্গদের পরে আন্ধ্র, তারপরে পাশ্চাত্য ক্ষত্রপদের অধিকারে ছিল সাঁচী—চতুর্থ শতাব্দের শেষ পর্যন্ত। এই সময়ে সমগ্র মালব দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

খৃস্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দে সাঁচীর রূপ পরিবর্তন ঘটে সুবহু। সাঁচীর

বিহারের দেওয়ালগুলি এই সময়ে অপরূপ চিত্রকর্মে ভূষিত করা হয়। এই চিত্রগুলি এখন আর নেই। মধ্যযুগে হর্ষ থেকে চালুক্যরাজগণের আমল (খৃ ১০৫৩) পর্যন্ত সাঁচীতে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব দেখা যায় না। এই সময়ে এখানে বৌদ্ধ-স্থাপত্যও নির্মিত হয়নি। বরং মধ্যভারতে এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ম্লান হয়ে এসেছিল। পরবর্তী মধ্যযুগে সাঁচীতে স্থাপত্য ও মূর্তিশিল্পের প্রভূত অবদান দেখা যায়। স্বতন্ত্র খোদাই-এর কাজ, মূর্তি এবং স্তূপ ছাড়া, পূর্বদিকের সমতল ছাদের সৌধগুলি এই সময়ের সৃষ্টি। বৌদ্ধধর্মের অবনতি বৌদ্ধশিল্পেও প্রতিফলিত। অবনতির প্রভাব বেড়ে চলে এবং ৪৫সংখ্যক মন্দিরটি গুপ্তযুগের স্থাপত্যশিল্প থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শৈলীতে নির্মিত হয়।

অতঃপর চার-শ বছর ধরে সাঁচী পরিত্যক্ত ছিল। ইতিহাসে তেরো শতাব্দ থেকে আঠারো শতাব্দ পর্যন্ত সাঁচীর কোনো উল্লেখ নাই। ১৮১৮ খৃস্টাব্দে সাঁচী পুনরাবিষ্কার করেন জেনারেল টেলর।

এই সময়ের মধ্যে জনবহুল বিদিশানগরীর অবনতি ঘটেছে এবং তার জায়গায় গড়ে উঠেছে আধুনিক শহর ভীলসা। ভীলসার পূর্বনাম ছিল ভৈলস্বামিন্। ঔরঙ্গজেবের সেনারা এর মন্দিরগুলি ধ্বংস করেছিল। কিন্তু আশ্চর্য, সাঁচীর সুখ্যাত কীর্তিগুলি এর মাত্র পাঁচ মাইল দূরে থেকেও অক্ষত থেকে গেছে।

সাঁচীর স্তূপ জেনারেল টেলর যখন আবিষ্কার করলেন, দেখা গেল, অটুট রয়েছে। চারটি তোরণের তিনটি তখনও দাঁড়িয়ে, এবং চতুর্থটি পড়ে রয়েছে পাদপীঠে। স্তূপের বিশাল গম্বুজ এবং কতকগুলি রেলিং দিয়ে জোড়া ছোট ছোট পিল্লাশ্রেণী ভালো অবস্থাতেই রয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তূপটিও অক্ষত। অন্য কতকগুলি সৌধ এবং ছোট স্তূপ ভেঙ্গে পড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

সাঁচী-স্তূপের আবিষ্কার প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে জোর উত্তেজনা জাগিয়েছিল। তবে দুঃখের কথা, স্তূপের অপূরণীয় ক্ষতি করেছিল দায়িত্বহীন লোকে—ধনসম্পৎ এবং প্রত্নবস্তুর সন্ধানীরা। স্তূপাবলীর বেশির ভাগই এঁরা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস করেছিলেন। এই সময়ে কেউ ভাবেননি এগুলিকে পুনর্গঠন ও রক্ষা করার কথা। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য ছাড়া

এর কেউ মর্যাদাও বোঝেননি। সাঁচীর অত্যুৎকৃষ্ট খোদিত তোরণ অবশ্য তখনই লোকের মন হরণ করেছিল। পূর্বতোরণ-দ্বারের ছাঁচ তৈরি করানো হয়েছিল ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে য়ুরোপের জাতীয় সংগ্রহালয়ে উপহার দেবার জন্যে। ভারতসরকার এগুলি পুনর্গঠন ও সৌধগুলির পুনরুদ্ধার করার জন্যে ১৮৮১খৃস্টাব্দে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। স্তূপের অনেক ক্ষতি করেছে মানুষ। আরও ক্ষতি হয়েছে দ্রুতপ্রসারী অরণ্যের দ্বারা। সংরক্ষণের প্রথম ধাপের কাজ করেছিলেন সেই সময়কার পুরাতাত্ত্বিক যাদুঘরের অধ্যক্ষ মেজর কোল। তিনি স্তূপ পরিষ্কার করালেন বন কেটে। মূল মহাস্তূপের একটা বিরাট ফাটল বন্ধ করলেন। যে-সব তোরণ পড়ে গিয়েছিল সেগুলিকে তিনি যথাস্থানে সংস্থাপিত করলেন। বিহারগুলোতে এখনও অনেক কিছু করার আছে। কতকগুলি মন্দির এখনও ভগ্নস্তূপ থেকে খুঁড়ে বের করতে হবে। এই কাজ ১৯১২ সালের দিকে তখনকার ভারতের প্রত্নতত্ত্বাধিকারের সর্বাধ্যক্ষ স্যার জন মার্শাল শুরু করলেন। কাজ ধীরে ধীরে চালাতে হলো, লাগলো সাত বছর। জঙ্গল পরিষ্কার করা হলো। সমাধিস্তম্ভগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো।

সংস্কার ও সংগঠন চললো তারপরে। মূল মহাস্তূপের দক্ষিণ-পশ্চিম বৃত্তের চতুর্থ পাদ ভেঙে গড়া হলো। এর সিঁড়িপথ, হারমিক পিল্লাশ্রেণী পুনর্গঠিত হলো। ১৮সংখ্যক মন্দিরের বিশাল স্তম্ভগুলি বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। সেগুলিকে নতুন করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। ৪৫ সংখ্যক মন্দিরটি খুবই জীর্ণ হয়েছিল, যে-কোনো মুহূর্তে পড়ে যেতো। সেজন্যে তখনই সেগুলি সারানো হলো। মধ্যে এবং পূর্ব সমতল ছাদের মাঝখানের ঠেক-দেওয়াল পুনর্গঠিত হলো। আর একটা প্রধান কাজ হলো গম্বুজ পুনর্গঠন করা। পিল্লাশ্রেণী এবং তৃতীয় স্তূপের ছাতাটিও নতুনভাবে তৈরি করা হলো। আধুনিক পয়ঃপ্রণালী তৈরি করা হলো মহাস্তূপের চারদিকে। সমগ্র স্থানটি সমান করা হলো। গাছপালা লাগান হলো, বাগান করা হলো এই স্থানটিকে মনোরম করবার জন্যে।

এখানে একটি ম্যুজিয়ম স্থাপন করা হলো। স্থাপত্যের টুকরো, শিলালিপি এবং অন্য প্রত্নবস্তু সযত্নে এই যাদুঘরে জমা করা হলো। সেগুলির

তালিকাও তৈরি কর' হলো। সাঁচীর প্ল্যান ফটোগ্রাফ রাখা হলো। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যাঁরা সাঁচীস্তূপ নিরীক্ষণ করবেন বা গবেষণা করবেন তাঁদের এ-সব ছাড়া উপায় নেই।

সাঁচীর স্তূপ ভারতবর্ষে বৌদ্ধস্থাপত্যের একক অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইষ্টকনির্মিত অর্ধচন্দ্রাকার স্তূপগুলি আদিতে ছিল চৈত্য। এগুলি পবিত্র হয়ে উঠলো অশোকের সময়ে। বুদ্ধের চিতাভস্ম ভাগ করে সম্রাট অশোক তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্যে হাজার হাজার স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে এইসব স্তূপ পুণ্যার্থীদের নিকট তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়।

সাঁচীর মহাস্তূপের অর্ধগোল গম্বুজটি চূড়ার দিকে চ্যাপ্টা। একে ঘেরে উঁচু সমতল ছাদ রয়েছে ভিত্তিভূমিতে। এই সমতল ছাদের নাম— 'মেধী'। পুরাকালে এ-টি ছিল 'প্রদক্ষিণপথ' বা শোভাযাত্রা চলার রাস্তা। দক্ষিণদিকের দু-তবক সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠতে হয়। নিচে স্তূপ ঘেরে দ্বিতীয় একটি সমতল ছাদ। পাথরের পিল্পে দিয়ে এ-টি ঘেরা। স্তূপের চূড়ায় পবিত্র ছত্রটিকে ঘিরে তৃতীয় পিল্পাশ্রেণী রয়েছে।

নিচের তলায় পিল্পাগুলি মসৃণ পাথর দিয়ে তৈরি এবং পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণমুখী চারটি তোরণ দিয়ে বৃত্তাকারে বিভক্ত। এই তোরণ চারটি উৎকৃষ্ট স্থাপত্যশৈলীতে খোদাই করা। গঠনরীতি অনন্য।

প্রবাদ, মহাস্তূপের মূল গঠন সম্রাট অশোকের। তখন এর আয়তন ছিল বর্তমান স্তূপের প্রায় অর্ধেক। প্রতিষ্ঠার এক-শ বছর পরে স্তূপটির আয়তন বাড়ানো হয়। পাথরের আবরণ তৈরি হয় এই সময়ে। পাদপীঠ ঘিরে পিল্পাশ্রেণীও তৈরি হয় এই সময়ে। তোরণ চারটি নির্মিত হয়েছিল প্রথম শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে।

সামনের তোরণগুলির প্রচুর অলঙ্করণ আর পিছনদিকের স্তূপের সাধারণ গঠন বিসদৃশ লাগে। দক্ষিণের তোরণটি তৈরি হয়েছিল প্রথমে। পরে হয়েছিল উত্তরের আর পূবের। পশ্চিমের তোরণটি হয়েছিল সবশেষে। চারটি তোরণেরই ডিজাইন সমান। পাথরের তৈরি হলেও মনে হয় যেন সূত্রধরের শিল্পকলা। তোরণগুলি দু-হাজার বছর পরেও অটুট অবস্থাতেই রয়েছে এবং আশ্চর্যের কথা এই যে, যে-পদ্ধতিতে এগুলি তৈরি সেভাবে পাথরে খোদাই সম্ভবপর নয়।

প্রত্যেকটি তোরণ চূড়ায় দু টি করে চৌকো থাম রয়েছে এবং প্রত্যেক চূড়ায় দু-টি করে হস্তী-শীর্ষ দণ্ডায়মান বামন অথবা সিংহের সম্মুখভাগ পিঠে পিঠে লাগিয়ে সেট্ করা আছে। চূড়ায় তিনটি করে ধার-বাঁকানো খিলান আছে। বাঁকানো খিলানগুলি চৌকো পাথর দিয়ে আলাদা করা —এগুলি বসানো রয়েছে স্তম্ভের উপরে আড়াআড়িভাবে এক-এক দিকে দু টি করে। বাঁকানো খিলানের মধ্যে উভয়স্থানে এবং চাংগুলি ভরতি করা আছে চারটি করে মূর্তি দিয়ে। মূর্তিগুলি আলাদা করা, তিনটি করে সংকীর্ণ আড়াআড়ি পাথরের টুকরো দিয়ে। চুড়ো থেকে উদ্গত যক্ষিণীর মূর্তি আছে দু টি। এই সব কমনীয় মূর্তি নিচেকার খিলানগুলির আধারের কাজ করছে। বাইর দিকে বাঁকা খিলানের মধ্যেকার স্থান ভরতি যক্ষিণী আর সিংহের ছোট ছোট মূর্তি দিয়ে। অনেকগুলি মূর্তির দু টি করে মুখ। উল্টোদিকে তাকিয়ে আছে। তোরণের শীর্ষ ধর্মচক্রভূষিত। – এ হলো বৌদ্ধধর্মের প্রধান প্রতীক। চক্র ধরা আছে সিংহ বা হাতির ওপর এবং একটি করে যক্ষ প্রত্যেক দিকে দাঁড়িয়ে। যক্ষেরা ত্রিরত্নের দু দিকে পার্শ্ব রক্ষা করছে। তোরণের সমগ্র পৃষ্ঠদেশ ভরতি উৎকৃষ্ট উৎকীর্ণের কাজে। তাতে জাতকের গল্প, বুদ্ধের জীবনচিত্র বা পরবর্তী বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী উৎকীর্ণ করা রয়েছে। তোরণগুলির একটিতে একটি প্যানেল বা খোব সম্পর্কে বিশেষভাবে বলতে হয়। এতে আঁকা রয়েছে সম্রাট অশোকের বুদ্ধগয়া পরিদর্শন কাহিনী। বৌদ্ধধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকের স্মৃতির এই হলো একমাত্র নিদর্শন। অবশ্য এর প্রামাণিকতা সন্দেহমুক্ত নয়। তবু ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের এই একক প্রতিকৃতিখানি বিশেষভাবে আদৃত হয়ে থাকে।

সাঁচীর অসংখ্য উৎকীর্ণের কাজ এবং মূর্তিগুলির সম্পর্কে বিশদভাবে বলার অবকাশ নাই। তবে এটা ঠিক যে, এখানকার অঙ্কন-পদ্ধতিতে কোন সমরূপতা নাই। কিন্তু কাজের ধরন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উচ্চস্তরের। মূর্তিগুলির ভঙ্গি সাবলীল এবং স্বাভাবিক। প্রকাশভঙ্গি একান্ত আন্তরিক। লোক-বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক ধর্মবিশ্বাস এখানকার উৎকীর্ণ শিল্পে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করেছে। কৃত্রিমতা এবং আদর্শবাদ থেকে মুক্ত রেখে এর উদ্দেশ্য ধর্মকে মহিমমণ্ডিত করা —বৌদ্ধধর্মের গল্প সরলতম এবং অত্যন্ত

সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা। ভাস্করের বাটালি এই দুর্লভ কীর্তি নির্মাণের গৌরবের দাবি করতে পারে। কারণ তাঁদের বাটালির নৈপুণ্যেই মানুষের প্রাণের সমবেদনা এবং স্বচ্ছ আন্তরিকতা এই সকল খোদাইকর্মে এমন যথার্থভাবে পরিস্ফুট হয়েছে এবং এখনও তা আমাদের অনুভূতিতে আকুতির আবেদন জাগাচ্ছে।

সাঁচীর মূল স্তূপের এলাকায় ছোট স্তূপ আছে অনেক। তার মধ্যে তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছোট স্তূপটিতে মগলিপুত্ত ও কাশ্যপের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। এর তোরণগুলি অতি সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ দৃশ্যসম্বলিত, এবং রেলিংগুলি খোদাই করা বৃহৎ পদকের দ্বারা শোভিত। দ্বিতীয় স্তূপটি (সংখ্যা ২) তৈরি করা হয়েছে পাহাড়ের পশ্চিম দিকে একটি পাথরের প্রান্তে। এই স্তূপের কোনো তোরণ নাই। পাদপীঠ ঘিরে সুদৃঢ় বেষ্টনীটি বিভিন্ন ধরনের উৎকীর্ণ কাজে ভরতি। গঠনপদ্ধতি আদিম ধরনের, এবং মহাস্তূপের তোরণগুলির অত্যুৎকৃষ্ট উৎকীর্ণাবলীর সঙ্গে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জন্তু-জানোয়ারের মূর্তিগুলি অমার্জিত হলেও অলঙ্করণের নিদর্শন আশ্চর্য শক্তি-শালী। তৃতীয় স্তূপটি (সংখ্যা ৩) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; রয়েছে মহাস্তূপের উত্তর-পূর্ব দিকে। এ-টি মহাস্তূপের মতন হলেও আয়তনে খুবই ছোট। এই স্তূপে বুদ্ধের সুবিখ্যাত দুই শিষ্য সারীপুত্র ও মহামোগল্লান-এর দেহাবশেষ রক্ষিত ছিল। ভস্মাধারটি ঠিক মধ্যস্থলে বসানো ছিল এবং ঢাকা ছিল একটি প্রকাণ্ড পাথর দিয়ে। ভিতরে পাথরের দুটি পেটিকা ছিল, তার একটির ওপর 'সারী-পুতস্য' এবং আর একটির ওপর 'মহামোগল্লানস্য' এই কথা দু-টি খোদাই করা ছিল। জেনারেল কানিংহাম এটিকে আবিষ্কার করে নিয়ে গিয়ে সংরক্ষিত করলেন লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ও এ্যালবার্ট ম্যুজিয়ামে। ১৯৩৮সালে ভারতের মহাবোধি সোসাইটি এই পবিত্র ভস্মাধারটিকে ফিরে পাবার জন্যে আন্দোলন করেন। বৃটিশ ম্যুজিয়াম শেষ পর্যন্ত ফেরৎ দিতে সম্মত হন। ১৯৪৭সালে লণ্ডন থেকে এগুলি সিংহলে আনা হয়। এর পাঁচ বছর পরে ১৯৫২সালের ৩০-এ নবেম্বর এগুলিকে খুব ধুমধামের সঙ্গে নিয়ে এসে সাঁচীর নূতন

বিস্তারে স্থাপন করা হয়েছে। সমগ্র স্থানটি জুড়ে অসংখ্য স্তূপ প্রকীর্ণ-ভাবে মাথা তুলে রয়েছে। এগুলিও বিশেষ পবিত্র। কারণ, এগুলিতে কারো না-কারো দেহাবশেষ নিহিত আছে। সাঁচী থেকে কয়েক মাইল দূরে সোনারীতে আটটি স্তূপের একটি শ্রেণী রয়েছে। এর দু-টি আছে চৌকো চত্বর দিয়ে ঘেরা জায়গায়। এর ভিতর থেকে বহু পবিত্র প্রত্নবস্তু খুঁড়ে পাওয়া গেছে। সাতধারায় দুটি স্তূপের আকৃতি ছোট। এতেও সারীপুত্র এবং অন্য অনেকের স্মৃতিচিহ্ন আছে। ভোজপুর এবং আন্ধেরতে মনোরম স্তূপশ্রেণী রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়েছে।

সাঁচীকে ঘেরে সমগ্র অঞ্চলটি পৃথিবীর বৌদ্ধদের নিকট পবিত্র। কারণ, এই সকল স্তূপ ওখানে রয়েছে। ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে গেলে, এই সব স্তূপের বয়েস অশোকের আমল থেকে খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দ পর্যন্ত। ধর্মীয় পবিত্রতার কথা বাদ দিলেও এই বিশাল পুরাতন স্তূপগুলি উৎকৃষ্ট ও সুবহু খোদাইকাজের জন্যে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। স্তূপ ঘেরে মন্দির এবং বিহারশ্রেণীর সমগ্র দৃশ্য অদ্ভুত সুন্দর। যে সন্ন্যাস জীবন এই প্রশান্ত পাহাড় ঘেরে একদা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, দর্শকেরা এগুলি প্রত্যক্ষ করে মুহূর্তের জন্যেও তার আমেজ পেয়ে থাকেন।

॥ মন্দির ॥

প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে বিশেষ দ্রষ্টব্য হলো চৈত্য-সভাগৃহ (মন্দির সংখ্যা ১৮)। এটি রয়েছে মহাস্তূপের দক্ষিণতোরণের সামনে। এর স্থাপত্য সাঁচীর অন্য কীর্তিগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতির। সভা-গৃহটি এখন ভগ্নস্তূপ। তবুও এর স্বতন্ত্র আকর্ষণ। সাদাসিধা স্তম্ভগুলি পুরাতন গ্রীকমন্দিরের স্থাপত্য স্মরণ করায়। এর গঠন তুলনায় আধুনিক খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দের দিকে। খনন-কার্যের ফলে দেখা গেছে, এই ভগ্নস্তূপের নিচে পরপর তিনটি প্রাচীনতর মন্দিরের অস্তিত্ব রয়েছে।

সাঁচীতে আর একটি স্থাপত্য রয়েছে হেলেনিক পদ্ধতির। সে রয়েছে ১৭সংখ্যক মন্দিরে। এর চৌকো কুঠুরি, সমতল চৌকো ছাদ

আর সামনে একটি দরদালান বা থামওয়ালা বারান্দা। থামগুলি সাদা-সিধা। এই ছোট মন্দিরটির গঠনে নিখুঁত মাত্রাবোধ, সমতল তলভূমি এবং অলঙ্করণে সংযতভাব দেখে এটিকে পরম্পরাবাহী উৎকৃষ্ট গ্রীক-মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দে। অতঃপর, গুপ্তসাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানে ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। গুপ্তযুগ থেকে মন্দিরে গর্ভগৃহ, একটিমাত্র প্রবেশদ্বার এবং মণ্ডপ-নির্মাণের বিধি প্রবর্তিত হয়েছিল।

॥ অশোক স্তম্ভ ॥

মহাস্তূপের দক্ষিণতোরণের কাছে অশোকস্তম্ভের ভাঙ্গা অংশগুলি পড়ে রয়েছে। এর চূড়ায় চারটি সিংহ পিঠেপিঠে দাঁড়িয়ে। এই স্তম্ভটি একজন স্থানীয় জমিদার বহু টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এগুলিকে নিয়ে গিয়ে তাঁর চিনির কলের ঠেক তৈরি করবেন। স্তম্ভের গোড়ার দিকটি এখনও অটুট রয়েছে। অন্য অংশগুলি নিয়ে আসা হয়েছে এবং গোড়া থেকে বসানো হয়েছে। শীর্ষটি মু্যজিয়ামে রাখা আছে। পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় স্তম্ভটির উচ্চতা ছিল ৪২ ফিট। কাণ্ডটি গোলাকার এবং উঁচুর দিকে কিছু সরু। এ-টি সারনাথের স্তম্ভের মতো নয়। এতে সিংহের ভিত্তিতে ধর্মচক্র নাই। সমগ্র স্তম্ভটি চমৎকার ফিনিশ করা, এবং পালিশ খুব উঁচুদরের। দুর্ভাগ্যক্রমে এখন সব কদাকার হয়ে গেছে। সিংহগুলি স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পশুরাজের তেজস্বী জীবন্তভাব মেশানো রয়েছে বলিষ্ঠ ঐতিহ্যগত খোদাই পদ্ধতিতে। স্থাপত্যশিল্পে স্তম্ভটিতে একটি সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। আরও দেখবার হলো, সিংহগুলির মাংসপেশীর পুষ্টতা, বিস্ফারিত শিরা, থাবার তীক্ষ্ণতা এবং কেশরের ঢেউ-খেলানো বাহারে মনোরম ছোট ছোট কুণ্ডলী। স্তম্ভটি লক্ষণীয় দু-দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্য এবং এর ওপর খোদাই করা রাজকীয় অনুশাসন।

॥ বিহার ॥

সাঁচীতে পাঁচটি বিহারের অবশেষ রয়েছে। এগুলি চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শতাব্দের মধ্যে নির্মিত। প্রথম বিহারগুলি তৈরি হয়েছিল কাঠ দিয়ে। কতকগুলি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তিকালে নির্মাণ করা হয়েছিল সেই মূল ভগ্নস্তূপের উপরে। তিনটি গৃহ এখনও রয়েছে। বিহারগুলির নম্বর হলো ৩৮, ৩৭ ৩৮। এই বিহারগুলির স্থাপত্যপরিকল্পনা ভারতের অন্য স্থানের বিহারের মতন। চৌকো উঠোনের বা চত্বরের চারদিকে কুঠুরি এবং থাম দেওয়া বারান্দা। উঠোনের মাঝখানে উঁচু মণ্ডপ। বেশির ভাগ বিহার হলো দোতলা। দোতলা সম্ভবতঃ কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি হয়েছিল। পুবদিকের উঁচু জমিতে তৈরি একটি বিহার খুব চিত্তাকর্ষক। এই বিহারটির অনেক উঠোন রয়েছে। সেই উঠোনগুলি বৌদ্ধভিক্ষুদের বসবাসের কুঠরি দিয়ে ঘেরা। প্রধান উঠোনের পুবদিকে একটি খুব উচু মন্দির। সে মন্দির বুদ্ধের।

সাঁচী পাহাড়। যে পাহাড়ের উপরে সাঁচীর সুকীর্তি রয়েছে সে-টি হলো প্রায় ৩০০ ফিট উঁচু। পাহাড়টি দেখতে তিমি মাছের পিঠের মতন। সাঁচী গ্রামটি পাহাড়ের প্রায় মধ্যিখানে। এই পাহাড়টি বিন্ধ্য পর্বতমালার একটি শাখা নানা রঙের বেলে পাথরে গড়া প্রচুর লতাগুল্ম আর বৃক্ষাদিতে ঢাকা, অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মনোরম। খাড়া ঢালু ছাদ লতা-গুল্মে ভর্তি। দক্ষিণ দিকটি সব চেয়ে ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন। খিরনী গাছ জঙ্গলা সুস্বাদু আতাগাছ প্রচুর। সাঁচী পাহাড় অপূর্ব দেখায়, বিশেষ করে বসন্ত প্রভাতে। তখন থাব' বা অরণ্য শিখা জ্বলে উঠে অবাক করে দেয়। মনে হয়, সমস্ত পাহাড়টি যেন ফুলের আগুনে জলছে। পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ শিখরের উপরে তখন বিবর্ণ ধ্বংসস্তূপের মুকুটে আলো পড়ে একটা অদ্ভুত আনন্দ ও ঔজ্জ্বল্যের দৃশ্য ফুটে ওঠে।

পৌঁছানোর রাস্তা। রেলস্টেশন আর সাঁচী পাহাড়কে যোগ করে রয়েছে সোজা সদর রাস্তা। পাহাড়ী ঢালু বেয়ে সাঁচী গাঁয়ে ওঠবার রাস্তা ডানদিকে ঘুরেছে। তার কাছেই একটি ছোট পুরানো পুকুর। এখান

থেকে খাড়া পাহাড়ের কিনারা পর্যন্ত বড়ো বড়ো পাথরের চাং দিয়ে বাঁধানো সড়ক। রাস্তাটি দক্ষিণ দিকে ঘুরে গেছে। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এর দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৮০ গজ। এই রাস্তা ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে তৈরি করিয়েছিলেন মেজর কোল্। ১৯১৫ সালে স্যার জন মার্শাল এর সংস্কার সাধন করেন বহুলপরিমাণে।

বিদিশার বিবর্ধনকালে প্রধান তোরণ ছিল উত্তর-পূর্ব কোণে। তখন ওঠার রাস্তা শুরু হয়েছিল 'পুরাইনিয়া' অর্থাৎ পুরাতন পুকুরের কাছ থেকে। চিক্‌নীঘাটি পার হয়ে এ পথ বেঁকেছে উত্তরমুখে এবং পৌঁচেছে উত্তর-পূর্ব তোরণে। পুরানো রাস্তা গিয়েছে তোরণের প্রায় পঞ্চাশ গজ পূর্বদিক দিয়ে। এ-পথ থেকে আর একটি শাখা-পথ গিয়েছে এবং পূর্ব দিকের মাঝামাঝি গিয়ে শেষ হয়েছে। পথটি ১২ ফিট করে লম্বা পাথরের চাং দিয়ে তৈরি। সাবেক সদররাস্তার বিস্তৃতি এখনো দেখা যায় চিকনীঘাটির কাছে উত্তর-দেওয়ালের নিচে।

এ ছাড়া আর একটি রাস্তা ছিল পাহাড়ের পশ্চিম ঢালুপথে ওঠবার জন্যে।—এটি ২নং স্তূপকে ছুঁয়ে তারপরে বেঁকে গিয়ে পূবদিকের ঘেরা জায়গার কিনারা পর্যন্ত গিয়েছে। এর প্রবেশদ্বার হলো ৭সংখ্যক স্তূপের কাছে।

পাহাড়চূড়া ॥ এখানকার সব রাস্তাই পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁচেছে। পথগুলির পরিমাপ ৪০০×২২০ গজের মধ্যে। উত্তর থেকে দক্ষিণের পথগুলি বড়ো মাপের। পথ গেছে ক্রমোচ্চ হয়ে পুবের দিকে এবং ৪৫সংখ্যক মন্দিরের নিচে হলো সবচেয়ে উঁচু জায়গা।

বেষ্টনী প্রাচীর ॥ সাঁচীর মালভূমিটিকে বৃত্তাকার শক্ত পাথরের দেওয়াল জড়িয়ে আছে মেঘমালার মতো। প্রবাদ, এই প্রাচীর তোলা হয়েছিল এগারো থেকে বারো শতাব্দের মধ্যে। প্রভূত সংস্কার করা হয়েছিল ১৮৮৩ আর ১৯১৪ খৃস্টাব্দে। দেওয়ালের ভিত্তি কেবল পাথরের। পূর্বপ্রান্তের প্রাচীরটি তৈরি হয়েছিল পরে মধ্যযুগের প্রাচীরের ধ্বংসস্তূপের ওপর। প্রাচীরের ভিতর দিকে একটি প্রাচীন তোরণ ছিল। সেখানেই পুরাতন পথের চৌমাথায়, পরে তৈরি নতুন প্রাচীর উঠেছিল। উত্তর-পশ্চিম কোণের বর্তমান তোরণ তৈরি হয়েছিল ১৮৮৩

ধ স্টাকে। মেজর কোল নূতন পথও করিয়েছিলেন।

ভূপাল থেকে সাঁচী রেলপথে যেতে হয় ২৮মাইল। ভূপাল থেকে সাঁচী বাসেও যাওয়া যায় —সে ৪৪মাইল।—

কবির সঙ্গে আচার্য নন্দলাল সাঁচীর কীর্তি দেখে ইটারসি হয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। জুলাই-এর শেষ, বর্ষাকাল। কবি ও শিল্পী স্বস্থানে ফিরে এলেন। দেশে হিংসাত্মক বিভীষিকা। কবি নানা-ভাবে আলোচনা করছেন। শিল্পীর মন ক্ষুব্ধ তবুও আত্মসমাহিত হয়ে তিনি স্বকর্মে মন দিয়েছেন। এই এ সময়ে তিনি নটীর পূজার ড্রয়িং করলেন। সে কথা আমরা আগে বলেছি। তাঁর সাঁচী ভ্রমণের স্কেচ-কর্মের কথা পরে বলছি।

এই সময়ে কলকাতায় একটি গীতোৎসবের আয়োজন হলো। এই গীতোৎসবের দু-টি ভাগ। প্রথম অংশে গান নাচ ও আবৃত্তি। দ্বিতীয় অংশে কবির 'শিশুতীর্থ' অভিনয়। গানের সঙ্গে নৃত্য ছিল বিচিত্র রকমের। শান্তিদেব ঘোষ এই সময়ে নাচে কথাকলির পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তন করলেন। বাসুদেব মেনন দক্ষিণভারতীয় নৃত্যকলা রূপায়িত করলেন। শ্রীমতী হাতি সিং গুজরাটি নৃত্য দেখালেন। হাঙ্গেরীয়ান মা ও মেয়ে এলিজাবেথ ব্রুনার ও সাস ব্রুনার হাঙ্গেরীয়ান লোকনৃত্য দেখালেন। এই হাঙ্গেরীয়ান মা ও মেয়ের কথা আমরা পূর্বে বিশদ-ভাবে বলেছি।

পাবলিক রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের পরে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন-সটিটিউট হলে আরো দু দিন (১৭ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর) গীতোৎসব অনুষ্ঠিত হলো। এই অভিনয়ের একদিন পরে কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী কবিকে কবিসার্বভৌম উপাধি দান করলেন একটি মনো-রম অনুষ্ঠান করে। কলকাতার লোকে উৎসবআনন্দে মত্ত। এদিকে মেদিনীপুর হিজলি জেলে দু জন রাজবন্দী পুলিশের গুলিতে নিহত হলো। ইংরেজের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা পূর্বে প্রায় ঘটেনি। সংবাদ-পত্রে দেশের লোক মনের ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। মৃতদেব প্রতি শ্রদ্ধা ও গভর্ণমেন্টের প্রতি ক্ষোভ দেখানোর জন্যে কলকাতায় মনুমেন্টের নিচে জনসভা হলো। কবি রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী জাতির হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ

করলেন। এদিকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দ্বন্দ্বে বাঙ্গালা দেশ জর্জরিত। কলকাতার উত্তেজনা পিছনে রেখে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন নন্দলাল প্রমুখ আশ্রমমুখ্যদের নেতৃত্বে আশ্রমিকরা গান্ধী-জীর ৬৫তম জন্মদিন (২রা অক্টোবর, ১৯৩১) পালনের আয়োজন করেছেন। স্বয়ং গান্ধীজী তখন দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবার জন্যে লণ্ডনে। কবি শান্তিনিকেতন মন্দিরে যথোপযুক্ত ভাষণ দিলেন। এই সময়ে কবির 'গীতবিতান গ্রন্থ সম্পাদিত হলো। ১৯৩১সালের শেষের দিকের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো সঞ্চয়িতা' কাব্য চয়ন ও গ্রন্থপ্রকাশ। এর একুশ বছর আগে 'চয়নিকা প্রকাশিত হয়েছিল নন্দলালের অঙ্কিত চিত্রভূষিত হয়ে।

শান্তিনিকেতনে ২রা অক্টোবর (১৯৩০) গান্ধীজীর জন্মদিন উপলক্ষে কবি মন্দিরে উপাসনা করলেন। এর ক দিন পরে গেলেন দার্জিলিং। এই সময়ে সারনাথে মূলগন্ধী বিহার প্রতিষ্ঠা হলো। মহাবোধি সোসাইটির কর্মী অনাগারিক ধর্মপালের চেষ্টায় সারনাথের এই মন্দির নির্মাণ শেষ হয়। এই বিহারে ফ্রেস্কো আঁকার কথা ছিল আচার্য নন্দলালের। সে প্রসঙ্গে পূর্বে বলা হয়েছে।

দার্জিলিং এ মাসখানেক কাটিয়ে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। আবার তিনি ছবি আঁকায় মগ্ন হয়েছেন। রাস-পূর্ণিমার দিন (৯ই অগ্রহায়ণ (১৩৩৮) শিল্পাচার্য নন্দলালের পঞ্চাশতম জন্মতিথি উপলক্ষে কবি একটি কবিতা লিখে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন।

নন্দলালের চিত্রকর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ অন্তরের। চিত্রাঙ্কনে তাঁর পাকা হাতের প্রবীণতাকে রবীন্দ্রনাথ সুগভীর শ্রদ্ধা করেন। কবি বৃদ্ধ বয়সে ছবি আঁকতে শুরু করেছেন। কবির ছবি ভারতশিল্পের ছকে পড়বে কিনা, সে তর্কের বিষয়, এবং তিনি এ-পথে নবাগত। কিন্তু, চিত্রকর্মে আদর্শ তাঁর জাতশিল্পী, অফুরন্ত প্রতিভাধর নন্দলালের চিত্রকর্ম। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ হলেন নন্দলালের চিত্রকর্মের প্রধান সমঝদার। কবি বলেছেন —'ছবির পরে পেয়েছো তুমি রবির বরাভয়'। ভারতশিল্প পররাব শিবসতী', 'শিবের তাণ্ডব-নৃত্য —এ-সব ছবির অভাবিত রূপ-কল্পনা কবির মনে সুস্থির হয়ে আছে। ১৯১৪সালের অভিনন্দনের সতেরো

বছর পরে, ১৯৩১ সালের এই অভিনন্দন-বাণী একই সুরে বাঁধা। নন্দলালের নব নব উন্মেষশালিনী সৃজনধর্মী শিল্প-প্রতিভার স্রোত শান্তিনিকেতনের খোলা মাঠে অক্লান্ত তারুণ্যের তেজে অব্যাহত। এই আদর্শ ভারতশিল্পীর 'খেলা' খেলবার জন্যেই কবি যুবকের মতো মত্ত হয়ে উঠেছেন তাঁর শেষ বয়সে। সেই কারণেই পঞ্চাশ বছরের কিশোর-গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্ভাষণ।

॥ আশীর্বাদ ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[পঞ্চাশ বছরের কিশোর-গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ]

নন্দনের কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারা,
জন্ম-আগে তাহার জলে তোমার স্নান সারা।
অঞ্জন সে কী মধুরাতে
লাগালো কে যে নয়নপাতে,
সৃষ্টি-করা দৃষ্টি তাই পেয়েছে আঁখিতারা॥
এনেছে তব জন্মডালা অজর ফুলরাজি,
রূপের লীলা-লিখন ভরা পারিজাতের সাজি।
অপ্সরীর নৃত্যগুলি
তুলির মুখে এনেছে তুলি',
রেখার বাঁশি লেখায় তব উঠিল সুরে বাজি'॥
যে মায়াবিনী আলিম্পনা সবুজে নীলে লালে
কখনো আঁকে কখনো মোছে অসীম দেশে কালে
মিলন মেঘে সন্ধ্যাকাশে
রঙিন উপহাসি সে হাসে
রং-জাগানো সোনার কাঠি সেই ছোঁয়ালো ভালে॥
বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইশারা করে কত,
তুমিও তারে ইশারা দাও আপন মনোমত।

বিধির সাথে কেমন ছলে
নীরবে তা আলাপ চলে,
সৃষ্টি বুঝি এমনিতরো ইশারা অবিরত ॥
ছবির 'পরে পেয়েছো তুমি রবির বরাভয়
ধূপছায়ার চঞ্চমায়া করেছো তুমি জয়।
তব আঁকন পটের পরে
জানিগো চিরদিনের তরে
নটরাজের জটার রেখা জড়িত হয়ে রয় ॥
চির বালক ভুবনছবি আঁকিয়া খেলা করে।
তাহারি তুমি সমবয়সী মাটির খেলাঘরে।
তোমার সেই তরুণতাকে
বয়স দিয়ে কভু কি ঢাকে
অসীম পানে ভাসাও প্রাণ খেলার ভেলা 'পরে ॥
তোমারি খেলা খেলাতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নব বালক জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তার ভাষায় ডোবা—
মুক্তচোখে বিশ্বশোভা
দেখাও তারে, ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে ॥

১৩০৮সালের পৌষ-সংখ্যার প্রবাসীতে রামানন্দবাবু এই বিষয়ে লিখলেন,—নন্দলাল বসুর সম্বর্ধনা। কলাকুশল শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়ায় সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে তাঁহার সম্বর্ধনা হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা উপহার দিয়া তাঁহাকে প্রীতি জানাইয়াছেন তাহা অন্যত্র মুদ্রিত হইল।

আমরা নন্দলালবাবুর মানবিক সদ্গুণ তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার হাতের নৈপুণ্য এবং শিক্ষকের কাজে তাঁহার অনুরাগ ও দক্ষতার জন্য তাঁহার প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।'

আচার্য নন্দলালের জন্মদিনের এই উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিচিত্রিতা' কাব্যগ্রন্থখানি নন্দলালের নামে উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থখানি নন্দলালের ও অন্য কয়েকজন চিত্রশিল্পীর চিত্রভূষিত। এ সম্পর্কে বিশদ-

ভাবে বলা দরকার। জয়ন্তী-উৎসবের পর কবি যান খড়দহে। গঙ্গার তীরে দোতলা বাড়িতে বাস, 'পদ্মা'-নামে তাঁদের বজরা ঘাটে বাঁধা। নূতন বাড়িতে নূতন পরিবেশে কবির মন কাব্যরচনায় মগ্ন। এখানে লেখা তাঁর কবিতাগুলির অধিকাংশ স্থান পেয়েছে ঐ 'বিচিত্রিতা' গ্রন্থে। আর কয়েকটি আছে 'বীথিকা' ও 'পরিশেষ' গ্রন্থে।

কলকাতায় থাকবার সময়ে গগনেন্দ্রনাথের বাড়িতে কতকগুলি ভালো ছবি কবির চোখে পড়ে। এই ছবি-সংগ্রহ দেখে তিনি স্থির করলেন, এই মৌন চিত্রগুলিকে তিনি ভাষা দিয়ে মুখর করে তুলবেন। কয়েক বছর আগে থেকেই কবি ছবি আঁকছেন। ছবিকে আমরা যে-ভাবে দেখি রবীন্দ্রনাথের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। খড়দহে যাবার সময়ে কবি ছবিগুলি সঙ্গে করে নিয়ে যান। এবং ছবিগুলি অবলম্বন করে কবিতা লেখেন। রবীন্দ্রজীবনীকারের মতে, (র. জী. ৩, ১সং, পৃ ৪১২-২৩) চিত্রগুলি উপলক্ষ্য মাত্র, সামান্য এক একটি সূত্র ধরে তাঁর কবি মানস বস্তু বস্তারে রূপ থেকে রূপান্তরে ছন্দ গেঁথে চলেছে। ছবি একটি জায়গায় এসে স্তব্ধ, সে যেন তার সমস্ত বাণী বয়ে এনে বোবা হয়ে যায়। কবি সেই স্তব্ধ বাণীকে ভাষা ও ছন্দে গেঁথে চলমান করে দেন। ছবি না দেখলেও 'বিচিত্রিতা'র কবিতার রসগ্রহণে বাধা হয় না। রবীন্দ্রনাথ চিরদিন অন্তরের অরূপ মূর্তিকে ভাষায় রূপ দিয়েছেন, আজ তিনি চিত্রশিল্পী; রূপকারের সৃষ্টির অন্তরে সহজে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন, এই রূপ ও ছন্দের রাজ্য তাঁর মনে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলে আছে। তাই চিত্রের রূপ তাঁর মনে ভাব-তরঙ্গ তুলেছে। এই 'বিচিত্রিতা' খণ্ড-কবিতার সংগ্রহ; কবিতাগুলির মধ্যে পরস্পরের ভাবের কোনো সাম্য নাই। অল্প-সময়ের মধ্যে লেখা কবিতার মধ্যে পরস্পরের ভাবসাম্য না থাকারই কথা। রবীন্দ্রজীবনীকার আরও বলেন, (পৃ ৪১১). 'তবে, বিচিত্রিতার সব কবিতাই ছবি দেখিয়া লিখিত হয় নাই; কয়েকটি কবিতার উপর ছবি আঁকা হয় বলিয়া শুনিয়াছি।'

এই কাব্যগ্রন্থখানি কবি আচার্য নন্দলালের জন্মদিন স্মরণ করে তাঁকে উৎসর্গ করলেন। এই উৎসর্গ রবীন্দ্রজীবনীকারের মতে, 'উহা একাধারে কবির ও রূপদক্ষদের যুগ্ম উপহার।' গ্রন্থারম্ভে নন্দলালের প্রতি 'আশীর্বাদ' কবিতাটি লেখা হয়েছিল ১৯৩১সালের ২৫-এ নবেম্বর বা ১৩৩৮সালের অগ্রহায়ণ মাসের রাসপূর্ণিমার দিনে। ১৮৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের

॥ প্রথম খণ্ড সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত ॥

নন্দলাল বসুর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সভানেতৃত্বে সম্প্রতি নয়াদিল্লির সংসদভবনে প্রধানমন্ত্রীর অফিসঘরে শতবর্ষপূর্তি কমিটির এক বৈঠক হয়। সভায় স্থির হয়েছে ··· বিশ্বভারতীর অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল রচিত শিল্পাচার্যের জীবনীগ্রন্থের ৪০০কপি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক কিনে নেবেন এবং দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে দান করবেন। —(যুগান্তর ১°অক্টোবর ১৯৮২)।

'ভারতশিল্পী নন্দলাল' গ্রন্থখানি অভিনব। গ্রন্থখানি নন্দলাল বসু ও শ্রীমণ্ডল উভয়ের মিলিত প্রয়াসের ফল।···নন্দলালের নিজের কথা ও তাঁর কালের কথা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। নন্দলালের মত একজন মহৎ শিল্পীর অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন এবং জাতীয় শিল্পচিন্তা ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগের বিবরণসম্পন্ন 'ভারতশিল্পী নন্দলাল' আকরগ্রন্থরূপে অনবদ্য একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। — (আনন্দবাজার পত্রিকা, সোমবার ৮জুন ১৯৮৩)।

'ভারতশিল্পী নন্দলাল' শুধু মহাশিল্পী নন্দলালের জীবনকথা নয়, বিংশ শতাব্দের প্রথমপাদে আমাদের জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ভাব-আন্দোলন জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রেরণা ও উদ্যম এনে দিয়েছিল —শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে সেই আন্দোলনের প্রসার ও রূপায়ণের ইতিহাসও একই সঙ্গে এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। নন্দলালের মত একজন মহৎ শিল্পীর অন্তর্জীবন ও বাহ্যজীবন এবং জাতীয় শিল্পচিন্তা ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সংযোগের বিবরণসহ এই গ্রন্থ শিল্পজগতে একটি আকরগ্রন্থরূপে গৃহীত হইবে। এই গ্রন্থ ডঃ মণ্ডলের আর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্ম। শ্রীমণ্ডলের আদি নিবাস বর্ধমান জেলার রায়না থানার ছোটবৈনান গ্রামে। আমরা তাঁহার জন্য গৌরব বোধ করি। — (বর্ধমানের ডাক, ৭ই জুন, ১৯৮৩)।

ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের অদ্ভুত গদ্যে কলকাতার চঙ্গয়ে মহাশিল্পীর সেই দূরগামী শিল্পভাবনা অতি সহজে পাঠের মাধ্যমে মরমে প্রবেশ করে। গদ্যরীতি এ এক অভিনব বিন্যাস।—(কান্দীবান্ধব, ২৭৭ এপ্রিল ১৯৮°)।

এ বই নন্দলালের স্মৃতিকথার অনুলেখনপ্রসঙ্গে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জাগরণ ও প্রসারের ইতিহাস। পঞ্চানন মণ্ডলমশায় শান্তিনিকেতনে

এক পুঁথি নিয়ে কাজ করতে করতে এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাটি স্বতঃ স্ফূর্ত রূপ পেতে শুরু করেছিলেন। নন্দলালের সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন প্রায় পঁচিশ বছর আর অবসর সময়ে শিল্পীকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন তাঁর জীবন-কথা। প্রথম খণ্ডটির মূল্যবত্তা বেড়েছে নন্দলালের ছবির তালিকাসহ বিবরণ থাকাতে। হাফটোন ছবিগুলি অবশ্য সাধারণ প্রিন্ট। বইটির দাম একশ টাকা। রঙিন ছবি থাকলে দাম স্বভাবতই নাগালের বাইরে চলে যেত। কিন্তু যে সব ছবি এবং স্কেচ এখানে ছাপা হয়েছে তার ভেতর দিয়েই নন্দলালের কলাশাস্ত্রের বিস্ময়কর ভাবের আভাস পাওয়া যায়। অন্তত যাঁরা নন্দলালের ছবি আলাদা করে দেখেননি, তাঁরা তার পরিচয় পাবেন। ছাড়া বিশ্বনাথ সংস্ক্রিত ঠাকুরবাড়ির দাদা টাইকান অবনীন্দ্রনাথ, সুরেন গাঙ্গুলী প্রমুখের ছবির চিত্রকর্মগুলি ঐতিহাসিক গুণসম্পন্ন। — দেশ, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮০।

'জনমনের বসওয়েল শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীম, নন্দলালের পঞ্চানন মণ্ডল।' বেদান্ত। আষাঢ় ১৩৯০।

ভারতশিল্পী নন্দলাল / প্রথম খণ্ড / যেমনটি বলেছেন / ১৮৮২-১৯৬৬ / শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল / রাঢ় গবেষণা-পর্ষদ / পৃষ্ঠা ২১। ৮৮৩, বহুচিত্রযুক্ত। প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৩৮৯, ডিসেম্বর ১৯৮২ মূল্য একশত টাকা। আকার ২১ × ১৭ সেন্টিমিটার।

বাংলা জীবনী সাহিত্যের বিরাট অঙ্গনে আলোচ্য গ্রন্থখানি এক নূতন সংযোজন। ইহাকে যেমন আত্মজীবন বলা চলেনা তেমনি ইহা আত্মজীবনী নয় তাহাও বলা চলে। 'শ্রীম' কথিত রামকৃষ্ণকথামৃতে যেমন রামকৃষ্ণ-দেবের বহু উক্তি অনুস্মৃতঃ ছড়াইয়া রহিয়াছে আলোচ্য গ্রন্থেও শিল্পী নন্দলালের জীবন কাহিনী — 'যেমনটি বলেছেন' ভঙ্গিতে স্থান পাইয়াছে। ইহা এক নূতন স্বাদের জীবনীগ্রন্থ।

'ভারতশিল্পী নন্দলাল' গ্রন্থ পাঠ করিতে গিয়া মহাভারতের একটি চিত্র মানসনেত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই চিত্রে বক্তা ব্যাসদেব বলিয়া যাইতেছেন, আর শ্রুতলিপিকার গণেশঠাকুর তাহা লিখিয়া যাইতেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে বক্তা শিল্পী নন্দলাল — শ্রুতলিপিকার বক্তার স্নেহধন্য পঞ্চানন মণ্ডল।

যে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এই গ্রন্থ অনুলিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া বিদগ্ধ পাঠকমণ্ডলী তৃপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। নন্দলালের ভাষায় —

রাসপূর্ণিমার দিনে নন্দলাল ভূমিষ্ঠ হন। সেই স্মরণেই কবির এই 'আশীর্বাদ' কবিতা।

এই আশীর্বাদ কবিতা লেখার সময়ে 'বিচিত্রিতা'র কবিতা লেখা হয়নি। ১৩৩৯সালের কার্তিক সংখ্যার 'বিচিত্রা'-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, পঞ্চাশটি নূতন ছবি ও সেই ছবি দেখে কবির পঞ্চাশটি নূতন কবিতা শীঘ্রই 'বিচিত্রিতা' নামে বই আকারে বের হবে। কিন্তু 'বিচিত্রিতা'য় পঞ্চাশটি কবিতা নাই; আছে একত্রিশটি। অবশিষ্ট কবিতা 'বীথিকা' ও 'পরিশেষে'র মধ্যে আছে। 'বীথিকা'র 'গোধূলি' (১৪ মাঘ, ১৩৩৮) নামে কবিতাটি আচার্য নন্দলালের একটি ছবি দিয়ে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৩৮সালের ২৯-এ চৈত্র কবি পারস্য যাত্রা করেন। পারস্যযাত্রার আ পর্যন্ত কবির লেখা কবিতার তালিকা সঙ্কলন করে দেওয়া গেল। এর মধ্যে অধিকাংশই 'বিচিত্রিতা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার ক্রমিক তালিকা দেওয়া গেল।—১৩৩৮ মাঘ ২ বেসুর (বিচিত্রিতা ২১ নং, চিত্রী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর), মাঘ ৩, হার (বিচিত্রিতা ৯নং, সুরেন্দ্রনাথ কর); মাঘ ৪, কালোঘোড়া (বিচিত্রিতা ২৪নং, গগনেন্দ্রনাথ), মাঘ ৪, মরণমাতা (বীথিকা, পৃ. ৮০), মাঘ ৫ পসারিণী (বিচিত্রিতা ৮নং, নন্দলাল বসু), মাঘ ৬, অপ্রকাশ (বীথিকা, পৃ ১২২), মাঘ ৭, মরীচিকা (বিচিত্রিতা ১০নং, গগনেন্দ্রনাথ), মাঘ ৭, রাত্রিরূপিণী (বীথিকা পৃ. ৯), মাঘ ৮, শ্যামলা (বিচিত্রিতা ১১ নং, রবীন্দ্রনাথ); মাঘ ৯, আরশি (বিচিত্রিতা ৭নং, সুরেন্দ্রনাথ কর), মাঘ ১০, পুষ্পচয়নী (বিচিত্রিতা) ১৮নং, (ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার), মাঘ ১০, দীপ (বিচিত্রিতা ১৯নং, গগনেন্দ্রনাথ), মাঘ ১১, পুষ্প (বিচিত্রিতা ১১নং রবীন্দ্রনাথ); মাঘ ১১, দ্বারে (বিচিত্রিতা ২০নং সুরেন্দ্রনাথ), মাঘ ১২, কুমার (বিচিত্রিতা ৬নং, গগনেন্দ্রনাথ); মাঘ ১২, যাত্রা (বিচিত্রিতা ২৮নং, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী); মাঘ ১৩, দ্বিধা (বিচিত্রিতা ২৭নং, গগনেন্দ্রনাথ), মাঘ ১৪, বধূ (বিচিত্রিতা ২নং, গগনেন্দ্রনাথ), মাঘ ১৪, গোধূলি (বীথিকা পৃ. ১০)।

বিচিত্রিতার জন্যে মাঘমাসে রচিত কবিতা (তারিখ নাই) — সাজ্ঞী ১০নং (চিত্রী সুরেন্দ্রনাথ কর); প্রকাশিতা ১৪নং (চিত্রী নিশিকান্ত রায় চৌধুরী), বরবধূ ১৫নং (চিত্রী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী), ছায়াসঙ্গিনী ১৬নং (চিত্রী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর); নির্বাক (২৮ মাঘ, পরিশেষ); ভেদ

১৭নং (চিত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), অচেনা ৩নং (চিত্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর), গোয়ালিনী ৫নং (চিত্রী গৌরী দেবী), অনাগতা ২৫নং (চিত্রী মনীষী দে), ঝাঁকড়া চুল ২৬নং (চিত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) কন্যাবিদায় ৩০নং, (চিত্রী নন্দলাল বসু) ।

১রা ফাল্গুন, ব্যর্থমিলন অপরাধিনী (বীথিকা), ৫ই ফাল্গুন, যুগল (বিচিত্রিতা ২০নং চিত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), ২৫ ফাল্গুন, প্রতীক্ষা (পরিশেষ), ২৫ ফাল্গুন পক্ষী-মানব (নবজাতক), ২৮ ফাল্গুন একাকিনী (চিত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২১ নং বিচিত্রিতা) ২৮ফাল্গুন রাজপুত্র (পরিশেষ) । ফাল্গুন মাসে লেখা অন্যান্য কবিতা — দীপশিল্পী বিহ্বলতা (বীথিকা) ।

৯চৈত্র বসন্ত উৎসব (দোলপূর্ণিমা), পরিশেষ (সংযোজন), ১১ চৈত্র ছন্দোমঞ্জরী (বীথিকা), ১২ চৈত্র, অগ্রদূত (পরিশেষ) ১৪ চৈত্র শান্ত (পরিশেষ), ১৭ চৈত্র প্রণাম (পরিশেষ) । চৈত্রমাসে লিখিত শূন্যঘর (পরিশেষ) গোড়ী রীতি, পরিচয় ১৩৩৯ ।

পরিজ্ঞাত এই তালিকা ছাড়া বিচিত্রিতা' গ্রন্থে 'দান বিদায়, 'স্যাকরা ও 'নীহারিকা এই চারটি কবিতা রয়েছে । এই কবিতা চারটী চিত্রভূষিত । চিত্রশিল্পী হলেন — দান' —সুনয়নী দেবী বিদায় —রবীন্দ্রনাথ 'স্যাকরা --নন্দলাল এবং নীহারিকা' —প্রতিমা দেবী ।

বিচিত্রিতা গ্রন্থের 'প্রথম সংস্করণ' প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসে। ছাপা হয়েছিল ১১০০ কপি। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট এঁকেছিলেন আচার্য নন্দলাল। অনুচ্ছদ'ও তাঁরই আঁকা। শীর্ষক 'বিচিত্রিতা' চিত্রিত করেছেন স্বয়ং কবি ।

আচার্য নন্দলালের পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন পালন করা হয় ১৩৩৮ সালের ৯ই অগ্রহায়ণ তারিখে। নন্দলালের এই জন্মদিন স্মরণ করে কবি এই গ্রন্থখানি নন্দলালকে আশীর্বাদ' রূপ উৎসর্গ করেছিলেন এক বছর আট মাস পরে ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসে। কবির দৃষ্টিতে নন্দলাল তখন হলেন ভারতশিল্প পরম্পরার একক প্রতিনিধি আদর্শ ভারতশিল্পী। এই পরম্পরাগত ই সেকালের লক্ষণীয় চিত্রশিল্পীদের সমবেত শিল্প অর্ঘ্য আপন বাণীতে বাঙ্ময় করে রবীন্দ্রনাথ এই বিচিত্রিতা গ্রন্থের পত্রপুটে নন্দলালকে নিবেদন করলেন। আমাদের মনে হয় এই হলো ভারতশিল্পী নন্দলালের প্রতিভার একটি বিশিষ্ট মূল্যাঙ্কন ।